ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৭, সেপ্টেম্বর ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 11th Issue 27th, September, 2024

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 27th, 9th September, 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১১ তম বর্ষ ও ২৭ তম সংখ্যা
৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, পি. কে. কলেজ, কাঁথি)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি : একটি পর্যালোচনা
হাসনাইন ইস্তেফাজ ১৩

'ভূম' রাজ্যে বর্গী হানা : বিপদ ও বিপর্যয়
শোভন ঘোষাল ২৫

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বঙ্গসমাজে নারীজীবনের
মুক্তিসূর্য শ্রীচৈতন্য ও আধুনিক সমাজের প্রতিচ্ছবি
নম্রতা দত্ত ৩৩

অনালোকিত ভৈরব নদী তীরবর্তী প্রান্তিক জীবনের কথাকার
সৌরভ হোসেনের সাহিত্য : বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ
সুমন হাসান ৪১

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন
মোসাহিদা খাতুন ৪৮

ঔপনিবেশিক শাসনকালে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের প্রভাবে
বাঁকুড়া জেলার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত
সুমিলা খাতুন ৫৪

বৌদ্ধ আখ্যান 'কাঞ্চনমালা': প্রতিহিংসা বনাম প্রেম
সুকন্যা চতুর্বেদী ৬২

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও বাংলায়
গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৮৩৬-১৯০৩)
কুশধর মান্না ৭১

কংগ্রেস ও বিপ্লবী নেতা হিসাবে বিপিন বিহারী
গাঙ্গুলীর অবদান (১৯০৫-১৯৫৪)
পীযূষ রায় প্রামাণিক ৮০

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সিনেমা : তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি
স্বস্তিকা বিশ্বাস ৮৮

ভারতীয় চেতনায় প্রকৃতি ও নারী
সোনালী পাল ৯৫

‘শুকতারা’র প্রথম পঁচিশ বর্ষে প্রকাশিত ছোটোগল্প :
সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি (১৩৫৪ – ১৩৭৯)
শুভঙ্কর ঘোড়ুই ১০২
আদি মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় বিতর্কের এক নয়া দিক :
একীকরণ নাকি অধিগ্রহণ?
নচিকেতা সাহা ১১০
ভারত : উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি
মৈনাক মণ্ডল ১১৯
অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাব্যময় গদ্যভাষা
পম্পা বর্মণ ১৩০
কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিবাদী দর্শনে মানব অস্তিত্বের তিনটি স্তরের
একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
আসলাম মল্লিক ১৩৯
‘ঘাটের কথা’ : রবীন্দ্র প্রতিভার এক কালোত্তীর্ণ মর্মকথা
মৃণালকান্তি মুর্মু ১৪৮
চল্লিশের দশকের কলকাতার সামাজিক বাস্তবতা এবং
ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য
অনিন্দিতা গাইন ১৫৬
জানগুরু : এক আলো অন্ধকারের গল্প
পাপিয়া নন্দী ১৬৪
হীরক রাজার দেশে সিনেমার রূপক বাস্তবতা ও বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা
মনোজ মণ্ডল ১৭২
হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র : শিশুচরিত্র গঠনে নৈতিক শিক্ষা ও জীবনের পাঠ
রতন রায় ১৮০
হাসান আজিজুল হকের নির্বাচিত গল্পে মনস্তত্ত্ব
আলোকপর্ণা সাহা ১৮৮
সুফি ধর্মধারার আলোকে লৌকিক দেবী ওলাইচণ্ডী তথা
ওলাবিবি : হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়
মুন্সী মহঃ সাহেবুর রহিম ১৯৫

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত গল্প : নারীর কণ্ঠে নারীর কথা
সুদেষ্ণা আদক ২০২
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ : নারীর রুদ্ধসঙ্গীত
আসিফা সুলতানা ২১১
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে অতিপ্রাকৃতের আবেশ
পিংকি দেবনাথ ২১৮
প্রেম : হুমায়ূন আহমেদের গল্পে
রাম কোনাই ২২৪
বিষয়ের অভিনবত্বে ‘শিলাপটে লেখা’: ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পায়েল হালদার ২৩৩
বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণ প্রসঙ্গে : কান্ট ও কোয়াইন
অনুপম দাস ২৩৯
বাস্তবের আখ্যান, আখ্যানে ইতিহাস ও শরদিন্দুর ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’
মিঠুন মন্ডল ২৪৫
ক্যালেন্ডার চিত্র : প্রতিটি বাস্তবযাপনের একটি পৌরাণিক আলাপ
বাপী মজুমদার ২৫৩
বাংলা কথাসাহিত্যে পিঁপড়ে-বৃত্তান্ত
উজ্জ্বল মণ্ডল ২৬২
বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের গান
ফ্রেডরিক মান্ডি ২৭৪
‘অসমের নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ ও ছিন্নমূল বাঙালির অস্তিত্বের সংকট’
বিপুল রায় ২৮২
প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : সাম্প্রদায়িকতার তমসাচ্ছন্ন ধ্বংসভূমিতে ‘চৈতন্যবান মানব’এর সন্ধান
সাথী ত্রিপাঠী ২৯০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্প : নারী ভাবনার আলোকে
রিয়া সাহা ৩০২
নবনাট্য ভাবনায় গঙ্গাপদ বসুর নাটক ‘সত্য মারা গেছে’ : একটি পর্যালোচনা
সঞ্জীব গরাই ৩১০
উনিশ শতকের আলোকে বাঙালি নারীর চিত্রশিল্প ও আলোকচিত্র চর্চা
শতাব্দী ধন ৩১৯

দয়ারাম দাসের ‘লক্ষ্মীচরিত্র’ : পুনর্পাঠ
অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী ৩২৬
একুশ শতকে চিত্তরঞ্জন দাশের চিন্তনের প্রাসঙ্গিকতা :
একটি ঐতিহাসিক বীক্ষণ
ইন্দ্রজিৎ দাস ৩৩৬
ঔপনিবেশিক বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর : সমসাময়িক বাংলা
সাহিত্যের উপর অভিঘাত
সুরজিৎ ঘোষ ৩৪৫
পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫৭)
জগবন্ধু সরদার ৩৫৪
উনিশ শতকের বাঙালি ‘মন’ ও ‘কথামৃত’ : একটি বিশ্লেষণী পাঠ
পিয়ালী বসু ৩৬২
বিবর্তনের বঙ্গ সমাজে চৈতন্য আদর্শ : সেকাল ও একাল
অরিন্দম মণ্ডল ৩৭২
শৈবাল মিত্রের ইলিশের রাত : এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারিক
জটিলতার উদ্ভাসিত ছবি
স্নিগ্ধা কর্মকার ৩৭৮
রবীন্দ্রনাট্যে ও প্রহসনে হাস্যরস
সুস্মিতা সাহা ৩৮৫
ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় ধর্মের ধারণা : একটি আলোচনা
নবনীতা রায় ৩৯৪
মেরুদণ্ড ও জয় গোস্বামীর নির্বাচিত কবিতা
মহম্মদ ওমর ৪০৩
বাংলার বৃক্ষকেন্দ্রিক দেবদেবী, লোকাচার ও পূজাপার্বণ
অর্পণ মণ্ডল ৪১৩
স্বাধীনোত্তর বাংলার তপশিলি সমাজ-শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে
রবি ঘোড়াই ৪২৫
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের দার্শনিকতা :
সৌন্দর্যবোধ ও বিশ্বসত্য সম্পর্কে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
সেখ সামিম আলি ৪৩৮

বাংলা বানান চর্চায় দেশ পত্রিকার ভূমিকা
জয়ন্ত বিশ্বাস ৪৪৬
গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে আইনি সীমাবদ্ধতা : ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য
হিংসা বিরোধী আইনের মূল্যায়ন
সীমা ঘোষ ৪৫৮
সেকাল – একালের সেতুবন্ধন : প্রসঙ্গ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
'জাতিস্মর' (গল্প গ্রন্থ)
বনমালী খাটুয়া ৪৬৪
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী এবং বর্তমান
সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা
ইতি বিশ্বাস ৪৭৫
স্বদেশ-সন্ধানী মন : প্রেক্ষিত 'নোনা জল মিঠে মাটি'
শবনম মুস্তারী ৪৮২
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে লিঙ্গভাবনা : প্রসঙ্গ 'দহন'
মঞ্জুরী বিশ্বাস ৪৯২
আসুন, বিজ্ঞাপন পড়ি
প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ৫০২
ভারত – জাপান সম্পর্ক : একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা
সুরজিৎ মজুমদার ৫০৮
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মধুকর': দর্পণে নৌ-শিল্পীদের জীবনালেখ্য
বাবলী বর্মন ৫১৬
কামনাতাড়িত প্রবৃত্তির উন্মাদনা ও ব্যক্তিজীবনের অসহায়তা :
'বৃষ্টিতে দাবানল' এবং 'তৃষ্ণা' তুলনামূলক পাঠের আলোকে
মিন্টু নস্কর ৫২৬
Contribution of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar as
Educational and Social Reformer in the 19th Century
Bidyut Sarkar ৫৩৪
The Development of Political Alternatives in Bengal During
1920's: Emergence of Leftism and The Role of
Newspaper in Its Growth
Debdatta Banerjee ৫৪৬

Interpretation of *Dracula* through the Lens
of Science Fiction
Kisor Baulia ৫৫৪
The Citizenship Amendment Act : Constitutional
Challenges and Human Rights Concerns
Surya Kanta Datta ৫৬৬
Jagat Seths : A Historical Review on Monopolistic
Dominance Over Mercantile Economy of Eighteenth
Century Murshidabad
Atriya Sarkar ৫৭৪
Uprooted, not tamed : Revisiting the
experiences of refugees of East Pakistan through
the prism of literature
Arnab Bhattacharyya ৫৮২
The Sea port of Gwadar : Security Implication for India
Sanjay Biswas ৫৯১
Locating the Indian Migrant Labourers in
Bhutan through the Diasporic lens
Tsheten.Tshomo.Bhutia ৬০০
Tourism Impact Assessment : A Study on West Bengal
Coastal Stretch
Jayeeta Bagchi ৬১৫
Orating the Dignity of Man : Reading Krishna Mohan Banerji's
The Persecuted in the Light of Renaissance Humanism
Ratan Dey ৬২৭
A Secular Integration of Human Value :
The Kernel of Religious Harmony
Apabrita Bhattacharya ৬৩৪

সম্পাদকীয়

চিন্তাশ্রীত আলোকে বিশ্লেষীত করতে কে না চায়। নিজের মত করে। কথার পিঠে দুটো কথা জুড়ে। হোক না গভীর অথবা গভীরে না গিয়ে। কিন্তু বাসনা থেকেই যায়। বিচার বিশ্লেষণ করার। সবটা মধুরতা ছড়ায় না। মাঝে মাঝে অমধুরতাও ছোঁওয়াও মেলে। প্রয়োজনবোধে গ্রহণ বা বর্জন। ঠিক ভুলের হিসাবটাও কোন সময় হয়ে পড়ে বেঠিক। আলোকোজ্জ্বল জীবনেও ছায়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে কখনো কখনো। সবটা নিয়েই পরিপূর্ণতা। এবারের সংখ্যাতে সেই স্বাদই মিলবে।

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি : একটি পর্যালোচনা

হাসনাইন ইস্তেফাজ
প্রভাষক, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃতি একটি বহুমাত্রিক ধারণা। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ। মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা সামগ্রিক রূপ-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার ও জীবনযাত্রায় রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। শুধু ভিন্ন ভিন্ন জেলা নয়, বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র হাওর অঞ্চলের এক জেলার মানুষের জীবনাচরণের সাথে অন্যান্য জেলার মানুষের জীবনাচরণের রয়েছে ভিন্নতা। আর এ কারণেই বৈচিত্রময় হাওরের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস ও স্বরূপ নিয়ে বর্তমান গবেষণা।
সূচক শব্দ: হাওর পরিচিতি, বস্তুগত লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোকক্রীড়া, লোকখাদ্য, লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, লোকচিকিৎসা, লোকউৎসব, লোকপ্রবাদ-প্রবচন, লোকধাঁধা।

মূল আলোচনা

বাংলাদেশ বিশ্বের নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত। এ দেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত বিশাল নিম্ন জলাভূমিপূর্ণ হাওরাঞ্চলকে ভাটি এলাকাও বলা হয়। প্রাচীনকালের নানা তথ্যে 'শ্রীহট' বলতে যে অঞ্চলটিকে নির্দেশ করা হয় ভাটি অঞ্চলটি তারই অর্ন্তগত ছিল। "সুরমা-অববাহিকায় সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৭৩ টি উপজেলার সমন্বয়ে ১৪৬৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই হাওর এলাকাটি বিস্তৃত। দেশের প্রায় এক-দশমাংশ এই হাওরাঞ্চলে ১৮০৫৩৯৭৪ জন মানুষের বসবাস।"[১] 'হাওর ও জলাভূমি বোর্ড' তথ্য অনুযায়ী এখানে রয়েছে প্রায় ৪১৪টি হাওর, তবে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হাওর রয়েছে সিলেট বিভাগে। একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ হাওরাঞ্চল। ইতিহাস-ঐতিহ্যে বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসেবে পরিচিত এই হাওরাঞ্চলের ইতিহাসের বিভিন্ন সময় নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্টি হয় এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি। এখানে রয়েছে একটি নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার। এখানকার

প্রকৃতি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র, জনজীবন, পেশা, অর্থনীতি,সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রভৃতি দেশের অন্য যে-কোনো অঞ্চল থেকে কিছুটা ভিন্নতর।

সংস্কৃতি হলো একটি জাতির প্রাণ ও জীবন পদ্ধতি। মানব জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে লোকায়িত রয়েছে সংস্কৃতি। মানুষ তার জীবন পথে চলার জন্য যে অভ্যাস, চলন-বলন, কথা-বার্তা রপ্ত করে তাই সংস্কৃতি। আর তাই একেক অঞ্চলের মানুষের জীবনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। "সংস্কৃতি একটি জাতি গোষ্ঠীর শুধু পরিচয় বহন করে না, তার স্বাতন্ত্রকেও তুলে ধরে। সংস্কৃতি একটি জাতির অস্তিত্বের প্রতীক।"[২] লোকসংস্কৃতির বিশেষত্ব নিহিত আছে 'লোক' কথাটির মধ্যে। লোকসংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে, তাদের চিন্তা ও কর্মে। 'লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতি বিকাশ।'[৩] ঐতিহ্যানুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সংস্কৃতিকে সহজ ভাষায় লোকসংস্কৃতি বলা হয়। লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী চরিত্র ও গঠন প্রকৃতি অনুসারে লোকসংস্কৃতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন-

"ক. বস্ত-নির্ভর লোকসংস্কৃতি: পোশাক-পরিচ্ছদ, কুটির-শিল্প, লোক-ভাস্কর্য, দেওয়াল চিত্র ইত্যাদি।

খ. অ-বস্তনির্ভর লোকসংস্কৃতি: লোকসাহিত্য।"[৪] তিনি লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, কথা, গান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত যে অভমত দিয়েছেন তা হলো- "কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছদের বিশিষ্টতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে তাকেই 'লোকায়ত সংস্কৃতি' বলে গ্রহণ করতে পারি।"[৫] আর তাই সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের বহুভঙ্গিম রূপ।

লোকসাহিত্য হচ্ছে প্রান্তিক মানুষের মন, মনন ও সংস্কৃতির প্রসূন। যে মানুষেরা বাস করে মাটি, জল, নদী ও সর্বোপরি প্রকৃতির সান্নিধ্যে। যে মানুষেরা নিয়ত শস্য ও সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করে, সে মানুষদের জীবন ব্যবস্থার ফসলই হচ্ছে লোকসাহিত্য। "লোকসাহিত্য লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্য। সমষ্টির চেতনা ও চিত্ত নির্যাসে এর জন্ম। সমষ্টির মর্মবাণী বহন করে লোকসাহিত্য।"[৬] ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য। হাওর অঞ্চলের কবিরা লিখতেন নতুন নতুন সাহিত্য। সেখানে মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, দুঃখ, বেদনার অনুপম চিত্র ফুটে উঠতো। পাশাপাশি রূপ নিতো এক উজ্জ্বল ও মহৎ সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের প্রথম রচয়িতা দ্বিজবংশী দাসের পূণ্যভূমি এ হাওরে। তাঁরই কন্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি মহিলা কবি

চন্দ্রাবতী এখানকার লোকজ ভান্ডার বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে তুললো। হাওরের নতুন প্রজন্ম তাঁদেরই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এখানকার সাহিত্যকে সম্প্রসারিত করে চলেছে। তেমনি এ হাওরে জন্ম নিয়েছেন মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, মনসা মঙ্গলের আদি কবি দ্বিজবংশী দাস, চন্দ্রকুমার দে, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, আল মাহমুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবদুল কাদির, আবদুল হাফিজ, নির্মলেন্দু গুণ, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য, মহাকবি সঞ্জয়, ভূদেব চৌধুরী, মুন্সি আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্নসহ অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। তবে ঐতিহ্যের প্রাচীনতা থাকলেও এই হাওরের সংস্কৃতি চর্চার সর্বগামী ব্যাপকতা খুব একটা প্রাচীন নয়। মূলত ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে হাওর এলাকাকে ঘিরেই এ অঞ্চলের সংস্কৃতি চর্চার বলয় গড়ে উঠে।

অনাদিকাল ধরে লোকসমাজে লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা লোকসঙ্গীতের চর্চা হয়ে আসছে। লোকায়ত ঘরানার সংগীত হিসেবে বাদ্য এবং নৃত্য মিলে হয়ে ওঠে লোকসংগীত। লোকংগীতের ভেতর থেকেই শাস্ত্রীয় সংগীতের বিকাশ সাধিত হয়েছে বলে সংগীতজ্ঞরা মনে করেন। “বাংলা লোকসাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুল প্রচারিত জীবন্ত শাখা হল লোকসঙ্গীত। উচ্চ সঙ্গীতের মতো সুরই লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ।”[৭] হাওরের বিস্তৃত জলরাশি বিধৌত হাওরবাসীর মুখে মুখে এসব লোকগান সুদীর্ঘকাল থেকেই প্রচারিত হয়ে আসছে। লোকগানে নিপীড়িত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আনন্দ-বেদনা-সুখ-দুঃখের কাহিনী ঠাঁই পেয়েছে সুনিপুণভাবে। হাওরের পালাগান, কবিগান, পুঁথিপাঠ ও লোকসংগীত সাধারণ মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। এখানকার জারিগান ও এর বিচিত্র পরিবেশনা শ্রোতামন্ডলীর কাছে খুবই উপভোগ্য। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলিসহ পালাগান, মহানবীর জীবনী, হযরত আলী ও হযরত হামজার বীরত্বগাঁথা নিয়ে কাহিনীকাব্যের প্রচলন ছিল। বাউল গান, জারি গান, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি, পালা গান, কবি গান, ঘাটু গান, ধামাই গান, মলয়া সংগীত, মেয়েলী গীত, বাইদ্যার গান, গাইনের গীত, গাজীর গীত, মারফতি সংগীত, কাপালী সংগীত, কর্ম সংগীত, মুর্শিদি গান, বারোমাসি গান, দেশাত্মবোধক গান, বিচার গান, রসিক গান, আঞ্চলিক গীতসহ বিচিত্র গানের প্রচলন রয়েছে।

লোকসংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ লোকবাদ্যযন্ত্র। এতে লোকমানস ও লোকজীবনের প্রতিফলন ঘটে। “লোকসংগীত লোকবাদ্যযন্ত্রের কারণেই রহস্যময় হয়ে ওঠে। সামাজিক উৎসব আচার ধর্মীয় অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা, শবযাত্রা এবং আরো নানাবিধ অনুষ্ঠানে লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।”[৮] দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দোতারা, হারমোনিয়াম, খঞ্জনি, বাঁশি, একতারা, বুগলি, থুনথুনে, বেনা, সারিন্দা, খমক, আরশী, ঢাক, ঢোল, ডুগডুগি. কাসি, জুরি, চটি, পাটলা, করতাল, আড়বাঁশি, টিপরাবাঁশি, স্বরাজ, মন্দিরা, শঙ্খ, শিঙ্গা ও তবলাসহ বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

“বিনোদনপ্রিয় হাওরের মানুষেরা নানা উৎসবে নানা পার্বনে লোকনৃত্য ও লোকগানের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছেন। সেসব আয়োজনে লোকবাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই হয়ে আসছে। অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন লোকগান এর আয়োজনে লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কমতি নেই।”[৯]

প্রাচীনকাল থেকেই হাওরে নানা ধরনের লোকক্রীড়ার আয়োজেন হয়ে থাকে। লোকায়ত বাংলায় আমরা নানা রকম খেলাধুলা দেখি। গ্রামজীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত এসব খেলাধুলাকে ‘লোকক্রীড়া’ বলে। এ বিষয়ে অলোককুমার ব্যানার্জী লিখেছেন, “লোকক্রীড়া মানুষের জীবন চর্চা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এবং অনেক লোকক্রীড়ায় প্রাচীন মানুষের জীবনধারণা প্রণালীর প্রতিভাস লক্ষ করা যায়।”[১০] হাওরের লোকজ খেলাধুলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্বতন্ত্র গোছের লোকক্রীড়া রয়েছে। তবে কিছু কিছু লোকক্রীড়া আবার সমগ্র বাংলাতেই সাধারণভাবে একই আঙ্গিকে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বউছি, কানামাছি, ডাংগুলি, সাতচাড়া, নৌকাবাইচ প্রভৃতি লোকক্রীড়ার কথা বলতে পারি। তবে পরিবেশগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আদিকাল থেকেই ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়া দৌড়, লাঠিখেলাসহ বেশকিছু খেলার প্রতি এ এলাকার মানুষের আগ্রহ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা চিরন্তন। তবে হাওরাঞ্চলে আরও কিছু ভিন্ন আঙ্গিকের লোকক্রীড়ার সন্ধান পাওয়া যায় যা অন্যান্য অঞ্চলে বিরল। এসব লোকক্রীড়ার মধ্যে চইতই, রস-কস খেলা, গুটিখেলা, বলাই খেলা, লাইখেলা অত্যন্ত প্রাণোচ্ছ্বল। তাছাড়া এ বিস্তীর্ণ জনপদ হাওর অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়া ইভেন্টের নাম সাঁতার।

“লোকনাট্য লোকসমাজের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত এক যৌথ সৃষ্টি যা লিখিত বা অলিখিত এবং মুখে মুখে প্রচারিত হতে পারে। দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ে এবং বিস্মৃত বা সংকীর্ণ পরিসরের হতে পারে।”[১১] আদিকাল থেকেই ভাটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী জনপদ হাওরাঞ্চলে নানারকম সংস্কৃতিচর্চা পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলে বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন গ্রামে লোকনাট্য পরিবেশনের ধুম পড়ে। লোকনাট্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারা ‘যাত্রাগান’ পরিবেশনা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রেখেছে। এসব যাত্রাগানের মধ্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক, জনসচেতনামূলক প্রনয়াখ্যানসহ নানা জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। প্রচলিত যাত্রাগানের মধ্যে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা, নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, সোহরাব-রোস্তম, ডালিমকুমার, জরিনা সুন্দরী, মেহেরজানসহ প্রভৃতির খুবই জনপ্রিয়তা রয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাত্রা অপেরা, সার্কাস ও পুতুলনাচ। বিশেষত বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, গ্রামীণ মেলায় তারা বিনোদন প্রদর্শন করতো। কৃষিনির্ভর মানবসমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে লোকনৃত্য। লোকনৃত্য হলো লোকায়ত সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল উপাদান। হাওরাঞ্চলে আমরা নানা রকম নাচ বা নৃত্য দেখতে পাই। যেমন- গারো নৃত্য, পুতুল নাচ,

ধামাইলনৃত্য, রাসনৃত্য, জেলেনৃত্য, জংলী নৃত্য, লাঠি নৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য, বাউল নৃত্য, ঘাটু নৃত্য ও ফকিরি নৃত্যসহ প্রভৃতি।

লোকশিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল হলো লোকপ্রযুক্তি। মানুষ আদিকাল থেকেই নিজের প্রয়োজনেই জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটিয়ে কল্পনাশক্তির সাহায্য নিয়ে এমন কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে যাকে লোকপ্রযুক্তি বলা হয়ে থাকে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই তাঁদের জীবনযাপন এবং কাজকে সহজসাধ্য করা জন্য নানা ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন। গ্রামের এসব নিরক্ষর মানুষ কেবল নিজেরদের সৃজনদক্ষতায় প্রতিভার সাক্ষর রেখে অন্যান্য সব লোকপ্রযুক্তি তৈরি করেছেন। যুগের পর যুগ সেসব প্রযুক্তি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে টিকে রয়েছে। কালের বিবর্তনে কিছু কিছু লোক প্রযুক্তির ব্যবহার কমে গেলেও সেগুলো একেবারেই হারিয়ে যায়নি। বরং আধুনিককালের উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সমানতোলে পাল্লা দিয়ে লোকপ্রযুক্তি গ্রামীণ সমাজে ক্রিয়াশীল ভূমিকা রেখে চলেছে। লোকপ্রযুক্তি দুর্লভ নয়, বরং সহজলভ্য এবং জটিলতামুক্ত। প্রকৃতি থেকে বিদ্যাপ্রাপ্ত হাওরাঞ্চলের সেসব মানুষ নিজস্ব প্রযুক্তিতে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে আসছে। সেগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো- কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের ফলা, মই, জোয়াল, গরুর গাড়ির চাকা, উড়া, উকূল/উকুইন, ফুফা/খাফাইর, পাজুন, হাকড়া, হেঁসে; বাঁশের তৈরি বিভিন্ন লোকপ্রযুক্তি, চাঁই, কাঠা ছিপ; মৃৎশিল্পে বিভিন্ন ধরনের হাড়ি-পাতিল সরা, ধান ভানার জন্য ঢেঁকি; লোহা দিয়ে তৈরি জাতি, কোদাল, নিড়ানি, কাস্তে, দা গৃহস্থলী কাজে ব্যবহৃত।

লোকস্থাপত্য সমাজের প্রতীক ও প্রতিবিম্ব স্বরূপ। লোকমানসের সৃষ্টিশীলতা এবং নির্মাণ সচেতনার ফলই লোকস্থাপত্য। লোকস্থাপত্য পরিশীলিত আধুনিক প্রযুক্তির পর্যায়ে পড়ে না, তা নিছক গ্রামীণ নৈপুণ্য এর অর্ন্তভূক্ত গ্রামীণ স্থাপত্য পরিকল্পনা, নির্মাণ উপকরণ ও অবস্থানের দিক থেকেই আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সম্ভাব্যতার আলোকে অভিজ্ঞতা দিয়ে স্থানীয় নির্মাণ কর্মীরা বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদের সহায়তায় বাড়িঘর নির্মাণ করতেন। নাগরিক স্থাপত্যের মতোই গ্রামীণ স্থাপত্যও সদা পরিবর্তনশীল, তবে অনেক এলাকার মানুষ এখনও তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। 'হাওরাঞ্চলে বসতবাড়ি নির্মাণে মূলত বাঁশ, বেত, ছন, নাডার প্রভাব লক্ষ করা যায়।'[১২] সহজলভ্য উপাদানগুলো প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যায়। স্থানীয় বাড়িঘর, বৈঠকখানা, মন্দির-মসজিদে এ সমস্ত বস্তুগত উপাদান তারা শিল্পিতভাবে ব্যবহার করে থাকে। হাওরাঞ্চলে বর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে বাঁশ, কাঠ, খড় ও ছনের পরিবর্তে টিন ও ইটের দালান প্রায়শই দেখা যায়। তবুও ভাটি অঞ্চলে অধিকাংশ গ্রামগুলোতে এখনো পুরোনো চিত্রই চোখে পড়বে। বাঁশ, বেতের যে ভালো কাজ করতে তাদের বলা হতো 'ছাহরবন্দ'। যাদেরকে

কারিগরও বলা হয়। ছনের ছাওয়া চৌহারি ঘর ও জুইতের ঘর এখন কম চোখে পড়ে। কোনো কোনো বাড়িতে মাটির ঘর ছনের ছাউনিতে অল্প পরিসরে দেখা যায়। বাড়িগুলো অধিকাংশই পূর্ব ও দক্ষিণমুখী।

হাওর অধ্যুষিত জনপদ হাওয়ায় এখানকার মানুষের লোকখাদ্যের মধ্যে নানা বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। ভাত ও মাছ বাঙালিদের প্রধান খাদ্য হলেও শুধু এর মধ্যেই বাঙালিরা নিজেদের খাদ্যাভ্যাস সীমিত করে রাখেনি। ভাত-মাছ-ডাল যেমন-এ অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার রয়েছে তেমনি এ অঞ্চলের কিছু লোকখাদ্য রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো এ অঞ্চলের পিঠা। পিঠা জাতীয় উপাদানের মধ্যে নকশি পিঠা, পাক্কন পিঠা, ঝাল পিঠা, মালপোয়া পিঠা, পুলি পিঠা, ক্ষিরপুলি চন্দনপুলি, চালর গুড়োর জিলাপি, ডুফি পিঠা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। মিষ্টির মধ্যে রসমালাই, রস মঞ্জুরী, বালিশ মিষ্টি,সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানামুখী, পেরা সন্দেশ, দুধের ক্ষির, নাড়ু এবং রাসমঞ্জুরীর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। মিঠাই হিসেবে কদমা, বাতাসা, লালচিনি, গুড়, বুইন্দা, জিলাপী, গজা, খাজা, উখড়া, চিরা ও মুড়ি ইত্যাদি লোকখাদ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। তাছাড়া চাউলের মধ্যে এক ধরনের ছোট ছোট কণা জাতীয় চাউলকে হাওর অঞ্চলে ‘খুদ’ বলে। এই খুদ চাউল দিয়ে এক ধরনের ভাত রান্নাকে ‘বউ খুদভাত’ বলে। হাওর অঞ্চলে আরেক ধরনের লোকখাদ্য রয়েছে তাকে ‘কাঞ্জি’ বলে। প্রতিদিন রান্নার সময় এক মুঠো চাউল করে একটি হাঁড়িতে ভিজিয়ে রেখে মাসের শেষে এই ভিজানো পচাঁবাসি চাউল রেঁধে কাঞ্জি ভাত তৈরি করে অনেকেই খায়। আবার কেউ কেউ এই চাউল দিয়ে পিঠা তৈরি করে খায়। ছই বা চই পিঠা চাপা সিদল বা হিদল শুটকির ভর্তা দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস বা প্রচলন হাওরাঞ্চলে অধিক পরিমাণে রয়েছে। তাছাড়া ‘পান্তাভাত’, নিরামিষ পঞ্চব্যঞ্জন বিচিত্র ধরনের ভাজি ভর্তা খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। হাওর গ্রামাঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নে পান আন্যতম একটি অনুষঙ্গ। তাছাড়া পানের সাথে সুগন্ধি জর্দ্দা ব্যবহারও এখানে এক ধরনের আভিজাত্যের বিষয়। এছাড়া নারিকেল দ্বারা তৈরি নাড়ু ও তক্তি, কাঁচা বা পাকা আম, জলপাই, চালিতা তেতুঁল আমড়া, মরিচ ইত্যাদির আচার, আমসত্ত্ব ও চালকুমড়ার তৈরি মোরব্বা লোকখাদ্য হিসেবে ঘরে ঘরে জনপ্রিয়।

লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা। লোকশিল্পের মাধ্যমে একটি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অথর্নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। হাওর অঞ্চলের লোকশিল্পের ধারাটি সমৃদ্ধ এবং সুপ্রাচীন লোকায়ত জীবনধারা হতেই উৎসারণ এই লোকশিল্পের। “বস্তুকেন্দ্রিক শিল্প সৃষ্টিতে কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য এর উদ্ভাবন ও সৃষ্টির জন্য কোন লিখিত রূপ নেই। বস্তুকেন্দ্রিক শিল্প সৃষ্টিতে শুধু ব্যক্তির নয়, গোষ্ঠি সমাজের ভূমিকা রয়েছে।”[১৩] অবচেতনেই সাধারাণ মানুষের নন্দনবোধ তথা শিল্পবোধ এ সব প্রয়োজনীয় বস্তুগত সংস্কৃতিতে ছাপ রেখে যায় যেন। হাওরে বিভিন্ন গ্রামে মৃৎশিল্প কারিগরেরা মাটি দিয়ে লক্ষ্মী প্রতিমা, ম্যারাল, হাঁড়ি,

পাতিল, ডেকচি, সরা, কলসি, সানকি, টুপি, টব, পতুল, ব্যাংক, পাখি, ময়ূর, হাতি, টিয়া, বাঘ, সিংহ ও খেলনাসহ নানা ধরনের সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। বাঁশ ও বেত দিয়ে প্রস্তুত করা হয় মোড়া, লাঠি, ঝুড়ি, ভুল, টুপি, কুলা, পাটি, তালা, দোলনা, টুরকি, মাছ ধরার পলো, চাঁই, বাশেঁর চাং প্রভৃতি। হাওরের লোকশিল্পের বহুল পরিচিত হচ্ছে নকশি কাঁথা। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে কৃত্রিম বাতাস পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের হাতপাখার প্রচলন হাওরে দেখা যায়। যেমন-তালপাতার পাখা, কাপড়ের তৈরি পাখা, বাঁশের তৈরি পাখা ও নকশি পাখা। হাওর এলাকায় বিয়ে-শাদি ও অন্য যে-কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা রকম আলপনা চিত্র, দেয়াল চিত্র, পিড়িচিত্র, কুলা চিত্র, ঘটচিত্র, পটচিত্র, মুখোশচিত্র, অঙ্গচিত্র ও পূজায় চিত্র অংকনের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। হাওর অঞ্চলে নানা রকম ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্প রয়েছে। যেখানে নানারকম নিত্যপণ্য তৈরি করা হয়। যেমন-স্বর্ণ ও শঙ্খ শিল্প, অলংকার শিল্প, তাঁত শিল্প , চরকা ও কুটির শিল্প, দারু শিল্প, ঘরবাড়ি শিল্প, পট শিল্প, পাট শিল্প, কাগজ শিল্প, লোহা শিল্প, কাসা শিল্প, নৌ শিল্প, টাংক শিল্প, আগরশিল্প ও আতর শিল্প। হাওর এলাকার সিলেট ও মৌলভিবাজার জেলা মণিপুরী তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। এসব যারা নির্মাণ করতেন তারা কখনো প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ করেননি। এরা স্বশিক্ষিত লোকশিল্পী। এই লোকশিল্পীদের আত্মজ্ঞান, প্রয়োজনবোধ এবং লোকমানসের শিল্পিত অনুভবই সৌন্দর্যসৃষ্টির মৌল নিয়ামক।

আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে মানুষ যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাই বৃত্তি বা পেশা । হাওর অঞ্চলে বহুকাল ধরে নানা ধর্ম-জাতির মানুষ বসবাস করে আসছেন। হাওরাঞ্চল হওয়ায় এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া লোক-পেশাজীবীদের মধ্যে জেলে সম্প্রদায়ের আধিক্যই বেশি। পরিবেশগত কারণেই এক এক অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছে। যেমন- নদী তীরের মানুষেরা কৈবর্ত, ধীবর, দাস, জেলে দাস, বর্মণ ও মল্লবর্মণ প্রভৃতি পেশাভিত্তিক গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। তাছাড়াও তাঁতি, পাটিকার, কুলু, গাছি, গাইন, লিপিকার, ঝালাইকার, শব্দকর, বারই, গোয়ালা, শালকর, নাকার্চি, মোদক, কুলু, মাঝি, নাপিত, মিস্ত্রি, কুমারসহ, প্রভৃতি পেশারও মানুষ এ অঞ্চলে পাওয়া যায়। এসকল ভিত্তিক গ্রুপের মানুষদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র রয়েছে। তারা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করে আসছে। অদ্যাবধি যারা বংশানুক্রমিক পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন; তাদের মধ্যে নরসুন্দর, চর্মকার, বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক, কাঠ ও বেতশিল্পী অন্যতম। তবে স্বর্ণ এবং লৌহ শিল্পেও অনেকেই বংশগতভাবে কাজ করছেন।

একটি সমাজের সমাজ মানস প্রতিফলিত হয় তার লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও জাদুবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক লোকাচার-লোকবিশ্বাস জাদুবিশ্বাস প্রভৃতি রয়েছে। হাওর অঞ্চলে সাধারন মানুষের যাপিত জীবনের ভেতরে কিংবা বিভিন্ন সামাজিক-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নানা রকমের

রীতিনীতির প্রচলন দেখি। এসবই লোকাচার। “হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের ধর্মীয়-সামাজিক রীতিনীতিসহ জীবন-জীবীকার সাথে সম্পর্কিত নান পার্বণে এসব আচার অনুষ্ঠান লালন করে আসছেন।”[১৪] বিয়ে-শাদিতে কিংবা খতনায় বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। নতুন বউকে স্বামীর বাড়িতে ধান-দূর্বা-ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। অনেক সময় নতুন বউয়ের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করতে ঘরের দরজার সামনে মাটিতে পয়সা/কয়েন মাটির নিচে লুকিয়ে বউকে খুঁজে বের করতে বলা হয়। অপরদিকে নতুন জামাই বিয়ে করতে গেলে গেট ধরে সম্মানি নিয়ে থাকে। এই পর্বে নতুন জামাইকে দই খেতে হয়। তবে কয়েকটি গ্লাসে চুনের পানি থাকে। একটি মাত্র গ্লাসে প্রকৃত দই থাকে। নতুন জামাইকে বেশ ধাঁধায় ফেলা হয় এবং উপস্থিত সকলে এমন খেলায় খুব মজা পায়। বিয়ে-শাদিতে বর-কনের মেহেদী অনুষ্ঠানে মেয়েলি গীতের প্রচলন রয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, যেমন-মিলাদ, ওয়াজ মাহফিলে কিংবা আশুরাতে নানা তবারক হিসেবে শিরনি, খিচুড়ি কিংবা মিষ্টান্নের আয়োজন করা হয়। শীতকালে হাওরাঞ্চলে বাউল গানের আসর, পীর-ফকিরের মাজারে ওরশ, ওয়াজ-মাহফিল প্রভৃতি এবং সীমিতভাবে যাত্রাপালার জমজমাট পরিবেশনা দেখা যায়। হাওরাঞ্চলে প্রচলিত ব্রতাচারসমূহের মধ্যে রয়েছে- চড়ক পূজা, কল্কী নারায়ণের পূজা, শনি দেবের পূজা, শ্রী মনসা দেবীর পূজা, বাঘাই ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, সন্তোষী মায়ের ব্রত, সূর্যব্রত, মঙ্গল চন্ডী ব্রত, ঝটপট ব্রত, গোরক্ষনাথের ব্রত, গঙ্গার ব্রতসহ প্রভৃতি। লোকায়ত জীবনধারায় এমন আরও বিভিন্ন লোকাচার আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি।

হাওরাঞ্চলে লোকায়ত সমাজ মানসে অদ্ভুত কিছু ‘লোকবিশ্বাস’ রয়েছে। এসব ‘লোকবিশ্বাস’ বংশ পরম্পরায় প্রবহমান রয়েছে লোকজীবনে। এসব বিশ্বাসকে কেউ কেউ সংস্কার বা কুসংস্কার রূপেও অভিহিত করে থাকেন। তেঁতুল গাছে, শেওড়া গাছে, বয়স্ক শিমুল গাছে, পুরাতন বটবৃক্ষে ভূত বা জিন থাকে বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। ডিম বা কলা খেয়ে পরীক্ষা দিলে ফলাফল বিপর্যয় ঘটে বলে জনমনে লোকবিশ্বাস রয়েছে। ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ওষ্ঠা (পা বাধাপ্রাপ্ত হলে) খেলে কিংবা পেছন থেকে কেউ ডাক দিলে যাত্রা অনিরাপদ হয় বলে গভীর লোকবিশ্বাস রয়েছে। ছেলেদের বুকে লোম থাকলে এই ছেলে খুবই ভাগ্যবান হয় বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। রাত্রিকালে ঘরে মাছ নিয়ে এলে ঘরে ভূত-প্রেতের আগমন ঘটতে পারেও বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। পৃথিবীর সব দেশে বা সমাজেই কম-বেশি কিছু লৌকিক আচার বা প্রথা স্মরণাতীতকাল থেকেই চলে আসছে। পাশাপাশি রয়েছে বহু বিচিত্র বোধ, বিশ্বাস। প্রচলিত সেসব লোকাচারের অনেকগুলিরই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বা এগুলো নিছক বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ মানস মজুমদারের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য-

> “পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই নানা ধরনের বিশ্বাস সংস্কার প্রচলিত। লোকসমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় এগুলির উদ্ভব। লোকসমাজকে এগুলো নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বাস সংস্কারের অবস্থান খুব কাছাকাছি।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্যও বিদ্যমান। বিশ্বাস হলো মানসিক ব্যাপার, একটি ধারণা, আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যখন কিছু করি তখনই তা সংস্কারে পরিণত হয়। বিশ্বাস সংস্কারগুলির উদ্ভবমূলে রয়েছে ভয় আর শঙ্কা।"[১৫]

হাওর অঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের লোকজ এসব সামাজিক প্রথার যেমন রয়েছে প্রচুর মিল, তেমনি অনেকগুলোর রয়েছে একান্তই নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেগুলো তাদের সুখ-দুঃখের সাথী, আনন্দ-বেদনার সহযাত্রী হয়ে রয়েছে।

লোকচিকিৎসা গ্রামবাংলার মানুষের প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি। আধি-ব্যাধি, রোগ-শোক এবং দৈহিক-মানসিক রোগে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের অবলম্বন লোক-চিকিৎসা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও প্রান্তিক মানুষজন এখনো লোক-চিকিৎসার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গ্রামবাংলার জনজীবনধারায় তন্ত্রমন্ত্র এবং লোকচিকিৎসার মূলে রয়েছে কুসংস্কার ও লৌকিক-আলৌকিক বিশ্বাস। এ চিকিৎসায় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হতো লতাগুল্ম আর তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তাবিজ, কবজ আর ঝাড়-ফুঁক। এ ধরনের চিকিৎসায় যারা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তারা হলেন-কবিরাজ, ফকির, পীর দরবেশ সাপুড়ে বা ওঝা, বৈদ্য, দাই, বৈদ্য,হাকিম, পুরাহিত ও গুনীন উল্লেখযোগ্য। হাওর অঞ্চলে যেসব লোকছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো কোথাও মন্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- তন্ত্র, মন্ত্র, যাদু-টোনা, শিঙ্গা লাগানো, হাঁড়ভাঙ্গা, ঝাড়ফুক, তেলপড়া, পানিপড়া ও কড়িপড়া ইত্যাদি কাজে মন্ত্রপাঠের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। হাওরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদ, মন্দির, দরগা, ভিটা, পীরবাড়ি, মুন্সীবাড়ি, বৈদ্যবাড়ি ও কবিরাজ বাড়ি নামে লোকচিকিৎসার উল্লেখযোগ্য স্থান বা এলাকা রয়েছে।

বাংলাদেশের লোকায়ত ঐতিহ্যে বৈচিত্রপূর্ণ লোক-উৎসব রয়েছে। পহেলা বৈশাখ, গ্রাম্যমেলা, বিবাহ উৎসব, ঈদ উৎসব প্রভৃতি বাংলাদেশের সাধারণ লোক-উৎসব। এছাড়া অঞ্চলভেদে আরও কিছু ভিন্ন লোকউৎসব রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। হাওরাঞ্চলেও রয়েছে আলাদা কিছু লোক-উৎসব যা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হাওরাঞ্চলের লোকউৎসবের মধ্যে গরুর দৌড়, নৌকাবাইচ, পীর-ফকিরের ওরশ উৎসব, গ্রামীণ মেলা, দুর্গা উৎসব, নবান্ন উৎসব, ভেলাভাসান উৎসব প্রভৃতি উৎসব তার আপন আভায় উদ্ভাসিত। মূলত ভেলাবাসন উৎসবটি নদ-নদী ও হাওর-বাওড় অঞ্চলে জেলের সবরকম অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পালিত হয়। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খোয়াজ-খিজিরের উদ্দেশ্যে উৎসবটি নিবেদিত হয়। হাওর অঞ্চলের লোকজীবনে এর প্রভাব এত গভীর যে, স্থানীয় লোকাচার এবং লৌকিক সংস্কারকে ভর করে এটা এখনও এ অঞ্চলে টিকে আছে। এ উৎসবে এক নিঃশ্বাসে কলা গাছ কেটে ভেলা বানানো হয় এবং তাতে নানা রকমের সিরনি সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। হাওরাঞ্চলের মানুষ প্রতিটি উৎসবে যোগ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের স্ফূর্তি লাভ করে।

লোকসাহিত্যের সবচেয়ে প্রজ্ঞাময় শাখা হচ্ছে প্রবাদ-প্রবচন। আবহমানকাল ধরে লোকসমাজে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার সমন্বয়ে জীবন ও জগতের বাস্তবতার সৃষ্টিশীল সূত্র হয়ে ওঠে এই লোকপ্রবাদ। শুধু অভিজ্ঞতার বিষয়ই নয়, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ জীবনদর্শনও থাকে প্রবাদ-প্রবচনে। হাওরাঞ্চলের লোকপ্রবাদে এই অঞ্চলের লোকায়ত জীবন, ধর্মনীতি, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পারিবারিক জীবনের নানা বিষয়ে, কৃষি, মানব সম্পর্ক প্রভৃতির বিষয়ের বৈচিত্রময় প্রতিফলন লক্ষ করি। "প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং মূলতঃ বুদ্ধিপ্রধান রচনা। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম।"[১৬] এগুলো কোনো দেশ বা কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সার্বজনীনভাবে মানবসমাজে এগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, হাওরের কোনো কোনো অঞ্চলে মানুষ লোকপ্রবাদকে অনেক সময় 'ডাকের কথা' বলেও অভিহিত করে। যদিও 'ডাক ও খনার বচন' বলে স্বতন্ত্র বিষয় রয়েছে।

১. স্বভাব যায় না মইলে, ইজ্জত যায় না ধইলে।
২. মা নাই ঘরে যার, সংসার অরণ্য তার।
৩. দুই দিনের যুগী ভাতেরে ক অন্ন।
৪. গাঙ্গের পানি ঘোলা ভালো জানের মেয়ে কালাও ভালো।
৫. গরিবের বউ হগলতের বাউজ।
৬. আল্লাহ যারে দেয়, ছাপ্পর পাইরা দে
৭. ভাটি দ্যাশের বাড়ি
উজান দ্যাশের নারী
হাওরে চড়া গাই
এই তিনে বিশ্বাস নাই

গ্রীক পুরাণ ও ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ধাঁধার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হওয়ায় একথা অনুমানযোগ্য যে, ধাঁধা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম অংশ। "ধাঁধার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধাঁধা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত।"[১৭] হাওরপাড়ের সংস্কৃতিতে বিশাল একটি জায়গা দখল করে আছে ধাঁধা। আমরা এই ধাঁধাগুলো পাঠ করলে জানতে পারবো হাওরপাড়ের মানুষের সরলতা, আনন্দ-বেদনা এবং উৎসবগাঁথা। হাওরপাড়ের লোকসমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উৎসবাদিতে কিংবা লোকজন অলস সময়ে ধাঁধার আসর জমাতো। এগুলোর মধ্যে সাহিত্যরস যেমন রয়েছে, তেমনি এতে বুদ্ধির দীপ্তিও পরিলক্ষিত হয়। হাওর অঞ্চলে প্রচলিত কিছু ধাঁধা/শিলক/হেয়াঁলি নিম্নরূপ:

১. আন্ধার ঘরে বান্দর নাচে, না করলে আরও নাচে। (জিহ্বা)
২. ঘর আছে দুয়ার নাই, মানুষ আছে শব্দ নাই। (কবর)
৩. এক থাল সুপারি, গুনতে পারে কোন বেপারী? (তারা)
৪. গলা আছে তলা নাই, পেড আছে উজুরি নাই। (পলো)

৫. ঘরের ভিতর ঘর, হাত বাড়িয়া ধর। (মশারি)

৬. তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে, মইধ্যের অক্ষর বাদ দিলে আকাশে উড়াল মারে। (চিল)

৭. দিতে গেলে কষাকষি, দিয়া সারলে মন খুশি। (কাচের চুড়ি)

৮. কোন শাড়ি শাড়ি না? (মশারি)

ভৌগলিকভাবে ভাটি বা হাওর এলাকা বলে বিবেচিত হলেও হাওর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একটি জনপদ। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় এ-জনপদের নান্দনিক লোকজসংস্কৃতিগুলো বাংলাদেশের অন্য জনপদের চেয়ে ভিন্নরূপ হওয়ায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সাজ-সজ্জা, উৎসব, লোকজ কৃষ্টি, খাবার-দাবারের বিষয় ও সাহিত্য এখানকার ঐতিহ্যের সূচক ও শেকড়ের উৎস। হাওর অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ লড়াকু, উদার, সহজ-সরল ও চিরাচরিত জীবন প্রণালীতে বিশ্বাসী। বর্তমানে বিশ্বায়নের বিনাশী স্রোতও হাওর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে আঘাত হেনেছে। বিশ্বায়নজনিত কারণে কিছুটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হলেও সমাজের সংস্কৃতির মূল কাঠামোতে আঘাত করতে পারেনি। এ-অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অবিচল দরদ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। তাইতো হাওর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি পুরো বংলাদেশের সংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সম্পৃক্ত।

তথ্যসূত্র:

১. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার, বাংলাদেশের হাওর, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১৩

২. ওয়াকিল আহমদ, লোকসংস্কৃতি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. XIII

৩. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা প্রবন্ধাবলি, আগস্ট ২০০৫, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২৫৬

৪. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৯-১০

৫. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০০

৬. দুলাল চৌধুরী, বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, লোকায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৭৭

৭. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা প্রবন্ধাবলি, আগস্ট ২০০৫, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ১২

৮. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৬৩

৯. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২১২
১০. অলোককুমার ব্যানার্জী, লোকক্রীড়া বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পাদনা-বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৮৩
১১. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৫
১২. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মৌলভীবাজার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৮৯
১৩. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা নেত্রকোনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৩৩
১৪. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সুনামগঞ্জ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২২৩
১৫. মানস মজুমদার, লোকসাহিত্য পাঠ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬১
১৬. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা, বইপত্র, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭
১৭. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা মৌলভীবাজার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২২৫।

'ভূম' রাজ্যে বর্গী হানা : বিপদ ও বিপর্যয়

শোভন ঘোষাল
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার : অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় এক বিপর্যয়কারী ঘটনা ছিল মারাঠা বর্গীদের হানাদারী। মুর্শিদাবাদ বা কলকাতার মত মূলকেন্দ্র ছাড়াও দক্ষিন-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্যগুলি বর্গী আক্রমনের শিকার হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের উপজাতি অধ্যুষিত অরন্যময় রাঢ়বঙ্গে একাধিক আঞ্চলিক ভূমরাজ্যের উৎপত্তি ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল মল্লভূম বা বনবিষ্ণুপুর। মারাঠা বর্গীদের আক্রমনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল এই রাজ্য। এই আক্রমন ও লুণ্ঠন শুধুমাত্র সম্পদহানিই ঘটায়নি, ভূম রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনে। মল্লভূমের মত গুরুত্বপুর্ন রাজ্য অবক্ষয়ের চাকায় পিষ্ট হয়েছিল। সর্বোপরি এই অঞ্চলের কৃষক ও নিম্নবর্গিয় মানুষদের জীবনের নেমে এসেছিল অশেষ দুর্গতি।
সূচকশব্দ : ভূম, রাঢ়ভূমি, বর্গী, মহারাষ্ট্র পুরাণ, মল্লভূম, পঞ্চকোট।

বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং ঝাড়খন্ড ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ এলাকার অঞ্চলগুলি মূলত একই ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। এই অঞ্চল পশ্চিমরাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের পূর্ব থেকেই পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে একাধিক ভূম রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। 'ভূম' কথাটির অর্থ ভূমি, স্থানীয় রাজাদের অধিকৃত ভূমি থেকেই ভুম-রাজ্যটির রাজ্যগুলির উৎপত্তি। পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে তেমনি আঠারোটি ভূম রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সংখ্যাটি যদিও সর্বজন বিদিত নয়। স্থানীয় সামন্ত শাসকরা নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে এই রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ভূম রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল, বীরভূম, সেনভূম, গোপভূম, শূরভূম, ভাওয়ালভূম, মল্লভূম, সামন্তভূম, তুঙ্গভূম, শিখরভূম, আদিতভূম, মানভূম, বরাভূম, নাগভূম, ধলভূম, সিংভূম, ব্রাহ্মণভূম, বাগভূম, ভঞ্জভূম।[১] এছাড়াও ছিল ধবলভূম ও ঝাড়গ্রাম শিলদা অঞ্চলে পৃথক একটি মল্লভূম রাজ্যের অবস্থান রয়েছে, যা বিষ্ণুপুরকেন্দ্রিক মল্লভূম থেকে পৃথক। বর্তমান বাঁকুড়ার সুপুর-অম্বিকানগর অঞ্চল নিয়ে গঠিত পরগনা ছিল ধবলভূম। আর ঘাটশিলা, চাকুলিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের ভূম রাজ্য ছিল ধলভূম। সাধারণত স্থানীয় রাজার নামের পদবী বা বংশ পরিচয় থেকেই এই নামগুলির উৎপত্তি। সাধারণত বাংলায় সেন শাসনের অবসান ও বর্তমান বাঁকুড়ায় শূর শাসনের প্রভাব শেষ হবার পরই অরণ্যাবৃত এই অঞ্চলগুলিতে ভূম রাজ্যগুলির উদ্ভব ঘটেছিল।

তবে কিছু লিপিমালার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনেক পন্ডিত ভূম রাজ্যগুলির উৎপত্তি পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বলে মত রেখেছেন।[২]

ভূম রাজ্যগুলির মধ্যে সব সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং আলোচিত রাজ্য ছিল মল্লভূম, যা বর্তমান বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, গঙ্গাজলঘাটি, জয়পুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের ও বাঁকুড়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। মল্ল রাজাদের কীর্তিকলাপের ফলে রাজধানী বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছিল একটি স্বতন্ত্র শক্তিশালী রাজ্য। বর্তমান ছাতনা,বাঁকুড়া ও শালতোড়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল সামন্তভূম। বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলের দুটি ভূম রাজ্য, বর্তমান খাতড়া, হীড়বাঁধ, ইন্দপুর, রানীবাঁধ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ধবলভূম এবং রাইপুর, সিমলাপাল, তালডাংরা অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল তুঙ্গভূম। বর্তমান বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া, শালতোড়া এবং কাশীপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল শিখরভূম। অষ্টাদশ শতকে মারাঠা বর্গীদের হানাদারী ও লুন্ঠন এই সব অঞ্চলে আর্থসামাজিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর লুটতরাজপ্রিয় অশ্বারোহী মারাঠা সৈন্যদলের নাম ছিল 'বর্গী' বা 'পাগার'। এরা ছিল মারাঠা রাজ্যের স্থায়ী সেনাবাহিনী। এই মারাঠা সেনারা 'চৌথ' আদায়ের জন্য বাংলায় এসে লুটপাট ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে ও নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার ও হত্যা করে তাদের ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। এইসব লুটেরাদেরকেই বাংলার মানুষজন বর্গী বলে ডাকতো। মারাঠি এই সেনারা অভিযানে যাওয়ার সময় কেবলমাত্র একটি সাত হাত লম্বা কম্বল ও বর্শা নিয়ে বের হত। এই বর্শাকে মারাঠি ভাষায় বলা হত 'বরচি'। এই নাম থেকেই 'বারগির' বা 'বর্গি' নামে পরিচিত হয়। 'বর্গী' শব্দটি তাই মারাঠি 'বারগির' শব্দের অপভ্রংশ। বারগির বলতে মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থায়ী অশ্বারোহীদের বোঝাত।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দী খাঁ উড়িষ্যা সহ বাংলা সুবার নবাব হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে মারাঠা বর্গীরা বাংলা জুড়ে দারুন বিভীষিকা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মারাঠারা বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'চৌথ'[৩] আদায়ের অধিকার কে কার্যকর করা। সমকালীন লেখক গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে।।
রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান চলে সত সত
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন।।
সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
একরাত্রি রইলা সেইখানে।

রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে।।
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা তরিত।[৪]

১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে বাংলায় মারাঠাদের এই আক্রমণ সূচিত হয়। বর্ধমানের কোন এক স্থানে মারাঠাদের সঙ্গে বাংলার নবাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভাস্কর পন্ডিত এই যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে পাঞ্চেতের দিকে চলে যেতে বাধ্য হন। দীর্ঘ নয় বছর আলীবর্দির আমলে বারংবার মারাঠা আক্রমণ চলেছিল এবং এই আক্রমণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল বর্তমান বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর। ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা আক্রমণ সম্পর্কে কলকাতা কাউন্সিলের লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায় মারাঠারা নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেতের ঘন অরণ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। পরে ভাস্কর পন্ডিত পাঞ্চেতের থেকে বেরিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন এবং চন্দ্রকোনার পথ দিয়ে তিনি মেদিনীপুরে উপনীত হন। মেদিনীপুরের নারায়নগড়ে শিবির স্থাপন করে তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ ও লুন্ঠন করেন। গোলাম হোসেন সালিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' (১৭৮৮) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় মারাঠা বর্গীরা অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।[৫] 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীদের বিষ্ণুপুর আক্রমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

চতুর্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা।।
তবে বোনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
য়সাদ্য বরগির তবে কি করিতে পারে।।[৬]

১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবর্দির সাথে মারাঠা নেতা রঘুজী ভোঁসলের সাথে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে উড়িষ্যায় রঘুজী ভোঁসলে প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। মেদিনীপুরের কিছু অংশও তার অন্তর্গত ছিল। এছাড়া বাংলা থেকে নবাব বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা 'চৌথ' হিসাবে রঘুজীকে প্রদান করে ভবিষ্যতে বাংলা অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। যদিও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। মারাঠা বাহিনী তথা বর্গীরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মেদিনীপুর ও বর্ধমানের সন্নিকট অঞ্চলে আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণের সময় নেতা ছিলেন শিউভট্ট। তিনি সাময়িকভাবে মেদিনীপুরের একাংশের শাসক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে ক্ষীরপাই বিষ্ণুপুর ও বর্তমানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।[৭]

বর্গীরা বিষ্ণুপুরের জঙ্গলময় অঞ্চলকে তাদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল এবং সেখান থেকেই রাঢ়বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও একাধিকবার আক্রমণ শুরু করে।

সমকালীন রচনা থেকে জানা যায় যে শিখরভূম, সামন্তভূম, তুঙ্গভূম, বরাভূম প্রভৃতি অঞ্চলের এই মারাঠা আক্রমণ বারংবার চলেছিল এবং মারাঠাদের ভয়ে সেখানকার শাসকরা রাজ্যপাট ছেড়ে অনেক শাসক বিভিন্ন বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত ধারাপাঠ, রামসাগর, পাইকপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ও বর্গীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলেছিল।[৮] মল্লভূমে প্রথমবার মারাঠা আক্রমণের সময় শাসক ছিলেন শ্রী গোপাল সিংহ, তিনি মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হননি। কথিত আছে যে মারাঠারা যখন মল্লভূমে উপস্থিত হয়েছিল তখন তার মন্ত্রী শুভঙ্কর[৯] রাজাকে সেই বার্তা দেন। গোপাল সিংহ অবশ্য আক্রমন রোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে তিনি নগর দেবতা মদনমোহনের কাছে আর্জি জানান বিষ্ণুপুর শহরকে রক্ষা করার জন্য এবং নগরবাসীকে হরিনাম জপ করার নির্দেশ দেন।[১০] আজও বিষ্ণুপুরে এই প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে, মারাঠারা রাত্রে বিষ্ণুপুর শহর আক্রমণ করবার ফলে অসহায় বিষ্ণুপুর রাজ গোপাল সিংহ ও সেখানকার নগরবাসীকে রক্ষা করবার জন্য নগরদেবতা স্বয়ং মদনমোহন 'দলমাদল' নামক সুবৃহৎ কামানের সাহায্যে শত্রুদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। যদিও ইতিহাসসম্মত কারন হল, সেই সময়কার বিষ্ণুপুর শহরটি গড় ও প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত থাকার কারনে রাত্রে মারাঠারা ওই নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি, এবং পরের দিন সেখানে সসৈন্যে আলিবর্দীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁরা অতিদ্রুত বিষ্ণুপুর শহর পরিত্যাগ করে মেদিনীপুরের উদ্যেশ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অপর একটি মতে গোপাল সিংহের মন্ত্রী শুভঙ্কর মল্ল রাজধানীতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। রতন কবিরাজ "মদনমোহন বন্দনা"য় লিখেছেন,

আইলেন ভাস্কর খবর কহে শুভঙ্কর,
তিন লক্ষ ঘোড়া সঙ্গে কর্যা...[১১]

বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ মারাঠাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের কোন পরিকল্পনা না করলেও সম্ভবত মল্লভূম অঞ্চলে মারাঠা হানাদাররা গণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। এই কারণেই বিষ্ণুপুর দুর্গ এবং বিষ্ণুপুর মূল শহরে মারাঠারা হানাদারী চালায়নি। গবেষক প্রভাত কুমার সাহা উল্লেখ করেছেন হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে দেবতা মদনমোহন কে আহ্বানের এই গল্পকথা প্রকৃতপক্ষে এক গণ প্রতিরোধেরই ইঙ্গিত দেয়।[১২]

প্রথম মারাঠা আক্রমণের অভিঘাত শুকনোর আগেই মারাঠারা পুনরায় দক্ষিন-পশ্চিমবঙ্গে হানাদারি চালিয়েছিল। রাঢ়বঙ্গে দ্বিতীয়বার বর্গী হানা ঘটেছিল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা নেতা শিউভট্টের নেতৃত্বে। মারাঠা দলপতি শিউভট্টের নেতৃত্বে মেদিনীপুরে খুসল সিংকে পরাজিত করে মল্লভূমে হাজির হন।[১৩] নবাব ও ইংরেজদের যৌথবাহিনী এই মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যোগী হয়। সেই সময় মল্লভূমের রাজা ছিলেন শ্রী চৈতন্য সিংহ। চৈতন্য সিংহের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানপ্রিয়তা ও দুর্বলতার সুযোগে তার মন্ত্রী কমল বিশ্বাস রাজকীয় ক্ষমতা গ্রাস করেছিলেন। মারাঠা

আক্রমণের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে চৈতন্য সিংহের সম্পর্কিত ভাই দামোদর সিংহ নবাবী বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বিষ্ণুপুর দুর্গ অধিকার করেছিলেন। কথিত আছে দামোদর সিংহ মারাঠাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সিংহাসন লাভের মোহে। চৈতন্য সিংহ এরপর রাজ্যহারা হয়ে তার গৃহদেবতা মদনমোহনের বিগ্রহকে নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে শেষ অবধি কলকাতায় বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে গচ্ছিত রাখেন।[১৪]

১৭৪২ থেকে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ সময়ে মারাঠারা সমগ্র বঙ্গ জুড়ে বিশেষত রাঢ়বঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং তার সঙ্গে চলেছিল ভয়াবহ লুণ্ঠন। মারাঠারা শুধুমাত্র বিষ্ণুপুরেই আক্রমণ করে ক্ষান্ত হয়নি, মল্লভূম আক্রমণের এই অভিঘাত সামন্তভূম, ধবলভুম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও অনুভূত হয়েছিল। শিখরভূমের অন্তর্গত মেজিয়ার কাছাকাছি একটি অঞ্চলটি এখনো "বর্গির সড়ান" বা বর্গীদের যাতায়াতের রাস্তা নামে পরিচিত আছে। বিষ্ণুপুর শহরের উপকণ্ঠেও এখনো একটি এলাকা পরিচিত রয়েছে 'মারাঠা ডাঙ্গা' নামে। সম্ভবত এই অঞ্চলে মারাঠারা তাদের শিবির স্থাপন করেছিল। পঞ্চকোট রাজার অধীনে শালতোড়া থানার পাবয়া ও সম্মিলিত গ্রামের জমিদাররা বাগদী সম্প্রদায়ের যুবকদের নিয়ে বর্গী বিরোধী বাহিনী তৈরি করে তুলেছিলেন। সম্ভবত এই পথ দিয়েই বর্গীদের আগমন মল্লভূমে আক্রমণ ঘটেছিল। সামন্তভূমের অন্তর্গত ছাতনা অঞ্চলেও বর্গীদের হানা ঘটেছিল। এই অঞ্চলে দেশমুখ পদবিধারীরা জমিজমা লাভ করে বিভিন্ন গ্রামে থেকে গিয়েছিল। সম্ভবত এরা ছিলেন মারাঠা পরিবার জাত। ইন্দাসের বেতালন গ্রামে স্বরূপনারায়ণ মন্দিরের নির্মাতা ও পূজারী চক্রবর্তী পরিবার 'বর্গী ভুলানো বামুন' নামে পরিচিত। সম্ভবত মারাঠা আক্রমণের সময় এই পরিবার কৌশলে মারাঠা বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে গ্রামকে রক্ষা করেছিলেন।[১৫]

তুঙ্গভূমের অন্তর্গত ইদপুরের ব্রজরাজপুর গ্রামে বর্গী হাঙ্গামা নিয়ে গোবিন্দদাস 'শ্রী শ্রী শ্যামলীলামৃত' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যে উল্লেখ রয়েছে,

এগার তেষট্টি সনে বৈশাখের অপরাহ্নে
শুক্ল পক্ষে তৃতীয়ার দিনে
একদল বর্গি এসে অত্যাচার কৈল যবে
এই ব্রজরাজপুর গ্রামে।[১৬]

অর্থাৎ ব্রজরাজপুর অঞ্চলে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে বর্গী আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। এই সনটি নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, কারণ ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ মারাঠা নেতা রঘুজী ভোঁসলের মধ্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর দীর্ঘদিন বাংলায় মারাঠি আক্রমণ হয়নি। তবে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শিউভট্টের নেতৃত্বে মারাঠারা পুনরায় মল্লভূম আক্রমণ করেছিল। তাই সম্ভবত ব্রজরাজপুরে মারাঠা আক্রমণ ঘটেছিল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়।

মহারাষ্ট্র থেকে বর্গীরা বাংলায় প্রবেশ করেছিল ঝাড়খণ্ডের পর্বতসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়ে। বর্গীরা নাগপুর থেকে ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য পথ দিয়ে পঞ্চকোটের

মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছিল। বর্গী হামলার সময় পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন শত্রুঘ্ন শেখর (১৭১৫-১৭৫০)। অবশ্য পঞ্চকোট রাজ্যে বর্গী হামলা হয়েছিল কিনা এবং রাজ্যের জনগণের উপর কোন অত্যাচার হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য নীরব। 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'এ পঞ্চকোটে বর্গীদের আসার সংবাদ দেওয়া হলেও সেখানেকার রাজ্য আক্রমণ এবং রাজ্যের জনগণের উপর কোন অত্যাচারের বর্ণনা নেই।[১৭]

উইলিয়াম হান্টার[১৮] উল্লেখ করেছেন যে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের সীমান্ত অঞ্চলে মারাঠা আক্রমণের চাপ ছিল সর্বাধিক। বর্গী আক্রমন দক্ষিন-পশ্চিমবঙ্গের ভূম রাজ্যগুলির রাজশক্তি দুর্বল করে দিয়েছিল সে বিষয়ে কন সন্দেহ নেই। মল্লরাজ শক্তির অবক্ষয়ের যুগে মারাঠা আক্রমণ মল্লভূমকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করে। মারাঠা আক্রমণের প্রভাব ছিল ভয়াবহ শুধুমাত্র প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয় সাধন নয়, এই আক্রমন মল্লভূমের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। শিল্প,কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলার বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বহু স্থান জনবিরল হয়ে পড়ে। মারাঠাদের নিষ্ঠুরতা অবাধ লুণ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী গ্রাম শহরের মানুষদের মনে ত্রাস প্রকৃতির সঞ্চার করেছিল। বাংলার লোকছড়ায় এই ভয়াবহতার ছবি চিত্রিত হয়েছে,

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে?
ধান ফুরালো পান পুরালো খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।[১৯]

বাংলায় মারাঠা আক্রমণের প্রভাবে সমৃদ্ধশালী মল্লরাজবংশ একটি ক্ষুদ্র জমিদারিতে পরিণত হয়েছিল। ১৭৪০-র দশকে কলকাতা সহ মেদিনীপুর,মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া অঞ্চলে অর্থাৎ রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে বর্গীর হাঙ্গামা ঘটেছিল তাকে গঙ্গারাম তার 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'এ দৈব শাস্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই হানা ছিল এই অঞ্চলের ব্যাপক নৈতিক অধঃপতনের পরিণতি। এজন্যই বর্গী হামলার মত নিদারুণ দুর্বিপাক রাঢ়বঙ্গে নেমে এসেছে।[২০] মল্লভূম তথা রাঢ়বঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চলের ঘাট পাহারা তথা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল ঘাটওয়ালদের হাতে। এই ব্যবস্থা ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল। ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মল্লভূম অঞ্চলে মারাঠাদের আক্রমণ শুরু হলে এই ঘাটোয়ালি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে, এমনকি ঘাটোয়ালরা অনেকেই মারাঠাদের সঙ্গে গ্রাম লুণ্ঠনে যুক্ত হয়ে যায় বলেও জানা যায়। ঘাটোয়ালরা বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। মারাঠা আক্রমণ তাই ভূম অঞ্চলগুলিতে ঘাটোয়ালি ব্যবস্থার অবসানেরও সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।[২১]

গ্রামে-গঞ্জে শহরে অবাধ লুণ্ঠন ও অমানবিক অত্যাচার প্রজাদের দেশত্যাগী করে তুলেছিল সেই বর্ণনা মেলে সমকালীন উপাদানে। একাধারে মল্লভূমির রাজস্বের পরিমাণ ক্রমহারে বৃদ্ধি ও অন্যদিকে মারাঠা আক্রমন, উভয়ের মিলিত প্রভাবে সমগ্র

পশ্চিমরাঢ়ে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে এই অঞ্চলের বহু কৃষক এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং কৃষি জমি পতিত হয়ে থাকে। এই চিত্রটি উঠে আসে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এর বর্ণনায়,

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথীর ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লাইয়া।।
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।।
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি।।
সঙ্ক বণিক পলাএ করা লইয়া যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত।।
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রাম ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পালাইল।।[২২]

রাঢ়বঙ্গে তথা মল্লভূমে বর্গীদের অভিযানের অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল সেই অঞ্চলের রেশম শিল্পের উপর আঘাত। বর্গীদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে ফলে গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ায় কৃষিকাজ ও রেশম চাষের উপর প্রভাব পড়ে। এই অঞ্চলের রেশমচাষ বর্গী আক্রমণের প্রকোপে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বর্গীরা রেশম উৎপাদনের গাছগুলিকে ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।[২৩] মল্লভূমের কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল রামসাগর, পাইকপাড়া, সোনামুখী প্রভৃতি স্থানগুলি বর্গীদের আক্রমণে প্রায় শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। মেজিয়া, ছাতনা, রামচন্দ্রপুর, জয়পুরও বর্গীদের প্রভাবে গ্রাম শূন্য হয়ে পড়ে। ব্যাপকহারে মানুষের উৎখাত ও রায়তদের গঙ্গার পূর্ব পাড়ে পলায়ন ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে কৃষক উৎখাতের প্রথম নিদর্শন। কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার এই প্রবণতা মারাঠা আক্রমণের অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল ছিল।

সূত্র নির্দেশঃ

১। P.Acharya, A Note on the 'Bhum' Countries in Eastern India, IC, No.2, Vol.XII, Oct-Dec., 1945,p.38.

২। ড. তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী, *ব্রিটিশ শাসনের আদিপর্ব ও মল্লভূমির গ্রামীণ অর্থনীতি*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, পৃ.২২

৩। চৌথ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে মারাঠা সাম্রাজ্য কর্তৃক আঠারো শতকের গোড়ার দিকে আরোপিত একটি নিয়মিত কর। এটি একটি বার্ষিক কর ছিল যা

নামমাত্র মুঘল শাসনের অধীনে থাকা জমিগুলির উপর রাজস্ব বা পণ্যের উপর নামমাত্র ২৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছিল।

৪। *কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ*, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, সন ১৩১৩, পৃ. ২১৪-১৫

৫। ড. তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী, প্রাগুক্ত; পৃ.৩০

৬। *কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ*, প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৫

৭। ড. তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী, প্রাগুক্ত; পৃ.৩২

৮। প্রভাত কুমার সাহা, *শেষ মধ্যযুগে বাঁকুড়া জেলার রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাস*, টেরাকোটা, বিষ্ণুপুর,২০২২, পৃ.৩২

৯। গবেষক মানিক লাল সিংহ তার "পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন শুভঙ্করের প্রকৃত নাম জগন্নাথ দাস। তবে শুভঙ্কর নামে একাধিক অস্তিত্ব জানা যায়। শুভঙ্কর ছিলেন পাত্রসায়ের থানার রামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিত বিশারদ ও বাস্তুকার। শুভঙ্করের গাণিতিক নিয়মাবলী "শুভঙ্করী আর্য্যা" নামে পরিচিত।

১০। প্রভাত কুমার সাহা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৩

১১। সুদীপ্ত পোড়েল, *রাজবৃত্তে রাঢ়ের প্রজা জীবন*, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২৪, পৃ.২৮০

১২। প্রভাত কুমার সাহা, প্রাগুক্ত; পৃ.৩৯

১৩। সুদীপ্ত পোড়েল,প্রাগুক্ত; পৃ.২৬২

১৪। ড. তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী, প্রাগুক্ত; পৃ.৩২

১৫। সুদীপ্ত পোড়েল, প্রাগুক্ত; পৃ.৪৭০-৪৭১

১৬। *তদেব*; পৃ.৪৭২

১৭। দিলীপ কুমার গোস্বামী, *পঞ্চকোট ও মানভূমের সভ্যতা*, বজ্রভূমি প্রকাশনী, ২০১৬, পৃ.৭৩

১৮। W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal, Vol. IV, Trubner & Co., London,1876, First Reprinted in India, Delhi, 1973.

১৯। ড. তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১

২০। শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, *বাঁকুড়া-জনের ইতিহাস সংস্কৃতি*, পশ্চিমরাঢ ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র বাঁকুড়া, ২০০০, পৃ.১২০

২১। প্রভাত কুমার সাহা, প্রাগুক্ত; পৃ.১৫০

২২। *কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ*, প্রাগুক্ত;পৃ.।২২২

২৩। সুদীপ্ত পোড়েল, *অতীত বাঁকুড়া সমাজ ও অর্থনীতি*, কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ.২২৫।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বঙ্গসমাজে নারীজীবনের মুক্তিসূর্য শ্রীচৈতন্য ও আধুনিক সমাজের প্রতিচ্ছবি

নম্রতা দত্ত
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারাংশ- সুদূর বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীজাতি বারাবরই অত্যাচারিত, শোষিত। নারী মানেই তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, বাক্-স্বাধীনতাসহ যেকোন প্রকার স্বাধীনতা পুরুষদের অনুমতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক বিধিনিষেধ কিংবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ সদা-সর্বদাই কারণে ও অকারণে নারীজাতির সম্ভ্রম নিয়ে ছেলেখেলা চলে। বাংলার নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এমতাবস্থায় নারীজাতির হিতার্থে যুগে যুগে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রাতঃস্মরণীয়নাম হল শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি একদিকে ভক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজে সাম্যবাদী বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন অন্যদিকে ঘর-সংসারের মধ্যে আটকে পড়া, সমাজের পতিত, নিপীড়িত নারীদের নিকট তিনি মুক্তি সূর্য হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের প্রথমা পত্নী সীতা দেবী, নিত্যানন্দ-এর দ্বিতীয় পত্নী জাহ্নবা, অবধূত সম্প্রদায়ের তমসার নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। তবে সময় এগোলেও নারীর প্রতি সমাজের অবমাননা চিত্র আজও অমলিন। কিন্তু শত মলিনতার মধ্যেও আজ নারীদের মধ্যে নিজেকে মানুষ ভাবার চৈতন্য এসেছে। ফলে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শিখেছে। সেই সাথে নারীদের এই লড়াই-এ পাশে থাকার চৈতন্য বহু পুরুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। সমাজের চৈতন্য দেখা দিয়েছে।

সূচকশব্দ - শ্রীচৈতন্যদেব, দীক্ষা, অবধূত সম্প্রদায়, বারবনিতা, কণ্ঠিবদল।

মূল আলোচনা-

বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগীয় সমাজ ছিল বিভীষিকাময় এক অধ্যায়। ব্রাহ্মণরা নিজেদের ঈশ্বররে প্রতিমূর্তি অজুহাত দেখিয়ে সমাজের অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের উপর তথা জ্ঞান ও ধন-সম্পদের অধিকারী কায়স্থ, বৈ্দ্য ও অত্যাচারিত চতুর্থবর্ণ শুদ্রদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যা তাঁদের স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। যা হিন্দুধর্মের বিপন্নতার কারণ হয়ে ওঠে। এদিকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঘরে-বাইরে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ব্রাহ্মণদের শোষণ, দেবদাসী প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যবনদের অত্যাচার, সম্ভ্রমহানি, পতিতার জীবন সব মিলিয়ে নারীদের জীবন বিষতুল্য করে তোলে। সমাজের এরূপ পরিস্থিতে আবির্ভাব ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের। তাঁর ভক্তিবাদী তথা বৈষ্ণব আন্দোলনের মূল কথা আরাধ্যকে পাওয়ার একমাত্র উপায় অন্তরের নম্রতা, প্রেম, ভক্তি দিয়ে তাঁকে আহ্বান করা। তিনি ভক্তিবাদী আন্দোলনের দ্বারা সমাজে

সাম্যবাদ আনার চেষ্টা করেন। যাইহোক, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদী আন্দোলনের কথা সকলের সুবিদিত এবং সেই বিষয়ে বহু আলোচনা গবেষকদের লেখনীর মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু পঞ্চদশও ষোড়শ শতকের বঙ্গসমাজে নারীজীবনের মুক্তিসূর্য শ্রীচৈতন্য ও আধুনিক সমাজে এর প্রতিচ্ছবিকিরূপ সেই বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি বললেই চলে। মূলত এই অনালকিত দিকটির উপর আজকের আলোচনার মাধ্যমে আলো ফেলার চেষ্টা করা হবে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের সন্ধিক্ষণ বঙ্গ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইতিপূর্বে তুর্কিরা নিরন্তর বাংলার উপর অভিযান চালায়। তুর্কিদের অভিযান বাঙ্গালী জনসাধারণের মানসিক শক্তির উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ফেলে। 'তুর্কানা তরীকার'-এ দেখা যায় তুর্কিদের সফল অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেবস্থানগুলি ধ্বংস করা ও সুফিয়ানা পদ্ধতিতে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটানো। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যসমাজের জুলুম, সমাজ-হোতা ও মোল্লাদের নিয়মের বাড়বাড়ন্ত নিম্নবর্ণীয়দের নাভিশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠে। জনসাধারণ এসময়ে নিজ ধী-শক্তি, বীর্যশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে অদৃশ্য শক্তির চমৎকার তথা ঐশ্বরিক শক্তি সহজ কথায় ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যা দর্শনের নজরে কাপুরুষতার লক্ষণ। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৪৮৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বাংলার ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন সূর্যাস্তের পরবর্তী মুহূর্তে চন্দ্রগ্রহণের সময়ে নিমাই ওরফে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে করতেই আমরা তাঁর বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থার সামান্য প্রতিচ্ছবি দেখব এবং সেই প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ের নারীদের অবস্থা ও সেক্ষেত্রে নিমাইয়ের অবদান দেখার চেষ্টা করা হবে।

জগন্নাথ মিশ্র বেঁচে থাকাকালীন নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করার আদেশ দেন। যেহেতু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ পড়ালেখা করে সন্ন্যাসী হয়েছে সেহেতু নিমাই-এর জীবনে ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এদিকে শচীদেবীর আশঙ্কা নিমাই মূর্খ থেকে গেলে বিয়ের জন্য কেউ মেয়ে দেবে না।[১] অন্যদিকে লেখাপড়ায় আগ্রহী নিমাইপিতার অনুমতি পেতেনিলেন অভিনব পথ। উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির গাদায় দাঁড়িয়ে মাকে দেখালেন বিদ্যাভাবে তাঁর বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এমতাবস্থায় শচীমাতা পুনরায় জগন্নাথ মিশ্রের নিকট দ্বারস্থ হয়েও পরাজিত হলেন। অবশেষে পাড়া-প্রতিবেশিদের সহযোগিতায় পিতার কাছ থেকে নিমাই লেখাপড়া শুরুর অনুমতি পান। লেখাপড়ায় আগ্রহী বালক নিমাই স্বভাবে ছিলেন চপল। গঙ্গাঘাটে শিবপূজারত কুমারীদের উক্তত্য করতেন।[২] এসময়েই নিমাই ও লক্ষ্মীপ্রিয়া পারস্পরিক প্রেমে পড়েন। যা শচীমাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সলজ্জ কথা শুনে সহজেই অনুমান করেন। বিবাহে বাঁধ সাধে উভয়ের বর্ণ ও আর্থিক পার্থক্য। যা সমাজের মাথা ও শচীমাতার পক্ষে মানা অসম্ভব ছিল। কিন্তু বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা মাথায় রেখে নিমাইয়ের জেদের কাছে তিনি হার মানেন। লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা দরিদ্র বল্লভাচার্য মাত্র পাঁচটি হরিতকী দিয়ে ১৫ বছরের নিমাই ও ১০ বছরের লক্ষ্মীপ্রিয়ার

বিবাহ সম্পন্ন করেন।[৩] কিছু সময়ের পর নিমাই নবদ্বীপে চলে গেলে লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্প দংশনে মারা যান। বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে চৈতন্যর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এদিকে কিছু বছর পর দেখা যায় বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য দায়ী অদ্বৈত নিমাইকে নবদ্বীপের অবতার করতে আগ্রহী।[৪] এজন্য শচীমাতার অনুমতি আবশ্যক। কিন্তু বৈষ্ণব পরিবারের বধূ শচীদেবী মুখ ফুটে কিছু বললেন না। কিন্তু অদ্বৈত আশঙ্কা করেন বিশ্বরূপের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য অদ্বৈত-এর প্রতি বিরূপ শচীদেবী। সুতরাং অনুমতি নাও দিতে পারেন। সুতরাং এই কাজের ভার পরে শ্রীবাসের উপর। যাতে তিনি সফল হন। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে নিমাই সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ও শচীমাতাকে সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানানোর পর নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে গভীর প্রেমালিঙ্গনের রাত্রিযাপন করে পরের দিন ভোরে সংসার ছাড়েন।

উপরের ঘটনা্গুলি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মা ও স্ত্রী-এর সাথে চৈতন্যর সম্পর্ককে নির্দেশিত করে। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের নারী-অবস্থানের চিত্র লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন, শচীমাতা আটপৌড়ে গৃহবধূ। যার জগত স্বামী-সংসার, ফি বছর সন্তানের জন্ম দিতে দিতে শেষাবধি দশম সন্তান নিমাইতে গিয়ে ঠেকে। এটি কেবল শচীমাতা নয় সকল নারীরই উদ্দেশ্য ছিল শ্বশুরকুলের প্রিয় পাত্রী হয়ে নিজ শরীরের, চাহিদার কথা ভুলে স্বামীর যৌন বাসনা পূর্ণ করা, সমাজের চোখে স্বামী সোহাগিনী প্রতিপন্ন হওয়া। এজন্য মৃত্যুবরন করতেও রাজী। কেননা সমাজ স্ত্রীলোককে আশীর্বাদ দেয় 'স্বামী সোহাগী হও', 'শতপুত্রের জননী হও।' অনথ্যায় স্বামী বারমুখি হবে।সমাজে বিবাহের যৌতুক হিসেবে কন্যাদেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল এবং অসম বয়সী বিবাহ প্রচলিত ছিল। এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ – ১৫১৯ সালে ৪৬ বছরের নিত্যানন্দ সূর্যদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করার সময় তার কনিষ্ঠা কন্যা ১২ বছরের জাহ্নবাকে যৌতুক হিসেবে দাবী করেন।[৫] যাইহোক, সন্তানের ভাল-মন্দ বিচারের অধিকার পিতামাতা উভয়ের থাকলেও স্বামী সেই অধিকারটুকু স্ত্রীকে দেন না. যা প্রতিফলিত হয় নিমাইয়ের শিক্ষাজীবন শুরুর মধ্য দিয়ে। প্রতিবেশীদের পীড়াপীরিতে রাজি হলেও জগন্নাথ স্ত্রীর মতামতকে প্রথম থেকেই উপেক্ষা করছেন। কেননা তৎকালীন সমাজের চিন্তানুসারে শাড়ি-গহনার হিসেব রাখা বোধ-বুদ্ধিহীন মেয়ে মানুষের কথা শুনলে পৌরষত্বের অপমান হয়, তাকে স্ত্রৈণ বলে। যা জন্মাবধি শিশুরাও জানে। সমাজের চোখে নাবালক-নাবালিকার মনে প্রেম জাগা, বাড়ির মতে বিবাহ করা স্বাভাবিক ঘটনা। এর ফলে পাত্রপাত্রী মন-শরীর-জীবনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে সেবিষয়ে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজও দৃকপাত করে না বা তাঁদের মধ্যে কোনো বোধ জন্মায়নি। লক্ষ্মীপ্রিয়া-নিমাইয়ের বিবাহের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বর্ণপ্রথা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহর প্রমাণ দেয়। সমস্ত নেতিবাচকতাকে সমাজপতিরা ধর্মীয় পোশাক পড়িয়ে শাস্ত্রের দোহাই দেয়। এ বিষয়ে সমাজের মাথা ব্রাহ্মণদের উদ্দ্যোগ সবচেয়ে বেশী ছিল। যা সমাজের পশ্চাদপদতাকে নির্দেশ করে। নিমাই পিতার বদলে মা'র কাছে

লেখাপড়া শেখার আবদার জানিয়ে বাল্যাবস্থাতেই সমাজের বাঁধাধরা চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করেন। শুধু তাই নয়, আস্তাকুড়ের উপর দাঁড়িয়ে তিনি আসলে ইঙ্গিত দেন প্রকৃত শিক্ষাভাবে নারী সম্পর্কে সমাজের চিন্তাধার মধ্যেও আস্তাকুড়ের মত দশা হয়েছে, বিচার ক্ষমতা হারিয়েছে। তবে তৎকালীন সমাজ নারীদের 'অবলা জীব' ভাবলেও কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় পাত্রের রূপ-বংশ অপেক্ষা জ্ঞান-বিদ্যাকে অধিক মান্যতা দেয়। সমাজের এই ইতিবাচক দিকনিমাই-এর বিবাহ চিন্তা প্রসঙ্গে শচীমাতার আশঙ্কার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। নিমাই নিজ বিবাহ ক্ষেত্রে বর্ণ-জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠেন। আমরা জানি চৈতন্যমানুষের ধর্মীয় আস্থাকে উপাদান হিসেবে নিয়ে কেবলমাত্র 'হরিনাম' সংকীর্তনের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একসুতোয় গাঁথেন। তিনি হিন্দুধর্মের নতুন রূপ দেন, যার নাম বৈষ্ণবধর্ম। এই বৈষ্ণবধর্মের সাথে বিভিন্ন আচার বিশ্বাস, সম্প্রদায় থেকে শুরু করে বিকৃত যৌনবাদ, নাথপন্থীদের গুরুবাদ, সহজিয়া ধর্মের যৌন যোগাচার, তন্ত্রসাধনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।[৬] যা মানব মনে জাত-বর্ণ-অস্পর্শ্যতার মত প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন জাগায়, ব্রাহ্মণ্যদের একাধিপত্যকে টালমাটাল করে দেয়। অন্যদিকে সমাজে নারীদের হেয় বানিয়ে আখেড়ে সমাজপতিদের যে রসনা তৃপ্তি ঘটছিল নিমাইয়ের কর্মকাণ্ডে তাতেও ভাটা পড়ার অশনি সংকেত দেয়। তাঁর কর্মকাণ্ড ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ ও নিপীড়িত জনসাধারণের নিকট নবজাগরণের আশীর্বাদ হয়ে আসে।

এতক্ষণ দেখা গেল, নিজস্ব নারী অর্থাৎ মা-স্ত্রীর মাধ্যমে চৈতন্য সংসারে আবদ্ধ সমস্ত নারীজীবনগুলিতে বিশুদ্ধ বাতাস দিতে চাইলেন। এবার দেখা যাক, কারণে-অকারণে স্বামী পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত, ধর্ষিতাএককথায় সমাজের ভাষায় 'পতিতা'দের জন্য চৈতন্য সমাজের চেতনা জাগ্রত করতে কোন পদক্ষেপ নিলেন।

মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিবাহ। জটিল রীতিনীতিকেন্দ্রিক বিবাহ ব্যয় সাপেক্ষ। ব্যয়ভার বহনে অপরাগ পরিবারের কন্যা অনেক সময় অরক্ষণীয়া থেকে যেত। এমতাবস্থায় সর্বপ্রথম দক্ষিণভারতে প্রচলিত কণ্ঠীমালাবদল বিবাহ পদ্ধতি আনয়ন দ্বারা বিবাহক্রিয়াকে সরল করেন। নারীদের স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অন্যদিকে এসময়ে সমাজে অবধূত সম্প্রদায় অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[৭] অবধূত সম্প্রদায় ছিল সমস্ত প্রকার খাদ্যগ্রহণকারী, মুক্ত চিন্তায় ও অবাধ যৌনতায় বিশ্বাসী জ্ঞানীগুণীসাধু-সমাজ। যাঁরা নিজ চেতনা-পার্থিব জ্ঞান দ্বারা শিষ্টাচার তৈরী করছে। চৈতন্যের চেতনাও এর মধ্যে পড়ে। এই সম্প্রদায়ে পতিতারা যোগ দিতেন। ফলে তমসার মত বহু অবধুতানিসহ সমাজের পতিতারা, বারবনিতারা শ্রীচৈতন্যর ভক্তিপ্রেমের রসে জীবনের মূল্য খুঁজে পান। শ্রীচৈতন্যর ভক্তিপ্রেমের রসে সিঞ্চিত হয়েবহু গৃহবধূ অবগুণ্ঠন ছেড়ে নিজেদের পুরুষদের সমতুল্য করে তোলেন। ঠিক যেমন নিত্যানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী নিঃসন্তান জাহ্নবা নিজ গুণে দীক্ষাদানের অধিকারী হয়ে

বীরভদ্রকে দীক্ষিত করে গোস্বামিনী পদে উপনীত হন।[৮] জাহ্নবা দেবীর উদ্যোগেই বৃন্দাবনের গোপীনাথ মন্দিরে কৃষ্ণের বামপাশে রাধা বিগ্রহ ও খেতুরিতে যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা শুরু হয়। যবন দস্যুকে হরিনামে দীক্ষিতকারী জাহ্নবা বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানকার গোস্বামীদের সাথে তত্ত্ব আলোচনা করেন। আরও জানা যায়, দেবী জাহ্নবা হুসেন শাহের দরবারের সগির মালিক সনাতন গোস্বামী, তাঁর ভ্রাতা গৌড়ের সুলতানের দবির খাস রূপ গোস্বামীর কাছ থেকেও সম্মান অর্জন করেন।[৯] শ্রীচৈতন্য পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া ও অদ্বৈত আচার্যের প্রথমা পত্নী সীতা দেবী, শ্রীবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃতা হন। এমনকি শাহাজাদা ডানিয়েলের বেওয়া বেগম মালতি বিবি শ্রীচৈতন্যর ভক্তিপ্রেম রসে সিঞ্চিত হন।[১০]এককথায় শ্রীচৈতন্যর ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে নারী ক্ষমতায়ন ঘটে নদীয়ার দিকে দিকে। এই ভক্তিরসের ধারা নবদ্বীপ, শান্তিপুর থেকে বৃন্দাবন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যা স্বাভাবিকভাবে তিনশো বছর পরেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। ফলে হটু, হটি, দ্রব্যময়ী মত বিদ্যাবতীদের বাংলা থেকে উৎখাত করা হলে কেউ কাশী কেউ বৃন্দাবনবাসী হয়ে পড়েন।[১১] আরেকটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য। শ্রীবাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত নিশা কীর্তনে নিমাইয়ের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।[১২] কিন্তু দেখা যায় নিয়ম লঙ্ঘন করে সকলের অগোচরে 'ডোল-এর মধ্যে লুকিয়ে কীর্তন শুনতে থাকে শ্রীবাসের শাশুড়িমা। যাকে শ্রীনিবাস চুলের মুঠিধরে বের করে।[১৩]এই ঘটনায় চৈতন্য ও শ্রীনিবাস দুজনেই আনন্দিত হন- 'প্রভু বোলে চিত্তে এবে বাসিয়া উল্লাস,/হাসিয়া কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস।'[১৪] প্রশ্ননিমাই তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের হিতার্থে পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেখানে এই নারীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন এল? তবে কি তিনি সমাজের কাছে বার্তা দেন যে তাঁর বানানো নিয়ম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য? নাকি তাঁর ভয় হয়েছিল নিগৃহীত নারীটি কোনো গোপনীয় আলোচনা শুনে ফেলতে পারে? তবে কারণ যাইহোক কোনো নারীর প্রতি এই আচারন কি শোভনীয়? আরেকটি ঘটনা বিষ্ণুপ্রিয়া তখনো স্বামীর সন্ন্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়ে অজ্ঞাত।[১৪]এই দ্বিচারিতার কারণ কি? উভয়েই নারী, উভয়েই তাঁদের পুত্র কিংবা স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত সমান পীড়া দেয়। তবে কিতাঁরও মনের কোনে আশঙ্কা ছিল নারী নরকের কিট, মোক্ষলাভের বাঁধা? পুরুষ মাত্রেই এক? জনশ্রুতি শাশুড়িমা সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকার কারণে স্বামীর অবর্তমানে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সত্যি? এমনও হতে পারে, শ্রীচৈতন্যকে কুলষিত করতে বিরুদ্ধশক্তির রটনা। কেননা পূর্বে বিঁধবরা স্বপাকে ভোজন করতেন। যা চৈতন্যকে ব্যাথিত করে এবং তারই অনুরোধে শচীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ার হাতে খান যা সম্পর্কে মিষ্টতা ব্যতীত অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য গবেষক তুহিন মুখোপাধ্যায়-এর মতে, স্বামী বিরহে দীর্ঘদিন অন্নজল পরিত্যাগের লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হতে পারে।[১৫] যে সমাজে নারী নরকের কিট সেখানে তিনি সীতাদেবীর হাতে রান্না করা খাবার খেয়ে সকল যুগের সামনে এক নজির রাখেন। এমনকি রামকৃষ্ণকেও দেখা যায়

বিধবাদের মুখে আমিষ তুলে দেন। সামগ্রিক বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব সমাজের নারীদের নিকট হয়ে উঠলেন মুক্তি সূর্য।

এবার বর্তমানে সময়ে আসা যাক। অত্যাধুনিকউন্নত সমাজের ধর্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত ডামাডোলের পরিবেশে 'চৈতন্য' শব্দটি উচ্চারণ করলেই একটা অরাকাজ করে। দেহত্বকের বাইরে সূক্ষ্মভাবে থাকাঅরা বা দেহজ্যোতি দ্বারা ব্যক্তির অন্তরের অন্তর স্থলকে চেনা যায়। এজন্য বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যিক। যা সকলের নিকট থাকে না। আধুনিক উন্নতমানের আরামদায়ক জীবনযাপনে-পোশাকে জনসাধারণ অভ্যস্ত হলেও সকল বয়সী নারীদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নজর, চিন্তা অপরিবর্তনীয়। ঘরে-বাইরে নারীর চরিত্র বিচার হয় তাঁর পোশাকের মাপ দ্বারা। সমাজের নজর আটকে যায় বয়ঃসন্ধি মেয়ে থেকে পূর্ণবয়স্কার নারীর বক্ষগঠন, অন্তর্বাসের ফিতের দিকে। প্রায় সকল স্তরের মেয়েরা এখনও মাসিককে 'পেটে ব্যাথা হয়েছে' বলতে স্বাচ্ছন্দ্য। কিছু নারী স্বামীর সাথে অন্তর্বাস কিনতে যায়। কেননা নারীটি একা পরপুরুষের সামনে অন্তর্বাসের বর্ণনা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে অন্যদিকে স্বামীর কাছে ঠুনকো নৈতিক শুদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে। এরমধ্যে রোমান্টিসিজম নেই। মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর দেহ-সম্মান লুঠ করতে যবনদের জুড়ি মেলা ছিল দুষ্কর। সমাজে ধর্ষিতা পেতেন পতিতা পরিচয়। তাঁদের এই পতিতা পরিচয় নিয়ে আরও বহুবার সমাজপতি, ব্রাহ্মণদের দ্বারা ধর্ষিত হতে হয়। বর্তমানেও এর তেমন হেরফের দেখা যায় না। পুরুষ দ্বারা নারী শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে নিগৃহীত হলেও আশ্চর্যজনকভাবে সমাজের কাছে সেই নিগৃহীতা অকারণে দোষী বলে পরিগণিত হন। ফলে তাঁর নাম-মুখ লুকিয়ে রাখা হয়। অন্যদিকে বীরপুঙ্গবরা সমাজের বুকে মুখ দেখিয়ে সদর্পে ঘুরে বেরায়। প্রশ্ন-সকলাবস্থাতেই নরকেরকীট নারীর উপর অঙ্গস্থাপনকারী পুরুষেরজাত-ধর্ম নরক যাত্রা করে না কেন? সমাজের চোখে নারী মানেই একটি সুখাদ্য বস্তু। তাঁকে ঢেকে রাখতে নানাবিধি বাম প্রস্তুত, সকল 'চৈতন্য' যেন সেখানেই নিহিত। সেসাথে কখন দেখা যায় কোনো নারী শোষণ বিরোধী আন্দোলনে পা মেলাচ্ছে নারী লোভী কোনো পুরুষ কিংবা পুরোধায় রয়েছে শাশুড়ির উপর নানাভাবে অত্যাচারকারী বধূ। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানেই এই নয় যে নারীর প্রতি কেবল পুরুষরা নিম্নরুচির পরিচয় দেয়, বেশ কিছু নারীও স্ব-লিঙ্গের মানুষদের প্রতি কুরুচিসম্পন্ন মানসিকতার পরিচয় দেয়। যদিও এই সমাজেরই বুকে নারীরা স্ব-ইচ্ছায় আপন ধীশক্তি দ্বারা আপন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। যদিও তাঁকে একদিকে স্বামীর দৃষ্টি নন্দন ও উপযুক্ত অঙ্কশায়িনী হতে মোহিনীরূপের অধিকারী হতে হবে। অন্যদিকে সেই মোহিনী নাকি পুরুষকে নরকে যাওয়ার রাস্তা দেখায়। এক অর্থে আধুনিক সমাজের চৈতন্য' নারী দেহ থেকে বেরিয়ে নারীকে প্রাণ হিসেবে দেখার নজর এখনো পেল না। নারীর মৃত শরীর কামুকের কাছে ভোগ্য। তবে প্রশ্ন মাটির দেবী মূর্তির নগ্ন রূপ আবার কামুকের মধ্যে কামুকতা জাগিয়ে তোলে না তো? কেননা দুটি দেহই প্রাণহীন। রাত-বিরেতের লড়াই লড়তে সেই পুরুষদের সাথেই যেতে হয়,

পাছে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।[১৬] শুধু তাই নয়, বহু বিধবা আজও তাঁর মৃতস্বামীর ইচ্ছা স্বপাক ভোজনের বাসনা রাখে। যদিও পরিবারের 'চৈতন্য' তাঁকে একাজে বিরত করে। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে অবুধতরা সকলের ধারণার বাইরে অবাধ-যৌনতায় বিশ্বাসের কথা বলেন যা তৎকালীনসমাজ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতনা। আজ সমাজ তাকে বলে free sex, যা আজকের ultra morden চিন্তাধারানুসারে অনেকাংশে স্বীকৃত। তবে এই free sex মানসিক-শারীরিক তৃপ্তি দিলেও সামাজিক-শারীরিক-commintment-এর সুস্থতার জন্য উপযুক্ত কিনা তা তর্কাতর্কির বিষয়।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের আমলের মত বর্তমান সময়েও নারীজাতি ঘরে-বাইরে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগৃহীত। কিন্তু বিনাদোষে দোষী হয় নারীরাই। সমাজ আশৈশব শিখিয়ে দেয় -তুমি নারী তুমি লজ্জা, নিজের লজ্জা বাঁচিয়ে চল, না পারলে সমাজে মুখ দেখিয়ো না, তুমি সমাজের কাছে ত্যাজ্য। আর পুরুষ মানেই বেপরোয়া হবেই, যেকোনো গুরুদোষেও সে নির্দোষ। তবে পার্থক্য একটাই- দীর্ঘ অত্যাচার সহ্য করার পর আজকের নারীদের মধ্যে চৈতন্য দেখা দিয়েছে। তাঁরা মিথ্যা অবগুণ্ঠন ফেলে নিজেদের লড়াই নিজেরা লড়তে শিখেছে। সমাজের 'চৈতন্য' এসেছে।এই সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে বলা যায়-'The influence of Sri Chaitanya is all over India. Where ever the Bhakti– Margo known, there he is appreciated, studied and worshipped ... most of his so-called disciples in Bengal do not know how his power is still working all over India'।তিনি কখনই নারীদের নরকের কিটতুল্যর মান্যতা দেননি। বরং তাঁর শিষ্য-সাধকদের সর্বদা কামিনীকাঞ্চনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন। চৈতন্য বৈষ্ণবদের শিক্ষা দেন যুগল সাধনায় মত্ত হলেও মাথায় রাখতে হবে প্রকৃতপক্ষে সকল নারী মাতৃতুল্য। চৈতন্যর নারীদের প্রতি এই চিন্তাধারা আজকের দিকেদিকে অশান্ত সমাজের নারীদের সম্মানের সাথে বাঁচা ও প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য নিঃসন্দেহে যথোপযুক্ত।

তথ্যসূত্র:

১. চৈতন্যদেব, ভাদুড়ি নৃসিংহপ্রসাদ, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩,পৃ-৫৭

২. মনীষার দীপ্তি- সংস্কৃতির প্রতীক মাতৃশক্তি, ১৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৪২৬, পৃ-৪০

৩. এই সময়, online,১১ইজানুয়ারি ২০১৪

৪. লোকায়ত শ্রীচৈতন্য, মুখোপাধ্যায়তুহিন, গাঙচিল, নভেম্বর ২০১৪, কলকাতা,পৃ-৫৮

৫. কৃত্তিবাস চৈতন্য হোক, ১লা এপ্রিল ২০২৪, কলকাতা, পৃ-২৭

৬. জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ নদীয়া, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২০০৩, কলকাতা,পৃ-৪০

৭. কৃত্তিবাস চৈতন্য হোক, ১লা এপ্রিল২০২৪, কলকাতা, পৃ-২৭
৮. তদেব, পৃ-২৯
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. লোকায়ত শ্রীচৈতন্য, মুখোপাধ্যায়তুহিন, গাঙচিল, নভেম্বর ২০১৪, কলকাতা,পৃ-১০৯
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. এই সময়, online,১১ই জানুয়ারি ২০১৪
১৬. জনসাধারণের মত, ১৪ই আগস্ট ২০২৪।

অনালোকিত ভৈরব নদী তীরবর্তী প্রান্তিক জীবনের কথাকার সৌরভ হোসেনের সাহিত্য : বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ

সুমন হাসান
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: যে শ্রমিক দুবেলা পরিশ্রম করে বাড়িতে অর্থের যোগান করে, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রামের সাধারণ মানুষদের অন্ধকারের দিকে ক্রমশ চালিত করে, যে মানুষগুলো পাড়ার মাচায় বসে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেন, তাদের জীবন সংগ্রাম সৌরভ হোসেনের গল্পভুবনে উঠে আসে বারবার। সেই মানুষগুলোর লড়াই এবং বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অনেকাংশ নিরক্ষর মানুষ যারা আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে এখনো গুছিয়ে উঠতে পারেনি তাদের কথা বলে যান গল্পকার। গ্রামের সৌন্দর্য, রূপ, চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে পাঠক মাত্রই আশ্চর্য অনুভূত হন। খেটে খাওয়া মানুষগুলো পরিবারকে নিয়ে একটু ভালো থাকার আশায় বিদেশে গিয়ে কাজও করে। কখনো সে শ্রমিকরা সেখানেই প্রাণ হারায়। কখনো আধপেট নিয়ে পরিশ্রম করেও অপমান, লাঞ্ছনা, কষ্ট সহ্য করে বিদেশে পড়ে থাকে। প্রান্তিক মুসলিম জীবন যারা নাগরিকত্ব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত, ধর্মের নামে বিভেদে যারা ভীত, তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, লড়াই, অসহায়তার কথা সৌরভ হোসেন তার কথা সাহিত্যে শিল্পীর মতো অঙ্কন করেছেন।

সূচক শব্দ: প্রান্তিক জীবন, গ্রামীন অর্থনীতি, শ্রমিক, গ্রামীন রাজনীতি, ধর্মের নামে বিভেদ।

সৌরভ হোসেন অলক্ষিত, অনালোকিত জীবনের কথাকার। ভৈরব তীরবর্তী মানুষের গভীর জীবনবোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে মেহনতী মানুষের অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। চাষ এবং কর্মহীন জীবনে পাড়ার মাচায় বসে বিড়ি টানা মানুষটি হয়ে উঠেছে গল্পের উপজীব্য চরিত্র। গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা ডিজিটালাইজেশনের প্রভাবে অস্থির। এই অস্থিরতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়। আড়াইশো টাকার রোজ মুনিশে খেটে খাওয়া জীবন, যারা সন্ধ্যায় কাজ করে টাকা পেলে চাল-ডাল কিনে ঘরে উনুন জ্বালায়। তাদের কথা গল্পের পরতে পরতে অঙ্কিত করেছেন কথাকার। সৌরভ হোসেন একুশ শতকের প্রথম দুই দশকের অন্যতম শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। প্রান্তবর্তী এলাকায় তিনি বেড়ে উঠেছেন, মিশে গেছেন মেঠো সুরে। পেশায় শিক্ষক সৌরভ হোসেন গ্রাম-জীবনের অঙ্কন শিল্পী।

কথাকার সৌরভ হোসেন জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৮৫ সালের ৩রা মার্চ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত দস্তুরপাড়া গ্রামে। তিনি প্রাণিবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। তাঁর পেশা শিক্ষকতা। তাঁর লেখা 'দেশ', আরও আনন্দ, সংবাদ প্রতিদিন, বর্তমান সুখিগৃহকোন, কালি ও কলম, 'এই সময়', 'সাপ্তাহিক বর্তমান', 'আজকাল', 'কালান্তর', 'নন্দন', 'গল্পগুচ্ছ', 'সৃষ্টির একুশ শতক', 'নতুন কৃত্তিবাস', 'কবিতা আশ্রম', 'আরম্ভ', 'পরিচয়', 'গল্পপাঠ', 'আপন পাঠ' ইত্যাদি পত্রিকায় গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'কমরেড ও অন্যান্য গল্প' অভিযান পাবলিশার্স, 'জমিনের আরশ' সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, 'সৌরভ হোসেনের গল্প' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, 'পঁচিশটি গল্প' একুশ শতক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাস 'ছবেদ মিস্তিরির খুতবা' অভিযান পাবলিশার্স, 'যে আলামতগুলি আশমানি নয়' সৃষ্টিসুখ, 'নেই দেশের নাগরিক' মাওলা ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) ও কেতাবে (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রান্তিক মানুষের কথা বলেন। প্রান্তিক জীবনের প্রতিদিনের আনন্দ -বেদনা, পাওয়া না-পাওয়া, হতাশার কথা কথাকার বলে যান।

তাঁর 'লাইন' গল্পের প্রধান চরিত্র দিনু। তাদের পূর্বপুরুষ অশিক্ষিত। কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি। দিনু ওরফে দীননাথ বাইন তার বাবার সাথে প্রথম বিদ্যালয়ে যাই। পড়াশোনা তার হয়নি। টিপসই দিয়েই তাদের জীবন চলে। সংসারের কাজ সামলিয়ে যখন নামের বানান ঠিক করতে যায় তখন দেখে লম্বা লাইন। সারা জীবন লাইনে গেল তার। তাই সে ফলে, "রেশনে লাইন, মুদিখানায় লাইন, পেট্রলপাম্পে লাইন, অফিসে লাইন, হাটে লাইন, ঘাটে লাইন, লাইনে যেন লাইন লেগেই থাকে"[১]। গল্পের শেষ লাইন "দুনিয়ায় কি যে মড়ক এল! মরার পরেও লাইন পিছু ছাড়ল না!"[২] প্রত্যাহিক জীবনে আমরাও কোনও না কোনও লাইনে দাঁড়িয়েছি। কখনো মিথ্যের কখনো সত্যের বিবেকের। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার লাইন বড়ই শক্ত। প্রমাণ সাপেক্ষে সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সংশোধিত জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। সমাজের নিচু স্তরের মানুষজন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেননা কোন লাইনে তারা দাঁড়াবেন।

'লাল ঘোড়া' যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনকথা। জীবনদশার শুরু থেকে একদম শেষ পর্যায়ে বার্ধক্য আসে। সেই বার্ধক্য অত্যন্ত কষ্টকর। বার্ধক্যে এসে রোগ জরায় জড়িয়ে কর্মহীন, ক্ষমতাহীন শরীর একসময় মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করে। লাল ঘোড়াও তাই। বাড়ির মনিবের মার খেয়ে শাসানি খেয়ে সারা জীবনের সমস্ত ফিরিস্তি মিটিয়েছে অবলীলায়। সেই মনিবের পুত্র অবহেলায় রেখেছে ঘোড়াটিকে। পাড়ার লোকে বলতো আতরের দুই ছেলে কালু এবং লাল ঘোড়া। এই গল্পে ঘোড়ার মুখে বাকদান করিয়ে কালু এবং ঘোড়ার জীবন বর্ণিত হয়েছে। আসলে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছলে সবার অবহেলা বেড়ে যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয়ের ওপর। বোঝা মনে হয়। যেটি ছাড়া এক

সময় চলত না সেটিই হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয়। লাল ঘোড়া এবং মনিবের আবস্থাও তাই। কালুর খেসেল বউ বলেছেন, "ঘুড়াটার মুতন এই বুড়োটাও বাড়ি থেকে গেলে বাঁচতাম"[৩]। কথাকার ঘোড়ার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সেই অমোঘ সত্য কথাটিই তুলে ধরেছেন যে প্রয়োজন ফুরুলে মানুষ পশু বা বস্তু হয়ে ওঠে বোঝা।

'কমরেড' গল্পের নায়ক সালাম ও তার স্ত্রী আফিয়া। আফিয়া বলে, "পেটে ভাত নাই, মুখে ইনকিলাব! হাড় যখন ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে তখন বুঝবে, কত ধানে কত চাল"[৪]। এই ভাবে বলে বারবার সাবধান করেছে সালামকে। সালাম লক্ষ্য করেছে পরিচিত মানুষদের বদলে যেতে। সালামের ভাবনা খুব পরিষ্কার। "এই ক্ষমতার জন্য তো আমরা দল করি না। এ তো বুর্জোয়া পথ। পুঁজিবাদীদের ক্ষমতায় টিকে থাকার পন্থা। আমাদের আসল লক্ষ্য, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা"[৫] এ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে দল করার জন্য পুলিশ আসে। সরকারি দলে নাম লেখায় না সালাম। গ্রামীন জীবনে দেখে আসা আফিয়া ভাবে দল করলে টাকা আসে সালাম সেই টাকা পায়ের তলায় গুড়িয়ে দেয়। আদর্শবোধ নিয়ে সে বেঁচে থাকে। পুলিশের ভয়েও সে হার মানে না। আসলে এই সালাম সমস্ত রাজনৈতিক দলের নিচুস্তরের কর্মীর প্রতীক যারা নিঃস্বার্থভাবে দলকে ভালোবেসে যাই। দলকে বাঁচিয়ে রাখে।

'ধানের গোলা' গল্পের প্রধান চরিত্র ছৈতুল্লা ও সুফিয়া। এ গল্পটি ধানের গোলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। কৃষি জীবনের হৃদপিণ্ড এই ধানের গোলা মূলতঃ বাড়ির ঠিক মাঝখানে উঠোনে থাকে। রোদের আলোয় চিক চিক করে গোলার বাতা। গৃহিনীর মন আনন্দে ভরে ওঠে। তবে সময় পরিবর্তন হয়। ধানের গোলাই ধান আর ওঠেনা। আশেপাশে ঢিবি তৈরি হয়। তাতে ইঁদুর,ব্যাঙ,সাপ থাকে। সে ধানের গোলায় আর ধান থাকে না। কিন্তু পূর্বপুরুষের স্মৃতি হিসেবে সেটা ফেলতেও চায়না ছৈতুল্লা। পুত্র সেরফুল আবুলরা চায় গোলা ভেঙে ফেলতে। পুত্রের বৌরা চাই ধানের গোলার বাতা দিয়ে জ্বালানি করতে।

ছৈতুল্লা বলে," বাড়িতে ধানের গোলা থাকা মানে গেরস্তর মান থাকা। জমি জিরেতের ইজ্জত থাকা"[৬]। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এই মান নষ্ট হয়েছে। 'যে ঘোষণাটির জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল' গল্পের মূল চরিত্র কুতুব। কুতুব মাস্টার। সে হাফ কৃষক। হাফ শিক্ষক। সে চাষবাস করে বিকেলে। সকালে টিউশন লড়াই। এভাবেই তার জীবন চলে। বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকে দল করা নিয়ে। স্ত্রী ফরিদা। কুতুবের জনসংযোগ করে বাড়ি ফেরাকে সে ফোটেন্টি বলে সম্বোধন করে। অন্য পার্টির লোক শাসানি দিয়েছে, "পার্টি করছিস কর বাড়িতে বসে কর, এ গাঁ সে গাঁ ঘুরেছিস তো পা ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেব"[৭]। তারপরও সে দমেনি। জেলা পার্টি অফিস থেকে তাকে ডাক করানো হয়। কুতুব ভাবে তাকে শোকজ বা সাসপেন্ড করা হয়েছে। সে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়েছে দলের সমালোচনা করে। সে পার্টি অফিসে গিয়ে দেখে তাকে দলের নতুন পার্টি লাইনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক আদর্শবাদী

কর্মীর কথা আমরা শুনি। সে নিষ্ঠার সাথে দল করে। গ্রামীন জীবনে এই ধরনের মানব দর্শনের প্রতিফলন দেখি।

'দুই নম্বরী হাবল শেখ' গল্পের হাবল খেটে খাওয়া খুব সাধারণ মানুষ। আধুনিকতার ছোঁয়া তার গায়ে লাগেনি। তার মোবাইলে ফোন নেই। ব্যাংকে অফিসে বা বাজারে মোবাইল ফোন থাকা অত্যন্ত জরুরী। মোবাইল খরচের মতন আর্থিক সমর্থ্য নেই। হাবল তাই গালি দেয় দেশের সরকারকে- "মোবাইল কোম্পানি কোম্পানি পোষা সরকার। মোবাইল কম্পানি গুলোকে বড়লোক করার ফন্দি"[৮]। আসলে হাবলের মত মানুষ গ্রামের রাস্তায় অহরহ। যাদের ফোন নেই। নম্বর নেই। প্রকৃতিপ্রেমী হাবুল শেখ নদীকে জিজ্ঞাসা করে, "এই নদী তোর ফোন নম্বর আছে"?[৯] 'যে শহরে একদা বাঙালি ছিলেন' গল্পে কাছিম এসেছে প্রথম কলকাতা শহর দেখতে। সঙ্গী পুত্র। কলকাতার রাস্তাঘাট মানুষ হাওড়া ব্রিজ পাতাল রেল দেখে সে অবাক হয়। তার এই প্রথমবার কলকাতা ঘোরা। ঘুরতে ঘুরতে দুচোখ পাকিয়েছে। কলকাতায় এসে চাষা কাছিম বাংলা ভাষা শুনতে পাইনি। তাই কাছিমের উক্তি, "কলকাতা তো বাংলার রাজধানী কিন্তু বাংলা কই এখেনে? শুধুই তো ইংরেজি আর হিন্দি। আমি তো কত্ত খুঁজুনু কুথথাও একটা বাংলা পেনু না"[১০]। আসলে এই গল্পটির মধ্য দিয়ে কথাকার বাংলা ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। গ্রামের মানুষজন এখন অবাক হন কোলকাতায় এসে। বাংলা ভাষা এখন তারা শুনতে পাচ্ছেনা।

'হারাম' গল্পে সালেহা ও ছাত্তার দম্পতি। তাদের কোন সন্তান নেই। প্রত্যেকের মতো তাদের স্বপ্ন তাদের সন্তান হবে। সালেহা মা ডাক শুনতে পায় তারা অনেক কবিরাজের কাছে গেছে কিন্তু কোন উপায় হয়নি। সন্তান হয়নি। ছাত্তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মানুষ। সে চাই আব্বা ডাক শুনতে। সালেহাকে থাকতে হয় বান্ধা মাগি বদনাম নিয়ে। পনেরো বছর তাদের বিবাহ হয়েছে। এখনো কোনো উপায় হয়নি। শেষে তারা ঠিক করে ডাক্তারের কাছে যাবে কিন্তু পাড়ার মানুষজন আধুনিক উপায়ে কৃত্রিম বাচ্চা হলে একঘরে করে দেবে। সালেহা ও ছাত্তার দম্পতি শেষে সব ভয় কাটিয়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত নেয় বাচ্চা নেবে। প্রথম থেকে বাচ্চা না হওয়ার জন্য সালেহাকেই দোষারোপ করা হতো। ডাক্তার দেখানোর পর দেখা গেল ছাত্তারের সমস্যা আছে। শেষে নার্সিংহোমে এসে সে আসমানী বার্তা শুনতে পাই, কে যেন বলে ওঠেন, "যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি দিয়ে আমি আমার সৃষ্টিকে পরিচালনা করি তুই সেই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে আপন করেছিস"[১১]। মুসলিম ধর্মান্ধ সমাজজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এই গল্পে।

'ঘরবন্দী মুখগুলো' গল্পে সুরাবুদ্দির ছেলে নুরুল। করোনাকালীন ঘর আবদ্ধ এক পরিবারের ছবি এ গল্পে ফুঁটে উঠেছে। সুরাবুদ্দি বৃদ্ধ মানুষ। গঙ্গার ধারের প্রতিদিনের আড্ডায় তার প্রাণ ফিরে আসে। সে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তার মনে হয়েছে, 'এসব দেশের সরকারের ফন্দি'। তিন মাস ধরে সে আড্ডায় যেতে পারে না। শেষে

একদিন সবার কথা উপেক্ষা করে একা কাউকে না জানিয়ে আড্ডাই চলে যায়। কেউ থাকেনা সেখানে। সে একা একা বিড়বিড় করে আর হাসে। এ গল্পের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক অনটনের পাশাপাশি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বার্তা ঘোষিত হয়েছে। 'ছবেদ মিস্তিরির খুতবা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। আমরা প্রত্যেকেই কোনো ছাদের তলায় বাস করি। দুপাশ জুড়ে আছে দেওয়াল। কখনো কখনো মনে পড়ে এই দেওয়াল, আমার মাথার ছাদ, যারা গড়েছিল; তাদের কথা। অর্থাৎ রাজমিস্ত্রিদের কথা। এই রাজমিস্ত্রিদের জীবন-পরিবার-অর্থনৈতিক টানাপোড়েন-সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার লড়াইকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে 'ছবেদ মিস্তিরির খুতবা'।

রাজমিস্ত্রিরা বড়ো বাড়ি তৈরী করেন। অথচ তারাই থাকেন এক ঝুপড়িতে। তারা অধিকাংশ সময় সম্মানিত হননা। তবে গৃহস্থ বাড়িতে আত্মীয়তার নীরব দাবি জানায় মাত্র। জীবন বোধহয় বাড়ির মতোই গড়ে ওঠে। উপন্যাসের পরিচ্ছেদ নেও, পুস্তে, গাঁথুনি, দেয়াল, লিনটন, ক্যান্টিলিভার, সাটারিং, খোয়া, বালি, সিমেন্ট, ঢালাই, দাগ বড়োই বিচিত্রময়। পাঠক একবার পড়তে শুরু করে শেষ না করে নিস্তার নেই।

উপন্যাসের মূল চরিত্র ছবেদ। তাদের পূর্ব পুরুষ পেশায় রাজমিস্ত্রি। এলাকায় মজুরি কম। দু-পয়সা রোজগারের আশায় বিদেশ যায় ছবেদ। যাওয়ার আগে ছবেদ তার স্ত্রী নাসিমা কে বলছে - "আমরা হলেম রাজমিস্ত্রি, ইট-মশলা দিয়ে গাঁথুনি গড়াই আমাদের কাজ। যাওয়ার আগে বংশের গাঁথুনিটা না হয় গড়েই গেলাম"[১২]। বিদেশে যাওয়ার পর মিস্ত্রি-শ্রমিকরাই একে অপরের আত্মীয় হয়ে ওঠেন। একসাথে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করেন। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে সন্ধ্যা বেলার আড্ডা তাদের কাছে ইবাদত। "এই ইবাদতে কেউ হিন্দু-মুসলমান ঢোকাতে পারেনা। ঢোকাতে পারেনা ঘৃণার বিষ। জীবন এখানে আমন ধানের শিষের মতো পবিত্র"[১৩]। বিদেশে একসাথে ঘুমোয়, 'রাম-রহিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকেন'।

লেখক হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে গোটা উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রাম্য ছড়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। "মাগ সতিনে মারামারি ভাতার চলল কবরবাড়ি"[১৪] বা "এ বউ আছে ও বউ ভাগ তৈয়বের মাথায় মস্ত টাক"[১৫] উপন্যাসে বিদেশে গিয়ে শ্রমিকদের উপর নেমে আসে অত্যাচার। কেউ কেউ জড়িয়ে পড়েন অসামাজিক কাজকর্মে। বিদেশে থাকলেও ভোটের সময় মিস্ত্রিদের বাড়ির লোকেদের মাধ্যমে এক প্রকার জোর পূর্বক আনা হয় গ্রামে। ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত আসে, ছবেদদের মনে হয় "গরিবের একটাই ধর্ম, পেট পূজা'। একই কুন্নিতে ছবেদ 'ওঁ' -ও লেখেন আবার 'আল্লাহু'-ও লেখেন"[১৬] । ছবেদ গোটা রাজমিস্ত্রিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আমরা লক-ডাউনে আটকে পড়া শ্রমিকদের দেখেছি। তাদের দূর্দশা দেখেছি। মুর্শিদাবাদের মানুষ হিসেবে জেলার রাজমিস্ত্রিদের জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছেন কথাকার। গভীর অনুভব নিয়ে লেখক জলজ্যান্ত সমাজচিত্র নির্মাণ করেছেন। খুতবা আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো ভাষণ: বক্তৃতা, প্রস্তাবনা, ঘোষণা,

সম্বোধন, উপস্থাপনা ইত্যাদি। উপন্যাসে হেডমিস্ত্রি ছবেদ নানান জটিল পরিস্থিতিতে সমস্ত মিস্ত্রিদের শান্ত করেছেন। সঠিক উপদেশ দিয়েছেন। হিংসা থেকে দূরে রেখেছেন। লেখক সুকৌশলে এই 'ছবেদ'-এর মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতি রক্ষাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলেছেন। রাজমিস্ত্রিদের জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ধারায় প্রথম বলেই বোধ হয়।

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ যার আগের নাম ছিল আরাকান। সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বলা হয় রোহিঙ্গা। রোহিঙ্গা মুসলিমরা সেই অঞ্চলের আদিবাসিন্দা নয় বলে সেনাবাহিনী পরিচালিত সরকার অত্যাচার করে তাদেরকে দেশ ছাড়া করায়। এইরকমই একটি পরিবার যে পরিবারটির প্রধান জাফর আলী। সে ৮০ বছরের বৃদ্ধ মানুষ। তার দুই ছেলে, পুত্রবধূ, নাতি নিয়ে একটি নৌকোয় তারা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পালিয়ে আসে। কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরে পালি আসার চেষ্টা করে। তখন তাদের নৌকা নাফ নদীর উপরে। নদীটি মায়ানমার এবং বাংলাদেশের মধ্যবর্তী স্থান। যখন তারা নাফ নদীতে এসে পৌঁছই তখন তারা জানতে পারে বাংলাদেশ সরকার শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের জায়গা দিচ্ছে না। আবার তারা মায়ানমারের দিকেও ফিরে যেতে পারছে না। ভিটে মাটিহীন জাফর আলী নৌকোতেই মারা যায়। জাফর আলী স্বপ্ন দেখেছে মৃত্যুর আগে এবং তাদের ছেলেদের জানিয়েছিলেন। তার কবরের জন্য যদি সে মাটি পাই তাহলে রোহিঙ্গারা তাদের স্বভূমি ফিরে পাবেন। ফলে জাফর আলীর দুই ছেলে জাফর আলীর মৃতদেহটিকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারছে না আবার মাটি ও তারা পাচ্ছে না। তারা পাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে কিন্তু পাড়ে প্রহরীরা সতর্ক। এমত অবস্থায় তারা রাত্রির অন্ধকারে বাংলাদেশের বর্ডারে সতর্কতার সঙ্গে ঢুকে মাটি খুঁড়ে মৃতদেহটিকে কবর দেয়। মানুষ আছে তাদের দেশ নেই। এই শরণার্থীদের নিয়ে লেখা সৌরভ হোসেনের উপন্যাস ‘নেই দেশের নাগরিক’।

সৌরভ হোসেন প্রান্তিক জনজীবনের কথা তুলে ধরেছেন। মুসলিম পরিবারের ধর্মান্ধতার জন্য যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হতে হয় সে সমস্ত কিছুই তিনি সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ রাজনীতি গ্রামীণ অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। সে কারণ অনুসন্ধান করেছেন গল্পের মধ্যে দিয়ে। গ্রাম বাংলার জনজীবন থেকে কখনো তিনি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্তমান গভীরতম সমস্যা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে তিনি কলম ধরেছেন। গ্রামের শ্রমিক তারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। কেউ পাট বপণ করে কেউ ধান। কেউ জুতো সেলাই করে কেউ বৃদ্ধ বয়সে পাড়ার মাচায় বসে শেষ কয়েকটা দিন কাটাই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ধারণা সৌরভ হোসেনের গল্পে পাই। বাংলা সাহিত্যের এই বিপুল পবিত্র ভূমিতে তিনি একটি ভিন্ন পথে হাঁটতে সক্ষম হয়েছেন এই সক্ষমতায় তার সাহিত্যসম্ভারের পাথেয়।

তথ্যসূত্র :

১। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৫৭
২। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৫৮
৩। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৬৫
৪। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ২০
৫। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ২১
৬। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ৪৭
৭। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১১৮
৮। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৭
৯। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৮
১০। দেশ, ১৭ই জুলাই, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫২
১১। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, পঁচিশটি গল্প, কলকাতা, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১০৪
১২। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, ছবেদ মিস্তিরির খুতবা, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৩০
১৩। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, ছবেদ মিস্তিরির খুতবা, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৪৪
১৪। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, ছবেদ মিস্তিরির খুতবা, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৫৬
১৫। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, ছবেদ মিস্তিরির খুতবা, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৬৭
১৬। হোসেন, সৌরভ; ২০২৩, ছবেদ মিস্তিরির খুতবা, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৮৮।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন

মোসাহিদা খাতুন
সহকারী শিক্ষক
শ্যামনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় উপমহাদেশ কেনো, পৃথিবীর ইতিহাসে উদ্বাস্তু একটি জ্বলন্ত সমস্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সমস্যা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। ভারতের ক্ষেত্রে দেশভাগের পরে পরেই উদ্বাস্তুদের ঢল নেমেছিল। যা দেখে কবি-সাহিত্যিকরা চুপ থাকতে পারেননি। তাদের অসহায়ত্ব, ক্ষুধা, জ্বালা, সন্তানের মুখে অন্ন দিতে না পারার বেদনাগুলোকে সাহিত্যিকরা তুলে ধরেছেন কলমের ডগায়। প্রদীপের তলায় অন্ধকার কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত হয় ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার স্বাদ, সেই সঙ্গে দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের ভয়াবহ যন্ত্রনাময় জীবন দেখে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। যখন এই তিনটি আবশ্যকীয় জিনিস সংগ্রহে অক্ষম হয়ে মানুষ বিবেক বুদ্ধি হারায়, তখন পশুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। ফলে ডাস্টবিনের খাবারের অধিকারের লড়াইয়ে কুকুরের কামড় খেতে হয়। নিশ্চিত জীবনের মোহে পাড়ি দিয়ে মোহভঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও বিবেক হারিয়ে ফেলেন মানুষ; তার সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প গুলিতে। তাঁর ‘ডাক’, ‘মুক্তি’, ‘না’, ‘কান্না’ প্রভৃতি গল্পে উদ্বাস্তু জীবনের হাহাকার ধরা পড়ে। আসলে উদ্বাস্তু জীবন একটি অভিশাপ। স্বাধীনতায় সবার আনন্দ পাওয়ার কথা। কিন্তু স্বাধীনতার সাথে সাথে দেশভাগ সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হলো। নেতৃবর্গরা নিজেদের ফায়দা ওঠালেও সাধারণেরা পড়লো বিপদে। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের কিছু সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে, আর পাকিস্তানের কিছু হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে আসার তোড়জোড় শুরু করে দিলো। ফলে শুরু হলো তাদের বিভীষিকাময় উদ্বাস্তু জীবন। যে জীবনের গল্প তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকাররা। দীপেন্দ্রনাথের গল্পে তার চরম দৃষ্টান্ত মেলে।
সূচক শব্দ : উদ্বাস্তু, দেশভাগ, স্বাধীনতা, হাহাকার, খাদ্য, বাসস্থান, জীবন।

প্রদীপের তলায় অন্ধকার কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত হয় ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার স্বাদ, সেই সঙ্গে দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের ভয়াবহ যন্ত্রনাময় জীবন দেখে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। যখন এই তিনটি আবশ্যকীয় জিনিস সংগ্রহে অক্ষম হয়ে মানুষ বিবেক বুদ্ধি হারায়, তখন পশুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। ফলে ডাস্টবিনের খাবারের অধিকারের লড়াইয়ে কুকুরের কামড় খেতে হয়। নিশ্চিত জীবনের মোহে পাড়ি দিয়ে মোহভঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও বিবেক হারিয়ে ফেলেন মানুষ; তার সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প গুলিতে।

"চারটে মরাই, একটা গরু, তিনটে পুকুর এবং দুশ বিঘে দো-ফসলা জমি... শুধু কি তাই!... "[১] ন'বছরের সুবাসিনী উনত্রিশ বছরের সুবো ঠাইরান্ হয়ে গঙ্গা স্নানের সুযোগ ও বড়োদের অনুরোধ পায়ে ঠেলেছিলেন সংসার ও পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। পরবর্তীতে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগের ফলে সব ছেড়ে এক বস্ত্রে চলে আসতে হয় কলকাতায়। কয়েকদিন শেয়ালদার দুর্ভোগ কাটিয়ে আশ্রয় নিতে হল কলোনিতে। ছেড়ে আসা গোয়াল ঘরের চেয়ে শতগুণ খারাপ একটা বাড়িতে নয়জন মানুষের বাসস্থান হল। পরনের পোশাক ছাড়া পোশাক জুটলো না। ছোটোখাটো জমিদারি জীবন ছেড়ে রোজগারের পথ হয়ে দাঁড়ায় রাস্তাঘাটে চুরি চামারি করা। ইহকালের জীবন যতটা যন্ত্রনাময় হয়ে উঠছে পরকালের পাথেও সঞ্চয়ের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠছে। তেইশ বছরের ছেলে নিতাই শুধু জানতে চেয়েছিল পূর্ণ গ্রহণে "যাওয়া কি সঙ্গত হবে এখন? বউটা ভর পোয়াতি। পুতুল এখন তখন, তার মুখে জলই বা দেয় কে। কাশ রোগী বকুলের বুকেই বা হাত বুলিয়ে দেয় কে? বাচ্চাগুলোর ওপর নজর রাখার লোকই বা কোথায়?"[২] সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হয় না। বুড়ি হঠাৎ যেন খুব চালাক হয়ে বুঝে ফেলেছে জীবনের সারকথা কেউ কারো নয়। এতদিন দেশভাগ হওয়ায় তার মনে ক্ষোভ, ঘৃনা, বিদ্বেষ ছিল, আজ তার সবকিছু আশির্বাদ মনে হচ্ছে। "ভাগ্যিস দেশ দু-খানা হয়েছিল, ভাগ্যিস সে আসতে পেরেছিল কলকাতায়। নইলে এই সাপের বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে তীর্থ করা সম্ভব হত না কোনওদিনই।"[৩] বাড়ির কর্তার মধ্যে মর্যাদা বোধ জন্মে গেছে তাই "লক্ষ্মীপাশার লক্ষন মন্ডলের বউ হাঁটিয়া যাইবে এই খোলা পথে এত চক্ষের সামন?"[৪] সুবাসিনী চটে খাদ্য বস্ত্র জোটাতে না পারার খোঁটা দেয়, ভাত দিবার বেলা নাই, কিল মারার গোঁসাই প্রবাদে। কর্তার অবাধ্য হয়ে ছ'বছরের নাতি হর্ষকে নিয়ে স্নান যাত্রা করেন। গ্রহণ দানের সামগ্রী ও নাতির চুরি করে আনা শাড়ি পেয়ে খুশি হওয়ার মধ্যে দিয়ে খালি পেটে ধর্ম হয় না তার প্রমাণ লেখক 'গ্রহণ' গল্পের শেষে জানিয়ে দিয়েছেন। একটা বনেদি পরিবার কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তার নিখুঁত চিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

দেশ ভাগের আর এক অমানবিক দিক দেখতে পাই 'ডাক' গল্পে। শুধু বাংলাদেশের থেকে ভারতবর্ষে আসা উদ্বাস্তু নয় এদেশ থেকে যাওয়া মানুষের ক্লেদাক্ত জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। নির্ভয় জীবন, নিশ্চিত নিদ্রা, শান্তি ও সুখী গৃহের আশায় মইনুদ্দিনরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে দেশান্তরে। তিন দিনের যাত্রা পথে ঘটে যায় অনেক ঘটনা। ওসমান চাচার একটা পা কাটা থাকায় গতির সাথে মিল রেখে হাঁটতে না পারার অপরাধে টুপি টিপে মেয়ে ফেলে, হাঁপানি রোগী নতিব মিঞা শ্বাসকষ্ট বাড়ায় গাছের তলায় বিশ্রাম নেওয়ায় ও ঘুমিয়ে পড়ায় তাকে ফেলে চলে আসে, লক্ষ্মীপুরে শ্মশানের ধারে মৃত বাহকের দল ঘিরে ধরায় তের বছরের মেয়ে ফতেমাকে স্বেচ্ছায় তাদের মধ্যে এগিয়ে দিয়েছিল, দুমাসের শিশুর অবুঝ কান্নাকে থামানোর জন্য স্বামী গলা টেপার ভয় দেখায় স্ত্রীর, মা মেয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় পানির বদনা।

মইনুদ্দিনের পিতার হাতে খড়ি ঘটে বৃদ্ধ, সৌম্য, সদা প্রসন্ন শিক্ষক ভবতারণ চাটুজ্যের হাতে। যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছাত্র বড়ো করা, মানুষ করা। লেখকের ব্যঞ্জনায় "মরে গেছে তিনি, মরে গেছে লোকটা এখানকারই না জানি কোন দেশপ্রেমীর হাতে।"[৫] নির্ভয় জীবন, নিশ্চিত নিদ্রা, শান্তি ও সুখী মইনুদ্দিনের গৃহে কে থাকবে?

'মুক্তি' গল্পে নিতাই গাঁয়ের মোড়ল। সম্পন্ন চাষি, মান্যিগন্যি লোক। সাত পুরুষের জমি জিরাতে চাষ, গরু পালন করে স্বচ্ছল জীবন যাপন করার স্বপ্ন দেখে। শ্রীপুরের মান্যিগন্যি মন্ডল নিতাই; উন্মাদ হয়ে যায় সরকারি ক্যাম্পে বসে। অচেতন মনে বাড়ির কর্তাদের মতো ক্যাম্পে বসে সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ঘুম ভাঙিয়ে গৃহকর্ম করার নির্দেশ দেয় "দুয়ারে জল ছড়া দাও, বুধিটা যে হাম্বাইতাছে। তারে খাইতে দাও কিছু। আমার আবার চাষে যাইতে অইবে।....কে উত্তর দেবে?"[৬] ছোট ছেলের মতো অকারণে ছানার মতো দুহাতে কাদা মাখামাখি করতে , প্রতিদিন ধানের চারা কতটা বড়ো হলো কাঠি দিয়ে মাপ নিতে চায়। শেয়ালদা স্টেশনে থাকতে থাকতে পাগল নিতাই মন্ডল অবচেতন মনে অনেক স্বপ্ন দেখে। বৃষ্টিতে চাষ করবে, একটা মরাই বাড়বে, গোয়াল তুলবে দুটো, পীর সাহেবের থানে টিনের চাল তুলে দেবে। ছেলে চরণের সখ পুরনের জন্য নৌকা গড়িয়ে দেবে একটা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নৌকা নিয়ে চরণ দূর দেশে পাড়ি দেবে। উন্মাদ নিতাই চিৎকার করে করে গলা ভেঙে গেছে, কোটরের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। মুখ রাঙা, আলুথালু চুল, দেহটা সামনে ঝুঁকে পড়ছে তবুও-"আমার লাঙ্গল কই? আমার রাম রহিম বলদ কই? আমার বীজধান কই? ছাইড়া দাও, ছাইড়া দাও। এখন জমিতে লাঙ্গল না দিলে সব পন্ড অইব।আমারে যাইতে দাও কইলাম।"[৭]

রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যাওয়ায় এক পুলিশ কুৎসিত গালি দিয়ে ফুটপাত ধরে হাঁটতে বললে নিতাইয়ের বুকে বহু দিন পরে জেগে ওঠে শ্রীপুরের মন্ডলের তেজ। আক্রমনোদ্যত বাঘের মতো প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের উপর। পুলিশ প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়ে পরে বসচা না বাড়িয়ে লাঠি চালায়। লাঠির একটা ঘা মাথায় পড়ায় দুদিন পরে মারা যায় সর্বহারা পাগল নিতাই।

চরণের মাটির প্রতি কোনো টান ছিল না। শখ ছিল একটা ডিঙি নিয়ে কলকাতা, বিলাত সব জায়গায় ঘুরবে। ডিঙিতে দেবে পাল তুলে, হাতে নেবে বাঁশি। চরণ স্বপ্ন দেখে লক্ষ্যা নদী ছোট নয়, মহাসমুদ্র, যার কোনো কুল নেই, খালি নীল জল, মোল্লা চাচার মুখে শোনা হজ যাত্রার গল্প। চাষের প্রতি টান না থাকায় পিতা খাবার জোটানোর উপায় জানতে চাইলে চরণ জানায় খাবে না, একটা নাও বানিয়ে দিলে তাতে লাল শালুর পাল তুলে শুধু ভেসে বেড়াবো। নিতাইয়ের মৃত্যুতে চরণের অজানা অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দেওয়ার জন্য রাজপথে হেঁটে চলল। হঠাৎ রাজপথে বন্ধু সিরাজুলের সাথে দেখা হওয়ায় এখনকার অবস্থা জানতে গেলে ম্লান সূর্যের মতো হেসে

বলে-"দাঙ্গা, চরণ, হিন্দু-মুসলমানের কালিয়া।"[৮] ফিসফিস পরামর্শ ও বাঁচার ইচ্ছায় রাজপথ দিয়ে হাতে হাত রেখে দুজন এগিয়ে গেল দূরের, অজানা অনিশ্চিতের পথে।

'না' গল্পে আর একটা অন্য ঘটনা খুঁজে পাই। স্বশিক্ষিত মানুষের জীবনের যন্ত্রনা এখানে ফুটে উঠেছে। সঞ্জয় বামুন পন্ডিতের ছেলে হয়েও লেখাপড়া শিখতে চায়। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার আগেই অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক চলে গেছে, কলেজের পড়া ভালো লাগে না। তার যুক্তি কলেজের পড়াতে ডিগ্রি হয়, বিদ্যা নয়, তাই আধপেটা খেয়ে বাড়িতে বসে রাজ্যের বই এনে জ্ঞান আহরণ করে। প্রথাগত শিক্ষায় চার ঘন্টা বিদ্যার পাচন গেলানোর পরিবর্তে সারাক্ষণ সহচর্যে শিশুদের মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন সঞ্জয়। সেই জন্য অপরিসীম কৃচ্ছ্রসাধন এবং নিরীক্ষা চলে। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় ছোট্ট শক্তি দিয়ে মানুষ গড়ে তোলেন। স্রষ্টা হতে চান না, বাগানের মালি হতে চান।

সঞ্জয়ের এই কৃচ্ছ্রসাধনায় বলি হয় স্ত্রী সুরমার শেষ সম্বল চুড়ি ও ফুলশয্যার কাপড়ও বন্ধকের দোকানে ওঠে। এখানেই শেষ নয় শহর ও সভ্যতা থেকে অনেক দূরে একটা মাটির কোঠা বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী যখন সব ভুলে এক অসাধ্য সাধনায় মগ্ন "তখন কী এক বিষবাষ্পের প্রক্রিয়ার দেশ জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল। তার শিখা যখন ছাত্রাবাসের চালেও ঝাঁপিয়ে পড়ল"[৯] তখন গ্রামের অন্য মুসলমানদের কান্না মেশানো অনুরোধে দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয় সঞ্জয়।

ফলস্বরূপ চল্লিশ বিঘা জমি চোদ্দপুরুষের স্মৃতি দুশো টাকায় বিক্রি করে আসতে হল কলকাতায়, শহরের সবচেয়ে অভিজাত নার্সারি স্কুলে নিজের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা ও সিস্টেম সম্পর্কে ত্রুটির কথা ধরিয়ে দেওয়ার আগেই সেক্রেটারি মিস সেইন ডিগ্রি জানতে চায়। শেষ অপমান টুকু না করে ছাড়লেন না "অনাবশ্যকভাবে মিস সেইন আবার তাকে ডেকে বললেন, শুনুন? বাইরে যে বেয়ারাটা দেখলেন না, সেও ম্যাট্রিক পাস, ভদ্রলোকের ছেলে।"[১০]

দুমাসের ভাড়া বাকি পড়ল। পাঁচ মাস পরে বাড়িওয়ালা উকিলকে চিঠি দিয়ে নামি গুন্ডা কেশবকে পাঠিয়ে দেন। দুদিন সময় দিয়ে মদের বোতল হাতে নিয়ে টলতে টলতে বাড়ি যায়। অগত্যা মাসে ছ'টাকা ভাড়া দিয়ে বস্তিতে উঠতে হয়। মালি হওয়ার স্বপ্ন চিরদিন নিভে যায়, আধা উলঙ্গ ছেলে মেয়েদের কাদা মাখামাখি করে খেলা, ফেলে দেওয়া বিড়ির উচ্ছিষ্ট অংশ ছুটে এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায় বছর পাঁচেকের ছেলে। পরিচয় জিজ্ঞাসায় ভাসা ভাসা প্রায় পিঁচুটি বোজা চোখদুটো থেকে উত্তর দেয় তার বাবা করপোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। নাম? জয়দেব চ্যাটার্জি। শিশু, শিক্ষা, জাতি, ভবিষ্যৎ- সবকিছু ভুলে ডিগ্রির অভাবে যে থিসিস এতদিন সাবমিট করতে পারেননি। পচা কাগজের একরাশ বোঝা নিয়ে উদভ্রান্তের মতো সারারাত জেগে সঞ্জয় বসে থাকে।

'কান্না' গল্পে অবুঝ শিশুর গৌর, রূপকথার শহর কলকাতা দেখার জেদ করে কান্না; যেন উদ্বাস্তুদের দেশ ছেড়ে এপারে সুখে, শান্তি,স্বচ্ছলভাবে জীবনধারণ করার স্বপ্ন ভঙ্গের কান্না হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিবারন ওপার বাংলার হরিপাল স্কুলের মাস্টার ছিল। গ্রামের মানুষ তাকে সম্মান করতো, বড়ো বিদ্বান মনে করতো। স্কুলের প্রথম মাছ, ক্ষেতের প্রথম ফসল এনে ঠাকুমার হাতে দিত।কলকাতায় এসে গৌর দেখলো বাড়িওয়ালা গালি দিচ্ছে, পাশের ঘর থেকে তেল চাইতে গেলে বুড়ি তাড়িয়ে দিল। এখানকার সাহেবরা তার বাবাকে একটা চাকরি দেয় না, নিবারণ চাকরির খোঁজে বৈশাখ মাসে রৌদ্রে, গায়ে জ্বর নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভির্মি খাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বাড়িতে ফাটা বালিশ, ছেঁড়া কম্বল, পুরনো শাড়ি আর বাইরে ছেলেরা গালি দেয়, বিড়ি খায়, আমের খোসা, কাঁঠালের ভুতি আর চিংড়ি মাছের খোলা পচে বাতাসটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে। তাই পাঁচ বছরের হর্ষ দেশে ফিরে গিয়ে খোলা-ম্যালা বাড়ি, মাঠে মাঠে ঘুড়ি ওড়ানো, পুকুরে ওসমানের সঙ্গে সাঁতার, চাচার ভিটায় পীরের থানে সিন্নি খাওয়া ও দুধ ভাত খেতে চেয়ে ছোট ভাই নিতাইকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে। বাবার সঙ্গে রোজ স্কুলে যাবে, আর দুষ্টামি করবে না, সন্ধ্যা বেলায় মা তুলসী তলায় প্রদীপ দেবে, পড়া বলে দেবে। ঠাকুমার কাছে বসে চান্দ সদাগরের, রাজকন্যার, শিব ঠাকুরের, কলকাতার গল্প শুনবে। কলকাতার বস্তিতে বসবাস করে গৌর বারবার মায়ের কাছে কল্পনার কলকাতা দেখতে চায়। পিতা নিবারণকে প্রশ্ন করে "তমার সেই রূপকথার রাইজ্য কই, সাত মহলা বাড়ি কই? মন্ত্রী পুত্তুর, কোটালপুত্তুর, রাইজকন্যা গেলেন কোন্ হানে?"[১১] কলকাতার জাদুঘর, পর্দায় মানুষে কথা কয়, কল টিপলে আলো জ্বলে, পিঁ-গাড়ি চলে; সাত মহলা বাড়ি, ঘোড়াশাল, হাতিশাল, গঙ্গায় স্নান করলে সব পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে। স্বর্গে গিয়ে দুধের সাগরে দুধ, ক্ষীরের সাগরে ক্ষীর, জিলাপির পাহাড়ে জিলাপি খাওয়ার স্বপ্ন একমাত্র পাঁচ বছরের গৌরের একার নয়, এ স্বপ্ন ওদেশ থেকে সব ছেড়ে নিঃস্ব ভাবে বুকভরা আশা নিয়ে এদেশে পাড়ি দেওয়া সকল উদ্বাস্তুদের।

আসলে উদ্বাস্তু জীবন একটি অভিশাপ। স্বাধীনতায় সবার আনন্দ পাওয়ার কথা। কিন্তু স্বাধীনতার সাথে সাথে দেশভাগ সেই আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হলো। নেতৃবর্গরা নিজেদের ফায়দা ওঠালেও সাধারণেরা পড়লো বিপদে। নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের কিছু সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে, আর পাকিস্তানের কিছু হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে আসার তোড়জোড় শুরু করে দিলো। ফলে শুরু হলো তাদের বিভীষিকাময় উদ্বাস্তু জীবন। যে জীবনের গল্প তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকাররা। দীপেন্দ্রনাথের গল্পে তার চরম দৃষ্টান্ত মেলে।

এ প্রসঙ্গে জসীমউদ্দীনের 'বাস্তুত্যাগী' কবিতাটি স্মরণ করতে পারি-

"কার মায়া পেয়ে ছাড়িলে, এদেশ, শস্যের থালা ভরি,
অন্নপূর্ণা আজো যে জানিয়ে তোমাদের কথা স্মরি।"

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা অনিশ্চয় চক্রবর্তী, একুশশতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ মে ২০১৯, পৃ-১২
২. প্রাগুক্ত-১৩
৩. প্রাগুক্ত-১৩
৪. প্রাগুক্ত-১৪
৫. প্রাগুক্ত-৫৬
৬. প্রাগুক্ত-৭০
৭. প্রাগুক্ত-৭০
৮. প্রাগুক্ত-৭১
৯. প্রাগুক্ত-৭৪
১০. প্রাগুক্ত-৭৫
১১. প্রাগুক্ত-১০৫।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের প্রভাবে বাঁকুড়া জেলার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

সুমিলা খাতুন
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ,
সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি

সারসংক্ষেপ: কোন দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তাই কোন দেশের অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা শোষিত হলে সেই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধা পায়। ঠিক এইরকম ভারতের অর্থনীতি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও শাসন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতের অর্থনীতি, সম্পদ ও জনগণকে নিজেদের মতো শোষণ করেছিল ও ধ্বংস করেছিল। ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছিল। ভারতের অন্যতম প্রদেশ বাংলা ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীনে। ফলে বাংলার প্রতিটি জেলার অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ শাসকের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে বাংলার অন্যতম জেলা বাঁকুড়া অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত স্থাপিত হয়েছিল।এই ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে বার বার দুর্ভিক্ষের অভিঘাতের ক্ষতিগ্রস্ত প্রভাব পড়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯৪৩ এর সময়ে বাঁকুড়া জেলায় বারবার অনটন, খরা, বন্যা, স্বল্পবৃষ্টি ও ঔপনিবেশিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই জেলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে দুর্দশা ও দুর্গতি নিয়ে এসেছিল। এই গবেষণা পত্রটিতে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য বাঁকুড়া জেলার অর্থনীতির ওপর এবং জনজীবনে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অনাবৃষ্টি, খরা, অজন্মা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প।

বাঁকুড়া জেলা হল একটি কৃষি ভূমি অতীত কাল থেকে আজও পর্যন্ত জেলায় কোন উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর গড়ে ওঠেনি। তাই এই জেলায় অর্থনীতি মূলত প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর। কিন্তু কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হলেই ব্যাপক শস্যহানি ঘটত। ফলে জেলাবাসীর কাছে নিদারুন খাদ্যাভাব দেখা দিত। বাঁকুড়া জেলার জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশ কম হওয়ায় খুব সুফলন হলেও চাষীর হাতে এমন পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত থাকত না, যার দ্বারা খরার মোকাবিলা করবে। ফলে চাষিদেরকে অর্থনৈতিক দুর্দশার সম্মুখীন হতে হত। বাঁকুড়া জেলার মানুষকে এই অর্থনৈতিক দুর্দশার সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবলে মধ্যে জড়িয়ে পড়ত। এই গবেষণা পত্রটিতে ১৯০৮-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সময় ধরে খরাজনিত শস্যহানির ফলে কম বেশি ভয়াবহতাসহ অসংখ্যবার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল। এই

জেলায় যেমন, ১৯০৮, ১৯১৯-২১, ১৯২৫, ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩৩, ১৯৩৭, ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে। এই বছরগুলিতে বাঁকুড়ার মানুষের জনজীবনে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুর্দশার ছায়া নেমে আসত।

১৯০৮ সালে বাঁকুড়া জেলায় খরার ফলে জমিগুলি শুকিয়ে গেলে শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়নি। জেলায় আকাল পরিস্থিতি দেখা দেয় এই পরিস্থিতিতে চাষিরা আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে। কারণ এর এক বছর আগে ১৯০৭ সালে স্বল্পবৃষ্টির কারণে আমন ফসল আংশিক মার খায়। ভালো ফসল উৎপাদন না হওয়ায় ধানের দাম বেড়ে যায় দ্রুত হারে। ১৯০৮ সালে বর্ষা হলেও বৃষ্টি হয় খুব সামান্য পরিমাণে। এর ফলে আউশ ধান সামান্য উঠলেও জেলার দক্ষিনাংশের থানাগুলির আমন ধান পুড়ে ঝলসে যায়।ওই অঞ্চলে জুলাই মাস থেকে এক সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। ১৯০৮ সালে অনটনের তীব্রতা ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকে অতিক্রম করে যায়। দুর্গত অঞ্চলগুলির ৫৫০ বর্গমাইল এলাকার বহু মানুষ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এই অঞ্চলের মানুষ খাদ্য সংকটের পাশাপাশি আর্থিক দুর্দশায় কবলিত হয়ে পড়ে।

১৯০৮ সালের এই অনটন ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল-ভুমিজ-বাউরি ইত্যাদি জন সম্প্রদায়ভুক্ত খেটে খাওয়া লোকের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য তারা কায়িক শ্রম নির্ভর। সুতরাং খাদ্যশস্যের অনটন দেখা দিলে চাষের কাজে মন্দা দেখা দিত। তাই তাদের কর্মসংস্থানের রেখা নিম্নমুখী হতে থাকত। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময় এই শ্রেণীটিকে সবচেয়ে বেশি দুর্দশাক্লিষ্ট ও আর্থিক অনটনের মধ্যে ফেলেছিল। ফলে তারা আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য টেস্টরিলিফ ও বেসরকারি কাজে এসে জড় হত। তাছাড়া জেলার বৃহৎ অংশের মানুষ কাজের সন্ধানে চলে যেত পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে। তারা এই আর্থিক সংকট মেটানোর চেষ্টা করত। চরম সংকটকালেও তারা কখনো ত্রাণ সাহায্যের দাবিতে সোচ্চার হত না। তারা চেষ্টা করেছিল অর্থনৈতিক দুর্দশা প্রতিকারের জন্য। অন্যদিকে দেখা যায় ১৯০৩ সালে বাঁকুড়া জেলা ভারতীয় রেল মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের এই জেলা থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানির পথ সহজ হয়েছিল। এই সময় থেকে ধান চাল রপ্তানি আগের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে কৃষক সমিতির মেমোরেন্ডামগুলিতে রেলপথ নির্মাণকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রকাশ রায়ও রেলপথ নির্মাণ জনিত খাদ্যশস্যের রপ্তানিকে ভারত তথা বাংলার খাদ্যসংকটের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৯০৭ সালে কম উৎপাদন সত্বেও জেলা থেকে ৫২,৮০১ মণ চাল রপ্তানি করা হয়। তবে এর বিনিময়ে ১৭,৯৯৩ মণ মোটা চাল এই জেলায় আমদানি করা হয়। আমদানি-রপ্তানির এই ব্যবধান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই জেলায় খাদ্যসংকট ও আর্থিক দুর্দশায় কবলিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের কোন মাথা ব্যাথা ছিল না।

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস গবেষণা করতে গিয়ে দেখা যায়, একটা দুর্ভিক্ষ শেষ না হতেই আরেকটি দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হত। ১৯১৪ সালের অনিয়মিত বৃষ্টি ও অল্পবৃষ্টির ফলে ১৯১৫ সালের শুরু থেকেই বাঁকুড়া জেলার সর্বত্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ও অন্যদিকে ১৯১৫ সালের সামগ্রিকভাবে ফসল উৎপাদন না হওয়ার কারণে এই দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠলেও এর এক বছর আগে থেকেই জেলার শস্য উৎপাদন ঘাটতির সংকেত মিলেছিল। শস্য উৎপাদনের মাত্রারিক্ত হ্রাস ও অব্যাহত রপ্তানি একত্রিত হয়ে খাদ্যশস্যে মারাত্মক ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল। ফলে চাষী মাত্র কয়েক মাস আগে যে দামে খাদ্য বিক্রয় করেছিল তার দ্বিগুণ দামে তাকে ক্রয় করতে হয়েছিল। বস্তুত অনাবৃষ্টি জনিত শস্যহানি ও খাদ্যশস্যের রপ্তানির চাপে টাকার ক্রয় ক্ষমতার ক্রমাবনতি যে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তা সহজে বোঝা যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ এড়িয়ে গেলেও ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বাংলায় তথা বাঁকুড়া জেলায় অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা যায়। ১৯১৯ সালের ফেমিন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অর্থের অভাবে বাঁকুড়ার মানুষ চাল কিনতে না পেরে খিদে মেটাতে অনেকে কাঁচা মহুয়া ও তেঁতুলের বীজ সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটিয়েছে।

১৯১৮-১৯ সালে দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল মূলত ঔপনিবেশিক সরকারের যুদ্ধকালীন ক্রিয়াকলাপের ফলে। ১৯১৮ সালে ঔপনিবেশিক সরকার দুর্ভিক্ষের সময় দেয় কৃষি ঋণগুলি আদায় করে নেয় কড়ায় গন্ডায়। সম্পন্ন কৃষকবর্গ ও বৃহৎভূমধ্যকারীদের উপর ততটা কষ্টকর না হলেও সীমিত আয়ের মধ্যবর্গ কৃষক ও ভাগচাষী, স্বল্প জোতদার মালিকের উপর প্রচন্ড আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। কারণ ১৯১৮ সালে ধানের উৎপাদন এমনিতেই কম হয়েছিল, তার উপর রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারি আদায়েও কোনো রকম ছাড় দেওয়া হয়নি। সেই সঙ্গে যুদ্ধকালীন আর্থিক টালমাটাল অবস্থান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলের মূল্য আকাশ ছোঁয়া করেছিল। ১৯১৮ সালের জুন মাসে যেখানে টাকা প্রতি ১২ সের চাল মিলত, অক্টোবর মাসে তা ৭ সেরে দাঁড়ায়। এই সময় কেরোসিন ও সরিষার তেলের মূল্য ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রম মূল্য বাড়েনি। উপরন্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে রেল পরিবহনকে যুদ্ধ সামগ্রী চলাচল করার ক্ষেত্রে মুখ্যত সংরক্ষিত করা হয়। ফলে কাঁসা, পিতল তামাসহ বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা একাধিক স্থানীয় শিল্পগুলি কাঁচামাল সরবরাহের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে স্থানীয় বস্ত্রশিল্পগুলি তৈরি সামগ্রী রপ্তানিতে বাধা পেলে নিয়োজিত শিল্পী শ্রমিক কর্মচুত্য হয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলেও কর্মসংস্থান ব্যাপক হারে কমে যায়। সরকার বিকল্প কর্মসংস্থান দেওয়ার জন্য যেমন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। অন্যদিকে সরকার অগ্নিমূল্যকালে কালোবাজারি, মজুতদারি রদ করে ন্যায্যমূল্য খাদ্যবস্তুর সুবন্টনের কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

এইরকম অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখে বাঁকুড়া জেলার সংবাদপত্রগুলি বাঁকুড়া থেকে চাল, ধান সহ বিভিন্ন খাদ্য বস্তু আমদানি ও রপ্তানি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করতে

থাকে। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার বাঁকুড়া জেলা থেকে খাদ্য রপ্তানি বন্ধ করেননি। ক্রমশ এই রপ্তানি হার বাড়তে থাকে এবং পরবর্তীকালে বাঁকুড়াকে দুর্ভিক্ষ ঘোষণার সময় সর্বাধিক পরিমাণ যথা, ৯১,২৭২ মণ চাল ও ৩৮, ৭১২ মণ ধান রপ্তানি করা হয়। এই রপ্তানির কাজে যে চারটি ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস রত ছিল তার মধ্যে বামারলরী কোম্পানি ছিল প্রধান। সরকারি আমলাদের এই রপ্তানির কাজে উদাসীনতা ও তা বন্ধ করতে না পারায় বাঁকুড়ায় সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক দুর্দশা ও খাদ্যাভাব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

১৯১৮ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা গাইড সরকার রপ্তানি নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ওই একই দিনে বঙ্গবাসী বাঁকুড়ায় তীব্র খাদ্য সংকটের ও মহামারীর কথা প্রকাশ করে। দরিদ্র অসহায় মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দুর্বল শরীর সহজেই অসুখের শিকার হয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে জলকষ্ট দেখা দেয় বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রায় সর্বত্র। দূষিত জল ও অপুষ্টিতে ক্লীষ্ট সাধারণ ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি ইত্যাদি অসুখের শিকার হয় ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বসুমতি রোগক্লিষ্ট অপুষ্ট মানুষজনের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থার আয়োজন করে। অবিলম্বে বাঁকুড়াকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিল। ১৯১৮ সালে বাঁকুড়ায় যে খাদ্যে টান পড়ার জন্য দুর্ভিক্ষ ঘটেনি, সেটা বিভিন্ন তথ্যের পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। দুর্ভিক্ষের সর্বাপেক্ষা দুর্দশায় পড়ে সীমিত আয়ের সাধারণ মানুষ ও শ্রমি, কৃষকরা। দ্রব্যমূল্যের উচ্চতর ও মজুতদারি এবং খাদ্য রপ্তানি অচিরেই বাঁকুড়াকে ঠেলে দেয় দুর্ভিক্ষে। অপুষ্ট, রোগক্লিষ্ট দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মহামারীর কবলে পড়েছিল। তাদের একমাত্র পুঁজি শ্রমশক্তির বিনষ্ট হয়। ফলে অর্ধাহারে ও অনাহারে শয়ে শয়ে মৃত্যু ঘটতে থাকে। সরকার এই সমস্ত মৃত্যুকে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে চালানোর চেষ্টা করে। এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারির ফলে বাঁকুড়া জেলায় এক ব্যাপক অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

১৯২৫ সালেও বাঁকুড়া জেলায় অনটন দেখা দেয় অল্পবৃষ্টির জন্য। বাঁকুড়া যেহেতু কৃষি প্রধান জেলা এবং এই জেলার অর্থনীতি বেশিরভাগ কৃষি নির্ভরশীল। ফলে অল্পবৃষ্টির কারণে জেলায় কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। ধানের জমি শুকিয়ে যায়। ফলে চাষিরা ফসল উৎপাদন করতে পারেনি। এই অনাটন দেখা দিয়েছিল জেলার সদর মহকুমার দক্ষিন-পশ্চিমাংশে থানাগুলির ৭৪৩ বর্গমাইল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাসীর ভাষায়, "এবারও বাঁকুড়ায় অন্ন কষ্ট হইয়াছে"। এই সমস্ত দিকগুলি বিচার করে দেখা যায় জেলায় সব সময় দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য ও আর্থিক দুর্দশা লেগেই থাকত বাঁকুড়া মানুষের জীবনে।

১৯৩৫-৩৬ সালে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জেলা কালেক্টর বর্ধমান বিভাগের কমিশনের কাছে যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন তা থেকে জানা যায়, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিন বছরে শস্য উৎপাদন ভালো হলেও বিপত্তি আসে ১৯৩৪ সাল থেকে। অল্প বৃষ্টির কারণে এই বছর সদর মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চল ছাড়াও বিষ্ণুপুর মহকুমার ইন্দাস

থানার অধিকাংশ জমিতে কৃষকেরা ফসল রোপন করতে পারেনি। কৃষকদের এই অনটন পরিস্থিতির সাথে ১৯৩৫ সালে জেলার দক্ষিণাংশে অনাবৃষ্টি এবং উত্তরাংশে দামোদর নদীর বন্যা যুক্ত হলে জেলায় ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে জেলায় ব্যাপক অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা যায়। অর্থের অভাবে কৃষকরা চাল কিনতে না পারায় অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এর ফলে সরকার জেলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করে। এই দুর্ভিক্ষের প্রভাবে বাঁকুড়া জেলার বহু মানুষ গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকায় সদর মহকুমার শস্যহানির কারণ হিসেবে অনিয়মিত বৃষ্টিকেই দায়ী করা হয়। বাঁকুড়া জেলার কালেক্টর বলেন যে, জেলার ৭০ শতাংশ মানুষ হল শ্রমিক ও বর্গাদার সম্প্রদায়ভুক্ত। যারা কেবলমাত্র খেয়ে পরে নামমাত্র বেঁচে থাকত। সুফলনের সময়েও তাদের কোন সঞ্চয় থাকত না।। সবসময় তারা আর্থিক দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাতো। সচ্ছলতা কখনোই তাদের জীবনে ছিল না। এমনকি তিনি আরও বলেন যে, উৎকৃষ্ট জমিগুলি কিছু সংখ্যক ভূস্বামীর হাতে রয়েছে। আর বেশিরভাগ খারাপ জমিগুলি রয়েছে দরিদ্র কৃষকদের হাতে। সে কারণে অজন্মার সময়ে তারা অতি সহজে খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়ত। এমনকি দুর্ভিক্ষের সময় তাঁতিরাও মারাত্মক দুরাবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে মজুত শস্য রাখা হয়েছিল। সরকার প্রয়োজনে অধিক দামে চাল ক্রয় করেন রানীগঞ্জ, আরামবাগের কালীপুর থেকে। সরকার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে প্রচুর চাল মজুত করেছিল, এর বিনিময়ে উড়িষ্যা থেকে কিছু মোটা চাল এই জেলায় চালের আমদানি হয়। সিভিল সাপ্লাইয়ের সহযোগিতায় মিল মালিক, মজুতদার ও আড়তদারেরা গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ চাল শ্রমিকদের জন্য মজুরের দোহাই দিয়ে তা গুদামজাত করে চাউলের ফাটকা খেলায় রত হয়েছিল। ফলে এই অঞ্চলের চাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। ন্যায্য দামে খোলা বাজারে চাল পাওয়া যায়নি। কোন কোন অঞ্চলে মিললেও দাম হয় টাকায় এক সের। অর্থের অভাবে চাল কিনতে না পারায় খাবারের সন্ধানে গ্রাম থেকে দলে দলে অন্নহীন মানুষ জেলা শহরে ভিড় জমায়। ১৯৪৩ সালের ১৬ই নভেম্বর 'বাঁকুড়া দর্পণ' লেখে "শহরের দিন দিন ভিখারীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। পল্লী অঞ্চল হইতে বাঁচার জন্য ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে শহরে বহু লোক আসিতেছে কিন্তু বাঁচার পরিবর্তে অধিকাংশ ভিখারী তাদের ছেলে মেয়েদের হারিয়েছে তারা চায় শুধু বেঁচে থাকার মতো খাদ্য দিন আনতে একবার তাও কি তারা পাওয়ার অধিকারী নয়"। অর্থাৎ এই চিত্র দেখে বোঝা যায় বাঁকুড়া জেলায় চরম আর্থিক দুর্দশা দেখা যায়। ফলে বহু মানুষকে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলায় এই দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যতার জন্য বাঁকুড়া জেলার তাঁতিরা আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে। তাদের শিল্পগুলি মার খায়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ও'ম্যালি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এ জেলায় কার্পাস শিল্প গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। তিনি লিখেছেন তখনো জেলার অধিকাংশ স্থানে কাপড় বোনা হত। কিন্তু সেই মোটা কাপড় ও বাজার

হারিয়ে ফেলেছিল। এর কারণ হল ইংল্যান্ডের কারখানাজাত সস্তা দরের কাপড়ের ব্যাপক আমদানি। স্বদেশী আন্দোলন বাঁকুড়া জেলায় এই কুটির শিল্পটিকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করতে পারেনি। কারণ এই জেলায় জনগণের দেশীয় কুটির শিল্পে উৎপাদিত বস্ত্র ব্যবহারের জন্য কোন রকম আগ্রহ ছিল না। দুই দশকের মধ্যে দেশীয় মোটা কাপড়ের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণ হয়তো ছিল, এই জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও আর্থিক দুর্দশা। এর ফলে তাঁত শিল্পগুলিতে ভাঙ্গন ধরেছিল।

বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের ভূমিকাও ছিল খুবই কম। কারণ এ জেলায় বাণিজ্যের ধারা ছিল খুবই ক্ষীণ। মোটেই খরস্রোতা ছিল না।ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকগণই প্রকৃত অর্থে ছিল একটি ক্ষুদ্র সংখ্যাল্প গোষ্ঠী। তাই ব্যাপকতা ও গভীরতার বিচারে বাণিজ্য জেলার অর্থনৈতিক জীবনকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারেনি। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিষ্ণুপুরের প্রাচীনত্ব ও খ্যাতি ঐতিহাসিক। এদিক থেকে সোনামুখী ও যেমন ছিল পুরোনো, তেমনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী, বাঁকুড়া ছিল অর্বাচীন।

১৯০৮ সালে ও'ম্যালি এই তিনটি শহরকে “Unprogressive of little Commercial importance and on the whole distinctly rural in character” বলে অভিহিত করেছেন। অতএব দেখা যায় যে জেলার শহরগুলি ছিল প্রগতি মনস্কতাও বাণিজ্য গুরুত্বহীন ও সুস্পষ্টভাবে গ্রামীণ প্রকৃতি আবেশিত। সুতরাং বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা সামগ্রিকভাবে চিরাচরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভ্যাস, রীতিনীতি ও নিয়মকানুন থেকে অর্থবহভাবে সরে আসতে পারেনি। তাই বাঁকুড়ার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের প্রভাব ছিল সীমিত।

বাঁকুড়া জেলায় আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল বাঁকুড়া জেলার নিম্নশ্রেণীর মানুষ। বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে শস্য, অর্থ, পণ্য বহির্গমনের ফলে এই জেলার মানুষের জীবনে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের ছায়া ফেলে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মহাজনদের শোষণ ও প্রতারণা এবং বাকী খাজনা ও ঋণের দায়ে জমিচ্যুত হয়েছিল বাঁকুড়ার বহু মানুষ। উচ্চতর স্তরেও দারিদ্র্যের কারণ ছিল সামাজিক অত্যাচার। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ছেলে মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম গৃহস্থরা গ্রামের চাপে সামাজিক বয়কটের ভয়ে ব্যয় বহুল ভোজের আয়োজন করতে বাধ্য হত জমি বিক্রি করতে। জমি কিনে নিত সমাজপতিগণ বা মোড়লরা। সুতরাং দেখা যায় বাঁকুড়া মানুষের জীবনে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্যের ফলে আর্থিক দুর্দশায় কবলিত হয়ে পড়ত। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় ১৯০০ থেকে ১৯৪৩ সালের সময়কাল ধরে বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতার প্রভাবে জনজীবনে অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র লক্ষ্য করা যায় এবং এই দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতার থেকে মুক্তির জন্য অনেকে গ্রাম ত্যাগ করেছে পরিবার ও পরিজনদের নিয়ে। আবারও অনেকে চা বাগিচায় শ্রমিকের কাজ করে তাদের আর্থিক দুর্দশা প্রতিকারের চেষ্টা করেছে। নিম্ন পরিবারের মেয়েদের নিম্ন মজুরির সম্পন্ন কৃষক

খেতমজুর বিশেষ করে সাঁওতাল, বাউরি, ডোম মানুষের জীবনে দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুর্দশা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। দারিদ্র্য ও আর্থিক দুর্দশা নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা স্থান করে নিয়েছিল। বহু শিল্পী ব্যবসায়ী উচ্চতর শ্রেণির মানুষেরা আর্থিক দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল। তারা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল চাষিদের বারবার শস্যহানি, অজন্মা, খরা ও দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। ফলে তাদের জীবনে খাদ্যাভাব ও দরিদ্র্যতা, অর্থের অভাব লেগেই থাকত। এছাড়াও একটা দুর্ভিক্ষ শেষ না হতেই আর একটা দুর্ভিক্ষ আসার পরে বাঁকুড়ার মানুষের জীবনই চিরন্তন হয়ে উঠেছিল দারিদ্র্য ও আর্থিক দুর্দশা।

তথ্যসূত্র:

১. F. W Robertson, Ibid, p-12.
২. Final Report on Famine Relief Oparation (No. 1523 G dt. 30.10.1908) from the Bankura Collector to the Burdwan Divisional Commissioner.
৩. বদরুদ্দিন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃষক, চিরায়ত প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫০।
৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা- ১৭৯।
৫. Letter from Bankura Collector to the Commissioner of Burdwan Division, No, 1523 G.
৬. Final Report on Famine Relief Operation in the District of Bankura in 1919, Alipore, 1936, P-8.
৭. Final Report on the Suevey and Settlement Oparations in the District of Bankura 1917-24: Robertson. P. 19.
৮. RABUR, pp. 37-38 Ibid.
৯. Letter of D. M, op. Cit.
১০. Final Report on the Famine Relief Oparations, op. Cit. Statement -D, P-75.
১১. Biswarup Goswami, op. Cit.
১১. Dainik Basumati, 18 February, 1919 RNP, weekeending, 1st march. 1919.
১২. RABUR, pp. 37-38.
১৩. বিবিধ প্রসঙ্গ "বঙ্গে দুর্ভিক্ষ, বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ" প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দে, পৃ. ৭৪১ এবং ৭৪৩।

১৪. Letter from Bankura Collector to Commissioner of Burdwan Division, Letter no, 2012 R. Dated 3rd April, 1937, (BDCRR)

১৪. বাঁকুড়া দর্পণ, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪।

১৫. বিবিধ প্রসঙ্গ, "বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ" প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা -১০।

১৬. পল. গ্রীনো, আধুনিক বাংলার সমৃদ্বি ও দারিদ্র্য: দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪, কে. পি. বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১০৪।

বৌদ্ধ আখ্যান 'কাঞ্চনমালা': প্রতিহিংসা বনাম প্রেম

সুকন্যা চতুর্বেদী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রতিহিংসা মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে একটি। ছেলেবেলা থেকে অনেকের মধ্যেই এই প্রবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে এই ভাবের নিরসন না ঘটাতে পারলে পরবর্তীতে অনেকক্ষেত্রেই তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। বর্তমান সময়ের একপ্রকার সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে খুন, জখম, রাহাজানি; অ্যাসিড অ্যাটাক এই সামাজিক অবক্ষয়ের সাম্প্রতিকতম সংযোজন। আমরা অনেকেই আমাদের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফারাক বুঝতে অক্ষম। মূলত এই অক্ষমতা থেকেই ক্ষোভ, আর সেই ক্ষোভ থেকেই এই নীচ প্রবৃত্তি। আমার আলোচ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'কাঞ্চনমালা' এই প্রেক্ষাপটে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র কুণালের প্রতি তারই বিমাতা তিষ্যরক্ষার অবৈধ আকর্ষণ কীভাবে সাম্রাজের সর্বনাশ করেছে, তার উপাখ্যান এই কাহিনি। অন্যদিকে সৎ পথে থেকে সকল কামনা-বাসনাকে জয় করে ধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র কাঞ্চনমালা এবং কুণাল। মূলত বৌদ্ধ অবদানকল্পের কাহিনিকে উপজীব্য করে ঔপন্যাসিক শাস্ত্রী মহাশয় কাহিনি বুনন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এই উপন্যাস প্রথম বৌদ্ধ প্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাস হিসাবে মর্যাদার দাবী রাখে।

সূচক শব্দ : শঠতা, লোভ, কামনা, ঈর্ষা, প্রীতি, ধর্ম।

মূল প্রবন্ধ :

বাঙালির ইতিহাসকে তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যিনি প্রায় হাজার বছরের ব্যাপ্তি দান করলেন চর্যাপদের পুথি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর এই আবিষ্কারে একদিকে যেমন উঠে এল চর্যা রচনার সমকালীন সমাজচিত্র, একইসঙ্গে আমরা জানতে পারলাম বৌদ্ধ সহজযানীদের সাধনার একাধিক গূঢ় তত্ত্ব, সাধন পদ্ধতি। একবার নয়, একাধিকবারের প্রচেষ্টায় নেপালের রাজদরবার থেকে শাস্ত্রী মহাশয় এই অমূল্য পুথি সংগ্রহ করেন। চর্যার আবিষ্কার শুধু বাংলা সাহিত্যই নয় বরং গোটা ভাষার ইতিহাসকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। চর্যার আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি হলেও মেধাবী শাস্ত্রী মহাশয়ের ছেলেবেলা এবং কর্মজীবনও ছিল বেশ ঘটনাবহুল। ১৮৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর নৈহাটির

প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য পরিবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুরাণের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক স্কুলজীবন থেকেই। প্রথম প্রবন্ধ লেখার বিষয়টিও ছিল খানিকটা পুরাণ ঘেঁষা। 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখা তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই পুরাণকে কেন্দ্র করে। প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি উপন্যাস রচনাতেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন অন্য ধারার একজন লেখক। তাঁর কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে এমনই ব্যতিক্রমী দু'টি উপন্যাস। ব্যতিক্রমী এই কারণেই কথাসাহিত্যে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ প্রথম তাঁর হাত ধরেই। বৌদ্ধ পুথি নিয়ে যাঁর গবেষণা, তাঁর উপন্যাসে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ যে থাকবেই একথা অস্বাভাবিক নয়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনায় ভারতের রাজকাহিনি উঠে এসেছিল, সেখানে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গও ছিল, কিন্তু বৌদ্ধদের ন্যূনতম প্রসঙ্গও কখনও আসেনি। ফলে উপন্যাসের কাহিনি বুননের প্রধান উপজীব্য 'বৌদ্ধ ধর্ম' একথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া একপ্রকার অকল্পনীয়। তাঁর 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে প্রথম বৌদ্ধদের প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রায় তেত্রিশ বছর আগে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল।

'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের কাহিনির মূল উপজীব্য কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থ 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'-থেকে গৃহীত। সংস্কৃত এই বইটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস। যার কয়েকটি খণ্ড পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অনুবাদের তৃতীয় খণ্ডের একটি অংশে 'কুণাল অবদান'-ই উপন্যাসের মূল সূত্র। উপন্যাসের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে শরচ্চন্দ্র দাস অনুদিত 'কুণালাবদান' কাহিনির সংক্ষিপ্তসার খানিকটা এইরকম—

কাহিনি শুরু হয়েছে রাজচক্রবর্তী সম্রাট অশোকের প্রসঙ্গ দিয়ে। কামাসক্ত, প্রচণ্ডস্বভাব রাজা ধর্মসাধনার মধ্য দিয়ে পুণ্যবান হন। অশোকপত্নী অসামান্যা রূপসী সম্রাজ্ঞী পদ্মাবতী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলে পুত্রটিও মাতৃসদৃশ রূপবান হয়। শিশুপুত্রের চোখদুটি হিমালয়ের কুণাল নামক এক বিশেষ হাঁসের মতো অপূর্ব সুন্দর হওয়ায় রাজপুত্রের নাম হয় কুণাল। যৌবনে রূপবতী কাঞ্চনমালার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিছুদিন পর এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা স্থবির কুণালের অনন্য চক্ষুদ্বয় বিনাশের মধ্য দিয়ে কুণালের দুঃখময় পরিণামের কথা বলে সতর্ক করেন। জনসাধারণ এই চোখ দেখেই ভ্রষ্ট হয়। নীলোৎপল পাতার মতো মায়াবী এই চক্ষুদ্বয় অনুরাগরূপে সর্পবিষের মতোই সকল ইন্দ্রিয়কে বিনষ্ট করে। চোখের 'পরে আস্থা ত্যাগ করলেই সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি মেলে। যারা সুশীল স্বভাবে অতিরিক্ত লালসা পরিত্যাগ করে, তারাই প্রকৃত সত্ত্বশালী এবং ধীর। কুণাল এইসকল কথা শুনে সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজের গন্তব্যে চলে যায়।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গিয়ে বসন্তকাল উপস্থিত হলে কুণাল একান্ত মনে স্থবিরের সেইসব কথা চিন্তা করতে থাকে। এমন সময় অকুস্থলে কুণালের বিমাতা

রাজপত্নী তিষ্যরক্ষা উপস্থিত হয়। কুমতি দুঃশ্চরিত্রা তিষ্যরক্ষা কুণালের চোখের প্রশংসা করার ছলে তাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে। কামতাড়িত এই রাজপত্নী তিষ্যরক্ষা কুণালকে অত্যন্ত অশ্লীল কামোত্তেজক বাক্যে প্রলুব্ধ করতে চায়। কিন্তু সৎচরিত্র, আদর্শবান পুরুষ কুমার কুণাল এসব হীন কথাবার্তায় নিজেকে পাপবোধে বিদ্ধ করে। বিমাতাকে সৎ পথে থাকতে অনুরোধ জানায়। কুণালের সুপরামর্শে তিষ্যরক্ষার কুমনোবৃত্তি আরও বেড়ে গেল। তিষ্যরক্ষা কুণালকে বলে সে কুণালের প্রণয় প্রার্থী। এমতাবস্থায় তিষ্যরক্ষাকে ত্যাগ করলে তা কুণালের মতো দয়াবান পুরুষের কাছে অধর্মের সমান। এরূপ আপত্তিকর কথা শুনেও কুমার কুণাল বিমাতাকে ধর্মের কথা শোনায় এবং পাপচিন্তা দূর করতে অনুরোধ জানিয়ে চলে যায়। এই ঘটনায় তিষ্যরক্ষা কুণালের প্রতি যার-পর-নাই ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয় এবং কুণালের চক্ষুদ্বয় বিনাশ করে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওার পরিকল্পনা করে সেই স্থান পরিত্যাগ করে।

এই ঘটনার কিছুকাল পর রাজা অশোক কুমার কুণালকে তক্ষশিলা জয়ের জন্য পাঠান। কুণাল বীরত্বের সঙ্গে সেই যুদ্ধজয় করে রাজার ন্যায় বেশ কিছুদিন রাজ্যশাসন করতে লাগল। অনেকদিন সম্রাট পুত্র কুণালকে না দেখায় তার মন কুমারের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এবং এই অতিরিক্ত চিন্তায় সম্রাটের কঠিন অসুখ দেখা দেয়। অনেক চিকিৎসার পরও রাজার স্বাস্থ্যের কোনরকম উন্নতি দেখা যায় না। রাজবৈদ্য জানায় ধর্মোপদেশ শোনা এবং রাজার প্রিয়পাত্রকে তার কাছে নিয়ে আসাই একমাত্র পথ্য। এমতাবস্থায় রাজা কুমার কুণালকে রাজ্যে ফিরিয়ে ভবিষ্যৎ সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত করার কথা জানান। রানী তিষ্যরক্ষা রাজাকে মন্ত্রণা দেয় পুত্রকে এখনই রাজ্য দান নয়। কারণ রাজকুমার রাজা হলেই সে দাম্ভিক হয়ে উঠবে। তিষ্যরক্ষা এরপর একই রোগ-লক্ষণযুক্ত এক আভীরকে হত্যা করে নাভি উৎপাটন করে সেখানে পেঁয়াজের রসে একটি বিশালাকার কৃমিকে মেরে রাজার রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি পরীক্ষা করে।

তিষ্যরক্ষার এই অসামান্য চিকিৎসাগুণে রাজা অত্যন্ত খুশি এবং কৃতজ্ঞতাবশত সাতদিনের জন্য তিষ্যরক্ষাকে রাজকার্য পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব দেন। তিষ্যরক্ষা শাসনভার পেয়ে তক্ষশিলাধিপতিকে উপঢৌকন সহ একটি চিঠি পাঠায়। চিঠির মর্মার্থ এইরকম— সম্রাট অশোকের শঠ, অপবিত্র, চরিত্রহীন পুত্র কুমার কুণালকে রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তের দোষে চক্ষুদ্বয় উপড়ে নিয়ে, উলঙ্গ করে তক্ষশিলা নগর থেকে বিতাড়িত করা হোক। কিন্তু তক্ষশিলা অধিপতি কুঞ্জরকর্ণ কুণালের প্রতি প্রীতিবশত এহেন নিষ্ঠুর কাজ করা থেকে বিরত থাকতে চাইলেও কুণাল পিতৃআজ্ঞাকেই শিরোধার্য করে এই নিষ্ঠুর অমানবিক চক্রান্তে নিজেকে আহুতি দেয়। বিমাতা তিষ্যরক্ষার নীচ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কুণালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চোখদুটি নষ্ট হয়। রাজা কুঞ্জরকর্ণ

রাজাজ্ঞা পালনে একপ্রকার বাধ্য হয়েই নগরের এক লোভী নির্দয় ব্যক্তিকে কুণালের দণ্ড কার্যকর করতে বলে। কুণাল ব্যক্তিটিকে স্বর্ণ তথা সম্পদের লোভ দেখালে ব্যক্তিটি কুণালের চোখ দুটি উপড়ে নেয়। হাতির পদপিষ্টে পদ্মফুলের যেমন পরিণতি হয়, চোখ হারিয়ে কুণালের অবস্থাও একইরকম হয়ে যায়।

কুণাল যখন রাজ্যজয়ে বেড়িয়েছিল, তখন কুণালের প্রিয়তমা পত্নী কাঞ্চনমালাও তার সঙ্গে ছিল। কাঞ্চনমালা তার স্বামী কুণালকে এই অবস্থায় দেখলে সেখানেই জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফেরার পর কাঞ্চনমালা পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকতে থাকে। কিন্তু ধীরস্বভাব কুণাল কাঞ্চনমালাকে আশ্বস্ত করে বলে ধৈর্য ধরতে। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, সংসারের নিয়মই তাই— এধরণের নানা কথা বলে সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়। প্রয়োজনে অন্ধ কুণালকে ত্যাগ করে স্ত্রীকে সে চলে যেতেও বলে। কিন্তু উপযুক্ত সহধর্মিণীর মতোই অন্ধ কুণালকে পরিত্যাগ না করে স্বামীর যষ্টি হয়েই থাকতে চায়। কাঞ্চনমালা কুণালের পা ধরে অনুনয়-বিনয় করলে কুণাল তাকে নিজের সঙ্গে থাকার সম্মতি দেয়।

কলাবিদ্যা নিপুণ কুণাল কিছুদিন গান গেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে ক্রমে পিতার রাজধানী পাটলিপুত্রে এসে পৌঁছায়। ক্লিশ জীর্ণ চেহারার কুণালকে দেখে কেউই চিনতে পারল না। নগরের বাসিন্দারা গালমন্দ করে তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কুণাল হাতিশালায় এসে উপস্থিত হলে গজরাজ প্রভুকে চিনতে পেরে গর্জন করতে লাগল। উপস্থিত সকলের বুঝতে বাকি রইল না যে এই জুবক ক্ষাত্রবংশীয় কোনো পুরুষ। হাতিশালায় আশ্রয় পাওয়ার পর মাঝরাতে মাহুতেরা ক্লান্ত কুণালকে ঘুম থেকে ডেকে গান গাওয়ার জন্য বলে। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মনে গানের মধ্য দিয়ে নিজের বৃত্তান্ত জানায়। পুত্রের চিন্তায় মগ্ন রাজা সেই রাতে হঠাৎ জেগে উঠে নানারকম আশঙ্কার কথা ভাবতে লাগলেন। কুণালের গানের মৃদুস্বর সম্রাটের কানে পৌঁছালে তিনি রাজ অমাত্যকে পাঠান নিজ পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কুণাল প্রাসাদে প্রবেশ করা মাত্র সম্রাট অন্ধ পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখে সংজ্ঞা হারান। জ্ঞান ফিরলে সম্রাট শোকবিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে থাকেন এবং পুত্রের এরূপ করুণ পরিণতির কথা জানতে চান। কুণাল সবিস্তারে সম্রাটকে সেই চিঠি এবং চক্ষুনাশের সকল বৃত্তান্ত জানায়। রাজা-কুণালের কথোপকথনের পর নিজ সত্যনিষ্ঠা বলে কুণাল দৈবিকভাবে তার দুটি চোখ পুনরায় ফিরে পায়। সম্রাট এই ঘটনায় আনন্দিত উৎফুল্ল হয়ে কুণালকে তৎক্ষণাৎ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন।

অতঃপর সম্রাট রানী তিষ্যরক্ষার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করলেন, তক্ষশিলা অধিপতির বিরুদ্ধেও তৎপর হন। ভিক্ষুগণ সঙ্ঘস্থবিরকে কুণাল বৃত্তান্তের কারণ জিজ্ঞেস করলে স্থবির জানায় গত কয়েক জন্মের কর্মফল কুণাল এজন্মে ভোগ করেছে। পূর্ব কয়েক জন্মে সে কখনো ছিল ব্যাধ, কখনো বা শ্রেষ্ঠীপুত্র। সেই পূর্বজন্মের

কৃতকর্মের ফলেই তাকে নিজের চক্ষুনাশের দ্বারা পাপক্ষয় করতে হল। কাহিনির শেষে স্থবির জানান কালক্রমে নিজ পুণ্যবলে কুণাল সংবুদ্ধত্ব প্রাপ্তিলাভ করবেন।

এই তো গেল অনুদিত কাহিনির সংক্ষিপ্তসার তবে 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু মোটের উপর প্রায় এক হলেও ঘটনাক্রমে ভিন্নতা রেখেছেন ঔপন্যাসিক। কাহিনির সূত্রপাত কাঞ্চন-কুণাল বৃত্তান্ত দিয়ে। প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে রোমান্টিকতার সুবাস ছড়িয়ে উপন্যাসের প্রধান দুই পাত্র-পাত্রীর হৃদয়াবেগকে তুলে ধরলেন। বৌদ্ধ ভাবনা প্রচারমূলক নাটক মঞ্চস্থ হবে রাজধানীতে। মার ও মারপত্নী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তৈরী করা মালা চুরি হয়ে যায়। ফলত কাঞ্চনমালা নাটকে অভিনয় করতে পারে না। কিন্তু কুণালকে চমকে দিয়ে চুরি যাওয়া সেই ফুলের মালা পড়ে মঞ্চে এক অবগুণ্ঠনময়ী নারী অভিনয় করতে থাকে। নাটক শেষ হলে রাজপুরীর দাসী কুণালকে জানায় ফুল চোরের পরিচয় জানতে হলে লতাকুঞ্জে যেতে। সেখানে পৌঁছে কুণাল দেখে সেই চোর অন্য কেউ নয়, বরং তারই বিমাতা তিষ্যরক্ষা। কুণালকে সে নানাভাবে প্ররোচিত করে নিজের কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সৎচরিত্র কুণালকে কোনোভাবেই বিপথে পরিচালিত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তিষ্যরক্ষা রণে ভঙ্গ দেয়। তবে তিষ্যরক্ষাকে প্রত্যাখানের ফল যে কুণালকে পেতে হবেই এই সতর্কবার্তাও রানী তাকে শোনায়। অন্যদিকে কুণালপত্নী কাঞ্চনের মন পূর্বের ঘটনায় স্বভাবতই খানিকটা বিচলিত ছিল। বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে রাতে সে নাট্যসভায় উপস্থিত না থেকে বুদ্ধের বন্দনায় নিজেকে নিয়োজিত করে। এদিকে কুঞ্জ থেকে ফিরে কাঞ্চনকে ঘরে দেখতে না পেয়ে কুণালও বৌদ্ধমঠে উপস্থিত হয়। সেখানে দুজনের সাক্ষাৎ হলে কাঞ্চন নিজের মানসিক অস্থিরতার কথা স্বামীকে জানায়। কুণাল যথাসম্ভব কাঞ্চনকে সান্ত্বনা দেয়। ঘটনাচক্রে রাজপুরী থেকে কুণালের ডাক পড়লে কাঞ্চনমালার অজানা আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। কুণাল মঠ ছেড়ে বেড়িয়ে গেলে কাঞ্চন বুদ্ধের জপ আওড়াতে থাকে।

উপন্যাসের পরের অংশে নাপিত কন্যা তিষ্যরক্ষার রাজরানী হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণন। অল্পবয়স থেকেই তিষ্য ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং লোভী। কোনো এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা গণনায় বলেছিল বড় হয়ে তিষ্যরক্ষা রাজরানী হবে। সেই থেকে রানী হওয়ার তীব্র বাসনা তার মধ্যে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বিন্দুসার পুত্র অশোকের দৌরাত্ম্য অতিরিক্ত বেড়ে গেলে কীকট দেশে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে তিষ্যরক্ষাকেও এই একই স্থানে পাঠানো হলে দুজনের আলাপ হয়। তিষ্যরক্ষার কাছে এ যেন এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে ওঠে রাজপত্নী হওয়ার। যদিও তিষ্যরক্ষাকে বিবাহের আগেও অশোকের আরও বিবাহ হয়েছিল, তবুও খলস্বভাব অশোক শঠ তিষ্যকে গ্রহণ করতে পিছপা হয়নি। রাজধানীতে এই সংবাদ পৌঁছতেই অশোককে ডেকে পাঠানো হয় এবং রানী তিষ্যরক্ষাকে অন্দরমহলেই একপ্রকার

বন্দীদশা কাটাতে হয়। বেশ কিছুকাল এভাবে কাটানোর পর তিষ্যরক্ষা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এইসময় রাজপুরীতে আরেক কুটিলের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য রাধাগুপ্ত। ক্রমে নানা ছল-চাতুরী করে একে একে রাজমাতার মনে অন্য পুত্র এবং পুত্রবধূ সম্পর্কে নানা কুকথা, মিথ্যা ঘটনা বলতে থাকে। তার এই ছলে রাজপুরীর অন্দরে বিভেদ চরমে পৌঁছায়। অশোক তাঁর সহোদরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে প্রায় সবাইকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। তিষ্যরক্ষার ঘৃণ্য চক্রান্ত সফল হলে তার রাজরানী হওয়ার স্বপ্ন এতদিনে পূরণ হয়। এদিকে রহস্যজনকভাবে অশোকের সম্রাট হওয়ার দু-তিন দিনের মধ্যেই রাজা এবং প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। এরপর একে একে সব আত্মীয়দের মৃত্যু নিশ্চিত করে নিষ্কণ্টক রাজপুরীতে রাজা-রানী স্বেচ্ছাচার শুরু করেন। এসবের মধ্যে তিষ্যরক্ষার নতুন আরেক ভাবনা জেগে ওঠে। প্রায়শই তার মনে হতে থাকে রানী হয়েও নারী জীবনের আসল সুখ থেকে সে বঞ্চিত। বলাবাহুল্য এই কামনা চরিতার্থ করতেই তিষ্যরক্ষার কুনজরে পড়ে রাজপুত্র কুণাল।

কুণালকে তক্ষশিলা যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করা হলে কাঞ্চনমালাকে রেখে কুণাল রাজ্যজয়ে বেড়িয়ে পড়ে। পুত্র বিরহে কাতর রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লে রানী নিজ সেবাগুণে রাজাকে সুস্থ করে তোলে। প্রসন্ন রাজা রানিকে আগামী একবছরের জন্য মগধের অধীশ্বরী নির্বাচন করেন। তক্ষশিলা অধিপতিকে এই সুযোগে রানী তিষ্যরক্ষা চিঠি পাঠিয়ে কুণালকে বন্দী করে কঠিন শাস্তির কথা জানায়। মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে কুণাল সমস্ত অত্যাচার মেনে নেয়। দুজন চণ্ডাল তার চোখ দুটো উপড়ে নিলেও কুণাল স্বধর্ম থেকে একচুলও সরেনি। সেই উপড়ে নেওয়া চোখদুটি রানীর কাছে পাঠানো হলে সেই নৃশংস দৃশ্য দেখে রাজকার্যে ইতি টানেন। অন্যদিকে কাঞ্চন যথারীতি সেবাই ধর্ম এরূপ বার্তা নিয়ে পীড়িত, আর্তদের সাহায্যে দিনরাত কাটিয়ে দিতে লাগল। তবে কুণালের চিন্তায় দিন প্রতিদিন তার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে শুরু করল। বন্দী কুণালকে খুঁজতে একদিন সে বেড়িয়ে পড়ে রাজপথে। অনেক বন-জঙ্গল পার করে সে দুই বৌদ্ধ চণ্ডালের মুখোমুখি হয়। এরাই সেই দুজন যারা কুণালের চোখ উপড়ে নিয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনে কাঞ্চনমালা জানতে পারে কুণালের কথা। এই দুজনকে সঙ্গী করেই সে খুঁজে পায় তার প্রেমিক স্বামীকে। উপন্যাসের শেষ অংশের ঘটনাক্রম অতি দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়েছে। কুণালকে উদ্ধার করে কাঞ্চন রাজধানীতে ফিরে আসে। রাজা অশোক কুণালের মুখ থেকে এহেন চরম নৃশংসতার কথা জানতে পেরে রাজা কুঞ্জরকর্ণ ও রানী তিষ্যরক্ষার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। যদিও সত্যি জানাজানি হতেই কুঞ্জরকর্ণ অকুস্থলে প্রাণ ত্যাগ করে। এবং ঘটনাচক্রে তিষ্যরক্ষা পাগল হয়ে যায়। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখা যায় উন্মাদিনী শঠ রানীকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনে মহামতী কাঞ্চনমালা। অন্যদিকে কুণালকে সেই দুই চণ্ডাল ভিক্ষু চক্ষুদান

করলে পুনরায় কুণাল তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। ঋদ্ধিমতী কাঞ্চনের ধর্মের জোরে সেই দুই চণ্ডালও চোখ অলৌকিকভাবে ফিরে পায়।

মূল কাহিনিকে বেশ কিছুটা ভেঙেচুরে উপন্যাসের কাহিনিকে বুনন করলেন ঔপন্যাসিক। বৈশিষ্ট্যের বিচারে 'কাঞ্চনমালা' ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও রোমান্টিকতায় তা কল্পকাহিনি হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বৌদ্ধ জাতকের গল্পের মতোই অলৌকিক ঘটনাবহুল হয়ে উঠেছে উপন্যাসের সমগ্র কাহিনি। উপন্যাসটি মোট চোদ্দটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে কাহিনির মূল অংশে প্রবেশের পূর্বে এক দীর্ঘ প্রাকৃতিক বর্ণনা ঔপন্যাসিক করেছেন, অর্থাৎ প্লট তৈরি করলেন প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। পরিচ্ছেদটি পাঁচটি অংশে লেখা এবং সমগ্র পরিচ্ছেদেই প্রকৃতির সঙ্গে উপন্যাসের মূল দুই চরিত্র কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সমান্তরাল ভাবে কাহিনি সৃজন করেছেন ঔপন্যাসিক শাস্ত্রী মহাশয়। রোমান্টিকতার দিক থেকে বিচার করলেও বঙ্কিমের লেখনীর সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে। একথা বলাই যায়, উপন্যাস রচনার একেবারে শুরুর দিকে সকল ঔপন্যাসিকের কাছেই মানদণ্ড ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজন। ফলে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। শাস্ত্রীপুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রকৃত সাহিত্য সমালোচকের মতো নিরপেক্ষ থেকে পিতার প্রথম উপন্যাস সম্পর্কে জানিয়েছেন—প্রথমত, কাঞ্চনমালায় বঙ্কিমী চালের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতবহুল শব্দের ব্যবহার। তৃতীয় পরিচ্ছেদের একটি অংশ এখানে উল্লেখ্য—

> "সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শান্তনলিনী, কুমুদগন্ধামোদিনী, ঝিল্লিরবরূতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুতারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয়ক্কচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌতবিধৌতসুরভিচর্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ়প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল।"[১]

শাস্ত্রী মহাশয়ের উপন্যাসের নায়িকার আভরণ বর্ণনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সাদৃশ্য খুব বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। কাঞ্চনমালার পুষ্পসাজ এই পরিচ্ছেদের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ। যেখানে প্রকৃতি প্রেয়সী আর্যা শকুন্তলার সঙ্গে আরেক চিত্রিতা রমণী কাঞ্চন এক হয়ে গেছে। পরিচ্ছেদের বাক্য বিন্যাসেও বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। লঘু-গুরু চাল এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের কাহিনি বয়ানকে বেশ গতি দান করেছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই এসেছে বৌদ্ধধর্মের কথা। যেখানে কুণাল বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা বলছে। পরিচ্ছেদের শুরুতে রঙ্গমঞ্চের অবতারণা। নট এবং নটী যথাক্রমে কুণাল এবং কাঞ্চনমালা। কিন্তু মারপত্নী চরিত্রে যার অভিনয়

করার কথা সেই অভিনেত্রী কাঞ্চনমালা নয়। কাঞ্চনের ফুলসাজ চুরি করা সেই অবগুণ্ঠনবতী রহস্যময়ী কুণালেরই বিমাতা অশোকপত্নী তিষ্যরক্ষা। বিমাতার পাপিষ্ঠ মনোভাবে কুণালের মনে যে স্বাভাবিক অস্বস্তি তৈরি হয়, তাতে কুণাল চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়। অন্যদিকে পরিচ্ছেদের শেষে নীতিবাগীশের মতো 'সুমতি' ও 'কুমতি'-র প্রবেশে তিষ্যরক্ষার নীচ ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে উপন্যাসের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে রানী তিষ্যরক্ষার প্রসঙ্গ অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে উপন্যাস পড়তে গিয়ে কখনো কখনো মনে হয়েছে কাঞ্চনমালা নয়, তিষ্যরক্ষাই এই কাহিনির প্রধান নায়িকা বলা ভালো খলনায়িকা। চরিত্রের বুননের ক্ষেত্রে কাঞ্চন চরিত্রটি খুব ফ্ল্যাট। উপন্যাসে তার আগমন যেন শুধুই ধর্মপ্রচারক হিসাবে। সেইদিক থেকে অনেক বেশি সক্রিয় চরিত্র রানী তিষ্য। সেই যে গোটা কাহিনির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। বাকি সবকটি চরিত্রই নিছক যন্ত্রবৎ আচরণ করছে। মূল অবদানকল্পে যেখানে কুণালের রাজ্যজয়ের সঙ্গী হিসাবে কাঞ্চনকে দেখানো হয়েছিল, উপন্যাসে সেখানে কাঞ্চনমালাকে শুধুই সেবাকর্মে নিয়োজিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী করেই রাখা হয়েছে। যেখানে মূল কাহিনিতে কুণাল রাজধানীর পথে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় একটি হাতির দ্বারা নিজের পরিচয়কে প্রকাশ করতে পেরেছে, সেখানে উপন্যাসে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখই নেই। বরং খুব স্বল্প পরিসরে রাজকুমারের ফিরে আসার প্রসঙ্গ এখানে দেখানো হয়েছে।

নবকলেবরে 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্য স্বাদের সৃজন। তাঁর প্রথম দিককার রচনাগুলির মধ্যে 'কাঞ্চনমালা' অন্যতম। সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো সমগ্র রচনায় খামতি থাকলেও প্রথম বৌদ্ধ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা উপন্যাস হিসাবে এই কাঞ্চনমালা উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৌদ্ধধর্মের একাধিক প্রসঙ্গ খুব সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও উপন্যাসে এসেছে। বৌদ্ধধর্মের মূল বিষয় অর্থাৎ কোন শঠতা, প্রতিহিংসা বা ক্রোধ নয়, বরং এ বিশ্বজয়ের সবচেয়ে সহজ পন্থা প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা—এই কথাটিই যেন উপন্যাসের শেষে শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিষ্ঠা করলেন। কুণাল-কাঞ্চন আখ্যানে কুণাল প্রতিহিংসার শিকার হয়েও তার ব্যক্তিনিষ্ঠা ও আদর্শ দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতাকে একদিকে যেমন জয় করেছে, একইসঙ্গে কাঞ্চনমালা তার ভক্তির জোরে সমাজের কাছে নিজের এবং ধর্মের মহিমাকে অনেক বেশি গৌরবান্বিত করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র প্রথম খণ্ড; উপদেশনা সুকুমার সেন; সম্পাদনা-সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য;

প্রকাশক- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০১৩; পৃষ্ঠা ১০৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ; 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সপ্তম খণ্ড; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; প্রকাশক – শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; প্রথম সংস্করণ – বৈশাখ, ১৩৫৬; তৃতীয় সংস্করণ – চৈত্র, ১৩৮৭; ২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা – ৬।

২. 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' সত্যজিৎ চৌধুরী, ১৯৩১-২০১৭: লেখক; বিষয়: জীবনী; প্রকাশক: সাহিত্য অকাদেমি; প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯; চতুর্থ মুদ্রণ: ২০১৩; পঞ্চম মুদ্রণ: ২০১৮; সাহিত্য অকাদেমি প্রধান কার্যালয়: রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১।

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন (১৮৩৬-১৯০৩)

কুশধর মান্না
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

সারসংক্ষেপ: অবিভক্ত বাংলাদেশে আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার উনবিংশ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল। উনবিংশ শতক ছিল নানা কারণেই বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ওই সময় বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই যেসব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছিল, তারই অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়। ইংরেজি শিক্ষায় প্রভাবিত বাঙালি ভদ্রলোক-শ্রেণী ও উদারনৈতিক কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনশিক্ষার প্রসারের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মধ্যে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'-র প্রতিষ্ঠা হয়। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এই লাইব্রেরির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় একের পর এক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করে এবং এইভাবে বঙ্গদেশে আধুনিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সংযুক্ত করে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৮৩৬ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় কিভাবে শতাব্দী-প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হয়েছে।
সূচকশব্দ: উনিশ শতক, সাধারণ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, জনশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি, শতাব্দী-প্রাচীন গ্রন্থাগার।

ভুমিকা :

বাংলায় 'গ্রন্থাগার' শব্দের অর্থ হল গ্রন্থের আধার বা গৃহ। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে ও ধরে রাখে। ভারতে গ্রন্থাগার বা জ্ঞানভান্ডারের সংগ্রহ সুপ্রাচীন কাল থেকেই ছিল। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে আমরা গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব খুঁজে পাই তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মঠে, মন্দির-চতুষ্পাঠীতে কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে বা রাজাদের রাজপ্রাসাদে।[১] মধ্যযুগে ও তার পরবর্তীকালে কিছু বিদ্যোৎসাহী সম্রাট বা শাসকের প্রাসাদেও গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার বিভিন্ন

স্থানে শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে হিন্দুদের যে টোল শিক্ষা ও মুসলমানদের মক্তব শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল তাতে অজস্র গ্রন্থ সংগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, মুদ্রণযন্ত্র আবির্ভাবের পূর্বে গ্রন্থ বলতে বোঝাত হাতে লেখা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি। তবে, এইসব গ্রন্থাগারে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলনা। সাধারণ মানুষের জন্য আধুনিক গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী গড়ে তোলার ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল মূলত ইউরোপীয়রা এদেশে আসার পর থেকে। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় মূলত তিন প্রকারের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিলঃ (১) শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার, (২) সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, ধর্মীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার এবং (৩) পাবলিক লাইব্রেরী বা জনসাধারণের গ্রন্থাগার। আধুনিক সংজ্ঞায় পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে বোঝায় জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার, যেখানে সকল নাগরিকের সাধারণ পাঠক হিসাবে গ্রন্থপাঠের সমান অধিকার থাকে। গ্রন্থাগার আন্দোলন আসলে ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলন, গ্রামে-শহরে বিভিন্ন স্থানে পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার আন্দোলন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাথে সাথে কিভাবে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজে সুগম করা যায়, তার প্রচেষ্টাই হল গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল, যেগুলিই পরে পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রেরণা যুগিয়েছিল। যেমন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল, যেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা হত। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু ছাড়াও মগধি, বাংলা, কানাড়া, তেলেগু এবং মারাঠি ভাষায় রচিত বহু অমূল্য দুষ্পাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি দ্বারা এই গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।[২] এশিয়াটিক সোসাইটির এই গ্রন্থাগারটি কোন পাবলিক লাইব্রেরি ছিলনা, কিন্তু এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়।[৩] যেহেতু মুদ্রণ ও শিক্ষার সম্পর্ক শিব ও শক্তির ন্যায়, তাই উনিশ শতকে বাংলায় গ্রন্থাগারের ইতিহাস আলোচনায় ছাপাখানা ও প্রকাশনার ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যায়না। মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তারের একটি অঙ্গ হিসাবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনেই প্রধানত গড়ে ওঠে আধুনিক লাইব্রেরি। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস' স্থাপন করেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হলে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ছাপা বইপত্র নিয়ে শ্রীরামপুর কলেজের সঙ্গে একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহ পৃথক করে উইলিয়াম কেরি গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দেই গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ করলে তার সাথে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল।[৪] শ্রীরামপুর প্রেসের সবথেকে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজ এবং এই কলেজ গ্রন্থাগারের যাবতীয় পাঠ্য-পুস্তক শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই ছাপা হত। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ৪০ টি ভাষায় প্রায় ২,১২,০০০ বই ছাপা হয়েছিল।[৫] ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে বিসপস্ কলেজ, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ, ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী মহসিন কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠলে ধীরে ধীরে সহযোগী গ্রন্থাগারও গড়ে উঠেছিল।[৬] তবে, এই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগারগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণের জন্য নয়।

কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা: বঙ্গদেশে পাবলিক লাইব্রেরি বা জনসাধারণের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে মার্চ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে- যেটি ছিল অবিভক্ত অবিভক্ত বাংলার প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল চার্লস মেটকাফ (১৭৮৫-১৮৪৬) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করায়, তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট কলকাতার টাউনহলে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী মিলিত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবের মর্ম ছিল, তার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি ভবন নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হবে 'মেটকাফ হল' এবং ঐ বাড়িতেই একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হবে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। পরে ৩১শে আগস্ট টাউন হলেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার পিটারগ্রান্টের সভাপতিত্বে জে.এইচ.স্টকলার সহ বিশিষ্ট নাগরিকদের সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তা হল, "That it is expedient and necessary to establish in Calcutta a Public Library of reference and circulation, that shall be open to all ranks and classes without distinction, and sufficiently extensive to supply the wants of the entire community in every department of literature"।[৭]

এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য ২৪জন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। যার মধ্যে দুইজন বাঙালি ছিলেন, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮) এবং হিন্দু কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত (১৭৭৯-১৮৫৪)। ইংরেজ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জন পিটার গ্যান্ট, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন, সমাচার দর্পণের সম্পাদক পাদরি মার্শম্যান। গ্রন্থাগারে অর্থ সাহায্য করে যারা অংশীদার হন তাদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ। টাউনহলে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য স্থানের অভাব থাকায় প্রথমে ২৪পরগনার একজন সিভিল সার্ভেন্ট ড.এফ.পি.স্ট্রং তার ১৩ এসপ্ল্যানেড রো-র বাড়িটি লাইব্রেরির ব্যাবহারের জন্য ছেড়ে দেন। সেখানেই একজন ইংরেজ ভদ্রলোক মি.স্ট্যাচি গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ শুরু করেন, এবং তার সহকারী গ্রন্থাগার নিযুক্ত হন প্যারীচাঁদ মিত্র। ক্যালকাটা পাবিলিক লাইব্রেরি'র সেই সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা

হয়েছে- "...Some of the distinguished men of young Bengal were amongst its builders, Dwarakanath Tagore being its first proprietor, Pearychand Mitra, the father of the Bengali novel, its first sub-librarian and Rasik Krisna Mallick and Rasamay Datta, member of its provisional committee."[৮] ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬শে মার্চ জনসাধারণের ব্যাবহারের জন্য লাইব্রেরি খুলে দেওয়া হয়।[৯] তবে এই সময় এটি ছিল বেসরককারী লাইব্রেরী। ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে স্থান সংকুলান না হওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একাংশে লাইব্রেরি স্থানান্তরীত হয়। ১৮৫৪ সালে লাইব্রেরি তার স্থায়ী ভবন মেটকাফ হলে উঠে আসে। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই পদেই ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এইপর থেকে গ্রন্থাগারের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। পরে লর্ড কার্জন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির দুরবস্থা দেখে ভারত সরকারের পক্ষে সকল অংশীদারকে ৫০০ টাকার বিনিময়ে লাইব্রেরির স্বত্ব কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যাবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির সঙ্গে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে যুক্ত করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি কার্জন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি জনসাধরনের ব্যাবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[১০] দেশ স্বাধীন হবার পর ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। যদিও সেই রূপান্তরের ইতিহাস বলার অবকাশ এখানে নেই। তবুও শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে একমাত্র ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশনাল লাইব্রেরি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সর্বসাধারণের ব্যাবহারের জন্য আজও উন্মুক্ত।

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ইউরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা অবিভক্ত বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠার পর উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও বিদ্যোৎসাহী সমাজসেবীদের মধ্যে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখা যায়, এবং পর পর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর শতাব্দী-প্রাচীন যেইসব গ্রন্থাগারগুলি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থাগার আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে মেদিনীপুর শহরের আলিগঞ্জে বাংলার দ্বিতীয় পাবলিক লাইব্রেরি রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বসু(১৮২৬-৯৯)। যদিও প্রথমে গ্রন্থাগারটির নাম ছিল ‘বেলি হল পাবলিক লাইব্রেরি’। কারণ তৎকালীন মেদিনীপুরের কালেক্টর হেনরি ভিনসেন্ট বেলি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে এই

লাইব্রেরি সাধারণ পাঠকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।[১১] নদীয়া জেলার ইংরেজ কর্মচারী (ICS) হজসন প্র্যাট (Hajson Prat), জেলার মুখ্য আমিন রামলোচন ঘোষ, এবং নদীয়ার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় সহ বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার, প্রাণকৃষ্ণ পাল প্রমুখ বিত্তশালী জমিদারদের উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্ব থেকেই এই গ্রন্থাগারের মাঠে বিভিন্ন সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বইমেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত।[১২] ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এর নাম ছিল Anglo Vernacular Library। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবার এই লাইব্রেরিতে আসেন এবং গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য শিবচন্দ্রকে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেন।[১৩] আজও লাইব্রেরিটি তার প্রাচীনত্বের নিদর্শন নিয়ে সজীব। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট জমিদার ও সমাজসেবক জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। উনিশ শতকের বহু মনিষী যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উইলিয়াম হান্টার, দীনবন্ধু মিত্র বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থাগারে পদার্পণ করেছিলেন। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে প্রায় ১২,৫০০ সদস্য ও ১,৬০,০০০টি মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ রয়েছে যা গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের কাছে আজও নানা দিক থেকে আকর্ষণীয়।[১৪]

'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার সম্পাদক ও সমাজসংস্কারক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার বরানগরে শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্যে একটি নাইট স্কুল খোলেন, সঙ্গে পুস্তকাগার; পরে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাতার নামে শশীপদ ইন্সটিটিউট লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম-এ পরিণত হয়।[১৫] কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্ররনারায়ন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় রাজ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পড়েছিল ইংরেজ কর্মচারী কর্নেল জে.সি.হটনের উপর। প্রধানত তার উদ্যোগেই ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় এর নাম ছিল 'মহারাজা গ্রন্থাগার'।[১৬] মহারাজা গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে কলকাতার তালতলা অঞ্চলে অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি রায় প্রমুখ স্থানীয় কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] এই গ্রন্থাগারের প্রথম দশ বছরের সভাপতি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৪৮-১৯২৫)। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে রাজবল্লভ স্ট্রিটে স্থানীয় কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের বাসিন্দা প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই গ্রন্থাগারের প্রথম সদস্য হন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এই গ্রন্থাগারের সদস্য হন।[১৮] ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চৈতন্য লাইব্রেরি, যার প্রধান উদ্যোক্তা

ছিলেন গৌরহরি সেন এবং পাদরি টমোরি সাহেব।[১৯] উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটি শুধুমাত্র গ্রন্থ সংগ্রহেই সমৃদ্ধ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ সহ বহু বাঙালি মনীষীর উপস্থিতিতে, প্রবন্ধ-পাঠে, আলোচনাসভার ভাষণে একটি সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছিল।

তবে, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুসংগঠিত ভাবে বাংলায় লাইব্রেরি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল । বাঁশবেড়িয়ার রাজা ক্ষিতিন্দ্রদেব রায়ের উদ্যোগে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাড়া বাড়িতে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তি এই গ্রন্থাগারটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমগ্র বাংলার মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান ও হুগলী গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরির অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের সভাপতি মুনীন্দ্রদেব রায় ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্পেনে আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরি কনফারেন্স'-এ যোগ দিয়েছিলেন।[২০] ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে Bengal Library Association গঠনে এবং বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে এই ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগারটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রায়।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও তার গ্রন্থাগার ছিল বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। প্রথমে এটি The Bengal Academy of Literature নামে নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহ-সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র সেন। এছাড়াও পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[২১] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহ পরিষদে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি গ্রন্থাগার উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে উঠেছিল, যেগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবদান রেখেছে। যেমন, নথব্রুক হল লাইব্রেরি (ঢাকা, ১৮৮২,), বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২), রামকৃষ্ণ লাইব্রেরি অ্যান্ড রিডিং রুম (কলকাতা, ১৮৭৯), আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (১৮৯১), ভারতি পরিষদ (১৮৯০), সুহৃদ লাইব্রেরি (১৮৯১), মুদিয়ালি লাইব্রেরি (১৮৭৬) রাজপুর সাধারণ পাঠাগার (১৮৭৭), রানাঘাট পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৪), রানীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮১), দি ইউনাইটেড রিডিং ক্লাব অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি (হাওড়া, ১৮৯৮), বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৪), বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৫), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৮৭৩), শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি (১৮৯১), শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১)[২২]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৬৬টি পাবলিক লাইব্রেরি সমগ্র বাংলা জুড়ে স্থাপিত হয়েছিল। যেগুলির মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সম্পর্কে তেমন কিছু গবেষণামূলক কাজ না পাওয়ার কারনে আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের গ্রন্থাগারগুলি তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে উনিশ শতকের বাংলায় গড়ে ওঠা পাবলিক লাইব্রেরির একটা সুস্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।[৩০]

জেলার নাম	গ্রন্থাগারের সংখ্যা	জেলার নাম	গ্রন্থাগারের সংখ্যা
কলকাতা	১৮	বাগুড়া	১
হাওড়া	১০	বরিশাল	১
২৪ পরগনা	১০	ঢাকা	১
হুগলী	৯	সিরাজগঞ্জ	১
মেদিনীপুর	২	কুমিল্লা	১
রাজশাহী	২	পাবনা	১
নদীয়া	২	খুলনা	১
বাঁকুড়া	১	বীরভূম	০
বর্ধমান	১	কোচবিহার	০
মুর্শিদাবাদ	১	দার্জিলিং	০
যশোর	১	জলপাইগুড়ি	০
রংপুর	১	মালদা	০
দিনাজপুর	০	পুরুলিয়া	০
মোট গ্রন্থাগার = ৬৬			

উপসংহার :

আলোচ্য সময়কালে বাংলায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একমাত্র ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়াঔপনিবেশিক বিদেশি শাসকবর্গ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। সাধারণ গ্রন্থাগার জনশিক্ষার প্রসার এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে- এই উপলব্ধি থেকে বিদেশি শাসকবর্গ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারে আগ্রহী ছিল না। এইপর্বে বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছিল স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে অথবা কোথাও কোথাও উদারমনস্ক ধনী ব্যক্তিরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বিত্তবান মানুষের দান ও চাঁদায় এইসব গ্রন্থাগারগুলি চলতো। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবার মানসিকতা নিয়ে বাংলায় সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি

গড়ে উঠেছিল, যদিও এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়-- মূলত কলকাতা শহর বা তার পার্শ্ববর্তী জেলা শহরগুলিতেই গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গ্রন্থাগারের পরিসেবা শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া পাবলিক লাইব্রেরির অর্থ জনসাধারণের গ্রন্থাগার হলেও কিছু কিছু ছিল চাঁদামূলক গ্রন্থাগার, যা সাধারণ মানুষের আওত্বের বাইরে ছিল। তবে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ও শিক্ষার বিস্তারে গ্রন্থাগারগুলির অবদানকে অস্বীকার করা যায়না।

সূত্র নির্দেশ :

১. Bimal Kumar Dutta, Libraries and Librarianship of Ancient and Medieval India, Delhi: Atma Ram & Sons, 1960, pp.14-15

২. A.K. Ohdedar, The Growth of the Library in Modern India: 1498-1836, Kolkata: The World Press Private Ltd.,1966, pp.80-81.

৩. কৃষ্ণপদ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতাঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ২০০৮, পৃঃ ১০।

৪. Abul Fazal M.Fazle Kabir, The Libraries of Bengal 1700-1947: The Story of Bengal Renaissance, New Delhi: Promila & Co, 1988, pp.35.

৫. বরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস, ১ম খ.; কলকাতাঃ প্রেস সুপারিন্টেনডেন্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মে ১৯৮৫, পৃঃ ১৬৫।

৬. অরুণ ঘোষ, উনিশ শতকের বাংলায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক, উনিশ শতকের বাংলা, স, অলোক রায় ও গৌতম নিয়োগী, ২০১১, কলকাতা, পৃঃ ১৪৪।

৭. B.S Kesavan, India's National Library, Kolkata: Indian National Library, 1961, pp.9.

৮. R. K. Dasgupta,On the occassion of 75th anniversary, 30th January - 1978.

৯. শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী, ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারে জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতাঃ পুনশ্চ, ২০০৫, পৃঃ ৫২।

১০. Kesavan, B.S op.cit pp.14

১১. অরুণ মুখোপাধ্যায়, এই বাংলার শতায়ু গ্রন্থাগার, কলকাতাঃ পুনশ্চ, ২০০৫, পৃঃ. ৩৮।

১২. কাজল মিত্র, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি একালের অনুসন্ধান, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি ক্যাটালগ, ২০০৬, পৃঃ ২১২-২১৪

১৩. অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪।

১৪. একটি আলক প্রবাহঃ উনিশ শতক থেকে একুশ শতক, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার সার্ধশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থঃ ১৮৫৯-২০০৯, উত্তরপাড়া, হুগলী, পৃঃ ২৬-২৭।
১৫. অরুণ ঘোষ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৪।
১৬. কুনাল সিংহ, প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহঃ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কলকাতাঃ দি ওয়ার্ল্ড প্রেস, এপ্রিল ১৯৭২,পৃঃ ৭১।
১৭. অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৪।
১৮. কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার, কলকাতাঃ দেবদত্ত অ্যান্ড কোঃ, মার্চ ১৯৫৭, পৃঃ ৩৮।
১৯. The Nine Annual Report of Beadon Sqaure Library Club and Chaitanya Library 1858 A.D
২০. কুনাল সিংহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭
২১. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমাজ ও গ্রন্থাগার, কলকাতাঃ বোনা, জুন ১৯৯৭, পৃঃ ৪৮
২২. Bengal Library Directory 1942, West Bengal Library Directory 1963, Calcutta, Bengal Library Association
২৩. ibid।

কংগ্রেস ও বিপ্লবী নেতা হিসাবে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর অবদান (১৯০৫-১৯৫৪)

পীযূষ রায়
প্রামাণিক
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বিপ্লবী ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনের যৌথ পরিচালনা। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তিনি একটি শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পারবো যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং বিপ্লবী মতাদর্শ কীভাবে একজন মানুষের জীবনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এই নিবন্ধটির মাধ্যমে আমি দেখাতে চাই যে কীভাবে সমসাময়িক রাজনীতি, প্রাথমিক জীবন এবং বিপ্লবী মতাদর্শের মাধ্যমে বিপিন বাবু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি সক্রিয় কংগ্রেস রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মানুষ তাঁকে কংগ্রেস নেতা হিসেবেই মনে রেখেছে কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, কংগ্রেস নেতা হিসেবে নির্বাচনী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার আগে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আত্মন্নতি সমিতির প্রধান নেতা ছিলেন। তাই এই আলোচনায় এই বিষয়টিও আমরা দেখব যে কীভাবে তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সূচক শব্দ: বাংলা, বিপ্লবী, অনুশীলন, আত্মন্নতি, কংগ্রেস।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি অন্যতম অন্যতম ধারা হলো বিপ্লবী ধারা। এই ধারায় যারা বিশ্বাস করতেন তারা বিপ্লবী, আর তাদের আন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলন নামে পরিচিত। জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও স্বাধীনতার প্রশ্নে তারা এক হয়ে লড়াই করেছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের মতের পার্থক্য প্রথম প্রকাশ পায় বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। প্রথম দিকে এই আন্দোলনে চরমপন্থা থাকলেও ততটা উগ্র ভাব ছিল না। যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেকোন উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের অবদান উল্লেখযোগ্য। আর এই সংগ্রামে কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল, যারা নেতৃত্ব ও আন্দোলনের কৌশলের বিরোধের কারণে নিজের মত করে

আন্দোলন পরিচালনা করেছে। এই ধরনের উদ্যোগ দেখা যায় বাংলা, পাঞ্জাব, ও মহারাষ্ট্রে। এই গোষ্ঠীর নেতারা নতুন এক ধরনের পথে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন যার পরিণতি হল চরমপন্থী মতবাদের উদ্ভব। আর এই চরম পন্থীদের একটি অংশ পরবর্তীতে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাংলায় এই ধারার প্রকৃত পর্যায় শুরু হয় ১৯০২ সাল থেকে এবং এই ধারা আরো বেশি সফলতা লাভ করে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে। ফলে বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ১৯২০র দশকে গান্ধীজির উত্থান আন্দোলনের গতি পরিবর্তন করে। এই সময় বিপ্লবী দের কাছে এটা পরিস্কার হয় যে, হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলন নয়তো অন্য পথ। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী দের কাছে তিনটি পথ তৈরি হয়। একদল ছিল যারা নিজেদের মতো করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চাইছিলেন, আর একটি দল কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অন্য একটি দল কংগ্রেসের সঙ্গে আন্দোলনের জন্য এগিয়ে যান। এরকম পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। যাকে আমরা কংগ্রেস নেতা হিসেবেই জানি। কিন্তু তিনি জীবনের প্রথম দিকে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিপ্লবী আত্মন্নতি সমিতির একজন প্রধান নেতা হিসাবে পরিচিত হন। তিনি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের মামলায় অভিযুক্ত হন এবং পাঁচ বছরের জন্য জেল বন্দী হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে যোগ দেন ও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮৮৭ সালে কলকাতার হালিশহরে। তার বাবার নাম অক্ষয়নাথ গাঙ্গুলি। তিনি শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্কুলে পাঠরত অবস্থায় বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন ও রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা লাভ করে অনুশীলন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতায় এসে উপস্থিত হন তখন কলকাতায় অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ চলছিল। তিনি থাকতেন সার্কুলার রোড। ইস্ট ক্লাব নামে একটি সমিতি স্থাপন করা হলো যেটি আদতে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। এখানে ঘোড়া দৌড়, সাঁতার, মুষ্ঠিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখানো হত এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এই ধরনের আখড়া-র ভুমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বক্তৃতা ও পাঠচক্র পরিচালনা করা হত। সার্কুলার রোডের এই রাজনৈতিক আলোচনায় বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী অন্যান্য দের সঙ্গে নিয়মিত যোগ দিতেন। এভাবেই তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি আত্মন্নতি সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন ও সংগঠনকে শক্তিশালী করেন। উল্লেখ্য যে কলকাতায় তার দলকে বিপিন বাবুর দল বলেই চিনত। এখন প্রশ্ন হল কিভাবে তিনি একজন সদস্য থেকে আত্মন্নতি সমিতির প্রধান সংগঠকে পরিনত হলেন? এই

আত্মন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। প্রথমদিকের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রঘুনাথ বন্ধপাধ্যায়, হরিশ চন্দ্র শিকদার, ইন্দ্রণাথ নন্দী, নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। প্রভাস দের পর বিপিন বাবু এর দায়িত্ব পান। প্রথমদিকে এটি শরীর চর্চা ও আলোচনা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী দলে পরিণত হয়েছিল। ১৯০২ সালে এটি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেও তার স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলেনি। একই সঙ্গে এটাও ঠিক যে প্রথম দিকে এটি তার কার্যকলাপ শারীরশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও পরে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সমিতিতে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিপ্লবী সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল এক যোগ্য নেতৃত্বের এবং এই কাজটি করেছিলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী।

অনেকে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে নেতৃত্বের ক্ষমতাকে উন্নত করেন আবার অনেকে নেতৃত্বের কবচকুন্ডল নিয়ে জন্মায়। বিপিন বিহারী ছিলেন এরকমই একজন সংগঠক, যিনি নিজের গুণাবলী দিয়ে নেতৃত্বকে নতুনভাবে গঠন করেন। বাংলায় বিপিন বাবুর নেতৃত্বে সংগঠিত আত্মন্নতি সমিতি ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। তিনি তার দলের নেতাদের কাছে দাদা নামে পরিচিত ছিলেন। অনেকে তার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনকে বিপিন বাবুর দল নামেই চিনতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলায় এই সময় যে সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলি ছিল তার প্রাথমিক ইউনিট ছিল দল। এই দল পরিচালিত হতো একজন দাদাকে কেন্দ্র করে, দাদা তার অনুগামীদের নেতা। এরা দাদার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থা রাখতেন। এই দাদা তাদের নীতিগত শিক্ষা দিতেন এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করার পাশাপাশি দেশ সেবার কাজে তরুন যুবকদের নিয়োজিত করতেন। এ প্রসঙ্গে বিজয় সিংহ নাহারের নাম উল্লেখ করা যায়, যিনি আত্মন্নতি সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের বাবু তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন যে তিনি কিভাবে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর মতন যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে যাওয়ার জন্য।

বিপিন বাবুর সহকর্মীদের থেকে জানা যায় যে তিনি কুশলতার সঙ্গে বিপ্লবী সংগঠনকে ধরে রেখেছিলেন এবং পরে তাকে বিস্তৃত করেছিলেন। প্রথমে তিনি দল ও পদের সীমাকে অতিক্রম করে কলকাতা বিভিন্ন ছোট ছোট দলকে একত্রিত করেন। এই সময় কলকাতা কেন্দ্রিক অনেক ছোট ছোট দল ছিল যারা নিজ উদ্যোগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এই সব ছোট ছোট দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেও বরানগর, আলমবাজার, ভাটপাড়া, আড়িয়াদহ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ। তার কর্মজীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯০৯-১০ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাটি ছিল ব্যক্তিনিধন ও সাধ্যমতন সরকারি অর্থ লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থসংস্থান ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার প্রধান কারণ ছিল

অস্ত্রের অভাব ও দ্বিতীয়ত অর্থের অভাব। তাই এই অবস্থায় গুপ্ত সংগঠন ও গুপ্ত কর্মকাণ্ড ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। বিপিন বিহারীবাবু সেই পন্থাই নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার জন্য ডাকাতি বিষয়ে অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথের মতই পোষণ করতেন। তাছাড়া গুপ্ত সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে টাকার প্রয়োজনীয়তা, বিপ্লবীদের মামলা ইত্যাদি ব্যয় এর জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। যারা বিপ্লবীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন বা বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছেন তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯০৮ থেকে ১৪ পর্যন্ত কলকাতা খড়দহ, টিটাগর অঞ্চলে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অর্থাৎ শত্রু হত্যা বা ডাকাতির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুমোদনের ফলে সংগঠিত হয়েছিল। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সম্মুখে উপস্থিত থেকে দলের সদস্যদের উৎসাহ বাড়িয়েছেন। প্রসঙ্গে আগরপাড়া ডাকাতির ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ডাকাতির ঘটনায় তিনি সরাসরি উপস্থিত ছিলেন এবং যদিও তিনি এই ঘটনার পর ধরা পড়েন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ডাকাতি বা গুপ্ত হত্যার পাশাপাশি ছাত্রদের বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত করে তাদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতেন। অমিতাভ মুখার্জী তার বইতে দেখিয়েছেন যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে কেবলমাত্র ডাকাতি বা মুক্ত হত্যা দিয়েই বিচার করলেই হবে না এই সময়, তাছাড়া যে সমস্ত গোপন কর্মকাণ্ডগুলি সংঘটিত হত সেগুলিও বিপ্লবী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিজয় সিং নাহারের কথা উল্লেখ করা যায় যিনি বিপিন গাঙ্গুলী পরিচালিত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিজয় বাবু তার জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন যে, কিভাবে বিপিন বাবু নেতৃত্বদানের মাধ্যমে ছাত্র দের নিজের দলে নিতেন যারা পত্র পত্রিকা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তেল-মশলা প্রভৃতি বিক্রি করে আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ দলের হাতে তুলে দিতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনের পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এই সময় তারা বিপ্লবী আন্দোলনকে নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রথমত ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীরা সংগঠিত হতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন দেশগুলি থেকে অস্ত্রশস্ত্র টাকা পয়সা সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতে এটি বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করেন। এই উদ্যোগেও শামিল হয়েছিল বিপিন বিহারী বাবু। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবী দলগুলো সংগঠিত হতে থাকে এবং এ সংঘটিত হতে থাকে একজন নেতার অধীন। ফলে বাংলার দায়িত্বে আসেন বাঘাযতীন ও তার যুগান্তর গ্রুপ। এই সময় বিপিন বাবু বাঘা যতীন এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্র ধরে ভারত এবং উত্তর ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের মধ্যে সমন্বয়ে যেমন বেড়েছিল, তেমনি ভারতের বাইরে থেকে বিপ্লবীরা আসতে থাকে ভারতে। যারা সমগ্র ভারত জুড়ে একটি সংঘটিত বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। তাদের এই বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনার

জন্য প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রসস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। এজন্য বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানির পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কারখানায় লুঠের পরিকল্পনা করা হয়। এরকম একটি উল্লেখযোগ্য লুন্ঠনের ঘটনা ঘটেছিল কলকাতায় রডা কোম্পানিতে। ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে। এই ডাকাতি ছিল চাঞ্চল্যকর ঘটনা যাকে The Statesman দিবালোকের সবচেয়ে বড় ডাকাতি বলে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এখানে তিনি কলকাতা কেন্দ্রিক বিভিন্ন দলের সাহায্য নিয়েছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিমান ঘোষ, বরানগরের তুলসী ঘোষ প্রমুখরা। এই লুণ্ঠন মামলায় বিপিন বাবুর ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে যদু গোপাল মুখোপাধ্যায় তার স্মৃতাই লিখেছেন যে, এই মাসার পিস্তলগুলি বিপ্লবীদের প্রকৃতই শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দেশের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উৎসাহের সঞ্চার করে। এখানে বিপিন বাবুর মহত্ব বর্ণনাতীত। শুধু তাই নয় তিনি, বাঘা যতীনের সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবীরা যুক্ত হয়ে ভারতের বাইরে থেকে অস্ত্র আনার যে পরিকল্পনা চলছিল তাতেও যুক্ত ছিলেন। একটি ঘটনা হলো বালেশ্বরের বুড়িবালামের ঘটনা। যে ঘটনায় বাঘা যতীন ধরা পড়েন। এই ঘটনায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের চেয়ে গোপন মিটিং হতো সেই মিটিংয়ে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী বাঘা যতীনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে একদিকে যখন বাঘাযতীন ধরা পড়েন। এই সময় বিপিন বিহারী বাবু বহু ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এইরকম দুটি উল্লেখযোগ্য ডাকাতির ঘটনা হলো আড়িয়াদহ (৬ই এপ্রিল, ১৯১৫) এবং আগরপাড়া (৩ আগস্ট, ১৯১৫)। এর মধ্যে দ্বিতীয়টির সময় তিনি অস্ত্রসহ হাতেনাতে ধরা পড়েন। যার ফলে আলিপুরের বিশেষ বিচার ব্যবসায় তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়।

এইভাবে বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে বিপ্লবী আন্দোলনের যে গতি তা ব্রিটিশদের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে একদিকে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনকে স্তিমিত করে তেমনি অন্যদিকে গান্ধীজীর উত্থান বিপ্লবী আন্দোলনকে কিছুদিন জন্য হলেও নতুন করে ভাবাতে শুরু করে। ১৯২০ থেকে ৩০ এর দশকে বাংলার রাজনীতিতে টানাপোড়ন চলছিল। এই সময় বিপ্লবীদের একটা ধারা ছিল, আর একটা ছিল গান্ধীবাদী খাদি ধারা। এই বিপ্লবীরা আবার তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে একটি ধারায় কংগ্রেসের সঙ্গে যারা চিত্তরঞ্জন দাস পরবর্তীতে সুভাষ সহযোগী হয়, আর একটি গ্রুপ যায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবং অন্য একটি ধারা ছিল প্রচন্ড উগ্র তারা কোন গ্রুপে যোগ না দিয়ে নিজেদের মাধ্যমে ব্রিটিশদের উৎখাতে কাজে নিয়োজিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে ১৯২০-র দিকে দশকে বিপ্লবীরা যখন সেভাবে নতুন কিছু করতে পারছে না তখন বিপিন বিহারী বাবুর মতন কিছু নেতৃত্ববৃন্দ ঠিক করল যে আমরা কংগ্রেসের সাথে যাব কিন্তু কাজ হল বিপ্লব করা অর্থাৎ ইংরেজদের তাড়ানো। এই আশা নিয়েই তারা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। অবশ্য তাদের এই কংগ্রেসী দের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার

জন্য এগিয়ে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ চন্দ্র বোস এর মত নেতৃবৃন্দ।এই সময় বিহারি গাঙ্গুলী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

ত্রিশের দশকে বাংলার রাজনীতিতে দুটি শক্তি ছিল যার একদিকে ছিল সুভাষ আর অন্যদিকে ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এদের লড়াই। সুভাষ বামপন্থী সহ বিপ্লবী নেতৃত্বকে নিয়ে কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে গান্ধী যিনি ১৯২০ থেকে সারাদেশে সংগঠনকে শক্তিশালী করেন তিনি ১৯৩০ এর পরিস্থিতিতে এসেও তার নির্দেশিত পথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে প্রথমদিকে বিপিন বাবু সুভাষ সহযোগী হয়ে কংগ্রেস সংগঠনের হয়ে কাজ করতে থাকে যদিও পরবর্তী সময় সুভাষের সঙ্গে বিরোধের কারণে তুমি আলাদা হয়ে যান এরপর থেকে বিপিন বাবু হুগলির অতুল্য ঘোষের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে শুরু করেন।

তিনি কংগ্রেসের যুক্ত হওয়ার প্রথম দিকে সুভাষপন্থীর হয়ে কাজ করতে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে তিনি কর্পোরেশন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তার সুভাসের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের পথ নিয়ে লড়াই হয়। ফলে সুভাসের সঙ্গে তার বিরোধিতার প্রকাশ্যে আসে এবং সুভাসের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে তিনি গান্ধীবাদী যে খাদি ধারা বাংলায় যারা বিভিন্ন গ্রামীন রাজনীতির সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের কাছাকাছি আসেন। এই সময় অতুল্য ঘোষের মতন নেতৃত্ববৃন্দ হুগলির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গ্রামীন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি স্বাধীনতার পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাংলা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেন এবং বিধান রায় মন্ত্রিসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন।

বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস নেতা, যিনি বাংলার কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘ পনেরো বছর যুক্ত ছিলেন। যদিও এর পূর্বে ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সুত্র ধরে বাংলার রাজনীতিতে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার আসে, সেই সময় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। উল্লেখ্য যে তিনি যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে একটি সংঘটিত রুপ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন আত্মন্নতি সমিতির প্রধান সংগঠক। এরপর ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির উত্থানের পর বিপ্লবী রাজনীতি

কোনঠাসা হয়ে পড়লে, তিনি গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। যদিও এর পূর্বেই তিনি কংগ্রেসে আসেন একজন সুভাষ পন্থী সমর্থক হিসেবে।এর পর সুভাষের সঙ্গে বিরোধের জেরে তিনি তার সঙ্গ ছেড়ে দেন। এর পর তিনি গান্ধীজির পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ও বাংলার গান্ধীবাদী খাদি ধরার সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৪০ এর দশকে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তাই একথা বলা যায় যে তিনি ছিলেন বাংলার একজন উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী ও কংগ্রেস নেতা।

তথ্যসুত্র :

১. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ‘*স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা*’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৯৬-৯৭।

২. অমলেশ ত্রিপাঠী, ‘*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব*’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১১৩-১২৩।

৩. সঞ্জীব সান্যাল, ‘*রেভোলিউশনারিঃ দ্য আদার স্টোরি অফ হাও ইন্ডিয়া ওন ইট সফ্রীডম*’, হারপাল কলিন্স পাবলিশার্স ইন্ডিয়া, হরিয়ানা, ২০২৩, পৃষ্ঠা- ১৩-২৮।

৪. যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, ‘*বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*’, রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৬৬।

৫. গৌতম নিয়োগী, ‘*দা ফাস্ট ন্যাশনাল রেভলিউশনারি সিক্রেট সোসাইটি কলোনিয়াল বেঙ্গল: দাআত্মন্নতি সমিতি, (১৮৯৭-১৯০২)*’, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস প্রসিডিংস, খন্ড-৬৩, ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৯৮-৬০২।

৬. ক্ষীরোদ কুমার দত্ত, ‘*বাংলার অগ্নিযুগ*’, হিন্দি প্রকাশনী ভবন, ক্যালকাটা, ১৩৪৮ (বাংলা), পৃষ্ঠা- ৬৪-৬৭।

৭. লিওনার্ড এ গর্ডন, ‘*বেঙ্গল দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট (১৮৭৬-১৯৪০)*’, মনোহর, নিউ দিল্লি ১৯৭৯ পৃষ্ঠা -১৪১-১৪২।

৮. বিজয় সিংহ নাহার, ‘*যা দেখেছি যা করেছি*’, কালিপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৩০।

৯. অমিয়কুমার সামন্ত (সম্পাদিত) , ‘*টেররিজমইন বেঙ্গল*’, খন্ড- তিন, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৪৯০-৫০৮।

১০. তদৈব, খণ্ড তিন, পৃষ্ঠা- ৪৯০-৫০৮।

১১. অমিতাভ মুখার্জী (সম্পাদিত), '*মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়াঃ ১৮৭৬-১৯৪৭*', ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিস, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৬৫- ২৭০।

১২. অশোক সিং, '*বিজয় সিংনাহার ১৯০৬-১৯৯৭*', কালিপদ মুখার্জি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০০৯, প্রিস্থা- ১৫-২০।

১৩. অমিত কুমার গুপ্ত, '*ডিফাইংডেথ : ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (১৮৯৭-১৯৩৮)* ইন সোশ্যাল সাইন্টিস্ট, খণ্ড- ২৫ নং-৯/১০, পৃষ্ঠা ৩-২৭।

১৪. *দ্যা স্টেটম্যান*, ২৫ আগস্ট ২০১৩, আর্কাইভ ফ্রমদা অরিজিনাল, তারিখ- ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

১৫. যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৪-৩২৫।

১৬. অমিও কুমার সামন্ত, প্রাগুক্ত, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৭২০।

১৭. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, '*ডিফাইনিং মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল ১৯২০ ১৯৪৭*', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২১৩।

১৮. গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, '*কন্সট্রেনইন বেঙ্গল পলিটিক্স ১৯২১-৪১ : গান্ধীয়ান লিডারশিপ*, স্টার বুক হাউস, ক্যালকাটা, ২০১৪ পৃষ্ঠা- ১৬৭।

১৯. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৭-১৫৮।

২০. অতুল্য ঘোষ, '*কষ্ট কল্পিত*', নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৭১, পৃষ্ঠা - ২৬-২৭।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সিনেমা : তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি

স্বস্তিকা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আলোচনার ব্যাপ্তি অনন্ত। তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে আছেন আমাদের শৈশবকাল থেকেই। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে সিনেমাকে তিনি কিভাবে দেখেছেন। আসলে সিনেমা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ মানবমুখী। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্য মানুষ। তিনি বাংলার নবজাগরণের অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। সামাজিক অস্থিরতাকে তিনি বুঝেছিলেন হৃদয় দিয়ে এবং সেটাকেই ধরে রেখেছেন তিনি তাঁর ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে।

তিনি সবসময় মানুষের সমস্যার কথা বলতে চেয়েছেন। তবে তিনি তাঁর কোনো সিনেমাতেই উচ্চস্বরে সামাজিক সমস্যার কথা বলেননি। তাঁর ছবির মধ্যেকার সমাজ-সচেতনতা কোনো সশব্দ ঘটনার মাধ্যমে নিজের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি প্রচার করে না। সিনেমার গল্প নির্বাচন ও তাকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কুশলতার পরিচয়। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ সিনেমায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন সমাজের কথা। ‘পথের পাঁচালী’, ’ অপুর সংসার’, ‘অপরাজিত’ –এই তিনটি ছবিতেও তিনি তৎকালীন বাংলার মানুষের জীবনের নির্মম বাস্তবতা ও দারিদ্রের কথা তুলে ধরেছেন। ‘জলসাঘর’, ‘দেবী’ ও ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবিগুলিতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংঘাতে উদ্ভূত দোদুল্যমান পরিস্থিতির বিষয় ফুটে উঠেছে।

অন্যদিকে তিনি সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীকে তুলে ধরেছেন অন্য ভাবে। ফুটিয়ে তুলেছেন নারীর অনুভূতি, টানাপোড়েন আর আকাঙ্ক্ষার গল্প। কখনও মাধবী মুখোপাধ্যায়, কখনও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, কখনওবা শর্মিলা ঠাকুর – এর মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নারী ভাবনা। ১৯৬৩ তে মুক্তি পাওয়া ‘মহানগর’ সিনেমাটি অবাক করে দিয়েছিল মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। মাধবী মুখোপাধ্যায় অভিনীত আরতি আমাদের সাথে পরিচয় করায় সেই নারীর সাথে, যে কিনা বাড়ির অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করেছে চাকরি জগতে। আরেকদিকে ‘দেবী’ দেখিয়েছিল কুসংস্কার আর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানো মেয়েকে। ‘দয়াময়ী’তে দয়াময়ী বলে দেয় তাঁর হতাশা আর ক্ষোভের কথা। ‘ঘরে-বাইরে’র বিমলা ও যেন হয়ে ওঠে বাংলার সাধারণ মেয়ে। আসলে সত্যজিতের সিনেমার নারীরা প্রকাশ ঘটায় নারীর প্রতি ঘটা বঞ্চনা ও তীব্র যন্ত্রণাবোধের কথা। আবার ‘জনঅরণ্য’ ছবিতে শহুরে যুবকদের হতাশা

ধরা পড়েছে। 'অশনিসংকেত', ছবিতে ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এইভাবে চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন সমাজের কথা, যা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ : চলচ্চিত্র, নবজাগরণ, সমাজ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, অন্দরমহল, অবক্ষয়, বঞ্চনা।

মূল প্রবন্ধ :

আমরা জানি যে সমাজ, শিল্প ও শিল্পী এক সূত্রে গাঁথা। সমকালীন সমাজ ও পরিবেশ-পরিস্থিতিকে শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই যেকোনো শিল্পীর কাজ। সত্যজিৎ রায় ও হচ্ছেন সেই ধরণের শিল্পী। যিনি বাংলার নবজাগরণের অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। যার প্রতিভার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা এত বিশাল যে, কোন একটি দিক থেকে সেই বিশালতার মূল্যায়ন অত্যন্ত দুরূহ। তাঁর সমকালীন সমাজকে তিনি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর পরিচালিত সিনেমাগুলিতে।

আসলে সত্যজিৎ রায়ের জন্ম এমন একটা সময়ে (১৯২১ সাল) যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। উদার মানবিকতাবাদের প্রভাবে গড়ে ওঠা উনিশ শতকের বাংলার চেতনার পাড়ও ভেঙে যাচ্ছিল সেইসময়। বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ মার্কসীয় মতবাদ ও বিপ্লবের ভাবনার আশ্রয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। যখন সত্যজিৎ একজন কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক, তখন আমরা দেখতে পাই Indian People's Theatre Association (IPTA)- র উন্মেষ, নতুন মতবাদের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসাবে। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা বা সংস্কৃতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও সত্যজিৎ তার চারপাশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি তৎকালীন সমাজ সচেতন বুদ্ধিজীবীদের একজন ছিলেন, যারা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে না থেকেও ছিলেন উদার মানবতাবাদী।[১] তিনি যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন, মানুষের চোখে তখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির রঙিন স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ভালো থাকার, ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন। তবে সেই স্বপ্ন ভাঙতে বেশিদিন লাগেনি। এই বিশ্বাসভঙ্গের বিশ্বাস ঘাতকতাকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। এই অস্থির যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতা সত্যজিতের দৃষ্টি এড়াইনি। এই অস্থিরতাকে তিনি বুঝেছিলেন হৃদয় দিয়ে। সেটাকেই ধরে রেখেছেন তিনি তাঁর ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে।

সত্যজিৎ রায় এমন একজন শিল্পী, যিনি সবসময় মানুষের সমস্যার কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন-' I am interested in people, in human beings, in human characters, in their interplay, in the relationship of characters. The fascinates me in itself', এই কথাগুলি ই তাঁর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে ব্যক্ত করে।[২] তবে তিনি কখনো মনে করতেন না যে, চলচ্চিত্র

সমাজ পরিবর্তন করতে পারে। একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্যে তাকে বলতে শোনা যায়, “কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে আঘাত করা খুবই সোজা। কিন্তু আপনি যেসব লোকদের আক্রমণ করছেন যারা তার থোড়াই কেয়ার করে। আপনি যা বলছেন তা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে ছোঁয়াও যাবে না। তা হলে কিসের জন্য বলা? চলচ্চিত্র সমাজ পরিবর্তন করতে পারে না, কখনো করেও নি”।[৩]

তাঁর এরকম ধারণা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সমাজের কথা বলতে ছাড়েননি। তাঁর পরিচালিত সিনেমা গুলির বেশিরভাগই হয়ে উঠেছিল তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। তবে তিনি তাঁর কোনো সিনেমাতেই উচ্চস্বরে সামাজিক সমস্যার কথা বলেননি। তাঁর ছবির মধ্যেকার সমাজ-সচেতনতা কোনো সশব্দ ঘটনার মাধ্যমে নিজের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি প্রচার করে না। সিনেমার গল্প নির্বাচন ও তাকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কুশলতার পরিচয়। সত্যজিৎ রায় একবার নিজের মুখেই বলেছিলেন, তার পরিচালিত ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ সিনেমা থেকেই চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসাবে তাঁর সামাজিক বোধ কেমন ছিল সে বিষয়ে জানা যাবে। এই সিনেমাটির মুখ্য চরিত্রে আছে দুই ভাই, এদের মধ্যে ছোটভাই নকশালি। সে অত্যন্ত সাহসী, কিন্তু নকশাল আন্দোলন যখন শেষ হয়ে যায়, তখন একজন ব্যক্তি হিসাবে সে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এই সিনেমার নায়ক চাকরির ইন্টার্ভিউ দিতে গেলে, সেখানে তাকে গতদশকে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করতে বলা হলে সে বলে ভিয়েতনামে সাধারণ মানুষের সাহস দেখানোর কথা।[৪] এইভাবে এই চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন সমাজের কথা।

‘পথের পাঁচালী’,’ অপুর সংসার’, ‘অপরাজিত’ -এই ছবি গুলিতেও তিনি দেখান তৎকালীন বাংলার মানুষের জীবনের নির্মম বাস্তবতা ও দারিদ্রের কথা। সিনেমাগুলি আমাদেরকে একটা কথা মনে করিয়ে দেয়- জীবনে দুঃখ, কষ্ট , মৃত্যু, যন্ত্রণা আছে বলেই জীবন থেমে থাকেনা। জীবন বহমান, সে তার নিজের গতিতেই এগিয়ে চলে। এই চলচ্চিত্র মানুষকে শেখায় মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতিকে, তাঁর ভাগ্যকে পরাস্ত করে জয়ী হবার শক্তি রাখে। ‘অপুর সংসার’ র অপুকে বলতে শোনা যায়, অপু একটা চাকরি পেয়েও সেটা নেয়নি, কারণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের বরখাস্ত করে তাকে চাকরিটি দেয়া হচ্ছিল। এই কথাগুলির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে যান, যেখানে এক গরীব যুবক অন্য কারোর মুখের গ্রাস কেড়ে না খাবার মত সাহস ও মর্যাদাবোধ দেখাতে পারে।

তাঁর সমাজভাবনার প্রকাশকারী ছবি হিসাবে বলা যেতে পারে- ‘জলসাঘর’, ‘দেবী’ ও ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র কথাও। বদলে যাওয়া সমাজের সাথে যুক্ত ছিল এই তিনটি ছবি। ক্ষয়িষ্ণু স্‌মন্ততন্ত্র ও উদীয়মান ধনতন্ত্রের সংঘাতে উদ্ভূত দোদুল্যমান পরিস্থিতির কথা জড়িয়ে আছে সিনেমা তিনটিতে। ‘জলসাঘর’ এ আমরা দেখতে পাই একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্যের অস্তগামিতা, আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী সমাজে নব্য

ধনিক গোষ্ঠীর উত্থান। 'দেবী'তে আছে মূল্যবোধের সংঘাত, যেখানে বুর্জোয়া যুক্তিবাদ অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কার আর সামন্ততান্ত্রিক ভাবনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' তে আমরা পাই এমন এক আভিজাত্যের প্রতীককে, যে ব্রিটিশ রাজাদের বদান্যতায় আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও নতুন যুগে গড়ে ওঠা নতুন মূল্যবোধের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই ছবি তিনটিতে তিনি সামাজিক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে। আর এই বাস্তবমুখিনতাই আধুনিক চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য।[৫]

এরপর আমরা আলোচনা করতে পারি তাঁর পরিচালিত আর কয়েকটি ছবি নিয়ে, যেগুলিতে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন সমকালীন সমাজের গায়ে জোঁকের মত লেগে থাকা সমস্যাগুলির প্রতি। বেকারত্ব, চরমপন্থী রাজনীতি, যুব-বিক্ষোভ, মূল্যবোধের অভাব, ভালো কিছু পাবার জন্য ভয়ংকর ইঁদুর- দৌড় ছিল সেই সময়কার জাজ্বল্যমান পরিস্থিতি। 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জনঅরণ্য' -তে আমরা পাই এমন একজন চলচ্চিত্র পরিচালককে, যিনি ষাটের দশকের শেষের দিকের আর সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের বিদ্ধস্ত সময়কে চলচ্চায়িত করেছেন। প্রতিটা ছবির চরিত্ররা উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে থেকে, ফলে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তাদের-ই কথা। তাদের শক্তি, দুর্বলতা, সাহস, বিশ্বাসঘাতকতার কথা।[৬]

শুধু সমকালীন সমাজকে নয়, সত্যজিৎ তাঁর চলচ্চিত্রগুলিতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছেন সমাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীদের কথাকেও। তাঁর গল্পে কোন নারীচরিত্র নেই বলে সত্যজিৎকে সমালোচিত হতে হয়েছে বহুবার। কিন্তু তাঁর পরিচালিত সিনেমাগুলির অধিকাংশই নারীকেন্দ্রিক। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত যেসব চলচ্চিত্রে নারীরাই মুখ্য, সেখানে সেই নারীকে সামলে নিতে হয়েছে নানা পারিপার্শ্বিক চাপ, প্রতিরোধ করতে হয়েছে নানা বাধা, ফুটে উঠেছে তার চরিত্রের নানা দিক, তাদের অস্তিত্ব, রহস্যময়তা, শক্তি, সৌন্দর্য, সংবেদনশীলতা, পছন্দ-অপছন্দ। আবার যেসব ছবিতে নারী চরিত্র মুখ্য নয়, সেখানেও তাকেই ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ঘটনার স্রোত, প্রকাশিত হয়েছে চারিত্রিক দুর্বলতা বা সাহস। পার্শ্ব চরিত্রে থেকেও নারীর ভুমিকা হয়ে পড়ে কাহিনীর পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য। আসলে গত শতকের পঞ্চাশের মধ্যভাগ থেকে নব্বই এর দশক পর্যন্ত সময়ের নারীর কণ্ঠস্বর ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি তার নারীকেন্দ্রিক ছবিগুলিতে। যা এককথায় তৎকালীন সমাজেরই প্রতিচ্ছবি।

এই বিষয়ে, আমরা প্রথমেই বলতে পারি 'দেবী' র দয়াময়ী-র কথা। এখানের ঘটনা ত তৎকালীন সমাজ ও বর্তমান সমাজেরই কথা, যেখানে ঈশ্বর আরাধনার দোহাই দিয়ে নারীমনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিপীড়ন করে পুরুষশাসিত সমাজ। এপ্রসঙ্গে, আমরা বলতে পারি 'মহানগর' ছবির আরতি-র কথা। যে তৎকালীন সমাজের চাকরিজীবী মহিলাদের প্রতিনিধি। তাঁকে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। এই আরতিকে বাড়ির বাইরে বের হতে হয় জীবিকার জন্য। তার সংসারে বাড়তি রোজগারের প্রয়োজনটা তীব্র। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে এ ধরণের প্রয়োজন থাকাটা ছিল স্বাভাবিক একটা বিষয়। ষাটের দশকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থার যে হাল ছিল তাতে একার রোজগারে বাবা-মা, বোন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার চালানো ছিল খুব কষ্টসাধ্য। বাধ্য হয়েই অন্তঃপুরে থাকা বউটিকে চাকরি নিতে হয়। আরতি সেলস-গার্লের চাকরি পেয়েছিল, ঘর ছেড়ে বাইরের কাজের জগতে এসে নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে তাঁকে মানিয়ে নিতে হয়েছে নতুন পরিবেশ, নতুন লোকজন, নতুন ভাষা, নতুন কাজ ও কাজের ধরণ। আড়ষ্ট অন্তঃপুরিকা থেকে বাইরে বেরিয়ে বাইরের পরিবেশকে মানিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু সেখানেও ঘনিয়ে উঠেছিল সমস্যা। যে মানুষটির উৎসাহ ও প্রেরণায় সে বাইরে এসেছিল, সেই অতিপ্রিয় মানুষটিও তাঁকে ভুল বুঝতে শুরু করেছিল। তাঁর স্বামী সুব্রত রায় তাঁর উপরে নজরদারি শুরু করে। তাঁর এই সন্দেহের কারণ কি- হীনমন্যতা না পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নেবার অক্ষমতা? সুব্রতর এই মানসিক চাপের ব্যবহারিক প্রতিফলনকে সামলাতে হয় আরতিকে। এই আরতি ও সুব্রত -তৎকালীন সমাজেরই প্রতিনিধি।

এরপর আমরা উল্লেখ করতে পারি, 'আভিযান' ছবির গুলাবি-র কথা। গ্রামীন পরিবেশ থেকে তাঁকে জোর করে এনে উপড়ে ফেলা হয়েছে শহরে। নিজের কলঙ্কিত জীবন থাকা সত্ত্বেও, সে স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধার, দমবন্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার। গ্রামীণ পরিবেশে পালিত নিম্নবর্গের ভাগ্যের হাতে লাঞ্ছিত মেয়ে গুলাবী অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যেও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। তৎকালীন পরিবেশে এরকম লড়াকু মেয়ের প্রয়োজন ছিল, সত্যজিৎ রায় হয়তো সেই কথাই বলতে চেয়েছেন সিনেমাটির মাধ্যমে।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'ও একটি সামাজিক ছবি, ছবির দুই নারীচরিত্র জয়া ও দুলি -দুজনেই বিধবা। তৎকালীন সমাজের বিধবাদের যেসব অনুশাসন মানতে হত, তাতে আবব্ধ তারা। কিন্তু দুলি অন্য ভাবে জীবন কাটাতে চায়। বৈধব্য জীবন যে সামাজিক বিধিনিষেধে গন্ডিবদ্ধ চলার পথ করে দিয়েছে, তাঁর থেকে মুক্তি খোঁজে দুলি। শরীর ও মনের একাকার হয়ে যাওয়া জীবনযাপনে পাপ-পুন্যের দুর্বল ভেদ রেখাকে দুলি লঙ্ঘন করে অনায়াসেই। তাঁর যৌবনের টানে প্রলুব্ধ করে এক পুরুষকে। এই ছবিটি যেন বাঙ্গালী সমাজের নারীদের বৈধব্য যন্ত্রণা আর তাঁর থেকে বেরনোর জন্য মানসিক ইচ্ছা- এ দুটির টানাপোড়েনের জাজ্জ্বল্যমান দিক।[৭]

এরকমই আরেকটা সিনেমা 'জনঅরণ্য' (১৯৭৬ খ্রি)। মণিশঙ্কর মুখার্জি -র একটি উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই সিনেমা তৎকালীন ভারতের শহুরে যুবকদের হতাশাকে চিত্রিত করেছে। নায়ক একজন অল্পবয়স্ক, স্নাতক হবার পরেও চাকরি খুঁজে পেতে সে ব্যর্থ হয়। তারপর সে শুরু করে নিজের ব্যবসা এবং ব্যবসার নোংরা কৌশল গুলিকেও আয়ত্ত করে নেয়। তাঁর পরিচালিত আরেকটি বিখ্যাত সিনেমা 'অশনিসংকেত', সেখানেও ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের কথাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আসলে ১৯৫০-র দশকের মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় সিনেমাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে। আধুনিক চিন্তা ভাবনা দিয়ে সিনেমাকে তিনি দেখতেন আর স্বাধীন মতাদর্শ প্রচারের বিষয়টাও মাথায় রাখেন। তাঁর সিনেমাগুলি ছিল মানবতাবাদী, উদার ও সামাজিক ভাবে আলোকিত। ঐ সময়ের সিনেমাগুলির মত সেই অর্থে তাঁর সিনেমা বিনোদনের কারণ হয়ে ওঠেনি, কিন্তু আদতে সিনেমা গুলির বিষয় ছিল গভীর, তৎকালীন সমাজের সাথে সম্পৃক্ত। সেগুলি দেখতে বসলে দর্শকরা ভাবতে বসবে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে।[৮]

এটা ঠিক যে, সত্যজিৎ রায় বারবার বলতেন, যে তিনি বিশ্বকে পরিবর্তিত করার জন্য সিনেমা বানান না। সমকালীন অন্যান্য পরিচালকদের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি তাঁর সিনেমাতে মার্কসবাদ এর উপর বেশি আগ্রহ দেখাননি। তবে এটা রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার বিষয় নয়, প্রকাশের জায়গাটা তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। উদয়ন গুপ্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা মনে কর মৃণাল আমার চেয়ে বেশি পলিটিক্যাল কিন্তু আমি মনে করি, আমি মৃণালের থেকে অনেক বেশি পলিটিক্যাল, ছবির মধ্যে। ছবিতে প্রতিবাদ করছি"।[৯] কিন্তু তাঁর সৃষ্ট প্রতিটা চরিত্র স্বাধীনভাবে তাঁদের সামাজিক ও নৈতিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছে। অন্যদিকে, ১৯৬০-র দশকে Nehruvian view সত্যজিতের সিনেমাতে প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালে একটা ইন্টারভিউ-তে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'I admire Nehru, I understand him better,...I understood what Nehru was doing.' স্বাধীনতার ফলে আসা উদ্বেগ ও তাঁর ফিল্মে যথেষ্ট প্রকট। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২ সাল), 'মহানগর' (১৯৬৩ সাল) তার প্রমাণ। 'মহানগর'এ ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যার কথা অত্যন্ত প্রকট। স্বামীর কর্মক্ষেত্রে সমস্যা আসায় আরতি চাকরি নেয়, কিন্তু একসময় আরতিও কর্মহারা হয়। জীবন যুদ্ধ মারাত্মক রূপ নেয় তাদের।[১০] এই সিনেমাটির জন্যই তিনি 'Silver Bear' পুরস্কার জেতেন বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে।

তাই সমগ্র আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে, সত্যজিৎ তাঁর পরিচালিত সিনেমাগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজকে অস্বীকার করতে পারেননি। আসলে সত্যজিতের সিনেমাগুলির প্রধান বিষয় ছিল মানবতাবাদ। ছবিগুলি আপাত দৃষ্টিতে সরল, কিন্তু এই সরলতার গভীরে লুকিয়ে আছে মানবতাবাদ। খুব কম চলচ্চিত্র নির্মাতাই তাঁর মত করে মানবচরিত্রের বিভিন্ন মাত্রাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেছেন। এখানেই সত্যজিৎ রায়ের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র :

১। বিভাস মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), 'প্রসঙ্গ সত্যজিৎ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন', (প্রবন্ধ - বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, 'সত্যজিৎ রায়: একজন সমাজ সচেতন শিল্পী'), কলকাতা, চলচ্চিত্র চর্চা, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৮, পৃঃ ৯১

২। তদেব, পৃঃ ৯২
৩। রুদ্র আরিফ (সম্পাঃ), 'অনলাইন ফিল্ম জার্ণাল', বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০২১, পৃঃ ৪
৪। তদেব,
৫। সন্দীপ রায় (সম্পাঃ), 'সত্যজিৎ রায়ঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃঃ ৪
৬। বিভাস মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), 'প্রসঙ্গ সত্যজিৎ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন', (প্রবন্ধ - বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, 'সত্যজিৎ রায়: একজন সমাজ সচেতন শিল্পী'), কলকাতা, চলচ্চিত্র চর্চা, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৮, পৃঃ ৯৪-৯৬
৭। বিভাস মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), 'প্রসঙ্গ সত্যজিৎ : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন', (প্রবন্ধ - সুনীত সেনগুপ্ত, 'সত্যজিতের ছবিতে মনীষা, আরতি, করুণাদের কথা'), কলকাতা, চলচ্চিত্র চর্চা, দ্বিতীয় সংস্করণ – ২০১৮, পৃঃ ২৬৯-২৮০
৮। 'Talkies, Movies, Cinema'by Shyam Benegal, Indian International Centre Quaterly, Vol.38, No. ¾, in The Golden Thread: Essays in Honour of C. D. Deshmukh(Winter 2011-Spring 2012) p.366
৯। সুখেন বিশ্বাস, 'বিষয় সত্যজিৎ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২১, পৃঃ ১৯৪
১০। Satyajit Ray: Liberalism an its Vicissitudes' by Chanak Sengoopta, Cineaste, vol 34, no.4(2009). Pp. 16-22।

ভারতীয় চেতনায় প্রকৃতি ও নারী

সোনালী পাল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার ১, দর্শন বিভাগ,
নিউ আলিপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ: নারীর অবস্থান প্রকৃতির কাছাকাছি। নারী মানবজাতির জননী। প্রকৃতিও মাতা। এই অর্থে নারী ও প্রকৃতি সমার্থক। ইতিহাস আমাদের তথ্য দেয় আদিম কৃষি ব্যবস্থা নারীর হাতেই শুরু হয়েছিল। নারী তার সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণে অংশ নেয়। প্রাচীন মহাকাব্য এবং বিভিন্ন সাহিত্যেও নারী ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ফুটে ওঠে। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানুষ কর্তৃক পরিবেশ নানা ভাবে ধ্বংস হচ্ছে। ফলস্বরূপ পরিবর্তিত হচ্ছে ঋতুচক্র। বিশ্ব উষ্ণায়ন শুরু হয়েছে। পৃথিবী আজ বিপন্ন। বিপন্ন পৃথিবীর মানুষ। বিপন্ন নারী। প্রকৃতির ওপর অত্যাচার যেমন দিন দিন বেড়েই চলেছে তেমনই নারীর ওপর অত্যাচারও বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতনের ঘটনাও। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর অত্যাচারও নতুন নয়। নারী নানান ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত ও অবহেলিত। সমাজে নারীর এই নিম্নতর অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জন্ম হয় নারীবাদের। নারীবাদীরা বলেন, নারী পুরুষের পার্থক্য সমাজ সৃষ্ট। নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ। তাই নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে, মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নীতিগতভাবে অন্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘মুক্তি’ কবিতায় বলেছেন- ‘রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা/ বাইশ বছর এক চাকাতে বাঁধা।’ আসলে ভারতীয় নারী প্রকৃতপক্ষে যেন পরিবারের পরিচারিকার ভূমিকাই পালন করে। তাই পুরুষতাণ্ত্রিক সমাজ কর্তৃক নারী ও প্রকৃতির ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জন্ম হয় নারীবাদের এক নতুন ধারার। যা পরিবেশ নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজম নামে পরিচিত। পরিবেশ নারীবাদীরা নারীকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার তাগিদও অনুভব করেন। নারী ও প্রকৃতিকে তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া আজ আবশ্যক। তাই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন কেবল নারীজাতি নয়, সমগ্র মানবজাতির আন্দোলন হয়ে ওঠে।

সূচক শব্দ: প্রকৃতির সংকট, প্রকৃতি ও নারী, পরিবেশ নারীবাদ, পরিবেশ রক্ষায় নারী।

প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের বসবাস। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়বস্তু সমন্বয়ে গঠিত সমগ্রতাকে বোঝায়। পরিবেশের সকল অংশীদার জীবন ধারণের জন্য পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এই পরস্পরিক নির্ভরতাকে

পরিবেশবিদদের ভাষায় বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা Ecology. এই ভারসাম্য ব্যবস্থা ব্যাহত হলে জীব অধ্যুষিত পৃথিবী বন্ধ্যা পাষাণী পৃথিবীতে পরিণত হবে। বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনাকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বাস্তুসংস্থানের পূর্বাভাস রূপে গণ্য করতে পারি। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত সমগ্র জীবমন্ডলের মধ্যে মানুষই কেবল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। সেই জন্য পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব মানুষের। অথচ মানুষের জন্যই প্রকৃতি আজ বিপন্ন। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ, স্বেচ্ছাচারিতা, অবিবেচনার কারণে ক্রমাগত ধ্বংস হচ্ছে প্রকৃতি। ফলস্বরুপ বিশ্ব পরিবেশ আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে আগে বাঁচাতে হবে প্রকৃতিকে। বিশ্বের প্রায় সব দেশে, বিশেষত শিল্পে উন্নত দেশগুলিতে ভারী শিল্প স্থাপন, শিল্প কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদী-সমুদ্রে নিক্ষেপ, প্রকৃতি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে তার যথেচ্ছ ব্যবহার, পেট্রোল চালিত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, নদী বাঁধ নির্মাণ, বিজ্ঞানের প্রভাব ইত্যাদি কারণে পরিবেশ অতি দ্রুত গতিতে দূষিত হচ্ছে। তাই অরণ্যধ্বংস, বায়ুদূষণ, জল দূষণ- এর ফলে আজ জীববৈচিত্র্য বিঘ্নিত। গাছপালা বনাঞ্চল কেটে সেখানে শিল্পনগরী স্থাপন করার ফলে সেই বনাঞ্চলে আশ্রিত পশুপক্ষীর জীবন সঙ্কটে পড়ে। এই অবস্থায় হয় তারা অন্যত্র আশ্রয় নেয়, লোকালয়ে প্রবেশ করে অথবা খাদ্যের অভাবে তাদের মৃত্যু ঘটে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমেই বিঘ্নিত হয়ে পড়ছে। যথেচ্ছভাবে অরন্য ধ্বংস এবং নানান রকম দূষণের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন শুরু হয়েছে। পরিবর্তিত হচ্ছে ঋতুচক্র। পৃথিবী আজ বিপন্ন। বিপন্ন পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী। পরিবেশ সচেতন মানুষ, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আজ পরিবেশের বিপন্নতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা বলেন এই বিপর্যয় রুখতে আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে পরিবেশ সচেতনতা আজ একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে। একমাত্র মানুষই পারে এই পৃথিবীকে তার বাসযোগ্য করে তুলতে।

মানুষ প্রকৃতির অংশ। নারীর অবস্থান প্রকৃতির কাছাকাছি। করণ নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতি পরিবেশের প্রতি নারীর এক গভীর টান আছে। প্রকৃতির সাথে নারীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। নারীর জৈবিক, প্রজনন, মানসিক ও সামাজিক অবস্থান নারীকে প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ ও প্রকৃতিবান্ধব করে তুলেছে। তাই নারীই পারে প্রকৃতির যথার্থ যত্ন নিতে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নানান দিক থেকে অত্যাচারিত, অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত ও নিপীড়িত। প্রথাগত মত অনুসারে জৈবিক ও দেহগত পার্থক্যের জন্য নারীর দৈহিক শক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। নারী অপেক্ষাকৃত কম যুক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বেশি আবেগপ্রবণ। পুরুষকেন্দ্রিক মতবাদ অনুসারে নারীর কর্মক্ষেত্র ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র। নারীর কাজ সন্তান প্রতিপালন, পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যা, গৃহকর্ম পরিচালনা ইত্যাদি।

মনুসংহিতাতেও নারীর জীবনকে পরাধীন বলা হয়েছে। বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। তাই সমাজে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান এবং নারীর ভূমিকা অপ্রধান। সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর এই নিম্নতর অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ জন্ম হয় নারীবাদের। নারীবাদ হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিরোধী এক মতবাদ। নারীবাদীরা বলেন নারী পুরুষের মধ্যে স্বভাবগত কোনো পার্থক্য নেই, উভয়ই মানুষ। তাই সমাজে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা নীতিগতভাবে অন্যায়। বিভিন্ন প্রকারের নারীবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সকল নারীবাদীরাই একমত। নারী পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে নারীকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনাই তাদের লক্ষ্য। নারীবাদী আন্দোলন আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনের আন্দোলন। বাংলায় সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ বিলোপ ঘটিয়ে নারীমুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সমাজে নারীর অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করেন বিদ্যাসাগর। রাবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বেশ কিছু নারী চরিত্রে আমরা প্রতিবাদী সত্তা দেখতে পাই। সমাজে নারী জাতির জাগরণের জন্য বিশ্বভারতীর নাট্যমঞ্চে মেয়েদের দিয়ে নৃত্য-গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার মূলে নাড়া দেন রবীন্দ্রনাথ। নারী জাতির উন্নতি না হলে, নারী সুরক্ষা সুরক্ষিত না হলে সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ নারী হল অর্ধেক আকাশ। তাই সুস্থ সমাজের প্রয়োজনে নারী জাতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার বার্তা দেন নারীবাদীরা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?'

নারী-পুরুষের সম্পর্ক প্রভু ও দাসের নয়। এই সম্পর্ক সমান্তরাল। অন্যদিকে পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পরিবেশকে শুধু নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার, ধ্বংস করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। এই দুটি বিষয়কে উপলব্ধি করেন নারীবাদীরা। জন্ম হয় নারীবাদের এক নতুন ধরার। যা পরিবেশ নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজম নামে পরিচিত। ফরাসি দার্শনিক লেখক ফ্রাসোয়াঁ দ্যুবন ১৯৭৪ সালে ইকোফেমিনিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন তার 'Le Feminisme ou la Mort' গ্রন্থে। নারী ও প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিষয়ে আলোচনা আছে এই বইটিতে। মাটি, জল, বাতাস, আলো ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি বীজ যেভাবে আস্তে আস্তে বনস্পতি হয়ে ওঠে সেইভাবেই মাতৃগর্ভে প্রতিদিন একটি ভ্রূণ ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ শিশুর রূপ নেয়। প্রকৃতির মতো নারীও প্রাণের প্রতিপালক। প্রকৃতি স্রষ্টা, নারীও স্রষ্টা। এই অর্থে নারী ও প্রকৃতি সমার্থক। নারী প্রকৃতিস্বরূপা। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী প্রকৃতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, লালন ও বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে নারীরা।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি আদিম কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল নারীর হাতে। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের প্রক্রিয়াটি প্রথম আবিষ্কার করেন নারীরাই। নারী তার সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণে অংশ নেয়।

প্রাচীনকাল থেকে নানা ধর্মে নারীকে ঈশ্বর বা দেবীরূপে দেখা হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন ধর্মীয় পুরাকথায় মাতৃদেবীর কথা উল্লেখ আছে। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নারী ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করা হয়। সনাতন হিন্দু ধর্মে দেবী দুর্গাকে প্রকৃতির ঈশ্বরী মনে করা হয়। ভারতের প্রথম সভ্যতারূপে আমরা সিন্ধু সভ্যতার নাম পাই। সিন্ধু সভ্যতা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এই সময়ের কোনো লিপি পাওয়া যায়না, কিন্তু এই সভ্যতার প্রাপ্ত মূর্তি থেকে আমরা জানতে পারি সেই সময় মাতৃদেবীর আধিক্য বেশি ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবসানে নারী জাতির উপর শুরু হল অত্যাচার, অবিচার। যদিও ঋক বৈদিক যুগ পিতৃতান্ত্রিক হলেও এই যুগের নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এই যুগের বহু নারী শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রেখেছেন। তারা বৈদিক মন্ত্র রচনার পাশাপাশি পুরুষদের সঙ্গে ধর্মচর্চা করতেন। বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা সেই যুগের নারী গার্গী, অপালা, লোপামুদ্রার নাম পাই। বেদে অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য দেবী দুর্গার স্তুতি যেমন আছে, তেমনই পরিবেশের আরাধনার কথাও আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের প্রয়োজন উপলব্ধি করে প্রকৃতিকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করেন বৈদিক ঋষিরা। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতি পুজোর উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা কর মায়ের মতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে কন্যা সন্তানকে সমাজের অভিশাপ মনে করা হত। নারীরা যখন সংসারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল তখন নারীদের অবনমনের পাশাপাশি শুরু হল প্রকৃতির উপর অত্যাচার।

বিভিন্ন সময় মহাকাব্যেও নারী ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। রামায়ণে সীতার জন্ম বৃত্তান্তেও আমরা প্রকৃতিকেই পাই। তাই সীতাকে প্রকৃতি কন্যা বলা হয়। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মিথিলার রাজা জনক যজ্ঞ ভূমি চাষ করার সময় লাঙ্গলের আঘাতে ভূমি বিদীর্ণ করে সীতার জন্ম হয়। অর্থাৎ সীতার সাথে প্রকৃতির নিবিড় যোগসূত্র। রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড অরণ্যকান্ডে আমরা দেখতে পাই সীতা হরণের সংবাদে রাম প্রথম বনরাজিকেই প্রশ্ন করেছিলেন সীতা কোথায় আছেন? রামের মনে হয়েছিল সীতা বিহনে শুধু তিনিই মর্মাহত হননি, কুটীর প্রাঙ্গণের গাছপালা, পাখি, হরিণ সবই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বনদেবী যেন বন ছেড়ে চলে গেছেন। কারণ সীতা এই গাছগুলিকে জল দিতেন, তাদের যত্ন করতেন। তাই কদম্ব, বিল্ব, অর্জুন, পুরুবক, বকুল, অশোক, তিল্রব, করবী, তাল, জাম প্রভৃতি বৃক্ষ এবং পদ্ম বনের কাছেও তিনি সীতার খোঁজ নিয়েছেন। বৃক্ষরাজিকে নিরুত্তর দেখে তিনি গোদাবরী নদীকে জিজ্ঞাসা করলেন সীতাকে দেখেছে কিনা। সেখানেও কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি একদল

হরিণের কাছে সীতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। রাবণ যেদিকে সীতাকে নিয়ে গিয়েছে হরিণগুলি করুণ দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। এর পরবর্তীতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রাণী সীতা উদ্ধারের সময় রামকে সাহায্য করেছিল।

কালিদাসের বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এও আমরা শকুন্তলার ও তপোবনের তপস্বীদের সাথে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক দেখতে পাই। রাজা দুষ্মন্ত কর্ণের তপোবনে প্রবেশ করে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করতে গেলে তপস্বী তাকে বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজ, আশ্রম-মৃগ বধ করবেন না। তপস্বীর এই কাতর অনুরোধ পরিবেশ সচেতনতার এক গভীর ইঙ্গিত বহন করে। এতদিন আগের তপস্বীর এই কাতর অনুরোধ আসলে ইকোফেমিনিস্ট ও পরিবেশ সচেতক মানুষের মনের কথাই বলে। মহর্ষি কর্ণের তপোবনে মানুষ, প্রকৃতি ও মানবেতর প্রাণীরা নির্বিবাদে বাস করত। তাদের সম্পর্ক ছিল সহমর্মিতার। রাজা দুষ্মন্তকে এখানে নগর সভ্যতার প্রতীক রূপেই যেন দেখানো হয়েছে। তপোবনের যে বৃক্ষ ও অন্যান্য প্রাণীদের শকুন্তলা এতোকাল মাতৃস্নেহে লালন পালন করত পতিগৃহে যাত্রা কালে তাদের সম্বোধন করে মহর্ষি কর্ণ বলেন, শকুন্তলা পতিগৃহে যাচ্ছে তোমরা অনুমোদন কর। আসলে এখানে উদ্ভিদ জগৎকেও প্রাণবান মনে করা হয়েছে। কর্ণের এই উক্তি থেকে শকুন্তলা ও অরণ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক প্রতিভাত হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই শকুন্তলা নগর সভ্যতা থেকে ফিরে আসে মারীচের আশ্রমে। প্রকৃতির মধ্যে ফিরে তার মন শান্ত হয়।

প্রাচীনকাল থেকে নারীরা সংসারের হাল ধরে। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি কৃষিকাজ, জ্বালানি সংগ্রহ, বৃক্ষরোপণ, খাদ্য উপাদান সংগ্রহ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে প্রকৃতিকে যদি আমরা রক্ষা করতে পারি তাহলে নিজেদেরও সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। যেহেতু নারীর মন জগৎ পুরুষের থেকে ভিন্ন। নারীর মন মমতায় পরিপূর্ণ। যেভাবে নারী নিজের পরিবারকে স্নেহ, মায়া, মমতায় আগলে রাখে সেভাবে নারীই পারে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ যত্ন নিতে। কিন্তু প্রকৃতির উপর অত্যাচার, নারীর উপর অত্যাচার, নির্যাতন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। প্রকৃতিকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করার ক্ষমতা যেমন মানুষের আছে, একই ভাবে নারীর উপর অত্যাচার করার ক্ষমতা, অধিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আছে। তাই প্রকৃতির উপর বিজ্ঞানের এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে পুরুষ দ্বারা নারীকে ধর্ষণ পক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন অনেকে।

আধুনিক সাহিত্যেও নারী ও প্রকৃতিকে সমার্থক দেখা হয়েছে। রাবীন্দ্রনাথ ভূমির সঙ্গে নারীর জীবনের তুলনা করেছেন। ভূমি নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে বৃক্ষের বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, বৃক্ষের বৃদ্ধিকে নিজ সীমার মধ্যে রাখে। বৃক্ষ তার স্বাভাবিক নিয়মে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। রাবীন্দ্রনাথের মতে, নারীর মধ্যেও এই প্রকার নিষ্ক্রিয় গুণ নিহিত আছে।

যে নিষ্ক্রিয় গুণাবলীর দ্বারা নারী জীবনকে সুস্থ রাখে, জীবনের জন্য যা অপরিহার্য। এই নিষ্ক্রিয় স্বভাবের মধ্যেই জীবনের সম্ভাবনা নিহিত। তাই নারী মানবজাতির জননী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যে বহু স্থানে নারীকে কখনও প্রকৃতির কন্যারূপে আবার কখনও স্বয়ং প্রকৃতিরূপে অভিহিত করেছেন। গীতবিতানের বিচিত্র পর্যায়ে তিনি নারীকে প্রকৃতি কন্যা বলেছেন- 'আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা-/তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা।।' আবার 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় প্রকৃতির অপরূপ রূপের বর্ণনা দিয়ে প্রকৃতিকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন এইভাবে,- '......নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি/ গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।' জীবনানন্দ দাশ 'রূপসীবাংলা'তে তাঁর জন্মভূমিকে মাতারূপে দেখেছেন। এছাড়াও মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখরাও জন্মভূমিকে মাতারূপে কল্পনা করেছেন।

পরিবেশ রক্ষায় নারীর আত্মত্যাগের ইতিহাস নতুন নয়। পরিবেশ রক্ষায় নারীর আন্দোলন নারীর অধিকার আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। যেখানে নেতৃত্ব দেয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরা। যেমন- ভারতের চিপকো, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। পরিবেশের বিপর্যয়ে যে কেবল নারীজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, এর প্রভাব সবার উপরই পড়ে। তাই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন সবার আন্দোলন হয়ে ওঠে। পরিবেশ নারীবাদতত্ত্ব আজ বিশ্বব্যাপী জায়গা করে নিয়েছে। শিক্ষিত নারীর পাশাপাশি বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিরক্ষর নারীদের মাঝেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। নরওয়ের অস্ লো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আর্নে নেস গভীর বাস্তুতন্ত্রের উল্লেখ করেন। যেখানে সমগ্র জীবমণ্ডলের (Biosphere) স্বার্থ চিন্তা করা হয়। পরিবেশের অন্তর্গত সব কিছুই (জড়-অজড়) এই নৈতিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। গভীর বাস্তুবাদ অনুসারে জীব ও অজীব অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ায় জীব ও অজীব উভয়ই নিজ মূল্যে মূল্যবান। অর্থাৎ স্বতঃমূল্যবান। পরিবেশের অন্তর্গত কোন একটি প্রজাতি (জীব ও অজীব) ক্ষতিগ্রস্ত হলে সমগ্র বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে পড়বে। তাই সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন সমাজে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে, নারী সুরক্ষা সুরক্ষিত করে নারীজাতিকে পূর্ণ মর্যাদা ও স্বাধীনতা অর্পণ। নারীকে নিজ মর্যাদাসহ বেঁচে থাকার অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করা হয় তাহলে মানব সমাজ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। তাই সমগ্র জীবমণ্ডলের স্বার্থ চিন্তা করে প্রকৃতি ও নারীর নিজ মূল্য অর্থাৎ স্বতঃমূল্য স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশকে বাঁচিয়ে নারীকে সমান অধিকার দিলেই এই পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তার জন্য প্রয়োজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিন্তার সংস্কার। নারীকে যেমন গৃহলক্ষ্মী বলা হয় তেমনই নারীর নতুন পরিচয় হয়ে উঠবে পরিবেশ-লক্ষ্মীরূপে।

তথ্যসূত্র:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯১৮)। পলাতক। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্হালয়। পৃ: ১৭।
গুপ্ত, দীক্ষিত। (২০১৭)। নীতিশাস্ত্র। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু। (২০২০) মনুসংহিতা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯২৯)। মহুয়া। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্হালয়। পৃঃ ৬৩।
মৈত্র, শেফালী। (২০০৭) নৈতিকতা ও নারীবাদ। কোলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯০০)। কাহিণী। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্হালয়।

‘শুকতারা’র প্রথম পঁচিশ বর্ষে প্রকাশিত ছোটোগল্প : সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি (১৩৫৪ – ১৩৭৯)

শুভঙ্কর ঘোড়ুই
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ (Abstract) : ‘শুকতারা’ হল ছোটোদের জন্য বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় একটি মাসিক পত্রিকা। স্বাধীনতার পর থেকে প্রকাশিত এই প্রাচীন পত্রিকাটি বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। সাহিত্য হল একপ্রকার সমাজের দর্পণ। আমরা এই আলোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির (Historical Criticism) ওপর ভিত্তি করে ‘শুকতারা’য় প্রথম পঁচিশ বর্ষে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে কীভাবে সমসাময়িক ছবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে তাই বিশ্লেষণ করবো।
সূচক / মূল শব্দ (Key Word) : শুকতারার গল্প, ছোটোদের পত্রিকা, শিশু-কিশোর সাহিত্য, গল্পে সমকাল।

মূল আলোচনা (Discussion) :
আমাদের মূল আলোচনার ভিত্তি যেহেতু সমকাল তাই আমরা পুরো আলোচনাটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির ওপর (Historical Criticism) ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করবো। Historical Criticism প্রবক্তা হিপোলাইত তেইন এক্ষেত্রে বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো শিল্প (Art) বা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পি বা সাহিত্যিকের Race (জাতি), Milieu (পরিবেশ) এবং Moment (মুহূর্ত/কাল) এই তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য কাজ করে থাকে—

> ‘Race, milieu, and moment, according to the French critic Hippolyte Taine, the three principal motives or conditioning factors behind any work of art. Taine sought to establish a scientific approach to literature through the investigation of what created the individual who created the work of art.’[১]

অর্থাৎ কোনো সাহিত্যকে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে সেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে জাতি, পরিবেশ ও সমকালের প্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। আমরাও এখানে ‘শুকতারা’র প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত বেশ কিছু গল্পকে এই পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই আলোচনা করবো। ‘শুকতারা’র একাধিক গল্পে সমকালীন অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। এই পত্রিকার টার্গেট রিডার যেহেতু

ছোটরা, তাই তাদের মতো করে হালকা চালে এই পরিস্থিতিগুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

স্বাধীনতার ঠিক ছ'মাস পরেই প্রকাশিত হচ্ছে 'শুকতারা' (ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮)। সুতরাং, এই পত্রিকা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষের বুকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। যেগুলি হলো—

১) সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তি
২) স্বাধীনতার পরেই দেশভাগ
৩) দেশভাগের সূত্র ধরে উদ্বাস্তু সমস্যা
৪) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
৫) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সদ্য পরিসমাপ্তি

এই ঘটনাগুলির প্রভাব বারংবার শিল্প ও সাহিত্যে উঠে এসেছে, 'শুকতারা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই পত্রিকার একাধিক গল্পে ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব গাথা বর্ণিত হয়েছে। গণেশচন্দ্র মজুমদারের 'স্বাধীনতার বেদীমূলে' (পৌষ ১৩৫৬), শ্রীপ্রশান্তের 'শহীদ' (ভাদ্র ১৩৫৭), প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ভালুকওয়ালা' (ভাদ্র ১৩৬১), নকুল মুখার্জীর 'আমার দেশের মানুষ' (পৌষ ১৩৬২), সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'আজাদ হিন্দের অজয় নন্দী' (আশ্বিন ১৩৬৩), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'আমার দেশের মানুষ' (ভাদ্র ১৩৬৪) ইত্যাদি গল্পগুলি হল তার কয়েকটি উদাহরণ। এই সমস্ত গল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরত্ব ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এরপর খন্ডিত স্বাধীনতার সঙ্গে সাইড এফেক্টের মতোই এলো দেশভাগ, আর তার সূত্র ধরেই অবধারিতভাবে চলে আসে উদ্বাস্তু সমস্যা। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এই দুই বিষয়ের ওপর ভিত্তিকরে অসংখ্য লেখালেখি হয়েছে, 'শুকতারা' পত্রিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন, সরোজিৎ বাগচীর লেখা 'মাতৃভক্ত' (অগ্রহায়ণ ১৩৬৪), শান্তিকণা দত্তের 'কাঁঠালতলার আতঙ্ক' (অগ্রহায়ণ ১৩৭২), লক্ষ্মীকান্ত চাউলের 'পরিণাম' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) ইত্যাদি গল্পগুলিতে উঠে এসেছে দেশভাগের করুণ চিত্র।

'মাতৃভক্ত' গল্পে সরাসরি দেশভাগের প্রসঙ্গ উঠে এলেও এখানে মানবিকতার একটি দিক পরিস্ফুটিত হয়েছে। সেই মানবিকাতার টানেই কাঁটাতারের বেড়াজাল কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই গল্পে দেখি—

> 'বাংলাদেশ ভাগ হয় ১৯৪৭ সালের ১৫-ই অগাষ্ট। ভাগাভাগির ফলে উত্তর-বঙ্গের রংপুর জেলা পড়ে পাকিস্থানে আর জলপাইগুড়ি পড়ে হিন্দুস্থানে। এই পাকিস্থান হিন্দুস্থান সীমানার এক বন্দরে এসে ডাক্তারি ব্যবসা শুরু করে বগুড়ার ডাক্তার গোবিন্দ রায়।...পাকিস্থানের সীমানা পেরিয়ে অনেক হিন্দু মুসলমান তার ডাক্তারখানায় এসে ভিড় জমায়। সীমানা রক্ষীরা এইসব দুঃস্থ

> লোকেদের ওষুধ পত্র নিয়ে যাতায়াতে কোনো বাধা দিত না বরং সহায়তাই করত।'[২]

আর বাকি দুই গল্পে প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে পূর্বপাকিস্থানের স্মৃতিমেদুর ছবি। 'কাঁঠালতলার আতঙ্ক' গল্পটির শেষে আমরা দেখি দেশভাগের পর 'দেবগ্রাম পাকিস্থানে পড়ছে', আবার 'পরিনাম' গল্পে দেখি শিক্ষক 'হরিশবাবুর বাড়ি ছিল পাকিস্থানে'।এই স্মৃতি চারণের মধ্যে দিয়েই এই দুই গল্পে দেশভাগের আক্ষেপ ফুটে ওঠে।

তবে দেশভাগের ফলে মূল যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি হল উদ্বাস্তু সমস্যা। এই উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে 'শুকতারা'য় প্রকাশিত গল্পগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

ক্রম	গল্পের নাম	গল্পের লেখক	প্রকাশকাল
১	দুঃখের ইতিহাস	অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯
২	গরীবের অভিমান	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	বৈশাখ ১৩৬১
৩	নাগকেশরের চারা	অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী	ফাল্গুন ১৩৬১
৪	ভগ্নদূত	অমরনাথ মুখোপাধ্যায়	কার্তিক ১৩৬৩
৫	ভয়	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	চৈত্র ১৩৬৪
৬	মায়ের মায়া	মৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত	কার্তিক ১৩৬৫

'দুঃখের ইতিহাস' গল্পে মেধাবী ছাত্র কিশোর বরিশাল ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয় এপার বাংলায়। পেট চালাবার তাগিদে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ছবি বিক্রি করতে বাধ্য হয় সে। তাই এই গল্পে কিশোরের জবানিতে উঠে আসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার একটি করুণ চিত্র—

> 'হঠাৎ শুনলাম আমরা নাকি স্বাধীন হয়েছি — আর সেই স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে ছেড়ে দিতে হবে আমাদের গ্রামকে।'[৩]

একইভাবে 'গরীবের অভিমান' গল্পে দেখতে পাই এক পরিবারের বাড়ি ছিল পূর্বপাকিস্থানে। পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা এসে উঠতে বাধ্য হয়েছে এপার বাংলায়। আবার 'নাগকেশরের চারা' গল্পে কেষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকারহয়েছে —

> 'ভদ্রলোকের আদি নিবাস নোয়াখালি—দূর সম্পর্কের জমিদার রাজেন্দ্রলাল রায়ের আত্মীয়। অবস্থা বরাবরই বেশ ভালো। ছোটখাটো জমিদার। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর পরিবারের অনেকে এখানে-ওখানে দলভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে পড়েন। কেষ্টও কোনরকমে একটি পলায়নপর দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসে লুকিয়ে।'[৪]

এরপর, 'ভয়' গল্পে সীতা ও তার পরিবারকে সহায়সম্বলহীন হয়ে টালার রিফিউজি ক্যাম্পে চলে যাবার জন্য জোর করা হয়। আবার 'ভগ্নদূত' গল্পে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ; সেখানে দেখতে পাই—

> 'দলে দলে লোক আসছে কোলকাতায়, কি মোহ আছে ওর ফুটপাতে কে জানে! হাজার হাজার লাখ লাখ লোক দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে কুকুর শিয়ালের মতো মরছে ড্রেনের ধারে ডাষ্টবিনের পাশে। — তবু তারা আসছে।'[৫]

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ছাড়াও ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ ছবি সরাসরিভাবে উঠে আসে 'শুকতারা'র গল্পে। এই পরিসরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে 'শুকতারা'য় প্রকাশিত গল্পগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

ক্রম	গল্পের নাম	গল্পের লেখক	প্রকাশকাল
১	কি বেশে এলে ফিরে	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	কার্তিক ১৩৫৮
২	অবলার বল	শ্রীমতী বীণা দেবী	চৈত্র ১৩৫৬
৩	হারানো সুর	মো. এনামুল হক	বৈশাখ ১৩৫৭
৪	জীবননাট্যের ট্রাজেডি	শ্রীঅনাহূত	ভাদ্র ১৩৬০
৫	নাগকেশরের চারা	অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী	ফাল্গুন ১৩৬১

'কি বেশে এলে ফিরে' গল্পটি পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে একটি ডানপিটে ছেলের গল্প বলা হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদের পর চতুর্থ পরিচ্ছেদে এসে হঠাৎই গল্পটির অভিমুখ বদল হয়ে যায়। চলে আসে সমকালীন অগ্নিদগ্ধ পরিস্থিতির চিত্র। তাই চতুর্থ পরিচ্ছেদটি শুরু হয় এইভাবে —

> 'উনিশশো ছেচল্লিশ সালের আগষ্ট মাস—কলকাতায় চলছে ভীষণ মারামারি।...সারা শহরে মিলিটারী পাহারা চলছে...'[৬]

দাঙ্গা বেঁধেছে, আর এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খেসারত দিতে হয়েছে মহীনের মতো ছেলেদের। গল্পের করুণ পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই ধর্মীয় দাঙ্গার হিংসাত্মক দিকটিকেই এখানে দেখানো হয়েছে।

অপরদিকে 'জীবন-নাট্যের ট্রাজেডি' গল্পে প্রহ্লাদের মতো কিশোরেরা দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। এই গল্পেও সরাসরিভাবে উঠে আসে দেশভাগ ও দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র—

> 'সহসা একদিন সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা দাবানল!...হাহাকার আর মৃত্যু আর্তনাদে পূর্ব্ববাংলার আকাশ ভারী হয়ে উঠলো।'[৭]

'হারানো সুর' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দুই বন্ধু আব্দুল ও নীহারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে মানবিকতা বোধকে পরিস্ফুটিত করা হয়েছে। গল্পের শেষে তাই দুই বন্ধু এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—

> 'বাঙ্গালী হিন্দু আর মুসলমানের কোনো পৃথক ধর্ম্ম হতেই পারে না। তাদের একমাত্র ধর্ম্ম ও জাত—তারা বাঙ্গালী, একই দেশের ছেলেমেয়ে।'[৮]

এছাড়াও, এই পত্রিকা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তার কয়েক বছর আগেই সমাপ্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাই প্রথমদিককার একাধিক গল্পে দেখা করা যায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেবক' (ফাল্গুন ১৩৫৪), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শকুনি দেবতা' (আষাঢ় ১৩৬৪) ইত্যাদি গল্পে যুদ্ধের বিভৎস দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও, নীলরতন দাসের 'স্মৃতিচিহ্ন' (আশ্বিন ১৩৬০), চিত্তরঞ্জন রায়ের 'অবাস্তব যখন বাস্তব হয়' (শ্রাবণ ১৩৭৯), ময়ূখ চৌধুরীর 'অগ্নিপরীক্ষা' (ফাল্গুন ১৩৭৬) ইত্যাদি গল্পেও সরাসরিভাবে উঠে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ কয়েকটি দিক।

এইভাবেই কখনো ক্লেদাক্ত সময়ের পঙ্কিল চিত্র আবার কখনো কালো সময়ের মাঝেও মানবতার নিদর্শন দেখা গিয়েছে 'শুকতারা'র প্রথম পঁচিশ বছরে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে। তাই এই গল্পগুলি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, এগুলি সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও খুব গুরত্বপূর্ণ।

এরপর স্বাধীনতার বেশ কিছু পরে শুরু হয় ভারত-চীন যুদ্ধ (১০-ই অক্টোবর ১৯৬২)। এই আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়েও একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে শুকতারা পত্রিকার পাতায়। ভারত-চীন যুদ্ধ বিষয়ক গল্পগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া যেতে পারে—

ক্রম	গল্পের নাম	গল্পের লেখক	প্রকাশকাল
১	বীর নওজোয়ান	দৃষ্টিহীন	পৌষ ১৩৬৯
২	৫ই নভেম্বর ১৯৬২ (পুরস্কৃত গল্প)	সুপ্রকাশ সিংহ	পৌষ ১৩৬৯
৩	স্মরণীয় হয়ে রইল (পুরস্কৃত গল্প)	নীলিমা সেনগুপ্ত	পৌষ ১৩৬৯
৪	ভারত কভু হটতী নেহি	অলককুমার ঘোষ	মাঘ ১৩৬৯
৫	অপরাধ নয় (পুরস্কৃত গল্প)	দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	চৈত্র ১৩৬৯
৬	যুদ্ধ মন্ত্র (পুরস্কৃত গল্প)	প্রতিমা সেনগুপ্ত	চৈত্র ১৩৬৯
৭	আলোয় ফেরা (পুরস্কৃত গল্প)	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	আষাঢ় ১৩৭০
৮	স্মার্ট মেয়ে মালবিকা	দীপালী দত্ত	আষাঢ় ১৩৭০

সুধীন্দ্রনাথ রাহা অলককুমার ঘোষ ছদ্মনামে ‘ভারত কভু হটতী নেহি’ গল্পে ভারতীয় সৈনিকদের বীরত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পে ভারত-চীন যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি কল্পিত কথোপকথন লক্ষ্য করা যায় —

> ‘—কি সংবাদ?
>
> —পঁচিশজন চীনা পেট্রোল পার্টি আমাদের ওয়ালং ঘাঁটির দিকে আসছিল। আমাদের বাহিনীর পাঁচজন রক্ষীই তখন টহল দিয়ে ফিরছিল।
>
> —কি হল তারপর?
>
> —যা হয়!
>
> —অর্থাৎ?
>
> —গুলি বিনিময়। দশজন চীনা সৈনিক মৃত্যুবরণ করতে বাকিগুলো চোঁচাঁ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।
>
> —এ তো সুখবর!’[৯]

এই ভারত-চীন যুদ্ধ ছাড়াও ভারত-পাকিস্থান মধ্যে যুদ্ধকালীন চিত্র ‘শুকতারা’র একাধিক গল্পে উঠে এসেছে। শ্যামলেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের ‘জীবনের জয়গান’ (ফাল্গুন ১৩৭২), সুধীন্দ্রনাথ রাহার ‘শহীদের রক্ত’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫), লক্ষ্মীকান্ত ঘোষের ‘মাতৃপূজা’ (পৌষ ১৩৭৮) ইত্যাদি গল্পগুলি হল তার উদাহরণ।

হাড়হিম করা ভৌতিক গল্পের মধ্যেও কখনো কখনো পরোক্ষভাবে উঠে আসে সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি; শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ‘ডানপিটে সতু’ (অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) তারই একটি উদাহরণ। এই গল্পে ভৌতিক পরিবেশের আবহেও একটি সংলাপের মধ্যে ৭০-এর দশকে নক্‌শাল আন্দোলনের একটি পরোক্ষ চিত্র উঠে আসে —

> ‘সতু বলল, কি বিপদ হলো? নকশালরা হামলা চালাচ্ছে নাকি? না কম্যুনিস্টদের উৎপাত শুরু হয়েছে।’[১০]

এইভাবেই ‘শুকতারা’র প্রথম ২৫ বছরের গল্পে দেশীয়, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছোটদের মতো করে তুলে ধরা হয়েছে।

অ্যারিস্টটলের কথায়, মানুষ হল সামাজিক জীব। তাই এসবের বাইরেও সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও ‘শুকতারা’র বেশ কয়েকটি গল্পকে আলোচনা করা যায়। ধনী-দরিদ্র্যের মধ্যে শোষক আর শোষিতের যে সম্পর্ক তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে সুজিতকুমার বসুর ‘চাকর’ (আশ্বিন ১৩৫৮) গল্পের মধ্যে দিয়ে। তাই শেষ পর্যন্ত চাকর বুদ্ধুর উপলব্ধি হয়—

> ‘পৃথিবীতে মাত্র দুটো জাত আছে। একদল বড়লোক আর একদম গরীব; একদল মনিব আর একদল চাকর। যারা বড়লোক, তারা মনিব—পৃথিবীর সব সুখ-সম্পদ ভোগের অধিকার একমাত্র তাদেরই। আর যারা গরীব, তারা বড়লোকদের চাকর।...তাদের শোষণ করবে ধনীরা।’[১১]

এছাড়াও, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দরিদ্র-নারায়ণ' (মাঘ ১৩৫৮) গল্পে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ দেখানো হলেও দরিদ্র শ্রেণীকে নারায়ণ স্বরূপে দেখা হয়েছে।

এই পত্রিকাটি যেহেতু ছোটদের উদ্দেশে প্রকাশিত, তাই তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এখানে পশুপাখি ও জীবজন্তুবিষয়ক বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এরই মধ্যে একাধিক জীবজন্তুবিষয়ক গল্পের রূপকে সমকালীন সমস্যা ও পরস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির অযাচিত ধর্ম্মঘট ও হরতাল করার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করা হয়েছে পরিমল গোস্বামীর 'একটি প্রতিবাদ সভা' (কার্তিক ১৩৫৫) গল্পে। এই গল্পটি শুরুর মুখেই সম্পাদকীয় তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে একটি মুখবন্ধ—

> 'প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট ও হরতাল কি কেবল মানুষেরই একচেটিয়া? পশু পক্ষীদের কি কোনো অভিযোগ নেই?—তারই সুস্পষ্ট জবাব এই গল্পে।'[১২]

আবার, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সবাই কি কম্যুনিষ্ট?' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬) গল্পে জীবজন্তুর রূপকে উঠে আসে তৎকালীন ভাররবর্ষের একটি চিত্র। তাই গল্পের মুখবন্ধে সম্পাদকীয়'র তরফ থেকে লেখা হয়—

> 'চোখ-কান সজাগ রেখে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সমাজেই আজও কী গভীর অসন্তোষ! স্বপ্নেও সে ছবি আমি ভুলতে পারবো না কখনো।'[১৩]

জীবজন্তু বিষয়ক গল্পের আড়ালে এই ভুলতে না পারা শ্রেণী দ্বন্দ্বের অসন্তোষের ছবিই হয়ে উঠেছে 'সবাই কি কম্যুনিষ্ট?' গল্পের মূল উপজীব্য।

এগুলি ছাড়াও, বেশ কিছু সামাজিক গল্পে সরাসরিভাবে উঠে এসেছে সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি। যেমন, জাত-পাত সমস্যার একটি কালো দিককে তুলে ধরা হয়েছে দিলীপ রায়ের 'রথযাত্রা' (আষাঢ় ১৩৬২) গল্পে। এখানে জাতপাত সমস্যার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে একটি শিশু। আবার, রেশেনের কাঁকড় মিশ্রিত চাল নিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লেখেন ব্যঙ্গাত্মক হাসির গল্প 'চা'ল মেশানো কাঁকড়' (শ্রাবণ ১৩৬৮), প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'পথ ভুল' (কার্তিক ১৩৬৪) গল্পে উঠে আসে কালোবাজারির দৃশ্য। এই গল্পে পুত্র তার পিতাকে ভুল পথ থেকে বের করে নিয়ে আসে। সন্ধ্যা রায়ের 'যা হচ্ছে আজকাল' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) গল্পে দেখা যায় স্কুলে পিকেটিং, রাজনীতির প্রবেশ ঘটছে একটু একটু করে। এছাড়াও রীণা মিত্রের 'বিধাতার অভিশাপ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭) ও আবদুর রসিদ মণ্ডলের লেখা 'আমার বোনের একটি স্মরণীয় স্মৃতি' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) গল্প দুটিতে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। এইভাবেই, সমাজ, রাজনীতি, মানবিকতা, অমানবিকতা, ধনী-দরিদ্র ও সমাজের আরও নানান সমস্যা উঠে এসেছে 'শুকতারা'র প্রথম ২৫ বছরে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে।

ফলত এই পত্রিকা ছোটদের ভালোলাগার পাশাপাশি একদিক দিয়ে হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ।

তথ্যসূত্র (References) :

১. Article Title: race, milieu, and moment, Website: Encyclopaedia Britannica, Publisher: Encyclopaedia Britannica, Inc., Date Published: 20 July 1998, URL link: https://www.britannica.com/art/race-milieu-and-moment

২. বাগচী, সরোজিৎ, মাতৃভক্ত, 'শুকতারা' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৪, কলকাতা, পৃ. ৭০৮

৩. ভট্টাচার্য্য, অমরেন্দ্রনাথ, দুঃখের ইতিহাস, 'শুকতারা' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, কলকাতা, পৃ. ২৪৮

৪. চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার, নাগকেশরের চারা, 'শুকতারা' পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩৬১, কলকাতা, পৃ. ১৪

৫. মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ, ভগ্নদূত, 'শুকতারা' পত্রিকা, কার্তিক ১৩৬৩, কলকাতা, পৃ. ৬৭৬

৬. সরস্বতী, প্রভাবতী দেবী, কি বেশে এলে ফিরে, 'শুকতারা' পত্রিকা, কার্তিক ১৩৫৮, কলকাতা, পৃ. ৫৬৭

৭. শ্রীঅনাহূত, জীবন-নাট্যের ট্রাজেডি, 'শুকতারা' পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৬০, কলকাতা, পৃ. ৫০০

৮. হক, এনামুল (মো.), হারানো সুর, 'শুকতারা' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫৭, কলকাতা, পৃ. ১৬৬

৯. ঘোষ, অলককুমার, ভারত কভু হটতী নেহি, 'শুকতারা' পত্রিকা, মাঘ ১৩৬৯, কলকাতা, পৃ. ৮৮১

১০. দাশগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ, ডানপিটে সতু, 'শুকতারা' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, কলকাতা, পৃ. ৭১৪

১১. বসু, সুজিতকুমার, চাকর, 'শুকতারা' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৫৮, কলকাতা, পৃ. ৫১১

১২. গোস্বামী, পরিমল, একটি প্রতিবাদ সভা, 'শুকতারা' পত্রিকা, কার্তিক ১৩৫৫, কলকাতা, পৃ. ৪৫৮

১৩. মুখোপাধ্যায়, শঙ্করানন্দ, সবাই কি কম্যুনিষ্ট?, 'শুকতারা' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬, কলকাতা, পৃ. ২০৬।

আদি মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় বিতর্কের এক নয়া দিক : একীকরণ নাকি অধিগ্রহণ?

নচিকেতা সাহা
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে একই প্রকারের ঐতিহাসিক সূত্রের পাঠগত বিভিন্নতা কীভাবে কোনো ঐতিহাসিক সময়পর্বের চরিত্রায়নে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে, তার অন্যতম উদাহরণ হল আদি মধ্যযুগীয় ভারতের চরিত্র সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চা। পঞ্চাশের দশক থেকে *ফিউডালিজম্* তত্ত্বের সমর্থকরা যেখানে এই সময়পর্বটিকে বিকেন্দ্রীকরণের কাল রূপে চরিত্রায়িত করেছেন, সেখানে বিগত চার দশক ধরে একীকরণের তত্ত্বের সমর্থকেরা এই সময়পর্বটিকে চরিত্রায়িত করছেন আঞ্চলিক রাষ্ট্রগঠনের কাল রূপে। প্রাথমিকভাবে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও হার্মান কুলকে প্রস্তাবিত একীকরণের তত্ত্বগুলি আদি মধ্যযুগের প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্যকারী তাত্ত্বিক কাঠামো রূপে ঐতিহাসিক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হলেও সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় সেইগুলি বিতর্কের কিছু নতুন ফাঁদে পড়েছে। একদিকে যেখানে আদি মধ্যযুগকে রূপদানকারী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তালিকায় অধিগ্রহণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে, সেখানে অপরদিকে দাবি করা হচ্ছে যে অনেকক্ষেত্রেই এইসব সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি ছিল অধিগ্রহণকারী চরিত্রের অধিকারী। বর্তমান প্রবন্ধে আদি মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চায় স্থান করে নেওয়া এই সদ্য বিতর্ককে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি, বীর-প্রস্তর, বিবিধ পুরাণ, লেখ, সিদ্ধাচার্যদের দোহা প্রভৃতির নিরিখে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কৈবর্ত বিদ্রোহের মতো প্রত্যক্ষ বিদ্রোহগুলি বিরল ঘটনা হলেও কেন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং তা কীভাবে উপজাতিদের রাষ্ট্রীয় সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণকালে সংঘটিত সংঘর্ষ, রাষ্ট্রীয় সমাজের নিম্নবর্গ কর্তৃক উচ্চবর্গের মূল্যবোধের অসম্পূর্ণ আত্মস্থকরণ, উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাসের অধিগ্রহণকালে সৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত, পুরাণের বয়ানে প্রতিভাসিত 'সংকর' বর্ণের মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় সমাজের প্রতিনিধি কর্তৃক জাতি-পরিচিতি আরোপের সাথে যুক্ত। বস্তুতপক্ষে, এই পরিস্থিতিগুলির আন্তঃসংযুক্ততার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র গঠনের সাথে যুক্ত বিবিধ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অধিগ্রহণকারী চরিত্রটি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

মূল শব্দ: আদি মধ্যযুগ, ইতিহাসচর্চা, একীকরণ, অধিগ্রহণ, ঘাত-প্রতিঘাত, উচ্চবর্গ, নিম্নবর্গ।

মূল আলোচনা

ইতিহাসের দীর্ঘ গতিপথে কোন এক স্থানিক প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়পর্বের চরিত্রায়ন বলতে সেই সময়ে সেই অঞ্চলে ক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক প্রবণতা, প্রক্রিয়া, বা তাদের সম্মিলিত রূপের ভিত্তিতে এমন এক চরিত্রায়নকে বোঝায়, যা সেই স্থানিক-কালিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে এক সামগ্রিক ধারণাকে প্রকাশ করে। কিন্তু বিতর্কের সৃষ্টি হয় কোনো ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপপ্রাপ্তি কোন কোন প্রবণতা বা প্রক্রিয়াগুলির মিথস্ক্রিয়ায় তার চিহ্নিতকরণে, সূত্র পাঠের পদ্ধতি ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে সেইগুলির প্রকৃতি অনুধাবনে। আদি মধ্যযুগীয় ভারতের (৬০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ) চরিত্রায়নে রামশরণ শর্মার মতো *ফিউডালিজম্* তত্ত্বের সমর্থকেরা যেখানে আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠনকে কেন্দ্রীভূত বৃহত্তর রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন[১], সেখানে একীকরণের তাত্ত্বিক কাঠামোর (Integrative Model) সমর্থকদের কাছে তা একীকরণের পরিণাম। যেমন, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, স্থানীয় রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সমাজের সম্প্রসারণ, উপজাতিদের কৃষকীকরণ ও জাতি ব্যবস্থার গঠন, এবং ধর্ম বিশ্বাসের অধিগ্রহণ ও একীকরণ - প্রভৃতি সামাজিক প্রক্রিয়া ছিল একীকরণের “মেকানিজম্স” (mechanisms)।[২] *ফিউডালিজম্* তত্ত্বের সমর্থকেদের দ্বারা সমালোচনার প্রাথমিক পর্যায়কে অতিক্রম করে এলেও একীকরণের তাত্ত্বিক কাঠামোটির নানা দিক সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় বিতর্কের কিছু নতুন ফাঁদে পড়েছে। একদিকে যেখানে একীকরণকে বাস্তবায়নকারী সামাজিক প্রক্রিয়ার তালিকায় অধিগ্রহণকারী প্রবণতার কোনোরকম অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে, সেখানে অপরদিকে দাবি করা হচ্ছে যে এইসব সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি অনেকক্ষেত্রেই ছিল অধিগ্রহণকারী চরিত্রের অধিকারী।

একীকরণ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াগত রূপ (Processual model) সংক্রান্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর অন্যতম প্রবক্তা হার্মান কুলকে আদি ঐতিহাসিক থেকে আদি মধ্যযুগের ভারতে গোষ্ঠীপতিদের পর্যায় থেকে আদি রাজ্য হয়ে সাম্রাজ্যিক স্তরে ধাপে ধাপে রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিকাশ ও একীকরণের কথা বলেছিলেন।[৩] তার তাত্ত্বিক কাঠামোটি একীকরণকারী এজেন্সি হিসাবে রাজকীয় কর্তৃত্বের আধিপত্যের ধারণা দিয়ে আচ্ছন্ন[৪] এহেন সমালোচনার সম্মুখীন হলে তিনি বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই একীকরণ পারস্পারিক অভিস্রবণশীল অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া থেকে পৃথক এবং এটার মধ্যে সেই সত্তার মধ্যে একীভূত হওয়ার দ্যোতনা আছে যা সাধারণত বৃহত্তর এবং যার থেকে একীকরণের প্রক্রিয়াগুলি সৃষ্টি হয়।[৫] তবে, তার মতে এই একীকরণ ‘একীকৃত বিষয়ের’ পরিচিতি ও এজেন্সির অধিগ্রহণের সমতুল নয়। যেমন, তোণ্ডাইমন্ডলম সাময়িকভাবে সাম্রাজ্যিক চোলদের সম্প্রসারিত কেন্দ্রীয় এলাকায় একীকৃত হলেও স্বীয় পরিচিত হারায়নি। চিদাম্বরমের নটরাজ সংক্রান্ত ধর্মবিশ্বাসও প্রথম রাজরাজ কর্তৃক রাজকীয় ধর্মবিশ্বাসে অধিগৃহীত হয়নি, বরং একীভূত হয়েছিল।

যার ফলস্বরূপ চিদাম্বরম ও তার পুরোহিতদের পরিচিতি স্পষ্টতর হয়েছিল ওতাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৬] অপরদিকে রণবীর চক্রবর্তীর মতে, আদিবাসী ধর্মবিশ্বাসের অধিগ্রহণ মোটেই শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া ছিল না। আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমাজ গঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে জাতি বর্ণ কাঠামোর সুসংহত রূপপ্রাপ্তি অসাম্যের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটায়, যেটি কতটা একীকরণের পথকে প্রশস্ত করেছিল সেই নিয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। উপরন্তু 'অধিগ্রহণ'-এর মধ্য দিয়ে অসাম্যকে যতটা স্পষ্ট করে বোঝা যায় একীকরণের ধারণার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব নয়। তাই তার মতে এখন সময় এসে গেছে, এটা বিচার করার যে আদি মধ্যযুগের জটিল রাষ্ট্র-সমাজের প্রসারের প্রক্রিয়া একীকরণের উপাদানের থেকে অধিগ্রহণের উপাদানের দ্বারা অধিক চরিত্রায়িত কিনা।[৭] তার এহেন মতের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক উদাহরণকেও হাজির করা সম্ভব। যেমন, আদি-মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুর অবতার রূপে বুদ্ধকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের স্বতন্ত্র পরিচিতির প্রধানতম উপাদনকে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল।[৮] সেই প্রচেষ্টা বৌদ্ধ ধর্মের স্বতন্ত্র পরিচিতিকে সম্পূর্ণভাবে অধিগৃহীত করতে না পারলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না যে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল। আদিপর্বের গঙ্গবংশীয় মহারাজ সামন্তবর্মনের পন্নুটুরু লেখ থেকেই গঙ্গ মহারাজরা নিজেদেরকে মহেন্দ্রপর্বতে প্রতিষ্ঠিত যে গোকর্ণস্বামিনের পূজক রূপে তুলে ধরেছেন, অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের (১১১৯ খ্রিস্টাব্দের) বিজগপত্তনম লেখ থেকে জানা যায় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কামার্ণব কলিঙ্গে আসার পর যুদ্ধে এক শবরাদিত্যকে হত্যা করার পর মহেন্দ্রপর্বতের শিখরে অবস্থিত সেই দেবতা গোকর্ণস্বামিনের পূজা করেন এবং মহেন্দ্রের চারিদিকে (কলিঙ্গ) রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] লেখটি মূল ঘটনার প্রায় ৬-৭ শতাব্দী পরের হওয়ার কারণে এটিতে নিখাদ ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে এমনটি বলা না গেলেও, স্মৃতির আকারেও যদি কোনো ঘটনা এর মধ্যে গথিত হয়ে থাকে তাহলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে - এক উপজাতীয় দেবতাকে, অর্থাৎ উপজাতির এক সাংস্কৃতিক সম্পদকে উপজাতির প্রধানকে হত্যা করে রাজা নিজের ইষ্ট-দেবতায়, অর্থাৎ নিজের সাংস্কৃতিক সম্পদেও পরিণত করেছিলেন, যার ফলে হিন্দুকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই সাংস্কৃতিক সম্পদের চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছিল। উপজাতির এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পদকে বলপ্রয়োগের পর নিজের সাংস্কৃতিক সম্পদেও পরিণত করার প্রক্রিয়ায় উপজাতি যদি তার সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর সম্পূর্ণ অধিকার নাও হারিয়ে থাকে, প্রক্রিয়াটি কি অধিগ্রহণকারী চরিত্রের অধিকারী নয়?

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে এই সময়পর্বে সংঘটিত নিপীড়কদের বিরুদ্ধে দরিদ্র নিম্নশ্রেণি এবং নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্যদের করা বিদ্রোহগুলির প্রতি আলোকপাত করে চলেছেন।[১০] কিন্তু, কুণাল চক্রবর্তীর মতে আসলে খুল্লামখুল্লা বিদ্রোহের নমুনা খুবই কম এবং এই বিরলতাকে কিছুটা হলেও নিপীড়িত সামাজিক গোষ্ঠীগুলি কর্তৃক সাংস্কৃতিক আধিপত্যকারী ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের আত্মস্থকরণের

(Internalization) প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।[১১] এই আত্মস্থকরণের মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্রীয় সমাজ কাঠামোর সদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রসমাজে নিজেদের নিম্নবর্গীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং স্থায়িত্ব পেয়েছিল আধিপত্যকারীর *হেগেমনি* (Hegemony)। কিন্তু এই আত্মস্থকরণ সম্পূর্ণ আত্মস্থকরণ ছিল না। নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের উচ্চবর্গীয়তা এবং নিজের নিম্নবর্গীয়তাকে স্বীকার করে নিলেও দৈনন্দিন ক্ষেত্রে নানাভাবে এই ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[১২] মহসিদ্ধাদের দোহায় ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, সরহ বলেছেন "ব্রাহ্মণ্যরা আসলে কিন্তু ভেড়ুয়া,/ ওরা অর্থহীন চতুর্বেদ আওড়ায়।", "সহজে সবাই সমান/ সেখানে শূদ্রও নেই,/ নেই ব্রাহ্মণ।"।[১৩] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার অর্থ আদি মধ্যযুগীয় প্রেক্ষিতে একরকমভাবে 'রাষ্ট্রের প্রতিনিধি' ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা। কারণ, এই ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য রাজতন্ত্রের আদর্শকেই অনুসরণ করে। কালিকা পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ প্রভৃতির বয়ান থেকে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা রাজার যে ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছিল, সেখানে ধর্মানুসারী রাজার শাসন করার ও কর আদায় করার অধিকার বৈধ।[১৪] সিদ্ধাচার্যরা সকলে জন্মগতভাবে সমাজের নিম্নস্তরের প্রতিনিধি না হলেও, সিদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ায় তাদের জাতপাতের কৌলীন্যকে ত্যাগ করতে হত। তাদের অনেকের নামে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় সমাজের নিম্নস্তরের ও প্রান্তিক মানুষদের জন্য বরাদ্দ চামার, চন্ডাল, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি পেশার সাথে জড়িত থাকার ইঙ্গিত সমাজে তাদের প্রান্তীয় অবস্থানকেই তুলে ধরে।[১৫] কোন দর্শনের বিকাশ ঘটার একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকে। চর্যাপদের বয়ান ইঙ্গিত করে যে মহাসিদ্ধাদের সামাজিক জগৎ নিম্নর্গীয়ের সামাজিক জগতে বা তার কাছাকাছি।[১৬] তাই মহাসিদ্ধাদের দর্শনে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধিতার ভাবনা যে নিম্নস্তরের মানুষদের ক্ষোভ দ্বারা পুষ্ট হয়নি, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? যদি মহাসিদ্ধাদের দর্শন সেই নিম্নবর্গের ভাবনা দ্বারা বিন্দুমাত্র পুষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্যকে ও সমাজে তাদের নিম্নবর্গীয়তাকে সমাজের নিম্নস্তরের সকল মানুষ সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেনি। প্রাধান্যকারীর উচ্চবর্গীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ না করার কারণেই সম্ভবত বিরল হলেও কৈবর্ত বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহের দেখা মেলে, যার মধ্যে স্থানীয় স্বতন্ত্রতা লাভের চাহিদার[১৭] পাশাপাশি, অন্তিম পর্যায়ে গিয়ে করভারে জর্জরিত হওয়ার কারণে মানুষের সমর্থন ও সমাজের নিম্নস্তরের থেকে সেনা নিয়োজনের ফলে "গণ অভ্যুত্থান"-এর[১৮] চরিত্রের দেখা মেলে।

বস্তুতপক্ষে, অ-রাষ্ট্রীয় সমাজের মানুষদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঘাত-প্রতিঘাত চলতে থাকে। যেমন, একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে বহুসংখ্যক বীর-প্রস্তরের আবির্ভাব ঘটে, যেইগুলি গৌতম সেনগুপ্তের মতে উপজাতীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রসারণকালে উপজাতির

সাথে হওয়া সংঘর্ষের প্রতিনিধিত্ব করে।[১৯] রাষ্ট্রীয় সমাজে উপজাতিদের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তকিরণের সময় থেকেই চলতে থাকা ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘর্ষ, প্রতিরোধ এবং বিরল হলেও কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়ে ওঠা বিদ্রোহগুলিকে বিক্ষিপ্ত উদাহরণ হিসাবে গণ্য করলে চলবে না। একীকরণের তত্ত্বের সমর্থকেরা যে সংঘর্ষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন, তা নয়। সমালোচনার মুখে পড়ে হার্মান কুলকে তো প্রক্রিয়াটিকে "প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে একীকরণ" রূপে অভিহিত করেছেন।[২০] কিন্তু উপজাতিদের সাংস্কৃতিক সম্পদ, তাদের ধর্ম বিশ্বাসের নিদেনপক্ষে আংশিক অধিগ্রহণের মতো প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্পষ্ট করে যে একীকৃত বিষয়ের এজেন্সি ও তাদের পরিচিতির অধিগ্রহণের সম্ভাবনাকে সার্বিকভাবে অস্বীকার করলে এই সংঘর্ষগুলির, প্রতিরোধ, বিদ্রোহগুলির আন্তঃসংযুক্ত চরিত্রকে বোঝা সম্ভব হবে না। পরিচিতি যেহেতু একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ যেহেতু পরিচিতিকে রূপদানের অন্যতম উপাদান, তাই সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ পরিচিতির পরিবর্তন ঘটায়। এইখানেই সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণের প্রশ্নটি যুক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর পরিচিতি নির্মাণের প্রক্রিয়াটির সাথে। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শে জারিত রাষ্ট্রীয় সমাজের পরিসরে বিভিন্ন উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার সময় থেকেই তাদের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সমাজের আধিপত্যকারীরা, রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাদের সামাজিক অবস্থান ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করেন, নিজেদের অবস্থানকে ধরে রাখা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বেঁচে থাকার জন্য জরুরি উদ্বৃত্ত আহরণের সামাজিক কাঠামোটিকে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার জন্য। সেই অবস্থানকে অস্বীকার করতে চাইলেই সামাজিক টানাপোড়েন, সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মহাভারত ও পূর্ববর্তী বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখিত বেণ-পৃথুর কাহিনীকে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে যেভাবে বর্ণসংকরের মিথের সাথে সংযুক্ত করে বাংলার স্থানিক-কালিক সংস্থাপন করা হয়েছে,[২১] সেই বয়ানকে বিশ্লেষণ করলে বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি ও জাতি গোষ্ঠীগুলির পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু ইঙ্গিত হয়তো পাওয়া যেতে পারে। বয়ানটিতে দেখা যায় প্রথমে সংকর বর্ণের মানুষরা তাদের নিজেদের পরিচিতি সম্পর্কে পৃথুর বলা কথাকে অস্বীকার করে, ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে। কিন্তু দণ্ডের সম্মুখে পড়ে, বন্দী হয়ে নিজেদের সম্পর্কে পৃথুর কথাকে মেনে নেয় তারা। পৃথুর প্রভূত্ব স্বীকার করে এবং নিজেদের জাতি নির্ণয় ও বৃত্তিবিধানের ক্ষমতা পৃথুর হাতে তুলে দেয়, যেখানে পৃথুর অনুরোধে তাদের জীবিকাদি নির্ধারণ করেন ঋষিগণ। এই মিথটিকে যদি আদি মধ্যযুগীয় বাংলার আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপটে সংস্থাপন করে সমাজ ইতিহাসের পরিভাষায় প্রকাশ করা হয় তাহলে বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন 'সংকর' জাতিগোষ্ঠীগুলি প্রথমেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় 'রাষ্ট্রের প্রতিনিধি', অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও সেই ব্যবস্থা কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া পরিচিতিকে আত্মস্থ করে নেয়নি, হয়তো কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতাও করেছিল। তাই, সম্ভবত তাদের অধীনস্থ করার ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক

মাধ্যমের ব্যবহার করা হয়েছিল। শাসককূল যদি সরাসরি জবরদস্তিমূলক পন্থা গ্রহণ নাও করে থাকে, যারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জীবিকা ভিত্তিক জাতি পরিচিতি চিহ্নিত ক'রে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে তাদের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, সেই ব্রাহ্মণরাই সেই জাতি বিন্যাসের কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য তাদের চেতনায় 'দন্ড'-এর ভয় ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বলা হয়েছে সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে ধরাতলে বিপ্লবের সৃষ্টি হবে।[২২] তাই বলা হয়েছে চতুর্বর্ণ বিভাগ ও দুর্বিনীতদের শঙ্কিত করে রাখার জন্য ভূপতিদের ধর্মধিকর্ষন স্থাপন করতে হবে এবং দন্ডভয়ে ভীত হয়ে সকলেই রাজশাসনের অনুবর্তী হবে।[২৩] এহেন বয়ানের মধ্যে অসমতাকে নিশ্চিত করার জন্য দন্ডের ভয় দেখানোর চেষ্টার ইঙ্গিত স্পষ্ট। পৃথুর আদেশে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যেভাবে বর্ণ সংকরেরা নিজেদের জাতি নির্ণয়ের অধিকার পৃথুর হাতে অর্পণ করেছে, তা সরাসরি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে তুলে ধরেছে কিনা সেই নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, এই বয়ানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র বা সমাজে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর নিজ পরিচিতি নির্মাণের অধিকার, অর্থাৎ নিজ জাতি-পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের এজেন্সিকে অধিগ্রহণ করার বাসনা, আধিপত্যকারীদের কাম্য সামাজিক পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণের এই বয়ান নিশ্চিত করে যে সমাজে উচ্চবর্গীয়-রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণকারী শক্তি সক্রিয় ছিল। উপজাতিদের রাষ্ট্রীয় সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণের সময় থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষ, সমাজের নিম্নস্তরের বাসিন্দা কর্তৃক উচ্চবর্গের মূল্যবোধের অসম্পূর্ণ আত্মস্থকরণ, বিকল্প মতাদর্শের উপস্থিতি, বিদ্রোহ, উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাসের নিদেনপক্ষে আংশিক অধিগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় সমাজের অঙ্গ হয়ে ওঠা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের নিজের জাতি-পরিচিতি নির্মাণের এজেন্সির ব্রাহ্মণ তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক অধিগ্রহণের তাগিদ একথা নিশ্চিত করে যে অধিগ্রহণ ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্র ছাড়াও আদি মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠনের পটভূমিতে সক্রিয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া রূপে কাজ করেছিল।

একীকরণ ও অধিগ্রহণের এই বিতর্ককে বিচার করলে বোঝা যায় হার্মান কুলকের একীকরণের ধারণায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে উপজাতিরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একীকৃত হয়েছে কিনা সেই দিকটি। অপরদিকে রণবীর চক্রবর্তীর মতে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত উপজাতি, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সামাজিক ভাবে একীকৃত হওয়া বা না হওয়ার দিকটি। আদি মধ্যযুগে আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠনকালে বহু উপজাতি যে রাষ্ট্র-সমাজ কাঠামোর মধ্যে একীকৃত হয়েছিল, তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনই এটাও অস্বীকার করা যায় না যে সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাওয়া মানুষগুলি রাষ্ট্র সমাজের উচ্চ বর্গের সাথে একীকৃত হয়নি, বরং ব্রাহ্মণ্য জাতি-বর্ণ কাঠামোয় তাদেরকে 'পৃথক' রূপে চিহ্নিত করে তাদের উপরে আধিপত্য স্থাপন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সমাজের উচ্চবর্গ নিজেদের সামাজিক অবস্থান রক্ষা করার জন্য যে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলির অবস্থানকে সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে বেঁধে রাখতে চায়।

যখনই কোন সামাজিক গোষ্ঠী তাদের উপর আরোপিত পরিচিতি অনুযায়ী সামাজ বিন্যাসের কাঠামোয় তাদের জন্য নির্দিষ্ট অবস্থানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সামাজিক গতিশীলতার মধ্য দিয়ে উপরের দিকে উঠতে চায়, তখনই ক্ষমতাসীন উচ্চ বর্গের সাথে তাদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বস্তুত, উচ্চবর্গের ক্ষেত্রটির সাথে নিম্নবর্গের স্বয়ংক্রিয় ক্ষেত্রটি কখনওই সম্পূর্ণভাবে একীকৃত হয়ে যায় না। ব্যবস্থাগত একীকরণ দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে সামাজিক একীকরনের পথকে প্রশস্ত করলেও, তাকে নিশ্চিত করেনা। উপরন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিকরণের বহুমাত্রিক প্রক্রিয়াটির সাথে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া জড়িয়ে থাকায় সামাজিক ক্ষমতা ও অধিকারের বৈষম্য, জাতি গোষ্ঠীর পৃথকত্ব বজায় থাকে এবং সেই স্থানিক-কালিক প্রেক্ষিতে সামাজিকভাবে একীকরণ সম্ভব হয়না। আদি মধ্যযুগের আঞ্চলিক রাষ্ট্র গঠন সংক্রান্ত একীকরণের তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে আদি মধ্যযুগ সম্পর্কে বহুমাত্রিক ধারণা উপস্থাপন করতে সক্ষম। কিন্তু এই তত্ত্বে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে যেহেতু একীকরণের “মেকানিজম্” রূপে গণ্য করা হয়, তাই সেইগুলিকে অনেকসময় তাদের সম্মিলিত ফলাফলের নিরিখে পিছনের দিকে তাকিয়ে চরিত্রায়ণের প্রবণতা চলে আসে। অধিগ্রহণকারী কোনো প্রক্রিয়াও দীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় থেকে এমন সামাজিক পরিস্থিতিকে রূপ দিতে পারে, যেটিকে আপাতভাবে দেখে মনে হবে যেন বহুলাংশেই একীকৃত। কিন্তু এই আপাত একীকৃত পরিস্থিতির মধ্যেও অধিগ্রহণকারী শক্তি, আধিপত্য-অধীনতা, পৃথকত্ব, বিচ্ছিন্নতা, সংঘর্ষ, প্রতিরোধ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। বস্তুতপক্ষে, ক্রমপরিবর্তনশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত যেসব সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি সক্রিয় থেকে আদি মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিকে রূপদান করেছিল, সেইগুলিকে ফলাফলের নিরিখে বিচার না করে তাদের নিজস্বতায়, তাদের নিজস্ব স্থানিক-কালিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী বিচার করতে হবে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আন্তঃসংযুক্ত ক্রিয়াশীলতাই যেহেতু কোনো সময়পর্বে কোনো স্থানের চরিত্রকে নির্ধারণ করে, তাই ক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির তাদের নিজস্ব স্থানিক-কালিক প্রেক্ষিতের নিরিখে চরিত্রায়ন সেই সময়পর্বে সেই স্থানের চরিত্রকেও স্পষ্টতর করে তুলবে।

সটীক তথ্যসূত্র:

১. R. S. Sharma, *Indian Feudalism*, c. 300-1200 (Madras: Macmillan India Limited, [1965] 1980).

২. Brajadulal Chattopadhyaya, *The Making of Early Medieval India*, Second edition (New Delhi: Oxford University Press, 2012), 17.

৩. Herman Kulke, “The Early and the Imperial Kingdom: A Processual Model of Integrative State Formation in Early

Medieval India", in Herman Kulke (ed.), *The State in India 1000-1700* (New Delhi: Oxford University Press, 1995), 233-262.

৪. Y. Mubayi,*Alter of Power: The Temple and the State in the Land of Jagannath* (New Delhi: Manohar, 2005), 31.

৫. Herman Kulke,"The Integrative Model of State Formation in Early Medieval India: Some Historiographic Remarks", in Bhairabi Prasad Sahu and Herman Kulke (eds.), *Interrogating Political Systems: Integrative Process and States in Pre-modern India* (New Delhi: Manohar, 2015),69.

৬. Kulke, "The Integrative Model of State Formation in Early Medieval India", 69.

৭. Ranbir Chakravarti, "Trade and the making of state society in early India (600-1300 CE)", in Herman Kulke and Bhairabi Prasad Sahu (eds.), *The Routledge Handbook of the State in Premodern India* (Abingdon, New York: Routledge, 2022), 129.

৮. Kunal Chakravarti, "A History of Intolerance: The Representation of Buddhist in the Bengal Purāṇas,"*Social Scientist* Vol. 44, No. 5/6 (May-June 2016): 24.

৯. S. N. Rajaguru, *History of the Gangas*, Part 1 (Bhubaneswar, State Museum Orissa, 1968), 14.

১০. Sharma, *Indian Feudalism*, 268; B.N.S. Yadav, "Problems of the Interaction between Socio-Economic Classes in the Early medieval Complex,"*The Indian Historical Review* Vol. 3, No. 1(July 1976): 50-6; R.S. Sharma, *Early Medieval Society: A Study in Feudalisation* (Kolkata: Orient Longman, 2003), 215-35.

১১. Kunal Chakravarti, "Brahmanical Hegemony and the Oppressed Social Groups: Rethinking the 'Kaivarta Revolt'," In *Early Indian History and Beyond: Essays in Honour of B.D. Chattopadhyaya*, ed. Osmund Bopearachchi and Suchandra Ghosh, (Delhi: Primus Books, 2019), 477-482.

১২. নির্দিষ্টভাবে আলোচ্য সময়পর্বের কালিক কাঠামো কেন্দ্রিক রচনা না হলেও এই প্রবণতার উদাহরণস্বরূপ রণজিৎ গুহের রাহু সংক্রান্ত লেখাটি দেখা যেতে পারে, রণজিৎ গুহ, "একটি অসুরের কাহিনী,"*নিম্নবর্গের ইতিহাস*-এর অন্তর্গত, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৮), ৬৭-৮৮।

১৩. অলকা চট্টোপাধ্যায়, *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী: 'চতুরশীতি-সিদ্ধপ্রবৃত্তি'র মূল তিব্বতী থেকে বাংলা অনুবাদ* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২-৮।

১৪. পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত ও বাংলা ভাষায় অনুদিত), *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্* (কলকাতা: বঙ্গবাসী স্টীম-মেশিন প্রেস, ১৩০০ বঙ্গাব্দ), *উত্তরখণ্ডম্*, ৩.৪, পৃ. ১৭৭।; পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত ও বাংলা ভাষায় অনুদিত), *কালিকাপুরাণম্* (কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ৮৪.৮৬, পৃ. ৮৬৫। ; Kunal Chakravarti, *Religious Processes: The Purāṇas and the Making of Regional Tradition* (New Delhi: Oxford University Press, 2001), 126-128.

১৫. চট্টোপাধ্যায়, *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*, ১০-২০।

১৬. উদাহরণস্বরূপ বিরুপা রচিত চর্যা ৩, কাহ্নপাদ রচিত চর্যা ১০, ১৮, ১৯, শবরপাদ রচিত চর্যা ২৮,৫০, ধামপাদ রচিত চর্যা ৪৭, ভুসুকপাদ রচিত চর্যা ৪৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব)* (কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩), ৭-৮, ১৯-২১, ৩২-৩৪, ৪৩-৪৫, ৭০-৭৬।

১৭. B.P. Sahu, "Dissent and Protest in Early Indian Societies: Some Historiographic Remarks,"in *The Changing Gaze: Regions and the Constitutions of Early India*, by B.P. Sahu, (New Delhi: Oxford University Press, 2013), 301.

১৮. Ryosuke Furui, "CHARACTERISTICS OF KAIVARTA REBELLION DELINEATED FROM THE RĀMACARITA"*Proceedings of the Indian History Congress* 75(2014): 95-96.

১৯. Goutam Sengupta, "Hero-Stones of West Bengal: A Preliminary Study," In *Ganga-Brahmaputra and Beyond: Exploring Art and Iconography of Eastern and North-Eastern India*, by Goutam Sengupta, (Delhi: Primus Books, 2023), 31-36.

২০. Kulke, "The Integrative Model of State Formation in Early Medieval India," 73.

২১. তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্, উত্তরখণ্ডম্*, ১৩, ১৪, পৃ. ২০১-২০৬।

২২. তর্করত্ন (সম্পা.),*বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্, উত্তরখণ্ডম্*, ৩.১৬-১৭, পৃ. ১১৭।

২৩. তর্করত্ন (সম্পা.), *বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্, উত্তরখণ্ডম্*, ৩.১৭-১৯, পৃ. ১৭৭।

ভারত : উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি

মৈনাক মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

সারসংক্ষেপ : ভারত ঐতিহাসিকভাবে গভীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বহু-সংস্কৃতি, বহু-ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঐতিহ্যের দেশ। ভারতের বহুত্ববাদী এবং যৌগিক সংস্কৃতি, সভ্যতার সঙ্গমের সম্ভাবনার জীবন্ত প্রমাণ। ভারত এমন একটি নেশন, যা বহু বৈশ্বিক বিভাজনের সেতুবন্ধন করে। বৈচিত্র্যময় ও বহুত্ববাদী ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ ও সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান, তবে এটি একটি এশিয়ান রাষ্ট্র, পশ্চিমী রাষ্ট্র নয়। এটির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রয়েছে, তবে এখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিষয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ও বর্তমান বিশ্বে দ্রুততম অর্থনীতির মধ্যে একটি। ভারত বর্তমানে একটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্থিতিশীল অর্থনীতি, সর্বোচ্চ জিডিপি, অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরতা, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতি, বৈশ্বিক বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং কূটনৈতিক প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত ও শক্তিশালী করেছে এবং ভবিষ্যতে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।
মূলশব্দঃ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বহুত্ববাদী ভারত, ধর্মনিরপেক্ষ, সংসদীয় গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি।

ভূমিকা:

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে ভারত একটি উদীয়মান বিশ্বশক্তি হিসেবে বিবেচিত। সাধারনভাবে কোন রাষ্ট্রকে উদীয়মান বিশ্বশক্তি তখনই বলা যাবে, যখন সেই রাষ্ট্রটি উচ্চ সামরিক ক্ষমতা সম্পন্ন, পর্যাপ্ত সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের অধিকারী হয়ে উঠবে এবং আঞ্চলিক ও বিশ্বমঞ্চে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা বা শক্তিশালী অবস্থান রাখতে সচেষ্ট থাকবে ও সক্ষম হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, "উদীয়মান বিশ্বশক্তি" হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল সামরিক শক্তির উত্থান, শক্তিশালী অর্থনীতি এবং কূটনীতিক প্রভাব। ভারত বর্তমানে স্থিতিশীল অর্থনীতি, সর্বোচ্চ জিডিপি, বৃহত্তম জনসংখ্যা, এক শক্তিশালী ও সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী এবং পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী। বিশ্ব শক্তি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের সব থেকে অনুকূল বা উপযোগী দিক হোল তার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি। ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে একটি। একবিংশ

শতাব্দীর শুরু থেকে, ভারতের বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬% থেকে ৮%।[১] যার ফলে ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির[২] মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন: এই প্রবন্ধটি যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আলোচিত হবে তা হল: ভারত কি ভবিষ্যতে একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারবে? অথবা ভারতের মধ্যে এমন কী আছে, যা তাকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তিতে উন্নীত করবে? অথবা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থানের ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কী কী?

তাত্ত্বিক কাঠামো: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের আলোকে, ভারতের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন- বাস্তববাদ; যেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত শক্তির রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং জাতীয় স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ[৩] , যা বর্তমান ভারতের বিদেশনীতিতে সর্বাধিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। নয়া-বাস্তববাদ; এই তত্ত্ব অনুসারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র, ক্ষমতা অর্জন ও প্রসারের লক্ষ্যে ধাবিত হলেও, প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্ব-কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়।[৪] বর্তমান ভারতও নয়া-বাস্তববাদীদের এই চিন্তাধারার অনুসারী। উদারনীতিবাদ- ভারত এই তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে।[৫] নির্মাণবাদী তত্ত্ব- এই তত্ত্ব অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে গঠিত হয়। অনুরূপভাবে ভারতও তার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আদর্শিক প্রেক্ষাপটে তার পরিচিতি নির্মাণ করে এবং তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালায়।[৬]

গবেষণা পদ্ধতি: এই প্রবন্ধটি অধ্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে এবং সেখানে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি ও উত্থানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে। নিবন্ধটিতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য ও গবেষণা রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা করা হবে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতের কার্যকরী ভূমিকার মূল্যায়ন করা হবে।

ভারতের অর্থনৈতিক উত্থান: ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানের মূল চালিকা শক্তি ছিল **১৯৯১** সালের অর্থনৈতিক সংস্কার। এই অর্থনৈতিক সংস্কার বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করে। স্বাধীনতার পর থেকে **১৯৯০** সাল

পর্যন্ত অর্থনীতিক নীতি হিসাবে ভারত মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়করণ, চাহিদা-পার্শ্ব অর্থনীতি (demand- side economics), প্রাকৃতিক সম্পদ, আমলা চালিত উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সহ সুরক্ষাবাদী অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে অনুসরণ করতো। এটিকে লাইসেন্স রাজের আকারে ডিরিজিজম (Dirigism) হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।[৭] কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর পতন তথা ঠাণ্ডাযুদ্ধের সমাপ্তিতে (১৯৯১) বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে তীব্র ভারসাম্যের সংকট দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ভারত একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহন করে এবং ধীরে ধীরে মিশ্র পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে সরে এসে একটি মিশ্র মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল সামাজিক বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করতে থাকে, যেখানে কৌশলগত ক্ষেত্রে রয়েছে পাবলিক সেক্টর।[৮] ভারতের অর্থনীতি তখন থেকেই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতের বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হারের গড় ছিল ৬%।[৯]

ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধি ও বিশ্ব অর্থনীতিতে তার অবস্থান: ভারত বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক আকার প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ক্রয় ক্ষমতা সমতা (purchasing power parity) দ্বারা তৃতীয় বৃহত্তম। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬% থেকে ৭%।[১০] দেশটির উৎপাদন কার্যক্রম বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% গ্রামীণ,[১১] যা জিডিপির প্রায় ৫০% অবদান রাখে।[১২] ৪৭৬ মিলিয়ন শ্রমিক নিয়ে ভারতীয় শ্রমশক্তি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম।[১৩] ভারতের জিডিপির প্রায় ৭০% অভ্যন্তরীণ ব্যবহার দ্বারা চালিত হয়;[১৪] ব্যক্তিগত খরচ ছাড়াও, ভারতের জিডিপি সরকারী ব্যয়, বিনিয়োগ এবং রপ্তানি দ্বারা চালিত হয়।[১৫] ২০২১-২০২২ সালে, ভারতে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) ছিল $৮২ বিলিয়ন। এফডিআই প্রবাহের নেতৃস্থানীয় খাতগুলি ছিল পরিষেবা খাত, কম্পিউটার শিল্প এবং টেলিকম শিল্প।[১৬]

২০২৪ সালের জুন মাসের আই.এম.এফ তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের দশটি বৃহৎ অর্থনীতির চিত্র ক্রমানুসারে দেওয়া হলঃ[১৭]

Rank and Country (GDP)	GDP (USD billion)	GDP per Capita (USD thousand)	Annual GDP Growth Rate	GDP (PPP) I.D thousand	Main Industries
1. U.S.A	28,783	85.37	2.7%	28.78 (2nd)	Service, Manufacturing, Finance, Technology

2. China	18,536	13.14	4.6%	35.29 (1st)	Manufacturing, Exports, Investments
3. Germany	4,590	54.29	0.2%	5.69	Automotive, Chemicals, Machinery
4. Japan	4,112	33.14	0.9%	6.72	Engineering, Chemicals, Automotive, Pharma
5. India	3,942	2.73	6.8%	14.59 (3rd)	Agriculture, Communication, Infrastucture, IT
6. U.K	3,502	51.07	0.5%	4.03	Finance, Service, Manufacturing,
7. France	3,132	47.36	0.7%	3.99	Tourism, Manufacturing, Technology
8. Brazil	2,333	11.35	2.2%	4.27	Agriculture, Minerals, Natural Resources
9. Italy	2,332	39.58	0.7%	3.35	Agriculture, Service, Manufacturing
10. Canada	2,242	54.87	1.2%	2.47	Service, Manufacturing, Energy

উৎসঃ IMF data (updated on 14th June, 2024)

ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সূচক:

সম্প্রতিককালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ব্লগ (Linkedin) পোস্ট করে দাবি করেছেন, "নিঃসন্দেহে আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' (ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি) স্বপ্ন পূরণের পথে রয়েছি।"[১৮] ভারত বর্তমান বিশ্বে একটি বিশিষ্ট অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত

হয়েছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, যা বিভিন্ন সূচক ও মাপকাঠির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হলঃ

জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে একটি। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬% থেকে ৭%।[১৯] ২০২৩ সালে, ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭% এর উপরে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতীয় অর্থনীতির এই প্রবৃদ্ধি সেবা খাত, শিল্প খাত এবং কৃষি খাতের সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগ: বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, ভারত একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণগুলি হলো ভারতের বৃহৎ বাজার, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং উদার বিনিয়োগ নীতি। ২০২২ সালে ভারতে মোট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) ছিল প্রায় ৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২০] "মেক ইন ইন্ডিয়া" এবং "স্টার্টআপ ইন্ডিয়া" প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে সরকার বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন: ভারত তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে। ভারতের আইটি খাতের আকার ২০২৩ সালে প্রায় ১৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।[২১] এটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং যুবসমাজের মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বেঙ্গালুরু ভারতের "সিলিকন ভ্যালি" হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

অবকাঠামো আপগ্রেড: পূর্বে কোন বিদেশী সংস্থার ভারতে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়াত পিছিয়ে থাকা অবকাঠামো। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি। সরকার বিভিন্ন মেগা প্রকল্প, যেমন 'ভারত মালা', 'সাগরমালা' এবং 'উড়ান' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের রাস্তাঘাট, রেলওয়ে ব্যবস্থা এবং বিমানবন্দরগুলির উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে। মোট সরকারী ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে মূলধন ব্যয় ২০১০ সালে ১১% থেকে ২০২৩ সালে ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবকাঠামো ব্যয় ৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে $১২২ বিলিয়ন হয়েছে।[২২] ভারতে বছরে ১০,০০০ কিলোমিটার হাইওয়ে যুক্ত হচ্ছে।[২৩] ২০১৪ সাল থেকে, ভারতীয় বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং একটি আপগ্রেডেড ট্রেন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।[২৪] এছাড়া, ভারতের 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্প এবং 'হাউজিং ফর অল' উদ্যোগও দেশের নগরায়ন ও আবাসন খাতকে সমৃদ্ধ করছে। এই অবকাঠামো উন্নয়নগুলি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লজিস্টিক্সের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে।

ডিজিটাল বিপ্লবঃ ভারতে সবচেয়ে স্বতন্ত্র পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি ডিজিটাল পরিকাঠামোতে হয়েছে, একে ডিজিটাল বিপ্লবও বলা যেতে পারে। আজ, দেশের প্রত্যন্ত

কোণে থাকা ভারতীয়রা দৈনন্দিন পণ্য কিনতে পারে নগদ অর্থ ছাড়াই, তাদের ফোনে একটি QR কোড ব্যবহার করে। সম্প্রতি ভারতের JAM-প্রকল্প অর্থাৎ জনধন, আধার ও মোবাইল- এর মাধ্যমে দেশের বাসিন্দাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট আধারের সঙ্গে লিঙ্ক করা- এর ফলে বেড়েছে ডিজিটালাইজেশন।

ভারতে এখন ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৮৮১.২৫ মিলিয়ন,[২৫] সেখানে চীনের প্রায় ১.০৫ বিলিয়ন,[২৬] অর্থাৎ ভারতে (চীনের পরে) বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইন্টারনেট-সক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। এই অ্যাক্সেসের উপর আরোহণ করে, ভারতে একটি ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো[২৭] রয়েছে, যা অন্যান্য দেশের কাছে একটি মডেল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে; একটি পেমেন্ট ইন্টারফেস রয়েছে যা ডিজিটাল পেমেন্টকে নির্বিঘ্ন করে। ফলস্বরূপ পরিবর্তনের একটি সূচক হিসাবে, ভারত চীনকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ডিজিটাল পেমেন্টের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।[২৮] অতিসম্প্রতি (২রা আগস্ট, ২০২৪) ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি (UNGA)-এর ৭৮তম অধিবেশনের সভাপতি ডেনিস ফ্রান্সিস বলেছেন, ডিজিটালাইজেশন নিয়ে ভারতে যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে গত ৫-৬ বছরে ৮০০ মিলিয়ন নাগরিক দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছেন।[২৯]

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ: ভারত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০২২ সালের শেষে, ভারতের সৌর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫০ গিগাওয়াট।[৩০] ভারত সরকার সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। ২০২২ সালের শেষে, ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সৌর শক্তি উৎপাদক দেশ ছিল। এটি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (IEA) এর মতে, ২০২৩ সালে ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৩৭% ছিল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি থেকে।[৩১] এটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধানে ভারতের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

জনসংখ্যা এবং মানব সম্পদ:

সাম্প্রতিক সময়ে চীনকে সরিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তকমা পেয়েছে ভারত।[৩২] ভারতের বিশাল জনসংখ্যা, যা প্রায় ১.৪ বিলিয়ন, একটি বড় অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করে, যা উৎপাদন ও সেবার চাহিদা বাড়ায়। এর ফলে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে আবার এই বিশাল জনসংখ্যা সস্তা ও প্রচুর শ্রমশক্তি সরবরাহ করে, যা উৎপাদন খাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানবসম্পদেরও বৃদ্ধি ঘটে। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মানবসম্পদকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করা যায়, যা অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হয়। ভারতের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম এবং তরুণ, যা দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে।[৩৩] সেখানকার তরুণ জনগোষ্ঠী বর্তমানে উদ্ভাবনের দিকে ঝুঁকেছে, যা

দেশটির বিশ্বমানের তথ্য-অর্থনীতি এবং সাম্প্রতিক চাঁদে অবতরণের (চান্দ্রায়ণ-৩) ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত।

ফার্মাসিউটিক্যাল এবং স্বাস্থ্য সেবা: ভারত জেনেরিক ওষুধের বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ। ২০২৩ সালে, ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের মোট আয় ছিল প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৩৪] কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ভারতের ভ্যাকসিন উৎপাদন এবং রপ্তানি বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর পাশাপাশি, ভারতীয় স্বাস্থ্যসেবা খাত দ্রুত বিকাশ লাভ করছে, যা বিদেশি রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলছে।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব: বর্তমানে ভারত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই লক্ষ্য অর্জনে ভারত সেই সব দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায়, যারা এ কাজে তার সহায়ক হবে। তাই পুরনো বিভেদ ঝেড়ে ফেলে নয়াদিল্লি ঘোষণা করছে, ভারত আর জোট নিরপেক্ষ নয়, বরং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে কাজ করতে ইচ্ছুক। কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়লগ (QUAD) থেকে ব্রিকস পর্যন্ত এ ধরনের কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক দীর্ঘ তালিকায় ভারতের নাম রয়েছে। এছাড়াও, ভারত আঞ্চলিক সমন্বয় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে, যেমন ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (IPEF)।

ভারতের বেশ কয়েকটি দেশ ও অর্থনৈতিক আঞ্চলিক সংগঠন বা জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আসিয়ান, সাফটা, মেরকোসুর, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, এবং আরও কয়েকটি যা কার্যকর বা আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।[৩৫] সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য বিভিন্ন গ্রুপ, যেমন- CIVETS (কলম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মিশর, তুরস্ক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং MINT (মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া এবং তুরস্ক) এই সকল জোট ও তার সদস্য দেশগুলির সঙ্গেও ভারত তার বাণিজ্যিক আদান প্রদান বৃদ্ধি করে চলেছে।[৩৬] এছাড়াও ভারত একাধিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি ও ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (FTA) স্বাক্ষর করেছে, যা তার বৈশ্বিক বানিজ্য অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে।

কূটনৈতিক প্রভাব: ভারত তার অর্থনৈতিক প্রভাবের পাশাপাশি কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। দেশটি বৃহৎ শক্তিগুলির সাথে সম্পর্ক উন্নত করার পাশাপাশি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্ব দিচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যেও ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা ও গ্রহনযোগ্যতা (যেমন- রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ভারতকে ভূমিকা পালনে আহ্বান) উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ব্রিকস, জি-২০ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এর

সদস্য হিসেবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোট মঞ্চে ভারতের সক্রিয়তা ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জি-৪ এর সদস্য হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবী, বৃহৎ শক্তি (ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমর্থন পেয়েছে, চীনের অবস্থান অস্পষ্ট) সহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ সমূহ: ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধি সত্ত্বেও, দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। দারিদ্র্য, উচ্চ বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, অবকাঠামোগত উন্নয়নে ঘাটতি ভারতের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। দেশটির একটি বড় অংশ এখনও দরিদ্র অবস্থায় বাস করছে এবং মৌলিক সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত।[৩৭] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই এম এফ) অনুসারে, মাথা পিছু আয়ের ভিত্তিতে, ভারত জিডিপি (নামমাত্র) দ্বারা ১৩৯ তম এবং জিডিপি (পিপিপি) দ্বারা ১২৭ তম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক বিলিয়নেয়ার ভারতে রয়েছে এবং একেই সঙ্গে রয়েছে চরম আয় বৈষম্যও।[৩৮] ভারত দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি হচ্ছে।

উপসংহার: ভারতের অর্থনৈতিক প্রভাব ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক স্তরে দৃশ্যমান এবং ভবিষ্যতে এর বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। তবে, ভারতের এই প্রভাব বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য দেশটিকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং আরও উদারনৈতিক নীতি ও সংস্কার গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ভারত তার বৈশ্বিক প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে। ২০০২ সালে, ভারত সরকার 'অবিশ্বাস্য ভারত' (Incredible India) নামে একটি সর্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রচার শুরু করে। আজ যদি একই ধরনের প্রচারণা শুরু করা হয়, তবে এটিকে 'অনিবার্য ভারত' (Inevitable India) ও বলা যেতে পারে। শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্ব বিশ্লেষকদের একটি কোরাস, ভারতকে পরবর্তী মহান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যেমন- গোল্ডম্যান শ্যাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ভারত ২০৭৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।[৩৯] আবার ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মার্টিন উলফ দাবি করেছেন যে, সবকিছু ঠিক থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের সমান হয়ে উঠবে এবং এর ক্রয় ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৩০% বেশি হবে।[৪০] 'অনিবার্য ভারত' এখন নাগালের মধ্যে। ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে তার অনিবার্যতাকে বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। 'অবিশ্বাস্য ভারত' (Incredible India) পর্যটকদের লক্ষ্য করে তৈরি হয়েছিল। এখন বিশ্ব অর্থনীতিকে তার দরজায় নিয়ে আসার জন্য, ভারতের পরবর্তী প্রচারাভিযান হওয়া উচিত 'বিশ্বাসযোগ্য ভারত' (Credible India)।[৪১]

তথ্যসূত্র:

১) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India#cite_note-Eco_info-53

২) https://cleartax.in/s/world-gdp-ranking-list

৩) Johari, J C (2009) "International Relations and Politics: Theoretical Perspective in the Post-Cold War Era", New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, Pp. 195-200

৪) Ghosh, Peu (2013) "International Relations", Delhi, PHI Learning Private Limited, pp. 28-29

৫) Johari, J C (2009) "International Relations and Politics: Theoretical Perspective in the Post-Cold War Era", New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, Pp. 626-633.

৬) Chandra, S (2018) "Constructing Indian Identity: Economics and Soft Power", New York, Routledge, Pp. 45-46.

৭) *Mazumdar, Surajit (2012)* "Industrialization, Dirigisme and Capitalists: Indian Big Business from Independence to Liberalization" *NMML Occasional Paper History and Society, New Series, No.7, pp. 2-3; For pdf* http://mpra.ub.uni-muenchen.de/93158/

৮) OECD Economic Surveys India; Volume 2007/14, October 2007, pp.13-16. Retrieved from https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:ad127150-cc2f-4a5c-b286-57c133f815c8

৯) World Bank. "India's Growth Story". 2019. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/country/india/overview

১০) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India#cite_note-Eco_info-53

১১) https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?name_desc=false

১২) "India: An agricultural powerhouse of the world". *Business Standard India.* 8 January, 2019. Retrieved from https://www.business-standard.com/article/b2b-connect/india-an-agriculture-powerhouse-of-the-world-116051800253_1.html

১৩) "Labor force, total – India". *World Bank &* ILO. 22 December, 2022. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.ZS?most_recent_value_desc=true&locations=IN

১৪) "Final consumption expenditure (% of GDP) – India". World Bank.

১৫) "Is your debt dragging the economy down?". *The Times of India, 11 September, 2019.*

১৬) "Reserve Bank of India – Publications". *Reserve Bank of India.* 8 July, 2022. Retrieved from https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=20623

১৭) https://www.imf.org/external/datamapper/profile/IND
https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the- world/86159/1

১৮) https://m.economictimes.com/news/economy/indicators/pm-modi-cites-reports-to-assert-india-on-cusp-of-new-era-of-economic-prosperity/articleshow/102833061.cms

১৯) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India#cite_note-Eco_info-53

২০) World Bank. (2023). Foreign Direct Investment, Net Inflows. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

২১) NASSCOM. (2023). Indian IT-BPM Industry Report. Retrieved from https://nasscom.in/knowledge-center/publications

২২) https://hbr.org/2023/09/is-india-the-worlds-next-great-economic-power

২৩) https://www.economist.com/asia/2023/03/13/india-is-getting-an-eye-wateringly-big-transport-upgrade

২৪) https://www.economist.com/asia/2023/03/13/india-is-getting-an-eye-wateringly-big-transport-upgrade

২৫) https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/indias-internet-subcribers-increased-to-88125-million-as-of-march-end-trai-report/article67219636.ece

২৬) http://english.scio.gov.cn/m/pressroom/2022-11/07/content_78506468.htm

২৭) (https://hbr.org/2023/05/the-case-for-investing-in-digital-public-infrastructure

২৮) https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/india-tops-world-ranking-in-digital-payments-beats-china-by-huge-margin-report/articleshow/100944643.cms

২৯) https://northeastlivetv.com/topnews/india-lifted-800-million-people-out-of-poverty-simply-by-smartphone-unga-president/

৩০) Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). (2023). Renewables 2023 Global Status Report. Retrieved from https://www.ren21.net/reports/global-status-report/

৩১) International Energy Agency. (2023). "India Energy Outlook." Retrieved from https://iea.org

৩২) আনন্দবাজার পত্রিকা; ১২ জুলাই, ২০২৪

৩৩) United Nations. (2023). World Population Prospects: The 2023 Revision. https://population.un.org/wpp/ Accessed 23 July, 2024

৩৪) Indian Pharmaceutical Industry Analysis. 2023. Retrieved from https://www.ipa-india.org/

৩৫) “By Country/ Economy- Free Trade Agreements.” Retrieved from https://aric.adb.org/database/fta-country

৩৬) “2004 to 2014- India’s lost decade/ Mint”. Retrieved from https://www.livemint.com/Opinion/pjn6VtNuSyLClkQFwx50qN/2004-to-2014Indias-lost-decade.html

৩৭) http://unemploymentinindia.cmie.com/

৩৮) *The Economic Times,* 20 January 2020.

৩৯) https://www.goldmansach.com/intelligence/pages/how-india-could-rise-to-the-worlds-second-biggest-economy.html

৪০) http://www.ft.com/content/c9de715e2e29-4a7f-880b-1509c04bf11b

৪১) https://www.google.com/amp/s/www.business-standard.com/amp/economy/news/india-could-become-a-magnet-for-foreign-direct-investment-martin-wolf-123070800479_1.html.

অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাব্যময় গদ্যভাষা

পম্পা বর্মণ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব হয় বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'প্রমিলার বিয়ে' নামক ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। তিনি নিজেকে মূলত লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে পরিচয় দিতেন। পেশার ডাক বিভাগের কর্মচারী হওয়ার দরুন তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এবং প্রচুর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করে তৈরি করেছেন সাহিত্য রচনা মনোভূমি। তাঁর উপন্যাসগুলির লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি শুধুমাত্র রাজা-রানী, জমিদার, জোতদার, এদের কথাই বলেননি। গোটা সমাজের সকলের কথাই সমান সহানুভূতি দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন পৃথিবীময় উপন্যাসের উপাদান। তাই শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা নয়, সমাজের যে কোনো স্তরের মানুষ উপন্যাসের নায়ক হওয়ার যোগ্যতা রাখে। উপন্যাসের ভাষা নিয়ে তিনি সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। গদ্যভাষা তাঁর সম্পদ। উপন্যাসে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব ঘরনার। এই ভাষার জন্যই তিনি সর্বদায় আলোচিত ও চর্চিত। অমিয়ভূষণের নতুন রীতির বাক্যগঠন, অব্যয় দিয়ে বাক্যের সূচনা, সর্বনাম দিয়ে বাক্যের শুরু, 'না' শব্দ ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন, প্রশ্নসূচক বাক্য ব্যবহারের কৌশল, ক্রিয়া পদের স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি সুকৌশল এর মধ্য দিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার বাক্য গঠনের প্রচলিত নিয়মকে ভেঙে ফেলে গড়ে তুলেছেন নতুন ছাঁচের ভাষা রীতি। আবার প্রকরণ সচেতনতা, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, সমান্তরাল বাক্যগঠন, ঘনঘন যতিপাত, প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দ্বৈত শব্দের ব্যবহারের ফলে গদ্যে এক ধরনের কাব্যময়তা সৃষ্টি করেছেন। এছাড়াও তাঁর উপন্যাসগুলির লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিভিন্ন রঙের সমাহার। লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ এই রঙগুলি তিনি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। সব রঙ কোনো না কোনো তাৎপর্যকে বহন করে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি যেমন বিভিন্ন রঙ এর ছবি এঁকেছেন পাশাপাশি চরিত্রগুলির হতাশা, ক্লান্তি, দুঃখ,ও আনন্দ বোঝাতেও তুলে ধরেছেন বিচিত্র রঙ। গদ্যের রূঢ়তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি কখনো কখনো কাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন। গদ্য যখন কবিতামুখী হয় তখন গদ্যের শব্দ নির্বাচনে লেখককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু অমিয়ভূষণের চিন্তা চেতনা যেমন মনোহর তেমনি প্রশংসনীয় কাব্যময় অনুভবের মনোহারি প্রকাশ। লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় তাঁর রচনায় রসাস্বাদনে বারবার বাঁধার সৃষ্টি করে। আর সেই কারণেই হয়তো তাঁর লেখা তথা উপন্যাস, ছোটগল্প সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। তাই তিনি

পাঠককে তাঁর রচনার পুনঃ পাঠের দাবি করেন। ভাষা ব্যবহারের নিজস্ব কৌশল তাকে করে তুলেছে এক 'ভিন্ন ধারার লেখক'। 'অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাব্যময় গদ্যভাষা' এই শিরোনামটির মধ্য দিয়ে তাঁর উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের সুকৌশলগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ : কাব্যময়তা, অরণ্য, চিত্রকল্প, কামগন্ধহীন, উত্তরবঙ্গ, জনজাতি, স্বপ্নময়তা, পুনরাবৃত্তি, লালের আভা, মনোহারি।

মূল আলোচনা :

অমিয়ভূষণ মজুমদার মূলত ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক বা কথাসাহিত্যিক। কবিতা লেখার সুযোগ তিনি তেমন পাননি। 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র' এর ১১তম খণ্ডে 'রাজার ঝিয়ারি অচেতন ঘুম ঘোরে' নামক একটি মাত্র কবিতা আমরা পাই। কবিতা সম্পর্কে সমীক চক্রবর্তী ও সমীর চট্টোপাধ্যায় এর এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন—"সাহিত্য শব্দ নিয়ে গোলমাল আছে। অনেকে যাকে সাহিত্য বলে, আমি তাকে সাহিত্য বলি না। সাহিত্য বলতে আমি পোয়েটিক্স বা অলংকার শাস্ত্রকে বুঝি। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা এই সবকেই আমি মনে করি কাব্য, বক্রোক্তি যার জীবন, ধ্বনি যার কায়া, রস যার আত্মা। প্রবন্ধ ছাড়া যখনই যা লিখি সবই আমার কাছে কবিতা।"[১] কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতার ভাষার সঙ্গে গদ্যের ভাষার একটা পার্থক্য থেকেই যায়। কবিতা হল অল্প কথার মধ্য দিয়ে অনেক কথার প্রকাশ। তাই কবিকে শব্দচয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হয়। অমিয়ভূষণ মনে করতেন—"গদ্যের আয়তন আছে, দু-চারটি শব্দের অপপ্রয়োগে লেখকের কম্যুনিকেশন মার খায় না। কিন্তু একটি কবিতায় একটি শব্দ কিংবা একটি যতিচিহ্নের গোলমাল হয়ে গেলে গোটা কবিতাই মার খেতে পারে।"[২] অর্থাৎ কবিতায় বা গদ্যে একই শব্দ ব্যবহার করা হলেও শব্দচয়নের যুক্তি পৃথক। এই শব্দচয়নই সেই ম্যাজিক যা একটা সাহিত্যকর্মকে কবিতায় পরিণত করে। লেখকের জীবনদৃষ্টি তাঁর ভাষার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। আসলে জীবন সম্পর্কে লেখকের যে অভিজ্ঞতা তা প্রকাশ পায় তার বিষয়ের বিভিন্নতায়। বিষয় ও দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্যে ভাষার বদল হয়। অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুধুমাত্র ভাষায় নয় বিষয়বস্তু নির্বাচন ও অভিনব। এই নবীনতাই যেন অমিয়ভূষণের মূল আকর্ষণ। তাঁর গদ্য পড়লেই মনে হয় তিনি এক সৌন্দর্য বিন্দু থেকে যাত্রা করেছেন আর এক সৌন্দর্যের অভিমুখে। তিনি কবিতা খুব কম লিখলেও তাঁর গদ্য কবিতারই ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। গদ্য যখন কবিতামুখী হয় তখন গদ্যের অন্বয়কে কিছুটা বদলাতে চান লেখক। যেহেতু পদ্যের ছন্দকে আশ্রয় করতে পারেনা সেজন্য তার ছন্দকে এমন ভাবে নির্বাচন করতে চান যাতে গদ্য পদ্যের কাছাকাছি যেতে পারে। সেজন্য গদ্যের শব্দ নির্বাচনে লেখককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর চেতনা ও ভাবকে প্রকাশ করতে গিয়ে গদ্যের রূঢ়তা থেকে বেরিয়ে কাব্যের আশ্রয়

নিয়েছেন। তাঁর কাছে উপন্যাস সেই মহাকাব্য যা গদ্যে লেখা হয়। অমিয়ভূষণের গদ্য সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন—"অমিয়ভূষণ বিষয় উপস্থাপনা শুরুতে কাব্যের দুহাত ধরে দু পা এগিয়ে হঠাৎ গদ্যে এসে মেশে।... অন্তরঙ্গে কাব্য আর বহিরঙ্গে গদ্য এমন আশ্চর্য নিরীক্ষা।"[৩] অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে যে কাব্যময়তা ফুটে উঠেছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—ছোট ছোট বাক্যগঠন, একই শব্দের পুনরাবর্তন, একই শব্দ দিয়ে পরপর কয়েকটি বাক্যগঠন, কখনো সামান্তরাল বাক্যগঠন, ঘনঘন যতিপাত, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার, দ্বৈতশব্দের ব্যবহার, প্রশ্নসূচক বাক্য ব্যবহারের কৌশল, চিত্রকল্পের ব্যবহার তার গদ্যকে গতিশীল ও কবিতামুখি করে তুলেছে। তাঁর গদ্যে যে কাব্যময়তা ফুটে উঠেছে তা যে শুধুমাত্র পাঠযোগ্য তা নয়, দর্শনযোগ্য বটে। এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে তার অবচেতন থেকে বেরিয়ে আসে নানা 'চিত্রকল্প' বা 'ইমেজ'। এই চিত্রকল্প গড়ে ওঠে ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে। 'চিত্র' অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য 'কল্প' মানে অনুভূতির জগৎ। লঙ্গিনুস 'ইমেজ' সম্পর্কে বলেছেন—"you imagine you are actually seeing the subject of your description and enable you audiences as well to see it।"[৪] দেখা এবং দেখানো এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কবিতা। দেখা অবশ্যই মর্ম চোখে দেখা আর দেখানোর উপর নির্ভর করে লেখকের দক্ষতা। মনের অবচেতন থেকে বেরিয়ে আসে ছবি। বিষয় সম্পর্কে লেখকের ধারণা যদি স্বচ্ছ হয়, তাহলে উপন্যাসে ভাষা, উপমা, চিত্রকল্প সমস্তই বিষয়ের তাৎপর্যকে প্রকাশ করতে এগিয়ে আসে। তাঁর উপন্যাসে জীবনের বাস্তবতা ও জীবন সম্পর্কে লেখকের অনুভূতি এই দুটিই সমান দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুভূতির ব্যাপকতা বারবার করেই নদী, সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য ও আকাশের ব্যাপ্তি ধরা দিয়েছে। তিনি বাস্তব জীবনে অরণ্য, নদী, পাহাড় অর্থাৎ প্রকৃতিকে এত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিনের যে রূপ পরিবর্তন ঘটে তা তিনি নিখুঁত ভাবে উপন্যাসে ভাষারূপ দিয়েছেন। উপন্যাসে চরিত্রগুলি যখন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে হাঁপিয়ে উঠেছে তখন তিনি যেন তাদের প্রশান্তির জন্য নিয়ে গেছেন প্রকৃতির কোলে। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে তিনি বলেছেন—"তারা যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে। এসব দেখে আমার মনে হয়েছিল; অরণ্যের দুই রূপ আছে; এক রূপে সে আশ্রয় দেয়, অন্যটিতে সে প্রতিহত করে।"[৫] প্রকৃতির এই দুই রূপকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন নীল, বেগুনি, সবুজ, হলুদ, লাল বিভিন্ন রঙের সমাহারে।

"নীলাভ বেগুনি রঙের মতো মেঘ মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের মতো সমান্তরাল সরল রেখার মতো গাছের গুড়ি, তার কোলে হাল্কা নীল নদীর জল।"[৬]

বর্ণময় অরণ্যের বর্ণনায় এই কাব্যিক চিত্র সত্যিই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে মধুর দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে বিচিত্র রঙের আকাশ।

"অনেক রকম আকাশ দেখা আছে মদুর সকালের। টুপ করে আলো নেবার পর যে-অন্ধকার; তারপর নানা দিক নানা রঙের আকাশ হয়। লালে সোনালিতে মাখামাখি হয়, কখন যেন একবার লাল সবুজে মেশামেশি ছিল। কান্নার মতে তা ঝড়ের কারণ।"[৭]

আবার 'দুখিয়ার কুঠি'তে বর্ণিত হয়েছে আর এক রঙা আকাশ—"আকাশে আলো আর মেঘ। হলুদ আলো আর সাদা মেঘ। খুব ভালো করে দেখলে মেঘ যেখানে ভাঙচুর হয় সেখানে কখনও হালকা নীল, কখনও কমলা রং চোখে পড়তে পারে।... এ কী রকম নীরস, জীবনহীন, অপ্রয়োজনীয় আলো?... ওখানে যদি আলো ঢোকে তবে বনের সেই দোয়াতের কালির রঙে মিশে বোধ হয় সবুজে-হলুদ হবে।"[৮]

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রঙ ছাড়াও অমিয়ভূষণ মজুমদার কালো রঙের ব্যবহার ও ভিন্নতা এনেছেন। যেমন—

১। "অন্ধকার। অন্তত আধো-অন্ধকার, সবুজ মিশানো কালচে অন্ধকার থেকে হলুদ-ধূসর-উজ্জ্বল সূর্যালোকে, আদি মতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেলাকে জেলা।"[৯]

২। "আর উত্তরদিকে নীল পাহাড় দিয়েছে, যার মধ্যে বিনদনির ছেলেরা বন্ধুরা রাতের ছাই-ছাই অন্ধকারে পালাতে চেষ্টা করছিল। সেই ছাই-ছাই অন্ধকারে গাছপালা, হরিণ, মানুষকে গাঢ় কালো রঙ দেখায় কিন্তু।"[১০] অমিয়ভূষণ মজুমদার যে রং গুলি ব্যবহার করেছেন তা কোনো না কোনো তাৎপর্যকে বহন করে।

বন যে মানুষের মনের অবচেতনের অংশ লেখকের বর্ণনায় সেই নিবিড় বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে 'সোঁদাল' উপন্যাসে—"যত গ্রাম, তত বন।... এই গ্রাম সেই গ্রামের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে, এমনকি বহতা নদীর এখাত সেখাত পার হয়ে হয়ে, কোলের কাছে একটা দুটো গ্রাম রেখে রেখে, এক মহাবন আর এক মহাবনকে স্পর্শ করে করে বিরাজ করত। আর সেসব বনে, যেমন হয়, দিনেও আলো হয় না, জোনাকি জ্বলে এমন অঞ্চলও ছিল। গাছপালা ছিল, মহীরুহ, বনস্পতি ছিল; হাতি, গণ্ডার, বাঘ, শুয়োর, হরিণ, বুনোমোষ, বনমুরগী, সাপ ছিল। ঝর্ণা ছিল, বড় নদীর ছোট ছোট শাখা ছিল; হাতিঘাস ছিল, বুনোঘাস ছিল, জলে শাপলা-শালুকের, হোগলার, কাশের সমারোহ থাকত। আর সেই অগম বনের অন্তস্থলে কখনও সেই বনে হারিয়ে গিয়ে, বুনো মানুষের গোষ্ঠীও থাকত।"[১১]

বনের এই অপরূপ সৌন্দর্য প্রকাশে তাঁর রচনায় ভাব ও ভাষার পরকাষ্ঠা লাভ করেছে। সুন্দর তাঁর কাব্যময় অনুভবের সৌকুমার্য। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ যেমন ধরা পড়েছে বিচিত্র রঙে তেমনি চরিত্রগুলির রূপ বর্ণনা, পরিধেয়ও পোশাক ও বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যে একটা কাব্যময়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'গদ্যপদ্য ও কবিতা পুস্তক' গ্রন্থে বলেছেন –"এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে

কবিতা পদ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্য কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয় বিশেষে গদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল।"[১২] এই বক্তব্যটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গদ্যকে অবলম্বন করে কাব্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য করি তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' নামক উপন্যাসে নায়িকার রূপ বর্ণনায়— "সেই গম্ভীরনাদি, বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার,-অবেনীসম্বন্ধ, সংসপিত, রাশিকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।"[১৩] অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে কালো মেয়ে মালতির রূপ বর্ণনা এনেছেন 'লালের আভা'— "কথাটা বোধহয় সিঁদুর। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা। বাড়িটার দরজা-জানালার পর্দা গুলোয় লালের আভাস। মালতির হাতে লাল শাঁখা। তার সর্বাঙ্গের অজস্র নতুন গয়নাগুলিতেও লালের আভা।"[১৪] এই 'লালের আভা' যেন মালতির বিবাহিত জীবনে প্রেম, ভালবাসা ও আশার ইঙ্গিত বহন করেছে। এছাড়া ছোট ছোট বাক্যগঠন, একই শব্দের পুনরাবর্তন ও একই শব্দ দিয়ে পরপর কয়েকটি বাক্য গঠন অর্থাৎ পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বাক্যটিতে একটি স্পন্দন তৈরি করতে চেয়েছেন লেখক। লেখকের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, তাঁর উদ্দেশ্য সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকে নান্দনিক স্তরে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর চিন্তা যেমন মনোহর, তেমনি প্রশংসনীয় কাব্যময় অনুভব এর মনোহারি প্রকাশ। তাঁর গদ্য পরলেই মনে হয় যেন জাগ্রত স্বপ্ন ময়তা নেমে এসেছে লেখকের মনোভূমিতে। "অমিয়ভূষণ শব্দচয়নে পদন্যাসে বাক্য গঠনে, যতি ব্যবহারে, অনুচ্ছেদ বিভঙ্গে তীক্ষ্ণ মনোযোগী এবং বয়নের এই পরিপাট্য তার সমগ্র রচনায় ব্যঞ্জনার ধ্বনি এনে দেয়। তার লেখায় ক্বচিৎ কখনো কাদামাটির গন্ধমাখা আনকোরা দেশি শব্দ এসে পড়ে, তাতে গদ্যের শীলিত প্রসন্নতা একটুও ক্ষুন্ন হয় না, কারণ তার ভাষায় অন্তরঙ্গে শুচিতাবোধ আছে, কিন্তু শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই।"[১৫] অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর ভালোলাগা ও ভালোবাসার উত্তরবঙ্গের প্রকৃতিকে যেমন উপন্যাসে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন তেমনি সেখানকার বিভিন্ন জনজাতি, তাদের ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের পাতায় পাতায়। তাই আনকোরা দেশি শব্দ অনায়াসেই উপন্যাসের শোভা বৃদ্ধি করেছে। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের সুরোর পরিচয় দিতে গিয়ে উপন্যাসে প্রথম পাতায় তিনি উল্লেখ করেছেন— "জল ও জঙ্গল নিয়ে জঙ্গাল-বাঙাল বাংলা দেশের এক গৈ-গাঁয়ের মেয়ে সুরো। ব্রাত্য 'সান্দার' বংশে তার জন্ম। বাপ নেই ভাববে, মা নেই কাঁদবে। গাঁয়ের পরিসীমার সঙ্গে সম -আয়তন ছিল তার মনের বিস্তার। গ্রামের মধ্যে গাঁ, বড়ো গ্রামের অংশ ছোট গ্রাম। পদ্মার চড়ে বসানো গাঁয়ের একটির নাম বুধেডাঙ্গা, তারই মেয়ে সে। বাউল পীরের গানে-গানে ছড়ানো, কথক- পাঠকের মুখে-মুখে রাঙানো ধর্ম- দর্শন ন্যায়-নীতির প্রবেশ

হয়নি তার মনের সীমায়।"[১৬] এই বাক্যটির লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জাঙ্গাল-বাঙ্গাল, গৈ-গায়ের, গাঁ এই শব্দগুলি আনকোরা দেশি শব্দ হলেও গদ্যের কার্য কারণ সূত্রে এই শব্দগুলির প্রয়োগ সুসমঞ্জস্যপূর্ণ। সুরো যে বুধেডাঙার অত্যন্ত গ্রামের মেয়ে তা এই শব্দগুলি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। আবার একই শব্দের ভিন্ন প্রয়োগ, যেমন 'গ্রামের মধ্যে গাঁ', দ্বৈতশব্দের প্রয়োগে বুধেডাঙ্গার মেয়ে সুরোর পরিচয় তিনি এনেছেন কাব্যিক অনুভূতি।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দ্বৈতশব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। যা তাঁর গদ্যকে গতিশীল করে তুলতে সাহায্য করেছে। যেমন-- "মেঘলা দিনকে যেমন চড়া রোদের আলো, রাজাকে যেমন গণতন্ত্র, স্মৃতি-আবেগ-অবচেতন কে যেমন পড়াশোনা আর বুদ্ধি তেমন বনারণ্যকে কাটতে কাটতে, ভাঙতে ভাঙতে, ঝলসাতে ঝলসাতে, আল টপকে টপকে শত শত মাইল চলে যাবে চষা জমির ধূসরতা।"[১৭] ঘনঘন যতিপাত ও দ্বৈত শব্দের ব্যবহারের ফলে এই গদ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছন্দ-তরঙ্গ। অমিয়ভূষণ মজুমদারের সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবনে হতাশা, দুঃখ ও দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে নতুন জীবনের স্বপ্নে ভরপুর। তাই 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে দেখা যায় আলেফ শেখকে, যিনি তার সন্তানকে হারিয়েও আগামী প্রজন্মের জন্য চাষ দেওয়ার কথা ভাবে, বালির মধ্যে লাঠি পুঁতে বারবার পরীক্ষা করে নিতে চায় বালুর কত নিচে মাটি। আবার সুরোর ব্যথাতুর মন মাধাই-এর কাছে থাকলেও তার শরীর যেন আকস্মিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ইয়াজের কাছে। 'সোঁদাল' উপন্যাসে শোনা যায় তিন্নির করুন স্বর—'এক রাতিৎ জীবনের সোয়াদ মিটে?' আবার 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে মাতালু চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার সময় ও ভাবতে থাকে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা। তাই তাকে বলতে শোনা যায় 'মোর খাওয়া আছে জলপরীর ঘরৎ'। আসলে অমিয়ভূষণ মজুমদার বিশ্বাস করতেন প্রেম এমন এক আলো, যা জীবনকে স্নাত করে। প্রেমের স্নিগ্ধ আলোয় মানুষ সংযত হয়। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে প্রেমকে করে তুলতে চেয়েছেন কামগন্ধহীন। জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি কমরুন আসফাকের সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও কমরুণের ডাককে অস্বীকার করে আসফাক। "আসফাক কমরুনের দিকে চেয়ে রইল। হলুদ সাদায় ডুরি একটা খাটো শাড়ি পরনে তার। গলায় একেবারে নতুন একটা রুপোর চিকহার কমানো লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঝকঝক করছে। কমরুন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কাছে তার সুদৃশ্য বিছানা। মশারিটা তোলা। সাদা ধবধবে বিছানায় দু একটা মাত্র কোঁচকানো দাগ। আর কমরুনের এক কুড়ির উপরে দশ পার হওয়া কিছু ভার মুখকে আলো করে নীল কাঁচের নাকফুল। ওটা সোনা না হয়ে যায় না।"[১৮] আবার 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে দেখা যায় প্রেমের আর এক বহ্নিশিখা। যেখানে মৃত্যু অনিবার্য জেনেও পতঙ্গ ধাবিত হয়। এই উপন্যাসে কোন সুনির্দিষ্ট কাহিনী প্লট না থাকলেও একাধিক কাহিনীর ইঙ্গিত উল্লেখ আছে। যা মধুর স্মৃতিতে বিরাজমান। নদীর স্রোতের মতো তার অন্তরেও অতীতের

সেইসব ঘটনাগুলি বারবার ঘুরপাক করে। এছাড়াও নদীর দুধারের চলমান দৃশ্যের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন কাব্যিক ভঙ্গিতে। এনেছেন ঘাই হরিণীর প্রসঙ্গ। তিনি দেখেছেন প্রেমে প্রমত্ত অবস্থায় দুটি হরিণ। যেন ছবিতে আঁকা। শুনেছেন হরিণীর ডাকের ব্যাকুলতা। মানুষের পক্ষে সে ডাকের গভীরতা বোঝার সামর্থ্য না থাকলেও সে ডাক যেন পুরুষ মানুষের বুক কাঁপাতে থাকে। ঘাই হরিণী কিভাবে দল ভুলিয়ে নিয়ে এসে ব্যাধের শিকারের মুখে হরিণকে ফেলে দেয়। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও হরিণ যেন মেতে ওঠে প্রেমে। সেই প্রেমের স্বর্গীয় বর্ণনায় লেখক এনেছেন কাব্যিক অনুভূতি।

"মধু হাসল। বলল ঘাইরা পালাতে দেয় না।
তা দেবেই যদি, দল ভুলিয়ে আনা কেন?
কিন্তু এমত দৃশ্য দেখিছ আরু?
এমত প্রেম; এমত খেলা?
অহো,
এমত দৃশ্য দেখি মানুষ অমর হয়।
আহা;
অসুনিতে পুনরস্মায়ু চক্ষু পুন প্রানমিহ নো দেহি ভোগম।
হে প্রাননেতা,
আবার প্রাণ দিহ,
আবার চক্ষু দিহ,
আবার দেখিবা দিহ,
আবার।"[১৯]

'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসে দেখা যায়, যে মাধাই গরুকে বিষ দিত, চামড়ার ব্যবসা করত, যৌন ব্যভিচারে ডুবে ছিল সেই মাধাই সুরোকে ভালোবেসে গঙ্গাস্নান করে সন্ন্যাসীর নিরাসক্ততা অর্জন করেছিল। কামকে প্রেমের স্নিগ্ধ আলো স্নান করাতে পেরেছিল মাধাই। উপন্যাসের শেষে বানভাসি পরিস্থিতিতে সুরো মাধাই কে বাঁচাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেও তাতে সে সক্ষম হয়নি। তাই জীবনচক্রে তাকে ইয়াজের প্রেমে ধরা দিতে হয়। উপন্যাসের শেষের লাইনটি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে পদ্মার এই রূপকে ব্যাখ্যা করতে তার ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্যময় অনুভবের প্রকাশ। এখানে পদ্মা নদী যেন সুরোর মনের প্রতীক হিসেবে ধরা দিয়েছে।

"থেকে থেকে পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে তখনো,
ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক।
উপরে ড ড ড করে মেঘ ডাকছে।
পুরাণটা যদি কারো জানা থাকে হয়তো কারো মনে হতে পারে,
কেউ যেন অন্য কাউকে বলছে :
দয়া করো, দয়া করো।"[২০]

অমিয়ভূষণ মজুমদার সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা গদ্য ভাষাকে শক্তিশালী করে তুলতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর একটি উপন্যাস সেই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আবেগময়তা, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রতিটি ভাবকে ব্যক্ত করতে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রীতির বাক্য সংগঠন করেছেন। লেখকের এই বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা তার রচনাকে এক আলাদা মাত্রা দিয়েছে। অমিয়ভূষণের প্রকরণ সচেতনতা, পাঠকৃতির অন্তর্গত বাচন স্তরের বহুমাত্রিকতা, বিচিত্র্য ভাষা শৈলীর ব্যবহার তাঁর রচনায় রসাস্বাদনে বারবার বাধা সৃষ্টি করে। তাই তিনি তাঁর রচনার পুনঃ পাঠের দাবি করেছেন। ভাষা প্রকাশের নিজস্বতাই তাকে করে তুলেছেন এক ভিন্ন ধারার লেখক।

তথ্যসূত্র :

১। মজুমদার এনাক্ষী(সম্পাদনা), ‘কথা বলতে বলতে’ অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি ২০১৮ এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-১২৮

২। তদেব, পৃ-৩৮

৩। নাগ রমাপ্রসাদ, ‘স্বতন্ত্র নির্মিতিঃ অমিয়ভূষণ সাহিত্য’, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০২, পুস্তক বিপণী, কলকাতা- ৯, পৃ- ১৭১

৪। মুখোপাধ্যায় তরুন(সম্পাদিত), ‘নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা’, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ-৭২

৫। অমিয়ভূষণ, ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র’ (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৮, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ২৪০

৬। তদেব, পৃ- ৭

৭। অমিয়ভূষণ, ‘মধু সাধুখাঁ’, ‘অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র’(৪র্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৪০

৮। অমিয়ভূষণ, ‘দুখিয়ার কুঠি’, ‘অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র’(৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ২০০৫, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৯৫

৯। অমিয়ভূষণ, ‘সোঁদাল’, ‘অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র’(৮ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৭৮

১০। অমিয়ভূষণ, ‘বিনদনি’, ‘অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র’(৭ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৯, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ১২৩

১১। অমিয়ভূষণ, ‘সোঁদাল’, ‘অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র’(৮ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৭৯

১২। দাশ শিশির কুমার, 'গদ্য পদ্যের দ্বন্দ্ব', প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৩৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৭১

১৩। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্কিম রচনাবলী'(উপন্যাস সমগ্র), প্রথম প্রকাশ- ১লা জানুয়ারি (কল্পতরু উতসব) ২০০৯, পৃ- ১০৩

১৪। অমিয়ভূষণ, 'দুখিয়ার কুঠি', 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র'(৩য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারি ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৭২

১৫। নাগ রমাপ্রসাদ, 'স্বতন্ত্র নির্মিতিঃ অমিয়ভূষণ সাহিত্য', প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০২, পুস্তক বিপণী, কলকাতা- ৯, পৃ- ১৭১

১৬। অমিয়ভূষণ, 'গড় শ্রীখণ্ড', 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র'(১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ২১

১৭। অমিয়ভূষণ, 'সোঁদাল', 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র'(৮ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৮৩

১৮। অমিয়ভূষণ, 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র' (৬ষ্ঠ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ২৭৮

১৯। অমিয়ভূষণ, 'মধু সাধুখাঁ', 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র'(৪র্থ খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- জুন ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ২৭

২০। অমিয়ভূষণ, 'গড় শ্রীখণ্ড', 'অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র'(১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ- ৩৪৫।

কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিবাদী দর্শনে মানব অস্তিত্বের তিনটি স্তরের একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

আসলাম মল্লিক
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ডেনমার্কের দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের পরিবার ধার্মিক হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই ধর্ম নিয়ে উনার মনে গভীর চিন্তা ছিল। সেই জন্য কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিবাদী দর্শনকে আমরা বলি **আস্তিক অস্তিবাদ** (Theistic Existentialism)। যে অস্তিবাদের অধীনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিহিত থাকে, তাকে আস্তিক অস্তিবাদ বলা হয়। কিয়ের্কেগার্ড ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁকে অস্তিবাদের জনক বলা হয়। একজন অস্তিবাদী দার্শনিক হিসাবে কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তির প্রাত্যহিক সক্রিয় মুক্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি কোন অস্তিত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেননি। এই অস্তিত্ব হল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের। এই অস্তিত্বের মধ্যে তিনি অস্তিত্বের সংকটগুলিকেও আলোচনা করেছেন। তিনি মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, সেগুলি হল নান্দনিক বা সৌন্দর্য চেতনার স্তর, নৈতিক স্তর এবং ধর্মীয় স্তর। মানুষের জীবন সাধারনত এই তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়। নান্দনিক স্তর হল ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সুখভোগের স্তর। এখানে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হল কেবলমাত্র সুখকে উপভোগ করা এবং দুঃখকে বর্জন করা। এই স্তরে ব্যক্তি কোন নীতি বা আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হন না। এই নান্দনিক স্তরে ব্যক্তির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাই সে নৈতিক স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরে ব্যক্তি নিজেকে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মনে করে; সে সমাজের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে। নৈতিক নিয়মগুলি মেনে চলে। কিন্তু এই স্তরেও ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক হতাশা দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা দেখা দেয়। এই প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য হল কিয়ের্কেগার্ডকে অনুসরণ করে মানব অস্তিত্বের তিনটি স্তরকে ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলির একটি পর্যালোচনা করা।

সূচক শব্দ : আস্তিক অস্তিবাদ, দ্বান্দ্বিকতা, নান্দনিক স্তর, নৈতিক স্তর, ধর্মীয় স্তর, নৈতিক হতাশা, ব্যক্তিগত সত্যতা।

মূল আলোচনা:

কিয়ের্কেগার্ড তাঁর অস্তিবাদী দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অস্তিত্ব হল ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের। ব্যক্তির স্বনির্বাচিত অস্তিত্বকে আলোচনা করাই হল কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিবাদী দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। এখানে তিনি বুদ্ধি বা যুক্তির তুলনায় অনুভূতি, কর্ম, সংকল্পকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলছেন বুদ্ধি বা যুক্তিতন্ত্র কতকগুলি সামান্য ধারণায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। এইরকম কতকগুলি সামান্য ধারনার ভিত্তিতে ব্যক্তির জীবনকে বা অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়। সামান্যীকরণ হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার মানদণ্ড। এই সামান্যীকরণ ব্যক্তির বিশ্বাস, সংকল্প, কর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সেইজন্য তিনি যুক্তি-তন্ত্রকে বাইরে রেখে ব্যক্তির অস্তিত্বের আলোচনায় আগ্রহী উনার অস্তিবাদী দর্শনে। অস্তিবাদীরাই প্রথম এই সার্বিকতাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। যারা অস্তিবাদী দার্শনিক তারা এই সার্বিকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন। কিয়ের্কেগার্ড প্রথম এই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন 'Individual is higher than the Universal'। তিনি বলেন সার্বিকতাকে কেন সবার উপরে রাখতে হবে? কিয়ের্কেগার্ড বলেন সার্বিকতাকে কে অনুভব করে? সার্বিকতা আসলে কোথায় আছে? পাশ্চাত্য দর্শনে ধারণা ছিল এমন একটা নীতি আনতে হবে যেটা সকলে গ্রহণ করবে। যেটা কখনো বাধিত হবে না, অবাধিত থাকবে। জ্ঞানতত্ত্বে, নীতিতত্ত্বে, সৌন্দর্যতত্ত্বে আমাদের এরকম একটি সার্বিক নীতি খুঁজে বার করতে হবে। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন দার্শনিকরা বিজ্ঞানের মত দর্শনকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। একটি সার্বিক নীতির অনুসন্ধান করেছিলেন এবং সেগুলি জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কান্ট বলছেন 'Universal is higher than the Individual'। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড সেটিকে বিপরীতভাবে বলছেন 'Individual is higher than the Universal'। সাধারণত আমাদের ব্যবহারিক জীবন কিভাবে কাটে; ব্যবহারিক জীবনে কি কি ঘটে- সেগুলি নিয়ে অস্তিবাদীরা আলোচনা করেন। কিয়ের্কেগার্ড তাঁর অস্তিবাদী দর্শনে ব্যক্তির প্রাত্যহিকযাপন বা অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই **'ব্যক্তির অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব'** (Dielectric Of Existence) নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিয়ের্কেগার্ডের মতে মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের মধ্যে আমরা এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। তিনি তাঁর এই দ্বান্দ্বিকতার ধারণা পেয়েছেন হেগেলের কাছ থেকে। কিয়ের্কেগার্ড যে দ্বান্দ্বিকতার কথা বলছেন সেই দ্বন্দ্ব হল মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন হেগেল যে দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন সেই দ্বন্দ্ব হল পরিমাণগত দ্বন্দ্ব। কেননা সমস্ত বস্তু জগত এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় বস্তুর গতির বা পরিবর্তনের তত্ত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং জগতের যে পরিবর্তন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা আমরা হেগেলের দ্বন্দ্বে পাই। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ডের দ্বন্দ্বতত্ত্বে জগতের রূপান্তরের কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। তার দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের প্রাত্যহিক যাপন। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বস্তুগত তত্ত্ব। কিয়ের্কেগার্ডের দ্বন্দ্বতত্ত্ব বিষয়ীগত

একটা তত্ত্ব। কেননা মানুষের দ্বন্দ্বের কথা এখানে বলা হয়েছে। কিয়ের্কেগার্ড তাঁর নিজের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে তাই গুণগত বলেছেন। তিনি 'ব্যক্তির অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব' এ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যে গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে অস্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এই অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল-

১. নান্দনিক স্তর বা সৌন্দর্য চেতনার স্তর (Aesthetic level)
২. নৈতিক স্তর (Ethical level)
৩. ধর্মীয় স্তর (Religious level)

এই তিনটি স্তর নিয়ে তিনি প্রধানত দুটি বইএ আলোচনা করেছেন- *Concluding Unscientific Posts Cript এবং Stages On Life's Way*। যেকোনো মানুষের জীবনে এই তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায় কোন ব্যক্তি সারা জীবন নান্দনিক স্তরে অথবা নান্দনিক এবং নৈতিক স্তরে কাটিয়ে দিতে পারে।

নান্দনিক স্তর: অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের প্রথম স্তরকে কিয়ের্কেগার্ড নান্দনিক স্তর বলেছেন। এই স্তরকে তিনি সৌন্দর্য চেতনার স্তরও বলেছেন। কিয়ের্কেগার্ড এই নান্দনিক স্তরকে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন-এই স্তরটি হল 'life of immediacy' **অর্থাৎ বিশুদ্ধ তাৎক্ষণিকতার জীবন**। তাৎক্ষণিক স্তর বা আনন্দের স্তর হল এই জীবন। এই স্তরে ব্যক্তি কোন সার্বজনীন নীতি অনুসরণ করে না। সুতরাং কোন নৈতিক আদর্শের ভূমিকা এই স্তরে থাকে না। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন ব্যক্তির কোন দায়বদ্ধতা বা কর্তব্যবোধ এই স্তরে থাকে না। এই স্তরে ব্যক্তি একটি আদর্শের দ্বারা চালিত হয়, সেটি হল 'principle of pleasure and pain'। ব্যক্তি এই নীতির দ্বারা নান্দনিক স্তরে পরিচালিত হয়। এই স্তরে যতটা সম্ভব বেশি সুখ পাওয়া যায় এবং যতটা সম্ভব দুঃখকে সরিয়ে রাখা যায়-শুধু এই নীতিটাই মানুষের মধ্যে কাজ করে। দুঃখ আছে বলে সে সুখকে পরিহার করে না। কিয়ের্কেগার্ড এই স্তরের মানুষদের বলছেন রোমান্টিক ব্যক্তি (Romantic Individual)। সে শুধু আনন্দকে জীবনে পাবার চেষ্টা করে। কিয়ের্কেগার্ড এই রোমান্টিক ব্যক্তির উদাহরণে বাইরনের কথা বলেছেন। যিনি এই স্তরের ব্যক্তি ছিলেন। এই আনন্দ বা সুখকে কিয়ের্কেগার্ড বলছেন ইন্দ্রিয়জ সুখ। এখানে কোন দায়বদ্ধতা, নৈতিকতা থাকে না। এই নান্দনিক স্তরে ব্যক্তি যেহেতু সুখ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে; তাই এখানে ভালো-মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণ এই পার্থক্যগুলি নিয়ে ব্যক্তি চিন্তিত নয়। তার সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা, সন্তোষ অসন্তোষ, উচ্ছ্বাস এবং উদ্বেগ বা হতাশা এই পার্থক্যগুলি নিয়ে তারা চিন্তিত। কিভাবে আমার তাৎক্ষণিক সুখ হবে এবং দুঃখ বা বেদনাকে সরিয়ে রাখা যাবে, প্রয়োজনে ঐ দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করেও ঐ সুখকে গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে তারা নান্দনিক স্তরে

ইন্দ্রিয়জ সুখকেই গুরুত্ব দেয়। কিয়ের্কেগার্ড এই নান্দনিক স্তরকে বলছেন অ-অনুধ্যানমূলক(non-reflective)। এই স্তরে ব্যক্তির মধ্যে কোন চিন্তনের অবকাশ থাকে না। কিন্তু তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন যদিও এই স্তর অ- অনুধ্যামূলক, তথাপি এই স্তর অবৌদ্ধিক (Unintelligent) নয়। ব্যক্তির সচেতনভাবে ওই ইন্দ্রিয়জ সুখের ধারা পরিচালিত হয়। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন নান্দনিক জীবনের একটা নেতিবাচক দিক রয়েছে। তিনি বলছেন নান্দনিক জীবনে শুধুমাত্র যে আনন্দ বা সন্তোষ আছে তাই নয়, সেখানে কিন্তু দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাও রয়েছে। সুখ যদি থাকে তবে সেখানে দুঃখও রয়েছে। মানুষ হচ্ছে অপূর্ণ, সসীম। তার জীবনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সসীমতা, সীমাবদ্ধতা থেকেই দুঃখ আসে। আমাদের দেহের পরিবর্তন আছে এবং তার ধ্বংস আছে। কিয়ের্কেগার্ডের মতে নান্দনিক জীবনে যেটা সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয়, এমন কি সুখ-দুঃখের চেয়েও; সেটা হল 'Boredam' অর্থাৎ মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ, একঘেঁয়েমি। নান্দনিক জীবনে এই মানসিক ক্লান্তি আসে, কারণ ব্যক্তি এই স্তরে শুধু সুখকে অন্বেষণ করে, দুঃখকে সরিয়ে রাখে। সমাজ, সম্পর্ক, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব, এগুলিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি নিরন্তন সুখের অন্বেষণ করে। এর ফলে তার মধ্যে এক সময় মানসিক অবসাদ বা ক্লান্তি এবং একঘেঁয়েমি জনিত বিরক্তি আসে। ওই ব্যক্তি নান্দনিক জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে যায়, সে একা হয়ে পড়ে, একঘেঁয়েমি অনুভব করে। এই বিরক্তি (Boredam) ব্যক্তির মধ্যে দু'রকমভাবে আসছে-

প্রথমত, ব্যক্তির যে কাজ, তার যে জীবন- সেই সম্পর্কে একঘেঁয়েমি। সে নিরন্তন সুখের জন্য চেষ্টা করছে, ফলে তার মধ্যে অসন্তোষ হচ্ছে। ব্যর্থতা থাকায় তার জন্য একঘেঁয়েমি হয়। ব্যক্তি যতবেশি সুখী হবার চেষ্টা করছে একটা সময় তার মধ্যে অসন্তোষ আসছে। কারণ জীবনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে সে সেই সুখটা পাচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ, নিজের উপর বিরক্ত আসা। নিজেকে নিয়ে যখন ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে না, সব সময় নিজের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলে। নিজের কাছে নিজেকে বিরক্তি লাগে। ফলে সে পুরোপুরি বিপদজনক জায়গায় পৌঁছে যায়। সুতরাং কিয়ের্কেগার্ড বলছেন নান্দনিক জীবনের পরিণতিতে মানুষ এই স্তরে এসে পৌঁছায়। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন এই একঘেঁয়েমি, হতাশা, বিরক্তি থেকে ব্যক্তি মুক্ত হবার চেষ্টা করে। তখন ব্যক্তি নিজেকে একেবারে ওই নান্দনিক জীবনে হারিয়ে ফেলে না, সেই ব্যক্তিরা তখন প্রথমে মানুষের সাথে মিশতে চেষ্টা করে। সে সমাজিকীকরণের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে। সে মনে করে সে একটা সমাজবদ্ধ জীব। সে মনে করতে চেষ্টা করে আমার কাছ থেকে আমার আশেপাশের মানুষজন, দেশ, সমাজের প্রত্যাশা থাকে। সুতরাং আমি মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারি না। আমাকে নৈতিক ব্যক্তি হবার চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্য সে নৈতিক জীবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করে।

নৈতিক স্তর: নান্দনিক স্তরে ব্যক্তির জীবনে একঘেঁয়েমি, হতাশা দেখা দেয়। ফলত ব্যক্তি নান্দনিক স্তরকে অতিক্রম করে নৈতিক জীবনে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই নৈতিক স্তর হচ্ছে ব্যক্তির সামাজিক জীবনের স্তর। নৈতিক স্তরে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার চেষ্টা করে এবং নৈতিক জীবনকে সে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেছে নেয়। নান্দনিক জীবন ছিল মানুষের বাইরের জীবন (outerlife)। কিন্তু নৈতিক স্তরের বিষয় হল ব্যক্তির অন্তর জীবন (internal life)। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন নান্দনিক জীবন হচ্ছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু নৈতিক জীবন হল সঙ্গতিপূর্ণ। নান্দনিক জীবন হল আপতিক, এর মধ্যে আবশ্যিকতা বলে কিছু নেই। কিন্তু নৈতিক জীবন আবশ্যিক সত্যের জীবন। নৈতিক জীবন হল বস্তুনিষ্ঠ আদর্শের জীবন। এই আদর্শ হল নৈতিক আদর্শ। কিন্তু নান্দনিক জীবনে নৈতিক আদর্শ বলে কিছু থাকে না। এই নৈতিক আদর্শগুলিকে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের জীবনে গ্রহণ করে এবং এগুলিকে নিয়ে চলার চেষ্টা করে। নৈতিক জীবন হল আত্মসৃজনমূলক (self-creative)। এই স্তরে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে তৈরি করে। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন নান্দনিক জীবনে এই হতাশা, ক্লান্তি, একঘেঁয়েমি, বিরক্তি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আর সামাজিক হওয়ার অর্থ হল সামাজিক নিয়ম-কানুন মানা, দায়িত্বশীল হওয়া, কর্তব্য পরায়ণ হওয়া। এই নৈতিক জীবনকে কিয়ের্কেগার্ড বলছেন 'Societal life'। এখানে ব্যক্তি আরো অনেকের সাথে মিলেমিশে তার দায়িত্বকে স্বীকার করে চলার চেষ্টা করে। সেই জন্য কিয়ের্কেগার্ড নৈতিক জীবনের তিনটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন। সেগুলি হল- **যুক্তি (Reason), কর্তব্য (Duty) এবং সার্বিকতা (Universality)**। তিনি বলছেন নৈতিক জীবন হল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্তরে ব্যক্তি নিছক আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কারণ সে যুক্তির আদর্শের মধ্যে প্রকৃত জীবনযাপনের আবশ্যিকতা খুঁজে পায়। কিভাবে তাকে জীবন যাপন করা উচিত সেটা যুক্তি বলে দেয়। যুক্তির আদর্শ অনুযায়ী যখন আমরা চলি তখন সেটা সৃজনমূলক। কারণ সেখানে আমি আমার দায়িত্ব, কর্তব্যকে মেনে চলার চেষ্টা করি। সেজন্য যুক্তির সঙ্গে রয়েছে কর্তব্য। সুতরাং নৈতিক জীবন হল কর্তব্যের জীবন। ব্যক্তি সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে। কারণ কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়েই সে নিজেকে অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। কর্তব্য থেকে সরে আসলে সে আবার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই জন্য সে কর্তব্য এবং দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে। সর্বপরি কিয়ের্কেগার্ড এখানে সার্বজনীনতার কথাও বলেছেন। ব্যক্তি নৈতিক জীবনে কতকগুলি আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা এই সর্বজনীন আদর্শগুলি পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কতকগুলি বস্তুগত মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করে। যে পার্থক্য গুলির কোন মূল্য নান্দনিক জীবনে ছিল না। সেই পার্থক্য গুলি হল ভালোমন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, নৈতিক অনৈতিক, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি। সত্যের একটি সর্বজনীন স্বরূপ সে ভাবার

চেষ্টা করে। সুতরাং সর্বজনীনতার আদর্শ নৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে কিয়ের্কেগার্ড মনে করেন।

প্রসঙ্গত আমরা এখানে কিয়ের্কেগার্ডের নৈতিক জীবনের ধারণা কান্টের নৈতিকতার আদর্শের যে ধারণা তার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। কারণ কান্টের নৈতিক ধারণার মধ্যেও আমরা এই যুক্তি, কর্তব্য এবং সার্বিকতার ধারণা পাই। কিন্তু কান্ট এবং কিয়ের্কেগার্ড দুজনেই হলেন ভিন্ন প্রকৃতির দার্শনিক। কান্ট নৈতিক জীবনকে পূর্ণ এবং সর্বোচ্চ জীবন বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ স্তর হল নৈতিক জীবন এবং নৈতিক আদর্শগুলির সর্বোচ্চ মান্যতা আসে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা থেকে। সুতরাং এই ব্যবহারিক প্রজ্ঞা কান্টের নীতিদর্শনে ঐ নৈতিক আদর্শগুলির **সর্বোচ্চ মান্যতা** (Ultimate Justification) প্রদান করে। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিবাদী দর্শনে এই সর্বোচ্চ মান্যতার ধারণা কোনোভাবেই স্বীকৃত হয়নি। কিয়ের্কেগার্ডের বক্তব্য অনুসারে বুদ্ধিই নৈতিক আদর্শের ভিত্তি। কিন্তু বুদ্ধি বা যুক্তি যা কিছু প্রতিষ্ঠা করছে তার সর্বোচ্চ মান্যতা থাকবে এটা কিয়ের্কেগার্ড স্বীকার করেননি।

কান্টের দর্শনে নৈতিকতা হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি। কারণ কান্ট মনে করেন যে ঈশ্বর হলেন নৈতিকতার অন্যতম পূর্বশর্ত। কান্টের দর্শনে নৈতিকতাকে ধর্মের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। নৈতিক আলোচনা বাদ দিয়ে কান্ট ধর্মের আলোচনা করবেন না। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড মনে করেননি নৈতিকতা ধর্মের ভিত্তি। তিনি মনে করেন নৈতিক জীবনকে অতিক্রম করেই মানুষ ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে পারে। কারণ নৈতিকতায় কেবলমাত্র ভালো মন্দ, নৈতিক অনৈতিক, কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই পার্থক্যগুলি অতিক্রম করতে না পারলে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

কিয়ের্কেগার্ড প্রশ্ন তুলে বলছেন- বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্নরকম শিক্ষা দেয়। তিনি বলছেন আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি অনেক সময় যে মানুষ যথেষ্ট নৈতিক, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়, বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এটাও দেখি যে ব্যক্তি অসৎ, অনৈতিক সে তার জীবনে সুখী জীবন যাপন করে। সুতরাং নৈতিকতার সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক কেমন? কিয়ের্কেগার্ড বলছেন এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক জীবন সম্পর্কে হতাশা দেখা দেয়। আবার একই বিষয় অনেক সময় একদিক থেকে নৈতিক আবার অন্য দিক থেকে অনৈতিক বলে মনে হয়। কোথাও একটা আচরণ শুভ, আবার অন্য একটি পরিস্থিতিতে ওই একই আচরণ অশুভ। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক জীবন সম্পর্কে যে হতাশার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় **নৈতিক হতাশা** (Ethical Despair)।

ধর্মীয় স্তর: কিয়ের্কেগার্ড বলছেন মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ স্তর হল ধর্মীয় স্তর। ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের মূল কারণ হচ্ছে নৈতিক হতাশা। নৈতিক জীবন সম্পর্কে অতৃপ্তি, অসন্তোষ হয় মানুষ। মানুষ চূড়ান্ত বিভ্রান্ত হয় এবং হতাশার সৃষ্টি হয় তার মনে। নৈতিক জীবনে ব্যক্তি কোন পথে যাবে সে বিষয়ে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই

সমস্ত রকমের বিভ্রান্তি থেকে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ জাগে। এই অসন্তোষ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করার তাগিদ অনুভব করে। সে ধর্মপ্রাণ হবে, তাঁকে ঈশ্বর অভিমুখী হতে হবে- এইরকম ব্যক্তির মনে হতে থাকে। নৈতিক হতাশা ব্যক্তির জীবনে আসার ফলে ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে। ফলে সে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং ঈশ্বরমুখী হওয়ার চেষ্টা করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিয়ের্কেগার্ড ধর্মকে একেবারে তাঁর অস্তিবাদের আলোয় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ধর্মের প্রথাগত অর্থকে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি ব্যক্তিগত ধর্ম (personal religion)কে মেনেছেন। তিনি খ্রিস্ট ধর্মের প্রথাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে 'Christianity is not a set of doctrine'। তিনি বলছেন 'Christianity is a way of life'। অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্ম হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের জীবনযাপন এবং জীবনবোধ। তিনি বলছেন কতগুলি নিছক প্রথা খ্রিস্ট ধর্মের মূল বিষয়বস্তু হতে পারে না। প্রথাগত বিষয়গুলি খ্রিস্ট ধর্মের বহিরঙ্গের রূপ। খ্রিস্ট ধর্মের যে অন্তরঙ্গ রূপ, সেখানে রয়েছে ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতা এবং সেই অসীম ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা এবং বিশ্বাস। জীবনকে উপলব্ধি করাই হল ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপ। এই রূপের মধ্যে আছে ব্যক্তির অর্ন্তমুখীনতা এবং পরম পূর্ণঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ভালোবাসা। তিনি বলছেন বিশ্বাস এবং ভালোবাসা হল মানুষের জীবনের এমন দিক যেগুলিকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, মানুষ এগুলিকে নিজের মধ্যে অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে অর্ন্তমুখীনতা যার মধ্যে আসে তারই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাস আসে এবং সে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে পারে। *Concluding unscientific posts crypt* বইতে কিয়ের্কেগার্ড প্রকৃত খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে একটি উক্তি করেছেন 'it is easier for me to be a Christian when I am not a Christian than to be a Christian when I am one' অর্থাৎ আমার পক্ষে তখনই খ্রিস্টান হওয়া সহজতর যখন আমি (প্রথাগত অর্থে) খ্রিষ্টান নয় এবং আমার পক্ষে যখন খ্রিস্টান হওয়ার কঠিন তখন আমি খ্রিস্টান।

কিয়ের্কেগার্ড বলছেন ধর্মীয় জীবনই মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ স্তর। নৈতিক জীবনের পরে তিনি ধর্মীয় জীবনকে স্থান দিয়েছেন। ব্যক্তির ধর্মীয় জীবন দাঁড়িয়ে আছে অন্তর্মুখীনতা, বিশ্বাস এবং পাপ বোধের উপর। নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়েও ব্যক্তি তার জীবনে পূর্ণতা পায় না। তার মধ্যে অসন্তোষ থাকে। নৈতিক জীবন সম্পর্কে সে হতাশ হয়ে পড়ে। এই অসহায়তা বোধ থেকে সে তাঁর মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে অসহায়, হতাশ হয়ে পড়ে। সে তখন নিজেকে পাপী বলে মনে করে। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে নিজের প্রতি বিশ্বাসহীনতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। এই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। ঈশ্বরের মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। ধর্মীয় জীবন দাঁড়িয়ে আছে এই সমর্পণ, বিশ্বাস এবং পাপ বোধের

উপর ভিত্তি করে। এই ধারণাগুলি ধর্মীয় জীবনকে নৈতিক জীবন থেকে আলাদা করে। সুতরাং কিয়েৰ্কেগার্ডের মতে নৈতিক জীবনকে অতিক্রম করেই ধর্মীয় জীবনে ব্যক্তিকে প্রবেশ করতে হয়। নৈতিক জীবনের দ্বৈততাকে অতিক্রম করেই ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে। ধর্মীয় জীবনে ব্যক্তি একা ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়। সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান, নিয়ম থাকে না। এখানে ব্যক্তি **ব্যক্তিগত সত্যতা (subjective truth)** কে নিয়ে যাপন করে। এই ব্যক্তিগত সত্যতাই হল ধর্মীয় সত্যতা (religioustruth)। এই স্তরে ব্যক্তি কোনো রকম নৈতিক নিয়মকে মেনে চলে না। ধর্মীয় জীবনে কিয়েৰ্কেগার্ড ধর্মীয় শিক্ষকের কথা বলেছেন, যিনি আমাদের সত্যের পথ দেখান। এই শিক্ষক হলেন যীশু। এইভাবে ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় জীবনযাপন করে।

উপসংহার: সবশেষে এই কথা বলা যায় যে, কিয়েৰ্কেগার্ড যে মানব অস্তিত্বের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে মানুষের জীবনে এই স্তরগুলির প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। আমরা দেখি কোন ব্যক্তি নান্দনিক স্তরের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য জীবন যাপন করে, আবার সেই ব্যক্তি যখন নিজের কর্তব্য, দায়িত্ব, সামাজিকতা সম্পর্কে অবগত হয়; তখন সে নৈতিক জীবনে প্রবেশ করে। এরপর ব্যক্তির মধ্যে যখন জগৎ জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, তার মধ্যে আধ্যাত্বিক চিন্তাভাবনা আসে, সে যখন নিজেকে ঈশ্বরের অংশ বলে মনে করে; তখন সে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। এ প্রসঙ্গে কিয়েৰ্কেগার্ডের একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন কোন ব্যক্তি সারা জীবন নান্দনিক স্তরের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে, আবার নান্দনিক এবং নৈতিক স্তরের মধ্যেও জীবন যাপন করতে পারে। বাস্তবেও আমরা দেখি অনেক মানুষ সারাজীবন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য জীবন অতিবাহিত করে দেয়, আবার কিছু মানুষ নৈতিকভাবে জীবন যাপন করে। এদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা না আসার ফলে এরা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে না। তাই এ কথা বলা যায় কিয়েৰ্কেগার্ড মানব অস্তিত্বের যে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন তা বর্তমান মানুষের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Kierkegaard, S(1941). Concluding Unscientific Posts Cript. Trans. David F Swenson and Walter Lowrie, Princeton, Princeton University press.

2. Kierkegaard, S(1971). Either/Or, vol.1, trans. David F. Swenson and Lillian Marvin Swenson, Princeton. Princeton University press.

৩. Solemon, R. C (1970). From Rationalism to Existentialism, New York; Harper and Row.

৪. Macquarie, John(1973). Existentialism, USA, Penguin books Publishers.

৫. Kierkegaard, S (1940). Stages On Life's Way. Trans. Walter Lowrie, New Jersey, Princeton University press.

৬. Blackham, H.J (1965), Six Existentialist Thinkers, London: Routedge and Kegan Paul Ltd.

৭. ভদ্র, মিনালকান্তি (১৯৯৫), অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. সরকার, স্বপ্না (২০১৬), অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

‘ঘাটের কথা’ : রবীন্দ্র প্রতিভার এক কালোত্তীর্ণ মর্মকথা

মৃণালকান্তি মুর্মু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যতম সৃষ্টি ‘ঘাটের কথা' গল্পটি। ঘাট যেন এই গল্পে সমস্ত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। ঘাটের মুখ দিয়ে বলা গল্প ‘ঘাটের কথা’, তাই স্বাভাবিকভাবেই ঘাট নামক অচেতন বস্তুতে চেতন সত্তা আরোপিত হয়েছে। মানব সমাজের নরনারীর জীবনলীলার বিচিত্রতা ঘাটের মুখ দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই গল্পে ঘাট বলতে গঙ্গার ঘাটকে বোঝানো হয়েছে,এই ঘাট সমস্ত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে সকল সমাজের কথাকেই ব্যক্ত করেছেন, তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। দূর্বার স্রোতে বয়ে যাওয়া সময়ের মধ্যে অসংখ্য ঘটনা পরম্পরার সাক্ষী থেকেছে এই ঘাট, যার প্রতিচ্ছবি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে এই গল্পে। গল্পের মূল চরিত্র কুসুম এই কুসুমের ছোটবেলা থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠা ও তার পরবর্তী প্রতিটি সময়ের বর্ণণা রয়েছে এই গল্পে। তবে কেবল নরনারীর বর্ণণায় নয় তার পাশাপাশি ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ, অদৃষ্ট ও নিয়তির প্রভাবও রয়েছে এই গল্পে, যা গল্পটিকে অনেক উৎকৃষ্ট করে তুলেছে। এইভাবে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা ও মানব জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের বিবরণ গল্পটির মধ্যে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এই গল্পে কুসুমের সাথে সকল শ্রেণীর মানুষের কথা যা প্রকারান্তরে আমাদের সকলের মর্মকথা তাই ঘাটের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। ঘাটের মুখ দিয়ে দেওয়া সেই বর্ণণারই আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ : অচেতন বস্তুতে চেতন সত্তা, নৈসর্গিক উপমা, অদৃষ্ট ও আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ, বঙ্গনরনারীর মর্মকথা।

মূল আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের আর্বিভাব বাংলায় এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। বাংলা ভাষার পক্ষে, বাংলা -সাহিত্যের পক্ষে,বাঙালী জাতির পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা আর একটিও নেই। শুধু বাংলা নয় পৃথিবীর ভাব, অনুভূতি ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান তাঁর অনুপম বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্য দেশ,কাল ও পাত্রের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করে এক সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছে, যা বিশ্ব-সাহিত্য সভায় অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে আছে।

সাহিত্য দেশ, কাল, সমাজ ও জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব। সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় সাহিত্যে স্থান পায়।আর তাই প্রতিফলিত হয় সৃষ্টিশীল লেখকের

লেখনীতে। তেমনই বিস্ময়কর এক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাতেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর রচনার দ্বারা হয়েছে পুষ্ট ও বিস্তৃত। তাইতো প্রশ্ন ওঠে কে বড়? গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, শিল্পী, সংগীতকার, সংগঠক, মানব-প্রেমিক— কোন একটি ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা কঠিন। সব মিলিয়েই অনন্য মহামানব রবীন্দ্রনাথ। আমি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবো। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্প ধারার সর্বজনবেদ্য ভগীরথ। তাঁর আগেও গল্প লেখা হয়েছে কিন্তু ১৮৯১ সালে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' র সাহিত্য বিভাগে শিল্পসম্মতভাবে প্রকৃত ছোটগল্পের বিকাশ শুরু হয়। সব দেশেই ছোটগল্পের সঙ্গে সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রের আত্মীয়তার সম্পর্ক। ইউরোপে যেমন মপাসাঁ লিখেছেন 'গেলোয়া' ও 'জিলে ব্লা'র পাতায়, চেকভ 'অসলকি' ও 'বুদিলনকি'তে, অ্যালান পো লিখেছেন 'স্যাটারডে ক্যুরিয়ার' ও 'স্যাটারডে ভিজিটার'এ, তেমনি রবীন্দ্রনাথও ছোটগল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছেন 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের আধারে। "Men and women are better than heroines" এই উক্তিই উনিশ শতকের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধ্রুববাণী হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্রের বিবিধ ফিচার-কল্পকাহিনীর মাধ্যমে সেই সমাজ ও সামাজিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবন বা দিনযাপনের বিচিত্র ঘটনা পাঠকমনে সংবেদনা সৃষ্টি করল। ফলে দেশে ও বিদেশে একসময় এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের আধারে জন্ম নিল ছোটগল্প।

বাংলা ছোটগল্প ধারার অন্যতম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিরিশ বছর বয়সে ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। ব্যক্তিগত বিষন্নতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতায় তাঁর চিত্ত তখন সংক্ষুব্ধ। সেই মুহূর্তে যৌবনের 'সজন-নির্জনের নিত্য-সংগমে' পদ্মার বুকে পদ্মা নামক বোটে চড়ে প্রকৃতির মধ্যে শুরু হয় তাঁর আশ্রয় অন্বেষণ। ফলে একদিকে মুগ্ধ কবি দৃষ্টি অকৃপণ প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুষ্ট হয়, অন্যদিকে কৃপণ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ ও দৈন্য সম্পর্কে গল্পকারের রূপকারী বিবেকের চৈতন্যলাভ ঘটে। বস্তুতঃপক্ষে জমিদারী পরিদর্শনে এসে কবি পূর্ববাংলার গ্রামীণ পরিবেশের মুখোমুখি হন। এখানেই স্বতন্ত্র বাস্তবতায় কবির জীবনবোধ হয় ভূমিসংলগ্ন, প্রসারিত এবং দ্বন্দ্বময়। বলা যায় স্রষ্টার এই বিশিষ্ট মর্মপাতের ফলেই তিন পর্বের 'গল্পগুচ্ছে' নর-নারীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বৈচিত্র্য। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপস্থাপনার কৌশলে বিস্মিত হয়ে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মতো আমরাও অনুভব করি — "রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যান নি।"

আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘাটের কথা' গল্পটি। বাংলা সাহিত্যে এই গল্পটির অন্যতম গুরুত্ব রয়েছে। গল্পটির সৃষ্টিশৈলী ও গঠন প্রকৃতি গল্পটিকে এক বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত করেছে। এই গল্পের মধ্য দিয়ে যে অচেতন বস্তুতে চেতন সত্তা আরোপ তা পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ধারাকে

বিশেষভাবে বিস্তৃত করেছে। 'ঘাটের কথা' নামটির মধ্যেই এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে এই গল্পটি নিতান্তই এক কল্পকাহিনী কিন্তু সচেতনভাবে দেখলে দেখা যাবে এই কাহিনীর মধ্যে প্রতিটি সমাজের প্রতিটি মানুষের দিনযাপনের চিত্র সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে যা কল্পকাহিনীর আড়ালে আমাদেরই বাস্তব জীবনের ধ্রুব কাহিনী।

'ঘাটের কথা' গল্পটি লেখা হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। রবীন্দ্র গল্প সংকলন গ্রন্থ 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম গল্প এটি। এই গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার একদিকে সমাজের প্রতিটি ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত অভিসন্ধি ও স্বপ্ন দর্শন তত্ত্বের উল্লেখ করে কাহিনীর পরিণতি টেনেছেন। ঘাট বলতে স্নানের ঘাটকেই বলেছেন,যা গঙ্গার ঘাট। অর্থাৎ যে ঘাট নির্জীব,নিষ্প্রাণ কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার অনন্য লেখনী স্পর্শে সেই ঘাট হয়ে উঠেছে সজীব, প্রাণবন্ত। ঘাটের মুখে একাধিক স্মৃতিচারণ ও ঘটনা বিবরণের মধ্য দিয়ে ঘাটের মুখে যে সমস্ত কথা বসিয়েছেন তা প্রকারান্তরে আমাদেরই মুখের কথা। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করে।

কর্মব্যস্ত সমাজের বিশেষ বার্তা প্রতিফলিত হয়েছে ঘাটের কথার মধ্য দিয়ে। গল্পে কুসুম নামধেয় যে নারী তার জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা, বিবাহ হওয়া, বিবাহের এক বছর পর বিধবা হওয়া ও তারপর পুনরায় গ্রামে আগমন ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিটি ঘটনার যে বিবরণ রয়েছে অনায়াসেই তা পাঠক মনে বিস্ময় জাগায়। এই গল্পের ঘটনাবলী কেবল এক নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ নয় তা শাশ্বত কালের নরনারী তথা মানব জীবনের পরিচয়বাহী। সময় যত এগিয়েছে ততই বেশি করে যেন তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আসলে কোন সময়ের ব্যক্তিগত কথা তখনই সমগ্র সমাজের অন্তরের কথা হয় যখন তা সমগ্র সমাজের অন্তস্থল থেকে স্খলিত হয়। 'ঘাটের কথা' গল্পটিতে তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

'ঘাটের কথা' গল্পটি শুরুই হয়েছে — "পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কত দিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে" এই উক্তি দিয়ে। উক্তিটির মধ্যে দিয়ে যে পূর্বস্মৃতির বিবরণ রয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। যেখানে ঘাট স্বয়ং বলেছেন — "পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মিত কথা শুনিতে পাইবে।" আসলে প্রকৃতির হাত ধরে যে জীবন এগিয়ে যায়, সে জীবনে প্রকৃতির কাছেই মানুষ সমস্ত না বলা কথা সে গচ্ছিত রাখে। যে ব্যক্তি বেদনা কারো কাছে ব্যক্ত করা যায় না তা যেন প্রকৃতির সহমর্মিতায় প্রকৃতির কাছে নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে মানুষ স্বস্তি বোধ করে। প্রকৃতির মতো এমন নিঃস্বার্থ বন্ধু আর কোথাও নেই, এমন অপরিসীম শান্তি আর কোথাও পাওয়া যায় না। 'ঘাটের কথা' গল্পে প্রকৃতি ও মানবের এমনই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে।

প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যে 'ঘাটের কথা' গল্পটি পুষ্ট হয়েছে। যেখানে প্রকৃতির বুকে মানুষের জন্ম,বেড়ে ওঠা ও প্রকৃতির বুকেই তার নিঃসীম পরিণতি। তাই সমস্ত কিছুর অন্তরালে প্রকৃতিই মানুষের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে রয়েছে। যাকে হয়তো সহজে দেখা যায় না তবে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। দুঃসময়ে যখন কেউ থাকে না পাশে একমাত্র প্রকৃতিই তখন পাশে থাকে নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হয়ে। আলোচ্য গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ককেই তুলে ধরা হয়েছে সুচারুভাবে। যেখানে দেখি — "আশ্বিন মাস পড়িতে আর দু চারদিন বাকি আছে। ভোরের বেলার অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে।তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।"

প্রকৃতিকেন্দ্রিক এই গল্পে একাধিক প্রকৃতিরই উপমা ব্যবহার গল্পটিকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। যেমন কোথাও আম্রকাননের নীচে কচবন, কোথাও ভরা গঙ্গার উপর শরৎ প্রভাতের রৌদ্র সে রৌদ্রের রঙ আবার কাঁচা সোনার মতো, কোথাও চাঁপা ফুলের মতো। সকল মানবের চিরাচরিত জীবনকথার পাশাপাশি একাধিক উপমা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বর্ণণা গল্পের শিল্পবোধকে অনেক বেশি উন্নত করেছে। শুধু তাই নয় সকলের জীবনপ্রণালীর পাশাপাশি আকস্মিক অঘটন, পৌরাণিক ব্যক্তির বর্ণণা, বাঙালির হৃদয়ের আধ্যাত্মিক ভক্তিমার্গের বর্ণণা প্রভৃতির প্রসঙ্গ গল্পটিকে সকলের আপনার করে তুলেছে।

গল্পের কাহিনী যত অগ্রসর হয়েছে একাধিক প্রসঙ্গের উপস্থাপনা গল্পটিকে তত বেশি পরিণতির দিকে সহায়তা প্রদান করেছেন। গল্পের মধ্যে প্রতিটি ঋতুর সুন্দর বর্ণণা রয়েছে,যা সকলের নজর কাড়ে। শুধু তাই নয় গল্পের চরিত্রের যে সমস্ত কার্যকলাপ তা যেন এই একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময়ের মানুষেরই কার্যকলাপ। যেমন কাশফুল ফোটার আরম্ভ যেন এখনকার সময়েরই শরৎকালের প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন কিংবা রাম রাম বলে মাঝির নৌকা খুলে দেওয়া এখনকার সময়েরই কোন ব্যক্তির শুভকর্ম শুরু করার আগে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করাকে ইঙ্গিত করায়। আবার ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি নিয়ে স্নান করতে আসার প্রসঙ্গ বর্তমান সময়ের পুরোহিত দের নিত্য জীবন প্রণালীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেয়েদের এক এক করে নদীর ঘাটে জল নিতে আসার প্রসঙ্গ যেন বর্তমান সময়ের লোকায়ত নারীর কর্মকান্ডেরই ইঙ্গিত বহন করেছে। আজ থেকে ১২৯ বছর আগে লেখা এই গল্প যে বর্তমান সময়েও কতটা প্রাসঙ্গিক সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রসঙ্গ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা' কাব্যের '১৪০০ সাল' কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানে কবি বলেছেন —

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে—

আজি হতে শতবর্ষ পরে।"

'ঘাটের কথা' গল্পটিতে এই কবিতাটির যেন সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

গল্পের কাহিনী কেবলমাত্র বাল্য,প্রৌঢ় বয়সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বৃদ্ধ বয়সের প্রসঙ্গও গল্পের কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। যেখানে দেখি — "যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদন্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছি,গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফালি ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে,তখন আমার সে দশা ছিল না।" এই কথা কেবলমাত্র ঘাটেরই নয় যেন বর্তমান সময়ের কোন বৃদ্ধের নিজেরই মুখের কথা। বৃদ্ধাবস্থার এমন স্মৃতিচারণ যে সত্যিই পাঠকূলকে বিস্মিত করে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গল্পের কাহিনী কুসুমকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কুসুমকেই বলা যায়। গল্পের কুসুম হয়ে উঠেছে আমাদের চিরপরিচিত ঘরেরই মেয়ে। কুসুমের সাথে তার সঙ্গী-সাথীদের খেলা করা যেন আমাদের ঘরের মেয়ের সাথে পাড়ার মেয়েদেরই খেলা করা। এখানেই কুসুম চরিত্র গল্পের গন্ডি অতিক্রম করে আমাদের ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গীদের সাথে কুসুমের খেলাচ্ছলে হাসিঠাট্টা, আদর-আবদার প্রভৃতি নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনা আমাদেরই ঘরের কথা। যেমন —"কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি"। গল্পে আবারও দেখি —".... মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপর যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত তখন আমার সাধ যাইত, সে ছায়াটি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি — এমনি তাহার মাধুরী ছিল।" কুসুম স্বভাবেও বেশ কোমল ছিল এবং সকলের সাথে অনায়াসেই মেলামেশা করার ক্ষমতা তার ছিল এ কথা গল্পের মধ্যেই পাই —".... তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না।" সর্বগুণ সম্পন্না এই মেয়েটা যে তার স্বভাবগুণে পাঠক সমাজে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সেই কুসুম যে সঙ্গীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল,যার স্বভাব ছিল জলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, হঠাৎই সেই কুসুমের বিয়ে হয়ে যাওয়া তার সঙ্গী সাথীদের মধ্যে আনন্দের ঘাটতি সৃষ্টি করে। যা সকল দেশে,সকল কালে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী সঙ্গীদের মনের কথারই ইঙ্গিত দেয়। কুসুমের বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পরে তার সঙ্গীসাথীদের মধ্যে ভুবন আর স্বর্ণের ঘাটে এসে কান্নাকাটি করার মধ্য দিয়েও সেই অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কুসুমের বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া যেন জলের পদ্মটিকে ডাঙায় রোপণের অবস্থা। স্বাভাবিকভাবেই নতুন পরিবেশে কুসুমের মানিয়ে নিতে বেশ সমস্যা হয়। যে দেশে কুসুমের বিয়ে হয়েছে সেই দেশে নাকি গঙ্গা নেই। তথাপি সংসারের কঠিন নিয়মে কুসুমের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের এক বছর পরে

কুসুমের স্বামী মারা যায়। তারপর কুসুম আবার বাপের বাড়িতে ফিরে আসে এবং গঙ্গার ঘাটের কাছে গিয়ে বসে নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব করতে চেষ্টা করে। এখানেই বেশ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় ঘাটের সাথে কুসুমের দৃঢ় সম্বন্ধের কথা যার দ্বারা বেশ বোঝা যায় ঘাটের সাথে কুসুমের সম্বন্ধ নিকটাত্মীয়ের বন্ধনে বাঁধা।

গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় ঘাটের সাথে কুসুমের নিবিড় সম্পর্ক। ঘাট ও কুসুম একে অপরের পরিপূরক। বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখতে দেখতে ভরে উঠে, তেমনি কুসুমও প্রতিদিন দেখতে দেখতে সৌন্দর্যে-যৌবনে ভরে ওঠার প্রসঙ্গ ঘাটের মুখ দিয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। তবে কুসুমের বড়ো হয়ে ওঠা ঘাটের চোখে পড়ে না, ঘাটের চোখে যেন কুসুম সেই বালিকা কুসুমই রয়েছে। পিতা-মাতার চোখে যেমন সন্তানেরা কখনো বড় হয়না তার মূল কারণ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অগাধ ভালোবাসা, এইরূপ অগাধ ভালোবাসাই যেন ঘাটের হৃদয় থেকে কুসুমের প্রতি ব্যক্ত হয়েছে গল্পের প্রতিটি পরতে পরতে।

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির হাত ধরে মানব মনের বিচিত্রতার পরিচয় দিয়েছেন ‘ঘাটের কথা' গল্পে। শরৎ ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ গল্পটির গঠন শৈলীকে বেশ সবল করেছে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত ঋতুগুলি লোকায়ত জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন বৈচিত্র্যের আড়ালে। গাছপালা,কাশবন, সূর্যের আলো প্রভৃতি সাধারণ উপকরণগুলির সার্থক প্রয়োগ গল্পের সৌন্দর্যকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। সার্থকভাবে সমাসোক্তি অলংকার ও উপমা অলংকারের প্রয়োগ একদিকে যেমন গল্পকার রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী লেখনী প্রতিভার পরিচয় দেয় অন্যদিকে তেমনি গল্পের গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বিশেষ সহায়তা করে।

স্বচ্ছ দর্পণের মতো লোকায়ত জীবনের প্রতিটি ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে ‘ঘাটের কথা' গল্পে। যেখানে ছবির মতো প্রতিটি ঘটনাকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই। গল্পের যেখানে দেখি — “তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচু নিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন....।” এখানে গ্রামীণ নরনারীর জীবনের যে আলাপচারিতার বর্ণনার ছবি ফুটে উঠেছে তা আমাদের প্রত্যেকের চোখের সামনে ঘটে চলা অহরহ ঘটনার বিবরণ।

গল্পের পরিণতিতে দেখি সন্ন্যাসী কুসুমকে ছেড়ে চলে যায়। কুসুম বিধবা হওয়ার বেশ কিছু পরে সন্ন্যাসীকে ঘিরে কুসুমের মনে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিল, যার কারণে কুসুমের অবচেতন মনের স্তরে অর্থাৎ স্বপ্নে সন্ন্যাসীর প্রেম নিবেদন প্রত্যক্ষ করেন। সন্ন্যাসীর প্রতি কুসুমের মনে যে প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাই কুসুমের মুখের কথাতেই। গল্পে যেখানে দেখি কুসুম সন্ন্যাসীকে বলছেন — “প্রভু,আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম,সেই আনন্দে

আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম,যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণহস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব, কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না।" সন্ন্যাসীকে নিয়ে কুসুমের মনের নিভৃতে যে অহরহ প্রেমের আস্তরণ তৈরি হয়েছিল এই উক্তি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই কুসুমের স্বপ্ন ভাঙলেও স্বপ্নের ঘোর ভাঙেনি।

তবে সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে কুসুমের মনে যে প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল সেই প্রেমের বাস্তবায়ন ঘটেনি। কুসুমের মনে সাজানো প্রেম,অবচেতন মনের গচ্ছিত প্রেম পরিপূর্ণতা পায়নি। অন্যদিকে সন্ন্যাসী আবার কুসুমকে ছেড়ে চলে যায়, যাওয়ার সময় কুসুমকে বলে যায় —"আমি আজই এখান হইতে চলিলাম; আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে"। সন্ন্যাসী কুসুমের মনের কথা জানার পর কুসুমের থেকে দূরে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় কুসুমকে বলে যায় সে যেন তার মন থেকে সন্ন্যাসীকে মুছে ফেলে অর্থাৎ ভুলে যায়।

গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার বিবরণ পাই ঘাটের মুখ থেকে। সময় যেমন কোন নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ নয়,সময় সদাই গতিশীল। আর সেই গতিশীল সময়ই সমাজের প্রতিটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে থেকে যায়, ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় কিন্তু সময়ের নির্দিষ্ট তালে তার নিদর্শন রেখে যায়। 'ঘাটের কথা' গল্পের মধ্যে তেমনই এক বিশেষ উৎকৃষ্ট সময়ের ঘটনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যে ঘটনা কোন এক সময়ে গল্পকারের নিজস্ব কলমের লেখনীর স্পর্শে রচিত হলেও তা কোন সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। যা শাশ্বত কাল ধরে মানব সমাজের বুকের নিগূঢ় কথাকে ব্যক্ত করে চলেছে। গল্পের মধ্যে যা ঘাটের মুখ দিয়ে ব্যক্ত, একথায় বলতে গেলে যাকে বলা যেতে পারে ঘাটের আত্মকথা। এই ঘাট যেন সমস্ত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে সকল সমাজের না বলা কথাকে ব্যক্ত করছে। তাই ঘাটের কথা যেন প্রকারান্তরে সমস্ত সমাজেরই মর্মকথা। যে মর্মকথা রবীন্দ্র প্রতিভার কালোত্তীর্ণ মর্মকথা রূপে প্রতিটি সমাজের বুকে বিরাজ করবে শাশ্বতকাল।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', এস.বি.এস.পাবলিকেশন, ৩০/১,বনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ.৭-১৩

২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ,'বাংলা সাহিত্য পরিচয়', তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭,বি,রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯,পৃ.৬১৫

৩. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ,'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা',ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,৯,শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০৯,পৃ.১

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বিশী, প্রমথনাথ,'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:,১০,শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন,'ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ',বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০৯

৩. আচার্য্য, কুমার, দেবেশ, ড.,'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ইউনাইটেড বুক এজেন্সি,২৯/১,কলেজ রো,কলকাতা-৯

৪. 'উদ্বোধন', ১২৪, শ্রাবণ, ১৪২৯, সপ্তম সংখ্যা, উদ্বোধন কার্যালয়,১উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩

৫. বেরা, মদনমোহন, ড.(সম্পাদক),'এবং মহুয়া', কে.কে. প্রকাশন,গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

৬. মিশ্র, অশোককুমার,ড., 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা'(১৯০১–২০০৮),দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০০৭৩।

চল্লিশের দশকের কলকাতার সামাজিক বাস্তবতা এবং ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অনিন্দিতা গাইন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : শাসকের শাসন- শোষণ, দেশীয় অরাজকতা, মিথ্যাচার, ভড়ং-এর সত্যতা- অসত্যতা আপামোর জনসাধারণ তথা পাঠকের সামনের তুলে ধরার দায়ভার অনেকাংশে কলমধারী সাহিত্যিকদের। চল্লিশের দশকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন মোড় এল। প্রাক- স্বাধীনতার মুহূর্তে সমাজ- রাজনীতি- অর্থনীতিতে দেখা গেল বিপুল পরিবর্তন। স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিফলন ঘটল সাহিত্যে। ১৯৪০-এর পরবর্তী সময় বাংলায় দ্রুত পরিবর্তনের কাল। এইসময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। একইসঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদী ভাবনাও প্রসার লাভ করেছে। শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্যক্তি মানুষের রোমান্টিক মনের স্বপ্ন- বিহ্বলতা আঘাত প্রাপ্ত হতে শুরু করেছে। এইরকম এক নতুন কালে বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হলেন ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। চল্লিশের দশকের কলকাতা মূলত তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। ঔপন্যাসিকের লেখনীতে মূলত তৎকালীন সময়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নর- নারীরা স্থান পেয়েছে। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, তার্কিক মনোভাবাপন্ন নারী- পুরুষ তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ, তাদের তার্কিক মন পাঠককেও ভাবতে বাধ্য করেছে। এখানে ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্যতা। আলোচিত নিবন্ধে চল্লিশের উত্তাল সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের সচেষ্ট প্রয়াস করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : সামাজিক বাস্তবতা— সমাজের বাস্তব রূপ। তৎকালীন সময়ের সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ সন্ধান। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস : মানব মনের অস্তিত্বের প্রকাশ চেতনা প্রবাহরীতি : মানব মনে একই সঙ্গে অতীত- বর্তমান- ভবিষ্যতের মেলবন্ধন।

মূল আলোচনা :

‘উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, আর প্রাতিস্বিকতার ধারণা দেশ ও কালের নির্দিষ্টতার উপর নির্ভর করে। দেশ- কালের নির্বিশেষে পটভূমিতে রচিত আখ্যান থেকে উপন্যাসীয় আখ্যান দেশ- কালের বিশেষতার গুণে আলাদা এবং সম্পূর্ণ নতুন এক শাখা হয়ে যায় সাহিত্যের। আর উপন্যাসের শরীরে শ্বসনের মতো সময় অন্তঃ- বহমান অশরীরী অথচ অমোঘ অস্তিত্ব হয়ে ওঠে।’[১] সময়ের পরিবর্তনে সাহিত্যের বাঁক বদল অবশ্যম্ভবী।

সাহিত্য যুগের ধারক ও বাহক। সমসাময়িক যুগের সামাজিক বাস্তবতা অর্থাৎ সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিরূপ হয়ে ওঠে সাহিত্য। অন্য ভাবে বললে বলা যায়, প্রত্যেক সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যে তৎকালীন সময়ের ঋণ স্বীকার করেছেন তথা করে চলেছেন। শাসকের শাসন- শোষণ, দেশীয় অরাজকতা, মিথ্যাচার, ভড়ং-এর সত্যতা- অসত্যতা আপামোর জনসাধারণ তথা পাঠকের সামনের তুলে ধরার দায়ভার অনেকাংশে কলমধারী সাহিত্যিকদের। যুগের পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন, আর সমাজ পরিবর্তনের প্রতিফলন ফুটে উঠেছে সাহিত্যর আধারে। মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল দেব- দেবী নির্ভর। পুরাণ কাহিনি আশ্রিত নানা কাহিনির মধ্যে দিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন শুরু হয়। দেব- দেবীর পরিবর্তে নর- নারীর দেহজ কামনা- বাসনা, হিংসা, ভালোবাসা, চাওয়া- পাওয়া নিয়ে কাহিনির রূপ নির্মাণ শুরু হয়। বাইরের নানা ঘটনা, বর্ণনাত্মক কাহিনির বদলে একদল সাহিত্যিক মানব মনের কারখানা ঘরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলেন। বাইরের ঘটনা অপেক্ষা মানব মনের অন্তরালস্থিত জটিল মনের প্রতি লেখকরা বেশি আগ্রহী হয়ে পড়লেন। তিরিশের দশকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ত্রয় অর্থাৎ তিন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সাহিত্যে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামীণ সামাজিকতা, প্রকৃতির নিসর্গ চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন, কালের পরিবর্তনে তারও বদল ঘটতে শুরু করল। চল্লিশের দশকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন মোড় এল। প্রাক- স্বাধীনতার মুহূর্তে সমাজ- রাজনীতি- অর্থনীতিতে দেখা গেল বিপুল পরিবর্তন। স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিফলন ঘটল সাহিত্যে। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের সাহিত্যে চল্লিশের কলকাতার সামাজিক বাস্তবতাকে অন্যরূপে তুলে ধরলেন। মানব মনের কারখানা ঘর অর্থাৎ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের ধারাকে আরও সূক্ষ্মভাবে সাহিত্যে আকার দিলেন তাঁরা। বাংলার পাঠক পরিচিত হলেন চেতনাপ্রবাহ রীতির সঙ্গে। পাশ্চাত্য সমালোচক উইলিয়ম জেমস ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর Principles of Psychology গ্রন্থে চেতনাপ্রবাহ শব্দের ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার চেতনাপ্রবাহ রীতির আলোচনায় বলেছেন, 'প্রথম মহাযুদ্ধের পরেকার কথাসাহিত্যে এই চেতনাপ্রবাহের প্রকাশে চরিত্রের মানসিক প্রক্রিয়া ও প্রবাহের ব্যাপক ছবি ধরা পড়তে শুরু করে। সেই ব্যাপক ছবির মধ্যে সচেতন ও অর্ধচেতন চিন্তা- প্রবাহের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি, স্মৃতি ও নানা এলোমেলো অনুষঙ্গের শৈল্পিক বিন্যাসও দেখা দিতে শুরু করে।'[২] ব্যক্তি মানুষের মনের এই এলোমেলো অনুষঙ্গ, তীক্ষ্ণ চিন্তা- চেতনা আসলে সামাজিক অরাজকতা, অবক্ষয়ের ফলাফল। মিথ্যা, দুর্গন্ধযুক্ত, অসাড়, রোগগ্রস্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকা চলমান ব্যক্তি সমাজের গোড়াতে ঘুণপোকার বংশবিস্তার ঘটেছে। ফলস্বরূপ শিরদাঁড়াহীন ধ্বংসপ্রায় সমাজের নীরব পদযাত্রার সাক্ষী সমসাময়িক ব্যক্তি মানুষ।

চল্লিশের দশকের সময়কালে কলকাতার সমাজ- রাজনীতি- অর্থনীতিতে বিবিধ ঘটনার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। ১৯৪১- ১৯৪৮- এর সময়কালে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে ধরা পড়ে বিচিত্র দৃশ্যপট :

১৯৪১ খ্রি: -- হিটলারের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ এবং ফ্যাসিবাদী বিরোধিতা, যুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত রদবদল

১৯৪২ খ্রিঃ -- ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪৩ খ্রিঃ -- বাংলার মন্বন্তর

১৯৪৫ খ্রিঃ -- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও অ্যাটমিক বোমা বিস্ফোরণ

১৯৪৬ খ্রিঃ -- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৪৭ খ্রিঃ – ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগ

১৯৪৮ খ্রিঃ – সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতির স্বরূপ

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভয়াবহ পরিস্থিতির আঁচে তপ্ত হয়েছে কলকাতা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ইংরেজ শাসন ও তা থেকে অব্যহতি পাওয়ার তীব্র আশায় উত্তপ্ত বিপ্লবী তাজা প্রাণের দৃপ্ততা, দৃঢ়তা, চরমপন্থী- নরমপন্থী মতাদর্শের নিজস্ব আন্দোলন— কলকাতার আগুনকে বারবার উস্কে দিয়েছে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ এই আগুনে ঘি ঢেলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সমাজ- পরিবেশের রাহুগ্রাসের কবল থেকে কলকাতাও রেয়াত পায়নি। বিচিত্র নৃশংস ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এই কলকাতা শহর। ১৯৪০-এর পরবর্তী সময় বাংলায় দ্রুত পরিবর্তনের কাল। এইসময় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। একইসঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদী ভাবনাও প্রসার লাভ করেছে। শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্যক্তি মানুষের রোমান্টিক মনের স্বপ্ন- বিহ্বলতা আঘাত প্রাপ্ত হতে শুরু করেছে। এইরকম এক নতুন কালে বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হলেন ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। চল্লিশের দশকের কলকাতা মূলত তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'বৃত্ত' উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একদল বুদ্ধিজীবীর পরিবেশ এখানে ধরা আছে।... কথাগুলো পরিবর্তিত হলে ১৯৪০-এর কলকাতা বইটি থেকে হারিয়ে যাবে।'[৩] ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য চল্লিশের দশকের কথাসাহিত্যিক। তৎকালীন কলকাতার সামাজিক- রাজনৈতিক পরিস্থিতি তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কথাকার অনেকাংশে তৎকালীন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ঔপন্যাসিকের ডায়েরির মুখবন্ধ থেকে স্পষ্ট জানা যায়, 'তাঁর ডায়েরির বিষয়বস্তুর প্রায়- সবটাই দ্বিশতাব্দীব্যাপী বিদেশী শাসন থেকে ভারতের আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের ক্রান্তিকালের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রসভ্যতার আত্মবিনাশী মানুষের অস্তিত্বের সংকটে আংস্টপীড়িত সাহিত্য সংস্কৃতির নিদ্রাহীন বাণীরূপের আলেখ্য।'[৪]

তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে তৎকালীন সময়ের কলকাতার নৃশংসতার ইতিকথা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের অরাজকতা, অস্থিরতা, হাহাকারে বিধ্বস্ত হয়েছেন

কথাকার স্বয়ং। ওয়েলিংটনের ছাত্র আন্দোলন, যেখানে ১০/১২ জন ছাত্র শোভাযাত্রা করে গণেশ এভিন্যু দিয়ে ডালহৌসি চলে গেল। এই আন্দোলন ছিল অভূতপূর্ব। 'শুধু ছাত্রসংখ্যায় নয়- কংগ্রেস যা করতে পারে নি ছাত্ররা তা-ই করেছে। সমস্ত পতাকা পাশাপাশি উড়ছে সেখানে— কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, লীগ, খাকসার।'[৫] শহীদ রামেশ্বরের মৃত্যু, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর মৃত্যু, সত্যাগ্রহী খাকসার যুবক আব্বাস সেলামের মৃত্যু, দক্ষিণ কলকাতার ব্ল্যাক আউট, জনমানবহীন অন্ধকারে রাস্তায় লরী পোড়ার বীভৎস দৃশ্য— সমসাময়িক কলকাতার পরিস্থিতির এক ভয়াবহ রূপ তুলে ধরেছে। 'হিন্দু- মুসলমান এক হোক। ভারতবর্ষে এক হবার দরকার হিন্দু- মুসলমানেরই— কংগ্রেস আর লীগের নয়। কংগেস বলতে সমগ্র হিন্দু সমাজ বোঝায় না, লীগ বলতে যেমন বোঝায় না সমগ্র মুসলমান সমাজ।'[৬]— এই ঐক্যতার সুর ধ্বনিত হয়েছে সর্বত্র। কখনো গান্ধীবাদী কখনো আবার গান্ধীবিরোধী মনোভাব— দেশীয় রাজনীতির- সমাজনীতির দ্বন্দ্বে প্রভাবিত ব্যক্তি মানুষের মন- মনন। মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

ব্যক্তিমানুষ ক্রমাগত তার্কিক মনোভাবাপন্ন হয়েছে। চল্লিশের দশকের কলকাতার এই সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে তৎকালীন সাহিত্যেও। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় আলোচ্য কথাকার সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কলমে। ঔপন্যাসিকের লেখনীতে মূলত তৎকালীন সময়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নর-নারীরা স্থান পেয়েছে। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, তার্কিক মনোভাবাপন্ন নারী- পুরুষ তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ, তাদের তার্কিক মন পাঠককেও ভাবতে বাধ্য করেছে। এখানে ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্যতা।

চল্লিশের দশকে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সমূহ হল— 'বৃত্ত' (১৯৪২), 'দিনান্ত' (১৯৪৩), 'কস্মৈ দেবায়' (১৯৪৪), 'রাত্রি' (১৯৪৫), 'কল্লোল' (১৯৪৭)। মননচর্চা ও ইতিহাসবোধের বিশিষ্ট সমন্বয়ধর্মী উপন্যাস 'বৃত্ত'। তৎকালীন কলকাতার বুদ্ধিজীবী মানুষের মন ও মননের ধারাভাষ্য ফুটে উঠেছে আখ্যানে। 'দিনান্ত'-এর কাহিনিতে স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, অবনীবাবুর মতো উদীয়মান পুঁজিবাদীদের বাস্তব রূপ। কালক্রমে পুঁজিবাদের কারখানার অভ্যন্তরে বাসা বেঁধেছে বুদ্ধির কীট। শুরু হয়েছে শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক আন্দোলন। চরমপন্থী আন্দোলন, চীনের ছাত্র আন্দোলন, কলকাতা শহর জুড়ে কার্ফুর মতো বিশৃঙ্খলতার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'কস্মৈ দেবায়'। বিশিষ্ট অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "'কস্মৈ দেবায়', 'দিনান্ত', 'রাত্রি', 'কল্লোল' ইত্যাদি উপন্যাসে আছে এই সময়ের বিশ্বাসভঙ্গ আর নিরালোক দিনের কথা।"[৭]

চল্লিশের কলকাতার অরাজকতা, উত্তাল পরিবেশ প্রভৃতি বাইরের ঘটনা চরিত্রের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা ভাষারূপ পেয়েছে কথাকারের কথনে। ব্যক্তি মানুষ আত্মসচেতনতায়, আত্মসমীক্ষণে, আত্মবিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে পড়েছে। 'বৃত্ত'-এ নায়ক

সত্যবানের আত্মঅন্বেষণের সূত্রে বাইরের বিভিন্ন ঘাত- প্রতিঘাত, বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ তার চিন্তন মননের ধারাভাষ্যে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যখন 'বৃত্ত' লেখা হয়েছিল তখন হিন্দু বিবাহ আইনে ডাইভোর্স চালু হয় নি। তবু সুরমা স্বামীকে ত্যাগ করে তার মেয়ে বনানীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় একা জীবন অতিবাহিত করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বাইরের সমাজের অজস্র প্রশ্নাধীন চোখ রাঙানি, অহেতুক কৌতূহলী ভিড় সে অবলীলায় উপেক্ষা করতে পারে। রোমা রোল্যার মতো সুরমাও বিশ্বাস করে, 'Happy marriages are rare'[৮]। সুরমা- সত্যবান, সত্যবান- বনানী, সত্যবান- মাস্টারমশাই— চরিত্রদের নানা সময়ের কথোপকথনে, তর্কে তৎকালীন সময়ের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। 'নার্সিসাস বৃত্তি', 'Sex-Taboo', 'ফ্রয়েডিআনা'র মতো নানা শব্দ জালে মানুষ তথা সমকালীন সমাজ আবদ্ধ। পাশ্চাত্য রীতির বিভিন্ন ধারায় কলকাতার শিক্ষিত মানুষরা সর্বদা তর্কে মুখর। নিজ নিজ মতাদর্শ স্থাপনে উৎসাহী। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতা নারীর সচেতনশীল, প্রগতিশীল মনোভাবও প্রাধান্য পেয়েছে। দৃষ্টান্ত :

ক. 'মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলে আর মেয়ের দেহ থেকে পঙ্গপালের মতো সন্তান বেরুতে থাকলে শুধু বাপমা-রাই তৃপ্তি পায় না। মেয়েরাও যেন নিজেদের সার্থকতা খুঁজে পায় বিয়েতে... জীবনব্যাপী বাঙালির এই যৌনতার তাণ্ডব।'[৯] (মধ্যবিত্ত মানসিকতা)

খ. 'একটু খাবার তৈরি করে বা শেলাই করে গৃহস্থালির বড়ো বেশি এগোয় না বরং সময় খরচ হয় প্রচুর। সে সময়টা বসে একটা বই পড়লেও অনেক উপকার আছে।'[১০] (নারীর প্রগতিশীল মানসিকতা)

ঔপন্যাসিকের ডায়েরির পাতায় ১৯৪৫- ৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রাজনৈতিক নৃশংস বাতাবরণের যে দিনলিপি পাওয়া যায় সেই ধারাবিবরণীর সাহিত্যিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে 'কল্লোল' উপন্যাসে। নেতাজীর অন্তর্ধানের পরবর্তী সময়কালীন রাজনীতি, ছাত্র আন্দোলন, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির ডাক, ধর্মতলার গুলিবর্ষণ, ব্ল্যাক আউটের কলকাতার অস্থির পরিবেশ ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। সমাজ পরিবেশের লুপ্ত প্রায় স্থিতিশীলতা মানুষের মননশীল মনকে অস্থির করে তুলেছে। বাইরের দুর্যোগপূর্ণ অস্থির ঘটনা মানুষের অন্তরকেও দ্বিধামথিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সংবাদ নিয়ে 'রাত্রি' উপন্যাস শুরু হয়েছে। সম্পর্কের বন্ধন উপন্যাসে অত্যন্ত শিথিল। বাইরের দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসহীনতা, ভালোবাসাহীনতার প্রতিফলন ঘটেছে চল্লিশের দশকের এইসকল উপন্যাসে। সম্পর্কের উষ্ণতা ক্রমশ ফিকে হয়ে পড়েছে। একই পরিবারের মধ্যে থেকেও ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রবীর, সুবীর, অনু, তাদের মা- বাবার মধ্যেকার দূরত্ব স্পষ্ট ভাষারূপ পেয়েছে। কম্যুনিস্ট প্রবীর চরমপন্থী সুবীরের দাদা নয়, শুধুমাত্র তার বিরোধী দলের কর্মী। চল্লিশের এই ভয়াবহ সামাজিক- রাজনৈতিক বিষাক্ত পরিবেশ সম্পর্কের অন্তর্গত উষ্মাকে নষ্ট

করেছে। 'কল্লোল'- এ প্রতীপ সমসাময়িক যুগের দোলাচলতার শিকার। তার অন্তরের দ্বিধা স্পষ্ট। স্বদেশীর কারণে জেলে যেতে প্রতীপ অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করেছিল। কিন্তু জেল থেকে ফিরে অসাড় সমাজের অরাজকতা, অস্থিরতা, দাঙ্গা, হাঙ্গামা তাকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। ছোটো ভাই প্রদীপের প্রতি তার উদাসীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি সুজাতা ও নীলিমার সঙ্গে জট- জটিল সম্পর্কের জালে সে বিধ্বস্ত, হতাশাগ্রস্ত। আবার, আন্তর্জাতিক এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে একশ্রেণির মানুষ নিজেদের মুনাফা অর্জনে ব্যস্ত। মহিমবাবু, শরৎবাবুর মতো ব্যক্তিরা যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারি করে নিজেদের আখের গোছাতে অত্যন্ত সচেতন। নিজের স্বার্থের জন্য নিজের মুনাফার খিদেকে তিনি ছেলে মহীতোষের মধ্যেও প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছেন :

ক. 'যুদ্ধটাকে তুমি বুঝতে পারছ না। দেখবে কি রকম ফেঁপে ওঠে বোম্বে আর আমেদাবাদ! ইংল্যান্ড যুদ্ধে ভিড়ে গেলেই কেমন শিফট বেড়ে যায় ওখানে দেখবে!'[১১]

খ. 'কি কি উপায়ে টাকা জোগাড় করা যায় তা- ও তিনি মনে মনে একের পর এক সাজিয়ে রেখেছেন।'[১২]

একইভাবে শরৎবাবু যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চালের কালোবাজারিতে নিজের পকেট গরম করতে তৎপর। সুদাস এই কালোবাজারিতে তাকে সমানভাবে উৎসাহ যোগায়— 'চালের দাম হু হু করে বেড়ে যাবে যদ্দিন না গভর্নমেন্ট বাঁধা দরে চাল বিক্রি শুরু করেন। আর চালের দাম বেড়ে যাওয়ার মানে সমস্ত জিনিসের দামই চড়ে যাওয়া।'[১৩] ফলস্বরূপ দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, হাহাকার। ভাত আর ফ্যান ভিক্ষে করে বেড়ানো নিরন্ন কিছু কঙ্কালসার মানুষের অযাচিত ভিড়ে চল্লিশের কলকাতার অলিগলি সরগরম। 'ভিখিরির ভিড় বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। ফুটপাতে চলা মুস্কিল ওদের জ্বালায়। হাঁড়ি কুড়ি, মালসা মগ, কাঁথা মাদুর নিয়ে দিব্যি সংসার জাঁকিয়ে বসেছে একেকজন।'[১৪]

কলকাতার সু- শিক্ষিত, সু- নাগরিকদের মননচর্চাকে উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন কথাকার সঞ্জয় ভট্টাচার্য। চল্লিশের দশকের কলকাতার নগরজীবন, elite শ্রেণির মানুষের জীবন যাপন, বুদ্ধিজীবী মনোভাব, দেশীয় সমাজনীতি- রাজনীতির কচকচানি এইসমস্ত বিচিত্র বিষয়ের সমাহার তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য। তৎকালীন কলকাতার সমাজ বাস্তবতার রূপ মিশ্র প্রকৃতির। দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর ধরে ইংরেজ শাসনের সুফল- কুফল, আশীর্বাদ- অভিশাপ দুটো দিক প্রত্যক্ষ করেছে স্বদেশবাসী। স্বাধীনতা লাভের অদম্য ইচ্ছার প্রত্যক্ষ রূপ প্রতিফলিত হয়েছে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে। শিক্ষিত যুবকদের স্বেচ্ছায় জেল, নির্বাসন, অসহযোগীতা, don't care মনোভাব সমাজ পরিবেশকে নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছে। ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসে বর্ণবহুল রঙের সমাহার প্রতিফলিত হয়েছে। চল্লিশের কিলকাতার সামাজিক- রাজনৈতিক অস্থিরতাকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর ডায়েরির

গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে তিনি তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন। 'কস্মৈ দেবায়', 'রাত্রি', 'কল্লোল' প্রভৃতি উপন্যাস চল্লিশের কলকাতার জীবন্ত দলিলে পরিণত হয়েছে। মহামারি, দাঙ্গা, গান্ধীবাদিতা, গান্ধীবিরোধিতা, মানব মনের অসন্তোষ, ব্যক্তি মানুষের তীক্ষ্ণ সমালোচক সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায় উপন্যাস সমূহে। তবে, চল্লিশের কালে উপন্যাসের বাঁক বদল এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। উপন্যাস তখন বর্ণনার একঘেয়েমিতা মুক্ত। লেখকরা ততদিনে মানব মনের চোরাগলির সন্ধান পেয়েছেন। আবার, চরিত্রের মনের কথাকে সর্বজ্ঞকথন রীতির মাধ্যমে আখ্যায়িত করার দায় থেকেও নিস্তার পেয়েছেন। কথাকার সঞ্জয় ভট্টাচার্য চেতনাপ্রবাহ রীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা অবলম্বন করে প্রত্যেক চরিত্রের মনের কথাকে সেই সেই চরিত্রের অন্তঃচেতনে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি একদিকে যেমন বাইরের ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন তেমনি, সেই ঘটনা চরিত্রের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাকেও স্পষ্ট করেছেন। ডাইভোর্স আইন, মধ্যবিত্ত মানসিকতা, নারীর আত্মসচেতনতা, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা, চরমপন্থী- নরমপন্থী আন্দোলন, ডাণ্ডি অভিযান, কালোবাজারি, মুদ্রাস্ফীতি, মন্বন্তর প্রভৃতি চল্লিশের দশকের সামাজিক- রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক সমস্যাকে ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য অত্যন্ত সচেতনভাবে সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, অলোক, ২০১৫, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক, পৃষ্ঠা- ৩৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯
৩. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, ১৯৪২, বৃত্ত, কলকাতা, নিউস্ক্রিপ্ট, ভূমিকাংশ
৪. গাঙ্গুলী, শাশ্বতী, ২০১৫, সঞ্জয় ভট্টাচার্য : একটি পরিক্রমা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা- ২৯২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০৬
৭. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, ১৯৯১, পাহাড়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সংখ্যা, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৭
৮. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, ১৯৪২, বৃত্ত, কলকাতা, নিউস্ক্রিপ্ট, পৃষ্ঠা- ১৬৫
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৯
১১. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, ১৯৪৫, রাত্রি, কলকাতা, পূর্বাশা লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ৫১
১২. তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৬
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬৩

গ্রন্থপঞ্জি :

গাঙ্গুলী, শাশ্বতী, ২০১৫, সঞ্জয় ভট্টাচার্য : একটি পরিক্রমা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি
চক্রবর্তী, সুমিতা, ২০১০, উপন্যাস বহুরূপে, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী
রায়, অলোক, ২০১৫, সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক
রায়, জ্যোতিপ্রসাদ, ২০২২, অন্তরালের বাঙালি সাহিত্য সংস্কৃতি, কলকাতা, ঋতবাক।

জানগুরু : এক আলো অন্ধকারের গল্প

পাপিয়া নন্দী
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : শিল্পকে আদর্শ দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় যাতে শিল্পের প্রচন্ড আঘাতে চুরমার না হয়ে যায়। শিল্পকে বেঁধে বেঁধে সজাগ হয়ে চলতে হয়। তেমনি আমাদের সমাজেও অর্থাৎ মানুষের পৃথিবীতে সবকিছুকেই কিছু না কিছু আদর্শ নিয়ম রীতি-নীতি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। যাতে হঠাৎ প্লাবনে ভেসে না যায়। রামায়ণ মহাভারত আমাদের সমাজ বন্ধনের শিক্ষা দিয়েছিলেন উগ্র স্বভাবা মানবকুলকে শান্তভাবে দমিয়ে রাখার জন্য। ভগীরথ মিশ্রের জানগুরু উপন্যাসটিতে প্রান্তিক শ্রেণী তাদের সমাজকে বেঁধে রাখতে নানা রীতি-নীতি, নিয়ম তৈরি করেছিল আর তাই সেগুলিকে চিরাচরিতভাবে বয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে সমাজের মুখ্য ব্যক্তিরা। আমরা জানি বাইরের পৃথিবী যখন পরিবর্তনময় তখন ভেতরের কোনো আদর্শই স্থির থাকতে পারে না সেটাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করতে হয়। এই উপন্যাসটিতে সমাজ প্রধান ছতর বাউরীর মতো অনেক মানুষ আছেন যারা কোন পরিবর্তন চাননি বংশগতভাবে যা চলে আসছে তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আধুনিকতার সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এই সমাজ বন্ধন কে ভাঙতেই একদল শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের আবির্ভাবে শুরু হয় এক নতুন লড়াই। চিরাচরিত ভাবধারার সঙ্গে আধুনিকতার অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। সমস্ত নিয়মকে ভেঙে ফেলে তারা চায় মানুষকে শান্তির নিশ্বাস দিতে। পুরাতন প্রথার বলে অনেককেই অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। সমিতির দলের ছেলেরা সমাজপ্রথাকে ভেঙে ফেলতে স্বতপ্রণোদিত ভাবে চেষ্টা করছে।

সূচক শব্দ: দ্বন্দ্ব, রীতি-নীতি, সমাজ, আধুনিকতা, বিশ্বাস- অবিশ্বাস, প্রান্তিক জনজাতি, শ্রেণী সংগ্রাম, অন্ধকার–আলো।

মূল প্রবন্ধ

আধুনিক একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মানুষ বিজ্ঞান ও তার যুক্তিকে বিশ্বাস করে। সেখানে প্রাচীনতা লোকপরম্পরার কোন স্থান নেই। কেননা সেগুলি আধুনিকতার যুক্তির দোরগড়ায় গিয়ে সাইরেন বাজায় না। কিন্তু একটা কথা হয়তো আমরা ভুলে যাই যে বিজ্ঞানের পূর্বে মানুষের এই লোকবিশ্বাস প্রবৃত্তি প্রবলভাবে ছড়িয়েছিল। আমরা জানি এই বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে পুরান,শাস্ত্র,বেদ এই সমস্ত কিছুর উপর। একেবারে গভীর স্তরে যার শিকড় তাকে সহজে উৎপাটন করা যায় না। আর তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক কিছুই তো পরিবর্তিত হয়। আগে ছিল ওঝা বদ্দি এখন হয়েছে

ডাক্তার এরকম হাজারো নাম পরিবর্তন পেশা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই আমাদের চারিপাশে। আমরা যারা শিক্ষার আলোতে এসেছি আর যারা সেই ভাবে এখনো পর্যন্ত সেই আলোতে আসতে পারেনি তারাও কিন্তু নিজের নিজের কাছে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচিত হয়ে আছে। আমরা চাইলেও তাদের সেই ভাবমূর্তিকে ভাঙতে পারবো না। শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয়দের কাছেই নিজের নিজের মত যুক্তি বিশ্লেষণ তৈরি থাকে যা সময় সাপেক্ষে প্রয়োগ করে। শুধু তফাৎ আধুনিক শিক্ষিত সামাজিক মানুষেরা বেশিরভাগই বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকভাবে আর প্রাচীন মানুষেরা তাদের চিরাচরিত চিরকালীন বোধির কাছে বিশ্বাসের কাছে মাথা নত করে সেই যুক্তিকেই তারা সর্বৈব মনে করে। আমাদের আজকের প্রবন্ধের নিবেদন কিছু প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের এক আলো অন্ধকারের গল্প।

ভগীরথ মিশ্রের জানগরু উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলকে নিয়ে বলতে গেলে বাঁকুড়া অঞ্চলেই বেশি করে আছে। এ অঞ্চলের প্রান্তিক জনজাতির অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আধুনিক মানুষের চেতনার লড়াই ও জীবন ভাবনাকে তুলে ধরব। বলা যায় অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর লড়াই,বিশ্বাস অবিশ্বাসের লড়াই,টিকে থাকার নতুনের সৃষ্টির লড়াই। এটা সত্য যে আজ যা আমাদের কাছে কুসংস্কার অন্ধকার অবিশ্বাস্য বলে প্রতিভাত হয় প্রাচীন মানুষদের কাছে তাই সত্য বিশ্বাসের। ফলে নিজেদের বিশ্বাসের কাছ থেকে সমাজের তৈরি করা বিভিন্ন নিয়মে কারো জীবন কেড়ে নিতেও তারা পিছপা হয় না। আমরা দেখেছি শুধু এই প্রান্তিক জনজাতি নয় আমাদের মা ঠাকুমাদের মধ্যেও যারা প্রাচীন মানুষ বেঁচে আছেন তারাও বিশ্বাস করে ডাক্তার নয় বদ্যি ওঝা। পেট ব্যথা করলে তেল পড়া জল পড়াতে। ফলে একথা স্পষ্ট হয় যে বিশ্বাস মানুষের মনোগত অবিশ্বাস মানুষের উপার্জিত। আমরা শুধু তার পরিবর্তনের কথা বলতে পারি মাত্র ভুল টাকে ভুল বলে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি মাত্র। মানুষকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করতে পারি যাতে অন্ধ বিশ্বাসের বসে কারো প্রাণ বলি না হয়। প্রতি মুহূর্তে জীবনকে বাজি রেখে শিক্ষার আলোকে জ্ঞানের আলোকে পৌঁছে দেওয়ার অদম্য প্রয়াস করে উপন্যাসের কিছু চরিত্রর যেমন সুফল, মনসারাম। 'জানগুরু' উপন্যাসের মাধ্যমে প্রান্তিক জনজাতির যেমন বাউরী, শিকারি, সাঁওতাল, আদিবাসী মানুষের জীবন ভাবনা এবং সমাজের আলো অন্ধকারের দিক এই প্রবন্ধের মূল জ্ঞাতব্য বিষয়।

উপন্যাসটির মধ্যে দুটি দলকে দেখা যায় সেখানে দু'দলই কিন্তু লড়াই করছে। একদল আলোর হয়ে আরেক দল নিজেদের সামাজিক প্রথাকে বেঁধে রাখার জন্য। দীর্ঘদিনের চলে আসা কুসংস্কারের ইমারত বিশ্বাসকে আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলএকদল শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়। বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চল তুলনাগতভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়া নানা সমস্যা সংকট এখানকার মানুষদের দমিয়ে

রেখে দেয়, তারা প্রাচীনকে ধরে রাখতে চায় সেই জন্য। কারণ এই অঞ্চলগুলোতে এখনো সেই ভাবে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনো মানুষকে সামান্য চিকিৎসা,জলের জন্য হন্যে হয়ে ছুটতে হয়। তাই তাদের কাছে দীর্ঘদিনের চলে আসা নিয়মই শ্রেয়। বর্তমানে শিক্ষার ছোঁয়া পেয়েছে বলেই কিছু কিছু মানুষ অনীতিকে ভাঙতে চেয়েছে কিন্তু অনেকেই মানুষদের কাছে যা অনৈতিক অবিশ্বাস তাই হয়তো ওই প্রাচীন মনোভাব সম্পন্ন মানুষগুলোর কাছে বিশ্বাসের। তবে কাহিনীর শেষে দেখা যায় প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস বলে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা আসলে বুজরকি মিথ্যে কেননা যা ডাইনি থান বলে খ্যাত তাই চাষের জমি হচ্ছে তাই গুপ্ত প্রেমের আখড়া হচ্ছে। ভুতের আখড়া বলে পরিচিত বাড়ি শারীরিক চাহিদা পূরণের আখড়া হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি তাদের বিশ্বাস শুধুই বাইরের আবরণ? আধুনিক যা বলে তা তারা প্রতি পদক্ষেপে পালন করে, বিশ্বাস করে কিন্তু প্রাচীনপন্থী সমাজপতিদের গঠিত সমাজ আসলে ঘুনে ভরা। তারা যেন শুধু প্রচারমুখী হতে চেয়েছে।

উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজমাথা বা দন্ড মন্ডের কর্তারা তাদের জনসমাবেশ বাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। আবার অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা তাদের সেই চেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। যুধাজিৎ স্যারের মাধ্যমে সেই মাথাকে তাদের বিশ্বাসের খুঁটিকে নাড়িয়ে দিতে একদল ছেলের আবির্ভাব ঘটে। সৃষ্টি হয় সংগঠনের। এই অলৌকিক কুসংস্কার দমনে প্রশাসনেরাও অগ্রবর্তি হয়েছে। কিন্তু কখনো কখনো সেই প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও নিজেদের স্বার্থ উন্নতির কাছে ভন্ডামিতে বিশ্বাস করে তাবিজ হাড় ইত্যাদির বশবর্তী হয়েছে।"বিদায় নেবার মুহূর্তে মেজোবাবু আমতা আমতা করে বলেন-একটা ঘোড়ার নালের টুকরো জোগাড় করে দিতে পারিস পচু? সাবড়াকোনের এক তান্ত্রিক বলেছিল, ঐ দিয়ে একখানা মহাশক্তি কবচ বানিয়ে দেবে।পরে থাকলে শত্রুনাশ, পদোন্নতি, অর্থাগম আরো কি কি যেন সব হবে।" তাহলে দেখা যায় একদিকে শিক্ষিত মানুষের লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা অন্যদিকে ভয় দোলাচলতা। আসলে আমাদের মনে হয় সংস্কারে বিশ্বাস আমাদের উপার্জিত আর কুসংস্কারে বিশ্বাস মনোগত আত্মাগত। তাই এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতায় তাই ঘুরছিলেন মেজ বাবু এসব ভূত-প্রেত ডাইন কুঁদরা এগুলো কে ঠিক বিশ্বাসও হয় না আবার পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেও ভয় করে। কত রহস্য না রয়েছে এই দুনিয়ায় মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে তার কতটুকুই বা নাগাল পায়। ছেলেবেলা থেকে ভূত প্রেত নিয়ে কত গল্পগাছায় না শুনে এসেছেন সবই তো আর মিথ্যে হতে পারে না। আরে এটা কি স্পষ্ট যে মানুষ চাইলেই সব কিছু তো অগ্রাহ্য করতে পারে না? কারণ তার অবচেতন স্তরে আমাদের সেই প্রাচীন প্রবৃত্তি আজও থেকে গেছে। যারা শিক্ষার আলোকে ছড়িয়ে বিজ্ঞান শক্তিশালী করতে চেয়েছে তাদের মনের কোথাও সুপ্ত অবস্থায় সেই ভাব রয়ে গেছে। মেজ বাবু তো শিক্ষিত

প্রশাসনিক চাকুরীজীবী একজন কর্মকর্তা তবুও তার মন সংস্কার কুসংস্কারের বিশ্বাসে দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছে। সাহসে ভর করে যদি নিজের বিশ্বাসের জায়গা কে শক্ত করে প্রাচীনের মুখোমুখি দাঁড়াতো তাহলে হয়তো মেজ বাবু দেখতে পেত আসল রহস্য। মেজবাবুর এই ভীরুতার কথাতে মনে পড়ে বিবেকানন্দের কথা-"প্রাচীন আদিম প্রবৃত্তি বৃত্তি কোন কিছুই আমাদের ত্যাগ করেনা। যখন মানুষ জঙ্গলে বাস করত তখন মুখের রুচি আনতে পচা মাংস খেত এখন মানুষ টক জাতীয় খাদ্য খায়। শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ বদল ঘটেছে"। আমরা বলতেই পারি যে আজ যা অবিশ্বাস কাল তা বিশ্বাস আবার আজ যা বিশ্বাস কাল তা অবিশ্বাসের হতেও পারে।

লেখক ভগীরথ মিশ্র প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক অন্ত্যজ, বাউরি, সাঁওতাল আদিবাসী শ্রেণীর মানুষদের বিশ্বাসের কারণে অহেতুক মানুষ হত্যা শাস্তিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের সামনে প্রকাশ করে দিলেন সমশ্রেণী আন্দোলিত কয়েকটি মুখ। তিনি জানতেন সমগোত্রীয় সম শ্রেণি না হলে তাদের চোখের পর্দা খোলা যাবে না তাই তারা একটা সমিতি গঠন করে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে। অনেক মেয়েকে ডাইনি রূপে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়।"বেশ কিছুদিন যাবৎ কানে আসছে, কিছু আদিবাসী ছগরা নাকি একজোট হয়ে কি এক কুমতি না সুমতি গড়েছে তালডাংরা বাজারে। উল্টাপাল্টা বোঝাচ্ছে মানুষকে হাতেনাতে ডাইন ধরলেও সাচার করতে দিচ্ছে নাই।" তালডাংরা কুসংস্কার নিবারণ সমিতি গঠন হওয়ার পর থেকে ডাইনি ধরার আসল রহস্য উদঘাটন হতে থাকে; তাই সমাজ মাথারা ভয় পায়। মানুষের আসল উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে যায়। কখনো ব্যাক্তি প্রেমের কারনে নিজের বউকে ডাইনি প্রমাণিত করার জন্য টাকা দেয়, আবার কেউবা বাবার অপমানের শোধ নিতে ঘরে আগুন ধরিয়ে ভুতে ধরার অভিনয় করে। বাঁচার জন্য অলৌকিকতাকে আশ্রয় করে। অন্যদিকে শারীরিক চাহিদা মেটাতে গুপ্তকালীপূজা জনকুঁদরার নামে বলাৎকার করে।" লোকটা গুপ্ত কালী পূজা কইরবার অছিলায় কাল রাইত ভর আমাকে বলাৎকার কইরেছে"। মৌখিক স্বীকারোক্তি সমিতির সদস্যদের মনবল আরো বাড়িয়ে দেয় কুসংস্কারের প্রতিরোধের প্রতি।

নিবারণ সমিতি গড়ে ওঠার পর থেকে শুরু হয় আসল লড়াই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর, বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাসের। একদল লোক ছাগল নিয়ে চার দিনের পথ অতিক্রম করে চলেছে সিলিপুরার জিন্নাসিনীর থানে মানত পূরণের আশায়। এই মানতপূরণের দীর্ঘ পথ আসলে এক রূপক। মনসারামদের কুসংস্কার নিবারন সমিতির লড়াইয়ের দীর্ঘ পথ। তারাও তো এই ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য শত প্রণোদিত উদ্যোগে পথে নেমেছে। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত তিক্ততা তাদের বাধ্য করেছে এই অবিশ্বাসের বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করতে। যেমনভাবে ওন্দার লোহার পাড়ার গরীব মানুষের দলটিও বাধ্য হয়েছিল গ্রাম থেকে দীর্ঘ পথ পার হয়ে

শিলিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে। একদিন যখন ওলা উঠা রোগে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে বসেছে তখন নাকি এই জিন্নাসিনির মানতের বলেই সমস্ত মানুষ ঠিক হয়ে যায়। তাই আজকে সেই প্রাচীন মানুষের দল বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত মানত পূরণে পথচারী হয়েছে। অন্যদিকে মনসারামদের নিবারণ সমিতির দলটির সদস্যরাও অনেক আপনজনদের হারিয়েছে ডাইনি প্রথার কারণে। তাই তারাও অনেক কষ্টে শাস্তি দেওয়ার প্রথা কে ভেঙে দেওয়ার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েও এগিয়ে গেছে। এই দুটো দিক যেন এক রূপ ধারণ করেছে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। প্রতীক রূপের মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আলোর পথচলা কে এগিয়ে নিয়ে গেছে নিবারণ সমিতির দলের লোকেরা।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়া শুষ্ক রুক্ষ অঞ্চল এখানে আধুনিকতার ছাপ ততটা মানুষের মনের কাছে যায়নি; বলতে গেলে নাগাল পায়নি। উচ্চ বৃত্তের উচ্চবর্ণের মানুষেরাও আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয় বড় সহজ সরল এখানকার মানুষজনেরা। অভ্যস্ত নয় তাদের ইচ্ছের বা যুগের সমভাবের অভাবে নয়, অভাব তাদের পেটের দায়ের, আর্থিকতার ।শিক্ষার প্রতি আধুনিকতার প্রতি মনের একান্ত আলাপন থাকলেও উপায় ছিল না।তবুও অনেকে সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে আধুনিক মানসিকতা আধুনিক শিক্ষার সঙ্গী হতে পেরেছে আর তারাই আস্তে আস্তে চেয়েছে শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। উচ্চবর্ণ থেকে নিম্ন বর্ণ প্রান্তিক থেকে অন্তজ সমস্ত জনজাতি সকলের কাছে। হ্যাঁ অনেকে বলতে পারে যে, আজ তো বাঁকুড়া-পুরুলিয়া এমন পরিবেশ নেই তবে তাদেরকে বলব একটু বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিতে। এখনো বহু গ্রাম আছে যেখানে বৃষ্টি না হলে চাষ হয় না; গ্রাম থেকে ১০-১২ কিমি দূরে স্কুলে যেতে হয় ; সামান্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাঠ জঙ্গল পার হয়ে অন্য গ্রামে যেতে হয়। শিক্ষাকে বাদ দিলে যদি স্বাস্থ্য থাকে তাও ডাক্তার নেই কোন অসুখ করলে ৭০-৮০-১০০ কিমি পার হয়ে বাঁকুড়া সদরে আসতে হয়। ফলে সেখানকার মানুষ তো অলীক কুসংস্কারের প্রাচীনতার পরিপন্থী হবে এটা আশ্চর্যের কিছু নেই আর তাই লেখক সেই বিষয়গুলোকে নিয়েই তাঁর উপন্যাসের কাহিনী গ্রন্থন করেছে। পূর্বেই বলেছি আমাদের মা ঠাকুমারাও তাই ভরসা করে তাহলে প্রান্তিক জনজাতির মধ্যে তো থাকবেই। উপন্যাসে নিবারণ সমিতির দল যে কুসংস্কারের লড়াই লড়ছে তা গহীন অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোতে টেনে আনার লড়াই। তাই তো দেখি যুধাজিৎস্যারের মতো মানুষ আসে পথ দেখাতে। যেহেতু পিছিয়ে পড়া অঞ্চল তাই আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা মনের তাগিদে ছুটে গেছে স্কুলে অনেকেই, মনসারাম যেন তার প্রমান।" মনসারামের সেই ছেলেবেলা থেকে স্কুলে যেতে খুব ভালো লাগে। পড়াশোনায় প্রখর মাথা তার, মাস্টাররা বলে ব্যাটা দৈত্য কুলে প্রল্লাদ। শিকারি যাতে এমন বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না।" সেই মনসারাম স্বজাতের

আরো অনেক সমবয়স্কদের নিয়ে পাড়ি দেয় কুসংস্কার নিবারণের গহীন অরণ্যে। সফল হতে পারবে কিনা তারা তা কেউ জানে না, তবুও নিজ নিজভাবে সকলেই চেষ্টা করে। এতদিনকার বিশ্বাস কি মনসারামদের দল তথা কুসংস্কার নিবারণ সমিতির সদস্যরা ভাঙতে পারবে? আমাদের মনে হয় পারবে মনোবল থাকলে অবশ্যই পারবে। তাদের অন্য আরেকটা শক্তি হল সমাজের নানা ছোটখাটো ভুল। সেই ভুলের সামান্য গলি রাস্তাতে মনসারামের দল তাদের উদ্দেশ্যময় শরীরকে প্রবেশ করিয়ে অন্ধকার তলতলে পাককে স্বচ্ছতা দেওয়ার চেষ্টা করে। পাকের গাথন শক্ত মাটির মতো নয় তাই তাদের শক্ত অবলম্বন ধরতে হয়। সেই শক্ত অবলম্বন হল একে অন্যের হাত। তারা যে পথে নেমেছে সে পথ বড় দুর্গম। নানা বিপদের সম্ভাবনাও আছে। যদি কারোর দীর্ঘদিনের সম্পদে হাত দেয় তাহলে তারা তো আক্রমণ করবেই আর এখানে তো সমাজের চালনার ভিতকেই নাড়া দিতে সমিতির দল উদ্যোগী হয়েছে।" সুন্দরীর ভারি ভয় করে এদের কথা ভেবে। আশঙ্কায় ভারী হয়ে আসে বুক। আগুন নিয়ে খেলছে এরা মানুষের আজন্ম বিশ্বাস সংস্কারের মূলে কুড়োলের ঘা মারতে চাইছে।" মনসারামদের দল সমাজের চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে তা বদলের চেষ্টা করছে তাই প্রতি পদে পদে প্রাণসংকট ও ভয় থাকে। সুফলের আত্মকথনও পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়।" সুফল নিঃশব্দে খেতে থাকে। একটু বাদে বলে,- 'যে কাজে নাইমছি উয়াতে পদে পদে জানের ডর। চোরা গুপ্তা হুজ্জুতি আকছারই হচ্ছে আমাদের উপর। যেকুনো সময় জীবনটা চইলে যেইতে পারে।'" সমিতির দলের প্রতিরোধ প্রকাশ্যে করতে পারে না বলে প্রীতম বাউরী হরিণ বাউড়ির সামাজিক দল গোপনে তাদের উপর হামলা চালায়। কুসংস্কারের পাশাপাশি আনন্দ, মেলা দেখা আরেকটা দিক মানুষের দেখা যায় তাহল মানবিকতার দিক। সুন্দরীর অল্প বয়সে স্বামী মারা গেলে প্রানের সখী ফুলমতি সব সময় তার পাশে থেকেছে। তাকে আনন্দে রাখতে চেয়েছে। সবটা দিয়ে ফুলমতি তার খোঁজ রাখে। তাই সুযোগ পেলেই হাসি আহ্লাদে ডুবিয়ে রাখতে চাই ওকে। কিন্তু ভালোর পেছনে খারাপও লুকিয়ে থাকে। সুন্দরী ফুলমতির সম্পর্কে আড়ালেও আলো আর অন্ধকারের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন সব ত্যাগ করে খুশিতে দিতে চায় আর অন্যজন গোপনে কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিতে চায় তাকে।

প্রাচীন সমাজ নীতির যারা চালক তাদের সহকারীরূপে কাজ করে পচু বাউরি। সমাজ প্রধান ছতর বাউরির চেলা। ছতর বাউরি যে কিনা নীতির ধারক হয়ে সমাজ চালায়। সেই প্রধানের চেলা পচু বাউরি ভূত ধরার নামে কৌটোতে করে চুরি করা সোনার জিনিস গাছে তুলে রাখে। বোবা মেয়েকে সুস্থ করার নামে দিনের পর দিন শরীরকে ভোগ করে। তাই রাসলীলার জন্য গোপন কুঞ্জ করে নেয় ভূতের আখড়াতেই। কামুকতা, লোভ, মোহ, শারীরিক চাহিদা প্রেম অনেক সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। এগুলো তো আমাদের মনের রিপু। চুনারাম বিয়ে করার বা চুনারাম সুন্দরী প্রেমকে

পূর্ণতা দিতে একটা সরল মেয়ের জীবন নিতে যে সমাজ দুবার ভাবেনি সেই সমাজের সব প্রথায় ঘৃণ্য। কাহিনির শেষে দেখা যায় ফুলমতির নিজের সঙ্গে লড়াই। সেসব মোহকে ত্যাগ করে নিজের মনের শুদ্ধতার কাছে সমাজের কুপ্রথাকে প্রতিহত করেছে। ডাইনি প্রথার হাত থেকে বাঁচতে সে আশ্রয় নিয়েছে এক পাথরের খাঁজে। আত্মগোপন করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আলোর অর্থাৎ নতুন দিগন্তের-"অন্ধকূপে বন্দিনী ফুলমতি এক চিলতে ফোকর দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখবার চেষ্টা করে-------এই উপায়েই বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে নিজেকে। যতক্ষণ না সুফল ফিরে আসে সমিতির লোকজন নিয়ে।" সমাজের অন্ধকূপের মধ্যে মনসারামদের দল সেই এক চিলতে মিঠে রোদ। ফুলমতি এই সাহসী ভাবনা আরো অনেক মেয়েকে জীবন দেবে অবশ্যই যেন অন্ধকার কাছে আলোর সামান্য জয় ঘোষণা হয়।

শুধু রাঢ় অঞ্চলে বাঁকুড়াপ্রান্তিক জনজাতি নয় আজও আমাদের সমাজের মধ্যে নানা কুপ্রথা আছে। সমাজের আনাচে-কানাচে একটু চোখ কান খোলা রাখলেই তার গভীর ছাপ দেখতে পাই। জানগুরু উপন্যাসের কাহিনি আমাদের সেই সব শ্রেণীর মন থেকে অন্ধ কু ভাবনাকে দূরে সরিয়ে নবচেতনার আলোতে নতুন ভাবে বাঁচার তাগিদ দেয়, প্রান্তীয় অপ্রান্তীয় সকল মানুষকে। যেমনভাবে ফুলমতি পেরেছে নিজের মনের দাম্ভিকতাকে ছাড়িয়ে মোহকে ত্যাগ করে যেতে। আসলে আমাদের মোহ আমাদের সবচেয়ে বড় কুস্বভাব তাকে সরাতে পারলেই সব শুভ হবে। জানগুরু আসলে সুজ্ঞান, মনের সুঅবস্থা, সুভাব। একটু চেতনা সাহস আমরা চাইলেই আমাদের মনের কুমতি জানগুরুর ভাবকে বাদ দিয়ে সুমতি জান গুরুর বিধানে চলতে পারি। উপন্যাসের কাহিনীর মাধ্যমে রাঢ়বঙ্গ শুধু নয় সমগ্র পাঠককুলকে অপ্রথার বিরুদ্ধে জীবনকে নতুন ভাবে শিক্ষার আলোয় বাঁচার কথা ঘোষণা করে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' কয়েক পংক্তি দিয়ে আমার আলোচনার ইতি টানলাম।

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ/যা কিছু আছিল মোর।/যতশোভা যত গান যত প্রাণ/জাগরন ঘুমঘোর/শিথিল হয়েছে বাহু বন্ধন/মদিরাবিহীন মেঘ চুম্বন জীবন কুঞ্জে অভিসার নিশা/আজি কি হয়েছে ভোর?/ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা/আনো নবরুপ আনোশোভা/নতুন করিয়া লহ আরবার/চির পুরাতন মোরে/নতুন বিবাহে বাঁধিবে আমায়/নবীন জীবনডোরে।" যা কিছু পুরানো অন্যের ক্ষতিকর জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা ত্যাগ করে নতুন ভাবে সমাজকে জীবনকে বরণ করে নেওয়ার বার্তা দেয়। জানগুরু উপন্যাসে লেখক ভগীরথ মিশ্র শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষিত জ্ঞানের বধির জানগুরুর জয়টিকার পরিয়ে দেয়। জীবননাশের জানগুরু মিলিয়ে যায় নতুন নিয়মের মাঝে। ফুলমতির আত্মগোপনের এক চিলতে আলো শরীরকে আলোকিত করে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১)	মিশ্র, ভগীরথ, ২০১৬, জানগুরু , কলকাতা, দেশ
২)	চৌধূরী কামিল্যা, মিহির,১৯৯২, আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

হীরক রাজার দেশে সিনেমার রূপক বাস্তবতা ও বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা

মনোজ মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
খিদিরপুর কলেজ

সংক্ষিপ্তসার : হীরক রাজার দেশে সত্যজিৎ রায়ের একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র, যা সমাজের নিপীড়ন, অন্ধ আনুগত্য এবং শাসকের কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রতি তীব্র সমালোচনা তুলে ধরেছে। ছবিটির গল্প হীরক রাজার উপর ভিত্তি করে, যিনি তার প্রজাদের উপর নিদারুণ শাসন চালিয়ে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করেন, যাতে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে। হীরক রাজা তার ক্ষমতা রক্ষা করতে শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করেন এবং সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাচার এবং ভয়ের উপর ভিত্তি করে রাজত্ব চালান। শেষ পর্যন্ত, প্রজারা হীরক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে উৎখাত করে। এই চলচ্চিত্রটি শুধুমাত্র রাজার স্বেচ্ছাচারিতা, দমননীতি এবং শেষে প্রজাদের জয়ই মুখ্য নয়, একালের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সেটি খুবই সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সিনেমার কাহিনি কীভাবে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে উঠেছে, তারই প্রতিপাদ্য বর্তমান প্রবন্ধটি।

সূচক শব্দ : হীরক রাজার দেশে, হীরক রাজার প্রতীকী অর্থ, **বিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা**, প্রজাদের উপর শোষণ ও দমননীতি, **উদ্ভাবন এবং স্বাধীন চিন্তার বাধা**, বিপ্লব এবং স্বৈরাচারের পতন।

‘হীরক রাজার দেশে’ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত একটি অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক চলচ্চিত্র, যা সমকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি এবং দমনমূলক শাসনব্যবস্থার উপর একটি তীক্ষ্ণ রূপক হিসেবে কাজ করে। ছবিটির রূপক বাস্তবতা মূলত শাসক-শাসিত সম্পর্ক, কর্তৃত্ববাদী শাসন, এবং জনগণের নির্জীব অবস্থার উপর আলোকপাত করে।

হীরক রাজার প্রতীকী অর্থ

হীরকের রাজা একনায়কতন্ত্রের রূপক। তিনি এমন একজন শাসক, যিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং রাজ্যের মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখেন। তার মূল লক্ষ্য হল নিজের শাসন টিকিয়ে রাখা এবং জনগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারকে রোধ করা। রাজা নিজেকে অমর মনে করেন, এমনকি নিজেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করানোর নির্দেশ দেন, যা একনায়ক শাসকের আত্মমুগ্ধতার প্রতীক এবং যা আসলে **নার্সিসিজম** (Narcissism) মানসিকতাকেই নির্দেশ করে।

নার্সিসিজম (Narcissism) এবং **হীরকের রাজার : উভয়** চরিত্রের মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই নিজেকে অতিরিক্ত ভালোবাসা, ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ এবং চারপাশের মানুষের অনুভূতি ও চাহিদাকে অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

নিজের প্রতি অতিরিক্ত মোহ ও অহংকার : নার্সিসিস্টিক ব্যক্তিত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল নিজের প্রতি চরম ভালোবাসা এবং নিজের গুরুত্বকে অতি মূল্যায়ন করা। তারা নিজেদের সবসময় সেরা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। অন্যের চাহিদা, অনুভূতি বা মতামতের প্রতি তাদের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

হীরকের রাজা নিজের ক্ষমতা, রাজত্ব এবং পদমর্যাদা নিয়ে খুবই অহংকারী। তার মনে হয়, তার শাসনই সেরা এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। জনগণের ইচ্ছার কোনো গুরুত্ব তার কাছে নেই, বরং তাদের মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে তিনি নিজের আধিপত্য বজায় রাখেন। রাজা তার নিজের অহংকার রক্ষা করতে স্বাধীন মত প্রকাশ ও চিন্তার উপর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। **নার্সিসিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি** এবং **হীরকে**র রাজা চরিত্র উভয়ই ক্ষমতালোভ, আত্মপ্রশংসা এবং শোষণের মিশেলে তৈরি। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রতি মোহ এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে তারা চারপাশের মানুষের কষ্টকে অবহেলা করে এবং তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

বিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা : হীরক রাজা তার রাজ্যে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন, যা মানুষকে জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন রাখার জন্য তৈরি। শিক্ষকের মূল দায়িত্ব হল প্রজাদের আজ্ঞাবহ করে তোলা, যেন তারা শাসকের অন্যায় ও দমনমূলক কাজগুলোকে কোনো প্রশ্ন না করেই মেনে নেয়। যুগ যুগ ধরে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়- লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে, কিংবা সদা সত্য কথা বলবে। শিক্ষা মানুষকে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের তফাৎ বুঝতে শেখায়। সেটাতেই রাজার ভয়। রাজাও জানেন— 'যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, আর তত কম মানে'। তাই রাজার শিক্ষামন্ত্রীর আদেশ— 'আজ থেকে বন্ধ পাঠশালা', কেননা, 'জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই'।

প্রজাদের উপর শোষণ ও দমননীতি : হীরকরাজা রাজ্যের প্রজাদের কঠোর শাসনের মধ্যে রাখেন। সাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক ও মানসিক শোষণ করা হয়। রাজ্যের সব সম্পদ, যেমন হীরে রাজা নিজে ভোগ করেন, কিন্তু প্রজাদের দুর্দশার কোনো সুরাহা নেই। এই শোষণব্যবস্থা তৎকালীন শোষক শ্রেণির প্রতীক হিসেবে কাজ করে, যেখানে শাসকগোষ্ঠী জনগণকে নিঃস্ব করে তাদের উপর প্রভুত্ব করে।

উদ্ভাবন এবং স্বাধীন চিন্তার বাধা : হীরকের রাজা তার রাজ্যে কোনো ধরনের নতুন উদ্ভাবন বা স্বাধীন চিন্তা সহ্য করতে পারেন না। বিজ্ঞানী চরিত্রটির উদ্ভাবনকে রাজা নিজে ব্যবহার করতে চান, কিন্তু জনগণের উপকারে সেটি ব্যবহার করার অনুমতি

নেই। এটি সমাজে দমনমূলক শাসকদের প্রতীক, যারা সৃজনশীলতা, মুক্ত চিন্তা এবং নতুন ধারণাকে ভীতির মাধ্যমে বাধা দেয়।

বিপ্লব এবং স্বৈরাচারের পতন : ছবিটির কেন্দ্রীয় থিম হল অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব। উদয়ন পণ্ডিতের মতো চরিত্ররা শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষকে জাগ্রত করেন এবং রাজাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান'—সাধারণ মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয় তখন রাজসিংহাসন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার শক্তি এবং জনগণের ঐক্যের জয়গাথাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে। ছবির শেষাংশে আমরা দেখি, প্রজারা রাজাকে বন্দী করে বিদ্রোহে জয়লাভ করে।

রূপক অর্থে সামাজিক সমালোচনা : 'হীরক রাজার দেশে' মূলত একটি সামাজিক ব্যঙ্গ। শাসকের অন্যায় কাজ, শিক্ষাব্যবস্থার বিকৃতি, মানুষের স্বাধীনতা ও চিন্তাকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা—এগুলো সবই সমকালীন সমাজে এবং রাজনীতিতে দেখা যায়। সত্যজিৎ রায় এসব বিষয়কে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরে দেখিয়েছেন কীভাবে একনায়কতন্ত্র মানুষের চিন্তাভাবনা ও স্বাধীনতাকে খর্ব করে।

'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটির প্রতীকী ব্যঞ্জনা

সত্যজিৎ তাঁর সিনেমায় 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটি ব্যবহার করেছেন, যা সমগ্র সিনেমার মূল সুরটিকে ধরে রেখেছে। সিনেমার পটভূমিতে সমকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি এবং দমনমূলক শাসনব্যবস্থার দিকগুলি তীক্ষ্ণ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কালজয়ী এই রূপক চলচ্চিত্র, যা সমাজের দমনমূলক শক্তি এবং কর্তৃত্ববাদী শাসকদের বিরুদ্ধে এক তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। ছবির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন যে কীভাবে শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা এবং জনগণের ঐক্য সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের অবসান ঘটাতে পারে।

বর্তমান সময়কাল ও 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার প্রাসঙ্গিকতা

সত্যজিৎ রায়ের **'হীরক রাজার দেশে'** সিনেমাটি মুক্তি (১৯৮০) পাওয়ার চার দশক পেরিয়ে গেলেও আজও তার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই সিনেমা যেমন **১৯৭০-৮০**-এর দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির এক তীক্ষ্ণ সমালোচনা ছিল, তেমনই আজকের সময়ে, বিশেষ করে আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

কর্তৃত্ববাদী শাসন ও একনায়কতন্ত্র : বর্তমান সময়ে অনেক দেশেই কর্তৃত্ববাদী শাসন বা একনায়কতন্ত্রের পুনরুত্থান দেখা যায়। যেখানে সরকার বা শাসক শ্রেণি জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের উপর আঘাত হানে। 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় হীরক রাজা তার প্রজাদের ভীতি ও চাপের মধ্যে রেখে শাসন করেন, যাতে তারা কোনো ধরনের বিদ্রোহ বা স্বাধীন চিন্তা করতে না

পারে। বর্তমান পৃথিবীতেও দেখা যায় এমন পরিস্থিতি, যেখানে শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, মিডিয়া ও তথ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করছে এবং জনগণকে ভীত করে রাখছে। এসব আধুনিক বাস্তবতায়, হীরক রাজার প্রতীক একনায়কতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার আধুনিক রূপকে প্রতিফলিত করে।

শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রোপাগান্ডা : সিনেমায় সত্যজিৎ রায় শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে একটি তীক্ষ্ণ রূপক ব্যবহার করেছেন—'যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, আর তত কম মানে', যা আজকের সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

হীরকের রাজা প্রজাদের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। উদয়ন পণ্ডিতের মতো স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শিক্ষকদের তিনি শাস্তি দেন। কারণ তারা প্রজাদের মধ্যে সঠিক ও স্বাধীন জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চান। শিক্ষাব্যবস্থার এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজা নিশ্চিত করেন যে প্রজারা যেন সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করতে না পারে এবং শুধুমাত্র সেইসব শিক্ষা গ্রহণ করে যা রাজাকে সমর্থন করে। রাজা প্রজাদের ভুল প্রোপাগান্ডা শিখিয়ে তাদের মাথায় ঢোকান যে, তাদের স্বাধীনতা নেই, তারা কেবল রাজাকে মান্য করলেই সুখে থাকবে।

বর্তমান সময়েও অনেক দেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রোপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেক জায়গায় সরকার বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মতবাদ, বিশ্বাস বা রাজনৈতিক ধারণাকে প্রচার করে, যাতে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারা মেনে চলে। এর ফলে, শিক্ষাব্যবস্থা জ্ঞানের একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে না, বরং তা হয়ে ওঠে ক্ষমতার হাতিয়ার।

স্বাধীন চিন্তা দমনের প্রচেষ্টা—তখন ও এখন : সিনেমায় উদয়ন পণ্ডিতের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল মুক্তচিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে। তিনি ছাত্রদের যুক্তি, প্রশ্ন ও সমালোচনা করার ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন, যা একনায়ক হীরক রাজার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। রাজা শিক্ষকদের মস্তিষ্কধোলাই পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রজাদের শেখান যে যা রাজা বলবেন, তা-ই সত্যি এবং তাদের চিন্তার স্বাধীনতা কেড়ে নেন।

বর্তমান সময়ে অনেক দেশে শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত না করে বরং প্রিস্ক্রাইবড তথ্য ও ধারণা শেখানো হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রশ্ন করা, সমালোচনা করা বা বিকল্প চিন্তাভাবনা অনুপ্রাণিত করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট নিয়ম, মতবাদ বা প্রোপাগান্ডা গ্রহণ করতেই উৎসাহিত করা হয়। এর ফলে, শিক্ষার্থীরা ক্ষমতা বা শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা হারায় এবং সমালোচনামূলক চিন্তার অভাব তৈরি হয়।

মিডিয়ার ভূমিকা ও শিক্ষার প্রকৃতি : সিনেমায় রাজা কেবল শিক্ষাব্যবস্থা নয়, প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমও নিয়ন্ত্রণ করেন। উদয়ন পণ্ডিত যখন প্রজাদের মুক্তি দিতে চান, তখন রাজা তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র

করেন। জনগণকে প্রকৃত ঘটনা থেকে দূরে রাখার জন্য রাজা নানা কৌশলে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেন।

আজকের বাস্তবতায়, গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থা যখন মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুল তথ্যের শিকার হয়, তখন শিক্ষার্থীরা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। আধুনিক শিক্ষার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হল সঠিক ও ভুল তথ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা। অনেক ক্ষেত্রে, প্রোপাগান্ডা এতটাই শক্তিশালী হয় যে শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের সমালোচনা ছাড়াই তা মেনে নেয়।

চিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ রোধ : সিনেমায় রাজা শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা দমিয়ে রাখেন। তিনি চান যে তারা কেবল তাকে মান্য করবে এবং কোনো ধরনের নতুন চিন্তা বা উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে ভাববে না। উদয়ন পণ্ডিত যখন স্বাধীন চিন্তা শেখাতে চান, তখন রাজা তাকে বন্দী করেন, কারণ তার মুক্ত চিন্তা রাজত্বের স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়ও অনেক সময় এমনটা দেখা যায়, যেখানে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা হয় না। বরং তাদের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে পড়াশোনা করতে বাধ্য করা হয়। পরীক্ষার মানদণ্ড বা নির্দিষ্ট সিলেবাস শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র তথ্য মুখস্থ করে বা নির্দিষ্ট উত্তর শিখে নেয়, কিন্তু নতুন কিছু ভাবার বা সৃজনশীল ধারণা বের করার সুযোগ পায় না।

শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যের অপব্যবহার : শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা ও জ্ঞানার্জনের পথ দেখানো। কিন্তু 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় দেখা যায়, রাজা শিক্ষাকে তার ক্ষমতা বজায় রাখার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তিনি প্রজাদের অজ্ঞতা ও মিথ্যা বিশ্বাসের মধ্যে আটকে রাখতে চান, যাতে তারা তার বিরুদ্ধে কোনোদিনও বিদ্রোহ করতে না পারে।

আজকের পৃথিবীতেও অনেক জায়গায় শিক্ষাকে শাসকগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের উন্নয়ন, মানুষের চিন্তা ও মানবিকতার বিকাশ। কিন্তু অনেক সময় তা ভুল প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে মানুষকে শাসন করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রূপক আলোচনা আজকের সময়ের বাস্তবতায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বর্তমান সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রোপাগান্ডার সংমিশ্রণে যেভাবে কোথাও কোথাও স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তচিন্তাধারা দমন করা হচ্ছে, তা সমাজের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। সিনেমাটি দেখিয়ে দেয় যে, শিক্ষা যদি মুক্ত চিন্তা,

প্রশ্ন করার অধিকার এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত না করে, তাহলে তা সমাজকে শুধু অন্ধভাবে শাসনের পথে নিয়ে যেতে পারে।

মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দমন : 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে রাজা সবকিছুকে নিজের ইচ্ছেমতো চালিত করেন এবং জনগণের কোনো অধিকার বা স্বাধীনতা নেই। আজকের বিশ্বে অনেক স্থানে একইভাবে মানবাধিকার হরণ ও জনগণের উপর দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নাগরিকরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : হীরকের রাজা প্রজাদের উপর চাপিয়ে দেন নানা রকমের অর্থনৈতিক অসুবিধা এবং সমস্ত ধনসম্পদ নিজে ভোগ করেন। বর্তমানেও অনেক স্থানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, করপোরেট শক্তির প্রভাব এবং ধনী ও গরিবের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত তীব্র। 'হীরক রাজার দেশে' এই অর্থনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্যকে রূপকভাবে উপস্থাপন করে, যা বর্তমানের বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

বিপ্লবের বার্তা : সিনেমার শেষাংশে, প্রজারা একত্রিত হয়ে হীরক রাজার শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তাকে পরাজিত করে। এটি অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের গুরুত্ব এবং জনগণের শক্তির প্রতীক। বর্তমান বিশ্বেও জনগণের আন্দোলন এবং প্রতিবাদ শাসকদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন করে সিনেমার উদয়ন পণ্ডিত শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে জাগ্রত করেন, তেমনই আজও শিক্ষিত, সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াইয়ে সামিল হয়।
শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশার চিত্র : সিনেমায় সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা এবং তাদের শোষণকে রূপক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই সিনেমায় হীরক রাজ্যের শ্রমিকরা কেবল শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত নয়, তারা বুদ্ধি ও মনের দিক থেকেও একধরনের দাসত্বের শিকার।

শ্রমিকদের শোষণ ও অধিকারহীনতা : 'যায় যদি যাক প্রাণ, হীরকের রাজা ভগবান'—সিনেমার শুরুতেই দেখা যায়, রাজ্যের শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে খনি থেকে হীরে তোলার কাজে ব্যস্ত। তাদের কাজ শারীরিকভাবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হলেও তারা রাজাকে ভীষণ ভয় পায় এবং কোনো ধরনের প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না। শ্রমিকদের মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এতটাই গেঁথে গেছে যে তারা নিজের কষ্ট বা শোষণের ব্যাপারে একদম চুপ থাকে। রাজার ক্ষমতা এবং তার শাসনব্যবস্থার প্রভাব তাদের উপর এতই গভীর যে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বা সচেতন হলেও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই।

এই দাসত্বমূলক পরিস্থিতি প্রাচীন রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের শোষণের প্রতীকী চিত্র তুলে ধরে। যেখানে শ্রমিকরা তাদের

অধিকার সম্পর্কে হয় জানে না, নয়তো জানলেও সেই অধিকার আদায় করার ক্ষমতা বা সুযোগ তাদের নেই।

মানসিক ও চিন্তার দাসত্ব : 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় শ্রমিকদের শুধুমাত্র শারীরিকভাবে নয়, মানসিক ও চিন্তার দিক থেকেও বন্দী করে রাখা হয়েছে। রাজা তার শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রচারণার মাধ্যমে প্রজাদের এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, যাতে তারা শুধুমাত্র রাজার আদেশ পালন করে এবং কোনো ধরনের প্রশ্ন বা বিদ্রোহ করার সাহস না করে। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে রাজা শ্রমিকদের মস্তিষ্কধোলাই করেন, যাতে তারা নিজেদের কষ্ট বা দুর্দশার বিষয়ে চিন্তা করতে না পারে।

এটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশ প্রাসঙ্গিক, যেখানে শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা, সামাজিক নীতি বা শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের শোষণের ব্যাপারে সচেতন হয় না বা সচেতন হলেও তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ থাকে না। তারা একধরনের ভয়ের সংস্কৃতিতে আটকে থাকে।

মুখ বন্ধ রাখার আদেশ : সিনেমায় একটি বিখ্যাত দৃশ্যে রাজা তার প্রজাদের মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেন। প্রজাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে তারা কেবলমাত্র রাজার আদেশ শুনে চলতে বাধ্য। এটি শ্রমিকদের অধিকারহীনতা ও তাদের কণ্ঠহীনতার প্রতীক। এই মুখ বন্ধ রাখা শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, যারা শোষণ এবং অন্যায় সহ্য করে কণ্ঠহীন থেকে যায়। তারা কোনো পরিস্থিতিতেই রাজা বা শাসকের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না, কারণ তারা জানে যে বললেই শাস্তি পেতে হবে।

বর্তমান সময়েও অনেক জায়গায় শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরা তাদের কষ্ট ও অধিকারহীনতার বিষয়ে কথা বলতে পারে না। তারা বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় এবং অনেক সময় রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক শক্তির মাধ্যমে তাদের কণ্ঠরোধ করা হয়।

শ্রমিকদের বিদ্রোহ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা : সিনেমার শেষ দিকে দেখা যায়, উদয়ন পণ্ডিত এবং তার ছাত্ররা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এটি শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, যেখানে তারা তাদের কষ্ট ও শোষণের অবসান চায়। এই বিদ্রোহ একটি প্রতীকী বিদ্রোহ, যা সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার, শোষণ এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করে। উদয়ন পণ্ডিতের শিক্ষাদান এবং তার মুক্তচিন্তা শ্রমিকদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, যা তাদের দীর্ঘদিনের শোষণ ও দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ দেখায়।

এই বিদ্রোহ বর্তমান সময়েরও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীক, যেখানে শ্রমিকরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করে এবং শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যদিও তারা প্রথমে দুর্বল ও ভীত থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য একত্রিত হয়।

'হীরক রাজার দেশে' আজকের সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি অত্যাচারী শাসন, শিক্ষাব্যবস্থার অবক্ষয়, গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে। সত্যজিৎ রায়ের এই চলচ্চিত্রটি একদিকে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক, তেমনি এটি আজকের বিশ্বের দমনমূলক শাসন ও অত্যাচারী ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার ব্যঞ্জনাকেও প্রতিফলিত করে।

তথ্য-সহায়ক:
হীরক রাজার দেশে, পরিচালক সত্যজিৎ রায়, সিনেমা প্রদর্শন, youtube link-
https://www.youtube.com/watch?v=Xjyh0O0XIs&ab_channel=Bengali
MovieswithEnglishSubtitle

হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র : শিশুচরিত্র গঠনে নৈতিক শিক্ষা ও জীবনের পাঠ

রতন রায়
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ,
নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়, হলদিবাড়ী

সারসংক্ষেপ : 'নয়তি ইতি নীতি:' অর্থাৎ যা সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে তাই নীতি। নীতি এর অর্থ ব্যাপক হলেও, নীতি শাস্ত্র বলতে আমরা হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্রকে বুঝি। প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষায় নীতি বা মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণান কমিশনের মতে - "When there is an empty space in the souls of man, superstitions fill the void, Belief in absolute values seems to be a condition of life". অর্থাৎ মানুষের মনের গভীরে যখন শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তখনই কুসংস্কার দানা বাঁধে। চিরন্তন মূল্যবোধে বিশ্বাস জীবনেরই অঙ্গ বিশেষ।"

যেহেতু ব্যক্তির আচরণের মধ্যেই তার মূল্যবোধের প্রকাশ প্রতিভাসিত হয়, সেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে সেই ভিত্তিতে ব্যক্তির মূল্যবোধকে বিভিন্ন মাত্রায় বিচার করে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের রীতি প্রচলিত আছে। যেমন- অর্থনৈতিক, জৈবিক, সামাজিক, সৌন্দর্য বৌদ্ধিক, ধর্মীয় ও নৈতিক।

ভূমিকা : প্রাচীনকাল থেকেই এই গল্প-কথা সংস্কৃত সাহিত্যের জগৎ জুড়ে বিস্তৃত। বৈদিক কালে- সরমা-পণি সংবাদ (১০/১০৮ /১১ নং সূক্ত) যেখানে সরমা নামে শুন, পণিকে উপদেশ দান করেন। উপনিষদে আধ্যাত্ম্য তত্ত্ব বা নৈতিক উপদেশ কিংবা মহৎ জীবনাদর্শ সম্পর্কে নানান গল্প দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১/১২, ৪/১/৫-৭) 'ইন্দুররাজ'ও কুকুর প্রধান ইত্যাদি জীবজন্তুর গল্প পাওয়া যায়। মহাভারতে 'শ্বান-কথা', হস্তী কচ্ছপ কথা মনু মৎস্য কথা প্রভৃতি নীতিকথা বিদ্যমান। চালক ও ধূর্ত বিড়াল কথা মহাভারতেই পাওয়া যায়। ৬৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বৌদ্ধের জাতক কথাতে বোধিসত্তম মৃগবানর ইত্যাদি জন্মের কথা বলেছেন। ৩৫টি জাতক কথা নিয়ে আর্য সত্য জাতক-মালা নামক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা নিবন্ধিত। শিশুদের জীবন শিক্ষায় নীতি উপদেশ দানে অপরিহার্য দুটি গল্প কথার নাম পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ।

সূচক/মূলশব্দ: শিশু, নৈতিকতা, কথা, বয়ঃসন্ধি, মৃগ, দৈত্য, সঞ্জীবক, ভেদ, হঠকারিতা, প্রত্যুৎপন্নমতি, মূর্খ, বায়স, মূষক, ধূর্ত।

মূল আলোচনা :

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শিশুকথা সাহিত্য বা গল্প কথা :

সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে কাব্যের ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলংকারীকদের মতে দৃশ্যত্ব ও শ্রব্যত্ব ভেদে কাব্য দু প্রকার--দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। দৃশ্য যথা নাটকাদি। শ্রব্য কাব্য দুই প্রকার গদ্য ও পদ্য। পদ্য আবার মহাকাব্য ও খন্ডকাব্য ভেদে দুপ্রকারের। কথা ও আখ্যায়িকা ভেদে গদ্য কাব্য দু প্রকারের।

অতএব গদ্য কাব্যের ভেদান্তর্গত কথা কাব্য। বন্দী গদ্য কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন --"অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্" অর্থাৎ পদ বা চরণবিহীন পদ সমষ্টির বিন্যাসকেই গদ্য কাব্য বলে। বিশ্বনাথ ও ছন্দোবদ্ধ পাদহীন বৃত্ত-বন্ধকে গদ্য আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন-- "বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"। এই গদ্যের অনেক প্রকার ভেদ - কথা, আখ্যায়িকা, পরি-কথা খণ্ডকথা, কথা-নিকা প্রভৃতি।

শিশুর নৈতিক বিকাশের সহায়ক গল্পকথার অন্তর্গত সুপ্রাচীন গল্পগ্রন্থ যা বিশ্ব সাহিত্যে ও নিজ গুনে স্থান করে নিয়েছে তা হল - বিষ্ণু শর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্র ও পঞ্চতন্ত্রের অনুসরণে রচিত পন্ডিত নারায়ণ শর্মার হিতোপদেশ গ্রন্থ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্প কথার বহু উদাহরণ সম্মুখে প্রতিফলিত হলেও শিশুদের অত্যন্ত উপযোগী বা বাল সাহিত্যরূপে খ্যাত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ নামক গল্পগ্রন্থকে আলোচ্য গ্রন্থে নির্বাচন করা হল। পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ সর্বজনবিদিত হলেও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উল্লেখ করা হল। বিশ্বসাহিত্য দরবারে সুপ্রসিদ্ধ ও পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা বিষ্ণু-শর্মা। চাণক্যের অপর নাম বিষ্ণু শর্মা অনেক বিদ্বান এই নীতিতে বিশ্বাস করেন পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা ও চাণক্য এক ব্যক্তি।

পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ শতকে রচিত বলে পণ্ডিত কীথ মহাশয় স্বীকার করেন। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী লোকপ্রসিদ্ধ বলে সকলেই অবগত যে মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিন মূর্খ পুত্রকে স্বল্পকালে নৈতিক, ধার্মিক এবং ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা। মূল গল্পের সাথে বহু ছোটগল্পের সন্নিবেশ হয়েছে, এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। গল্পের শেষে নীতি পাঠকের জ্ঞানোপলব্ধে সহায়ক। মূল গ্রন্থটি পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত -- মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ এবং অপরীক্ষিতকারক। এই বিষয়ের রচয়িতার স্ব উক্তি

"সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্।।"

গদ্যাকারে বর্ণিত এই গ্রন্থের নীতি উপদেশ পদ্যাংশে রচিত। এই গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য গল্পগুলি পশু পাখির চরিত্রে রূপায়িত ও ভাষা সহজ সরল প্রাঞ্জল। বহু কঠিন রাজনৈতিক নীতিকে তিনি খুব সহজ ভাষায় পশু পাখির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের সূক্ষ্ম- তত্ত্ব তার নিকটে বিফল হয়ে পড়ে।

উল্লেখযোগ্য অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য :
উনবিংশ বিংশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নতুন রূপে সজ্জিত করেছে নিজেকে। নতুন রূপে সজ্জিত হলেও অঙ্গের পরিবর্তনে যথা অঙ্গী অপরিবর্তনীয় থাকে তথা অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আত্মাও অপরিবর্তনে রয়েছে।

অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যাকাশ নব নব রচনার আলোকে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। সে উজ্জ্বল আলোক ধারা বিশ্ব সাহিত্য দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যকে অভিনব স্থান দান করে। সেই আলোক ধারার অঙ্গরুপ সরল মতি শিশুদের উদ্দেশ্যে বিরচিত 'বালকথা' ও 'বাল নাট্য'। শিশুদের উদ্দেশ্য করে রচিত হলেও সকল বয়সের উপযোগী। বাল সাহিত্যে অর্বাচীন বহু কবিগণ কাব্য রচনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামকিশোর মিশ্রের 'বাল সাহিত্যম্', সম্পদানন্দমিশ্রের 'হাস্যমঞ্জরি', সুকান্ত কুমার সেনাপতির 'সুকান্তকথাবিংশতি' প্রভৃতি।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ গল্পসমূহে নীতি শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
নারায়ণ শর্মার হিতোপদেশ নীতিমূলক গল্প সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্রের মতো এটি একটি উপভোগ্য গল্প সংগ্রহ। ৪৩ টি কথার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র থেকে ২৫ টি ও অন্যান্য স্থান থেকে ১৮ টি গল্প গৃহীত হয়েছে। নারায়ন শর্মা ছিলেন রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি। পাটলি পুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই নীতি গ্রন্থ রচিত হয়।

এটি মিত্রলাভ, সুহৃদভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় বিভাগ, ঘটনা বিন্যাস, রচনারীতি প্রভৃতি বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণ চিহ্ন স্পষ্ট হলেও নারায়ণ শর্মার নিজস্ব বৈচিত্র্য এতে যোজনা করেছেন। বেশ দক্ষতার সঙ্গে তিনি গল্পের আকর্ষনীয়তা ও গতিবেগ বাড়িয়ে তুলেছেন। এতে নীতিশ্লোকের বাহুল্য লক্ষণীয়। বহু শ্লোক নীতিসার থেকে নেওয়া।

এর গল্প গুলি বালক বালিকার কল্পনা রাজ্য এক মায়ার আবেশ সৃষ্টি করে। গোদাবরী তীরের বিশাল শালস্মলি তরু, মন্দার পর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ, কল্যাণকটকের ভৈরব ব্যাধ, চম্পকবতী অরণ্যানীর মৃগকাকশৃগাল এমন অনেক গল্পই শিশু মনে পুলক জাগায়। নানা গুনে সমৃদ্ধি হেতু হিতোপদেশের খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত। এটির রচনাকাল খ্রিষ্টীয় ১০ম শতক থেকে ১৪শ শতকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়, গল্পের উপদেশ গুলি বালক বালিকার জীবনে চলার পথে নিত্য কাজে লাগে।
মিত্র লাভা (বন্ধু লাভ – বন্ধু জয় করা সম্পর্কিত গল্পের সংগ্রহ।

অপরীক্ষিতকারাকম্ (চিন্তা না করেই কাজ করা) – অদূরদর্শিতার কারণে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হারিয়ে যায় সেই সম্পর্কিত গল্পের সংগ্রহ। লব্ধপ্রণাশম্ (লাভের ক্ষতি)– কোনওকিছু হারিয়ে না ফেলে কঠিন পরিস্থিতি থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে হয় সেই সম্পর্কিত গল্পের সংগ্রহ।

কোলূকিয়ম্ (কাক এবং পেঁচা) – যুদ্ধ এবং শান্তির বিধি এবং কৌশল সম্পর্কে গল্পের সংগ্রহ।

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ থেকে—

বানর চটক দম্পতি কথা : একদিন সম্পূর্ণ দিবস ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, একবনে শমী গাছের উঁচু ডালে বাসা ছিল একজোড়া চটক-চটকীর। মজবুত বাসা হওয়ায় তারা প্রাণে বেঁচে গেল। সেই গাছের নিচে বৃষ্টির জলে সিক্ত রত এক বানর আর শৈত্যে কাঁপুনি হচ্ছিল তার। এই দেখে চটকীর বড় কষ্ট হলো।

তাকে না ভিজে নিজের বাসায় যাবার পরামর্শ দেয় চটকি। পরামর্শ শুনে বানর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চটকিকে নিজের বাসায় চুপ করে থাকতে নির্দেশ দেয় সে। চটকি বলে 'মানুষের মতো হাত-পা থাকতেও বাসা বাঁধতে পারেনি? আমরা ঠোঁট দিয়ে যা পারি তাও পারো না তুমি।' চটকিকে আবার বলে 'সে বাসা না করলে চটকির কি তাতে।' চটকি বিরক্ত হয়ে বলে 'তবে ভিজে মোর।'

বানর ভীষণ রেগে বলে তোর অনেক অহংকার হয়েছে দ্রুত গাছে ওঠে চটকদের অতি কষ্টের বাসাটা ভেঙে দিল। চটক দম্পতির কষ্টের সীমা রইল না।

নীতিকথা :

মূর্খকে উপদেশ প্রদান সর্বদা অহিতকর হয়ে থাকে। মূর্খকে উপদেশ প্রদানে সেই মূর্খ উপদেশ দাতার ক্ষতিসাধনে প্রয়াসী হয়ে পরে। ফলত পরিণাম হয় ভয়ংকর। অতএব মূর্খকে উপদেশ প্রদান করা অনুচিত।

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রপ্রাপ্তি থেকে --

লঘুপতনক- চিত্রগ্রীব-হিরণ্যক-চিত্রাঙ্গ-মন্থরক কথা :

চিত্রগ্রীব কপোতদের রাজা ও হিরণ্যক ইঁদুরের রাজার মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। লঘুপতনক নামক বায়স তাদের বন্ধুত্ব লক্ষ্য করে হিরণ্যকের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। কিন্তু হিরণ্যকের মতে ভক্ষ্য-ভক্ষকের বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। লঘুপতনক বহুভাবে হিরণ্যকের বন্ধুত্ব পাওয়ার আশায় তার প্রশংসা করে, অবশেষে তাদের বন্ধুত্ব হয়। একদা তাদের খাদ্যের অভাব দেখা দিলে হিরণ্যকের অপর বন্ধু কচ্ছপ মন্থরকের খোঁজে দুবন্ধু রওনা দেন।

তাদের অপর সখা চিত্রাঙ্গ নামক হরিণ ব্যাধের হাত থেকে বাঁচতে তাদের শরণাগত হয়। তারা এক সরোবরে আশ্রয় নেন, কিন্তু দ্বিগবিজয়ে আগত রাজার হাত থেকে বাঁচতে সেই স্থানও ত্যাগ করতে হয়। সখাদের নিষেধ অমান্য করে মন্থরকও তাদের সাথে স্থলপথে রওনা দেয়। মন্থরক কে দেখতে পেয়ে এক ব্যাধ তাকে হাতে তুলে নেয়।

অপর বন্ধুরা তাকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করে। চিত্রাঙ্গ জলাশয়ের ধারে মৃতবৎ পরে থাকবে, মৃত ভেবে লঘুপতনক তার ওপর বসে থাকবে। ব্যাধ তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত নয়, তাই মৃত হরিণকে ধরতে গেলে হিরণ্যক ব্যাধের দড়ি

কেটে দিয়ে মন্থরককে মুক্ত করে। মুক্ত-মন্থরক জলাশয়ে গমন করে। মৃত হরিণের কাছে না পৌঁছাতেই সেও পালিয়ে যায়। ব্যাধের অতি লোভে কচ্ছপ বা হরিণ কোনটাই পাওয়া হয় না। অনুশোচনায় তার দিন কাটে।

নীতিকথা :

প্রকৃত বন্ধু সেই হতে পারে যে বন্ধুকে বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগেও পিছপা হয় না।

" উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।। "

আবার অন্যদিকে ব্যাধের চরিত্র থেকে ধরা পড়ে তার লোভ, তথা চিন্তা না করে কার্য করার প্রবণতা।–

"যো ধ্রুবানি পরিত্যাজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে।
ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি।। "

নীতিশিক্ষা:

উক্ত গল্পে কপোত- মূষিক -বায়োস-হরিণ কূর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি প্রাণী স্বভাব গত দিক থেকে একে অপরের থেকে বিজাতীয়। কিন্তু প্রাণ রক্ষার্থে একে অপরের সহায়তা করেছে। উক্ত প্রাণীরা ভালো চরিত্রের। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। উক্ত গল্প থেকে অপরের প্রতি ভালোবাসা,সহানুভূতিশীল সম্মান এবং বিপদে বন্ধুকে ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো রূপ নীতিশিক্ষা শিশুদের জন্য প্রাপ্য।

হিতোপদেশের মিত্রলাভ থেকে –

বৃদ্ধব্যাঘ্র-লুব্ধবিপ্র কথা : দক্ষিণারণ্যে একদা এক বুড়ো বাঘ স্নানের পরে হাতে কুশ নিয়ে সরোবরের তীরে বসে পথিকদের ডেকে বলতে থাকে- পথিকেরা শুনুন, সোনার কাঁকন নিয়ে যান। কোন এক পথিক লোভে পড়ে, জীবনের সংশয় আছে ভেবেও, অনিষ্ট বস্তু থেকে ইষ্ট লাভের চেষ্টায় বাঘের কাছে আসে। বাঘ তার থাবা দেখিয়ে বলে এতে কাঁকন আছে। কাঁকন নেওয়ার আগে পথিককে সামনের সরোবর থেকে স্নান করে আসতে বলে। বোকা পথিক লোভে পরে বাঘের কথায় বিশ্বাস করে সরোবরের স্নান করতে যায় এবং গভীর পাকের জলে আটকে পরে। সেই পাক থেকে বেরিয়ে আসার অনেক চেষ্টা করলেও সফল হয় না। দুরাত্মা বাঘ বলে আমি নিয়ে আসি তোমায়। পথিকভাবে দুরাত্মা ধর্মচারণ করছে তা বিশ্বাসের কারণ হতে পারে না। পাকে আবদ্ধ পথিককে বৃদ্ধ বাঘ অতি সহজেই ভক্ষণ করে।

নীতিকথা :

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম মনকে বশে রাখতে অসমর্থ হলে মানুষ ষড়রিপুতে আক্রান্ত হয়ে পরে। এর ফলে সহজেই বিপদগ্রস্ত হয়ে সেই ব্যক্তির বিনাশ হয়। এই ষড়রিপুর অন্যতম লোভ, যার কবলে মানুষ মনুষত্ব জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। নিজের বিপদেও তার

জ্ঞান থাকে না জ্ঞানের উদয় হলেও ফিরে আসার অন্তিম ক্ষণ অতিক্রম হয়ে পড়ে। তাই লোভ থেকে নিজেকে দূরে রাখাই শ্রেয়।

"অনিষ্টাদিষ্ট লাভেঽপি ন গতির্জায়তে শুভা।
বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পথিকঃ সঃ মৃতো যথা।। "

লুব্ধদের বশে আনার বিষয়ে চাণক্য সংগ্রহে বলা হয়েছে –

" লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্মনা।"

নীতি শিক্ষা :

লুব্ধ পথিকের মধ্যে সহনশীলতার অভাব লক্ষণীয়, তাই কঙ্কনের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

" তত লোভাঽঽকৃষ্টেন কেনেচিতপান্থেনাঽঽলোচিতং।"

বৃদ্ধ বাঘটি শিকার করতে অসমর্থ হলেও খাদ্যান্বেষনের জন্য সে শ্রমবিমুখ হয়ে পড়েনি। বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে খাদ্যের ব্যবস্থা করে।

" অদত্র সরসি স্নাধা সুবর্ণকঙ্কণং গৃহাণ্। "
মহাপঙ্কে পতিতোঽসি অতস্ত্বামহমুৎথাপয়ামিত্যুক্ত্বা--।"

সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমূলক গ্রন্থ : শিশুশিক্ষায় নীতি ও মূল্যবোধের শিক্ষা অনস্বীকার্য। সেই কার্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান উল্লেখনীয়। প্রাচীন ভারতের ব্যবহারিক জীবন এবং রাজধর্ম প্রভৃতি নীতি-ভিত্তিক ছিল। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে নীতিকথা থাকলেও নীতি অবলম্বনে পৃথক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে চাণক্য নীতি ও ভর্তৃ-হরির শতকত্রয় সুপ্রসিদ্ধ। এছাড়াও ভল্লটের শতক, সদানন্দের নীতিমালা, শম্ভু রাজের নীতিমঞ্জরী,বেঙ্করায়ের নীতিমালা, ঘটকর্পরের নীতিসার, স্বামী দয়ানন্দের নীতিচন্দ্রিকা , সুন্দরাচার্যের নীতিশতক, সোমদেবসূরির নীতিবাক্যামৃত। প্রভৃতি গ্রন্থ নীতি উপদেশে পূর্ণ।

এই সমস্ত গ্রন্থ নীতি আলোচনায় পূর্ণ হলেও কাঠিন্য বহুল রচনা শিশুদের বোধগম্যে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে সরল শিশু মনে নীতি- উপদেশদানের উদ্দেশ্যে পন্ডিতগণ বহু গল্প-কাহিনী রচনা করেছেন। এই গল্প কাহিনীর মূল চরিত্রগুলি বিভিন্ন পশু -পাখি দৈত্য দানব ও নানা ধরনের পেশার মানব হওয়ায় তা অতি সহজেই শিশু মনে স্থান করে নিতে পারে। এর নীতি উপদেশ শিশুরা জীবনে চলার পথে প্রতিক্ষেত্রে স্মরণে রাখে।

পঞ্চতন্ত্রে নৈতিক গল্পগুলি পশু-ভিত্তিক কল্পকাহিনীগুলির অন্যতম জনপ্রিয় সংগ্রহ। মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এই উপকথাগুলির প্রতিটির একটি সম্পর্কিত নৈতিকতা রয়েছে। এই গল্পগুলি হালকা, রঙিন এবং উপযুক্ত, এমনকি ছোট বাচ্চাদের জন্যও, এবং মূল্যবান পাঠ প্রদান করে যা তাদের মনে চিরকাল থাকে। পঞ্চতন্ত্রের ৫টি খণ্ড জুড়ে ২০০টিরও বেশি আকর্ষণীয় প্রাণী উপকথা, উপমা এবং কাহিনী ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে আইকনিক গল্পে কুমির, বানর, সিংহ, ইঁদুর, সাপ এবং অন্যান্যদের

মতো প্রাণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গল্পের অন্তর্নিহিত বিন্যাস গল্পের সংখ্যাকে আরও বহুগুণ করে। পঞ্চতন্ত্র গল্পের মূল বিষয়বস্তু এবং পাঠের মধ্যে রয়েছে: প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, সততা, বন্ধুত্ব এবং কৃতজ্ঞতার গুণাবলী; অজ্ঞতা, অহংকার এবং বেপরোয়াতার বিপদ; শাসন, রাষ্ট্রযন্ত্র, সম্পর্ক এবং কূটনীতি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান। বিনোদন এবং জ্ঞানের মিশ্রণ এই পাঠগুলিকে শোষণ করা, মনে রাখা এবং প্রয়োগ করা সহজ করে তোলে।

এটি মিত্রলাভ, সুহৃদভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় বিভাগ, ঘটনা বিন্যাস, রচনারীতি প্রভৃতি বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণ চিহ্ন স্পষ্ট হলেও নারায়ণ শর্মার নিজস্ব বৈচিত্র্য এতে যোজনা করেছেন। বেশ দক্ষতার সঙ্গে তিনি গল্পের আকর্ষনীয়তা ও গতিবেগ বাড়িয়ে তুলেছেন। এতে নীতিশ্লোকের বাহুল্য লক্ষণীয়। বহু শ্লোক নীতিসার থেকে নেওয়া।

এর গল্প গুলি বালক বালিকার কল্পনা রাজ্য এক মায়ার আবেশ সৃষ্টি করে। গোদাবরী তীরের বিশাল শালম্মলি তরু, মন্দার পর্বতের দুর্দান্ত নামক সিংহ, কল্যাণকটকের ভৈরব ব্যাধ, চম্পকবতী অরণ্যানীর মৃগকাকশৃগাল এমন অনেক গল্পই শিশু মনে পুলক জাগায়। নানা গুনে সমৃদ্ধি হেতু হিতোপদেশের খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত। এটির রচনাকাল খ্রিষ্টীয় ১০ম শতক থেকে ১৪শ শতকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়, গল্পের উপদেশ গুলি বালক বালিকার জীবনে চলার পথে নিত্য কাজে লাগে।

ব্যক্তিগত মতামত :

হিতোপদেশএবং পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে উদ্ভূত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি সংকলন যা আজও শিশু সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এদের মধ্যে থাকা নৈতিক শিক্ষা, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক, এবং বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গল্পগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান সময়েও এই সাহিত্যগুলোর উপযোগিতা অপরিসীম।

হিতোপদেশ একটি নীতিগত গ্রন্থ যা বিভিন্ন ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। প্রতিটি গল্পের শেষে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক শিক্ষা তুলে ধরা হয় যা শিশুদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে, যখন শিশুদের নৈতিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তখন হিতোপদেশের গল্পগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক।

পঞ্চতন্ত্র মূলত প্রাণীদের নিয়ে গল্পের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার প্রচার করে। প্রতিটি গল্পের মধ্য দিয়ে কোনো না কোনো শিক্ষামূলক বার্তা দেওয়া হয়, যা শিশুদের মধ্যে কৌশলী চিন্তাভাবনা, বিচক্ষণতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়ক। আধুনিক সমাজে, যেখানে শিশুরা প্রযুক্তির আধিক্যের কারণে অনেক সময় বাস্তব জীবনের শিক্ষাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে, পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি তাদের জীবনের মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করতে পারে।

বর্তমান সময়ে উপযোগিতা:

বর্তমান সময়ের শিশুদের নৈতিক শিক্ষা, ধৈর্য, এবং বুদ্ধিমত্তা বাড়ানোর জন্য হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র অত্যন্ত উপযোগী। ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যমের যুগে, যেখানে শিশুরা সহজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের মধ্যে পড়তে পারে, এই প্রাচীন সাহিত্যগুলো তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া, হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো সহজ ও মজাদার হওয়ায়, শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়।

উপসংহারে, হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলো তাদের নৈতিক ও শিক্ষামূলক দিকগুলোর জন্য আজও প্রাসঙ্গিক এবং শিশু সাহিত্যে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিশীলিতা গ্রন্থানুক্রমণী :

১. পঞ্চতন্ত্রম্ (বিষ্ণুশর্মা প্রণীত) প্রো, বালশাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশনী, বারাণসী, ২০১৩(সংস্করণ)।

২. যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ (রবীন্দ্রকুমার পন্ডা বিরচিত) - রবীন্দ্রকুমার পন্ডা সম্পাদিত, অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ , গুজরাত, ২০১০(প্রথম সংস্করণ)।

৩. হিতোপদেশঃ (নারায়ণ শর্মা বিরচিত)- প্রো. বালশাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশনী, বারাণসী,২০১৫(সংস্করণ)।

৪. হিতোপদেশ(নারায়ণ শর্মা বিরচিত)- সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১২(চতুর্থ সংস্করণ)।

৫. হাজরা, ডঃ নীরদবরণ-'পঞ্চতন্ত্র সমগ্র' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭(চতুর্থ সংস্করণ)।

৬. রায়, সুশীল-'শিক্ষা মনোবিদ্যা', কলকাতা, ২০১৬(অষ্টাদশ সংস্করণ)।

৭. উৎফুল্লম্ অন্তরঙ্গম্ (জনার্দন হেগডে বিরচিত) - জনার্দন হেগডে সম্পাদিত, সংস্কৃত ভারতী, বেঙ্গালুরু, ২০১৩ (প্রথম মুদ্রণ)।

৮. বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ --'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ)।

৯. রায়, সুশীল - 'শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬ (বিংশ সংস্করণ)।

১০. গোপ, যুধীষ্ঠীর - --'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস',সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪০৭(প্রথম সংস্করণ),২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ)।

হাসান আজিজুল হকের নির্বাচিত গল্পে মনস্তত্ত্ব

আলোকপর্ণা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : হাসান আজিজুল হক মূলত দেশভাগ ও দেশভাগোত্তর জনজীবনের এক বৃহত্তর পরিসরকে তাঁর লেখায় উপস্থিত করলেও, মানবমনের গোপন তলদেশকে কখনই উপেক্ষা করে যাননি। ক্ষুদ্রতর পরিসরেও মানবমনের সূক্ষ্ম টানাপড়েনগুলিকে তিনি তুলে ধরেছেন তার বেশ কিছু গল্পের মধ্য দিয়ে। তারই মধ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচটি গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, লেখক কীভাবে দেখিয়েছেন মানুষের প্রেমের অসহায়তা, মানসিক জটিলতা, ঈর্ষা, কৈশোরকালীন দেহচেতনা, বিকৃতি ও অবসাদ। বিভিন্ন মানুষের মনের বিভিন্ন পরত, যা হয়তো তাদের গ্রাস করছে প্রতিনিয়ত, লেখক এক নিপুণ দক্ষতায় পাঠকের সামনে তা উপস্থিত করেছেন যা পাঠককে অবাক করে। লেখকের লিপিকৌশল যেন গল্পের চরিত্রগুলির মনকে পাঠকের সঙ্গে একাত্ম করে দেন।
সূচক/ মূল শব্দ (Key Words) : মনস্তত্ত্ব, উত্তর বসন্তে, একটি আত্মরক্ষার কাহিনী, মন তার শঙ্খিনী, সারাদুপুর, কিশোর মনস্তত্ত্ব, মানসিক টানাপড়েন।

মূল আলোচনা :
বিখ্যাত লেখক হাসান আজিজুল হক নিজের লেখনীতে ধরেছেন একটি অস্থির সময়কে। তিনি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, কিন্তু সমধিক পরিচিত হয়েছেন উপন্যাসকার ও গল্পকার হিসেবে। তিনি হয়তো খুব বেশি সংখ্যক গল্প লেখেননি, কিন্তু তারই মধ্যে তিনি দেশ-কাল-সমাজ ও মানবমনের এক বিরাট পরিসরকে বিশ্লেষণ করতে এবং তাঁর বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরতকে উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যেমন তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তুলে এনেছেন শ্রেণীসমস্যা, দারিদ্র্য, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনচর্যা, ঠিক তেমনই তিনি তাঁর ছোটগল্পে মনস্তত্ত্বকেও তুলে এনেছেন। হাসান আজিজুল হক যেহেতু নিজে একজন সামাজিক দায়বদ্ধ লেখক, তাই তাঁর ছোটগল্পগুলির পরতে পরতে তিনি পাঠকের কাছে তাঁর এই সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশই করে চলেন অনন্য প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে। এবং সমাজের সঙ্গে মানুষ আর মানুষের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব যেহেতু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই ছোটগল্পে মানুষের সূক্ষ্ম, জটিল, অসহায় মানসিক টানাপড়েনকে তুলে আনাও একপ্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা বলা যেতেই পারে। হাসান আজিজুল হকের পাঁচটি নির্বাচিত গল্প আলোচনার মাধ্যমে সেই দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। গল্পগুলি হল- ‘উত্তর

বসন্তে', 'সারাদুপুর', 'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী', 'একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে', 'মন তার শঙ্খিনী'।

'উত্তর বসন্তে' গল্পটি একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। গল্পের মুখ্যচরিত্র বাণী নামের মেয়েটি। তাঁরা যে ঝুলকালি পড়া, জর্জর, প্রায় ভেঙে ধ্বসে পড়া বাড়িটিতে থাকে, কাহিনির আবর্তনের সঙ্গেই বোঝা যায় যে বাড়ির প্রতিটি মানুষের মনও কিন্তু বাড়িটির মতোই দমবন্ধ করা আর প্রায় ভেঙে পড়া। কাহিনির সূচনায় বাণীকে দেখে বোঝা না গেলেও কাহিনির আবর্তনে বোঝা যায় যে, বাড়ির সকলের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হলেও বাণীর মনই সবচেয়ে বেশি ধ্বস্ত, জর্জর ও ক্লান্ত।এই ভাঙাচোরা মনকেই তাঁরা প্রতিনিয়ত বহন করে নিয়ে চলেছেন নিত্যদিনের কাজে। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিত্য যুদ্ধ করতে করতে আর মনে এক পর্বতপ্রমাণ ভার বহন করতে করতে তাঁদের মন থেকে আনন্দ নামক শব্দটিই হারিয়ে গেছে, জীবনের অতিরিক্ত কঠোরতা মানুষকে অনাবশ্যক কঠোর বানিয়ে দেয়, হয়তো কিছুটা জড়ও বানিয়ে দেয়, যার ছাপ পড়েছে মা ও রন্তুর অনাবশ্যক কাঠিন্যের মধ্যে আর টুকু ও বাণীর অনাবশ্যক জড়তার মধ্যে। এই গল্পে লেখক যেন প্রেমের মনস্তত্ত্ব উন্মোচন করতে করতে পাঠকের সামনে আরো যন্ত্রণাদায়ক এক পারিবারিক মনস্তত্ত্ব উন্মোচন করেন এক নিপুণ কৌশলে। বাণীর মনের প্রথম ঝলক পাঠক পান, যখন টুকু তাঁকে গনি নামক একটি তথাকথিত সামাজিকভাবে অসফল ছেলের লেখা একটি চিঠি দেয়। সেই চিঠিতে কোথাও প্রেম কথাটি নেই, কিন্তু এই চিঠি যেন অজান্তেই বাণীর মনকে এক ধাক্কা দেয়, তাকে মনে করায় এটা হয়তো প্রেমেরই চিঠি। এই পত্রের সূত্র ধরেই পাঠক দেখতে পান একটি প্রেমকাহিনি ও বাণীর অন্তর্লোককে। সেই প্রেমকাহিনির নায়ক-নায়িকা হল-বাণীর দিদি লিপি ও কবীর, যাদের প্রেমের প্রথম সাক্ষী তথা দর্শক ছিল বাণী। এই প্রেম যেন বাণীর নিজের মধ্যেই এক অদ্ভুত টানাপড়েনের সৃষ্টি করেছে। তারই সামনে সমবয়সী বাণী ও কবীরের প্রেম এক ঈর্ষার জন্ম দিয়েছে, সে ঈর্ষা আরো তীব্র হয়েছে যখন সে বুঝেছে কবীর তাঁর প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছে। "আমি আর কোনো কিছু জানি না"[১] এ যেন নিজের অশান্ত অনুভূতির কাছে পরাভূত হয়েই অনুভূতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা। কিন্তু কিশোরীবেলার সেই অনুভূতি আবার যখন ফিরে আসে ততদিনে দেশভাগের কারণে তাঁদের বাসাবদল হয়ে গেছে, লিপি এই পৃথিবী ছেড়ে অকালে বিদায় নিয়েছে আর বাণী হঠাৎ আবিষ্কার করেছে যে কবীর তাঁদের কলেজের নতুন প্রফেসর। কিন্তু লেখক যেন এবারের এই ঈর্ষাকে মিশ্রিত করেছেন অপরিসীম বেদনার সঙ্গে। যে বেদনার মুখোমুখি হতে চায় না বাণী আর বাড়ির কেউই। তা হল লিপির অকালপ্রয়াণের বেদনা। বাণী সেই উভয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই কবীরকে নিয়ে আসে তাঁর বাড়িতে, সেখানের দমবন্ধ পরিস্থিতি আর তিক্ত কটু চা যেন এই তিক্ত পরিবেশেরই প্রতিরূপ। আর তাঁকে সঙ্গে নিয়েই খুলে ফেলে সেই ঘর, যেখানে আছে লিপির স্মৃতি, যার মুখোমুখি হতে ভয় পান হতভাগ্য

পিতামাতা বা বাণী। সত্যই আমরা খারাপ স্মৃতির মুখোমুখি হতে চাই না কষ্টের ভয়ে। বাণীর বাবার "ও ঘরটা খুলল কে?"[২] এই চিৎকার যেন সেই ভয়মিশ্রিত যন্ত্রণা। আর বাণী আবারও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় স্মৃতির ও প্রেমের যুগপৎ বেদনায় যা তাঁকে শতপাকে জড়িয়ে ধরে। "আমাকে লোভী করে তুলো না"[৩] এই আর্তি যেন কবীরের কাছে নয়, নিজের অশান্ত যুগপৎ অনুভূতি, অপরিসীম বেদনা ও নিয়তির কাছেই। এভাবেই হাসান আজিজুল হক প্রেম ও প্রিয়জনের স্মৃতির বেদনাকে মিলেমিশে একাকার করে দিয়েছেন অনুপম শক্তিতে।

'সারাদুপুর' গল্পটি কাঁকন নামের একটি কিশোরের। দুপুর শব্দটির মধ্যেই যে ভাবটি পাওয়া যায় তা হল নির্জনতা। গল্পের মূলচরিত্র কাঁকনের মনেও যে ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে, তা হল সীমাহীন নির্জনতা বা একাকীত্ব। কাঁকনের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সে সবার মাঝে থেকেও কতটা একা। তার পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত। সে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, দাদু গুরুতর অসুস্থ, মা সংসারে থেকেও যেন নেই, আর বাবা অন্যত্র সংসার পেতেছেন। কাঁকন যদিও জানে তার বাবা ঢাকায় গেছেন আর একদিন ফিরে আসবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কাঁকন গুলি খেলতে গিয়ে জানতে পারে যে তার পিতা এই সংসার ছেড়ে অন্য একটি নারীকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন। এই প্রশ্ন যখন সে মাকে জিজ্ঞাসা করে যাচাই করতে চায়, তখন মা, কাঁকন ও তাঁর পিতার লুকিয়ে রাখা সম্পর্কের জটিলতাগুলো যেন পাঠকের সামনে বেআব্রু হয়ে পড়ে। গুরুতর অসুস্থ দাদুর জীবন খুব কাছ থেকে দেখে, পিতার সম্পর্কে এই হৃদয়বিদারক সত্য জানার পর জীবন সম্পর্কে কাঁকনের এক মিশ্র ধারণা গড়ে ওঠে, যা কিশোরমনে নিয়ে আসে দ্বন্দ্ব, অবসাদ, ও হতাশা। মৃত্যুপথযাত্রী দাদুর শেষবারের মতো খাবার ইচ্ছেগুলি, যেমন ইলিশমাছ ভাজা বা বালিহাঁসের মাংস, যেগুলিকে সে হয়তো আগে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু অবসাদে ডুবে যেতে যেতে সে এই ইচ্ছাগুলোকে আবার যেন নতুন করে বুঝতে পারে। কাঁকনের অবসাদগ্রস্ত জীবনে সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে যখন সে তার মায়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে চোখের সামনে দেখে ফেলে। নিজের পিতার জায়গায় অপরিচিত লোকটির আগমন তার কিশোর মনকে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের, শূন্যতার সম্মুখীন করে দেয়। জীবনের প্রতি কতটা বিমুখ হলে "মরে গেলে বেশ হয়"[৪] এই ধারণায় জর্জরিত হতে হয় তার মতো এক কিশোরকে। এটিই কি 'সুইসাইডাল থটস' নয়? কিশোর মনের সুইসাইডাল থটসকে কী নির্লিপ্তভাবে লেখক লেখায় এনেছেন। এনেছেন কিশোর মনের বিপুল হতাশার ছবি। মরে যাওয়ার কথা মনে আসাতেই তার দাদুর মৃত্যুপথযাত্রাকে সে নতুনভাবে দেখে। একটি কিশোরবয়সী ছেলে, যার নিজের মনই দুর্জ্ঞেয় এক জগৎ, যার কাছে পারিবারিক জীবনই সব, সেখানে তাকে তার ভঙ্গুর পারিবারিক জীবনে সম্মুখীন হতে হয় এমন কিছু আঘাতের, যা তার পরিবারের প্রতি বিশ্বাস ও ভরসার শেষ ভিতগুলিও নাড়িয়ে দেয়। তার অবসাদগ্রস্ত মন যেন তার মায়ের অবসন্নতাকেও ছুঁতে পারে-"মা-টাও মরে

গেছে বলে মনে হয় যে আমার!"[৫]- এই মৃত্যুচিন্তা, হতাশা, একাকীত্ব ও অবসন্নতা, তার কিশোর মনোজগতের এমন এক চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরে, যে চিত্র একটি কিশোরের মনোজগতে দেখতে পাঠক অভ্যস্ত নন। শেষ পর্যন্ত কাঁকনের সব দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-গ্লানি-হতাশার মুক্তি হয় রেললাইনে আত্মহত্যা করে। মরে গিয়েই শেষ অবধি বেঁচে যায় কাঁকন।

'একটি আত্মরক্ষার কাহিনী' গল্পটিও একটি কিশোর মনস্তত্ত্বের কাহিনী। এই কাহিনি রেজা নামক এক কিশোরের। কৈশোরের যে দুর্জ্ঞেয় জগতের অজানা কিছু অনুভূতির মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করে কিশোর-কিশোরীরা, এই গল্প যেন তাদের, অথবা তাদের নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার। প্রতিটি কিশোর কিশোরীই নিজেকে এই সময়ে আবিষ্কার করে নতুন ভাবে। নিজেদের কার্যকলাপ, চিন্তাভাবনায় নিজেরাই অবাক হতে থাকে তাঁরা, এমনকি তাদের চারপাশের মানুষেরাও। ঠিক যেমন রেজার মা- "হঠাৎ যেন তাকে চিনতে পারেন না"[৬]। এই না চেনা আসলে অ্যাডোলেসেন্স বা কৈশোরের অচেনা জগৎ। যেখানে গর্ভধারিণী মাও সন্তানকে অনেক সময় নতুন করে আবিষ্কার করেন। সমগ্র গল্পটি জুড়েই রেজা নিজেকে আবিষ্কার করতে করতে চলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মনুষ্যজীবনের সবচেয়ে আদিম অনুভূতি তথা আদিম রিপুর অস্তিত্ব নিজের শরীরে টের পায় এক অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। রেজা নিজের অনিয়ন্ত্রিত আবেগগুলিকে প্রকাশ করে, তার জন্য বিব্রত হয়। রাগের মাথায় রিকশাওয়ালাকে চড় মেরে তার নিজের চোখ দিয়েই জল গড়াতে থাকে, যুগপৎ রাগ ও অবুঝ অনুতাপকে সামলাতে গিয়ে রেজা বিব্রত হয়। ছোটবেলার মতো দিদির হাত বা চুল সে অনায়াসে ধরতে পারেনা, নারীদের সম্পর্কে এক রহস্যময়তা তাকে ঘিরে ধরে, যে নারীদের মধ্যে রয়েছে তার দিদিও। এভাবেই তার মধ্যে গড়ে ওঠে যৌনচেতনা, যা কিশোরবয়স থেকেই গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু রেজা তা বুঝতে পারে এক কঠিন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, যখন তার জীবনে এসে পড়েন গার্লস স্কুলের টিচার ও রেজার দিদি আমিনার পরিচিত এক সন্তানের জননী রাহেলা। রাহেলার কাছে ইংরেজি পড়তে গিয়ে একদিন রেজা তাঁকে দরজার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত ও স্খলিতবাস অবস্থায় দেখে ফেলে এবং সেই দৃশ্য তার কিশোরমনের সুপ্ত দেহচেতনাকে জাগিয়ে তোলে, যা সে আগে কখনো অনুভব করেনি। একই সঙ্গে অনেকগুলো অনুভূতি যেন রেজাকে গ্রাস করে ফেলে। সে পালাতে চেয়েও পালাতে পারে না এক অজানা আকর্ষণে- " কিন্তু হরিণের ক্ষিপ্রতা নিয়ে তার দুটি পা অনড় হয়ে রইল।"[৭]মানুষ নিজ অন্তরের গোপন ইচ্ছার কাছে কতটা অসহায় ও এই ইচ্ছা কত অমোঘ তা সে বুঝতে পারে যখন " অস্পষ্ট, অশরীরী ও অন্ধ কতকগুলো ইচ্ছা দ্রুত ছুটে বেড়াতে শুরু করল তার রক্তের মধ্যে এবং শিকারী পশুর মতো মরিয়া, সাঙ্ঘাতিক ওতপাতা ক্রুদ্ধ একটা আবেগ তাকে যেন ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করতে চাইল।"[৮] কিন্তু যদিওবা রেজা এই আকর্ষণের মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে, তাকে ঘিরে ধরে কৈশোরের আরো একটি চিরন্তন

বন্ধন, সেটি হল গ্লানি তথা তীক্ষ্ণ ন্যায়-অন্যায় বোধ। “ছি, তোমার মতো ভালো ছেলে!”[৯]- এই ভালো ছেলে হওয়ার গ্লানি যেন রেজাকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিন্তু এর পরেই পাঠক দেখতে পান রাহেলার জটিল অন্তর্জগৎকে। একাকীত্বে ভোগা রাহেলা অদ্ভুতভাবে নিজের অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করেন রেজার মতো কিশোরকে। তিনি রেজার সদ্যজাগ্রত যৌনচেতনাকে কেবল ব্যবহার করেছেন নিজের কামনাকে চরিতার্থ করতে। তাই তিনি রেজাকে চুম্বন করেন, প্রায় শারীরিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করেন। আর রেজার দুর্জ্ঞেয় মনোজগতে ঘিরে থাকে কেবল কৈশোরের সদ্যজাগ্রত দেহচেতনার নেশা, স্বাভাবিকভাবেই সে বুঝতে পারে না যে সে কেবলমাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই প্রথমে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়লেও শেষ পর্যন্ত রেজা রাহেলার অপরিসীম কামনার কাছে হেরে যায় তথা নিজের অন্তরের দেহচেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হয়, তারই প্রমাণ “এই প্রথম সে প্রতিচুম্বন করল।”[১০]পাঠকও দেখতে পান নবলব্ধ দেহচেতনার বোধকে সে কীভাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু কৈশোরের আরেকটি বন্ধন গ্লানি, যা কিনা তাকে রাহেলাকে স্খলিতবাস অবস্থায় দেখতে বাধা দিয়েছিল, সেই গ্লানিকেও তখন সে ভুলে যায় অর্থাৎ চিরন্তন মানবমনের মতোই আদিম রিপুর কাছে বিবেক হেরে যায়। কিন্তু রেজা তার ‘রক্তাক্ত, আহত, মুমূর্ষু’ বিবেককে পরিত্যাগ করে মুহূর্তের উত্তেজনার জন্য। শেষ মুহূর্তে বাচ্চা মেয়েটির চিৎকার কি কেবল মেয়েটির? নাকি সেই আহত বিবেকের? যা রাহেলা ও রেজার এই অস্বাভাবিকত্বের প্রতিবাদ করে? তবে শেষপর্যন্ত আদিম রিপুর কাছে নয়, গ্লানির কাছেই পরাজিত হয়েছে রাহেলা, বিশেষত রেজা। এভাবেই এক কিশোরের ও এক পরিণতবয়স্ক নারীর জটিল মনোজগতের চিত্র লেখক সৃষ্টি করেছেন।

‘একজন চরিত্রহীনের স্বপক্ষে’ গল্পটি মূলত এমনই একটি গল্প, যেখানে সতীনাথ নামের এক বয়স্ক,ভ্রষ্টচরিত্র, মানসিকভাবে দ্বন্দ্বদীর্ণ ব্যক্তি স্পষ্টতই নিজেকে ‘ডিফেন্ড’ করে। নিজের ভ্রষ্টচরিত্রের পক্ষে কথা বলা, বয়স্কা, সন্তানের জননী স্ত্রীকে ফেলে রেখে অন্য নারীসঙ্গ করতে যাওয়া, কাহিনির ছত্রে ছত্রে যেন নিজেকেই প্রতিহত করা। এই কাহিনি মোনোলগ না হয়েও যেন মোনোলগ হয়ে উঠেছে। সতীনাথের মনের উদগ্র কামনা আটচল্লিশ বছর বয়সেও জাগ্রত রয়েছে, যা তার স্ত্রীকে দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হবে না বলেই তার ধারণা। তার নারীলোলুপ চোখ যেমন বাগদী মেয়েকেও ছাড়েনা, তেমনি ভদ্রঘরের বউকেও নয়। আবার, সে নিজেই এই বিষয় নিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের মনের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক তর্ক করে। বাবার মুখে শোনা ‘ভ্রষ্টচরিত্র’ কথাটা তাকে যেন তাড়া করে বেড়ায়। সে যে নিজেই ভ্রষ্টচরিত্র, এই কথাটি যেন সে মেনেও মানতে পারে না। নিজেকে সে নোংরা লোক অবধি বলতে রাজি আছে, কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্র বলতে গেলেই চলে আসে তার বাবার প্রসঙ্গ, তাই কি ভ্রষ্টচরিত্র কথাটা তার কাছে এত পোশাকি? শিক্ষিত কমবয়সী ছেলেদের উপহাস তাকে পীড়িত করে, এই ছেলেদের যৌবনের প্রতি তার হিংসা হয়। এই নারীলোলুপতা থেকে সে বেরিয়ে আসার কথা ভাবে কিন্তু

চরিত্রহীনতার বিকৃতি তাকে সেটা করতে দেয় না। তার চরিত্রহীনতার পক্ষেই সে যেন শেষপর্যন্ত কথা বলতে থাকে। “আমি তো ভ্রষ্টচরিত্র! কিন্তু মেয়েটা যে নষ্টা।”[১১] এই কথা বলে সে নিজের খারাপ স্বভাবের কিছুটা দায় তার বর্তমান শয্যাসঙ্গিনী, বাগদী মেয়ে ভামিনীর উপরেও বর্তাতে চায়। সে ভাবতে চায় খারাপ চরিত্রের মেয়ে ভামিনীই তাকে ভ্রষ্টচরিত্র করে ফেলেছে। ভামিনীর সঙ্গেও তার সূক্ষ্ম মানসিক টানাপড়েন চলতে থাকে, এমনকি ভামিনীর স্বামী তুষ্টু, যাকে কি না ভামিনী ছেড়ে এসেছে আর যে মাঝে মাঝেই মদ্যপ অবস্থায় তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাকুতিমিনতি করে, তার প্রতিও সতীনাথের সূক্ষ্ম ঈর্ষা কাজ করে। এই ঈর্ষা আসলে তার বয়সজনিত ও কামজনিত অক্ষমতাজাত। সে ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে বারবার নারীলোলুপতা ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যেতে প্রতিজ্ঞা করলেও চিরকালীন অভ্যাস ও মনের অভ্যন্তরের পাকে পাকে জড়িয়ে থাকা নারীলোলুপতার বিকৃতি তাকে আবার ভামিনীর কাছে ফিরে যেতেই বাধ্য করে।

‘মন তার শঙ্খিনী’ গল্পে দুটি চরিত্র শাদু ও হামিদা। একেবারে নিম্নবিত্ত স্তরের মানুষ এরা দুইজন। লেখক এখানে স্পষ্টই দেখিয়েছেন একটি নারী তার প্রেমিককে ছলনাময় প্রেমের জালে কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে পারে। হামিদা যেন পুরো গল্প জুড়েই এই রহস্যময়তার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। আর শাদু যেন ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি নামক মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে থাকে। হামিদা শাদুকে ভালোবাসে, এই মিথ্যা মায়ায় শাদুকে আবদ্ধ করেই শাদুকে ব্যবহার করতে থাকে বিবাহিতা হামিদা। আর হামিদার আচরণ শাদুর মনে জন্ম দেয় এক অদ্ভুত ঈর্ষার, যে ঈর্ষার পাত্র হয় হামিদার স্বামী ট্যারা, এমনকি পালোয়ান রহম। আসলে হামিদার আচরণ শাদুকে হীনম্মন্যতায় ভুগতে বাধ্য করে, তাই নিজের গায়ের জোর দেখাতে গিয়ে বিনা কারণেই রহমের কোমর ভেঙে দিয়ে আসে কারণ হামিদা শাদুর সামনে তার প্রশংসা করছিল। শাদু হামিদাকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেও হামিদা কিন্তু রাজি হয়নি, কারণ শাদু ছিল তার হাতের পুতুলমাত্র। পাঠক দেখতে পান শাদু পড়ে আছে মানসিক জটিলতার এক বিশাল আবর্তের মধ্যে যেখানে হামিদা তাকে বঞ্চনা করছে বুঝতে পেরেও, হামিদাকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে অশান্তি করেও হামিদার প্রেমের জাল থেকে বেরোতে পারছে না কারণ হামিদা তাকে জেনেশুনে প্রতারণা করলেও হতভাগ্য শাদু তাকে সত্যিই ভালবেসেছে। কিন্তু কাহিনির শেষের আঘাত যেন নিরপরাধ শাদুকে বাস্তবের সম্মুখীন করে দেয় রূঢ়ভাবে, যখন হামিদা সকলের সামনে বলে যে শাদু তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে ও তাকে অপমান করে। এর চেয়েও বড় আঘাত শাদুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও পান যখন এত কিছুর পরও শাদুর কাছে মিথ্যা ক্ষমা চাইতে এসে হামিদা বলে “তোর ছেলে রইল আমার প্যাটে।”[১২] এটা যেন কেবল আঘাত নয়, শাদুর সমস্ত বিশ্বাস যেন ভস্মীভূত হয়ে যায় আর পাঠকও হামিদার জটিল অন্তর্লোকের সর্বশেষ অস্ত্রপ্রয়োগে যেন অবাক হয়ে যান।

হাসান আজিজুল হক তাঁর লেখায় মূলত এনেছেন দেশভাগ-মুক্তিযুদ্ধ ও তজ্জনিত কারণে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের ওঠাপড়া, মন-মানসিকতার ও জীবনের বাঁকবদল এবং দেশ-কাল-সামাজিক চিত্রের বাঁকবদল। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় কিছু গল্পে তিনি কত নিপুণভাবে কোন বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ছাড়াই মানুষের জটিল অন্তর্লোককে, মানসিক দ্বন্দ্ব-জটিলতাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। উক্ত গল্পগুলি যেন তারই সাক্ষ্য বহন করে এবং লেখক হিসেবে হাসান আজিজুল হকের লিপিকুশলতাকেই প্রমাণ করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

রচনাবলি ১: হাসান আজিজুল হক (সম্পাদক – হায়াৎ মামুদ ও সৈকত হাবিব)

তথ্যসূত্র:

১) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৯৩।
২) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৯৫।
৩) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৯৫।
৪) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৯৭।
৫) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৯৯।
৬) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৩৫।
৭) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৪০।
৮) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৪০।
৯) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৪০।
১০) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১৪৩।
১১) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৭৩।
১২) হক, হাসান আজিজুল, প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৯, রচনাবলি ১, প্রকাশস্থান-ঢাকা, প্রকাশনী- ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ১২৫।

সুফি ধর্মধারার আলোকে লৌকিক দেবী ওলাইচন্ডী তথা ওলাবিবি : হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়

মুন্সী মহঃ সাহেবুর রহিম
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: লোক সমাজের দ্বারা পূজিত দেবতারাই লৌকিক দেবতা। আমাদের রাঢ় বাংলার জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে প্রকৃতি রোষানল, পশু-জীবজন্তু থেকে বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির পূজারী হয়ে ওঠে আদিম মানুষ। সেই থেকে জন্ম নেয় লৌকিক দেবদেবী। ধনসম্পত্তি লাভ, সন্তান লাভ, অতিবৃষ্টি ও খরানিবারণ, পুত্রকন্যা বিবাহ মামলা মোকদ্দমা জয় লাভ, শত্রুনাশ, গাভীর দুধ দেওয়া, মুরগির ডিম পাড়া, বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি যেমন কলেরা, বসন্ত, দাদ হাজা, খোশ পাঁচড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রকটভাবে লোকসমাজে বিরাজমান। বাংলায় মুসলমান শাসকদের আগমনের ফলে সুফি সাধকদের প্রভাবে যে লৌকিক পিরের জন্ম হয়, তার মধ্যে হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটে। সুফিদের সহায়তায় ও মুসলিম শাসকদের দ্বারা বাংলায় হিন্দু সমাজের জনমানসে সুফিবাদের ধর্মীয় চেতনা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিরের মাজার বা দরগায় উরসের সঙ্গে হিন্দুদের উৎসবের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্থানে লোকউৎসব ও মেলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আগমন এক মিলন মেলায় রূপান্তরিত হয়। লৌকিক দেবদেবী দক্ষিণরায়, বনদুর্গা, পাঁচকুমার, বাসলী, পাঁচুঠাকুর, ওলাইচন্ডী, শীতলা, ঢেলাইচন্ডী প্রভৃতি যেমন এখনো পূজা পাচ্ছেন তেমনি মুসলমান সমাজে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক পির ও গাজী পির ছাড়া বিভিন্ন লৌকিক পির যেমন মানিকপির, বদরপির, সত্যপির, খোজখেজের, মাদারপির, পাঁচপির প্রভৃতি এবং বিভিন্ন বিবিমা যেমন বনবিবি, ওলাবিবি, ফতেমা বিবি প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক হাজত বা পূজা পেয়ে থাকেন। গ্রামে-গঞ্জে একসময় কলেরা বা ওলাউঠার খুব প্রভাব ছিল। সেই রোগ থেকে মুক্তি পেতে ওলাইচন্ডী দেবীর উপাসনা করে মানুষজন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ওলাবিবি এবং ওলাইচণ্ডী একই দেবী ও অভিন্ন। ওলাবিবি মুসলিম উপাস্যদেবী হলেও হিন্দুরাও দেবীকে সম্মান জানায়। বিভিন্ন এলাকায় প্রতিটি গ্রামে আছে ওলাবিবির থান। 'ওলাউঠা বিবি' থেকে ওলাবিবি। ওলাবিবির সিন্নি বানান স্থানীয় হিন্দু মুসলিম পরিবার। ওলাবিবির মতোই ওড়িশার যোগিনীদেবী এবং দক্ষিণ ভারতের মারাম্মা এবং আনকাম্মা কলেরা তথা ওলাউঠা রোগের দেবী হিসেবে পূজিতা হন। সুতরাং এখনও হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এই লৌকিক দেবী ওলাইচন্ডী বা ওলাবিবি রাঢ় বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সূচক : ইসলাম, সুফি, পির, হাজত, মাজার, দেয়াসী, থান, সালাম।

মূল আলোচনা:

আদিম মানুষ শিকার ও পশুপালনের উপর নির্ভর করে দিনযাপন করতো। তাদের চেতনার সঙ্গে জড়িত ছিল ভীতি। প্রাকৃতিক শক্তি, ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হলে মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করতো। আদিম মানুষ নিজেদের যখন অসহায় মনে করত, তখন নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য তার থেকে শক্তিশালী কোন কিছুকে ভাবতে শুরু করেছিল। তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ঢুকে পড়েছিল নানান সংস্কার ও প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্য নানা আচার-অনুষ্ঠান। তাদের মনে বিভিন্ন অন্ধ বিশ্বাস জন্ম নিতে লাগল। সেই সময় থেকেই দেবতাদের জন্ম। তারা ভাবত যে দেবতারা মানুষ বা পশুরূপ ধারণ করে। ঝড়ঝঞ্ঝায় তারা প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ দেখে কাল্পনিক দেবদেবীর আরাধনা করতে লাগল। হিংস্র পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা পশুপূজা করত, উদ্দেশ্য তাদের তুষ্ট রাখা। আদিম মানুষ আরও মনে করত প্রকৃতির নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর রূপের পিছনে কোন অদৃশ্য শক্তি আছে। শক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাল। এই শক্তির প্রতিনিধি হলেন গ্রামদেবতা। এদের নামকরণ, পূজার্চনা, স্থান বিশেষে প্রাধান্য পেতে লাগল। মানুষের বা লোকের প্রয়োজনে দেবতার সৃষ্টি। কখনও বন্য জন্তু, হিংস্র প্রাণীর ভয় থেকে, আক্রমণ থেকে বাঁচতে, অলৌকিক শক্তি, অপদেবতার রোষানল থেকে বাঁচতে বা নিজেদের মনোবাসনা পূরণ করতে হাজার হাজার লোক দেবতার জন্ম হয়েছে। পাথর, নদী, জল, বৃক্ষ, মাটি, মাটি দলা কেউ বাদ যায়নি। মানুষ নিজের মতো কল্পনা করে তাকে রূপ দিয়েছিল। যুগ যুগ ধরে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যেমন কামনা করেছে দেবতা হয়ে উঠেছে সেইরকম শক্তির আধার। গ্রামে গ্রামে মানুষের সেই কামনা পূরণের দেবতারাই পরবর্তীকালে "গ্রাম্য দেবদেবী" বা "লৌকিক দেবদেবী" নামে পরিচিত। সুতরাং লোক সমাজে যে সকল দেব-দেবীরা পূজিত হন তারাই লৌকিক দেবদেবী নামে পরিচিত। এই লোকসমাজ গ্রামে বসবাস করে তাই এই দেবদেবীদের "গ্রাম্য দেবদেবী"ও বলা হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে দেব-দেবীদের প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় বৈদিক দেবদেবী, পৌরাণিক দেবদেবী, লৌকিক দেবদেবী।[১] শাস্ত্রীয় দেবতাদের চেয়ে লৌকিক দেবতারা বহু প্রাচীন। এ প্রসঙ্গে মিহির চৌধূরী কামিল্যা বলেন "লৌকিক দেবতারা আরও প্রাচীন, সভ্যসমাজ বা বেদ-পুরাণের দেবতাদের থেকেও তারা অনেক পুরানো।"[২]

এই দেবদেবীদের মন্ত্রযজ্ঞ উপাচারের শাস্ত্রীয় কোন বিধান নেই। এরা মূলত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে আলাদা। বাংলায় যারা মূল, সেইসব আদিম অথচ অন্তজ বলে পরিচিত সম্প্রদায়ই লোকদেবতার প্রধান পূজারী বা "দেয়াসী"। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকদেবতায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৩]রাঢ় বাংলায় লৌকিক দেবদেবীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে মানুষের দ্বারা পূজা পাচ্ছেন, যাদের নাম শাস্ত্রে বা ইতিহাসে উল্লেখ

নেই। গ্রামের পাশাপাশি শহরের মানুষও বংশ-পরম্পরায় পূজার্চ্চনা করে চলেছে। তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই দেব-দেবীগণের মধ্যে কেউ সাধারণভাবে সকল হিন্দু কর্তৃক পূজিত। আবার কেউ কেউ পূজিত হন বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও পেশাজীবীদের দ্বারা যেমন মৎস্যজীবীদের পূজ্য মাকাল ঠাকুর। কেউ পূজিত হন শুধু মেয়েদের দ্বারা যেমন ভাদু ও টুসু দেবী। কেউ কেউ শুধু উপজাতিদের দ্বারা যেমন ভৈরব। আবার কেউ কেউ পূজিত হন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী দ্বারা যেমন ওলাইচণ্ডী, মনসা, বড়খাঁ গাজী, পির গোরা চাঁদ ও সত্যনারায়ণ বা সত্যপির, বনবিবি, খজখেজের প্রভৃতি। পূজিত হন পূজারীর বিভিন্ন ইচ্ছাপূরণের জন্য। ইচ্ছাগুলোর মধ্যে আছে অধিক মৎস্য পাওয়ার বাসনা, বনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা, ব্যাঘ্র থেকে আত্মরক্ষা, শিশুদের মঙ্গল, রোগ থেকে মুক্তি, গ্রামরক্ষা, পশুদের রোগমুক্তি, চর্মরোগ থেকে মুক্তি, কলেরা রোগ থেকে মুক্তি ও সন্তানলাভের ইচ্ছা ইত্যাদি। লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে এঁদের কারও কারও প্রতিমা আছে, কারও কারও প্রতিমা নেই যেমন মাকালঠাকুর, বনবিবি, হাড়িঝি ও করম পূজা। কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রতীক বৃক্ষ, প্রস্তর খণ্ড অথবা মাটির স্তূপ। কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রতিমার রূপ উগ্র যেমন পাঁচুঠাকুর, আবার কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রতিমা সৌম্য, শান্ত ও সুশ্রী। এইসব আঞ্চলিক হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে পরবর্তীকালে মুসলমান পির বা বিবিমাদের সংমিশ্রন ঘটেছে। পিরদের অলৌকিকতা ও কর্মমুখীতার ফলে বাঙালি লৌকিক সমাজে এক ধরনের ধর্মীয় রূপান্তর ঘটে। বাংলায় সুফিবাদের পরিণতি হল পিরবাদ, পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী গুরুবাদ ও পিরবাদের ধারণা একই। ভারতে এসে লোকায়ত বিশ্বাসের সাথে ইসলামের সুফিবাদের সংমিশ্রণের ফলে ইসলাম ধর্মে নানা ধরণের নতুন বিশ্বাস ও প্রথা উদ্ভুত হয়, যা “লৌকিক পির” নামে পরিচিত। এ সমস্ত বিশ্বাস ও প্রথা মূল ইসলামের, বিশেষত শরিয়তের পরিপন্থী বা সাংঘর্ষিক। এ সকল পিরদের সম্পর্কে জানতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া আমরা প্রাচীন পুঁথি, পাঁচালী, লোকগান, লোকগাথা প্রভৃতি লোকসাহিত্য থেকে জানতে পারি। লৌকিক পির প্রথম দিকে মুসলমানদের নিকট থেকে শ্রদ্ধা ও শিরনি পেলেও কালক্রমে হিন্দুদের নিকট হতেও শিরনি পেতে লাগলো। শুরুর দিকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং ক্রমশ অভিজাত সমাজ পর্যন্ত এসব পিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্তি করতে লাগলো। মূলত পিরদের নানা বুজরুকি বা অলৌকিক ক্ষমতা ও সেসব নিয়ে প্রচলিত গল্পকথা এই আকর্ষণ তৈরীর মূখ্য কারণ। বাংলার লোকসমাজে অনেক পির ও লৌকিক দেবদেবী রয়েছে। হিন্দু ধর্মে যেমন লৌকিক দেবদেবী হিসাবে দক্ষিণরায়, বনদুর্গা, পাঁচ কুমার, বাসলী, পাঁচুঠাকুর, ওলাইচন্ডী, শীতলা, ঢেলাইচন্ডী প্রভৃতি এখনো পূজা পাচ্ছেন, তেমনি মুসলমান সমাজে সত্যপির, কালু-গাজী, মাদারপির, পাঁচপির, বদরপির, মানিকপির, পিরগোরাচাঁদ, খোজখেজের, খোকাপির, বুড়াপির প্রভৃতি পিরগণ শিরনি ও শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। এ সমস্ত পিরগণের কেউ কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র

হিসেবে স্বীকৃত, আবার অনেকের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসব পির সুফিগণ দেহত্যাগ করলে তাঁদের কবরস্থানে মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাজারে ভক্তগণ নানা মনস্কামনা নিয়ে আসতে থাকে। আজও ঐতিহাসিক ও লৌকিক পির হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধা ও শিরনি পেয়ে আসছেন। ঐতিহাসিক ও গাজীপির ছাড়াও ফাতেমাবিবি, বনবিবি, ওলাবিবির মত বিবিরা আজও বাংলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজা ও হাজত পেয়ে থাকেন।

লৌকিক দেবী ওলাইচন্ডী তথা ওলাবিবি:

বাংলা তথা রাঢ় বাংলার বিশিষ্ট লোকদেবতা হল ওলাবিবি। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করেন ওলাবিবি হল ওলাওঠা বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ওলাবিবির থান বা মণ্ডপ কোন কোন স্থানে দেখা যায়। এর পূজা কোন গৃহে বা বাস্তুভূমিতে বা মন্দিরে হয় না। গ্রামের গাছের নিচে পর্ণকুটিরে তিনি ছয় ভগ্নির সঙ্গে থাকেন সেজন্য ওলা বিবির থানকে সাতবিবির থানও বলা হয়। ওলাবিবির সাত ভগ্নিগণের নাম হল ওলাবিবি, আসানবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনেবিবি। ওলাবিবির সাত ভগ্নির মধ্যে ওলাবিবির প্রভাব প্রতিপত্তি ও জনভক্তি সবচেয়ে বেশি। 'ওলাবিবি'র পূর্ণ নাম 'ওলাউঠাবিবি'। ওলাউঠা চলতি কথা। 'ওলা' ও 'উঠা' দুইটি কথার সমষ্টি। 'ওলা' মানে নামা বা দাস্ত হওয়া এবং 'উঠা' কথার অর্থ হইল উঠিয়া যাওয়া বা বমন হওয়া। অর্থাৎ "যে রোগে দাস্ত ও বমন উভয়ই হইয়া থাকে তাহা ওলাউঠা, শুদ্ধ কথায় এই রোগকে বিসূচিকা এবং ইংরেজীতে কলেরা (cholera) বলা হয়"।[৪]

ওলাবিবি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের পূজিত দেবী ওলাইচণ্ডী। বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ওলাবিবি ওলাইচণ্ডী রূপে পূজিতা হতেন। ওলাইচন্ডী হলো ওলাওঠা-কলেরা-মহামারী-মড়ক নিবারণী দেবী। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল প্রভৃতি সকল ধর্মের লোকই এর পূজো দেয়। সকলের বিশ্বাস ইনি রাগান্বিত হলেই দেশে এ সব রোগের সৃষ্টি হয়। এবং এর পুজো দিলেই রোগ ভালো হয়। অনেকের ধারণা, আমাশয়, পেটফাঁপা, পেটশূল, পেটজ্বালা ইত্যাদি রোগও এর থানের ওষুধে সেরে যায়। অর্থাৎ ওলাইচণ্ডী শীতলার গুণসম্পন্না দেবী। বীরভূমে শক্তিপুর ও বিজুড়ি গ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর থানে মুখের ঘা সারানোর ওষুধ দেওয়া হয়।[৫]

ইসলামে হিন্দুদের কোনও দেবদেবীর পূজার নিয়ম নেই। সে কারণে ইসলামিক মোড়কে ওলাবিবি নামে পূজার পরিবর্তে হাজত দেওয়া হয়। ডাক্তার বৈদ্যহীন পরিবেশ পরিস্থিতিতে হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পূর্ব সংস্কার বশতঃ কলেরা হলে কোনও দেবতা বা দেবীর নিকট কৃপা প্রার্থনা করতে হয়েছে। এই সূত্রে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ ওলাইচণ্ডীকে ওলাবিবি নামে পূজার পরিবর্তে ইসলামি কায়দায় হাজত দিয়েছেন। আসলে ওলাবিবি ও ওলাইচণ্ডী একই বিশ্বাসজাত দেবী। একইভাবে বনচণ্ডী বা বনদুর্গাকে বনবিবি নামে, শীতলাদেবীকে আসানবিবি নামে, সপ্তমাতৃকা দেবীকে সাতবিবি নামে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীদেবীর সাদৃশ্যে লক্ষ্মীবিবির

ব্রতপালন, সন্তানরক্ষার্থে ষষ্ঠী বা পাঁচ ঠাকুরের সাদৃশ্যে মনাইপির বা নিমরিয়া পির নামে হাজত করা।[৬]কিংবা বসন্ত-কলেরার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওলাবিবি-বুড়িমা-মাইবিবিদের ব্রত-গান-শিরণি- হাজতের বহুবিধ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

ওলাইচন্ডী বা ওলাবিবির মূর্তি পোশাক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন, "ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির মূর্তি দু-রকমের হয়। সর্বত্রই অতি সুশ্রী। হিন্দু- প্রধান অঞ্চলে এর আকৃতি একেবারে লক্ষ্মী সরস্বতীর মত"[৭] রং ঘন-হলদে, টানা টানা দুটি চোখ (কোন কোন স্থলে তিনটি), নাক, কান, ঠোঁট বেশ সুন্দর, দুটি হাত প্রসারিত (মুদ্রার স্থিরতা নেই), কখন দণ্ডায়মান, কখনও বা শিশু-সন্তান কোলে করে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। সারা দেহে নানারকম গয়না - বাজু, গোট, মাকড়ি, চুড়ি, নখ, হার, চিক ইত্যাদি। মাথায় মুকুটও পরেন দু-এক স্থানে, অন্যত্র ইনি এলোকেশী। বাহন বা প্রহরণ কিছু নেই। সাধারণত নীল শাড়ি পরেন।

মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এর আকৃতি বা পোশাক-পরিচ্ছদ একটু ভিন্ন রকমের। মূর্তি খানদানী ঘরের মুসলমান কিশোরীর মত। পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না, গায়ে নানারকম গয়না- টিকরি, ঝুমকো, টায়রা, হাসুলী, নাকছাবি, বাউটি, গোট প্রভৃতি, পায়ে নাগরা-জুতো, মোজাও পরেন কোন ক্ষেত্রে। এক হাতে আসাদণ্ড দেখা যায়।[৮] ওলাবিবির পূজা সর্বত্র এক প্রকার নয়। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে দেবীকে ওলাইচণ্ডী নামে পূজা করা হয়। শুক্লপক্ষের শনি ও মঙ্গলবার 'বারের পূজা' এবং মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি স্থানীয় ভাবে নির্দিষ্ট কোনও এক দিনে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। এর পৌরহিত্য করেন যে কোন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ, এমনকি নারীরও পৌরহিত্য করার অধিকার আছে।

সাধারণত এই দেবীর পূজার উৎপত্তি কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হলেও রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও এই দেবীকে পূজিত হতে দেখা যায়। বীরভূম জেলার বোলপুর ও শ্রীনিকেতনের মাঝে প্রাচীন নীলকুঠির কাছে একটি থানে ওলাবিবি অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর সাথে পূজিত হন।[৯] অন্যান্য লৌকিক দেবতার পূজার মতো ওলাবিবির বেলাতেও কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। এখানে হিন্দু-মুসলমান একই পুরোহিতের হাতে পূজার নৈবদ্য ও হাজত নেয়। ওলাবিবির নৈবদ্য অতি সাধারণ যেমন সন্দেশ, বাতাসা, পান, সুপারি, আতপ চাল ও পাটালি।

মানুষ বিপদগ্রস্থ হলে সব সময় ধর্মের গোঁড়ামি রক্ষা করতে পারে না। রাঢ় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উদাহরণ রয়েছে। হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানের দরগায় পূজা দেওয়া, মুসলমান পিরদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা, মুসলমান ফকিরদের শরণাপন্ন হওয়ার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমানেরাও অনেক সময় হিন্দু দেবতাদের উদ্দেশে পূজা দিতেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিন্দুদের পূজিত মুসলমান পিরের মধ্যে সত্যপির, সোনাপির ও মনাইপির এর কথা জানা যায়। মনাইপির সম্পর্কে সংস্কৃত ও দেশী মিশ্রিত ভাষায় রচিত একটি শ্লোক পাওয়া যায় –

মনাইপীরমহং বন্দে পাক্কাদাড়িযুতাননম্।
বৃদ্ধাবিবি বামভাগে বেষ্টিতং গুড়পোন্টয়া।

অর্থাৎ ইঁহার মুখে পাকা দাড়ি, বাম ভাগে বৃদ্ধা বিবি এবং গুড়ের পোটলা দ্বারা ইনি বেষ্টিত।[১০] কারোর মতে মুসলমান আমলে ওলাইচণ্ডী ওলাবিবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।[১১] মৃদঙ্গ, মন্দিরা সহযোগে ওলাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করে পাঁচালী গাওয়া হত। রাঢ় বাংলার প্রায় সর্বত্রই এই গান করা হয়।[১২] ওলাইচণ্ডী ও ওলাবিবিকে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের দেবী বলা যায়। ওলাবিবির উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে একটি গানের উল্লেখ করা হলো-

“ওলাবিবি মাগো তুমি করো মাগো মেহেরবাণী
দয়া করে এই আসরে এসো গো।
তুমি মাতা ত্রিনয়নী অজ্ঞান মা ডাকি আমি
এসে তুমি মেহেরবাণী করো গো।
ওলাবিবি নামটি ধরি বিপদে মা বিপদহারী
পার কর মা আজি এ বিপদে গো
ডাকে তোমায় মমিনেতে পীর যে তুমি দুনিয়াতে
সালাম করি মাগো আজি তোমায় গো।।”[১৩]

এখানে ওলাবিবির গানে দেখতে পাই ওলাবিবির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি সংহতি ও মিলনসেতু রচিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, *আঞ্চলিক দেবতা লোক সংস্কৃতি,* বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ১৪-১৫.

২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

৩. সরকার, প্রণব (সম্পা:), ১৭বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, স্বদেশচর্চা লোক, *বাংলার লৌকিক দেবদেবী,* সোনারপুর, কলকাতা, লোক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৩৮.

৪. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, এপ্রিল ১৯৭৮, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ১৯৩.

৫. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০২.

৬. ইসলাম, ড. সা' আদুল, জুন ২০১০,*বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ,* দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, পৃষ্ঠা ২৪২.

৭. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫.

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫.

৯. নিজস্বসংগ্রহ, ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার, মহাম্মদ মহীউদ্দিন ও সয়দোর মিয়াঁ, বোলপুর, বীরভূম, তাং ৭/১/২০২৪.

১০. বিশ্বাস, শ্রীদিলীপ কুমার, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্ত ষষ্টিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, নিবন্ধ: চক্রবর্তী, শ্রী চিন্তাহরণ, *বাংলার লৌকিক দেবদেবী*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃষ্ঠা ১৭.

১১. ঘোষ, বিনয়, ১৯৫০, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, কলকাতা, পুস্তক প্রকাশক, পৃষ্ঠা ৬৩৫.

১২. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৩, *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১০৫.

১৩. ব্যানার্জি, সায়নদীপ (সম্পা:), মুরমু, গোপাল ও চৌধুরী, সৌম্যজিৎ, (সহ-সম্পা:), ১ম বৈশাখ ১৪২৮, *বাংলার লৌকিক দেব-দেবী:* নতুন এষণা, নিবন্ধ:গিরি, সৌমেন, বাংলা লোকসংগীত: লৌকিক দেবদেবী, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রত্যয় প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৩৭।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত গল্প : নারীর কণ্ঠে নারীর কথা

সুদেষ্ণা আদক
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ,
মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত), পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর জীবন, তাদের দুঃখ, দুর্দশা, সংসারের চাপে পিষ্ট হতে বসা নারী, সম্পর্কের জটিল সমীকরণ, প্রেম, দাম্পত্য, বিচ্ছেদ সবকিছুই জলছবির মতো স্পষ্টভাবে উঠে আসে তাঁর কথাসাহিত্যে। নিপুণ চিত্রকরের তুলির এক একটি টানের মতো করে তিনি তাঁর সাহিত্যের ক্যানভাসে সমসাময়িক সমাজ, নর-নারীর জীবনের জটিলতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংসারের ভাঙন, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিকভাবে নিপীড়িত হওয়া সুদীর্ঘকালের নারীসমস্যা এবং সেইগুলো থেকে উত্তরণের পথ চিত্রিত করেছেন। বাস্তব সমাজের পার্থিব রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন তাঁর নারী চরিত্রগুলোকে। তাই তাঁর নারী চরিত্ররা সবসময় সজীব, প্রাণবন্ত, ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষদিক থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁর লেখনী আরও পরিণত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলো একদিকে যেমন জীবনবোধের সামগ্রিকতায় পরিপূর্ণ, তেমনই পাঠকমহলে অসম্ভব জনপ্রিয়। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে বাস্তব জীবনের কাহিনি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায়। চাহিদা বা স্বপ্ন অনেক থাকলেও বেশির ভাগ নারীরা তা পূরণে ব্যর্থ হয়। কখনও বা শুনতে হয় সমাজের চোখরাঙানি - তুমি নারী হয়ে এটা করতে চাও? এটা তো পুরুষের কাজ, তোমার নয়। তোমার এই পোশাক পরা উচিত; এটা পরা উচিত নয়। একজন নারী তো শৈশব থেকেই এইগুলো শুনে বড় হয়। নারীত্বের সংজ্ঞা হারিয়ে যায় তাঁদের জীবন থেকে।

বর্তমান সমাজে নারীদের অগ্রগতি একদিনে হয়নি। তার মূলে রয়েছে বহুদিনের বহু সংগ্রামের ইতিহাস। বাংলার মনীষীরা নারী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তির জন্য যেমন আন্দোলন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে অন্তঃপুর থেকে বহু নারী নীরবে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সেই প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এইরকম একজন সংগ্রামী, কলম প্রতিবাদী আধুনিক যুগের নারী হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সমাজের মধ্যে থেকেই নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর, পুরুষের মতো নারীও যে রক্তমাংসে গড়া একটা মানুষ; পুরুষের মতো নারীরও যে নিজস্ব কামনা–বাসনা চাহিদা, আশা -আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন রয়েছে এবং সেইসব কিছুই পাওয়ার তার ন্যায্য অধিকার রয়েছে - সেইসব গল্প বলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে শহুরে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট। বাস্তব জীবনে যা তাঁর অভিজ্ঞতা সেটাই তিনি পরিস্ফুট করে তুলতে

চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যের আঙিনায়। সমাজব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের জীবনবোধ, মুক্তি ও সুপ্তচেতনা। মানব সমাজ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিমানস ও সমাজব্যবস্থা পরস্পর ক্রিয়া – প্রতিক্রিয়া মণ্ডিত। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাসাহিত্যে তথা ছোটগল্পে মানবজীবনের সঙ্গে সমাজের ঘটনাবলি যুক্ত হয়ে এক নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সাহিত্যে নারীদের নিয়ে নতুনভাবে লেখার তাগিদ, নারী সমস্যার খুঁটিনাটি, নারী - মুক্তির পথ অঙ্কিত হয় নিপুণভাবে। একজন নারীর পক্ষেই তো সম্ভব নারীদের জীবনের হালহকিকৎ, অন্তরমহলকে এত সূক্ষ্মভাবে সাহিত্যের ক্যানভ্যাসে ফুটিয়ে তোলা। স্বল্প পরিসর থাকার কারণে আমার এই **'সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত গল্প: নারীর কণ্ঠে নারীর কথা'** শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচ্য গল্পগুলি হল, যথা - **'দুই নারী', 'আমি মাধবী'** এবং **'চেনা অচেনা'**।
সূচকশব্দ : নারী, অন্যপূর্বা, সমাজব্যবস্থা, পুরুষতান্ত্রিক, গল্প।

মূল আলোচনা:
পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীজীবন প্রায়শই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। পুরুষের অত্যাচার নারীকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। তাই সমাজের প্রতিচ্ছবি ছোটগল্পে নিপুনভাবে ফুটে ওঠে। বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে বিভীষিকাময় করে তুলতে পারে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সুখ - শান্তির ছন্দপতন ঘটাতে পারে তার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একাধিক গল্পে। 'দুই নারী' ঠিক এমনই একটি গল্প। গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে অতসী ও তন্দ্রা - এই দুই নারীকে কেন্দ্র করে। দুজনেরই অবলম্বন একজন পুরুষ - সঞ্জয়। অতসী, সঞ্জয়ের সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া স্ত্রী। আর তন্দ্রা, সঞ্জয়ের ঔরসে মা হওয়ার স্বাদটুকু পেলেও সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি কখনও। সঞ্জয়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি পাবেই বা কী করে তন্দ্রা! তন্দ্রা আর সঞ্জয়ের সম্পর্কটা জানত অতসী। কাচার জন্যে জামা নিতে গিয়ে সঞ্জয়ের জামার পকেটে একটি ছবি খুঁজে পায় অতসী, সেই প্রথম পরিচয় হয় তন্দ্রার সাথে। ছবিটা কার জিজ্ঞেস করায় বিরক্ত হয় সঞ্জয়, এমন প্রশ্নের আশা সঞ্জয় করেনি বোধহয়, তবুও তাঁর কণ্ঠস্বর ঝাঁঝালো হয় আরো, আকারে ইঙ্গিতে অতসীকেই অপরাধী বানিয়ে তোলে। স্ত্রী হিসেবে অতসীর যেন কোনো অধিকারই নেই স্বামীকে প্রশ্ন করার। উল্টে অতসীকে শাসিয়েছে সঞ্জয় –

> "...তুমি আমার জামা-প্যান্ট ঘাঁটো নাকি আজকাল? আমাকে কি তুমি জেরা করছ?"[১]

অতসীকে সঞ্জয় দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দেয় যে জামার পকেটে ছবিটা সে নিজেই রেখেছে। সঞ্জয় এমন স্পষ্টবাদী বরাবরই। নিজের করা গোপন অপরাধগুলোকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিতে কখনই দ্বিধাবোধ করেনি সে। মনের অতলে ডুব দেয় অতসী, ভাবে - জীবনের কিছু কিছু চরম সত্যগুলো না জানলেই বোধ হয় ভালো,

কমপক্ষে কষ্টটা একটু কম হয়। ধীরে ধীরে জীবন থেকে শান্তি অবলুপ্ত হতে থাকে অতসীর। সঞ্জয়ের সাথে তন্দ্রার গোপন সম্পর্কটা হঠাৎ করে প্রকট হয়ে ওঠে, দুর্বিষহ করে তোলে তাদের দাম্পত্য জীবন। ঠাণ্ডা দমকা বাতাসের মতো হিমশীতল চোরাস্রোত বয়ে যায় অতসীর বুকের অতলে।

সেই তন্দ্রাই ভাগ্যের পরিহাসে এসেছে অতসীর কাছে। কুড়িবছর পরে এক দুপুরে আবার মুখোমুখি হয় দুই নারী। জীর্ণ - শীর্ণ চেহারার, মাথাভরা রুক্ষ্ম এলোমেলো চুলের তন্দ্রাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি অতসী। পরিচয় দিতেই আঁতকে ওঠে অতসী। কয়েক পা ছিটকে সরে যায় সঙ্গে সঙ্গেই।

"...তন্দ্রা। তন্দ্রা। ছোট্ট এক ফোঁটা নাম। দুটো মাত্র শব্দ। তবু এখনও, এতদিন পরও, কী তীব্র বিষ তাতে! অতসী নতুন করে সেই বিষছোবল খেল যেন।"[২]

সঞ্জয়ের সাথে তন্দ্রার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে অতসী কিন্তু বিচ্ছেদের রাস্তায় হাঁটেনি, উল্টে মান - অপমান ভুলে গিয়ে ছুটে গিয়েছিল তন্দ্রার কাছে। অনেক অনুনয় করেছিল যাতে তন্দ্রা সরে যায় সঞ্জয়ের জীবন থেকে। সঞ্জয়ের সাথে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার আপ্রান চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু তন্দ্রা সরে আসতে পারেনি তখন; ততদিনে মা হতে চলেছিল তন্দ্রা। শূন্য হাতে ফিরতে হয় অতসীকে। সঞ্জয়ের এই অবৈধ সম্পর্কটাকে নিজের ছেলে - মেয়ে, বন্ধু - বান্ধব, আত্মীয় - স্বজন সবার কাছেই গোপন করেছিল অতসী, জানতে দেয়নি কাউকেই। অতসী চরিত্রের মধ্য দিয়ে পারিবারিক মূল্যবোধের এক নিদর্শন চিত্রিত করেন লেখিকা। অতসী নিজেও হয়তো ভুলে গিয়েছিল তন্দ্রাকে, সংসারের চাপে আর ছেলে মেয়েদের বড় করতে গিয়ে। সেই তন্দ্রাই এতদিন পরে আবার পুরোনো দগদগে স্মৃতিগুলোকে জলজ্যান্ত করে তোলে।

মেয়ে হওয়ার পর সঞ্জয়, তন্দ্রাকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে। হয়তো বা লোকলজ্জার ভয়ে তন্দ্রা নিজেই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিল। সঞ্জয় বেঁচে থাকাকালীন তন্দ্রার কোনো অভাব রাখেনি। অতসীর কাছে তন্দ্রা এসেছে কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আশায়; নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য –

"...অন্তত হাজার পঞ্চাশেক যদি দ্যান... মুন্নিরও তো তার বাবার সম্পত্তিতে কিছু অধিকার আছে।"[৩]

সঞ্জয়ের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আজ হঠাৎ করে যেন অশ্রুধারা বয়ে এল অতসীর। মনে মনে ভাবতে লাগল সঞ্জয়ের অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী - তন্দ্রা নাকি সে নিজেই। অথচ সঞ্জয়ের মৃত্যর পর, স্বামীর মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে একটুও কাঁদতে পারেনি অতসী। পনেরো বছর ধরে জমতে থাকা তীব্র কষ্ট, যন্ত্রণাগুলো তাঁর বুকফাটা আর্তনাদকে বুকের গভীরেই সমাহিত করে দেয়।

সঞ্জয়ের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকান্ডের জন্যই দুই নারীর জীবন ছারখার হয়ে গিয়েছে। নিজের স্বার্থের জন্য দুজনকেই ইচ্ছে মত ব্যবহার করেছে সঞ্জয়। সঞ্জয়ের

নিয়ন্ত্রণেই দুই নারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দুজনের ওপরেই কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল সঞ্জয়, তবে দুজনের কাউকেই সুখ-শান্তি দিতে পারেনি সে-মৃত্যুর আগেও আর মৃত্যুর পরেও। সম্পর্কের নাগপাশ আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বলি হতে হয় অতসী আর তন্দ্রা দুজনকেই।

মেয়ের বিয়ের জন্য একটা ভাল ছেলে পেয়েছে তন্দ্রা। তাই সবকিছু ভুলে দায়ে পড়ে অতসীর শরণাপন্ন হয় সে, সঞ্জয়ের সাথে সম্পর্কের একটা সামাজিক পরিচয় ছিল অতসীর। কিন্তু তন্দ্রার তা ছিল না –

"...হ্যাঁ, ওই টুকুনি যা তফাত ছিল আপনার সঙ্গে আমার।"[৪]

করুনা হয় অতসীর। তন্দ্রার জন্যে কষ্ট অনুভব করে সে। ঘোরের মধ্যে তন্দ্রা বলে -

"...আপনাকে ছেড়ে সে আমার কাছে চলে আসেনি। আমাকে ছেড়েও আপনার কাছে ফেরেনি। কেন ফেরেনি কখনও ভেবে দেখেছেন কি? কেন আপনার পাশে শুয়েও সে আমার কথা ভেবেছে? আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আপনার বিছানায়?"[৫]

একটা ঘোরের মধ্যে ডুবতে থাকে অতসী। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ভাবনায় –

"অতসী কে ছিল সঞ্জয়ের? তন্দ্রাই-বা কে ! এক অর্থে দুজনেই তো পৃথক পৃথক দুটো পরগাছা মাত্র, সঞ্জয়েরই অর্থে লালিত। সঞ্জয়েরই তৃষ্ণায় জারিত।"[৬]

ঝাপসা আধারে ডুবতে থাকে দুই নারীর দুই মুখ। কাঁদতে ইচ্ছে করে দুজনেরই। অতসী হাত রাখে তন্দ্রার হাতে। দুই নারী একে অপরের হৃদয়ের অতল গভীরতা স্পর্শ করে, মিলেমিশে এক হয়ে যায় দুই নারী, দুই সত্তা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আর পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার পরিণতি যে কতটা নির্মম, কষ্টকর করে তোলে নারী জীবনকে; তার সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য, যা বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো দংশন করে প্রতিনিয়ত।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নীচ, অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নারীকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে দমন করে রাখার প্রবল কামনার কারণে নারী আজও সমাজে কোণঠাসা। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আমি মাধবী' একটি পৌরাণিক গল্প হলেও এই কাহিনির বিষয়বস্তু আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নারীকে কীভাবে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করে গল্পের ছত্রে ছত্রে নিপুণ চিত্রকরের মতো লেখিকা ফুটিয়ে তোলেন আমাদের সামনে। গল্পের মূল চরিত্র ও মূল আকর্ষণ হলেন মাধবী, রাজা যযাতির কন্যা। একজন পুরুষের কন্যা তিনি অথবা একজন পিতার কন্যা, এই পরিচয়ই যথেষ্ট। মাতৃপরিচয় অর্থহীন সেখানে। কারণটা ভীষণ রকমভাবে স্পষ্ট। কুমারী মেয়ের পিতার পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় থাকতে নেই যে। বর্তমান আধুনিক সমাজও এখনো এই মানসিকতায় কলুষিত। গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্যে ঋষি গালবের আটশো ঘোড়ার প্রয়োজন। তার বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ঋষি গালবের হাতে নিজের সদ্য যুবতী কন্যা মাধবীকে সমর্পিত করেন রাজা যযাতি। ততক্ষণে সুপুরুষ, সুদর্শন গালবের প্রেমে পড়েছেন মাধবী। পিতা যে ছল - চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তাকে

গালবের অভীষ্ট পূর্ণ করার উদ্দেশ্য ভোগ্যপণ্য হিসেবে তুলে দিয়েছেন সেই ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি তাঁর। সবকিছু জানার পরেও প্রেমে ব্যাকুল মাধবী গালবের সাথে জীবন কাটানোর স্বপ্নে বিভোর। তাই গালবের গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আটশো ঘোড়া জোগাড় করার জন্যে একের পর এক রাজার সঙ্গে সহবাস করে পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে হয় মাধবীকে। এমনকি গালবের গুরু বিশ্বামিত্রের সঙ্গেও সহবাস করে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় সে। তিন রাজার মতো ঋষি বিশ্বামিত্রও তাঁকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে শেষ করলেন। অবশেষে গালবের গুরুদক্ষিণা পূরণ হয়। এতদিন মাধবীর মাথার মধ্যে শুধু একটাই জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছিল - কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বিপদে সাহায্য করাই নারীর ধর্ম। অবশেষে প্রেমের মোহ কাটে তাঁর। গালবকে যখন বাকি জীবনের জন্যে পাশে চায় মাধবী, গালব জানায় –

"...সারা জীবন ধরে? আমার আশ্রমে? তোমাকে নিয়ে? তুমি কি জানো না, তোমাকে আশ্রমে আর নিয়ে যাওয়া যায় না? আশ্রম অতি পবিত্র স্থান, অন্যপূর্বা নারীকে নিয়ে সেখানে বাস করাটা অধর্ম। আমি কোনও ভাবেই তোমাকে আমার সহধর্মিনী করতে পারি না।"[৭]

মাধবী চাইলেই বাবার বাড়িতেই থাকতে পারতো। কিন্তু ঘরে অবিবাহিত মেয়ে থাকলে নাকি বাবার স্বর্গে ঠাঁই হয়না। পিতা যযাতি ও পাঁচ ভাই মিলে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। বর্তমান সমাজেও কন্যা দায়গ্রস্থ এমন পিতার অভাব নেই। কোনোরকমে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু মাধবী কারো গলায় মালা দেয় না আর। পুরুষজাতির উপর তীব্র ঘৃণা জন্মে গিয়েছে তার মধ্যে। স্বয়ম্বর সভায় তার বরমালা শুকিয়ে যায়, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা তীব্র আর্তনাদগুলো যেন বলে ওঠে –

"...কাকে পরাব এই মালা? কোন হর্যশ্ব দিবোদাস উশীনর অথবা বিশ্বামিত্রকে? অথবা কোন গালবকে? এদের একজনকেও না বাছার স্বাধীনতা আজ আমার আছে, কিন্তু তারপর? বাবার কাছে থাকা, সেও তো এক পুরুষের আশ্রয়েই থাকা। বাবা মারা গেলে ভাইদের আশ্রয়, তারাও তো পুরুষ। অপেক্ষা করব ছেলেরা কবে বড় হয়ে মাকে নিয়ে যাবে? হায়, ততদিনে তারাও তো এক একটা আস্ত পুরুষ মানুষ হয়ে যাবে!"[৮]

মাধবী মনস্থির করে সে জঙ্গলে চলে যাবে। বাঘ – ভাল্লুক – শিয়াল - কুকুরদের মত হিংস্র প্রাণীদের জগত মানুষের সমাজের মত এত হীন হবে নাকি সংশয় প্রকাশ করে সে।

বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা এখনও একইরকম রয়ে গিয়েছে। আধুনিক সমাজে দাঁড়িয়ে এইরকম কত শত – শত, হাজার - হাজার মাধবী, হাজার - হাজার নারীমন ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে নিত্যদিন। নারীরা আজও লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা। তাঁদের নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই, নেই কোনো স্থায়ী ঠিকানা। পুরুষের পরিচয়েই সে পরিচিতা। আমরা যেমন কোনো জিনিস ব্যবহৃত হয়ে গেলেই তাঁকে খেলনা পুতুলের

মতো আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেই, ঠিক তেমনই নারীকে ভোগ করা হয়ে গেলে, নিজের লালসা, কামনা বাসনা চরিতার্থ হয়ে গেলেই অনেক পুরুষ তাকে বিসর্জন দেয়। ফেলে দেয় সমাজের জঞ্জাল - আবর্জনায়। এই প্রথা যেন চিরন্তন। যার থেকে মুক্তির দ্বার আজও যথার্থভাবে উন্মোচিত হয়নি। গল্পের মাধবী তবু শেষপর্যন্ত পেরেছিল কাউকে বিয়ে না করার মতো, দাসত্বের শিকলে বাঁধা না পড়ার মত চরম সিদ্ধান্ত নিতে, কিন্তু বাস্তবের অনেক মাধবীর সেই অধিকারটুকুও নেই নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার, নিজের শর্তে চলার, নিজের শর্তে বাঁচার। যেদিন সেই অধিকার তারা সম্পূর্ণরূপে অর্জন করবে সেদিন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় তীব্র কুঠারাঘাত পড়বে।

‘চেনা-অচেনা’ গল্পের বিষয়বস্তু একটু ভিন্ন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবালা - একটি কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ে হয়েও গৃহকর্ত্রীর প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসার কাহিনি বলে এই গল্প। দেওয়া - নেওয়ার সম্পর্কের মাঝেও, টাকা - পয়সার হিসেবের মাঝেও যদি কিছু অবশিষ্ট পড়ে থাকে, তা হল অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা। অর্থসর্বস্ব সামাজিক মানসিকতার ভিড়েও তা যে এখনো চিরতরে হারিয়ে যায়নি সেই সত্যটাই তুলে ধরেন লেখিকা। সকাল সাতটার ট্রেন ধরে বাড়ি থেকে মিতালি - অনিমেষের ফ্ল্যাটে আসে সুবালা। রান্না থেকে শুরু করে ঘরদোর পরিস্কার করা, জামা-কাপড় কাচা - সব একার হাতেই করে সুবালা। এর সঙ্গে রয়েছে মিতালির ছেলে টুবলু স্কুল থেকে ফিরে এলে তার বিকেলের নিত্যনতুন টিফিন করে দেওয়া। আবার স্বামী - স্ত্রী অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এলে তাঁদের জন্য রাতের খাওয়ার তৈরি করে দেওয়া - এই এতকিছুর পরে তাঁর সারাদিনের কাজ শেষ হয়। আক্ষরিক অর্থে সংসারটা মিতালি - অনিমেষের হলেও সুবালা না থাকলে তাঁদের জগৎ অন্ধকারময়। শহুরে চালচলনের ছাপ আর ফ্ল্যাট নিবাসী আদব-কায়দা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন লেখিকা। সেই সুবালার এখন ছুটির দরকার কিছুদিনের। জরায়ুর একটা অপারেশন করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, নাহলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা। মাথায় যেন বাজ পড়ে মিতালির। মুখে অপারেশনটা করতে বললেও মনে মনে ভাবে দেরী করে করলেই পারত, সুবালা ছাড়া একা হাতে সবকিছু সামাল দেওয়া যে সম্ভব নয় তাঁর।

অপারেশন করে দুসপ্তাহ পরে ফিরে এলেও সুবালা যে ট্রেনের ভিড় ঠেলে এখানে আসতে পারবে বা কোনো কাজ করতে পারবে - সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে মিতালি। সুবালাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো কাজের লোককেও যে ভরসা করা যায় না –

“...একটু আলু পেঁয়াজ সরানোর অভ্যেস ছাড়া সুবালার সেরকম কোনও হাত টান নেই। ভরসা করে গোটা বাড়ি ওর ওপর ছেড়ে রাখা যায়। নতুন লোক কোথায় কাকে ঢোকাবে, পুরো ফ্ল্যাটই হয়তো সাফ হয়ে যাবে একদম।”[৯]

আসলে স্বামী - স্ত্রী চাকরি করেন এমন শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনগুলো তো সুবালার মতো কাজের মেয়েদের ওপর নির্ভর করেই টিকে রয়েছে দিনের পর দিন।

অপারেশনের সময় সুবালার মেয়ের দায়িত্ব যে তাঁর ঘাড়েই পড়বে সেই হিসেবও করে নেয় মিতালি। অপারেশনের সময় একবোতল রক্ত লাগবে। তারপর ইনজেকশন, ঔষধ - সবমিলিয়ে হাজার দুয়েক মত টাকা খরচ হবে। মিতালির কাছে কিছু টাকা ধার চায় সুবালা - মাইনে থেকে কেটে নিতে বলে। সুবালাকে টাকা ধার দেওয়ার মতো আসলে আর নেই কেউ। আত্মীয় - স্বজন এমনকি তার দিদি - জামাইবাবু পর্যন্ত কেউ নেই। মনে মনে বিরক্ত হয় মিতালি -

"...আহ্লাদের বেলায় দিদি, ঠেকায় পড়লে বউদি। সারাক্ষণ শুধু দাও দাও। জাতটাই এরকম।"[১০]

অনিমেষ মনে করিয়ে দেয় সুবালা কিন্তু মিতালির জন্য অনেক কাজ করে। মিতালিও দাঁড়িপাল্লায় ওজনের মতো হিসেব করে –

"...তার বদলে সুবিধেটাও কম পায় না। মাস গেলে নশো টাকা মাইনে বাদই দিলাম, মেয়ে নিয়ে আসছে, থাকছে, খাচ্ছে...কোন বাড়িতে এটা অ্যালাও করবে বলো? পাওয়ার লোভেই করে। পায় বলেই করে।"[১১]

অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হয় সুবালা। অথচ তাঁর আত্মীয় - স্বজন, দিদি - জামাইবাবু কেউ নেই তাঁর পাশে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সুবালাকে দেখতে হাসপাতালে আসে মিতালি। মিতালিকে পাশে পেয়ে বুকে যেন সাহস পায় সুবালা; মিতালির হাত শক্ত করে চেপে ধরে। তাঁর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে যেন মিতালি তাঁর মেয়ে টেঁপিকে দেখে। মায়া হয় মিতালির। মিতালির আশ্বাসবাণী শুনে শান্ত হয় সুবালা। অপারেশনের পর প্রায় অচেতন দশায় চোখ না খুলে মিতালিকে খোঁজে সুবালা –

"...আমার বউদি কোথায়? আমার বউদি? অফিসের দেরি হয়ে গেল... বউদিকে ভাত দাও... চাটনি দাও...চাটনি ছাড়া বউদি খেতে পারে না গো... টিফিনটা খেয়ো বউদি, ওটুকু না খেলে শরীর থাকবে কী করে...।"[১২]

আশ্চর্য হয় মিতালি। অবচেতন মনে, যাকে হ্যালুসিনেশন বলে - ওই অবস্থায় সুবালা আর অন্য কাউকে খোঁজেনি – "...মেয়ে নয়, মা নয়, পালিয়ে যাওয়া বরটা নয়, আর কোনও আত্মীয় নয়, প্রথমেই মিতালিকে খুঁজছে সুবালা?"[১৩]

মিতালির হৃদয়কে তোলপাড় করে দেয় অজস্র ভাবনা। এটাকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধে আটকে রাখা যায় না - তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। গৃহকর্ত্রী আর কাজের মেয়ের সুবালার মধ্যে প্রেম - প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ আর আবেগের সংমিশ্রন জলছবির মতো সুস্পষ্ট করে এঁকে দেন লেখিকা। তাইতো শিহরিত হন মিতালি। কড়ায় - গন্ডায় হিসেব করলে সুবালা যে তাঁর জন্য অনেক বেশি করেছে - টাকাপয়সা দিয়ে যার ঋণ কখনও কেউ মেটাতে পারবে না। সহজ - সরল ছোটগল্পের আড়ালে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বাঙালি মধ্যবিত্ত শহুরে জীবনে অভ্যস্ত, ফ্ল্যাট নিবাসী মানুষদের সাথে জড়িত এরকমই হাজার হাজার সুবালার মতো বিশ্বস্ত কাজের মেয়ের আত্মত্যাগের

কাহিনি, গৃহকর্ত্রীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার কাহিনি, ভরসার কাহিনির দিকে আলোকপাত করেন। তুলে ধরেন সেইসব নারীদের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার কথা - যারা পেটের দায়ে নিজের সংসার ভুলে গিয়ে অন্য মানুষদের সংসারকে প্রতিনিয়ত আবেগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সঠিক ছন্দে বেঁধে রেখেছেন। যেখানে অর্থ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজে অনবরত ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনাবলী, প্রসঙ্গ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভাসিত হয় সাহিত্যে। একজন সাহিত্যিকের আসল সার্থকতা সেখানেই। পরকীয়া সম্পর্কের ফলে আগত নর - নারীদের জীবনের অবাঞ্ছিত জটিলতা, মানসিক অস্থিরতা, দাম্পত্য সম্পর্কের ফাটলকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য তার 'দুই নারী' গল্পে খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। আবার তার 'আমি মাধবী' গল্পের মাধবী কোনো পুরুষের আশ্রয়েই আর বন্দী থাকতে চায়নি। নিজের বাকি জীবন নারীসত্তার মুক্তির ভাবনায় কাটাতে চেয়েছে। উত্তরণ ঘটেছে তার নারী জীবনের। 'চেনা অচেনা' গল্পের সুবালা নিজের না পাওয়া সাংসারিক সুখগুলোকে মিতালি - অনিমেষের সংসার সামলানোর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। কাজের মেয়ে হয়েও মিতালির যত্ন নেওয়া, তাদের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসার মাধ্যমে তার বুকের গভীরে চেপে রাখা কষ্টগুলোকে লাঘব করার চেষ্টা করেছে। স্বামী ছেড়ে চলে গেলেও সুবালা কিন্তু দমে যায়নি। প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে নিজে কিছু করার তাগিদ, মেয়েকে বড় করার তাড়না তাকে স্বনির্ভর করে তুলেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী চিরদিনই অবহেলা, বঞ্চনার শিকার হয়। আধুনিক নারীমনের শব্দকল্পনা, আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ, কষ্ট, যাতনাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। তাঁদের নিজস্ব জগৎ, নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে সাবলীল ও সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর কাহিনিগুলোতে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্পগুলো যেমন নারীদের প্রতি হওয়া শোষণ, অত্যাচার, মানসিক নিপীড়নের গল্প বলে, তেমনি সেই সব অন্যায় এর বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের সত্তার মুক্তির দিশা দেখায়। জীবনধারণের তাগিদে, নিজের আত্মসম্মানবোধ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় কখনও তারা পরিবারের বিরুদ্ধে কখনও বা সমাজের চোখরাঙানির বিরুদ্ধে যেতেও পিছুপা হয়নি। প্রয়োজনে তারা বিষময় সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, বিচ্ছেদের মত যন্ত্রনাবিদ্ধ অধ্যায়গুলো পেরিয়ে এসে নব আশা, নব ভাবনার সঞ্চার ঘটিয়েছে। খুঁজে পেয়েছে আবার প্রথম থেকে জীবনকে নতুনভাবে শুরু করার অনুপ্রেরণা, যা ভরসা জুগিয়েছে প্রতিনিয়ত নিপীড়িত হওয়া এমন শত - শত নারী হৃদয়কে। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প নতুন নতুন কাহিনি সম্ভারে সমৃদ্ধ। নারীদের প্রতি হওয়া অন্যায়, অবিচারকে বাস্তব সমাজের দৃষ্টিকোণে ফেলে একদম স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর ছোটোগল্পে। জীবনবোধ ও সাহিত্যরস তাঁর প্রত্যেকটি গল্পকে করে তুলেছে স্বকীয়, সমাজধর্মী আর বাস্তবমূলক। নারীদের প্রতি অন্যায় দেখলেই গর্জে ওঠে তাঁর নারীসত্তা। তাঁর গল্পের নারীরা নবজীবনের পথে পাথেয় হয়েছে।

তথ্য সূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প (প্রথম পর্ব), ১৩ বি ব্লক বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা - ৫৫, পুষ্প, পৃ. ১৫৯
২. তদের, পৃ. ১৫২
৩. তদেব, পৃ. ১৫৮
৪. তদেব, পৃ. ১৬১
৫. তদেব, পৃ. ১৬১
৬. তদেব, পৃ. ১৬১
৭. তদেব, পৃ. ৫৭
৮. তদেব, পৃ. ৫৯
৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০১৫, নির্বাচিত পঞ্চাশ, ১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, সাহিত্যম্, পৃ. ৬৮
১০. তদেব, পৃ. ৭১
১১. তদেব, পৃ. ৭১
১২. তদেব, পৃ. ৭৩
১৩. তদেব, পৃ. ৭৩।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ : নারীর রুদ্ধসঙ্গীত

আসিফা সুলতানা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে নারীকে বিচার করা হয় সবসময়ই পুরুষের সাথে তার সম্পর্কের নিরিখে। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী কখনো তার একক অস্তিত্বের কথা অথবা অধিকারের দাবি নিয়ে প্রশ্ন রাখতে পারে না। সিমন দ্যা বোভোয়ারের বিখ্যাত উক্তি কেউ নারী হয়ে জন্মায় না সমাজ তাকে নারী করে তোলে প্রতিমুহূর্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সমাজ নির্ধারিত নারী স্বভাবের অথবা মেয়েলিত্বের সেই কনসেপ্টকে যার ব্যতিক্রম হলে নারীকে পেতে হয় পুরুষালী নারীর তকমা। এ ক্ষেত্রে যা কিছু সহজ-স্বাভাবিক-সুন্দর-নমনীয় তার রূপকে কল্পনা করা হয় নারীকে। কিন্তু এই কল্পনার বাইরে গিয়ে বিশ শতকের শেষের দিকে মেকি আধুনিকতা থেকে সরে এসে এক নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে জনসমক্ষে একজন নারী তার মৌলিক প্রতিবাদের দাবি জানাতে পারে কিনা? তার উত্তর খুঁজতে চেয়েছিল সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ উপন্যাসের ঝিনুক। কিন্তু যে সমাজের কাছে নারী স্বাধীনতা নিছক একটি প্রলোভন,‘স্বাধীনতার মরীচিকার’ নামান্তর মাত্র সেখানে একজন নারীর একক প্রতিবাদ যে কোন মূল্য পাবে না তা খুবই স্বাভাবিক। তাইতো হার মানতে হয় ঝিনুককেও। শুধুমাত্র বিশ শতক নয় আজ একুশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটেও দহন উপন্যাসের ঘটনা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। তাই আমরা আলোচ্য নিবন্ধটিতে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ উপন্যাসটিকে একটি প্রতিবাদী সত্তার কণ্ঠ এবং সেই কণ্ঠকে রোধ করতে যে পরিকল্পিত পূর্বনির্ধারিত প্রচলিত সামাজিক সুকৌশল তার প্রেক্ষিতে আলোচনা করব।
সূচক শব্দ: নারী অবমাননা, আত্মবিশ্বাস, বৈবাহিক ধর্ষণ, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, একক প্রতিবাদ।

মূল আলোচনা:

“কোন পুরুষবাহিত অনভিপ্রেত ঘটনায় কেন শুধু মেয়েদের গায়েই কালি লাগে? মেয়েরা কী? মনবিহীন মস্তিষ্কবিহীন শুধুই একটা শরীর? একটা জঠর? গর্ভাশয়?”[১] বিশ শতকের শেষের দিকে আধুনিক কলকাতায় দাঁড়িয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছিল সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ উপন্যাসের ঝিনুক। ঝিনুকের পূর্বসূরী সত্যবতী সুবর্ণরাও ঠিক এই একই দাবি নিয়ে বুঝতে চেয়েছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মূল্যবোধকে। কখনো প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো ন্যায্য অধিকারের দাবিতে তারা বিদ্রোহ

করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের অস্তিত্ব আর অধিকারের দাবি আছড়ে পড়েছিল সমাজ বাস্তবতার অভিঘাতে। প্রকৃতির নিয়মে সময় হয়তো আজ অনেকটাই এগিয়ে এসেছে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ছবির কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়েও নারীর প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায় অনাচার, ধর্ষণ, বধূ-নির্যাতন, ইত্যাদি ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয় আমাদের। প্রতাপের রাজনীতিতে নির্যাতিতা আজও মেয়েরাই। তাই নারী স্বাধীনতা নিয়ে বড়াই করা সামাজের কাছে নারী নিরাপত্তা আজও প্রশ্নের বিষয়। আজও নারীর উপর ঘটে যাওয়া অনাচারের বিরুদ্ধে নারী সুরক্ষার দাবি জানিয়ে পথে নামতে হয় জনসাধারণকে যথার্থ বিচারের দাবিতে দীর্ঘ অপেক্ষায় দিন গুনতে হয়। আর এই ঘটনা নতুন কিছু নয় এবং বাস্তবসম্মত এই ঘটনার ছবি দেখা যায় একাধিক বাংলা উপন্যাসে।

বিশ শতকীয় লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ বাস্তবতাকে। তার লেখা প্রতিটি উপন্যাসে আধুনিক জীবনের নানা সমস্যার কথা যেমন স্থান পেয়েছে। ঠিক তেমনি আধুনিক নরনারীর মানসিক জটিলতা, সম্পর্কের টানা-পোড়েন ইত্যাদি বিষয় গুলিও তিনি তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমাজে যা প্রায়ই বা হামেশাই ঘটে এইরকম কাহিনী নিয়ে তিনি তার উপন্যাসের প্লট সাজিয়েছেন। তাই তার লেখা প্রতিটি উপন্যাস কোথাও না কোথাও সমাজ বাস্তবতার সেই ছবিকে তুলে ধরে যার সাথে কানেক্ট করতে পারে প্রতিটি পাঠক। তার 'দহন' উপন্যাসটিও এমনই এক সামাজিক সত্যকে দাবি করে। বিশ শতকের সামাজিক পেক্ষাপটে ধর্ষণ, বৈবাহিক ধর্ষণ, নারী পুরুষের স্থানিক বৈষম্য ইত্যাদি ঘটনাগুলি নিয়ে দহন উপন্যাসের কাহিনী, আর খুবই বাস্তবসম্মত এই কাহিনীর মূল আকর্ষণ ঝিনুক নামক একটি মেয়ের প্রকাশ্য জনসম্মুখে টালিগঞ্জ মেট্রো চত্বরে ঘটে যাওয়া রমিতা চৌধুরী নামক এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সমবয়সী আর পাঁচটা ছেলে মেয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ঝিনুক। বিশ শতকের শেষের দিকের চটকদার আধুনিকতা তাকে টানে না। সে বাচ্চাদের স্কুলে শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত হয়েছে। সুতরাং আর্থিকভাবেও সে স্বনির্ভর। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জানে আর এই প্রতিবাদপ্রথম থেকেই ছিল ঝিনুকের সত্ত্বাতে। কখনো সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে, কখনো কলেজে ঢুকে র‍্যাগিং নামক নোংরামির বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করে। ছোটবেলা থেকেই ঝিনুক লক্ষ্য করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর গুরুত্ব একজন পুরুষের থেকে কম। তাই তার বাবা মা মানস ও সুজাতা ঝিনুককে সমস্ত রকম স্বাধীনতা দিয়ে বড় করে তুললেও ভাই ছোটনের প্রতি তার বাবা-মায়ের আচরণের বৈষম্যটা ঝিনুক স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই। যেখানে ঝিনুক কে পড়াশোনা শেখানো নিছক এক সামাজিক দায়বদ্ধতা তাতে কোন যত্নের স্পর্শ নেই, কিন্তু বিপরীত দিকে ভাই ছোটনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি।

শুধুমাত্র মানস ও সুজাতার এই দ্বিচারী আচরণকেই নয় ঝিনুক বুঝতে পারেনা তার চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষদের মন ও মানসিকতাকে। নারী সম্পর্কে তার যে ধারনা তার সাথে সে মেলাতে পারেনা বাস্তবতাকে তার মনে উঠতে থাকে একাধিক প্রশ্ন। কেন বিয়ের ব্যাপারে পাত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় সমাজ, কেন বিয়ে নামক সম্পর্কে নারী-পুরুষ সমান অধিকার রাখতে পারে না, কেন সহকর্মী সুনিতা দি সমস্ত কথাতেই হালকা সিঁদুরের মতো তার স্বামীর উপস্থিতিকে ছুঁয়ে যায়, ইত্যাদি প্রশ্নগুলি তার মনোজগতে দ্বিধার সৃষ্টি করে। আর এই যাবতীয় দ্বিধা কোথাও যেন উত্তর খুঁজে পায় উপন্যাসের শেষে মৃণালিনীর ব্যাখ্যা করা 'স্বাধীনতার মরীচিকা' নামক বাস্তবতায়। ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য যেন নিজের অভিজ্ঞতার যাবতীয় তথ্য দিয়ে নিজের কথাগুলিকে বলিয়ে নিয়েছেন এই বৃদ্ধার মুখ দিয়ে, "স্বাধীনতা হলো মনের অনুভূতি। তোদের সেই মনের স্বাধীনতাটাকে ছেলেরা কখনোই মানবে না। আমরা সভ্য হলেও পৃথিবীতে এখনো আদি কালের নিয়মটাই চলে। যার শক্তি বেশি তার কথাই আইন। জোরটাও তার।"[২] উপন্যাসের শেষে এসে ঝিনুকও মেনে নেয় ঠাকুরমার কথাকে। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে সেও বুঝেছে ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি সোশ্যাল ইমেজ নামক কনসেপ্ট গুলির কাছে একজন নারীর সম্মানের মূল্য আর সেই সম্মানের দাবি নিয়ে যে প্রতিবাদ তার মূল্য বড়ই ঠুনকো। নাতনি ঝিনুকের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে অভিজ্ঞ মৃণালিনী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে প্রতিবাদের মূল্য নির্ণয় অপেক্ষা প্রতিবাদ করার যে ক্ষমতা তার মূল্য অনেক বেশি। কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে গান্ধারীর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিরুদ্ধে, দ্রৌপদীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে করা প্রতিবাদের কথা। মহাভারতের এবং রামায়ণে নারীর অবমাননার পরিণতির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বাস্তবের সাথে সে ছবি মেলেনা। গান্ধারির মতো ঝিনুকও প্রতিবাদ করেছিল একদিন। টালিগঞ্জের মেট্রো চত্বরে রমিতা চৌধুরী নামক এক গৃহবধূর শ্লীতাহানির বিরুদ্ধে। নিজের কথা না ভেবে এলোপাথারি ব্যাগ চালিয়ে চারজন গুন্ডার কবল থেকে উদ্ধার করেছিল রমিতাকে। শুধু তাই নয় নিরব দর্শকের ভূমিকায় থাকা দর্শকদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার জানিয়ে রমিতা ও তার স্বামী পলাশকে নিয়ে থানায় ডায়েরি করে এসেছিল, ভীষণভাবে চেয়েছিল অপরাধীরা শাস্তি পাক। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী ঝিনুকের যাবতীয় প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছিল বিপক্ষ উকিলের মিথ্যে কথার জালে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর একক প্রতিবাদ যে কখনোই টিকে থাকতে পারেনা তার প্রমাণ পেয়েছিল ঝিনুক। তাইতো ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা চাকুরীরতা ঝিনুককে মুহূর্তের মধ্যে রাতবিরেতে খদ্দের ধরা নষ্ট মেয়ে হিসাবে প্রমাণ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি বিরোধী পক্ষের উকিলের। তাই প্রতিবাদের মূল্য নিয়ে ঠাম্মা মৃণালিনীর সাথে ঝিনুকের মত মিলে না কিছুতেই, "না গো ঠাম্মা প্রতিবাদের দাম কোথাও নেই দেখলে তো আমিও কেমন হেরে ভূত হয়ে গেলাম।"[৩]উপন্যাসের শুরুতে যে ঝিনুককে আমরা দেখেছিলাম আত্মবিশ্বাসে ভরপুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক প্রতিবাদী নারী

সত্ত্বা হিসাবে উপন্যাসের শেষে এসে সেই ঝিনুক আর স্বভাবভীরু রমিতা চৌধুরির মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঝিনুকের এই হেরে যাওয়া তার একার হেরে যাওয়া নয়। এই হার অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিটি কণ্ঠের পরাজয়। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে একজন নারীর নিরাপত্তা এবং তার অস্তিত্ব উভয়ই সংকটের বিষয় সেখানে একটি নারীর একক প্রতিবাদ যে সুকৌশলে দমন করা হবে এটা খুবই স্বাভাবিক। দহন উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই একটা সময় পরে ঝিনুকেরও প্রতিবাদ স্থিমিত হয়ে আসে। আর এই প্রতিবাদী সত্ত্বার কণ্ঠ রোধ করার প্রয়াস চলতে থাকে শুরু থেকেই। ঝিনুক তার এই লড়াইয়ে কখনোই কাউকে পাশে পায়নি। যে বাবা-মা তাকে ছেলে মেয়ে সমান সমান এই শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলেছিল তারাও একটা সময় পরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে আর পাঁচটা বাবা মার মত তাদের কাছেও মেয়ের নিরাপত্তার কথা দুঃশ্চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। মা সুজাতা স্পষ্ট ভাষায় ঝিনুককে জানিয়ে দেয়, "লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, চাকরি করতে দেয়া হয়েছে তাতেই তুমি পুরুষ মানুষের সমান হয়ে গেলে নাকি?"[৪] বাবা মানস বোঝাতে চেষ্টা করে রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে বিচারের দাবি রাখা প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। কোথাও না কোথাও ঝিনুকও জানে এই সত্যি। তাইতো তার অন্তঃকরনেও ভয় কাজ করে। বাড়িতে আসা অযাচিত ফোন, রাস্তায় অপরিচিত লোকের চলাফেরা কোনওটাকে সে অবজ্ঞা করতে পারেনি। তূণীরের কথায় যা ধরা পরে এভাবে, "জেনেটিক ফ্যাক্টারটা তাহলে ভুল বলিনি বল? তোর মতো বীরাঙ্গনাও কেমন ভয়ে কাঁপছে।"[৫] আর ঝিনুকের এই ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক কারণ আজ যা রমিতার সাথে হয়েছে তা ঝিনুকের সাথেও ঘটতে পারে। ঝিনুক এই ভয়কে হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারতো যদি তার পরিবার এবং তার পরিচিতদের সে এই লড়াইয়ে পাশে পেত। কিন্তু ঝিনুকের এই ভয়কে তার ভিতরে চলতে থাকা অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল তারই পরিচিত কিছু মানুষ। টালিগঞ্জের মেট্রোচত্বরে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর পরিচিত মহলে সে প্রশংসিত এবং বাহবা পেলেও তা ছিল সাময়িক; বরং এই ঘটনার পর থেকে ঝিনুকের প্রতিটি আচারনকে সবাই নারী স্বভাবের বিপরীত আচারন বলে শোনাতে শুরু করে। স্কুলের ছাত্রের অভিভাবকের করা কমপ্লেন এবং ঝিনুকের কথার টোনে সুনিতা অ্যান্টি 'এগ্রেসিভনেস' দেখতে পান। অন্য এক সহকর্মী গীতালিও তাকে জানায়, "তোর মধ্যে এখন যেন সব ব্যাপারেই বেশি যুক্তি যুক্তি ভাব। একটু বেশি তর্ক করার প্রবণতা। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না শ্রবণা। কেমন যেন রাফ...পুরুষালি পুরুষালি হয়ে গেছিস"[৬] বাড়িতে সুজাতাও তাকে নানা কথার মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার যে তার মধ্যে 'মেয়েলিত্ব' বলে আর কিছু নেই। এই সমস্ত কথাগুলো ঝিনুক ঝেড়ে ফেলতে পারে না কথাগুলি তাকে দংশন করতে থাকে তাই একদিন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে বাঁচতে চাওয়া ঝিনুক খুঁজতে শুরু করে ঠিক কিসের ওপর ভিত্তি করে পুরুষত্ব আর মেয়েলিত্ব মাপা হয়। এই প্রথম তার

আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। সে কখনও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বাথরুমের আয়নায় কখনও স্কুলের টয়লেটের আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মেলাতে চেষ্টা করে ঠিক কোথায় তার পরিবর্তনটা। নিজের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নে তার সন্দেহ জাগে। সে ভাবতে থাকে "সত্যিই কি সে বদলে গেছে? মন তো আগে ছাপ ফেলে মুখে। কই তার শারীরিক লাবন্য তো বিন্দুমাত্র টসকায়নি। তবে কি এই পরিবর্তন আরও নিগূঢ় কিছু! পুরুষালি বলতে কি বোঝে মানুষজন? মেয়েলিত্বই বা বলে কাকে? আত্মবিশ্বাসহীনতাকে? প্রশ্নহীন আনুগত্যকে?"[৭] হয়তো উপন্যাসের এই পর্যায়ে এসে ঝিনুকও বুঝতে পারে প্রতিবাদ, অধিকারের লড়াই এগুলো নিতান্তই বেমানান মেয়েদের ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয় উপন্যাসের শুরুতে ঝিনুকের যে আত্মবিশ্বাস ছিল তার নিজের সম্পর্কে এবং সমাজের রক্ষক পুলিশ প্রশাসনের ওপর তাতেও চিড় ধরতে শুরু করে পরবর্তীতে। তাই বাড়িতে আসা অযাচিত ফোনের অভিযোগ জানাতে গিয়ে থানায় আসা নতুন ও.সি যেভাবে ঝিনুকের সাথে কথা বলে তাতে থানার প্রতি তার এক তীব্র বিতৃষ্ণা দেখা যায়। অথচ একদিন এই থানা পুলিশের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল।"নতুন ও.সিটা অতিশয় অভদ্র। বসতে পর্যন্ত বলে না! কী বিশ্রী টিটকিরি মারা কথাবার্তা.........ছেলেগুলো তো এমনিতেই যথেষ্ট ফেঁসে আছে ম্যাডাম, তিলকে তাল করে আরও বেশি ফাঁসাতে চাইছেন......"[৮] আসলে আমাদের এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু লোক থাকে যারা মন ও মানসিকতায় রক্ষণশীলতাকে বহন করে চলে সময়ের সাথে তাদের বাইরেটার আধুনিকতায় মুড়ে নেয় শুধু। আর সেই রক্ষণশীল পিতৃতন্ত্রেরই সুর শোনা যাই নতুন ও.সির গলায়। আর শুধু তিনি একা নন এই উপন্যাসে রমিতার শ্বশুর, মৈনাক, পলাশ, তূণীর ইত্যাদি পুরুষ চরিত্র গুলিকেও আমরা রক্ষণশীল পিতৃতন্ত্রের আওতায় ফেলতে পারি। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ঝিনুকের প্রেমিক তূণীর যেমন সহকর্মী নিলমের কাজকর্মকে নেহাতি মেয়েলির আওতায় ফেলে অবজ্ঞা করে, এবং একজন নারীর চাকরী করা আর একজন পুরুষের চাকরিকে কখনো এক পর্যায়ে রাখতে পারে না। ঠিক তেমনি তথাকথিত শিক্ষিত মার্জিত সভ্য পলাশ নিজের স্ত্রীকে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলেও একজন পুরুষ হয়ে নারীর (ঝিনুক) কাছে হেরে যাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। তাইতো ঝিনুকের ওপর জমে থাকা ক্রোধের সে প্রতিশোধ নেই নিজের স্ত্রী রমিতাকে ধর্ষণ করে, "উন্মাদের মত বিড়বিড় করে চলেছে .... দেখি কোন শ্রবণা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে। দেখি দেখি"।[৯]

যে রমিতা চৌধুরীকে ঝিনুক একদিন সকলের সামনে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সেই রমিতাকে স্বামীর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। এমনকি রমিতার অপমানের বিরুদ্ধে যে দাবি ঝিনুক উঠিয়েছিল তাতেও সে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা ঝিনুকের একার নয় সেদিন রাতে মেট্রো চত্বরে নীরব দর্শকের ভুমিকায় থাকা প্রতিটি মানুষের। তারা চাইলে ঝিনুকের পাশে দাঁড়াতে পারতো, বিপক্ষ পক্ষের

উকিলের দিন কে রাত করে দেওয়া মিথ্যার সত্য উন্মোচন করতে পারতো। কিন্তু তারা করেনি শুধু ‘ নপুংসকের’ মত দাঁড়িয়ে দেখেছে। আর যে মানুষটাকে ঝিনুক ভীষণভাবে পাশে পেতে চেয়েছিল ঝিনুকের সেই প্রেমিক সাতাশ বছরের শিক্ষিত মার্জিত সভ্য সি.এ তূণীর মজুমদারের কাছে প্রেমের থেকে বড় হয়ে ওঠে স্বার্থ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আর বিদেশ যাওয়ার নেশা তাকে এতটাই জাকড়ে ধরে যে তিয়াত্তর পাতার প্রেম পত্র যাবতীয় প্রতিশ্রুতি সমস্ত কিছু মুহূর্তের মধ্যে মিথ্যে হয়ে যায়। সে স্পষ্টভাবে ঝিনুককে জানিয়ে দেয় যদি সে এই ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত না করে তাহলে তার পক্ষে আর সম্পর্কে থাকা সম্ভব হবে না। শুধু তো তূণীর নয় যে রমিতা চৌধুরীর উপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝিনুক প্রতিবাদ তুলেছিল সেই রমিতাও পারিবারিক চাপে এবং কিছুটা স্বভাব ভীরুতার জন্য ঝিনুকের পাশে থাকতে পারেনি। আসলে রমিতা চৌধুরী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অবস্থিত এমন একজন গৃহবধূ যাকে শোষণ করা যায় শাসন করা যায়। তার কাছে প্রতিবাদ আশা করা যায় না। যে নিজের উপর হওয়া অন্যায়ের কলঙ্ক গায়ে মেখে ধর্ষক স্বামীর সাথে সংসার করতে পারে। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সম্মান তার কাছে আত্মসম্মানের থেকেবড় হয়ে ওঠে। তাইতো যে পুরুষ স্বামী একদিন তাকে সুরক্ষা ও সম্মানের অঙ্গীকার দিয়ে গ্রহণ করেছিল সেই স্বামীর কাছে ধর্ষিতা হয়ে তারই সন্তান গর্ভে নিয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে শ্বশুরমশায়ের উকিল বন্ধুর শেখানো বুলি বলতে বাধ্য হয় রমিতা, “ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল আলো কম ছিল কারুর মুখ ভালো করে দেখতে পাইনি।”[১০]

উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখতে পাই একজন নারীর সামাজিক পরিবেশে প্রতিবাদ করার মৌলিক অধিকারের দাবি জানিয়ে যে লড়াই তাতে রমিতা চৌধুরীর বলা না বলাতে কিছু এসে যায় না, এই ভাবনা নিয়ে চলতে থাকা ঝিনুকের আত্মবিশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায় আলিপুর কোটের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একজন মেয়ের প্রতিবাদ রুদ্ধ হয়ে যায় প্রভাব প্রতিপত্তি, মিথ্যা সাক্ষী এবং সোশ্যাল ইমেজ নামক কনস্পেট এর কাছে। ঝিনুক বুঝতে পারে এই প্রতিবাদের কোন দাম নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মূল্য কেবল সমাজ নির্ধারিত। এখানে নারীর প্রতিবাদের কোন অধিকার নেই। নারীকে চলতে হবে চিরকাল পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে। রমিতাকে যেমন বাঁচতে হবে পলাশের স্ত্রী হয়ে ঠিক তেমনি তূণীর ভালবাসা টিকিয়ে রাখতে গেলে ঝিনুককেও স্বাক্ষর করতে হবে এক অলিখিত চুক্তিপত্রে কারণ, “ব্যক্তিগত সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে প্রতিটি পুরুষই হয়ে যাবে দুঃশাসন বা রামচন্দ্র! কেউ প্রকাশ্যে নারীকে বিবস্ত্র করতে চাইবে অথবা প্রেমিকের ছদ্মবেশে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলবে প্রিয়তমা নারীকে! যেন নারী শুধুই তার অধিকারের পণ্যসামগ্রী! প্রিয়তমা থাকতে হলে নারীকে অর্পণ করতে হবেনমনীয় দাস্য!”[১১] উপন্যাসের শেষে এসে দেখি এই দাস্যতা স্বীকার করে নিয়েছে ঝিনুকও ফিরে গিয়েছে তূণীরের কাছে।

তার যাবতীয় প্রতিবাদ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভাষা হারিয়ে বেরিয়ে এসেছে কেবল লক্ষ মন ভারি একটি দীর্ঘশ্বাস হয়ে।

তথ্যসূত্র:

১) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ.৮২

২) তদেব, পৃ. ১৬৬

৩) তদেব, পৃ. ১৬৭

৪) তদেব, পৃ.৮৮

৫) তদেব, পৃ. ৭৪

৬) তদেব, পৃ. ১০৪

৭) তদেব, পৃ. ১০৬

৮) তদেব, পৃ. ১৪০

৯) তদেব, পৃ. ৫৭

১০) তদেব, পৃ. ১৫১

১১) তদেব, পৃ.১৫১

সহায়ক গ্রন্থ:

১) অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক,আশাদীপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

২) সুতপা ভট্টাচার্য, 'মেয়েদের লেখালেখি' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪।

৩) ড. স্বপ্না নাথ, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে নারী পরিসর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৭।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে অতিপ্রাকৃতের আবেশ

পিংকি দেবনাথ
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের সর্বশাখায় যার অবাধ বিচরণ তার লেখা কয়েকটি ছোটগল্পে যেমন- নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, কঙ্কালে দেখা গেছে কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনা। জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু ডাক্তারকে তাঁর প্রথম স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং যত্নের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর রোগশয্যায় শায়িত থাকাকালীন যন্ত্রণা ও অবশেষে বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর হারান ডাক্তারের কন্যা মনোরমাকে বিবাহ করলেও প্রায়শই রাত্রে দক্ষিণাচরণবাবু তাঁর প্রথম স্ত্রীর হাসি এবং বিভিন্ন অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে 'নিশীথে' গল্পটি এবং ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে দেখা গেছে কথক এক প্রাচীন প্রাসাদে থাকাকালীন তিনি স্বপ্নাদর্শনে সেই প্রাসাদের ভিতর বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে দেখেন এবং মেহের আলির চিৎকারে তার এই ভ্রম ভঙ্গ হয়। পরে তিনি তার অফিসের কর্মচারীর কাছ থেকে সেই প্রাসাদের কিছু ঐতিহাসিক গল্প জানতে পারেন এবং এও জানতে পারেন যে কেউ যদি ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে থাকে তাহলে সে আর বেঁচে ফেরে না। একমাত্র মেহের আলি পাগল হয়ে বেরিয়েছে, যা গল্পদুটিতে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।
সূচক শব্দ: ওরিয়েন্টাল, ব্যক্তিত্ব, অনুপ্রবেশ, সাহিত্য, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, রাজনীতি, সমকালীন সমাজ, অলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃত, মনোবিকার, আত্মহত্যা, পরামর্শ, বিস্ময়কর, আবেগ, মানবিক সম্পর্ক।

।। এক ।।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্রে তাঁর স্থান বিভিন্ন শাখায়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন করে পড়াশোনা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষায় অনাগ্রহী হওয়ায় পরবর্তীকালে বাড়িতেই গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আট বছর বয়সে কবিতা লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশ ঘটে। সাহিত্যের সর্বশাখায় তাঁর নির্বাধ এবং বিস্ময়কর পদচারণা,

সর্বভূমিতে তাঁর বিচরণ, সর্বক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপ্তি। তাঁর লেখার বহু বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় হলো ছোটগল্প। তিনি মোট ৯৪ টি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন।

১৮৭৭ সালে মাত্র ষোলো বছর বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিনী' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। পরবর্তীকালে লেখক কর্তৃক পরিত্যক্ত এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী পত্রিকার শ্রাবণ – ভাদ্র ১২৮৪ সংখ্যায়। এরপর সাত বছর রবীন্দ্রনাথ কোনও গল্প রচনা করেননি। ১৮৮৪ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামক গল্প দুটি এবং তার পরের বছর রচনা করেন 'মুকুট' (মতান্তরে 'মুকুট' ছোট উপন্যাস)। কিন্তু ১৮৯১ সালে তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ভারতী ছাড়াও নবজীবন, বালক, হিতবাদী, সাধনা, সখা ও সাথী, প্রদীপ, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, বঙ্গভাষা, সবুজপত্র, আনন্দবাজার, শনিবারের চিঠি, বিশ্বভারতী ও ঋতুপত্র পত্রিকায় তাঁর অন্যান্য ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছিল ছোটগল্প, বিচিত্র গল্প (১ম ও ২য় ভাগ), কথা চতুষ্টয়, গল্প দশক, গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড), কর্মফল, হিতবাদীর উপহার, রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী, গল্পসপ্তক, তিন সঙ্গী ও গল্পসল্প গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈচিত্র্য এবং কল্পনা প্রকাশের পরিকল্পনা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেমন তাঁর সতর্ক পরিভ্রমণ আমাদের নজর কাড়ে, তেমনি মানুষের মনের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং অনুভবের পরিবেশনশৈলীও তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারে ঘটে যাওয়া এবং ঘটে চলা মানবিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের বিনষ্টি তাঁর গল্পের ক্যানভাসে প্রবেশ করেছে শৈল্পিক পথের বর্ণিল রেখায়। অতীত – বর্তমান আর ভবিষ্যতকে এক সুতোয় বেঁধে পাঠকের সামনে হাজির করতে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার যে ব্যাপ্তি, তার তুলনা পাওয়া ভার। মানব সম্পর্ক এবং মানুষের জন্য মানুষের মমতার ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি আমাদের প্রবল আবেগের জায়গাটিকে দারুণভাবে স্পর্শ করতে পেরেছেন। আর ইতিহাস – ঐতিহ্য, সমকালীন সমাজ – রাজনীতি তিনি আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন খুব সরল স্বাভাবিক বর্ণনায়। এছাড়াও তাঁর কিছু গল্পে যেমন 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা'য় দেখতে পাওয়া যায় অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃতের ছায়া।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিস্ময়-বিভোরতার ওপর ভর করে লৌকিকতা-অলৌকিকতার মিশেলে মানবতার বিপর্যয়, ঐশ্বরিক শক্তির উপস্থিতি ও প্রভাব এবং সেসব-সম্বন্ধে উত্তর-প্রজন্মের অনুভবকে পাঠকের সামনে পরিবেশন করেছেন তাঁর এই গল্প গুলির মাধ্যমে। 'নিশীথে' হোক বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' অথবা 'মণিহারা' গল্পগুলিতে যতই অলৌকিকতার ছায়া থাকুক না কেন কোথাও একটা দেখা গেছে গল্পগুলির নায়ক কোন না কোন ভাবে মনোবিকার গ্রস্থ হয়ে পড়েছে। এবং তাদের এই মনোবিকারের সুযোগেই গল্পগুলিতে প্রবেশ করেছে অলৌকিকতা, যা পাঠক মনকে বেশ দ্বন্দ্বে ফেলেছে।

।। দুই ।।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নিশীথে' গল্পটি ১৩০১ সালের মাঘ মাসে রচিত হয়। গল্পটি প্রথম 'সাধনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৯৫ খিস্টাব্দের (১৩০২ বঙ্গাব্দ) ৩০ আগস্ট প্রকাশিত গল্পসংকলন 'গল্পদশক'- এ প্রকাশিত হয়। এই বইটি রবীন্দ্রনাথ আশুতোষ চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছিলেন। অধিকাংশ সমালোচকই 'নিশীথে' গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলির শ্রেণিভুক্ত করেছেন। কেউ কেউ আবার মনে করেছেন এডগার অ্যালান পো রচিত 'লিজিয়া' গল্পটির প্রভাব 'নিশীথে' গল্পটির উপর পড়েছে। ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় 'নিশীথে' গল্পটির মূলরসকে অতিপ্রাকৃত বলেছেন কারণ গল্পটির আবহ, নায়কের অনুভূতি সবই অতিপ্রাকৃতের রসের উদ্বোধন ঘটিয়েছে। গল্পটির শুরু হয়েছে জনৈক এক ডাক্তারের কাছে গল্পের নায়ক জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবুর জবানবন্দি দিয়ে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী অতিদুর্লভ, গম্ভীর শান্ত প্রকৃতির, স্বল্পভাষিণী, সেবাপরায়ণা। তাঁর স্ত্রী যে কতটা সেবাপরায়ণা সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

"রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহুর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।"[১]

দক্ষিণাচরণ বাবু যখন অসুস্থ ছিলেন তখন তার স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। দক্ষিণাচরণ বাবু সুস্থ হওয়ার কিছুকাল পড়ে তার স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন এবং তারপর থেকেই তার স্ত্রীর নানা রকম জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হয়। কিছুকাল সেবা শুশ্রূষা করার পর বোঝা যায় যে তার রোগ সারবার নয়। তারপর ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান এলাহাবাদে। সেখানে গিয়ে হারান ডাক্তার তার স্ত্রীর চিকিৎসা করতে থাকেন। এই সময় দক্ষিণাচরণ বাবুর সাথে পরিচয় হয় হারান ডাক্তারের মেয়ে মনোরমার এবং তিনি তার প্রতি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েন। দক্ষিণাচরণ বাবুর স্ত্রী তা বুঝতে পেরে মালিশের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন যাতে মনোরমাকে বিয়ে করে তার স্বামী দক্ষিণাচরণ বাবু সুখী হতে পারেন। দক্ষিণাচরণ বাবুর স্ত্রী মারা গেলে তিনি সত্যি সত্যিই মনোরোমাকে বিবাহ করেন এবং তাকে নিয়ে আসেন তাঁর বরানগরের বাড়িতে। মনোরমাকে ভালবেসে বিয়ে করলেও দক্ষিণাচরণ বাবু যখন মনোরমার সাথে আদরের কথা বলতেন, প্রেমালাপ করে তার হৃদয় অধিকার করার চেষ্টা করতেন তখন মনোরামা হাসতো না, গম্ভীর হয়ে থাকতো। এই সময় দক্ষিণাচরণ বাবু তাঁর মদের নেশা অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং একদিন শরতের সন্ধ্যায় এই নেশার ঘোরেই তিনি মনোরমাকে বলে ওঠেন, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোন কালে

ভুলিতে পারিব না।"[২] কথাটা বলা মাত্রই তিনি চমকে ওঠেন, তাঁর মনে পড়ে যায়, ঠিক একই কথাটা আগেও তিনি তার প্রথমা স্ত্রী কে বলেছেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হয় কেউ একজন তার এই কথায় হা হা করে হাসছে। এই কথার বর্ণনায় তিনি বলেছেন-

"কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুত বেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার বলিতে পারি না।"[৩]

এই হাসি শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি তার স্ত্রীর কাছে হাসির কথা বলায় তার স্ত্রী জানালেন যে সেটা হাসি নয় সেটা একঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়ার সময়কার পাখার শব্দ। এই ঘটনার কয়েকদিন পর দক্ষিণাচরণ বাবু তাঁর স্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে পদ্মায় বোটে করে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। পদ্মাচড়ে বিহারের সময় জনমানব শুন্য বালুকারাশির মধ্যে দক্ষিণাচরণ বাবু যখন তার স্ত্রীকে চুম্বন করেন তখন তিনি সেই জনমানব শূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে শুনতে পান কে একজন গভীর স্বরে তিনবার বলে উঠলো, "ও কে। ও কে। ও কে।" এবং এবারেও তা ছিল চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। তারপর তারা যখন বোটের ভিতরে মশারি টানিয়ে দুজনে শয়ন করেন তখন আবারও দক্ষিণাচরণ বাবু অন্ধকারে দেখেন কে একজন তার মশারির কাছে দাঁড়িয়ে সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শূন্য অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুট কণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করছেন "ও কে। ও কে। ও কে গো।" প্রতি রাত্রে এইভাবে মনোবিকারে অর্ধরাত্রে ডাক্তারের কাছে ছুটে এসে প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবিচার, একনিষ্ঠতার অভাব তিনি অনুভব করতেন এবং নিজের জবানবন্দিতে সারা রাত্রি তিনি তা বর্ণনা করতেন এবং প্রাকৃতিক ঘটনা বা পাখির ডাক ও তাদের ডানা ঝাপটানোকে প্রথমা স্ত্রীর অতিপ্রাকৃতিক উপদ্রব বলে মনে করতেন। গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার আড়ালে গল্পকথকের অপরাধবোধের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে।

।। তিন ।।

সাধনা পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০২ সংখ্যায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থে তা সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে গিয়েছিলেন, তখন শাহীবাগের একটি নির্জন প্রাসাদে নির্জন দিনরাত্রি উপভোগ করেছিলেন তারই স্মৃতি রোমন্থিত হয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' এর মধ্যে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক পান্নালাল বসু 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির অনুবাদ করেছিলেন 'Hungry Stone' নামে, যা ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সংখ্যার মর্ডাণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি বাংলা

সাহিত্যের একটি অনবদ্য গল্প যেখানে আরব্য উপন্যাসের আদলে ফ্যান্টাসি ও রোমান্সের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এই গল্পটিতে কবির কল্পনা শক্তির এক মোহনীয় রূপ ধরা পড়েছে, যে মোহন তুলির টানে তিনি পাঠককে এক অপূর্ব কল্পলোকে নিয়ে যান যেখানে আড়াইশো বছর আগের লাস্যময়ী ইরানি তরুণীরা তাদের অব্যক্ত প্রেম নিবেদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে যা এই গল্পের মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃতিক আবহের সৃষ্টি করে।

গল্পের শুরুতে দেখা যায় পুজোর ছুটিতে ট্রেন পথে ভ্রমণ করার সময় গল্পকার এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি কথায় কথায় বিজ্ঞান বেদ পার্শি বয়েত আওড়ে গল্পকারদের চমৎকৃত করে দিচ্ছিলেন। একটি স্টেশনে গাড়ি বদলানোর জন্য তারা ওয়েটিং রুমে যখন অপেক্ষা করছিলেন, ওই সময় গাড়ি আসার বিলম্ব আছে বলে ভদ্রলোক এই গল্পটি বলতে শুরু করেন। তিনি তাঁর এই গল্প বলতে গিয়ে সেখানকার প্রাসাদটির বর্ণনায় জানান-

"প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদ টি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মর খচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া, কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া, তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া, সেতার কোলে, দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত। এখন আর সেই ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না- এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শুন্য বাসস্থান।"[৪]

এই শূন্য পরিত্যক্ত প্রাসাদে, গল্পের নায়ক তথা যুবক কালেক্টর রাত্রি বাস করার অভিপ্রায় জানালে কোন ভৃত্যই তার সঙ্গে রাত্রি বাস করতে রাজি হয় না অগত্যা উৎসাহী ও কৌতূহলী তরুণ কালেক্টর সমস্ত ভীতিবিহ্বলতা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে রাত্রিযাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। রাত্রি বাসকালীন তিনি শুনতে পান কখনো দরবারই মহলের গীত ঝংকার, কখনো কখনো ইরানি তরুনীর ক্রন্দনধ্বনি। একরাত্রে স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে তিনি দেখেন যে হাতের ইশারায় কেউ একজন তাকে ডাকছে, তাকে অনুসরণ করে যেতে যেতে একটি ঘরের বাইরে পর্দার আড়াল থেকে তিনি দেখতে পান কোন এক সুন্দরীর সুন্দর চরণ গোলাপী মখমল আসনের ওপর অলসভাবে স্থাপিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু সে ঘরে প্রবেশ করার আগেই প্রহরীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, খোলা তলোয়ার তার কোলের উপর ঝনঝন করে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই নায়ক শুনতে পান পাগল মেহের আলি প্রাত্যহিক অভ্যাস বশে চিৎকার করে বলে চলেছে "তফাত যাও" "তফাত যাও"।[৫]

প্রায় প্রতি রাত্রেই তিনি শুনতে পান তার খাটের নীচে, মেঝের নীচে, এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলা থেকে কে যেন কেঁদে কেঁদে তাকে বলছে তুমি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও। এরপর এক ঝড়ঝঞ্ঝা পূর্ণ অমাবস্যার রাত্রে তিনি স্পষ্ট অনুভব করেন, একজন রমণী পালঙ্কের তলায় গালিচার উপর উপুড় হয়ে পড়ে দুই দৃঢ়বদ্ধমুঠিতে নিজের আলুলায়িত কেশ জাল টেনে ছিঁড়ছে, তার গৌড় বর্ণ কপাল দিয়ে রক্ত ফেটে পড়ছে, কখনো সে হাহা করে হাসছে, কখনো সে কাঁদছে, দু হাতে বুকের কাঁচুলি ছিঁড়ে অনাবৃত করে নিজের বুকে আঘাত করছে। সে রাতে ঝড়ও থামেনা, কান্নাও থামেনা। তিনি কি করবেন বুঝতে না পেরে নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কেউ কোথাও নেই, কাকে সান্ত্বনা দেবেন, এই প্রচন্ড অভিমান কার, এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা থেকে উত্থিত হচ্ছে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। হঠাৎই মেহের আলির চিৎকার শোনা যায় “তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।”[৬] এবং তিনি তাঁর সম্বিত ফিরে পান।পরদিন সকালে অফিসের করিম খাঁর কাছ থেকে তিনি যা জানতে পারেন তার মর্মার্থ এরকম-

“এক-সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত- সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তর খন্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।”[৭]

রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের মধ্যে কবির কল্পনার যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা পাঠক চিত্তে এক অবাস্তব রমনীয়তার প্রবেশ ঘটিয়েছে। এই গল্পে নায়কের মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দর্শনে অদ্ভুত জিনিস গুলি দেখা তারপর হঠাৎই মেহের আলির চিৎকারে আবার বাস্তবে ফিরে আসা গল্পে যেন এক অতিপ্রাকৃতিক আবেশের সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, নিশীথে, ২০০৭, গল্পগুচ্ছ, কলকাতা, শুভম, পৃষ্ঠা নং - ২১৭
২. তদেব-২২৩
৩. তদেব-২২৩
৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুধিত পাষাণ, ২০০৭, গল্পগুচ্ছ, কলকাতা, শুভম, পৃষ্ঠা নং - ২৬৪
৫. তদেব-২৬৮
৬. তদেব-২৭২
৭. চট্টোপাধ্যায় পার্থ, আগস্ট২০১৬, বাংলা সাহিত্য পরিচয়, কলকাতা-৭০০০০৯, তুলসী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং-৩৮৮
৮. তদেব-৫৪৬।

প্রেম : হুমায়ূন আহমেদের গল্পে

রাম কোনাই
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বলে গণ্য করা হয়। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি সংলাপ প্রধান নতুন শৈলীর জনক। অন্য দিকে তিনি আধুনিক বাংলা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পথিকৃৎ হিসেবে অন্যতম। নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও তিনি সমাদৃত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বেশ কিছু গ্রন্থ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মিসির আলি, হিমু ও সুভ্র চরিত্রের সৃষ্টির জন্যে পাঠকের হৃদয়ে তিনি জায়গা করে নিতে সক্ষম। প্রেম কী? জীবনে প্রেমের মূল্য থাকা কতটা প্রয়োজন? শুধু কী মানব-মানবীর প্রেমই শ্রেষ্ঠ নাকি মানুষের সঙ্গে পশুর প্রেমও জীবনে আলাদা চিত্র আঁকে? লেখকের গল্পে কীভাবে এর প্রভাব পড়েছে– এটা দেখানোয় এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

সূচক শব্দ : স্মৃতিচারণ, মানবিকতা, সহানুভূতি, মানসিক দ্বন্দ্ব, সমাজ, মিলন, ত্যাগ, বিরহ।

মূল আলোচনা

মানব জীবনে, সমাজে ও সভ্যতায় প্রেম এক অনশ্বর মৌলিক উপাদান। সভ্যতার ঊষালগ্নে যা ছিল একান্ত জৈবিক, জীবন ও সভ্যতার বিবর্তন ধারায় তা হল মানসিক ও আত্মিক উপাদান। প্রেমের আরক্ত সংরাগের সঙ্গে সঙ্গে এলো মনোজীবনে তার অন্তরঙ্গ ভূমিকা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে প্রেমের সুনিপুণ বর্ণনা আমরা পাই। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আমরা প্রেমের সার্থক রূপ খুঁজে পাই। এর পরবর্তী বাংলাসাহিত্যেও প্রেম নিয়ে লেখালেখি কম নয়। হুমায়ূন আহমেদের প্রেম নিয়ে লেখালেখির সংখ্যাও কম নয়, তবুও তাঁর গল্পমালা থেকে দশটি প্রেমের গল্প নিয়ে আমার এই ছোট্ট আলোচনার প্রয়াস। তাঁর যে দশটি গল্প নিয়ে আমার এই রচনা সেগুলির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতে হবে রচনাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আলোচনার প্রথমে যে গল্পটিকে রেখেছি সেটি হল– “রূপা”। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়

কথককে প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ একজন একটি গল্প শোনাতে চায়। সেই লোকটি অদ্ভুত ধরনের বলে কথকের মনে হলেও সেই লোকটি যথার্থই মানবিক চেতনাযুক্ত। সেই লোকটি তাঁর নিজের জীবনের গল্প বলে। সে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, তখনকার প্রেমকাহিনী। আজ কুড়ি বছর পরেও বিবাহিত জীবন হলেও সেই প্রেমের স্মৃতি সে ভুলতে পারেনি। সে বুদ্ধিমান। কেননা সে কথককে বারবার বলে কথক নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যখন পড়ে, তখন রূপা নামের একজন মেয়েকে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেন। রূপার সম্পর্কে সে কোন খোঁজ খবর নেননা। কেননা–

"না। খোঁজ নেইনি। কারণ, আমার সব সময় ভয় হতো খোঁজ নিতে গেলেই জানব– মেয়েটির হয়তো বা কারো সঙ্গে ভাব আছে। একদিনের একটি ঘটনা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন– সাবসিডিয়ারি ক্লাসের শেষে আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটা হেসে হেসে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। সব ক্লাস বাদ দিয়ে হলে চলে এলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আমার জ্বর এসে গেল।"[১]

এই থেকেই বোঝা যায় তার ভালোবাসা কতটা আন্তরিক। পুরো দু'বছর এভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর সে হঠাৎ একদিন প্রেমিকার বাড়িতে এসে 'আমরণ অনশন' থাকার হুমকি দেয়, আর লেখক ঠিক এই সময়ই গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেন। কেননা সে যে বাড়িতে 'আমরণ অনশন'র জন্য পড়ে রয়েছে সেটা রুপা নামক মেয়ের বাড়িই নয়; অন্য এক মেয়ের বাসা। সে মানবতাবাদী, নইলে তিনি কেন বিয়ে করবেন এই মেয়েটিকে; বর্তমানে সেই মেয়ে তার পত্নী। সে যখন বলে–

"বাসার সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠিন চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সবার কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিলো। যে গভীর ভালোবাসায় হাত বাড়ালো সে ভালোবাসাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা ঈশ্বর মানুষকে দেননি। আমি তার হাত ধরলাম। এই কুড়ি বছর ধরেই ধরে আছি।"[২]

তার প্রেমিক সত্তা এখানেই সার্থক। প্রেমের জন্যে তার এই পাগলামি ক্ষণিকের জন্যে হাসির উদ্রেক করলেও– তার জীবনে এটাই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি। সবদিক বিচার করলে প্রথম দেখাতেই রূপার প্রতি তার ভালোবাসা, তার পাগলামি ও অন্যজনকে পেয়েও বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কোন খামতি নেই– এখানেই গল্পটি সার্থক প্রেমের গল্প।

একজন বৃদ্ধার অতীতের প্রেমের স্মৃতি নিয়ে রচিত "বুড়ি" গল্পটি। গল্প কথক পড়াশোনার সুত্রে প্রথমবার আমেরিকার এক বুমিং হাউসে থাকতে শুরু করেন। গল্প কথক ও তার বন্ধুরা যে রুমে থাকে তার পাশের রুমেই থাকে এলিজাবেথ নামে এক নিঃসঙ্গ বুড়ি, যে প্রতি রাত্রে ব্যাগ পাইন (এক ধরনের আইরিশ বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে কথকদের বিরক্ত করেন। আসলে সে কথকদের বিরক্ত করবার জন্যে নয়, সে তার

নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যেই এই যন্ত্র বাজান সেটা গল্পটি পড়লেই বোঝা যায়। কেননা সে তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে চাইলেও তার পরিবারের লোকজন তাকে সঙ্গী করেনা। এখানে নগর জীবনের বেদনার একটি রূপ লেখক তুলে ধরেছেন। আমেরিকার হতদরিদ্র বুড়িদের একজন এলিজাবেথ। সে হতদরিদ্র হলেও বা বিধবা হলেও তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসা কমে যায়নি। প্রেমিকের দেওয়া প্রথম চিঠির বা প্রেম পত্রের কথা সে আজও ভুলে যাইনি। সে যখন বলে–

"প্রিয় বন্ধু,

আজকের দিনটি আমার জীবনের বিশেষ দিন। এই দিনে আমার স্বামী ববের সঙ্গে প্রথম দেখা। এই দিনেই আমরা প্রথম একসঙ্গে ডিনার করি এবং বব আমাকে বলে– I Love You. বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্যে ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করেছি। অয়োজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তুমি আসবে।"[৩]

বিধবা হয়েও স্বামীর প্রতি ভালোবাসা থাকায় স্বাভাবিক, কিন্তু এলিজাবেথের চরিত্র যেন এক অনুন্নত মহিমায় মহিমান্বিত। আবার কথক ও তাঁর বন্ধুদের এলিজাবেথের প্রতি ভালোবাসাও গল্পটিকে আলাদা মূল্য দান করে। বুড়ি অসুস্থ হলে কথক ও তার বন্ধুরা বুড়ির 'ব্যাগ পাইন' বাজানোর জন্য পূর্বে বিরক্ত হলেও তাকে দেখতে যায় একটি 'ব্যাগ পাইন' নিয়ে। যা দেখে বুড়ির কান্নায় প্রমাণ করে প্রেম তার মন থেকে এখনও মরে যায়নি।–

"আমেরিকানরা কাঁদতে পারে না–এই কথা যে বলে সে মহামূর্খ। অনন্ত নাগ যখন ব্যাগ পাইন বুড়ির হাতে তুলে দিল–বুড়ি অবাক হয়ে আমাদের সবার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর শিশুদের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। কান্নার এমন মধুর দৃশ্য আমি আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি।"[৪]

এলিজাবেথের স্মৃতি, কথক ও তার বন্ধুদের এলিজাবেথের প্রতি ভালবাসায় গল্পটি অসামান্য।

একটি জামার বোতামের স্মৃতি নিয়ে লিখিত "একটি নীল বোতাম" গল্পটি। গল্পটির বিষয়বস্তু সাধারণ হয়েও গল্পটি প্রেমের দিক দিয়ে অসাধারণ। গল্পের নায়ক রঞ্জুর জীবনে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এশাদের বাড়ি যাওয়ার পর থেকে। রঞ্জুর বারবার কোন না কোন অছিলায় এশাদের বাড়ি যাওয়া। গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয় হঠাৎ রঞ্জুর বদলে যাওয়ার মধ্যে। সে বন্ধুদের সঙ্গে আর চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয় না, নিজের ভাঙাচোরা ঘরটাকে বদলে ফেলা– এটাই প্রমাণ করে সে যথার্থ প্রেমিক। যদি সে এশার প্রতি দুর্বল না হতো, তাহলে কখনোই বাউণ্ডুলে জীবন ছেড়ে বাস্তব পৃথিবীতে ধরা দিত না। এশা রঞ্জুকে গল্পের বই দেয়, রঞ্জু গল্পের বই জীবনে কোনদিন না পড়লেও সেই বই খুলে। এখানেই গল্পের মোড় ঘুরে যায়। গল্পের বই এর ভিতরে একটি 'নীল রঙের বোতাম' ছিল। হঠাৎ একদিন রঞ্জু এশাদের বাড়ি গিয়ে জানতে পারে এশাকে দেখতে পাত্রপক্ষ এসেছে। রঞ্জু বিষয়টিকে মেনে নিতে পারে না।

কিছু চেয়ে না পাওয়ার বেদনা রঞ্জুকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি" গল্পের কথা মনে আসে। 'সমাপ্তি' গল্পের নায়ক অপূর্ব স্ত্রী সমাপ্তির কাছে বাইরে যাওয়ার সময় একটি চুম্বন চাইলেও সেটা সে পাইনা, তবে শেষে তাদের মিলন হয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পের পরিণতি বিয়োগান্তক। কিন্তু রঞ্জু প্রেমিক সে এশাকে নিজের করে পাক বা না পাক–

"আমি ফিরে যাচ্ছি আমার খুপরি ঘরে। অন্যসব রাতের মতো আজ রাতেও হয়তো ঘুম হবে না। বালিশের নীচ থেকে নীল বোতাম বের করে আজও নিশ্চয়ই দেখব। এই পরিবারটির কাছ থেকে একটা নীল বোতামের বেশি পাওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। এই সহজ সত্যটি আজ রাতেও আমার মাথায় ঢুকবে না। আজ রাতেও বোতামটিকে মনে হবে একটি অপরাজিতা ফুল।"[৫]

ত্যাগের মধ্যেও আনন্দ আছে। রঞ্জুর প্রেম যেন নীরব প্রেম। এভাবেই কত মানুষের সঙ্গে কত মানুষের বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

শুধু মানব-মানবীর প্রেমই ভালোবাসা হতে পারে না। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, মায়ের বা বাবার প্রতি সন্তানের বা সন্তানের প্রতি মায়ের বা বাবার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্রভৃতি দিক দিয়ে ভালোবাসা থাকতে পারে। ঠিক তেমনই মানুষের প্রতি পশুর বা পশুর প্রতি মানুষের ভালোবাসার সার্থক দৃষ্টান্ত– "কুকুর" গল্পটি। কথককে আলিমুজ্জামান একটি গল্প শোনাতে চাইলে কথক সেটা শুনতে চাইনা। তবে কথকের হৃদয়দ্বন্দ্ব হঠাৎই একদিন নিয়ে যায় আলিমুজ্জামানের গৃহাভিমুখে। আলিমুজ্জামান কথককে যে গল্পটি বলে সেই গল্পের কুকুরের প্রতি আলিমুজ্জামানের ভালোবাসা ও মানবিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আলিমুজ্জামান কুকুর ভালোবাসে না, তবুও ছোট ছেলেদের সর্দার নান্টুর কীর্তি হঠাৎ একটি কুকুরের বাচ্চার গায়ে কেরোসিন মাখিয়ে শীতের রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে তাতে ছেড়ে দেওয়া। এই দৃশ্য আলিমুজ্জামান সহ্য করতে না পেরে সে কুকুরের বাচ্চাটিকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয় এমনকি কুকুরের বাচ্চাটিকে বাঁচাতেও পারেনা। এখানেই প্রমানিত আলিমুজ্জামানের মানবিকতাবোধ কতটা উচ্চ পর্যায়ের–

"না বাঁচেনি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ড ডিগ্রি বার্ন হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিক্যালে কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠান হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। দু'মাসের উপর হাসপাতাল থাকতে হলো। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ন এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফেটিং হতো না। অল্পতেই শরীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম। তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।"[৬]

কিছুদিন পরে কুকুরের দল এসে আলিমুজ্জামানের বাড়ির সামনে হাজির হয়, শুধু কি কৃতজ্ঞতার জন্যে? ঘটনাটি মাঝে মাঝেই ঘটা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের "সুভা" গল্পের কথা মনে চলে আসে এ প্রসঙ্গে। সুভাষিনীর পশুদের প্রতি ভালোবাসা ও

পশুদের তার প্রতি প্রেম যেন মানব-মানবীর প্রেমের সীমা পার করে এক অসীমের রূপ লাভ করে। গল্পটি কল্পবিজ্ঞানের। কেননা–

"যে কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটির মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুংঘুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দুলায় আর ঘুংঘুরের শব্দ হয়।"[৭]

সে ছাড়া অন্যরা এই কুকুরছানাটিকে দেখতে পাইনা। কল্পবিজ্ঞানের গল্প হলেও মানুষ ও পশু প্রেমের দিক দিয়ে গল্পটি যেন মানব-মানবীর প্রেমের চেয়েও উচ্চ পর্যায়ের।

লেখক নবদম্পতির প্রেমের চিত্র দেখিয়েছেন– "দ্বিতীয় জন" গল্পটিতে। নতুন বিবাহিত জীবনে প্রেম যেমন হয় বা হওয়া উচিৎ প্রিয়াঙ্কার একুশ দিনের বিবাহিত জীবনে স্বামী জাভেদের সঙ্গে প্রেমটা ঠিক তেমন নেই বললেই চলে। জাভেদের প্রথম স্ত্রীর প্রতি যেরূপ ভালোবাসা ছিল, দ্বিতীয় স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রতিও ঠিক তেমনই ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা জাভেদের প্রতিরূপ আর একজনকে রাত্রে দেখতে পায়, এমনকি সেই ব্যক্তি তার সঙ্গে কথাও বলে। এর ফলেই প্রিয়াঙ্কার অসুখের সুত্রপাত। এই অসুখ প্রেমের নয়, ভয়ের। অসুখের সময় প্রিয়াঙ্কার প্রতি তার মামা ও মামির ভালোবাসার রূপ লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জাভেদের ভালোবাসার নিদর্শনও লেখক বর্ণনা করেছেন সুনিপুণ দক্ষতায়–

"চিঠি না–চিরকুট। জাভেদ লিখেছে–প্রিয়াঙ্কা, তোমার গা-টা গরম মনে হলো। তৈরি হয়ে থেকো। আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।"[৮]

প্রিয়াঙ্কাও জাভেদের পূর্বের স্ত্রীর ন্যায় দু'টা জাভেদ দেখে। এই গল্পটিও কল্পবিজ্ঞানের গল্প, তবে জাভেদের প্রিয়াঙ্কার প্রতি ভালোবাসায় গল্পটিকে যথার্থ প্রেমের মর্যাদা দিয়েছে।

"সঙ্গিনী" গল্পটি হুমায়ূন আহমেদের সমগ্র গল্পসাহিত্যের মধ্যে ভিন্নস্বাদের। স্বপ্নলব্ধ প্রেম কাহিনী হিসেবেও আমরা গল্পটিকে বিচার করতে পারি। মিসির আলি কথককে গল্প শোনান স্বপ্ন নিয়ে। বিভিন্ন রকম পাতি বিষয় নিয়ে স্বপ্ন মানুষ দেখলেও অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে স্বপ্নের কথা তিনি একটিই শুনেছেন। সেই বিষয়টিই এই গল্পের প্রেমের দিক চিহ্নিত করছে। গল্পটি হলো– লোকমান ফকিরের মুখে শোনা গল্প। লোকমানের স্বপ্নে নারগিস নামক একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয়। তারা দু'জনে শুধুই দৌড়ায়। সেই রাস্তায় ব্লেড বিছানো। পাঠকের আগ্রহ এখানেই বাড়ে– যখন লোকমান স্বপ্নের ব্লেড বিছানো রাস্তায় দৌড়ায় আর বাস্তবে তার পা কেটে সে আহত হয়। এখানে গল্পটিকে অতিপ্রাকৃত মনে হয়। তবে গল্পের নায়ক লোকমান বিষয়টিকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই তিনি জুতো পড়ে ঘুমানোর ফলে স্বপ্নটি দেখতে পাননি ঠিকই, কিন্তু নারগিসের সেই কথা–

"সে বলল– 'আমার নাম নারগিস। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। একটু পরই বুঝবেন। আগে আমি শুধু একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।"

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল– 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতিমাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।"[৯]

সে বাধ্য হয় আবার খালি পায়ে ঘুমাতে। আসলে সে নারগিসকে ভালবেসে ফেলেছে। সংকীর্ণতায় প্রেমের মৃত্যু। তাই লেখক লোকমানের মুখে–

"সে স্বপ্নের মেয়ে নয়। আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু'জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়তো ঢাকাতেই কোনো-এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ব্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।"[১০]

এই ভাবনা বৃহত্তর। আর বৃহতত্বে প্রেমের সম্প্রসারণ। স্বপ্নলব্ধ প্রেম হলেও লোকমানের কাছে স্বপ্নের নায়িকা নারগিসই তার বাস্তবের রাজকন্যা।

"ভালোবাসার গল্প" গল্পটিও নায়ক রঞ্জু ও নায়িকা নীলাঞ্জনার প্রেমের সার্থক দৃষ্টান্ত। আলোচ্য গল্পটির কাহিনী খুবই সহজ-সরল। তাদের প্রেম সাত্ত্বিক। নীলাঞ্জনাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসে, কিন্তু সে তো চাই প্রেমিক রঞ্জুকে; আর সে কথা সে তার ভাবী ছাড়া আর কাউকেই বলতে পারেনা। রঞ্জুকে সেই কথা বললে রঞ্জু কোর্টে গিয়ে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনা। ঠিক যেন বর্তমান প্রেমের এক রূপ লেখক তুলে ধরেছেন। এছাড়াও নীলুর ভাবীর পতিব্রতা রূপ লেখক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সমাজে নীলাঞ্জনার মতো মেয়েরা কতটা অসহায় তার নিদর্শন–

"নীলু বাসায় পৌঁছে দেখে অনেক লোকজন। হিরণপুর থেকে খালারা এসেছেন। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে তুমুল হইচই। নীলু আলগাভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যায় চা খেতে বসে সেজো খালার হাসির গল্প শুনে উঁচু গলায় হাসল। কিন্তু রাতের বেলা অন্যরকম হলো। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নীলু গিয়ে তার দাদার ঘরে ধাক্কা দিল। রেহানা বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে নীলু?'

নীলু ধরা গলায় বলল, 'বড় কষ্ট হচ্ছে ভাবী।'

রেহানা নীলুর হাত ধরল। কোমল স্বরে বলল, 'ডাকব তোমার দাদাকে? কথা বলবে তার সাথে?'

'ডাক।'

নীলুর দাদা সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'কী রে নীলু কিছু হয়েছে?'

নীলু বলল, 'কিছু হয়নি দাদা। তুমি ঘুমাও।'

তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।"[১১]

প্রেম কাউকে করে আত্মপ্রয়াসী, আত্মসচেতন; আবার কেউ হয় শূন্যগর্ভ মানসচারী। কীটের মতো নীলাঞ্জনাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। একে অপরকে ছাড়া তারা যেন নিঃস্ব।

'দ্বিতীয় জন' গল্পে বর্ণিত হয়েছে নব দম্পতির প্রেম আর লেখক প্রবীণ দম্পতির প্রেম তুলে ধরেছেন– "সম্পর্ক" গল্পটিতে। মোবারক হোসেনের তরকারি পছন্দ নয়, এই নিয়ে বউ মনোয়ারার সঙ্গে কলহ করে বাইরে বেরিয়ে এসে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। বর্তমানে এরূপ ছবি অহরহ লক্ষ্য করা যায়। ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে কলহ লেগেই রয়েছে, তবে প্রেমও দু'জনের কম নয়। মোবারক হোসেন বাড়ি ফিরে যখন বলে– 'বউ ভাত খেয়েছ?' মনোয়ারা উত্তরে 'না' বললে মোবারক ও মনোয়ারার পরবর্তী কথোপকথন–

"মোবারক হোসেন ভাত মাখিয়ে দলা করে স্ত্রীর মুখের দিকে এগিয়ে বললেন, 'দেখি হাঁ করো তো।'

মনোয়ারা বললেন, 'ঢং করবে না তো। তোমার ঢং অসহ্য লাগে।'

অসহ্য লাগলেও এ ধরনের ঢং মোবারক হোসেন প্রায়ই করেন। এলা নামের মেয়েটাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলা হয়নি।

মোবারক হোসেন মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই খাও ! ভাত হাতে কতক্ষণ বসে থাকব!'

মনোয়ারা বললেন, 'বুড়ো বয়সে মুখে ভাত ! ছিঃ !'

ছিঃ বললেও তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখভর্তি লজ্জামাখা হাসি।"[১২]

যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালি জীবনে চিরসুখী পতি-পত্নীকে। আমাদের মনে পড়ে যাই- বঙ্কিমচন্দ্রের পতিব্রতা নারী বা শরৎচন্দ্রের সার্থক গৃহিণীদের।

পত্নীকে ঠগানোর সার্থক রূপে রূপায়িত– "অতিথি" গল্পটি। এটি হিমুর সমগ্র গল্প সাহিত্যে এক অনন্য গল্প। এই গল্পটি পড়ার সময় মনে পড়ে যায়– রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে" বা "মধ্যবর্তিনী"র মতো কালজয়ী গল্পের। গল্পের নায়িকার ঢাকায় কাজে আসা, মেমসাহেবের প্রতি ভালোবাসা, তার প্রতি মেমসাহেবার ভালোবাসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বকুলের বাবা অর্থাৎ সফুরার স্বামী মাঝে মাঝে টাকা নিয়ে গেলেও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যায় না। যেদিন সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে, সেদিন সফুরা জানতে পারে তার স্বামী পুনরায় বিবাহ করেছে। সে ত্যাগ করেছে, ত্যাগের মধ্যেই তার ভালোবাসা সত্য। সফুরা ছেলে-মেয়েদের জন্যে ঈদের বাজার করে সঙ্গে–

"ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু কিনল সফুরা। ছেলেমেয়েদের জন্যে জামা-জুতো, স্নো-আলতা। একটা মশারি, চিনি, পোলাউয়ের চাল, এক ডজন কমলা। সবার জন্যেই কিছু না কিছু কেনা হয়েছে, শুধু নতুন বউয়ের জন্যে কেনা হয়নি। বেচারি মন খারাপ

করবে। তার তো কোনো দোষ নাই। তাকে বিয়ে করেছে বলেই সে এই সংসারে এসেছে।

সফুরা নয়া বউয়ের জন্যে একটা লালপেড়ে শাড়ি এবং কাঁচের চুড়ি কিনল।

বকুলের বাবা বলল, লাল ফিতা কিনো তো বৌ। ফিতার কথা বলছিল।

সফুরা লাল ফিতাও কিনল।”[১৩]

এখানেই তার প্রেমের সার্থকতা। তবে বেদনা তো থাকবেই। যার প্রমাণ তার চোখের জল।

আলোচনার শেষ গল্প– “আজ দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ”। গল্পটি বাৎসল্য প্রেমে অনুন্নত ও উজ্জ্বল। গল্পের নায়িকা মীরার প্রতি তার বাবা আফতাবের ভালোবাসা বা একজন দীন ছেলের প্রতি মীরার প্রেম বর্ণিত। গল্পটি পড়লে মনে হয়– মীরার শওকতের প্রতি ভালোবাসা নয়, রয়েছে যেন করুণা। আফতাব মেয়ে যে মাছ খেতে ভালোবাসে শুধু সেই মাছই নয়, বরং মেয়ে যাকে সমাদর করে নিমন্ত্রণ করেছে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে রেস্টুরেন্ট থেকে।

“আফতার সাহেব ছেলের পিঠে হাত রাখতে রাখতে বললেন, আমার মেয়েটা খুব কাঁদছে। এত কান্না কী আছে বুঝলাম না। সে আজ জীবনের প্রথম চিংড়ি মাছ রান্না করেছে। খেয়ে দেখ তো কেমন।”[১৪]

একজন অকর্মরত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি মীরার বাবা। প্রেম শুধু ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক কোনো উপাদান নয়, প্রেম চলতে ও চালাতে জানে– তারই সার্থক রূপ এই গল্পটি।

হুমায়ূন আহমেদ শুধু মানব-মানবীর প্রেমই নয়, মানুষের উর্দ্ধে গিয়েও প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন– তাঁর গল্পগুলির মধ্যে। আলোচ্য গল্পগুলি ছাড়াও “একজন সুখী মানুষ”, “পাখির পালক”, “একজন ক্রীতদাস”, “ভালোবাসা”, আনন্দ-বেদনার কাব্য”, “বেয়ারিং চিঠি”, “গন্ধ” প্রভৃতি গল্পে প্রেম চেতনার প্রভাব রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমকে ভিন্নমাত্রায় দাঁড় করিয়েছেন। শুধু গল্পই নয়, তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে প্রেমের চিত্র বিরাজমান।

তথ্যসূত্র:

১। আহমেদ, হুমায়ুন, গল্পসমগ্র ১, কাকলী প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, আষাঢ়, ১৪২৮, পৃষ্ঠা ১১।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ১৩।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা ১৭।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা ২৫।
৬। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৭।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৩৯।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৭।
১০। ঐ, পৃষ্ঠা ২৬০।
১১। ঐ, পৃষ্ঠা ৪১৩।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা ৫৯৫।
১৩। আহমেদ, হুমায়ূন, গল্পসমগ্র ২, কাকলী প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, আশ্বিন, ১৪২৯, পৃষ্ঠা ৭৭।
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৭।

বিষয়ের অভিনবত্বে 'শিলাপটে লেখা': ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পায়েল হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রস্তর সাক্ষর' নামে একটি উপন্যাসপ্রকাশিত হয় জনপ্রিয় একটি পূজাবার্ষিকীতে (সম্ভাবত প্রসাদ পত্রিকা)।তবে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে এর নতুন নাম দেন 'শিলাপটে লেখা'। ১৯৬৫ সালের বৈশাখে এই নাম নিয়ে চৌদ্দো পরিচ্ছেদের এই উপন্যাসটি মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা সংস্থা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে মিত্র ও ঘোষের পর এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়েছিল নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ। বর্তমানে উপন্যাসটি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনির প্রেক্ষাপটে রয়েছে পাহাড়ে পাথর কাটার খাদানের অভিনব পরিবেশ। উপন্যাসটিতে রয়েছে প্রেম, দাম্পত্য, বাণিজ্য, শ্রেণি বৈষম্যের মতো একাধিক বিষয়। গবেষণাধর্মী পত্রটিতে বিবিধ এই বিষয়গুলি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: উপন্যাসের বিষয়, পাথর কাটার খাদান, বাণিজ্য, প্রেম, দাম্পত্য, অন্ত্যজ শ্রেণি।

'শিলাপটে লেখা' উপন্যাসের নায়ক নায়িকা দুজন রয়েছে। তাদের নাম বিনয়েন্দ্র কাঞ্জিলাল এবং জয়ন্তি। তবে তাদের সম্পর্কের ইতিবৃত্তকে ঘিরে এই উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস করেননি ঔপন্যাসিক, বরং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক এখানে গৌণ বিষয়। উপন্যাসটির মুখ্য বিষয় এর নামকরণের মধ্যেই লুক্কায়িত। প্রথমে উপন্যাসটির যখন নাম ছিল 'প্রস্তর সাক্ষর' তখনো এই নাম উপন্যাসের মূল বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং যখন ঔপন্যাসিক এই নাম বদলে নামকরণ করলেন 'শিলাপটে লেখা', তখনও সেই নাম মুখ্য বিষয়েরই প্রতীক হয়ে রইল। বিষয়টির পটভূমি হল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে জমিদারি আমলে পাহাড়ে শিলা বা পাথর কাটার খাদান। খাদানের জীবনযাত্রা, সেখানকার নিম্নবর্গের আদিবাসী জীবনের যাপনচিত্র, জমিদারি ঘরানার নারী পুরুষ, দাম্পত্যের অসুখ, বণিকবৃত্তি, অসমবয়েসি বন্ধুত্ব, বহুগামিতা, অশিক্ষিত উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেদের নিজ নিজ আত্মমর্যাদাকে টিকিয়ে রাখার লড়াই –এইসমস্ত বিষয়ই ক্ষুদ্রায়তন এই উপন্যাসের মুখ্য আলোচনার বস্তু।

উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক লিখেছেন- 'পাহাড় টানে'[১]। আর দ্বিতীয় লাইনেই এই টানের বৈপরীত্য ঘোষণা করেছেন-'এই টানে কেউ যদি এখানে এসে পড়েন, তিনি বড়-সড় একটা ধাক্কা খাবেন'[২]। বাঙালি পাঠক পাহাড় বলতেই যে সুন্দর রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক পরিবেশের নাগাল পাওয়ার আশা রাখে ঔপন্যাসিক যেন তাদেঁর শুরুতেই সতর্ক করেছেন এই উপন্যাসের পরিবেশ সম্পর্কে। পাহাড়ের এই পটভূমিতে রোমাঞ্চ অবশ্যই আছে কিন্তু আবেগমিশ্রিত রোমান্টিক প্রকৃতি যে খুব বেশি উপস্থাপন করবেন না ঔপন্যাসিক এ কথার ইঙ্গিত দিতেই আগাম এই সতর্কতা জারি –'প্রকৃতির ভাবগম্ভীর ডাক শুনতে আর হাতছানি দেখতে কেউ যদি আসেন, তাঁর কানে তালা লাগবে, চোখে অন্ধকার ঘনাবে'[৩]। কিন্তু এরপর তিনি ডাক দিয়েছেন সেই সকল রহস্যপিপাসু পাঠককে যাঁদের উপন্যাসের পাঠ শুধুমাত্র লঘুচালের বিনোদনপ্রাপ্তির বিষয় নয়, যারা শুধু প্রকৃতি বা প্রেমের রোমান্টিসিজম চান না, যারা চান আরো একাধিক নতুন বিষয়ময়তার সন্ধান। তাঁদের উদ্দেশ্যেই ঔপন্যাসিকের এই উপন্যাস সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ এই আহ্বান –'প্রাণের অখণ্ড পরমায়ুর প্রতি যদি কারোও অন্ধ ঈর্ষা থাকে, তিনি আসতে পারেন এখানে। তিনি ঈর্ষামুক্ত হতেও পারেন। সংহারের কাব্য রচনায় যদি কারও মন মেতে ওঠে, তিনিও আসতে পারেন। এই কাব্যের বিপুল রসদের ভাণ্ডারটি তিনি পেতেও পারেন। আর, প্রকৃতির এই ডাক আর এই হাতছানির ইশারায় যদি কোনো মনে কুবেরের খনি উঁকি-ঝুঁকি দেয়, তিনিও আসতে পারেন। একটি স্বর্ণমৃগ শিকার তিনি করে উঠতে পারবেন'[৪]। এই উক্তি থেকেই উপন্যাসের প্রতিটি বিষয়ের একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। প্রাণের অখণ্ড প্রাণবায়ু যার সে এই উপন্যাসের নায়ক বিনয়েন্দ্র কাঞ্জিলাল। আর তাঁর এই গুণকেই ঈর্ষা করেন কড়িবাবু ওরফে তিনকড়ি চাটুজ্জে। সংহারের কাব্য রচনা করার পরিবেশ আছে কারণ উপন্যাসের পটভূমি যে খাদান সেখানে রাতের অন্ধকারে পাথর কাটা ইত্যাদির কাজ করতে গিয়ে কিংবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বেসামাল হয়ে পাহাড় থেকে পাথুরেভূমিতেই পড়ে গিয়ে মৃত্যু প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এই মৃত্যু যে শুধু আকস্মিক ঘটনা তা নয়, হাড়িয়া বা মদ খাওয়ার লোভে মালিক শ্রেণির কাছে একটু বেশি পারিশ্রমিকের টোপ খেয়ে প্রায়ই আত্মাহুতি দিয়ে থাকে আদিবাসী অসভ্য পুরষ। নারীরা মালিক পক্ষের বাবুদের কামের আগুনে জ্বালাতে গিয়ে নিজেরদের জীবনই জ্বালিয়ে দেয়। এককথায় এই ঘটনাগুলি মানুষের নিজের লোভ এবং বিত্তশালী শ্রেণির চটুলতার দ্বারা একরকমভাবে প্রাণের সংহারই বটে।

উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে পাথরের খাদান সৃষ্টির ইতিবৃত্ত। মানুষ শুধু পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করবে বলে পাহাড়ে যায়নি। তারা গিয়েছিল কুবেরের ধনের খোঁজে। সেই ধন হল পাথর। পাহাড় কেটে খাদান করে সেখান থেকে পাথর তুলে সেই পাথরের ব্যবসা শুরু করে শুধু বাঙালি নয় সিন্ধী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী বহু জাতির মানুষ। যারা এই ব্যবসা করে তারা মহাজন। সেই সময়কার এই বাঙালি মহাজনেরা ছিলেন

জমিদার। তাদের এবং ব্রিটিশ সরকারকে মোটা সেলামি দিয়ে খাদানের ইজারা নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে হত ব্যবসাদারদের। উপন্যাসে একটা বিশেষ সময়ের উল্লেখ রয়েছে, যখন নেতাজী কলকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠান-প্রধান সুভাষচন্দ্রহিসাবেঅধিষ্ঠিত তখন তার নির্দেশে রাজমহল থেকে রাজগড় পর্যন্ত পাহাড়গুলির পাথরের মান পরীক্ষা করা হল এবং জানা গেল এই সব পাথরগুলির গুণগত মান সবচাইতে ভালো এবং তখন থেকেই কলকাতার নগরায়নের কাজে এবং দেশের সর্বত্র এর চাহিদা হু হু করে বেড়েগেল। দেশের প্রয়োজনে এর চাহিদা বাড়লেও ব্যবসায়ীরা উদার চিন্তায় ব্যাবসা যে করে না এবং ছলে বলে কৌশলে তারা মুনাফা বুঝে নেবেই খাদান থেকে –এই মুখ্য বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই ‘শিলাপটে লেখা’ উপন্যাসের সূচনা।

প্রথমেই দুটি মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকদের। এরা হল- খাদানের মালিক কড়িবাবু, যার আসল নাম তিনকড়ি চাটুজ্জে এবং দ্বিতীয়জন, বিনুবাবু ওরফে বিনয়েন্দ্র কাঞ্জিলাল, যে কড়িবাবুর খাদানের পাঁচশ টাকা বেতনভোগী বি.এ. পাশ করা ম্যানেজার। ব্যবসায়িক স্তরে মালিক-কর্মচারী সম্পর্কের অন্যতম একটি বিষয় দেখা যায় এই উপন্যাসে। একদিকে তাদের এই সম্পর্কের মধ্যে যেমন অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি চিরাচরিত প্রভুত্ব ফলানোর অযৌক্তিকতা এবং যৌক্তিকতা দুইই রয়েছে, তেমন আবার রয়েছে অদ্ভুত এক প্রচ্ছন্ন স্নেহ, বন্ধুত্ব ও নির্ভরতা। কড়িবাবু তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ, অন্যদিকে তার অধীনস্থ কর্মচারিটি বি.এ. পাশ। এ হেন কর্মচারী বিনয়েন্দ্রর প্রখর বুদ্ধি ও কেয়ারির সমস্ত কাজকে যথোপযুক্তভাবে সামলে নেওয়ার ক্ষমতাকে তিনি মনে মনে সর্বদা স্বীকার করে নিলেও প্রকাশ করতে নারাজ। এমনকি বিপদকালে বিনুর বুদ্ধিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের বুদ্ধি বলে চালিয়ে দিয়েও তিনি তার ব্যবসার কাজের সুষ্ঠতা বজায় রাখেন। বরং প্রকাশ্যে তিনি এমন ভাবই বজায় রাখতে চান যেন বিনয়েন্দ্র থাকল কি গেল তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিন্তু অন্যদিকে আবার অন্যান্য খাদানের মালিকেরা বেশি টাকা টোপ দিয়ে যে এই ছেলেকে বশ করে তাদের কেয়ারিতে যে নিয়ে যেতে পারে তাতেও তার মনে বিশেষ ভয় রয়েছে। বিনুকে তিনি কিছুটা সমীহও করেন। পাকা ব্যবসায়ীর মতো বিনুর চরিত্রের দুর্বলতা খুঁজতে চান, না পেয়ে হতাশ হন। কারণ প্রভু হওয়া সত্ত্বেও বিনয়েন্দ্রর ব্যক্তিত্ব তার প্রভু সত্তার অহংকারকে খর্ব করে। না বিনয়েন্দ্রর চৌর্যবৃত্তি রয়েছে, না খাদানে কাজ করা নারী শরীরের প্রতি প্রবৃত্তিগত সংযমহীন আসক্তি আছে, না টাকার লোভে অন্যত্র কেটে পরার মতলব সে করে। এখানেই বিনয়েন্দ্রর সংযমী ও কঠিন সত্তার প্রতি কড়িবাবুর ঈর্ষা আবার প্রচ্ছন্ন নির্ভরতাও দেখা যায়। সমাজে বিত্তশালী শ্রেণির প্রতিনিধির এমন ব্যক্তিত্ববান অথচ ক্ষমতাহীন অধীনস্ত কর্মচারীকে পুরোপুরি করায়ত্ত না করতে পারার এই জ্বালাটি এই উপন্যাসের একটি চমৎকার বিষয়। বিনয়েন্দ্র আসলে উচ্চিবিত্তের চটকদার দেখনদারির সমাজের মাঝে শিরদাঁড়া সোজা রেখে বশীভূত না হওয়া সেই মডেল চরিত্র যা সমাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত কাম্য। এই চরিত্রটি নির্লিপ্ত এবং

প্রতিবাদী। কড়িবাবুর অসুস্থ অবস্থায় তার বড় ছেলে বিজিত যখন ব্যবসার কাজে নেমে বিনুবাবুকে খানিকটা জব্দ করার জন্যেই অফিসে ধুতি ছেড়ে প্যান্ট শার্ট পরবার নোটিস দিয়েছে তখনই অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বিনুবাবু পাল্টা জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে অফিসটা কাজের জায়গা, দেখনদারি দিয়ে ব্যবসা টেকে না, টেকে পরিশ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে। চাটুকারিতার দুনিয়ার বিপরীতে বাস্তব ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে সদা তৎপর ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপধ্যায়।

উপন্যাসটিতে মূল ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরো দুটি কাহিনি। দুটি উপকাহিনিই তিনকড়িবাবুর জীবনকে কেন্দ্র করে। প্রথম উপকাহিনিটি ছিল–তরুণ বয়সে জমিদার বাড়ির ফাইফরমাস খাটা যুবক তিনকড়িবাবু জমিদার বাড়ির গৃহিণী ন'বৌদি সুনজরে পড়েন। এই ন'বৌদির স্বামী সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হওয়ায় তাদের দাম্পত্য ছিল আপোষময়। আপাতদৃষ্টিতে ন'বৌদির প্রতি তিনকড়ির আকর্ষণকে স্থূল প্রকৃতির মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল নারীর কঠিন অথচ স্নেহশীল ব্যক্তিত্বের কাছে পুরুষের আত্মসমর্পণ। এই ন'বৌদির মদ্যপ স্বামী তার আত্মগ্লানি ঘোঁচাতে অসহায় ভৃত্যের মতো তিনকড়িকেও মদের নেশায় মেতে ওঠার দোসর বানিয়ে তুলছিলেন দিনে দিনে। একরকম এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তিনকড়িকে উদ্ধার করতেই স্বামীকে বশ করে বিনা পয়সাতেই একটি খাদানের ইজারা তিনি তিনকড়ির নামে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করে জমিদারি মহলের বিকারগ্রস্থ জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেন। জানা যায় অনেক উপায়ের পর ন'বৌদির শেষ পর্যন্ত একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। এরপর যখন জমিদারি আমলের অবসান ঘটতে চলেছে, প্রতিপত্তি কমছে তখন ন'বৌদির স্বামীর মৃত্যু ঘটলে ভাগে পাওয়া সম্পত্তির সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিয়ে তিনি ছেলে নিয়ে কাশিবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এইসময় ঋণ শোধ করেছিলেন তিনকড়ি। চড়া দামে নিজেই সমস্ত সম্পত্তি কিনে ন'বৌদিকে তার গন্তব্যে যেতে সাহায্য করেছিল। এই উপকাহিনির মধ্যে দিয়ে লক্ষিত হয় জমিদারি আমলের প্রতিপত্তির প্রভাবে সাধারণ কর্মচারীকে কীভাবে মুখ বুজে সহ্য করতে হত অত্যাচার, সায় দিতে হত বিকারগ্রস্ত মানুষের মদকতায়, অসহায় মানুষের প্রাণ হয়ে উঠত ওষ্ঠাগত, খুঁজতে হত নিষ্কৃতি লাভের উপায়–এই বিষয়গুলি। আর দ্বিতীয় উপকাহিনিটি ছিল–পরবর্তী সময়ে অবস্থাসম্পন্ন ব্যবসায়ী তিনকড়ি খ্যাতিমান অ্যাডভোকেটের আই.এ পাস করা কন্যা কুন্তলা দেবীকে বিয়ে করেন। কিন্তু সেই সংসারকে মাঝপথে অব্যাহতি দিয়ে কুন্তলাদেবী দুই পুত্র সন্তান ও গর্ভস্থ কন্যা সন্তান নিয়ে ফিরে যান তার পিত্রালয়ে। এইখানেই খতিয়ে দেখা যাবে এই উপন্যাসের অন্তর্গত দাম্পত্যের অসুখ বিষয়টি। স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের মানসিক বিকারের ফলেই এই দূরত্ব। মানসিক বিকারের কারণগুলি এইরূপ –এক. তিনকড়িবাবু নিজের ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। এতবড় কারবারী হয়ে এত টাকা উপার্জন করেও তিনি নিজের তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করা নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতেন। স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতায় গর্বিত হলেও

নিজের পৌরুষকে বা আত্মমর্যাদাকে তিনি স্ত্রীর সামনে প্রকট করে তুলতে পারেননি। স্ত্রীর কাছে তার পুরুষকারের অভাব ছিল। দুই. প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক থাকলেও স্বামী তেমনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে না পারায় এবং নিজের অতীতের কথা গোপন করে যাওতার ফলে এক বাড়িতে উপস্থিত থাকলেও কুন্তলা দেবীর কাছে স্বামীর থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে বাড়ির চাকর বেচা। সম্পর্কের মাঝে এই তৃতীয় ব্যক্তি নিজের স্বার্থ কায়েম রাখতে আরো গুরুতরভাবে দ্বিচারিতা করে তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। তিন. যে পুরষকারকে তিনকড়িবাবু স্ত্রী কুন্তলার দেবীর সামনে প্রকটভাবে প্রকাশ করতে পারতেন না তা তিনি প্রকাশ করতে পারতেন তার খাদানে গতরে খাটা লেবার শ্রেণির নারী ময়নামতীর কাছে। বিয়ের আগে থেকেই ময়নামতীর সঙ্গে প্রবৃত্তিগত সম্পর্কে লিপ্ত তিনি। এই পদস্খলন স্ত্রী কুন্তলা দেবীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়লে তাদের সংসারের সুস্থতা সম্পূর্ণভাবেই বিনষ্ট হয়। সাংঘাতিক বিকার দেখা যায় স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যেই। কুন্তলা দেবী ন'বৌদির কথা জেনে এবং একবার তাকে চাক্ষুস দেখে ঈর্ষার আগুনে যে পুড়েছিলেন তা বলা বাহুল্য এবং নিম্নশ্রেণির আদিবাসী মেয়ে ময়নামতীর প্রতি স্বামীর এই প্রবৃত্তিগত চাহিদাও প্রকারান্তরে তার শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদাবোধের পরাজয় ঘটিয়েছিল। ফলে স্বামীর সাথে শেষ বোঝাপড়ায় বসে ন'বৌরাণীর সঙ্গে মথ্যা সম্পর্কে তাকে জড়িয়ে অশ্লীল মন্তব্য করতে তিনি পিছপা হয়নি। আর সেই মন্তব্য শুনে নেশার বিকারে হিংস্র হয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করতেও আটকায়নি তিনকড়িবাবুর। অবশেষে স্ত্রীর পিত্রালয়ে মাসিক পাঁচশটা স্ত্রী ও সন্তানদের খরচবাবদ পাঠানোই এই দাম্পত্যের শেষ দায় হিসাবে অবশিষ্ট ছিল।

উপন্যাসের তৃতীয় পরচ্ছিদে দেখা যায় প্রৌঢ়া কুন্তলাদেবী দুই ছেলে বিজিত, সুজিত এবং কন্যা জয়ন্তিকে নিয়ে ফিরে এসেছেন স্বামীর সংসারে। শুরু হয় তাদের সংসারের নতুন সমীকরণ। এই ফিরে আসা যে প্রেম বা ভালোবাসার খাতিরে নয় বরং ধ্বনি ব্যবসায়ী স্বামীর কাছ থেকে সন্তানদের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আসা তাও ঔপন্যাসিক পাঠককে বলেছেন এবং যে অমোঘ সত্যের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন তা হল –'টাকা বস্তুটার একটা অদৃশ্য ক্ষমতা প্রায় অমোঘ! অনেক বিভিন্নমুখী মনকেও একসঙ্গে কাছাকাছি এনে জড়ো করতে পারে'[৫]। অর্থাৎ প্রতিপত্তির লোভে আত্মমর্যাদাকে খাটো করে দেখতে বিচলিত হয়না সভ্য শ্রেণির মানুষ। মনের অমিলটা সেখানে গৌণ বিষয়, অর্থ লাভ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিষয়টিই শহুরে সভ্য মানুষের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সভ্যতার এই চাহিদার বিপরীতেই আবার ঔপন্যাসিক দাঁড় করিয়েছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নরনারীদের। তারা প্রতিপত্তির বিনিময়ে সম্পর্ককে গড়তে বা ভাঙতে জানে না। প্রকাশ্যে যৌবনের তিন রঙের কথা বোঝে –'কিন্তু ওদের যৌবনের স্বভাবে তিন রঙ। এক নিজের রঙে চলে, দ্বিতীয় স্বামীর রঙে, তৃতীয় মনের গোপন আঙ্গিনায় কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তার রঙে'[৬]। তাদের প্রেম বৈধ বা অবৈধতার শৃঙ্খলা বোঝে না, বহুগামিতা কী তার সংজ্ঞাও জানে না। তারা শুধু

সরল মনে ভালোবাসার আদান প্রদান করে মাত্র। স্বামী বা প্রেমিক কেউই তাদের কাছে অবহেলার পাত্র নয়। তাই ময়নামতীর স্বামীর খাদানে পড়ে গিয়ে মৃত্যু ঘটার পর সে যেমন হাপুস নয়নে কেঁদেছে, তেমনি কয়েক মাস পরেই মুকুটবুড়াকে বিয়ে করেছে, মুকুটবুড়া তার চোখে রঙ ধরাতে না পারলে সে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে রঙের খেলায় মজেছে। কিন্তু তীব্র আত্মমর্যাবোধও তাদের আছে। তাই ময়নামতির 'ছাড়াই' (বিবাহবিচ্ছেদ) হওয়া ভাইঝি ফুলাচিকে রেংঘা তার জাতের বিধান মেনে যখন বিয়ে করতে না পেরে তাকে টাকার টোপ দিয়ে ভুলিয়ে আদরে রাখার প্রতিশ্রুতি দেয় তখন ফুলাচি তার আত্মসম্মানবোধ থেকেই গর্জে উঠে প্রত্যাখ্যান করে রেংঘাকে। উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে পাহাড়ে মালপাহাড়ি ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের বিষয়টিও।

উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় তিনকড়ি ও কুন্তলা দেবীর বড় ছেলে দেখনদারির দুনিয়ার মেতে উঠে ব্যবসার হাল ধরে রাখতে পারেনি, ছোট ছেলের ব্যারিষ্টার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি, কন্যা জয়ন্তির কলকাতায় ফিরে এম.এ পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। বরং বিনয়েন্দ্রর সঙ্গে জয়ন্তির নতুন পথ চলা শুরু হয়েছে। তারা একসাথে খাদানের ব্যবসা সামলেছে। সবমিলিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরের উপন্যাস হলেও এই উপন্যাসের চৌদ্দোটি পরিচ্ছেদ জুড়ে রয়েছে জমিদারি আমল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তাধারার বিবর্তন, পাথরের খাদান, সম্পর্কের বিচিত্রতা, কালের বহমানতায় প্রভুত্ব ও দাসত্ব সম্পর্কের বিবর্তিত রূপ প্রভৃতি বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-১৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.৩ (শিলাপটে লেখা)।
২। তদেব, পৃ. ৩।
৩। তদেব, পৃ. ৩।
৪। তদেব, পৃ. ৩।
৫। তদেব, পৃ. ৪০।
৬। তদেব, পৃ. ৬৬।

সহায়ক পত্রিকা:

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ পৌষ ১৪২০, ১১ জানুয়ারি, ২০১৮।
২। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২, আশুতোষমুখোপাধ্যায়, 'সবিনয় নিবেদন', কলকাতা-০১।
৩। বয়ের কাগজ, বিশেষ সংখ্যা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক- জয়দেব ঘোষ, মার্চ - জুন ১৯৮৯, Vol. B NO. II-III, R. NO. 48111/81।

বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণ প্রসঙ্গে : কান্ট ও কোয়াইন

অনুপম দাস
গবেষক, দর্শন বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : পাশ্চাত্য দর্শনে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট 'বিচারবাদ' নামে নতুন ভাবধারা এর প্রবর্তক। যিনি জ্ঞান এর উৎস রূপে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুইয়েরই গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার শুরুতেই যদিও বলেছেন, আমাদের সকল জ্ঞানের সূত্রপাত হয় অভিজ্ঞতা থেকে; কিন্তু তারপরই তিনি বলেন, "But although all our knowledge begins with experience, it does not follow that it all arise out of experience" অর্থাৎ যদিও সকল জ্ঞানের শুরু অভিজ্ঞতা তথাপি তা থেকে এটি নিঃসৃত হয় না যে, আমাদের সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকেই হয়। কান্ট তাঁর দর্শনে জ্ঞান, অবধারণ ও বচনকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। সদর্থক নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য এর ধারণা এবং বিধেয়ের ধারণা এর উপর নির্ভর করে কান্ট বচনকে দুইভাগে ভাগ করেছেন, বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচন। কোনও বচনের উদ্দেশ্যের ধারণাকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যদি বিধেয়র ধারণা পাওয়া যায় তবে বচনটি বিশ্লেষক আর যদি উদ্দেশ্যের ধারণাকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়র ধারণা না পাওয়া যায় তবে বচনটি সংশ্লেষক। যদিও কোয়াইন ও একাধিক দার্শনিক এই বচনের বিভাগকে সমালোচনা করেছেন, তথাপি এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ।
মূল শব্দ : বিচারবাদ, বিশ্লেষক বচন, সংশ্লেষক বচন, যৌক্তিক ধারণা, অন্তর্ভুক্তি।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট ১৭৮১ সালে 'Critique Of Pure Reason' গ্রন্থটি প্রকাশ করে চিন্তার জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এই গ্রন্থে মূলত জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে, যেখানে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভেই কান্ট বলেছে, "All our knowledge begins with experience" অর্থাৎ আমাদের সকল জ্ঞানের শুরু হলো অভিজ্ঞতা। কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে অবধারণ বা বচনের বিভাগ করেছেন। অবধারণ সংক্রান্ত প্রথম বিভাগটি হলো পূর্বতঃসিদ্ধ (A-priori) ও পরতঃসাধ্য (Aposteriori) বচনের বিভাগ এবং অবধারণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিভাগটি হলো বিশ্লেষক (Analytic) ও সংশ্লেষক (Synthetic) অবধারণের বিভাগ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর ধারণার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই বিভাগ করা হয়। কান্ট সর্বপ্রথম এই বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক শব্দ দুটি ব্যবহার করেন; কান্টের পূর্ববর্তী কোনও দার্শনিকের কাছে আমরা এই শব্দ দুটির উল্লেখ ও ব্যবহার লক্ষ্য করি না।

অবধারণ (Judgement) সাধারণত যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দুই ধরণের হয়ে থাকে, ১। শর্তসাপেক্ষ (Conditional) ও ২। নিরপেক্ষ (Categorical)। শর্তসাপেক্ষ অবধারণ আবার বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, যেমন – বৈকল্পিক (Disjunctive), প্রাকল্পিক (Hypothetical), সংযৌগিক (Conjunctive), দ্বিপ্রাকল্পিক (Bi Conditional)। নিরপেক্ষ বচন (Categorical proposition) গুনের বিচারে দুই ধরণের হয়ে থাকে, সদর্থক ও নঙর্থক। তবে কান্ট এই বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বাক্যের যে পার্থক্য করেছেন তা কেবল সদর্থক নিরপেক্ষ বচনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কান্ট বলেন, Judgement এর মধ্যে যে, Subject concept ও Predicate concept থাকে, তাদের সম্পর্ককে দুইভাবে বলা যেতে পারে -১। বিধেয়ের ধারণা সুপ্তভাবে উদ্দেশ্যের ধারণার অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ২। বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণার বহির্ভূত থাকে, যদিও তারা পরস্পর সম্পর্কিত।

এরপর প্রশ্ন উঠবে, এই যে বলা হচ্ছে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রয়েছে, এর অর্থ কি? কান্ট বলেছেন উদ্দেশ্যের ধারণাটিকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যে যে ধারণা পাবো; তাদের কোনও একটির সঙ্গে যদি বিধেয়ের ধারণার অভিন্নত্ব থাকে অর্থাৎ বিধেয়ের ধারণার সাথে এক হয় তাহলে সেই অবধারণটি বিশ্লেষক অবধারণ।

অপরদিকে, যদি উদ্দেশ্যের ধারণাকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যে যে ধারণা পাবো তাদের কোনও একটির সঙ্গে যদি বিধেয়ের ধারণার অভিন্নত্ব না থাকে অর্থাৎ বিধেয়ের ধারণার সঙ্গে এক না হয় তাহলে সেই অবধারণটি সংশ্লেষক অবধারণ।

উদাহরণ দিয়ে অবধারণ দুটি বোঝানো হলোঃ যেমন – ‘All men are animal’ (সকল মানুষ হয় মরণশীল প্রাণী) এই অবধারণটিতে subject concept হলো ‘men’ আর predicate concept হলো animal। subject concept ‘men’ কে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে পাবো- 1. Concept of rationality ও 2. Concept of animality। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই অবধারণটির subject concept কে বিশ্লেষণ করে যে যে concept পাওয়া গেল তাদের কোনও একটির সাথে predicate concept অভিন্ন হল। অতএব অবধারণটি analytic। তেমনি আবার – “all bodies are extended” এই অবধারণটির subject concept হল ‘body’ এবং predicate concept হল ‘extended’। subject concept ‘body’কে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে পাবো – ১। concept of substantiality (দ্রব্যত্ব) এবং ২। concept extend (বিস্তৃতি)। সুতরাং এখানেও দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বিধেয়ের ধারণাটি পাওয়া যাচ্ছে; তাই এই অবধারণ গুলি analytic proposition.

অপরদিকে “All men are mortal” এই অবধারণটিতে subject concept হলো men এবং predicate concept হলো mortal। subject

concept টিকে বিশ্লেষণ করলে পাবো- ১। concept of rationality ও ২। concept of animality। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই অবধারণটির subject concept-কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে যে concept পাওয়া যাচ্ছে সে গুলির কোনও একটির সাথেও predicate concept অভিন্ন হলো না; তাই অবধারণটি সংশ্লেষক (synthetic)। তেমনি, "All bodies are heavy"এই অবধারণটির অন্তর্গত subject concept হলো 'body' এবং predicate concept হলো 'heavy'। subject conceptকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি concept পাই ১। concept of substantiality এবং ২। concept of extended। কিন্তু predicate conceptটি হলো 'heavy', সুতরাং এখানে subject concept টিকে বিশ্লেষণ করে predicate concept পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এই অবধারণটি সংশ্লেষক (synthetic)।

যদি কোনও কিছু সরল হয় তাহলে সেটিকে বিশ্লেষণের প্রশ্ন ওঠে না। ক্কিন্তু যদি কোনও কিছু জটিল ধারনা হয় তাহলে সেটিকে বিশ্লেষণের প্রশ্ন ওঠে। তাই সংশ্লেষক এবং বিশ্লেষক দুই প্রকার অবধারণই জটিল।

বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যা নিম্নে আলোচিত হলোঃ

এক, কান্ট বিশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে বলেছেন, উদ্দেশ্যের ধারনার মধ্যে যে বিধেয়ের ধারণা ছিল তা কেবলমাত্র স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। বিশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে বিধেয়টি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে না; বিশ্লেষক বচন অতথ্যজ্ঞাপক। উদ্দেশ্যের ধারণাকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিধেয়ের ধারণা পাওয়া যায় বলে বিশ্লেষক অবধারণকে কান্ট ব্যাখ্যামূলক অবধারণ বলেছেন।

অপরদিকে, সংশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে বিধেয়ের ধারণাটিকে উদ্দেশ্যের ধারণা সম্বন্ধে নতুন তথ্যজ্ঞাপন করে যা কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে না। তাই এই ধরণের অবধারণকে কান্ট জ্ঞানসম্প্রসারণমূলক অবধারণ বলেছেন।

দুই, কান্ট পরে বলেছেন যে, সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের নীতি হলো বিরোধবাধক নীতি। সংশ্লেষক বচনকে অস্বীকার করলে, কোনও স্ববিরোধিতা উৎপন্ন হয় না; কিন্তু বিশ্লেষক বচনকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা উৎপন্ন হয়। যেমন- "All men are animal" এই অবধারণটিকে অস্বীকার করলে পাবো-

All men are not animal

Or

Some men are not animal

এখন men পদটিকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করলে পাওয়া যায় দুটি ধারণা concept of rationality and concept of animality. তাহলে এখন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি দাঁড়ায় All rational animal are not animal অর্থাৎ একটি স্ববিরোধী

বচন পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্লেষক বচনকে অস্বীকার করলে একটি স্ববিরোধী বচন পাওয়া যায়।

আবার, All men are mortal – এই বচনটিকে অস্বীকার করলে আমরা পাবো-

all men are not mortal

Or

Some men are not mortal

Or

Some rational animal are not mortal

এই অবধারণটি সংশ্লেষক অবধারণ কারণ এই অবধারণকে অস্বীকার করলে কোনও স্ববিরোধীতা উৎপন্ন হচ্ছে না।

তাহলে, বিশ্লেষক অবধারণের নিশ্চয়তার নীতি হলো বিরোধবাধকতার নীতি আর সংশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে শুধু বিরোধবাধকতার নীতি দিয়ে হবে না; বাস্তবে আছে কিনা দেখতে হবে অর্থাৎ বিরোধবাধকতার নীতি ছাড়াও আরও কিছু দরকরা।

কান্ট, এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অবধারণ গুলি সবই সংশ্লেষক, কেননা, অভিজ্ঞতা থেকে কোনও রকম বিশ্লেষক অবধারণ পাওয়া যায় না। কান্ট বলেন, বিশ্লেষক অবধারণ গঠন করার ক্ষেত্রে ওই অবধারণটির অন্তর্গত ধারণা গুলির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এমনকি এই রূপ অবধারণের বৈধতা সিদ্ধ করার জন্য কোনরূপ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। যেমন – " সকল জড় বস্তু হয় বিস্তৃতি সম্পন্ন"। এই বিশ্লেষক অবধারণটি হলো পূর্বতঃসিদ্ধ এবং স্বভাবতই তা কোনও ভাবেই অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভরশীল নয়। কেননা অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়ার পূর্বেই অবধারণটির অন্তর্ভুক্ত ধারণা গুলির সাহায্যে এর বৈধতা নির্ণীত হয়ে যায়। কিন্তু সংশ্লেষক অবধারণ গুলি সেই রূপ নয়, কেননা এর অন্তর্গত ধারণা গুলির ভিত্তিতে এর বৈধতা নির্ণয় করা যায় না। উপরন্তু সংশ্লেষক অবধারণের বৈধতা নির্ণয়ের জন্য বাহ্য অভিজ্ঞতার সাহায্য প্রয়োজন হয়।

কোয়াইন এর অভিমত বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণ প্রসঙ্গেঃ

কান্ট বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের মধ্যে যে পার্থক্য নিরূপণ করছেন তা, দার্শনিক জগতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কান্টের এই দুই অবধারণের পার্থক্যের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি করেছেন। এই সব অসংখ্য আপত্তির মধ্যে দুটি প্রধান আপত্তি আমরা আলোচনা করবো কোয়াইনকে অনুসরণ করে।

কোয়াইন তাঁর Two Dogmas of Empiricism নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে কান্ট প্রদত্ত বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্যকে অস্বীকার করছেন এবং যারা এই পার্থক্যকে মেনেছেন তাদের প্রত্যেকের মতের সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত, কান্ট যেভাবে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে একপ্রকার অন্তর্ভূক্তি (containment) এর কথা বলা হয়েছে। কারণ বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকলে তা বিশ্লেষক, না থাকলে

সংশ্লেষক হবে। কোয়াইনের ব্যক্তব্য হলো, এই অন্তর্ভূক্তি এর বিষয়টি নিতান্তই আলঙ্কারিক প্রয়োগ। অর্থাৎ কান্ট রূপকের আশ্রয় নিয়ে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা, কোনও একটি বিধেয়ের ধারণা প্রকৃতই কোনও উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কিনা তা নির্নয় করতে হলে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের বিশেষ প্রকার সংজ্ঞা পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। কিন্তু কান্ট এ বিষয়ে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করেননি।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়- কান্ট বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের পার্থক্য অন্তর্ভূক্তির যে নিয়মের সাহায্যে করেছেন। এখানে অন্তর্ভূক্তি বলতে দৈশিক অন্তর্ভূক্তিকে বোঝানো হচ্ছে না, ধারণাগত অন্তর্ভূক্তি এর কথা বলা হয়েছে; অর্থাৎ যৌক্তিক অন্তর্ভূক্তি এর কথাই বলা হয়েছে। ধারণাগত অন্তর্ভভূক্তির সাথে দৈশিক কালিক বিষয়গুলি যুক্ত থাকে না কিন্তু দৈশিক অন্তর্ভূক্তির সাথে দৈশিক কালিক বিষয়গুলি যুক্ত থাকে। তাই আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্ভূক্তি শব্দটির প্রয়োগকে রূপক প্রয়োগ বলে মনে হলেও কিন্তু এই ঠিক নয়, এটি কান্টের দৃষ্টিভঙ্গির ভুল ব্যাখ্যা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, কোয়াইন বলেছেন, কান্ট যে সংজ্ঞার ভিত্তিতে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তা কেবলমাত্র উদ্দেশ্য – বিধেয়াত্মক অবধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যে সকল অবধারণ উদ্দেশ্য – বিধেয়ত্মাক নয়; সেই সব অবধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন – "সকল জড় বস্তু হয় বিস্তৃত সম্পন্ন", "সকল ফুল হয় নীল", সকল মানুষ হয় বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন জীব" – ইত্যাদি অবধারণ প্রসঙ্গে কান্ট এর বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বিভাজন প্রয়োগশীল। কিন্তু অবধারণ মাত্রই উদ্দেশ্য ও বিধেয় আকারের হয় না। যেমন – 'সক্রেটিস হন একজন দার্শনিক' এখানে বলা হচ্ছে যে সক্রেটিস দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্যটি ধারণা নয়, উদ্দেশ্যটি এখানে একজন ব্যক্তির নাম। তাই এখানে বচনটি উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের নয়, সুতরাং কান্টের এই বিভাগ যথাযথ হয়নি। তেমনি আবার – 'আজ সোমবার অথবা সোমবার নয়', 'রাম এসেছে অথবা শ্যাম আসবে'; ইত্যাদি এই আকারের অবধারণও উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের হয় না- এগুলি যৌগিক অবধারণ। কিন্তু কান্ট এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ধরণের যৌগিক অবধারণ গুলিকে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক আকারে ভাগ করা যায় না।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হয়েছে – kornar বলেছেন কান্ট যে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তাতে কোনও ভুল নেই। কারণ যে কোনও অবধারণকে অস্বীকার করলেই বোঝা যাবে যে তা বিশ্লেষক নাকি সংশ্লেষক।

একথা, kornar এর নতুন দেওয়া নয়। কান্ট তার পূর্বেই বলেছিলেন, কান্ট যে দুটি মানদণ্ডের কথা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি হলো – contradiction criteria. যেমন – সক্রেটিস একজন দার্শনিক এই বচনটিকে নিষেধ করলে পাই – সক্রেটিস নন একজন দার্শনিক। আর এই বচনটি মিথ্যা কিন্তু স্ববিরোধী নয়। তাই

বচনটি সংশ্লেষক। তেমন ভাবে, If it is a table then it is a table. ধরি, table = p; সুতরাং বাক্যের আকারটি হবে p>p.

উপরিউক্ত অবধারণটিকে নিষেধ করলে পাওয়া যায় ~ (p>p)

= ~ (~p v p) Impl.

= ~~p . ~p Dem

= p . ~p D.N

উপরিউক্ত বচনটির নিষেধ করলে দেখা গেল যে বচনটি স্ববিরোধী। সুতরাং বচনটি সংশ্লেষক বচন নয়, বচনটি বিশ্লেষক বচন। সুতরাং, কোয়াইন এর আপত্তি গুলি যথাযথ নয়। সর্বশেষে বলা যায়, জার্মান দার্শনিক কান্ট তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে যে, বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের উল্লেখপূর্বক পার্থক্য ও ব্যাখ্যা করেছেন তা ত্রুটিহীন না হলেও, এই পার্থক্য সম্পর্কে একাধিক সমালোচনা হলেও; এই পার্থক্য দর্শন জগতের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কান্টের প্রদত্ত পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের যে ধারণা তা নির্ভর করে আছে এই বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের বিভাগের উপর। যদি বচন গুলিকে পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাধ্য এবং বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক এই বিভাগে বিভক্ত না হতো তাহলে পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বচনের এই বিভাগ গুলি পাওয়া যেতো না। সুতরাং উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর ধারণার উপর নির্ভর করে অবধারণের এই বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের বিভাগ যুক্তিযুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Blackwood, R.T., & Herman, A. L., 1975, *Problems In Philosophy: West And East,* New Delhi, Prentice hall.

২. Falckenberg, Richard, 2012, *History Of Modern Philosophy From Nicolas Of Cusa To Present Time,* Trans. A.C.Armstrong, JR. Kolkata, Progressive Publishers.

৩. kant, Immanuel, 1929, *Critique Of pure Reason*, Trans. Norman Kemp Smith, London, Macmillan And Co, Limited.

৪. Quine, Willard Van Orman, 1951, *Two Dogmas Of Empiricism,* United States, The Philosophical Review.

৫. দাস, রমাপ্রসাদ ও চক্রবর্তী শিবপদ, ২০০২, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ।

বাস্তবের আখ্যান, আখ্যানে ইতিহাস ও শরদিন্দুর 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'

মিঠুন মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাস্তব আর ইতিহাসের মিশেলে রচিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা। কিন্তু সেই উপন্যাসের আখ্যানের কুলপুরোহিত যদি হন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাহলে সেখানে যে কোনো পাঠককে থামতে হয় বইকি! শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' সেই রকমই এক ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। যার কাঠামো নির্মাণ করেছেন স্বয়ং অতীশ দীপঙ্কর। যাকে নানা সজ্জায় সজ্জিত করে তুলেছে নয়পাল, বিগ্রহপাল, বিক্রমাদিত্য, কর্ণদেব, জাতবর্মা, বীরশ্রী, যৌবনশ্রীর মত ইতিহাসের চরিত্ররা। যেখানে কাহিনির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে অনঙ্গ পাল, লম্বোদর, বান্দুলীর মত অনৈতিহাসিক চরিত্রেরা। স্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় - *বাস্তবের আখ্যান, আখ্যানের ইতিহাস ও শরদিন্দুর 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'* শীর্ষক প্রবন্ধটি সেই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই লিখিত।

সূচক শব্দ : ঐতিহাসিক, উপন্যাস, ইতিহাস, রোমান্স, কাহিনি, রাজা, রাজত্ব, ব্যক্তিত্ব।

মূল আলোচনা:

অসতো মা সদ্গময়

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটির নাম উচ্চারণ করলেই স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে অনেকগুলো টুকরো ছবি আর চেনা নাম। যেমন হারিয়ে যাওয়া ষোড়শ মহাজনপথ, মজে যাওয়া নর্মদা নদী, ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়া বিক্রমশীলা মহাবিহার, বিলুপ্ত হওয়া পালবংশ; চেদীবংশ, বড় বড় রাজা, তাদের রাজত্ব, মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান – এমন আরো কত কিছু। শুধু যেটা মনে পড়ে না তা হল, কোনটা ইতিহাস আর কোনটা ঔপন্যাসিকের কল্পনা, সেটা খুঁজে দেখার কথা।

সালটা ১৯৫৮, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবল উৎসাহে, তাঁকেই উৎসর্গ করে প্রকাশিত হল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'। উপন্যাসের কাহিনির সূচনায় দেখা মিলল এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের, যাকে কোনো কাল, কোনো ইতিহাস, কোনো সমাজ, কোনো ধর্ম, কোনোকিছুই উপেক্ষা করতে পারবে না কোনোদিন - তিনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। অন্ধকার থেকে আলোর পথে চলার জন্য প্রদীপ জ্বেলেছিল যারা অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁদেরই পুরোধা পুরুষ - এইকথা যদি

বলি তাহলে, ইতিহাস তার সাক্ষী বহন করে অবলীলায়। ইতিহাসের জীবন্ত চরিত্রকে সাহিত্যের উপকরণ করে তুলেছিলেন যারা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আসলে তাঁর মত করে এমনভাবে ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যের আর কোনো ঔপন্যাসিকের আছে কি না, তা যথেষ্ট চর্চিত বিষয়। তাঁর হাতে ইতিহাস আর কল্পনা মিশ্রিত হয় যেন নদীর চোরা স্রোতের মত, পাঠক তার অতলে তলিয়ে যায় কেবল।

বিক্রমশীলা মহাবিহার তখন তার পূর্ণ গৌরব নিয়ে অবস্থান করছে। অতীশ দীপঙ্কর সেখানকার মহাচার্য পদে আসীন। মগধ শাসন করছে পাল রাজারা। ত্রিপুরায় অবস্থান করছে চেদীরাজ বংশ। তিব্বত থেকে বিক্রমশীলা মহাবিহারে এসে উপস্থিত হয়েছেন একদল তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষু। যারা অতীশ দীপঙ্করকে তাদের দেশে নিয়ে যেতে চান। মহাচার্য এবারও তাদের প্রস্তাব নাকচ করেছেন। এমন এক সন্ধ্যায় হঠাৎ মহাবিহারের মধ্যে এসে উপস্থিত হন চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণদেব। প্রাথমিকভাবে জানা যায় তিনি নাকি মৃগরায় এসে ক্ষুধার্ত হয়ে বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তার সৈনিকদের লুটপাট করার মনোভাব দেখে সেকথা কখনই সত্য বলে মনে হয় না অতীশ দীপঙ্করের। বরং তাদের অত্যাচার থামাতে ময়দানে নামতে হয় তিব্বতী বৌদ্ধভিক্ষু বিনয়ধরকে। অপরিচিত অগ্নিকন্দুক প্রয়োগ করে বিনয়ধর লক্ষ্মীকর্ণের বাহিনীর পৈশাচিক আচরণ থামান, নিজে 'পিশাচ' হয়ে। পরে জানা যায় চেদীরাজ আসলে মগধ আক্রমণের অভিপ্রায় নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়েছে কারণ মগধেশ্বর নয়পাল তার পথ রোধ করেছেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়পাল কখনই বৌদ্ধবিহার আক্রমণ করবেন না। সুতরাং বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহারের থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল আর কিই বা হতে পারে। চেদীরাজের অসৎ উদ্দেশ্য অচিরে ধরা পড়ে মহাজ্ঞানী এই মহাচার্যের কাছে। তবুও স্বাভাবিক বিনয়েই তিনি তাকেও আশ্রয় দেন। নয়পালের সাথে সন্ধির প্রস্তাব রাখেন। পথ করে দেন তাকে নিরাপদে নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার। কেবল সন্ধির শর্ত হিসাবে পাল বংশের ভবিষ্যৎ রাজবধূ নির্বাচন করেন লক্ষ্মীকর্ণদেবের কনিষ্ঠ কন্যা যৌবনশ্রীকে। যুবরাজ বিগ্রহপালের বধূ হবেন তিনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় উপন্যাসে বর্ণিত এই যুদ্ধ এবং পরিণয়ের। আর এই গাঁটবন্ধনের সাক্ষী থাকেন স্বয়ং অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

পিশাচ !

যে রাতে রাজা লক্ষ্মীকর্ণদেব তার বাহিনী নিয়ে বৌদ্ধ বিহারের প্রবেশ করেন, সেই রাতেই তার সৈনিকদের তান্ডব থামাতে, বিক্রমশীলা মহাবিহারে আগত তিব্বতী বৌদ্ধভিক্ষুরা এক অসাধারণ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। অপরিচিত আগুনের গোলকের ছোটাছুটি আর কর্ণবিদীর্ণ করা শব্দ চমকে দিয়েছিল সাধারণ সেনা, রাজামশাই থেকে অতীশ দীপঙ্করকে। মহাচার্য তার অন্তরের বিস্ময় অচিরেই সামলে নিতে পারলেও, রাজামশাই আর তার সৈনিকরা পারেননি। তাই সৈনিকরা পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপে ভীত

হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। রাজামশাইয়ের কাছে বিনয়ধর হয়ে উঠেছিলেন 'পিশাচ'। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ সিরিজ হোক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনি সর্বত্র একটা বিষয় ভীষণভাবে চোখে পড়ে, তাঁর অস্ত্র প্রয়োগের উপকরণ। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' উপন্যাসের ব্যবহৃত এই অগ্নিকন্দুক-এর বিবরণ দেখলে বোঝা যায়, এ সম্ভবত আমাদের অতিপরিচিত হাতবোমা। কিন্তু ঔপন্যাসিকের লিখনশৈলী আর কাহিনির বাঁধন এমন যে, এই সাধারণ জিনিসও পাঠকের কাছে অসাধারণ বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত হয়।

বৃষ লগ্নে গুরুঃ খলঃ

জগতে কিছু মানুষ থাকেন, কোনো পরিস্থিতিই যাদের চরিত্র বদল করতে পারে না। এই লক্ষ্মীকর্ণদেব চরিত্রটি ঠিক এমন এক চরিত্র। সেদিন রাতে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সন্ধি স্থাপন করেন ঠিকই। কিন্তু যে ক্ষণে সন্ধি করছিলেন, সেই ক্ষণেই জানেন এই শর্ত তিনি ভঙ্গ করবেনই। কেবলমাত্র অতীশ দীপঙ্কর আর তার বৌদ্ধবিহারে ঘটে যাওয়া পৈশাচিক ঘটনা তার মনে ভয় সৃষ্টি করেছিল তাই, তাদের সকল প্রস্তাব সেদিন মাথা নত করে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তো মনুষ্য চরিত্র বদল করতে পারে না। পরিস্থিতি বদল হলে মানুষ তার নিজ স্বভাবেই ফেরৎ আসে। লক্ষ্মীকর্ণদেবও তার ব্যতিক্রম নন। বরং কেমন করে মগধের যুবরাজ বিগ্রহপাল আর তার পিতা নয়পালকে অপদস্ত করা যায় তার পরিকল্পনা করতে থাকেন। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে, যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর সভায় মগধের যুবরাজ বিগ্রহপালের নামে ছেদ পড়ে। যেখানে তাদের বিবাহ পূর্বে নির্ধারিত। তার বদলে রাজা লক্ষ্মীকর্ণদেব সন্ধান করতে থাকেন এক শিল্পীর যিনি বিগ্রহপালের মূর্তি নির্মাণ করে দেবেন এবং যার দেহ হবে বানরের মত। অর্থাৎ যত রকমভাবে স্বয়ংবর সভার নামে প্রহসন করা যায় তার কোনো ত্রুটি চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণদেব রাখেননি। ইতিহাসের পাতায় চেদীরাজ কর্ণদেব এবং পালরাজা নয়পালের যুদ্ধের কথা থাকলেও, উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনিতে যে বিবাহ বিভ্রাট তা চেদীরাজ করেননি। বরং সেটা আরো শতাধিক বর্ষ পরের ঘটনা, সেকথা ঔপন্যাসিকের নিজস্ব বয়ান থেকেই জানা যায়। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লেখেন,

> দীপঙ্করের শান্তি-প্রচেষ্টা এবং বিগ্রহপালের সহিত যৌবনশ্রীর বিবাহও ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কাহিনীর সংঘটন কাল হইতে শতাধিক বর্ষ পরে কান্যকুব্জের রাজা জয়চাঁদ তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর সভায় পৃথ্বীরাজকে অপদস্থ করিবার যে ফন্দি করিয়াছিলেন, এই কাহিনীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত তাহার কিছু সাদৃশ্য আছে।[১]

বোঝাই যাচ্ছে রাজা কর্ণদেবের না হলেও অন্যান্য বড় বড় রাজাদের এইধরণের ছেলেমানুষীর পরিচয় ইতিহাস বহন করে। যাকে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের উপাদান করে তুলেছেন, কেবল স্থান, কাল, পাত্র পরিবর্তন করে।

তুমি আমার সাধের সাধনা

মনের গতি বড় অদ্ভুত, যখন সে কারোর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তখন সেদিকে অন্ধের মত ছুটে চলে। তার এই ছুটে চলার পরিণতি কিরূপ এই ভাবনা তার কাজ করে না। যেমন যুবরাজ বিগ্রহপালের করেনি। মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর, পিতা নয়পাল আর রাজা লক্ষ্মীকর্ণদেব যখন বিগ্রহপালের সাথে যৌবনশ্রীর বিবাহের সন্ধিস্থাপন করেন, তখন যুবরাজ বিগ্রহের মনে তার ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে কোনো কল্পনাই ছিল না। কিন্তু যখন স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ পড়লেন তিনি, তখন আঘাত লাগল তার পৌরুষে। বন্ধু অনঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যায়, পাটলীপুত্রের ঘাট থেকে যখন নৌকা ছেড়ে যাচ্ছে, তখনও বিগ্রহপালের হৃদয়ে যৌবনশ্রীর জন্য কোনো পূর্বরাগের সঞ্চার হয়নি। এর কারণ প্রধানত তিনি রাজকুমারী যৌবনশ্রীকে দেখেননি, এমনকি কারো মুখে তার প্রসঙ্গে কোনো কথাও শোনেননি। কিন্তু নদীর গতিপথ যত এগিয়েছে পূর্বরাগ ক্রমে অনুরাগে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশেষ করে যখন তিনি জাতবর্মা এবং বীরশ্রীর সাথে পরিচিত হয়েছে। জাতবর্মার স্ত্রী বীরশ্রীই যৌবনশ্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সুতরাং তাকে দেখে তার ভগিনী সম্পর্কে একটি অবয়ব কল্পনা করে নেওয়াই যায়। তাই এই পর্ব থেকে ধীরে ধীরে যুবরাজের মনে অদৃশ্য আকর্ষণ এবং কৌতূহল জন্ম নিয়েছে। তারপর ত্রিপুরীর ঘাটের দিকে নৌকা যত এগিয়েছে যেন নদীর স্রোতের টানের সাথে মিশে গেছে যুবরাজের মনের অনুরাগের রঙ। এই রঙ গাঢ় হয়েছে ত্রিপুরীর ঘাটে সাধুবাবার সামনে যৌবনশ্রীর হাতের উপর নিজের হাত রাখার পর। আসলে মনের খেলা এমনই, কখন যে কোনদিকে কেমন করে ধাবিত হবে মানুষ নিজেই তা জানে না। বরং যৌবনশ্রী যেভাবে বিগ্রহকে বরণ করে নিয়েছে সেটাকে অনেকটা love at first side বলাই যায়। এই উপন্যাসের যৌবনশ্রী আর বিগ্রহ পাল ছাড়াও আরো দুটি চরিত্র একে অন্যের জন্য সাধনা করেছিল, তারা অনঙ্গ পাল আর বান্দুলী। বান্দুলী আর অনঙ্গের মনে পূর্বরাগের সঞ্চার ঘটেছিল প্রথম দর্শনেই। অনঙ্গ শিল্পী তার মন স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্য পিপাসু। কেমন নারীকে সে তার জীবনে চায়, সেটা সে পূর্বেই জানিয়েছিল বন্ধু বিগ্রহপালকে। যে রূপের সাধনা শিল্পী অনঙ্গ পাল করত, বান্দুলী যেন অবিকল তাই। সেই কারণে বান্দুলীকে আপন করতে অনঙ্গপালের বিশেষ দেরী হয়নি। ত্রিপুরীর ঘাটই আসলে মিলিয়ে দিয়েছিল বিগ্রহ পাল-যৌবনশ্রীকে। লম্বোদরের গৃহ মিলিয়ে দিয়েছিল অনঙ্গপাল-বান্দুলীকে। নিজেদের ভালোবাসার মানুষকে চিনে নিতে এই চারটে চরিত্রের বিশেষ সময় লাগেনি। ত্রিপুরীর ঘাটে পৌঁছানোর একদিনের মধ্যেই এই মন জানাজানির পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। তাই সাধনা মূলত বৈবাহিক পরিণতি লাভের জন্যই করতে হয় এদের। ইতিহাস বান্দুলী আর অনঙ্গের ভালোবাসার কাহিনি না জানলেও, যৌবনশ্রী আর বিগ্রহপালের ভালোবাসার বাস্তব কাহিনি জানে। যুদ্ধক্ষেত্রে একে অন্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে থেকেও ভালোবাসা এই দুই

নর-নারীর মিলন ঘটিয়েছিল। ইতিহাসে সেই মিলন ছিল অনাড়ম্বর। উপন্যাসের সেই অধ্যায়ই সবচেয়ে আকর্ষক অধ্যায়, কারণ এরপরের কাহিনি মূলত এগিয়েছিল এদের বৈবাহিক পরিণতি কিভাবে হবে, সেই রহস্যময় অধ্যায়কে কেন্দ্র করে।

'ফুল আর ভোমরা'

ভোমরা যেমন ফুলের টানে একস্থান থেকে আর একস্থানে চলে যায় অবলীলায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' উপন্যাসের নারী-পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণ যেন ঠিক তেমন। অলিখিত, অদৃশ্য কোনো সুতোর টানে চরিত্রগুলো যেন বাঁধা। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিগ্রহপাল আর যৌবনশ্রীর মাঝে যেমন এক অদৃশ্য বন্ধন ছিল। ঠিক তেমন উপন্যাসের উপকাহিনি নির্মিত হয়েছে যে চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যেও বাঁধন এই ফুল আর ভোমরার মত। চেদীরাজ কন্যা বীরশ্রী, বঙ্গদেশের রাজবধূ, তার স্বামী জাতবর্মা শুধুমাত্র যে তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসেন তা নয়, প্রিয় নারীর বুদ্ধিমত্তাকে তিনি সম্মান করেন। নিজের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত সকলদিকে দিব্যদৃষ্টি রেখে, চিন্তা-ভাবনা করে যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করেন। বিগ্রহপাল আর যৌবনশ্রীর মিলনের অনুঘটক এই দুই চরিত্র। কিন্তু তারা যে এই সম্পর্কটিকে সমর্থন করেছেন কিংবা চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণদেবের বিপক্ষে গেছেন, সেটা চারদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মূল কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই দুই চরিত্রের ভূমিকা বিপুল। ঐতিহাসিক এই দুই চরিত্রকে, বিশেষ করে জাতবর্মাকে রাজকার্যের পরিবর্তে শালিকার বিবাহের অনুঘটক হতে দেখাটা যেমন আনন্দকর, যুক্তিসঙ্গত। ঠিক তেমন ঔপন্যাসিক এই চরিত্রদুটিকে যেভাবে নির্মাণ করলেন ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও চরিত্রের রসক্ষুণ্ণ হয়নি এতটুকুও।

উপন্যাসের দ্বিতীয় উপকাহিনি নির্মিত হয়েছে বান্দুলী আর অনঙ্গপালকে কেন্দ্র করে। অনঙ্গের মনের মাধুরীতে যে নারীর জন্ম সে বান্দুলী, তাই সে, 'অঙ্গ নধর, কান্তি কমনীয়, অধর রসসিক্ত, চক্ষু দুটি কাজল না পরিয়াও কৃষ্ণায়ত'[২]। বান্দুলী প্রকৃত ভারতীয় নারী। তাই সে তন্বী, সে শ্যামাঙ্গীনি। যেন প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত ভারতীয় নারী। অনঙ্গ পাল শিল্পী, ভারতীয় শিল্পীর চোখে যে ভারতীর নারীর এইরূপই গ্রহনীয় হবে এটাই স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিকের ভারতীয় শিল্পের প্রতি যে অনুরাগ, তার প্রচ্ছন্ন ধারক ও বাহক যেন এই চরিত্রদুটি। অনৈতিহাসিক এই চরিত্রদুটিকে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছিলেন মূল কাহিনির প্রয়োজনেই। অনঙ্গ পাল বিগ্রহপালের বন্ধু। বন্ধু ছাড়া আর কার কাছে বিগ্রহ তার মনের কথা জানাত। বিগ্রহপালের মনের দ্বার অবধি পৌঁছানো পথ নির্মান করেছে অনঙ্গ। উপন্যাসে বান্দুলী চরিত্রটির গুরুত্ব কিন্তু বীরশ্রী ত্রিপুরী না পৌঁছানো অবধি। তারপর বীরশ্রী বারবারই বান্দুলীকে যৌবনশ্রীর থেকে সরিয়ে দিয়ে, তাকে বাহিরের জগতে প্রেরণ করেছে। যে সময় অনঙ্গ রাজ শিল্পী হিসাবে রাজশিল্পীশালায় বন্দী থেকেছে, সেই সময় অনঙ্গের সাথে বাকি চরিত্রের যোগাযোগের মাধ্যম হয়েছিল বান্দুলী। এই চরিত্রটি ছাড়া স্বয়ংবর সভা ভঙ্গ করা সম্ভব হত না, শত

পরিকল্পনা সত্ত্বেও। অনঙ্গের পরিপূরক একটি চরিত্র বান্দুলী। আবার বীরশ্রী এবং বান্দুলীকে একে অন্যের পরিপূরক করে নির্মাণ করেছিলেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের এই নারী-পুরুষ চরিত্রগুলো ফুল আর ভোমরার মত কেবল একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল তা নয়। কাহিনিতে নির্মিত সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় অনুযায়ী, এরা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কখনও অনঙ্গ-বিগ্রহপাল, কখনও জাতবর্মা-বিগ্রহপাল, কখনও বীরশ্রী-যৌবনশ্রী, কখনও বীরশ্রী-বান্দুলী।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা

যৌবনশ্রী চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছিলেন লজ্জাশীলা করেই, কিন্তু ঘটনার আবহে তার লজ্জা গেছে ভেঙে বরং এক ক্ষত্রিয় তেজের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। যে সময় পর্বে ঔপন্যাসিক কাহিনি নির্মাণ করেছেন, তখন বঙ্গদেশে ষাটের দশক, নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজের অধিকার বুঝে নিতে শিখেছে। তাই শরদিন্দুর ষাটের দশকের যৌবনশ্রীও সতেরো বছর বয়সে স্বয়ংবরা হচ্ছে। বিগ্রহপাল, যে ভবিষ্যতে মগধের মত রাজ্যের ভার বহন করবেন, তিনি আবেগের বশবর্তী হয়ে, নিজের প্রিয়তমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু যৌবনশ্রী ভুলে যাননি তার ক্ষত্রিয় ধর্ম। বিগ্রহপালের হাত ধরে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন। তার এই অবস্থান সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশের পরে এক পত্রে ঔপন্যাসিককে জানিয়েছিলেন,

> যৌবনশ্রীকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। ভারী সুন্দর যৌবনশ্রী। রূপে গুণে নারীরত্ন। হাজার কয়েক বছর আগে এক চর্তুদশবর্ষীয়া ক্ষত্রিয় কুমারী রাজাবরোধ হইতে ঠিক এই কথাই লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে। যৌবনশ্রী মুখে যাহা বলিয়াছেন, পত্রে সেকথাই লেখা ছিল, তুমি এস, একাকী নয়, চতুরঙ্গ বাহিনীতে সজ্জিত হইয়া এস। প্রকাশ্য দিবালোকে সমাগত রাজন্যমন্ডলীর সমক্ষে আমাকে রথে তুলিয়া লও। রাক্ষস বিবাহে আমায় গ্রহণ কর। সিংহের ভোগ্য যেন শৃগালে স্পর্শ না করে। ... ভারতের ক্ষত্রিয় কুমারীর অন্তর্নিহিত এই কামনা ঐ কুসুমপেলব তন্বী যৌবনশ্রীর আলেখ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে।[৩]

যুবরাজ বিগ্রহপালের মনের মেঘ এই নারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, আবার এঁর কারণেই সেই মেঘ কেটেও গেছে। যৌবনশ্রী বিগ্রহ পালের জীবনেরই সেই মেঘ, যে মেঘ নিজে ঝরে গিয়ে আকাশকে গাঢ় নীল করে তোলে। তাই যৌবনশ্রী বিগ্রহ পালকে ক্ষত্রিয় তেজে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। যেমন করে, অনঙ্গ পালের জীবনে সন্ধ্যার মেঘমালার মতো এসে উপস্থিত হয়েছিল বান্দুলী। দিদি বীরশ্রী এসেছিল ছোটো ভগিনি যৌবনশ্রীর জীবনে সন্ধ্যার মেঘ হয়েই। কারণ বীরশ্রী না থাকলে বিগ্রহপাল-যৌবনশ্রীর সম্পর্ক আদৌও কোন পথে পরিণতি পেত সেটাই একবড় প্রশ্ন চিহ্ন। কিন্তু বুদ্ধ আর

বিষ্ণু মেঘ কাটিয়ে নীল আকাশের মাঝে মুক্ত করেছেন ভালোবাসাকে - এখানেই এই ঐতিহাসিক কাহিনির সফলতা।

ইতিহাস কথা বলে

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘমালার মত সাজিয়ে দিলেন ইতিহাসের কাহিনি। যে ইতিহাস জানাল অতীশ দীপঙ্করের মৃত্যুর তেরো বছর পূর্বের এক ভারতবর্ষকে। পাল রাজ বংশের সাথে চেদীরাজ বংশের সংঘাত, প্রেম, পরিণয়ের কাহিনি। যুক্ত হল বঙ্গদেশ সেই বৈবাহিক সূত্রেই। বৌদ্ধরা আর তখন কেবল নির্বানের কথা বলে না, তন্ত্রসাধনার পদ্ধতি শিক্ষাও লাভ করে। এই ইতিহাস যে কথা বলে উপন্যাসের আখ্যাপত্রে ঔপন্যাসিক সে সম্পর্কে লিখেছিলেন,

> এই কাহিনীতে দীপঙ্কর, রত্নাকর, শান্তি, নয়পাল, বিগ্রহপাল, লক্ষ্মীকর্ণদেব, বীরশ্রী, যৌবনশ্রী, জাতবর্মা, বজ্রবর্মা, যোগদেব ও তিব্বতীয় আচার্য বিনয়ধরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দীপঙ্করের শান্তি-প্রচেষ্টা এবং বিগ্রহপালের সহিত যৌবনশ্রীর বিবাহও ঐতিহাসিক ঘটনা।[৪]

তবে, ইতিহাস যে কথা বলে না, তা হল সেদিন পালরাজা আর চেদীরাজের মধ্যে ছিল সংঘাত, তবে ছিল না কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি। সংঘাত মুছে ছিল বাস্তবের দুই নর-নারীর ভালোবাসা। ইতিহাসের কাহিনি অনুযায়ী মগধরাজ বিগ্রহপালের স্ত্রী হতে যৌবনশ্রীর পায়ে কোনো শিয়াল কাঁটা ফোটেনি। উপন্যাসের কাহিনিতে শিয়ালকাঁটা বিঁধেছিল, না হলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে হয়ে উঠত না রহস্যময়। চেদীরাজের চরিত্রটিকে কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয়েছিল হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের। সেখানেও কাহিনির স্বার্থই বৃহত্তর হয়েছিল ঔপন্যাসিকের কাছে। কিন্তু অনঙ্গপাল, বান্দুলী, লম্বোদর, বেতসীর মতো চরিত্রগুলোও যেন ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর সাথে মিশে ঐতিহাসিক চরিত্রই হয়ে গেছে।

আসলে শরদিন্দু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনির আয়নায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সেই ভারতীয়দের ইতিহাসের প্রতিবিম্ব। যা আজকের ভারতীয়কে, বিশেষ করে বঙ্গদেশকে স্মরণ করিয়ে দেবে বাঙালির অবস্থান কি ছিল; আর কি হয়েছে। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' এই দীর্ঘ উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে কোনো পাঠকের কখনও বোধ হবে না যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ছে, বারবার মনে হবে, সে তো এই বঙ্গদেশকেই দেখছে। আসলে ব্যক্তিজীবনে বাঙালি হয়েও প্রবাসী বাঙালি হিসাবেই থেকে গিয়েছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। হয়তো এই কারণেই নিজের সংস্কৃতি, সভ্যতার উপর দায়িত্ববোধ তাকে তাড়িয়ে বেড়াত। ১৯৫১ সালে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি নিজের ডায়েরিতে লেখেন,

> আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীন tradition-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করে না কেন?

> বাঙ্গালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না, ততদিন তাহার কোনও আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই, তাহার ভবিষ্যৎ নাই।

তাই, ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করতে ইতিহাসের অবিস্মরণীয় চরিত্র অতীশ দীপঙ্করকে দিয়ে এক রাক্ষস বিবাহের মধ্যস্থতা করাতেও পিছুপা হন না ঔপন্যাসিক। যে বাঙালি আজ তার সংস্কৃতি ভুলতে পারলে সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করে। সেই বাঙালি পাঠক যখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' আজও পাঠ করে, তখন যেন উপন্যাসের শেষে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে দিয়েই ঔপন্যাসিক কানে কানে বলেন, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়...'

তথ্যসূত্র :

১। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭০০০০৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মে ২০১৫, পৃষ্ঠা – ৮২৮।

২। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭০০০০৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মে ২০১৫, পৃষ্ঠা – ৫৪৯।

৩। প্রাগুক্ত গ্রন্থ (১সংখ্যক), পৃষ্ঠা – ৮৩০।

৪। তদেব।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -৭০০০০৯, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, মে ২০১৫।

২। ক্ষেত্র গুপ্ত, রমণীয় শরদিন্দু, গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/২ বি পটুয়াতোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ - পয়লা বৈশাখ, ১৪০৮।

ক্যালেন্ডার চিত্র : প্রতিটি বাস্তবযাপনের একটি পৌরাণিক আলাপ

বাপী মজুমদার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
নিউ আলিপুর কলেজ

সারাংশ: পুরাণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। ক্যালেন্ডারে পৌরাণিক স্থিরচিত্রের মধ্য দিয়ে এক একটা ঘটনা যেন এক একটা জীবনের দিক উঠে আসে। তা যেন স্থিরচিত্রের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের ভাব জাগ্রত হয়। তার প্রতীকি আলাপের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবন যেন একাকার হয়ে যায়। ক্যালেন্ডার চিত্রে সেই সব পৌরাণিক আলাপের সঙ্গে মানব জীবনের একান্ত যোগাযোগ রয়েছে তা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা মাত্র করা হয়েছে এই লেখাটির মাধ্যমে।

মূল শব্দ: স্থিরচিত্র অথচ চলিষ্ণু মন, পৌরাণিক প্রতীক ও বাস্তব ভাবনার প্রবহমানতা।

সভ্যতার শৈশব থেকে ধর্ম ও পুরাণের প্রতীকের আড়ালে যেসব সত্য মানুষকে জীবনযাপনে সাহায্য করেছে, তার কল্পনা ও মননকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করেছে, তাকে জীবনের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটনে কিংবা সেইসব রহস্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেসব সত্য উন্মোচন বিশ্লেষণ এবং বর্তমান জীবনযাত্রায় তাদের অন্তর্লীন ধারাবাহিকতা প্রদর্শনই পুরাণচর্চার উদ্দেশ্য হিসেবে প্রকাশিত ও প্রসারিত হোক।

চিত্রকল্প আদিম মানুষকে যেমন নাড়া দিত, আধুনিক মানুষকেও তা কখনও কখনও নাড়া দেয়। মিথের রহস্য আজও মানুষকে শোনায় আশার বাণী। মিথের গল্প এই মানসিক অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নতুন জীবনে পদার্পণের সময় যুবক-যুবতিকে পুরাণ যেমন পথ দেখায় (বিবাহের রাতে অরুন্ধতি তারা দেখা), তেমনই সেই জীবন উত্তীর্ণ হতে এবং পরবর্তীকালে মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতেও তাকে সাহায্য করে। মিথের পুনরুজ্জীবনে শিল্পীর ভূমিকা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। মিথের কাহিনীর মাধ্যমে ক্ষনিকের ভেতর চিরায়তকে, সীমার মাঝে অসীমকে এবং ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করা হয়। মিথ বিশেষজ্ঞ দেবদত্ত পট্টনায়েকের অনুভব স্বকৃত অনুবাদে ব্যক্ত করলাম—

অনন্ত পুরাণের মাঝে
আছে যে সনাতন সত্য,
তা পূর্ণরূপে কেই বা জেনেছে!
বরুণের আছে সহস্র নয়ন

আর ইন্দ্রের আছে শত।
ভেবে দেখো, তোমার আমার
শুধু পোড়া দুনয়ন। [১]

আরেকটা বিষয়, যার সন্ধানের নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা নেবে, তা হল, যে কোনও পরিস্থিতিতেই দেওয়ালে টাঙানো পৌরাণিক ছবির কাছে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যাওয়া। চায়ের দোকানে দেয়ালের এক প্রান্তে উড়তে থাকা একটি ছবির (ভয়ালো বা শান্ত) প্রতি 'আর কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া মানুষ' কিংবা প্রাণভিক্ষাকারী অথবা কোনও চাকরিপ্রার্থীর প্রার্থনা নৈঃশব্দ থেকে ধ্বনিময়তায় উজ্জীবিত হয়ে যাওয়া—এইসব পৌরাণিক দৃশ্য (ঘরোয়া) যা আমরা আজ থেকে দশক আগেও প্রতি ঘরে ঘরে দেওয়ালে টাঙানো দেখতাম, তার কি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি রয়েছে? ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে?

ভারতীয় ধর্ম ও পূজাপদ্ধতির ইতিহাসে মন্দিরের চলন তেমন না থাকারই ইঙ্গিত ইতিহাসে লক্ষণীয়। ইতিহাসের কালো পথে পড়ে থাকা ঋণাত্মক আধার লক্ষ করলে জানা যাবে, সেই মন্দিরে সকলের আরাধনার প্রবেশপথ মসৃণ ছিল না, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শৈল্পিক ক্রান্তিকারী রাজা রবি বর্মা পুরাণকে আরও সহজতর করে প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি যেন মানুষের মনে ভক্তির বীজ বিশ্বাসের আধারে বপন করে দিলেন। রাজা রবি বর্মা তাঁর চিরস্মরণীয় কাজটি করলেন নিজস্ব ক্যানভাসে। মন্দিরের দরজা বন্ধ তো কি হয়েছে! ভগবানকে ভক্তের ঘরে স্থাপন করতে হবে। প্রেসের কাগজে ফুটে উঠল বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির স্থিরচিত্র। অচিরেই ঘরে ঘরে তা ছড়িয়ে গেল। তিনি শুধু চিত্রের মাধ্যমে পুরাণকে ধরার চেষ্টা করলেন তাই নয়, সেই স্থিরচিত্র যেন চলচ্চিত্রের রূপ নিল মানুষের অন্তরে পৌঁছে। প্রত্যেকটা ক্যালেন্ডারের সেই ছবি হয়ে উঠল যেন এক একটি চলচ্চিত্র, যেন প্রতিটি বাস্তবযাপনের এক একটি পৌরাণিক আলাপ।

আমি এই ছোট্ট পরিসরে পাঠকের কাছে সেই ভাব পৌঁছে দিতে চাই যা ফ্যাক্ট ও ফিকশনের মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। হয়তো এই সূত্র ধরেই এই বিষয়টি একটি গভীর গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এইটুকু আশা।

আদিমকাল থেকেই মানুষ দলবদ্ধ জীব, নিজ প্রয়োজনেই পরিবার ও সমাজ সৃষ্টির জন্যই তার চেষ্টা। সেই প্রচেষ্টাতেই এই শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে কখনও দলবদ্ধভাবে শিকারচিত্রে, কখনও বা দেখার আনন্দে নানা প্রাকৃতিক চিত্রপ্রবাহে। বৈদিক যুগের কঠিন ঈশ্বরসাধনা পুরাণ যুগে এসে সরল দর্শনের রূপে প্রকাশ পেল। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিগুলো লোকমানসে বিশেষ একটা স্থান অধিকার করে আছে, তা যেন কোনও অলংকার হিসেবে নয়, মিশে রয়েছে দেহমজ্জায়। এর এক সুন্দর অভিব্যক্তি এটি গানের মধ্যে ফুটে ওঠে, যেখানে ভগবান শিব আত্মভোলা ডমরুধর

ভাঙের নেশায় বুঁদ অথচ এই বিশ্বকল্যাণে তাঁর অসীম কৃপার পরিচয় সকলের কাছেই জ্ঞাত।

ডিমিক ডিমিক ডমরু কর বাজে,
প্রেম মগন নাচে ভোলা, ভোলা।[২]

—তাই যখন ক্যালেন্ডারের স্থিরচিত্রের মধ্য দিয়ে সেইসব পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্ররা উপস্থিত হচ্ছিল, সেই সময় থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা একাত্মতার ভাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। যাদের মন্দিরে যাওয়া একটা নিষিদ্ধ বিধান হিসেবে প্রচলিত ছিল, সেই তাদের ক্ষেত্রে আরও সহজ হয়ে গেল। নিজের ঘরের দেওয়ালে তাদের প্রিয় ঈশ্বরের প্রকট হওয়া ও ধীরে ধীরে ভরসা স্থল হয়ে ওঠা।

কৃষিসমস্যা সমাধানের জন্যই মানুষ প্রথম পঞ্জিকা আবিষ্কার করে; পণ্ডিতেরা একথা বলেন। প্রাচীন মিশরেও এই সমস্যা ছিল। ফলে মিশরীয়রা পঞ্জিকা আবিষ্কার করেছিল কৃষিসমস্যা সমাধানের জন্য। সেখানে প্রতি বছর দক্ষিণের আবিসিনিয়ার পাহাড় অঞ্চলে যে বর্ষা নামত, তাই-ই উত্তরে এসে মিশরের নীলনদের দুপাশে প্লাবন সৃষ্টি করত। এই প্লাবনই মিশরে কৃষিকার্যের সহায় হত। কৃষিকার্যের জন্য প্রস্তুতি দরকার। তাই প্লাবন কখন আসবে জানা থাকলে কৃষিকার্যের প্রস্তুতি ঠিক ঠিক ভাবে নেওয়া সম্ভব হত। এই প্লাবনের সময় জানতে গিয়েই মিশরীয়রা পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। বৈদিক সভ্যতায়ও সময়-ধারণার অত্যুন্নত বিকাশ ঘটেছিল। ঋগ্বেদে যজ্ঞের নামান্তর বৎসর। বৎসর কাল-পরিমাণ বিশেষ। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য সভ্যতা তার নিজের মতো করে সময় ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছে, সে ইনকা বা অ্যাজটেক বা মায়া সভ্যতা যেখানেই হোক।[৩]

ক্যালেন্ডার যে শুধু এক পাতায় অঙ্কিত মনোহর ছবি ও সংখ্যার মেলবন্ধন নয়, তার চেয়েও ভিন্ন কিছু প্রবাহিত করে দেয় মানুষের অন্তরে, এই অনুভবের উৎসে রাজা রবি বর্মার পথ চলা। একটা ক্যালেন্ডারে চিত্রিত বিভিন্ন কাহিনি বিভব এগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জনমানসের অন্তরে জাতীয়তাবাদী মানবতার শিকড় অনুসন্ধানের এক লহর ওঠা আন্দোলন। এই লহর রাজা রবি বর্মাকে তাঁর প্রজন্মের অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের থেকে এগিয়ে দিয়েছিল। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে ইউরোপীয় কৌশলের সাথে মিশ্রিত করেছিলেন ও এইভাবে ভারতে চিত্রকলার একটি নতুন ধারা নিয়ে এসেছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন লোক ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা ক্যানভাসে তুলে ধরেন এমন এক সময়ে, যখন ভারত নিজেকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য অনুপ্রেরণা খুঁজছিল, সেই কারণে সহজেই ভারতের গৌরবময় অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাসে ক্যালেন্ডার চিত্রগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম না হলেও এই কারণেই তাঁকে সবচেয়ে বেশি পরিচিত একজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্মা তাঁর অনবদ্য কৌশল দিয়ে ভারতীয় শিল্পকে সারা বিশ্বে নিয়ে যাওয়ার জন্যও প্রয়াসী ছিলেন। ইউরোপীয়রা এবং

অন্যান্য শিল্পপ্রেমীরা তাঁর কৌশলের প্রশংসা করলেও ভারতের সাধারণ মানুষ এই সরলতার জন্য তাঁর কাজকে উপভোগ করেছিল। হিন্দু দেবদেবীদের চিত্রায়ন নিম্নবর্ণের বহুলোকের উপাসনার উপাদান হয়ে ওঠে। কারণ ছবিগুলি তাদের ধারণা দিয়েছিল যে মন্দিরের ভিতরে দেবতারা দেখতে কেমন। তিনি শৈল্পিক জ্ঞান উন্নত করতে এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে শিল্পের গুরুত্ব ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। জোসেফ ক্যাম্পবেলের ভাব অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষের স্নায়ুযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছে পুরাণ এবং এ জন্যই তা কেবল মানসিক নয়, দৈহিক পদ্ধতিও প্রভাবিত করে।

হিন্দু পুরাণে প্রতীকের গুরুত্ব অসীম। একে ডাইরেক্ট ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা না হলেও এটা আরও বেশি করে সত্য, কারণ এর মধ্য দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি দিশার প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাস অর্থনীতি যুদ্ধনীতি ভবিষ্যৎ চিন্তা ইত্যাদি হল একরৈখিক সত্য, আর পুরাণ বহুমাত্রিক বিশ্বাসের সত্য। জোসেফ ক্যাম্পবেল এর কথা অনুযায়ী, "মিথ থেকে একটি সত্য জানা যায়, তা হল অনন্ত গহ্বরে জাগে নির্বাণের স্বপ্ন। হতাশার তিমিরে উচ্চারিত হয় রূপান্তরের নিখাদ বাণী, আর আলো ফোটে ঘন অন্ধকার মুহূর্তেই। মিথ হল গণস্বপ্ন আর স্বপ্ন ব্যক্তিগত মিথ।"[৪]

প্রতীক, অর্থাৎ, যে আধারে বিশ্বাস বিরাজিত, অন্তরালে বয়ে চলা এক অন্তঃসলীলা নদীর মতই সত্যের প্রকাশই যার চলন। যেকোনও শিল্পই যেন কিছু সত্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়। যা প্রকাশিত, তার অন্তরালে এক না বলা কথা প্রস্ফূটিত মুকুলের মতই উন্মুখ থাকে, কোনও এক আশায়, একদিন কেউ অন্তরালের এই সত্য উজাগর করবে।

বস্তুগত দিক থেকে হিন্দু প্রতীকগুলি আমাদের প্রতিদিনের আচার-অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনি, শিল্প এবং প্রার্থনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গভীর বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, যখন আমরা প্রার্থনায় লিপ্ত হই না। তেমনই একটি প্রতীক স্বস্তিক যা শুভ এবং সৌভাগ্যময় রূপে পরিচিত। এটি ঈশ্বরকে তাঁর সার্বজনীন প্রকাশ এবং শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি পুরুষার্থকেও প্রতিনিধিত্ব করে: ধর্ম (প্রাকৃতিক আদেশ), অর্থ (সম্পদ), কাম (ইচ্ছা), এবং মোক্ষ (মুক্তি)। এটি একটি পবিত্র এবং প্রতিরক্ষামূলক প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয় যা মন্দির এবং এর ভক্তদের জন্য আশীর্বাদ এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে।

কাহিনির দিক থেকেও হিন্দু পুরাণ বিশেষ অর্থবহ। যে পৌরাণিক কাহিনিটি আলোচনা করতে চলেছি, তা স্নাতকস্তরে সিলেবাস অনুসরণ করে অনেকেই জানেন— মা মনসার কাহিনি। এই কাহিনিটি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে,—

- সমাজ ব্যবস্থায় ভগবত্তা ও আধ্যাত্মিকতার চর্চায় প্রান্তবাসীরাও সক্রিয়।
- ভগবানের অংশে জন্ম নিলেও দৈবত্ব লাভ সহজলভ্য নয়। নিজ জীবনের যথার্থ যাপন ও তার ফলে যথার্থ উপলব্ধিতেই তা অর্জন করা সম্ভব। এ বিষয়ে অবধারণাই জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে ও উপলব্ধি সঞ্চয় করিয়ে দেয়।

দেবীর বিষহরী নাম যথার্থ। এই নাম শোনামাত্রই যেন এক বেদনা উপজিত হয় অন্তরে। মহাদেব পুত্রদ্বয় কার্ত্তিক-গণেশের ক্ষেত্রেও যে অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এসে দৈবত্ব লাভ সহজ হয়েছে, তা স্বীকার না করা দেবী মনসা আপন জীবনের বিনিময়ে সেটাও উপলব্ধি করেছেন। অন্তরের ঋণাত্মক অনুভূতি নিজ কর্মকাণ্ডের প্রভাবে কখন যে কল্যাণবত্তায় উত্তীর্ণ হয় তা খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে এই কাহিনির মাধ্যমে।

- ভক্তির অহংকারও ভক্তকে কলুষিত করে। যে মহাদেবের কাছে মহত্ব বা হীনত্ব সবকিছুই গুরুত্বহীন। তাঁর কাছে উন্নততর জীব বা কীটানুকীট—প্রত্যেকেরই সমান গুরুত্ব। এই মহাদেবভক্তের অন্তরে কিনা ভক্তির অহংকার! চাঁদ সওদাগর ও দেবী মনসার মধ্যবর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাহিনিটিকে ভিন্নমাত্রা দেয়। দেবীর মনসার পৌরাণিক কাহিনিটিকে পুনরায় বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে কত ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে দেবী মনসাকে। যে মনসা দেবী আপন সন্তান আস্তিককে পৃথিবীর কল্যাণে বলিদান দিয়ে দেন, তাঁকে মঙ্গলকাব্যে অত্যন্ত ক্রূররূপে প্রকাশ করা হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বা অনুমান করা যায় যে, তাঁর মাতৃত্ব কখনই লোপ পায়নি। তা হলে কাহিনির শেষে চাঁদ সওদাগরের পুত্ররা ফিরে আসত না। এটাকে এভাবেই দেখা ভালো যে, দেবী মনসার তত্ত্বাবধানেই তারা অন্তরালে ছিল এবং নিজেদের পিতার অহংকার চূর্ণ করার এই ক্রিয়ায় একটি ভূমিকা পালন করেছিল। ভক্তির অত্যধিক অহংকার চরিত্রে কলুষতা প্রদান করে। এই কাহিনিটি চাঁদ সওদাগরের মাধ্যমে সেটাই তুলে ধরে।
- নিজেকে সমস্তকিছুর নিয়ন্তা মনে করাও এক অর্থে অজ্ঞতা, দেবী মনসার অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর ভাব বিধ্বস্ত হয়, যখন মৃত লখিন্দরকে প্রাণদানে ব্যর্থ হন তিনি। ভক্তের ভক্তি যেমন ভগবানের প্রিয়, তেমনই ভগবানের কল্যাণকামীতাও এক ভক্তের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ ঝরে পড়ে। অলৌকিক ক্ষমতা ঈশ্বরবত্তায় উত্তীর্ণ হবে তখনই যখন করুণা ধারায় তিনি নেমে আসবেন ভক্ত হৃদয়ের মন্দিরে।
- অনন্ত প্রেম যার হৃদয়মাঝে বাস করে, শত বাধাও অতিক্রম করার প্রেরণা দেয় তাকে। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনিতে তা উঠে এসেছে।
- এই কাহিনি যেন ক্ষুদ্রত্ব থেকে বৃহতের দিকে যাত্রা। দেবী মনসা কিংবা চাঁদ সওদাগর দুই দিক থেকেই।

চরিত্রের দিক থেকেও প্রতীকবাদ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। আমরা জীবনের যেকোনও স্তরে জয়ী হতে হতে এটা স্থির করে ফেলি যে, জেতাটাই আমার কাজ, যেন এটা জন্মগত অধিকার। এরফলে আমাদের ঘিরে যে যে সম্পর্কের বন্ধন থাকে সেগুলো প্রভাবিত করে ফেলি। সহ্য করতে পারি না তাদের কাছেও পরাজয়। তাই আঘাত করে

দিই নিজের জয়গৌরবে। সম্পর্ক কোনও যুদ্ধ নয়, তা শুধুই অনুভূতি। দেবসেনাপতি কার্তিক ঠিক এটাই করে...

দেবসেনাপতি কার্তিক, এক মহান যোদ্ধা। একদা ভীষণ যুদ্ধ হয় অসুররাজ জলন্ধর ও তার মধ্যে। জলন্ধর, মহাদেব শিবের ক্রোধাগ্নি থেকে সৃষ্ট। সে দৈবষড়যন্ত্রের শিকারও...প্রতিশোধস্পৃহা ধিকিধিকি শৈশব থেকেই। দেবরাজের ভয় সিংহাসন খোয়ানোর চিরকালই, তারই নির্লজ্জ প্রকাশ ষড়যন্ত্রে জলন্ধর নিধনের ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। ইন্দ্রের লক্ষভ্রষ্টে তির নিক্ষেপে মাতৃহারা সে, শৈশবের অনিশ্চয়তার শিকার জলন্ধর।

একাগ্র অটল অবিচল জলন্ধর ইন্দ্রের পতনে তৎপর অনবরত। জয় নিশ্চিত করতে স্মৃতিভ্রষ্ট পার্বতীকে মায়ার দ্বারা বন্দী করে রাখে। জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা কার্তিকের পক্ষে সহজ ছিল না, কারণ তার শিবাংশে জন্ম। তবু দেবসেনাপতি রণভূমি ছাড়েনি। জলন্ধরও কার্তিককে পরাজিত করতে পারছে না। ঠিক সেই সময় জলন্ধর মায়াবলে সেই মায়াপুরীকে রণভূমিতে হাজির করল কার্তিকের একাগ্রতা ভঙ্গ করার জন্য, সফলও হল সে। কারণ মাকে সামনে দেখে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে নিজের একাগ্রতা ভঙ্গ করে দিল। রণভূমিতে প্রধান অস্ত্র হল যোদ্ধার একাগ্রতা, যা কার্তিককে অসংযমী এবং অসন্তুলিত করে তুলল, তাই নিজের অসীম শক্তি ও বুদ্ধিকে চালিত করতে ব্যর্থ হল। তখনই জলন্ধর সুযোগটা নিল এবং হঠাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ করল কার্তিকের ওপর। কার্তিক মহাযোদ্ধা হয়েও তা প্রতিহত করতে পারল না। আহত হল এবং পরাজিত হল।

প্রতিপক্ষ যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাকে তার দুর্বলতায় আঘাত করো, অনুভূতিতে আঘাত করে বিক্ষিপ্ত করো, মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করো, সহজেই যুদ্ধে জয়ী হবে। সাম দাম দণ্ড ভেদ, এই যুদ্ধনীতি কি এমনিই রচিত হয়েছে এই ভারতবর্ষে!

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। মাতৃস্নেহবঞ্চিত পিতৃ আদর্শরহিত কার্তিক, যার জন্মই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিন্তু তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল পিতা-মাতার বাৎসল্য অনুভব করার অক্ষমতা। গণেশ যা উপলব্ধি করতে পেরেছে সহজে, তা সে পারেনি। তাই অভিমানের ভারে সে ভারাক্রান্ত। বারবার পরিবারবিচ্ছিন্ন এক এলিয়েনেটেড ব্যক্তি। ইন্দ্র সেই সুযোগটাই বার বার নেয়। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হওয়া সত্বেও মান পাওয়ার আশায় লালায়িত। কার্তিক শ্রেষ্ঠপুত্র হওয়ার পথে বিচরণশীল। সব ছেড়ে দেওয়ার অনুশীলনে ক্লান্ত। গণেশের মতো পরিস্থিতি থেকে সহজে উদ্ধার পায় না, আরও জড়িয়ে পড়ে। নিজের প্রেমকেও চিনতে না পারা দেবসেনা-পতি কার্তিক আহত পাখির মতো ডানা ঝাপ্টিয়ে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে।

বাহন পৌরাণিক প্রতীকবাদের পরাকাষ্ঠা। পেচক হল তেমনই এক বাহন। দস্যুর ন্যায় অতর্কিত আক্রমণে সে অনায়াসেই সাফল্য অর্জনে সমর্থ। মনুষ্য সমাজেও এরূপ একদল অর্থলোলুপ পিশাচ আছে, যাদের স্বভাব হিংস্র পেচকের মত। এরা রাতারাতি ফেঁপে উঠতে চায়। অন্ধকার পথেই এদের চঞ্চলা লক্ষ্মীর অনুসন্ধান।

বেপরোয়া ঘুস, কালোবাজারী, প্রতারণা, জালিয়াতি, মুনাফাবাজী, চৌর্য্য বা রাহাজানি এদের নিত্য উপজীব্য। অতর্কিতে অজ্ঞাতসারে এরা সমাজের উপর অবাধ লুণ্ঠনবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে, নিরীহ জনতার বুকের রক্ত চুষে খাচ্ছে। শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, সমষ্টিগত ভাবেও এই পেচকবৃত্তির নির্লজ্জ প্রকাশ বিরল নয়। বিত্ত অর্জনের এই কলুষময় অধ্যবসায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এনেছে দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, অশান্তি, রক্তারক্তি, অনৈক্য ও দুর্ভোগ। লক্ষ্মী এখানেই 'কলহাঙ্কুরা', তিনি এখানে অবিদ্যারূপিণী-অলক্ষ্মী। এঁর ভজনা করে অসুর, দৈত্য, দানবেরা, ভোগবাদী দস্যুরা। কিন্তু ভারতের আর্য্য হিন্দু তো এঁকে চান্ নি। তাঁরা চেয়েছেন-ধর্মরূপিণী, বিদ্যারূপিণী লক্ষ্মীকে। পেচকটা নিরর্থক নয় এখানেও। তিনি যেন বলছেন-"আমার বাহন পেচক যেমন দিবসে অন্ধ, তুমিও তেমনি পরধন সম্বন্ধে অন্ধ হও-পাপের পথ, পরস্বাপহরণের পথ, দস্যুবৃত্তির পথ, নিরীহশোষণের পথ, মুনাফাবাজীর পথ, ঘুসের পথ, সর্ব্ববিধ দুর্নীতির পথ তুমি ভুলক্রমেও দেখো না। সে পথে গেলে যমের দণ্ড আছে, তা মদ্বাহন যাম্য পেচককে দেখে স্মরণ কর এবং সংযত হও।”[৫] ধনোপার্জন করতে হবে ঠিক, কিন্তু তা বিহিত উপায়ে, ধর্মীয় বুদ্ধিতে। অর্জিত ধনের ব্যয়ও করা উচিত ধর্মার্থে এবং পরার্থে-কেবল স্বকীয় ভোগের জন্য নয়। এরূপ হলে অর্থ নিয়ে জগতে এত অনর্থের সৃষ্টি আর হবে না। মানুষ ক্রমশঃ হবে নিবৃত্তিমুখী-অর্থের অসারতা উপলব্ধি পূর্ব্বক ক্রমশঃ তার অন্তরে জেগে উঠবে পরমার্থ পিপাসা।

স্থান ও সময়ের অভাবে একটি ক্যালেন্ডার চিত্র আলোচনা করে দেখানো হল, কীভাবে পৌরাণিক ও বর্তমানের সঙ্গে ভাব ও প্রতীকের মেলবন্ধন ঘটেছে। কোথাও না কোথাও এই ধরনের ছবিগুলি অন্যরূপে ও ভিন্নক্ষেত্রে সদা প্রবহমান। নিচের ছবিটি দেখার অনুরোধ রইল।

ঈশ্বরের স্থানীয় প্রকাশ খান্ডোবা। মহারাষ্ট্র রাজ্যে তাকে অনেক সম্মান করা হয়। তিনি একটি ঘোড়ায় আরোহিত, এবং তার সাথে মহিলাটি তার স্ত্রী, মালসা, একজন বণিকের কন্যা। তারা যে দুই রাক্ষসের সাথে লড়াই করছে তারা হল মণি এবং মল্লা। সংস্কৃত গ্রন্থে খান্ডোবাকে মার্তণ্ড ভৈরব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের স্থানীয় শিবের একটি উগ্র রূপ। তিনি একজন ক্ষেত্রপাল, জমির রক্ষক। রক্ষক হিসাবে, তিনি রাক্ষসদের সাথে লড়াই করেন। মণির মতো কিছু রাক্ষস, যারা মন্দিরের আশেপাশে তাদের নিজের মতো করে দেবতা হয়ে ওঠে। অন্যরা, মল্লের মতো, যার মূর্তি মন্দিরের দিকে যাওয়ার সিঁড়িতে এম্বেড করা আছে, ভক্তদের দ্বারা পদদলিত হয়ে শাস্তি পেতে থাকে যারা খান্ডোবাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

খান্ডোবা হলুদ পছন্দ করেন: তার মন্দির এবং তার ছবি হলুদ দিয়ে আচ্ছাদিত। হলুদ একটি সুবর্ণ ভেষজ যা জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত এবং এর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে, রক্ষক হিসাবে খান্ডোবার ভূমিকা আরও জোরদার হয়। তিনি একজন বীর্যবান দেবতা যার কৃপা বর্ষিত হয় ভক্তের ওপর। তার দ্বিতীয় স্ত্রী বাণাই,

ছাগল পালনকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁর বহু বিবাহের কাহিনী একক গ্রাম-দেবতার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ করে। এইভাবে প্রতিটি সম্প্রদায় খন্ডোবার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখে। একসাথে, তারা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে একে অপরকে সমর্থন করে। স্থানীয় গ্রাম দেবতা খান্ডোবাকে শিবের মতো প্যান-হিন্দু ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, গ্রামটি একটি বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে ওঠে। গ্রামটি অনন্য, তবুও একটি বৃহত্তর সমগ্রের অংশ। খাণ্ডোবা হল মহাজাগতিক ভগবত্তার স্থানীয় প্রকাশ।

এইভাবে খান্ডোবার পৌরাণিক কাহিনি বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসের যোগাযোগ করে। তারা এমন একজন দেবতা চায় যিনি তাদের স্থানীয় চাহিদা পূরণ করবেন, তাদের জন্য জোগান দেবেন এবং তাদের রক্ষা করবেন। তারা আরও বিশ্বব্যাপী হিন্দু পরিচয়ের অংশ হয়ে তাদের স্থানীয় পরিবার এবং গ্রামের পরিচয় ধরে রাখতে চায়।

উপসংহার: ক্যালেন্ডার চিত্রে মানসিক প্রবহমানতার যে প্রকাশ ঘটেছে তা চিরকালই আগ্রহের বস্তু। কিভাবে একটি পৌরাণিক কাহিনি বর্তমানের জীবন যাপনের মনতাজের মধ্যেও সত্যরূপে দেখা দেয় তা বিস্ময়কর। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের বিস্তৃত পরিধিতে আলোচনার একটি আগ্রহ জাগ্রত থাকবে।

গ্রন্থসূত্র:

১। দেবদত্ত পট্টনায়েক, সেভেন সিক্রেটস্ অফ হিন্দু ক্যালেন্ডার আর্ট, ২০০৯, রাধা প্রেস, দিল্লি, অথার্স নোট, পৃষ্ঠা ১০

২। পদ্মভূষণ পণ্ডিত চন্নুলাল মিশ্র, সঙ্গীতজ্ঞ, হিন্দুস্তানি ধ্রুপদি, কিরাণা ঘরানা, বারাণসী, শিব বিবাহ অ্যালবাম, রাগ মিশ্র খামাজ

৩। মহাসময়ের ইতিবৃত্ত, প্রশান্ত প্রামাণিক। দে'জ পাবলিশিং

৪। জোসেফ ক্যাম্পবেল, মিথের শক্তি (অনু), খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, ২০২২, বাতিঘর প্রকাশনি, বাংলাদেশ, অধ্যায় ২য়, পৃষ্ঠা ৬১ ও ৬৫

৫। স্বামী নির্ম্মলানন্দ, দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, ১৪২৪, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, একাদশ অধ্যায়, লক্ষ্মী, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩।

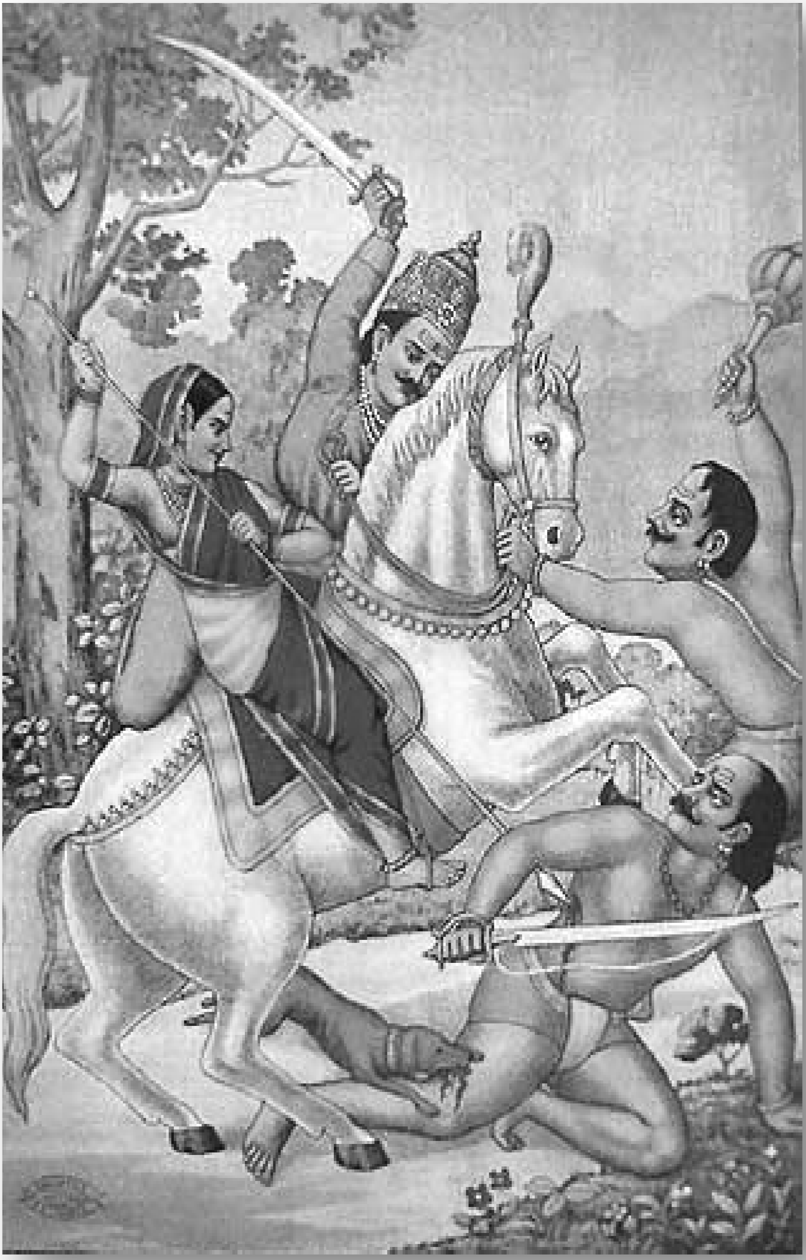

বাংলা কথাসাহিত্যে পিঁপড়ে-বৃত্তান্ত

উজ্জ্বল মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সারসংক্ষেপ : পিঁপড়ে-বৃত্তান্তের আলোচনায় আমরা দু'টি রচনাকে গ্রহণ করেছি। পিঁপড়ে পুরাণ (১৯৩১) ও লালকালো (১৯৩০)। প্রথমে আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)-এর লেখা বড়গল্প 'পিঁপড়ে পুরাণ' নিয়ে আলোচনা করবো। এটি একটি কল্পবিজ্ঞানধর্মী রচনা। অপরটি নির্ভেজাল শিশুসাহিত্য। তবে একটু ব্যতিক্রমী রচনা। মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসুর (১৮৮৭-১৯৫৩) লেখা একমাত্র সাহিত্য, তাও শিশুদের জন্য লেখা। ভাববার বিষয় বটে!
মূলশব্দ: শৈশব, পিঁপড়ে, কল্পবিজ্ঞান, শিশুসাহিত্য, সমাজশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা।

মূল আলোচনা :

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের কথায়, প্রথম ইংরেজি পড়তে শিখে স্কুলের লাইব্রেরীতে জুল ভার্নের (১৮২৮-১৯০৫) একটি উপন্যাস পেয়ে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলার সেই স্বল্পতাই এ ধরনের কাহিনী লেখায় তাঁকে উৎসাহিত করে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র প্রেমেন্দ্র জুল ভার্নের 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্‌স্ আন্ডার দ্য সিস্' (১৮৭০) পড়ে কল্পকাহিনির ভক্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া চার্লস ডেকেন্সের (১৮১২-১৮৭০) 'অলিভার টুইস্ট্'ও (১৮৩৮) কিশোর প্রেমেন্দ্রের কল্পনায় বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। ১৯৬৪ সালে তাঁর 'বিজ্ঞান নির্ভর গল্প' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "বিজ্ঞান-নির্ভর বা বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি বলতে আমরা যা বুঝি গত শতাব্দীতে তার জন্ম। ফরাসি লেখক জুল ভার্নই এ জাতীয় কাহিনির প্রবর্তক।...বিজ্ঞানের অক্লান্ত সন্ধান নিত্য যে নতুন জগৎ আমাদের কাছে উদঘাটিত করে তুলেছে তার বিস্ময়-বিহ্বলতা পাঠক মনে সঞ্চারিত করে দেওয়াই এ কাহিনির আসল লক্ষ্য।"[১] তাঁর প্রথম ছোটোদের বই 'ভয়ঙ্কর' (১৯৩১) একটি রোমাঞ্চ-কাহিনি। ১৯৩৯ সালে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'আজগুবি জানোয়ার' নামে একখানা বই লেখেন। বীরভূমের নলহাটিতে থাকার সময়েই তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয়ে যায়। কাঁটাতার ঘেরা রেলচত্ত্বর, শৈশবের খেলার সাথী লজ্জু ও মোরাদের সঙ্গে কাটানো সময়গুলোর কথা স্মৃতিকথার মধ্যে বারবার ফিরে এসেছে। লিখেছেন,"কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সেই বিস্তীর্ণ এলাকা একদিকে যেন রূপকথা, আর দিকে অতিবাস্তব জগৎ।"[২] নলহাটির রেলকলোনী, শুকনো দিঘি, পাকুড় গাছ, ঝোপঝাড়, উইঢিপি এবং সঙ্গী সমবয়সী বীরুমামা। কালিপদ সেনের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সেন। প্রেমেন্দ্রের দিদিমার ভাই কালিপদ সেন নলহাটির হেড-সিগন্যালার। বয়সে কিছুটা বড় বলে বীরুমামা

কিছুতেই নীচের ক্লাসে পড়তে চাইলো না। জেদ ধরলো, প্রেমেনের সঙ্গে মামাভাগ্নে তারা একই ক্লাসে পড়বে; নইলে পড়বে না। অগত্যা কেবল বীরুমামার জন্যই প্রেমেন্দ্রকে নীচু ক্লাসে নেমে আসতে হলো। বীরুমামার সঙ্গে মিলে ছোটো একখানা চিড়িয়াখানাও তৈরি করেছিলেন তিনি। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পালিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বসে থাকতেও দেখা যাবে তাঁকে। কিন্তু তখন শিশি, বোতল, বোয়াম প্রভৃতি জোগাড় করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, বোলতা, ফড়িং, শুঁয়োপোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি ধরে রাখতেন। তাঁর প্রাণীবিদ্যায় আকর্ষণের সূত্রপাত হয়তো ঐ সময় থেকেই। ঐ বয়সেই তিনি পিঁপড়েদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রজাতিগত পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখেছিলেন। বীরুমামাই তাঁকে বইলেখায় উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে উদ্ধার হয়, "বীরুমামা অনেক বিষয়েই আমার নেতা। চিড়িয়াখানা পরিকল্পনার ব্যাপারে যেমন, তেমনি ভাঙা থার্মোমিটারের খাপ জোগাড় করে তার মুখে সুকৌশলে কর্ক আর নিব গুঁজে ফাউন্টেন পেন বানিয়ে সে আমাকে অবাক করে দিয়েছে। তার নতুন কীর্তিতে কিন্তু আগেকার সব বাহাদুরী ম্লান হয়ে গেল। একদিন খাতাকলম নিয়ে আমাকে সে ডেকে বললে, আয়। আমরা বই লিখব।...আমি তো হতভম্ব। বই যে লেখা যায়, আর মানুষেই লেখে এই ভাবনাটাই কখনো মাথায় আসেনি।"[৩] বিশ শতকের তিনের দশকে মাসিক 'মৌচাক' পত্রিকায় বীরুমামাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ ও বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা মিশিয়ে লিখে ফেললেন 'কুহকের দেশে'। সেখানেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির নায়ক 'মামাবাবু'র আত্মপ্রকাশ ঘটে। যার নেপথ্যে বীরুমামা রয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। দ্বিতীয় কাহিনি 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস'। অনেক পরে 'মামাবাবু সমগ্র' প্রকাশ পেয়েছে। ঘনাদাকে নিয়েও লিখেছেন কল্পবিজ্ঞান সিরিজ। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ প্রেমেন্দ্র মিত্র। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম রচনা একটি কবিতা 'ইলেকট্রনের তামাশা'। 'অ্যামিবা'ও বিজ্ঞান বিষয়ক কবিতা। এছাড়া শিশু পত্রিকা 'রঙমশাল'-এর সঙ্গেও দীর্ঘসময় যুক্ত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

১

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রামধনু পত্রিকায় 'পিঁপড়ে পুরাণ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য। পত্রিকার প্রকাশে কাহিনির নাম ছিল 'সেকালের কথা'। ১৯৩১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'পিঁপড়ে পুরাণ' হয়। বাংলা গল্প-উপন্যাসের জগতে, বিশেষত শিশুকিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্যে কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু ও বিভিন্ন ধরনের মনুষ্যেতর প্রাণীকে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৩১ সালের মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের চার'টি উপন্যাস (পাঁক, মিছিল, আগামীকাল, কুয়াশা) ও দু'টি গল্পসংকলন (পঞ্চশর, বেনামী বন্দর) প্রকাশিত হয়ে গেছে।

কথাসাহিত্যের প্রাণ গল্প। যে ধরনের রচনাই হোক, পাঠক চায় তারমধ্যে একটা গল্প বা আখ্যান থাকবে। কল্পবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সে আখ্যানের গঠনকৌশল সকল রচয়িতার ক্ষেত্রে একইরকম হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ভ্লাদিমির প্রপ, রঁলা বার্ত, মাইকেল টুলান প্রমুখপাশ্চাত্য ফর্মালিস্টরা এব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমরা সেই তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে যাবো না। 'পিপড়ে পুরাণ'-এর শুরুতেই সর্বজ্ঞকথকের জবানীতে শোনা যায়,"সে অনেক কাল আগের কথা। তখন সবই ছিল আশ্চর্য রকমের।"[৪]প্রথমেই কালের কথা উল্লেখ করা হলো; অর্থাৎ সময়। কল্পবিজ্ঞানের আলোচনায় সময়ের ব্যবহার অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যদিও স্রষ্টারা প্রমাণ করেছেন বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ যেকোনো কালের পটভূমিকাতেই কল্পবিজ্ঞান রচনা করা সম্ভব। তবে কল্পবিজ্ঞান কাহিনির প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছে ভবিষ্যৎ কাল। পাশ্চাত্যে যাকে 'টাইম-ট্রাভেল স্টোরি' (Time-Travel Story) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়েমানুষের মনে অজানা আশঙ্কা ও কৌতুহল থাকাই স্বাভাবিক। কল্পবিজ্ঞানের সচেতন পাঠক হলে তো কথাই নেই। লেখকও পাঠকের এই দুর্বলতাটি (নাকি কল্পনার সবলতা!) তার রচনার মধ্যে কাজে লাগান। কারণ তা পাঠকের ঘড়িমাপা সময়ের অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থিত। যেখানে সাধারণভাবে কথকের সময় অনাগত ভবিষ্যতে বিচরণ করে অথচ লেখক লিখছেন পাঠকের সময়ে দাঁড়িয়ে বর্তমানে কিম্বা আরও অতীতে; কিছুটা ভবিষ্যতের পাঠকের কথা ভেবে। সবচেয়ে মজার কথা,"...পাঠকের সময় কিন্তু স্থিরীকৃত বা পূর্ব-নির্ধারিত নয়। পাঠকের সময় সচল। ক্রমশ পরবর্তীকালের পাঠক ঘটনাকালের দিকে অগ্রবর্তী হবেন। একসময় পাঠককালের যাত্রায় কথকের কালকেও অতিক্রম করে যেতে পারেন। তখন তাঁর কাছে কাহিনিতে বর্ণিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অসম্ভব এবং অবাস্তব বলে প্রতিভাত হতেই পারে"[৫] আরও বলা যায়, "...সময়ের মাত্রায় কল্পবিজ্ঞানের অবস্থান ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসের বিপ্রতীপে। ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস-ছোটোগল্প লেখা হয় ঘটে যাওয়া ঘটনার ভিত্তিতে। ফলে প্রামাণ্য ঘটনার কতটুকু কাল্পনিক বিচ্যুতি ঘটাতে পারেন লেখক তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্য যেহেতু ভবিষ্যৎমুখী তাই সেখানে কল্পনার পরিসর প্রশ্নাতীত। কল্পনার স্বাধীনতার দিক দিয়ে কল্পবিজ্ঞানের নিকট আত্মীয় 'বিকল্প ইতিহাস' (Alternative History)। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো বিকল্প ইতিহাসেও পাঠকের অতীতযাত্রা ঘটে থাকে, কিন্তু ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্যের উদ্দেশ্যমূলক পরিবর্তন সেখানে অভিপ্রেত।"[৬]'পিঁপড়ে পুরাণ'-এর কথক অনাগত ভবিষ্যৎকালের প্রেক্ষাপটে গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন। প্রকৃত অর্থে যে অতীত এবং বর্তমান; তা এতে উপেক্ষিত। বোঝা যায়, লেখাটি কিশোরদের উদ্দেশ্যে লেখা। তাই আমরা বলতে পারি, কিশোর পাঠককে প্রেমেন্দ্র মিত্র বাধ্য করেন কথকের সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। গল্পের প্রেক্ষাপট সুদূর ভবিষ্যতে প্রথিত। যেখানে কথকের সময় ও পাঠকের বর্তমান সমার্থক।

গল্পটি ১৯৩০ সালে প্রথম লেখা হচ্ছে; অথচ সেখানে ৭৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ, ৬৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ, ৬৭০৩ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি সালও অতীত কাল হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই কাহিনিতে কথকের বর্ণিত ভবিষ্যৎ ও পাঠকের বর্তমান একই সারিতে অবস্থান করছে। যেখানে আলাদা করে কোনো বর্তমান কাল নেই, আছে কেবল অতীত আর সুদূর ভবিষ্যৎ কাল। আমাদের চিরচেনা বর্তমানের পৃথিবীকেও অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। যেমন-"তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠ্‌ত আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হবার আগেই সূর্য অস্ত যেত। দিনের বেলা তখন আলো থাকত আর রাত্তিরে হতঅন্ধকার।...আরও এমন সব অদ্ভুত জানোয়ার সেকালে ছিল যা চোখে দেখলেও তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না—ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি কত নাম করব।"[৭] অথচ সুদূর সেই আপাত ভবিষ্যতে (যা পাঠকের বর্তমান) মানুষ চিতাবাঘকে গৃহপালিত পশু হিসেবে ব্যবহার করে। আবার শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে, সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল। অন্তত ৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত সেখানে মানুষ বসবাস করতো। ৬৭৫৭ সালে অর্থাৎ আরও অতীতে অশেষ রায় নামে একজন বিখ্যাত বাঙালি পর্য্যটক দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতের কাছে একরকম অদ্ভুত জানোয়ারের সন্ধান পান। যদিও তাঁর কথা তখন কেউ বিশ্বাস করেনি। আজও করে না। কিন্তু মৃত্যুমুখে কেউ কি মিথ্যে কথা বলে? না, বলে না। নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে অন্তত কেউ মিথ্যেকথা লিখে যায় নামরণের ঠিক প্রাগ্‌মুহূর্তে। এখানেই রহস্রস্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র মোক্ষম চালটি চালেন। অশেষ রায় তাঁর শেষলেখায় লেখেন "আমি শপথ করে বলে যাচ্ছি—আমি যে অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলেছি তা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।"[৮] অর্থাৎ সত্যি-সত্যি-সত্যি, তিন-সত্যি। লক্ষ করবার বিষয়, এই কথাগুলোকে গল্পকথক নিজেও উদ্ধৃতির মধ্যে রেখেছেন। কারণ এগুলো কথকের নিজের কথা নয়। অশেষ রায়ের ডায়েরি থেকে উদ্ধার করা। কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে এমন কিছু কৌশল লেখক অবলম্বন করে থাকেন। এখানে প্রয়োজন ছিল উত্তমপুরুষ কথকের। তাই সরাসরি অশেষ রায়ের নিজের কথা হুবহু উদ্ধৃত করলেন কথক। শুধু ডায়েরি নয়, সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে অশেষ রায় তখন খবরের কাগজে কি লিখেছিলেন তার সাহায্যও নিচ্ছেন কথক। কাফ্রী বন্ধু কীটতত্ত্ববীদ মণ্ডুলার সঙ্গে আলাগাস হ্রদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার সময় অদ্ভুত জানোয়ার দেখেন অশেষ রায়। তারপর প্রায় ১০০০ বছর পিঁপড়েদের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সম্ভবত সেই অবসরে মানুষদের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি সেরেনেয় পিঁপড়েরা। মানুষের সমাজে পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণ হয় ৭৭৫৭ সালের এক রাতে, ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমধারে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকুয়েডর, গায়ানা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান শহরগুলো ধ্বসে যায়।

২

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের বুননটা খুব শক্ত হতে হয়। নইলে গল্প দাঁড়ায় না। তাই সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ মারা গেলেও একজন মানুষকে গল্পকার সযত্নে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি রায়োবামা নগরের বাসিন্দা ডন পেরিটো। কিন্তু কেন এই পক্ষপাত? "পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনী পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়"[৯] এই 'পৃথিবীর লোক' আর কেউ নয়, আমি-আমরা স্বয়ং পাঠকদল। দ্বিতীয় আক্রমণ হল ঠিক দু'বছর পর। ৫২ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিমের সমস্ত শহর ধ্বসে পড়ে। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, অরিনকো নদী উপকূলের বলিভার নগরের লোকেরা আগেই আশঙ্কা করে শহর ছেড়ে নদীতে অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ নিয়ে জড় হয়েছিল, তারাই কেবল যুদ্ধ করে মরবার সৌভাগ্য পেয়েছিল। এখানেও গল্পের খাতিরে কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। যুদ্ধশেষে তারা নদীপথে আটলান্টিক সাগরে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। সেই ভয়ানক যুদ্ধকাহিনির বর্ণনায়আমাদের অবাক হতে হয় বৈকি! পিঁপড়েদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধনীতি, আত্মরক্ষার কৌশল সবই অভিনব।১৯৩১ সালে 'পিঁপড়ে পুরাণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৪৫ বছর পর ১৯৭৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায় 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইটি। লেখক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১); পতঙ্গবিশারদ (Entomologist), প্রকৃতিবীদ (Naturalist)ও প্রাণীবিশারদ (Zoologist) হিসেবে তার নামডাক ছিল। কলকাতার বোস ইন্সটিটিউটে গবেষণা করেছেন আজীবন। যখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গবেষণা প্রকাশ করবার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না তখন তিনি অনায়াসে সে কাজ করেছেন। প্রাণীবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিভাগ কীটতত্ত্ব বা পতঙ্গবিদ্যা (Entomology) তাঁর পছন্দের বিষয় ছিল। 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইয়ের অন্তর্গত 'পিঁপড়ের লড়াই' প্রবন্ধে তিনি পিঁপড়েদের বুদ্ধি ও রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 'পিঁপড়ের বুদ্ধি' প্রবন্ধে পিঁপড়েদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। পিঁপড়েরা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মাংসাশী প্রাণী, তাদের যুদ্ধবিগ্রহ, আত্মরক্ষা, খাদ্যসংগ্রহের অভিনব পদ্ধতি—এসব আমরা তাঁর বৈজ্ঞানিক লেখা থেকেই জানতে পারি। তিনি আরও বলেন "মানুষ সামাজিক প্রাণী অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে মানুষের মতো সমাজ ব্যবস্থা না থাকলেও মৌমাছি পিঁপড়ে প্রভৃতি নিম্নস্তরের কীটপতঙ্গের মধ্যে এরূপ সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে মানুষেরা বুদ্ধিমান ও কৌশলী হয়েও পিঁপড়ে অথবা মৌমাছির মত ও নিয়ন্ত্রিত একটা পাকাপোক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি।"[১০] সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র পিঁপড়ে-সমাজ সম্বন্ধে সে ইঙ্গিত কি দেননি এই গল্পের মাধ্যমে? মিশিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞান ও সাহিত্য। এখানেই কল্পবিজ্ঞানের সার্থকতা। আজ যা সাহিত্যের পাতায় কাল্পনিক, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের জগতে তা বাস্তবিক হয়ে উঠতেও পারে। আবার নাও পারে। তবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা থেকেই প্রকৃত অর্থে কল্পবিজ্ঞান রচনার সুত্রপাত। মানুষের সভ্যতা মাটির ওপর যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত হলেও মাটির নীচের শত্রুকে সামলাবে কীভাবে! তাদের যুদ্ধনীতিই বা

রপ্ত করবে কীভাবে! অগত্যা পিঁপড়েদের তৃতীয় ও শেষ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ মানুষের সভ্যতায় মড়ক লাগিয়ে দেয়। "সুস্থ, সবল মানুষ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তারপর কয়েক মিনিট হাতপা খিঁচে মারা যায়!"[১১] ডাক্তার বৈজ্ঞানিকরাও তার কারণ নির্ণয় করতে পারেনা। শেষমেশ কারণ আবিষ্কার করে বাহিয়া শহরের এক মুটে, নাম গুস্তাভ। মৃত্যুর আগের সে বলে যায় 'জল খেওনা'। এখানেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের প্রধান রসটা লুকিয়ে আছে। যা বৈজ্ঞানিক পারলো না, তা পারলো একজন মুটে। পৃথিবীর আশ্চর্য সব বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিজ্ঞানী হয়তো আপাত তুচ্ছ বিষয়কে বিশেষ আমল দেয়নি। তাই যা গুস্তাভের মতো মুটে আবিষ্কার করে ফেলে, শিক্ষিতেরা তা পারে না। গুস্তাভের কাছেই জানা গেল যে, মূল সমস্যাটা আছে জলে।"প্রত্যেক সহরের প্রধান ট্যাঙ্কের জল কিভাবে কখন যে পিঁপড়েরা বিষাক্ত করে দিয়েছিল তা অবশ্য কেউ জানে না।"[১২]এভাবে দক্ষিণ আমেরিকার অর্ধেক মানুষ মারা যাওয়ার উপক্রম হয়। তৃতীয় আক্রমণের কাহিনিও কথকের নিজের জবানীতে বলা নয়। কথক এখানে প্রথমপুরুষ। উত্তমপুরুষ কথক সাবাটিনির লেখা থেকেই কথক আমাদেরকে পড়ে শুনিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ পাঠকের কাছে গল্পটি এসে পৌঁছোচ্ছে উত্তমপুরুষে। যাতে আমরা ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও শহরের বিখ্যাত লেখক সেনর সাবাটিনের মুখ থেকেই কাহিনিটা শুনে কৃতার্থ হই। যেকোনো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে সেই ঘটনার বিবরণ শোনার মজাই আলাদা। কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষাতেও সাহায্য করে এই ধরনের কৌশল। সেজন্যই কথক বারবার ডায়েরির সাহায্য নিচ্ছেন।

৩

কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ও সম্ভাব্য সূত্রগুলিকে যথাসম্ভব গল্পের মধ্যে প্রয়োগ করা। গল্পের শিরা-উপশিরায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের ধারণাকে জায়গা করে দেওয়া। দুধের মৌল উপাদান জল সেকথা গুস্তাভের ঘটনাতেই বলা হয়েছিল। জল না খেয়ে, দুধ খেলেও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কারণ দুধেও কিছু জল রয়েছে। আবার আলো-বিজ্ঞানের (Light Science) কথাও বলা হয়েছে। তীব্র আলো মানুষের চোখ সহ্য করতে পারেনা। পিঁপড়েরা আলো-বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষের তুলনায় অনেক উন্নতিসাধন করে ফেলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাবাটিনি লিখেছেন "পিঁপড়ে বাহিনীর একেবারে পেছনে প্রায় শ পাঁচেক সার্চ্চলাইট জ্বলে উঠেছে। পিঁপড়েদেরও সার্চ্চলাইট থাকতে পারে, এবং এতক্ষণ বাদে তা জ্বালবারই বা কি প্রয়োজন, ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সার্চ্চলাইট তাকে ঠিক বলা চলে না। আমাদের সার্চ্চলাইটের আলোর চেয়ে সে আলো শতগুণ তীব্র ও একটু যেন সব্‌জে রঙের।"[১৩] সেই আলো যাদের চোখে পড়েছিল সবাই অন্ধের মতো অসহায় হয়ে গেল। এখানেও সেনর সাবাটিনিকে রক্ষা করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।পদ্ধতিটা বোকাবোকা বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু এটাও একটা কৌশল চরিত্রকে রক্ষা করবার। কেন সাবাটিনি অন্ধ হলনা বাকি সবার মতো? তিনি জানান

"জুতোর ফিতেটা অনেকক্ষণ থেকে খুলে গিয়েছিল। এই অবসরে নীচু হয়ে বসে সেটা বেধে উঠেই আমি দেখি যে আলো আমাদের সার ছাড়িয়ে আমাদের অনেক পেছনের সারের মুখের ওপর দিয়ে তারা দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"[১৪]এবারে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে রিও-ডি-জেনেরিও শহরের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র সেনর সাবাটিনিই কেন রক্ষা পেলেন! আমাদের কাছে গল্পটা পৌঁছে দেবেন বলে? হয়তো তাই।

৪

কীভাবে পিঁপড়েরা এই বিপুল শক্তি অর্জন করেছে? তাদের রাষ্ট্রসমাজের গঠন কেমন? অধিকৃত দক্ষিণ আমেরিকাকে তারা কীভাবে গড়ে তুলেছে?—এত কথা মানুষের সমাজ কীভাবে জানবে? সেজন্য একজন মানুষকে সেখানে পাঠাতে হবে। তাই নতুন করে গল্প তৈরি করতে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। এক বাঙালিকে পাঠালেন পিঁপড়ে সাম্রাজ্যে। ভারতীয় জাহাজ 'যমুনা' ফিলিপাইনের পূর্ব উপকূল বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় একবারো বছরের দুষ্টু-বুদ্ধিমান-সাহসী ছেলের দৌরাত্ম্যে ভেলায় বাঁধা অর্ধ-উলঙ্গ একজন মানুষ উদ্ধার হয়। "সেই ভেলাতে দক্ষিণ আমেরিকার পিঁপড়েদের ইতিহাস যে একটিমাত্র লোকের জানা ছিল তার উদ্ধার হল"[১৫]লোকটি একজন বাঙালি বিজ্ঞানী, সুখময় সরকার। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে মানুষের অবলুপ্তির দীর্ঘকাল তিনি সেদেশে কাটিয়েছেন। গোলযোগের সময় নগরের ভেতর একটি ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তিন-চার দিন সেখানে থাকার পর গবেষণাগার ভেঙে সুখময় সরকারকে বন্দি করে তাদের সাম্রাজ্যে নিয়ে যায় পিঁপড়েরা। সেখানে পাঁচ বছর কাটিয়ে তিনি বুঝলেন, মানুষের মতো প্রকৃতির রহস্যউদ্ঘাটন করে মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে পিঁপড়ে-সমাজ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও আবিষ্কারেতারা মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বিশেষ করে আলোকবিজ্ঞনে তারা অনেক উন্নতি করেছে। কেমন সে আলো? "অনেকটা আমাদের ইলেকট্রিক আলোর মত। কিন্তু আলোগুলির চারিধারে কোন কাচের আবরণ নেই, বৈদ্যুতিক শক্তিতেও তা জ্বলেনা। পাথরের মত এক একটিনুড়ি নানা জায়গায় ছড়ান, তা থেকেই এই আলো বার হয়।...তাপহীন যে আলো আবিষ্কার করবার চেষ্টায় মানুষের বিজ্ঞান এখনও অক্ষম, পিঁপড়েরা তাই বার করেছে।...সে আলো এত উজ্জ্বল যে, দিন বলে ভ্রম হয়।"[১৬] এছাড়া আছে সুড়ঙ্গ পথে লিফ্ট-এর ব্যবহার, মেঠো ইঁদুরে টানা গাড়ি; এমনকি মানুষের খিদে-তেষ্টা নিয়েও তারা যথেষ্ট সচেতন। মূলোর মতোই দেখতে (কিন্তু মূলো নয়) ক্ষুধানিবৃত্তি ফল। তাদের সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার হলো 'শব্দশোধন যন্ত্র' (SoundPurified Device)। দেখতে অনেকটা ছোট গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্সের মতো। যার সাহায্যে সুখময় সরকার পিঁপড়েদের ভাষা শিখে ফেলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পরীক্ষাগারে পিঁপড়ের পাল্লায়' বলে একটা ছবিও সংযোজন করেছেন গল্পের মধ্যে। বিজ্ঞানে প্রমাণিত সত্যকে তিনি প্রয়োগ করেন গল্পে। বাস্তবে শব্দশোধন

যন্ত্র রয়েছে। শব্দ পরিমাপের একক ডেসিবেল। তা আমরা জানি সব শব্দ আমাদের কান গ্রহণ করতে পারেনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "মানুষের কান দিয়ে আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তাছাড়া আরো অনেক শব্দ পৃথিবীতে হচ্ছে। শব্দে এমন ভয়ঙ্কর জোর আছে যে তা আমাদের কান ধরতেই পারে না। আবার অত্যন্ত ধীর শব্দও আমরা স্বাভাবিক কান দিয়ে ধরতে পারি না।"[১৭]পিঁপড়ে-সমাজ নিয়েতিনি যা বর্ণনা করেছেন তা সত্য। আবার মানুষের সমাজের তুলনায়পিঁপড়েদের সমাজ যে অনেক এগিয়ে তার তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে 'পিঁপড়ে পুরাণ' গল্পে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 'শ্রমিক পিঁপড়ের জন্ম-রহস্য' প্রবন্ধে লিখেছেন"প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকেই সুবিধামত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকে। তার ফলেই দাসত্ব প্রথা, বাধ্যতামূলক বেগার খাটা এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল।...শ্রমসাধ্য যাবতীয় কার্যনির্বাহের জন্য পিঁপড়েরাকিন্তু অতি সহজ উপায়ে এরূপ একপ্রকার শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন করবার উপায়আয়ত্ব করে নিয়েছে। মনুষ্য কর্তৃক অবলম্বিত উপায় অপেক্ষা তাদের উপায় যে সহস্র গুণেশ্রেষ্ঠ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।"[১৮]গণতন্ত্র, নারী-পুরুষের সমাধিকার সবই প্রতিষ্ঠিত পিঁপড়ে-সমাজে। তবে একটা ব্যাপারে পিঁপড়েরা খুব সচেতন।তাদের মধ্যে জোর করে শিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। যা মানুষের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। নচিকেতা চক্রবর্তীর গানের অ্যালবাম 'মুখোমুখি'-তে (২০০৩) 'আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ বাবু' বলে একটা গান আছে। মানুষের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ আছে এই গানে। নচিকেতা লিখেছেন-

"আজকে যিনি কয়লা মন্ত্রী কালকে তিনি শিক্ষা,
তাই, কয়লাকালো শিক্ষা নিয়ে মানুষ করে ভিক্ষা..."[১৯]

পিঁপড়ে-সমাজে তা চলেনা। তাই তাদের মধ্যে মতভেদ বিশেষ হয়না। কারণ,"যার মাথা ইঞ্জিনিয়ারিংএ খোলে সে কখনও রাজনীতিতে মাথা ঘামাতে আসেনা।"[২০] তবে কলাবিদ্যায় তারা অনেক পিছিয়ে। মাঝেমধ্যে নাচের মতো একরকম সভা হলেও গানবাজনা, ছবিআঁকা ইত্যাদি চৌষট্টিকলার চর্চা তাদের নেই। যাইহোক এবারে সুখময়কে ফেরাতেই হয়। মানুষ হয়ে মানুষের জন্য মন কেমন হবে না তা কি হয়! আর তা না হলে মানুষের সাহিত্যে পিঁপড়ে সমাজের গল্প এভাবে শোনাবে কে? তাই শেষ পর্যন্ত সুখময় সরকারকে মানুষের সমাজে ফিরিয়ে আনলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। আকস্মিক ভূমিকম্পের সুযোগে পিঁপড়েদের রাজ্য ছেড়ে পালায় সে। ভূমিকম্পের সময় পিঁপড়েরা হঠাৎ করে দিশেহারা হয়ে যায়। আগাম ভূমিকম্পের খবর পেতে জার্মানীর বিজ্ঞানীরা পিঁপড়েকে ব্যবহার করে থাকেন। এমনই একটা গবেষণার খবর প্রকাশিত হয়েছিল হিন্দুস্তান টাইম্‌স পত্রিকায়। তা হল- "Ants can sense earthquakes before they strike and the tiny insects suspend their normal activities a day after the quake, a new research has found. Researces

have discovered that red wood ants prefer to build their colonies along active faults, fractures, where the Earth ruptures during earthquakes, in Germany. They found the ants change their behaviour significantly prior to the quake and resume normal functioning only a day after the earthquake.”[২১]

বাংলায় কল্পবিজ্ঞান লেখার চল শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেদিক থেকে প্রথম দিকের রচয়িতা। আবার তাঁর রচিত বিপুল কল্পবিজ্ঞান সমগ্রের মধ্যে ‘পিঁপড়ে পুরাণ’ একেবারে প্রাথমিক প্রয়াস। তাই এই গল্পের মধ্যে পরিণত কল্পবিজ্ঞানের ছাপ ভাসা-ভাসা ধরনের। প্রাথমিকভাবে তিনি শিশুসাহিত্য ও কল্পবিজ্ঞানকে আলাদা করতে পারেননি। সচেতনভাবে আলাদা করার চেষ্টাও করেননি। তাই অতিরঞ্জিত কল্পনা, অবান্তর প্রসঙ্গ, অযৌক্তিকতার প্রাধান্য—এমন কিছু ত্রুটি লেখাটির মধ্যে রয়ে গেছে।

৫

রাজার রাণী মরে অভিমানে

আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য-কাহিনি গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘লালকালো’ (১৯৩০)। প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘পিঁপড়ে পুরাণ’-এর গ্রন্থপ্রকাশ কালে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, “পিঁপড়ে পুরাণ বইখানি দেখিয়া আর একটি ছেলেদের সুলিখিত ও সুপ্রকাশিত বইএর কথা মনে পড়িতে পারে। পিঁপড়ে পুরাণ সে বইটির অনেক পরে প্রকাশিত হইল বলিয়া ইহাতে সে বইটির ছায়া আছে একথাও মনে হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। সেই জন্যেই একথা জানান প্রয়োজন মনে করিতেছি যে ‘পিঁপড়ে পুরাণ’ উক্ত বইটির প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই ‘রামধনু’ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, উক্ত বইএর গল্পের সহিত ইহার কোন মিল নাই”[২২]‘উক্ত বইটিই গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘লালকালো’। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা আক্ষরিক অর্থে ঠিক নয়। ১৯৩০ সালে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) গিরীন্দ্রশেখর ‘লালকালো’ লেখেন। সেবছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একই সময়ে ‘সেকালের কথা’ ‘রামধনু’তে প্রকাশ হচ্ছিল। পরের বছর তা গ্রন্থরূপ পায়। তবে বইদুটির বিষয়ের মধ্যে সত্যিই কোনো সাদৃশ্য নেই।

লেখকের জন্ম দ্বারভাঙায়। মনোবিদ্যার গবেষক ছিলেন। ১৯২১ সালে ফলিত মনোবিজ্ঞানে মানসিক অবদমন নিয়ে গবেষণা পত্র লিখে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কাছে পাঠান। তারপর থেকে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ কুড়ি বছর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ফ্রয়েডের 'Oedipus Complex' ধারণাটি নিয়ে দু'জনের মতপার্থক্য তৈরি হয়। পাশাপাশি তিনি নিজের মতবাদ 'Theory of Opposite Wish'-কে দাঁড় করান। তাঁর গবেষণা পশ্চিমি দুনিয়ায় বিশেষ আলোড়ন ফেলেছিল। রাশিয়ান বন্ধু লস অ্যান্ড্রিউসের কাছে প্রশংসা করে ফ্রয়েড লেখেন, সুদূর ভারতে গিরীন্দ্রশেখর নামে একজন বাঙালির Psychoanalysis-এর শাখা শুরু হয়েছে। ভারত তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মনোবিশ্লেষক (Psychoanalist) গিরীন্দ্রশেখর বসু। ফ্রয়েডের উদ্যোগে গঠিত 'International Psychoanalytical Association'-এর সভাপতি হন তিনি। ১৯২২ সালে ১৫ জন সদস্য নিয়ে কলকাতায় স্থাপন করেন 'Indian Psychoanalytical Society'। এই সভার মুখপত্র হিসেবে বের করেন 'সমীক্ষা' নামের একটি সাময়িকী। তাঁর দাদা গল্পকার রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ওরফে পরশুরাম। দুজনেই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তবে পুরাণ নিয়ে তাঁদের গভীর পড়াশুনা ছিল। তিনি লেখেন পুরাণপ্রবেশ, ভগবতগীতা ইত্যাদি। ১৯১৭ থেকে ১৯৪৯ খ্রি. পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Abnormal Psychology'-বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। মনোবিদ্যার বিষয় নিয়ে লেখাপত্রগুলি হল—স্বপ্ন, Everyday-Psychoanalysis, Concept of Repression, মনোবিদ্যার পরিভাষা প্রভৃতি। ছোটোদের জন্য লেখেন 'লালকালো'। বিষয় পিঁপড়েদের যুদ্ধ ও রাজনীতি। এরসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ' গল্পের কোনোরকম মিল নেই। 'লালকালো' কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি নয়, নির্ভেজাল শিশুসাহিত্য। যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল ছবি ও ছড়ার সমাহার। পরশুরাম 'গল্পসমগ্র' বইয়ের ছবিগুলো এঁকেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন। 'লালকালো'র একটা ছবি বাদ দিয়ে সবকটি ছবি তাঁরই আঁকা। কেবল 'ঐ বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম' ছবিটি এঁকেছেন লেখক গিরীন্দ্রশেখর বসু স্বয়ং। ছোটোদের খুব সহজে বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়ার উপযোগী করেই তিনি লিখেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানের বিষয় বাস্তুতন্ত্রের জটিল খাদ্যশৃঙ্খল (Food-Chain)। তাই বিভিন্ন প্রজাতির পিঁপড়ে, গিরগিটি, ছ্যাতরা পাখি, কটকটি ব্যাঙ, গড়গড়ি সাপ, হাড়গিলে পাখি,

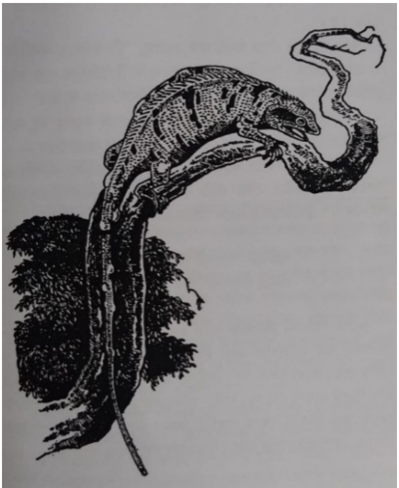

শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে

কালপ্যাঁচা 'লালকালো'র প্রধান চরিত্র। বইয়ের শুরুতেই রয়েছে রূপকথাধর্মী একটি ছড়া। তা হল-

"সাত সুমুদ্দুর তের নদী লঙ্কাদ্বীপের পার,
তেপান্তরের মাঠে নামে রাতের অন্ধকার।
তেপান্তরের মাঠের মাঝে বোম্বা শিমুল গাছ,
আগ্‌ডালে তার বসে আছে কাঁকুড়শিঙে মাছ।
... .
মনের সুখে কাঁকুড়শিঙে সাগর দোলায় দোলে,
হেসে ওঠে খোকনমণি জেগে মায়ের কোলে।
ঝিক্‌মিকিয়ে শিমুল চূড়ো নাম্‌ল ভোরের আলো,
খোকার সাথে খুকুমণি পড়বে লালকালো।"[২৩]

তবে মূল বিষয় লাল ও কালো পিঁপড়েদের মধ্যে ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী যুদ্ধ। এক মহাভারত। তবে কুরু-পাণ্ডবের মহাভারত নয়, পিঁপড়ে বৃত্তান্ত। হস্তিনাপুরের রাজসভায় নারীকে অপমান করার ফলে যেমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেছিল। এখানেও তেমনি এক কালো পিঁপড়ে বউয়ের শ্লীলতাহানির মধ্য দিয়েই কাহিনির সূত্রপাত। তারপর প্রতিশোধের নেশায় লাল ও কালো পিঁপড়েদের মধ্যে লড়াই বাধে। একটা আপাত তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয় কুরুক্ষেত্র অবস্থা, যা ঘোষেদের পুকুরপাড় ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় অন্যান্য প্রজাতির আঙিনায়। শিশুসাহিত্য হিসেবে একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ার মতো। যুদ্ধবর্ণনা। যুদ্ধের ভয়াবহতা সেভাবে শিশুসাহিত্যের বিষয় নয়। গিরীন্দ্রশেখর যেন তা মানতে চাননি মনোবিদ হিসেবে। অনেক নৃশংসতা দেখিয়েছেন, মৃত্যুমিছিল দেখিয়েছেন শিশুদের। বাংলা শিশুসাহিত্যে এক বিজ্ঞানী সাহিত্যিকের রচনা অমর হয়ে থাকবে চিরকাল। গিরীন্দ্রশেখর বিজ্ঞানী বলে নয়, 'লালকালো' সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবেই বাঙালির মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন।

গড়গড়ি সাপ

তথ্যপঞ্জি :

১. ঘোষ সিদ্ধার্থ, সায়েন্স ফিকশন, কল্পবিশ্ব পত্রিকা, ২০১৬, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০০

২. দাশগুপ্ত সুরজিৎ সম্পাদিত, প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ২৭২

৩. মিত্র প্রেমেন্দ্র, নানা রঙে বোনা, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ এপিল ১৯৫৪, পৃষ্ঠা ৪১

৪. মিত্র প্রেমেন্দ্র, পিঁপড়েপুরাণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা ১

৫. ত্রিসঙ্গম পত্রিকা (TRIJ), volume 4, issue 3, july 2024, article 57, অঙ্কনা বেতাল, বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আখ্যানকৌশল, page 484

৬. Ibid, page 484

৭. মিত্র প্রেমেন্দ্র, পিঁপড়েপুরাণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১-৩

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৬

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৭

১০. ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্র, বাংলার কীটপতঙ্গ, দে'জ, কলকাতা ৭৩, ১ম সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১০

১১. মিত্র প্রেমেন্দ্র, পিঁপড়েপুরাণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩

১২. তদেব, পৃষ্ঠা ২৮

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৪

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৪

১৮. ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্র, বাংলার কীটপতঙ্গ, দে’জ, কলকাতা ৭৩, ১মসংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১১

১৯. https://bangla.oslyrics.com/2019/10/blog-post.html#google_vignette

২০. মিত্র প্রেমেন্দ্র, পিঁপড়েপুরাণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৮২১ .https://www.hindustantimes.com/india/ants-can-sense-earthquakes-a-day-in advance/story yQtSRQ1pq1OQf0HfH74oZJ.html

২২. মিত্র প্রেমেন্দ্র, পিঁপড়েপুরাণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা

২৩. ডা. বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম, অনন্য গিরীন্দ্রশেখর, ডানা, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৪।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের গান

ফ্রেডরিক মান্ডি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে ঔপন্যাসিককে বর্ণিতব্য যুগের রীতি-নীতি, সংস্কার ও আচার-ব্যবহারকে তুলে ধরতে হয়। আর সেই রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে আসে গানের প্রসঙ্গ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা গানগুলি উপন্যাসে স্থান পেয়ে যায়। বিদ্রোহের এই গানগুলি সাঁওতাল সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে গানের সেই পটভূমির কথাই এখানে বিবৃত।
সূচক শব্দ: উপন্যাস, গান, ঐতিহাসিক, সাঁওতাল, বিদ্রোহ।

মূল আলোচনা :
ইতিহাসের কোন ঘটনা-কাহিনি ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে অতীতের তথ্য-সত্যকে সৃজনী কল্পনার প্রাণরসে জারিত করে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসে বর্ণিতব্য যুগের সংস্কার ও আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোশাক ইত্যাদি সকল বিষয়গুলি ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় সুনিপুণভাবে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক শিল্পী। 'রাজসিংহ' হল তাঁর যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিম পরবর্তী বাংলা ভাষায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসকার হলেন—রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ।

বাংলা সাহিত্যে সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য বহ্নি' (১৯৬৬), মহাশ্বেতা দেবীর 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২) এবং 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) উপন্যাস তিনটি সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিল। অতীতে সাঁওতালদের আন্দোলনের সময় যে গানগুলি গাওয়া হয়েছিল, সেই বিদ্রোহের গানগুলি আমরা এই উপন্যাসগুলিতে দেখতে পাই। বাংলা উপন্যাসের ধারায় সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিতে উপন্যাসে গীত গানগুলি নিয়ে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

'অরণ্য বহ্নি' (১৯৬৬) উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ বয়সের রচনা। এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়া সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস ও শৈশবকালে শোনা কাহিনিগুলি কল্পনায় সংমিশ্রণ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি লিখেছেন।

এই উপন্যাসে দেখা যায়, একটি সাঁওতাল কিশোর বৈশাখের গরমের মধ্যে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে। গ্রামে গিয়ে শালপাতার নিমন্ত্রণপত্র বিলি করছে, মালকোচা করে কাপড় পড়েছে। কুর্তা পরে, মাথায় দিয়েছে পাগড়ি। গ্রামে গিয়ে বলছে—

> "সাঁওতালদের মারাংবঙ্গার ঘুম ভেঙেছে। সাঁওতালদের দুঃখ দেখে বোঙ্গা (রাজা) শুভবাবু পাঠিয়েছেন— তারা আসছে। তারা আসছে। তাদের সঙ্গে আসছেন বঙ্গা নিজে। যে গ্রামে গ্রামে তিনি আসবেন। তার জন্য তোমরা পথঘাট পরিষ্কার করো। পথের ধারে পুঁতে রাখো সেই ঝাণ্ডা।বঙ্গা শুভবাবুদের দেখা দিয়ে বলেছেন— এ দেশ তোমাদের দেশ।"[১]

গরমে লাল মাটির গুঁড়ো উঠছে। সেই লাল ধুলো উড়িয়ে কিশোর সওয়ার গান গেয়ে চলেছে। যে গান সাঁওতালরা কখনও শোনেনি। সেই নতুন গানটি হল—

> "শুকনা ধুলা উড়ছে, মাটি পুড়ে ধূলা হয়ে গেইছে—
> আকাশ ঢেকে গেলো রে।
> জল হল নাই। ও জল হল নাই রে,
> জৈঠ আষাঢ় যায় রে—
> মাটি ফেটে যায়—জল হল না—ই।
> দিকুরা সব লুঠলো, সাদা মানুষ জুটলো
> কালো মেয়্যা লুটলো, হড়ে ধরম চাড়লো—
> মরংবোঙ্গা ক্ষেপলো—
> জল হল নাই। তাথেই জল হল না—ই
> মরংবোঙ্গা রাগলো—শুভবাবু জাগলো—
> টাঙি নিয়ে ছুটলো—
> সায়েবদিগে কাটলো—কালো মেয়্যা কাড়লো;
> চোখের পানি মুছল—
> আবার তারা হাসলো—ইবার জল হবে রে—
> ওরে ডর না—ই।
> শুভবাবু আসছে—শুভবাবু আসছে—
> শুভবাবু আসছে—
> ঘোড়ায় চড়ি আসছে টগবগিয়ে আসছে,
> ওরে ডর নাইরে আর ডর না—ই।
> একহাতে তার টাঙিয়া আর হাতে তার বলুয়া—
> পিঠে ধনুক কাঁড় নিয়ে মাথায় পাগ বাঁধিয়ে
> লাল পাগ বাঁধিয়া চাঁচর চুলে বান্ধিয়া শুভোবাবু আসিছে—
> টকবগায়ে আসিছে। আর ডর নাই রে!

আর ডর না-ই।
চোখে আগুন ঝরিছে বোঙ্গার হুকুম বলিছে—
আর ভয় না—ই।
আমি তাকে দেখিলাম—তার পরসাদ মাগিলাম—
পাইলাম রে পাইলাম— হুকুম নিয়া ছুটিলাম—
হুকুম হুকুম হুকুম রে— আর ডর নাইরে!
আর ডর না-ই!"[২]

এটি হুলের গান। 'হুল' মানে বিদ্রোহ। সাঁওতালদের সমাজে নানা রকমের গান আছে। কিন্তু এই হুলের গান গাওয়া হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কালে। 'হুল' গানের মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজের মানুষরা একত্রিত হয়েছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে মিলিত হয়ে লড়াই করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে।

উপন্যাসে গানটি রুকনী গেয়েছিল। প্রিয়দর্শন সাঁওতাল কিশোর, যে ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছিল সে আসলে ছদ্মবেশী রুকনী। রুকনী ছিল সিধুর প্রণয়াকাঙ্খী। সিধু রুকনীকে সঙ্গে নিতে চায়নি। তবু রুকনী বলে— সে সিধুর চাকরানি হবে। ফুল হবে রানি। সঙ্গে থেকে রুকনী সিধুর সেবা করতে চায়। চায় হুকুম খাটতে। ভৈরবীর আদেশে সিধু-কানু রুকনীকে সঙ্গে নেয়। সেই রুকনী চুল কেটে ছেলে সেজে মরংবোঙ্গার (দেবতার) কথা বলল। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান গাইলো শুভবাবুর।

ইংরেজ সরকারের লোকজন এসে সাঁওতালদের স্বাধীনতা খর্ব করেছিল। শোষণ করে তাদের কাছে দাবি জানিয়েছিল খাজনার। কোম্পানির কর্মচারীরা খাজনা আদায়ের নাম করে সাঁওতালদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। এমনকি শাসকের লোকজন সাঁওতালদের ধরে এনে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিলকা মাঝি এগিয়ে আসেন। তিলকার নেতৃত্বে সাঁওতালদের মুক্তিবাহিনি গঠিত হয়। ১৭৮২ সাল নাগাদ তিলকা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিলকা মাঝির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে মহাশ্বেতা দেবী গ্রহণ করেছেন। 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২) উপন্যাসে আমরা তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই।

এই উপন্যাসের ছয় নম্বর পরিচ্ছেদে দেখা যায়, আরিয়া গ্রামের দেশ মাঝি সজো হাঁসদার উঠোনে তিলকারা বসেছিল। জবর খবর নিয়ে বাঁকা কিসকু ছুটে এসেছিল। খবরটা সরজন সিং ঘাটোয়াল নিজের কানে শুনেছে। ঝিলিমিলি সাহেবের চাপরাশি মতি লোহার ভাগলপুরের ফৌজি বাজারে এসে বলেছে, সাহেব নিজে তিলকা মাঝিকে মারতে যাচ্ছেন।

খবরটা শুনে তিলকা বলেছিল— "তবে তো দেখা করতে হয়। মানী লোকটা আমার মত বুনো সাঁওতালের জন্য ভাগলপুরের কুঠি ছেড়ে চলে আসছে যখন।"[৩] হারা বলে ভাগলপুরের কুঠিতে গরমের সময় মাথায় চলে টানা পাখা। শীতের মধ্যে আগুন

জলে। মধু পাহাড়িয়া বলে, সাহেবদের যিশুর পরব পূজার কথা। সেই সময় তারা বড় পাখি ময়ূর আনে, গোটা ময়ূরটিকে কেটে মসলায় মাখিয়ে ঘি-এর মধ্যে ভাজে। টেবিলের সাজিয়ে সাহেব এবং তার মানুষরা মিলে বাঘের মতো খায়। দেশ মাঝির উঠোনে বসে তিলকা এইসব শুনছিল।

সাজো হাঁসদা তিলকার জন্য ভেট এর ব্যবস্থা করেছিল। সার্জন সিং ঘাটোয়াল সেই ভেট আনতে কামারবাড়ি গেছে। তখনো সে এসে পৌঁছায়নি। পলান্ রবিদাসকে দেখে তিলকা তার পরিচয় জানতে চেয়েছিল। পলান্-এর পরিচয় দিয়েছিল সাজো।

তিলকাদের খোঁজ করতে গিয়ে কোম্পানির ফৌজ পলান্-দের গ্রামে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাতে অনেক মানুষের প্রাণ চলে যায়। গ্রামের লোকের ধান চাল সব লুট করে ফৌজরা চলে গিয়েছিল। পলান্ সেই আগুনের তাপে তার দুই চোখ দিয়েছিল। তারপর থেকে সে সাজোদের সঙ্গে থাকে। এত যন্ত্রণার পরেও পলান্ কাঁদে না। সে গান গায়।

সর্জন আসেনি দেখে তিলকা পলানকে কাছে ডাকে। আগুনের কাছে বসে গান গাইতে বলে। কাঠের ঠকঠকি বাজিয়ে পলান্ দুটি গান গেয়েছিল। প্রথম গানটি হল—

“ঘর পুড়ছে ছাই উড়ছে
ভিটায় গজায় বন
গোহাল ঘরে বনটিয়া
রুক্কন কোথা, ঝক্কন কোথা
সুখন লছমন শাবন কোথা
আমি নুক্কন, আমি গোহালে
আমি ঝুক্কন, আমি ঘরে।
সুখন লছমন শাবন ঘুমায়
বাজরা খেতে নদীর চলে।।”[৪]

দেশ মাঝি সজন হাঁসদার কথা অনুযায়ী পলান্ কাঁদে না। তবে এই গানটি গাওয়ার পরে পলান্ মুখ মুছেছিল। এটি তার জীবনের গান। তাই হয়তো গান গাইতে গাইতে পলানের চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় গানটি শুরু করার আগে পলান সবাইকে চমকে দিয়েছিল। দুঃখ ও বিষাদের ভার ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে গান গেয়েছিল সে—

“নুসাসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হু বাকো তেঙ্গোনা
খাঁটি গেবোন হুলগেয় হো,
খাঁটি গেবোন হুলগেয় হো,
দিশম দিশম দেশমাঞ্ঝহি পারগানা
নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো
দঃ বোন দানাং বোন বাং গোকো তেঙ্গোন

তবে গেবন হুলগেয়া হো।"[৫]

পলান্-এর এই গান শুনে তিলকা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। সে জানায় আমরা যারা যুদ্ধ করি, এ যে আমাদের সকলের কথা। উপরে গানের বাংলা তরজমাটি পলান্ এর কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল—

"আমরা বাঁচবো, আমরা উঠবো
কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করবো,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করবো
দেশ মাঝি ও পারগানারা, গ্রামের মোড়লরা,
আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে
কেউ পাশে দাঁড়াবে না
তবে আমরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করব।"[৬]

তিলকা পালান্কে জিজ্ঞেস করেছিল, এই গান তুমি শুনলে কোথায়? কেবা তোমাকে শেখালো? তিলকার কথা শুনে সজল হাঁসদা উত্তর দিয়ে বলে—

"তিলকা! হুল্ উঠাছিস্, বহোত লাশ ফেলছিস কোম্পানির—বহোত লাশ পড়েছে আমাদের—সব পারিস আর গানের কথায় একি বললি? এ গান ফিরে সবার মুখে। আরো কত গান ফিরে। হুল্ চলবে তো হুলের গান হবে না? এটা কি বললি তুই?"[৭]

হাঁ ঠিক। এই হুলের কারণেই তিলকার নাচতে ইচ্ছে করে। সেখানে উপস্থিত মেয়েদের সাজো তার ঘরের ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। বলে দেয়, গোয়ালের গরুগুলোকে যেন বেঁধে রাখা হয়। বাবা তিলকা মাঝি সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এখন সাঁওতালদের দেবতা।

হাসতে হাসতে তিলকা দাঁড়ায়। অন্যরাও তিলকার মতো দু-হাত জড়ো করে, মুখের কাছে নিয়ে আসে। দম নিয়ে হঠাৎ করে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে— 'হু-ল্! হুল্! হুল্!' গ্রাম-বন ছাড়িয়ে গিয়ে সে চিৎকার অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৫৫ থেকে ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ বিরোধী গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিধু মুর্মু ও কানু মুর্মু। ইতিহাসের পাতায় এই আন্দোলনের নাম সাঁওতাল বিদ্রোহ। যদিও এই বিদ্রোহ অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তবে সিধু কানুর নেতৃত্বে এটি চরম পরিণতি লাভ করেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটকে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) উপন্যাসে পটভূমি রূপে গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষাপটকে ঔপন্যাসিক জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়।

উপন্যাসের তিন নম্বর পরিচ্ছেদে দেখা যায়, ভগনাডিহির মাঠে এক প্রাচীন বটগাছের নিচে সিধু ও কানু বসে আছে। ১৮৫৫ সালের ৩০ শে জুন। দিনটি ছিল

বৃহস্পতিবার। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল হাজার হাজার সাঁওতাল। সিধু-কানুর শালগিরার ডাক বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সাঁওতালরা রওনা হয়েছিল ভগনাডিহির পথে। হাজারীবাগ, মানভূম, বীরভূম, ভাগলপুর, মালদা, পূর্ণিয়া এবং দামিন থেকে সাঁওতালরা এসেছিল। ভগনাডিহির মাঠে যদি দশ হাজার সাঁওতাল এসে থাকে, পথে তো আরো অনেকেই ছিল। কেউ গিয়েছিল জমিদারের প্রয়োজনে, কেউবা নীলকুঠির ডাকে। কারা আবার বর্ধমানে রাণীগঞ্জে রেল কুলির কাজ করতে, কেউবা কয়লা খাদানে কাজ করার জন্য। তারা সবাই দলে দলে আসছিল।

পুরুষরা তাদের বউ ছেলে-মেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল। চাল-চিড়ে-গুড়-লবণ বাঁধা ছিল কাপড়ের পুটলিতে। অজয়, দ্বারকা, শাখী, বাঁশলোই, জয়ন্তী, ব্রাহ্মণী, বরাকর এমন কত না নদী পেরিয়ে তারা ভগনাডিহি গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল।

যুবকরা তো ছিলই। এছাড়া যারা একদিন দামিনে বন কেটে জমি হাসিয়েছিল, সেই বুড়োরাও আসছিল। তাদের উর্বরকরা জমিতে কোম্পানির সরকার মহাজনদের বসিয়েছিল। সেই মহাজনের অত্যাচারের ফলে সেখানকার সাঁওতালরা কষ্টের জীবনযাপন করতো। দামিনের বুড়োরা সেটি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন। সেই উপলব্ধির কথা তারা প্রকাশ করেছিলেন গানের মাধ্যমে। ভগনাডির যাওয়ার রাস্তায় এমন অনেক গান তারা গেয়ে চলেছিল। তার মধ্যে একটি গান হল—

"মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে আসেনি।
মাটি কেউ সঙ্গে নিয়ে যাবে না।
মাটি তাদের,
যারা মাটির সন্তান হয়ে মাটিকে হাসায়।
যারা প্রথম আগুন আবিষ্কার করে
আমরা সেই সব মানুষের এক গোষ্ঠী
মেয়েদের যারা প্রথম স্বাধীনতা দেয়
আমরা তাদের একজন
প্রথম লোহার ব্যবহার যারা করে
তীর ও লাঙলের ফালে
এই অরণ্য ও মাটির প্রথম সন্তানদের
একজন, একজন, একজন, আমরা
সভ্যতা আমাদের হাত ধরে কালো জঙ্গলে ঢুকে ছিল।
তাই
আজ আমরা চলেছি আমাদের অধিকার রাখতে।
বীরসিংহ বাজায় নাগরা
চন্নো বাজায় দুমদুমি

মেঘসিংহ বাজায় মাদল
সিধু পাঠায় শালগিরা
কানু পাঠায় তীর
আমরা এসেছি আমাদের অধিকার রাখতে।
কে তুমি বলো হুল্ আমাদের পাগলামি?
কে বলো, হুল্ একটা ক্ষ্যাপা ঝড়?
হুল্ আমাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার হাতিয়ার
হুল্ আমাদের হাতে তুলে দেবে দেশ ও রাজ্য।”[৮]

এই বিদ্রোহের গান গেয়ে হাজার হাজার সাঁওতাল ভগনাডির মাঠে সমবেত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত সিধু-কানু সাঁওতাল জাতির প্রাচীন ইতিহাসের কথা বলেছিলেন। সবাই শুনেছিল তিলকা মাঝির বিদ্রোহের কথা। সিধু-কানু বলেছিলেন জমিদার মহাজন ও আড়তদারদের কথা। তারা ছিল সবাই দিকু। কোম্পানির সরকার সাঁওতালদের প্রদেশগুলি ওই দিকুদের দিয়েছিল।

এই দিকুরা এসে সাঁওতালদের বেঠবেগার খাটায়। মহাজনের কাছে জিনিস কিনতে গিয়ে অবোধ সাঁওতালদের ঠকানো হয়। মহাজনরা জিনিস দেওয়ার সময় ছোট বাটখারায় দেয়। আর নেওয়ার সময় বড় বাটখারা ব্যবহার করতো। সুদের টাকা দিতে না পারলে সাঁওতালরা মারও খেত। অনেক সময় চাষ জমি মহাজনরা আত্মসাৎ করে নিত। সাঁওতাল মেয়ের ইজ্জত নিতেও তারা ছাড়েনি।

কোম্পানি সরকার খাজনা নেওয়ার জন্য জমিদারতন্ত্র আনলো। এই জমিদারের ছত্রছায়ায় মহাজন, নীলকর, ব্যবসায়ী আড়কাঠিরা সমাজে জোঁকের মতো বসেছিল। সাঁওতালদের জীবনে এরাই অভিশাপ এনেছিল। থানা-পুলিশ-দারোগা জুলুম করে। আদালতের উকিল, পেশকার, মুহুরী দোষীদের ছেড়ে নির্দোষকে জেলে পাঠায়। তাই সিধু-কানুরা সাহেব ও দিকুদের উচ্ছেদ করে সাঁওতালদের দেশে সাঁওতালকেই রাজা বানাতে চেয়েছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের এই গানগুলো সাঁওতাল সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিদ্রোহের সময় সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব ভাষায় গান রচনা করেছিল। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেটি বিদ্রোহের স্মৃতি এবং সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে রয়ে গেছে। বিদ্রোহের কালে গানগুলো যেমন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, তেমনি আজকের দিনেও এই গানের বিশেষত্ব সাঁওতাল সমাজে দেখতে পাওয়া যায়।সাঁওতাল বিদ্রোহের গানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় তা হল—

সাঁওতাল বিদ্রোহের গানে তাদের সংগ্রাম ও সাহসের কথা উঠে আসে। এই গানগুলোতে জমিদারদের অত্যাচারের বর্ণনা, সাঁওতালদের দুঃখ-কষ্ট এবং ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা পাওয়া যায়। এছাড়াও বিদ্রোহে সাঁওতালদের

ঐতিহাসিক ভূমিকা, সামাজিক বন্ধন, এবং তাদের জীবনের নানা দিকগুলো এই গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

এই গানে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানকারী চার ভাই সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব-এর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বিদ্রোহের এই গানগুলোর মধ্যে সিধু-কানুকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। দেবতাদের কৃপায় এই বিদ্রোহের সূচনা হয়ে ছিল বলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষরা মনে করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের গানগুলিতে যেমন তাদের সংগ্রামের কথা বলা হয়, তেমনি সিধু-কানুর মতো নেতাদেরও বন্দনা করা হয়। এই গানের মধ্যে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি, সাহসিকতা যেমন প্রকাশ পায় তেমনি ব্রিটিশ সরকার ও তার তৈরি করা জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের ক্রোধ প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্রোহের এই গানগুলি সাঁওতালদের ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সংগ্রামের স্মৃতি ধরে রাখে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের এই গানগুলো সাঁওতালদের সাংস্কৃতির একটা অংশ। সাঁওতালি সংগীতে 'হুল সেরেঞ' বা বিদ্রোহের গান বলে নিজস্ব একটি ধারা আছে। এর ভাষা, সংগীত ও নৃত্যশৈলীতে সংস্কৃতির অন্যতম অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবী হয়তো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে চাননি। তাঁরা বঞ্চিত, শোষিত জাতির মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। নিপীড়িত এই সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহের ইতিহাস তাঁরা নতুন ভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই সাঁওতালদের বিদ্রোহের গানগুলি উপন্যাসে স্থান পেল।

বর্তমান সময়েও এই গানগুলির ভূমিকা সাঁওতাল সমাজে দেখা যায়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে বিদ্রোহের বার্ষিকীতে, এই গান আজও পরিবেশিত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের গানগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই গান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় সংগ্রামী চেতনা।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, অষ্টম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২৪, অরণ্য বহ্নি, রচনাবলী-১৮, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা-৩৪২

২। তদেব

৩। দেবী, মহাশ্বেতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৩, শালগিরার ডাকে, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৬৭

৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮

৫। তদেব

৬। তদেব

৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৬৯

৮। দেবী, মহাশ্বেতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, সিধু কানুর ডাকে, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী,পৃষ্ঠা-৩৬

'অসমের নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ ও ছিন্নমূল বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'

বিপুল রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক চরম বিপর্যয়ের ঘটনা দেশভাগ। এই বিভাজনের মর্মান্তিক পরিণতিতে অখন্ড ভারতভূমি খন্ডিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে খন্ডিত হয় ভারতের ভূগোল, সমাজ, সংস্কৃতি, সম্প্রীতি, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক বন্ধন। সর্বোপরি মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে তৈরি হল এক গভীর সংকট। ইতিহাসে এই ঘটনা মানবজীবনের ট্রাজিক অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষের এই বিভাজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে অর্থাৎ পাঞ্জাব, বাংলা ও অসমের ওপর। এই তিনটি অঞ্চলে দেশভাগের কিছু মৌল পার্থক্য আছে। তবে, বিভাজনের কবলে পড়া এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যার যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে প্রত্যকটি অঞ্চলের কিছু স্বতন্ত্রতা রয়েছে। সেদিক থেকে অসমের দেশভাগের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা লক্ষ করা যায়। কারণ, জনমত হোক বা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ হোক কিংবা অন্য কোনও সমস্যাই হোক, দেশ বিভাজনের জন্য দেশের আর কোথাও গণভোটের পথ অবলম্বন করা হয়নি। গণভোটের মাধ্যমে অসমের বিভাজনের ফলে যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বাঙালি জীবনকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অসমে ছিন্নমূল বাঙালি জীবনে প্রবহমান দেশ হারানোর যন্ত্রণা, বিদেশি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, কখনো ডি-ভোটার বা ডিটেনশন ক্যাম্পের নরক যন্ত্রণা, কখনো বাংলা ভাষা ও বাঙালি পরিচিতি ভুলে অসমিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিন্নমূল বাঙালি প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে। ছিন্নমূল বাঙালির এই অস্তিত্ব সংকটের কথা লিপিবন্ধ হয়েছে এই অঞ্চলের বাংলা কথাসাহিত্যে। আমাদের নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে সেই অস্তিত্ব সংকটের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সূচক শব্দ : দেশভাগ, গণভোট, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, ছিন্নমূল জীবন, শরণার্থী সমস্যা, বিদেশি, নাগরিকত্ব।

মূল আলোচনা :

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা পৃথিবীর নানা দেশের মতো ভারতবর্ষেরও একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ভারতবর্ষে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে সাতাত্তর বছর পূর্বে। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষের মানুষ বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং হাজার হাজার শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছিল তা দেশভাগের মধ্য দিয়ে সম্ভব হল। ভারতবর্ষ দ্বি-খন্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ। আর এরই সঙ্গে দেখা দিল দেশভাগজনিত ছিন্নমূলের সমস্যা। কতিপয় সাম্রাজ্যলোভী, স্বার্থান্ধ নেতার ষড়যন্ত্রে সেদিন ভারতবর্ষের মাটিতে দেশভাগ নামক এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ভারতবর্ষের দেশভাগের ইতিহাস বলতে আমরা বেশিরভাগ মানুষ পাঞ্জাব আর বঙ্গদেশের বিভাজনের কথা জানি।পাশাপাশি অসমেরও যে বিভাজন ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে তা আমাদের অনেকেরই অজানা। তবে অসমের ক্ষেত্রে বিভাজনের ইতিহাস কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। কারণ, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসক অসম অধিকার করার পর, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্বতন্ত্র অসম প্রদেশ গঠনের সময় বাংলার শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলাকে বাংলা থেকে বিচ্যুত করে অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল।[১] তাদের যুক্তি ছিল পিছিয়েপড়া অসমের রাজস্ব ঘাটতির চাপ তাতে কিছুটা কমবে এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটবে। সেই থেকেই অসমের একটি জেলা হিসেবে সিলেটের পরিচিতি। কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকের চক্রান্তে এবং কিছু স্বার্থান্ধ নেতার ষড়যন্ত্রে ভারত বিভাজন অবসম্ভাবি হয়ে পড়লে শাসকশ্রেণি বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভাজন করার পাশাপাশি অসমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা সিলেটকেও বিভাজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে অসমের শ্রীহট্ট জেলার কোন কোন অংশ ভারতে আর কোন কোন অংশ পাকিস্তানে থাকবে তা নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণির মানুষের মধ্যে এক তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলি এই উত্তেজনাকে হাতিয়ার করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। অবশেষে এই ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য শ্রীহট্ট জেলায় রেফারেন্ডাম বা গণভোটের সিদ্ধান্ত হয়।

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট হলে দেখা যায়, শ্রীহট্টের পূর্ব-পাকিস্তান ভুক্তির পক্ষে ২৩৯৬১৯ টি বৈধ ভোটের মধ্যে ১৮৪০৪১ টি ভোট ভারতভুক্তির সমর্থনে পড়েছিল। আর ৫২৭৮০ টি ভোট পাকিস্তানের সমর্থনে পড়েছিল। ব্যবধান হয়েছিল ৫৫৫৭৮ টি ভোটের।এই ভোটের প্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ শ্রীহট্টের বিভাজন ঘটায়। শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিনটি থানা - রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, বদরপুর ও করিমগঞ্জ থানার কিছু অংশ ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকল। আর প্রায় পাঁচটি পরগনা সদরসিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, করিমগঞ্জের কিছু অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) দিকে চলে গেল। তৎকালীন মোট ৭০৯ স্কোয়ার মাইল অঞ্চল অসমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।[২] হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে জেলাভিত্তিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভারতের আর কোনও প্রদেশে কোনও জেলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এরকম গণভোটের কোনও নজির নেই। ভারতবর্ষে

অসমের এই বিভাজনের ইতিহাস তাই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়েই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দেশভাগের ফলে সমস্ত বাঙালি জাতির জীবনে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এই একটি মাত্র ঘটনা হাজার হাজার বছরের বাঙালি জাতিসত্তাকে টুকরো টুকরো করে দিল। সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গেল আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরম্পরা,আর্থ-সামাজিক জীবন ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বীভৎস দাঙ্গা, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ, ধনসম্পতলুণ্ঠন, ধর্ষণ, নারীহরণ, অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হল নির্বিচারে। ফলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে যার দেশে পালিয়ে যেতে লাগল। এভাবেই বাঙালি হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমেও সেই সময় অসংখ্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল উদ্বাস্তু হয়ে। সেই সময় কত যে বাঙালি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে অসমে এসেছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া দুষ্কর। তবে জনগণনা ও সরকারি বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় এখন পর্যন্ত তিন কোটির ওপর বাঙালি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। এই উদ্বাস্তু মানুষেরা কীভাবে নানা প্রতিকূল পরিবেশে, আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়ে শত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন তার প্রতিরূপ আমরা সাহিত্য-শিল্পে কেবল অনুভব করি। দেশ ভাগের ফলে যে সকল বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে অসমে আশ্রয় নিয়েছিল এদের মধ্যে অনেকেই পুনর্বাসন লাভ করলেও অসংখ্য মানুষের ওপরই ঝুলছে ডি-ভোটারের মতো তীক্ষ্ণ তীর, ডিটেনশন ক্যাম্পের মতো অস্বাস্থকর পরিবেশে জীবন যাপন। আবার অসংখ্য মানুষের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হচ্ছে ভাসমান উদ্বাস্তু হয়ে। অসমের এই সমস্ত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষগুলির দুঃখ-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, হতাশা-ক্ষোভ, তাদের বেঁচে থাকার মরিয়া অভিযান, সাফল্য বা ব্যর্থতার কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে অসমের বাংলা ছোটগল্পের ক্যানভাসে। গল্প লেখকেরা বিভিন্নভাবে দেশভাগ ও ছিন্নমূল বাঙালির অস্তিত্ব সংকটের কথা তুলে ধরেছেন।

১. 'সীমানার ওপারে থমকে থাকা পা' - দেবীপ্রসাদ সিংহ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকারের মধ্যে প্রথমেই উঠে আসে দেবীপ্রসাদ সিংহের নাম। তাঁর 'সীমানার ওপারে থমকে থাকা পা'(২০১৬ খ্রিঃ) গল্পটি এ সময়ের বাস্তব-উন্মোচক একটি প্রতিবেদন। গল্পটিতে দেখা যায় কবি অনন্ত দত্ত ও সবুজ লুঙ্গি পরা মধ্যবয়সী রিকশাওয়ালা রজব আলীর জীবনভাষ্য যেন অসমের Everyman বাঙালির জীবনভাষ্যে পরিণত হয়েছে। দেশভাগের পরা উপস্থিতি সম্পর্কে অনন্ত দত্তের প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত হয়েছে- "অসমে এক বাঙালি, চিরন্তন বহিরাগত, এমনকি অতিথি বাদের দিক থেকেও উড়ে এসে জুড়ে বসা এক আপদ, ঘৃণিত, লাথি খাওয়া একটি জীব,...ভাগ্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়া গলায় আপনাকে সারাজীবন নো-ম্যান্স ল্যান্ডে বাঁচার বেদনা সম্পর্কে বলত,বলত একমুঠো মাটিকে নিজের মনে করে আঁকড়ে ধরার প্রবল ইচ্ছের কথা।...তার পা থমকে আছে সীমান্ত রেখার ঠিক ওপরে, কেননা

অনন্তই সেই লোকটি, এক চিরন্তন উদ্বাস্তু যার পদক্ষেপ সর্বদাই থমকে আছে সীমান্ত রেখার ওপর- আকাশ ও পৃথিবীর সীমান্তে, জল ও ভূমির সীমান্তে, অতিত ও ভবিষ্যতের সীমান্তে, অস্তি ও নাস্তির সীমান্তে।"[৩]

২. 'আশ্রয়' - শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

বরাক উপত্যকার একজন প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পকার হলেন শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী। তাঁর রচিত 'আশ্রয়' (২০১১ খ্রিঃ) গল্পের মূল বিষয়বস্তু হল- ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ কার্যকরী হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষগুলি আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দেয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম প্রদেশের বরাক উপত্যকায় বহু মানুষ এভাবে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এভাবে আশ্রয় নিয়ে বাসভূমি খুঁজে নেওয়া কম যন্ত্রণার ছিল না। তবু দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা এক বৃদ্ধের কাছে এই ভূমি কখন যে জন্মভূমিতে পরিণত হয়েছে তা খেয়াল করেননি বৃদ্ধ -" এই জল মাটি কবেই আপন করে নিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছিল জন্মসূত্রে এ ভূমি তার নয়। আজকে তার চিন্তা- ভাবনা, আশা- আনন্দ সব কিছুই এই মাটিকে ঘিরে।"[৪] শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের মানুষের কাছে তিনি মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন- " গ্রামের সব ব্যাপারেই বৃদ্ধকে ছাড়া চলত না, এখনও না।"[৫]

গল্পের পরবর্তী অংশে বৃদ্ধের বিশ্বাস ভঙ্গের কালোদিন ঘনিয়ে আসে। ভূমিপুত্র ছাড়া কারও স্থান হবে না এই রাজ্যে। এমন নির্দেশের জন্য বৃদ্ধ কখনই প্রস্তুত ছিল না। ফলে পূর্ব স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভিড় করে আসে বেদনা ও হতাশা- "সেই কবে ছোট্ট অরিন্দম কে বুকে নিয়ে এক বস্ত্রে ভিটে মাটি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালাতে হয়েছিল প্রাণের মায়ায়।... কিন্তু ভাসতে ভাসতে যেখানে নোঙর ফেলার সুযোগ পেয়েছিল সেটি এই মাটি। তার পর ভাষা এক না হলেও আত্মীয়ের আন্তরিকতায় পুরনো স্মৃতির ওপর কবেই পলিস্তর জমে আশ্রয়ের দ্বীপ হয়ে উঠেছিল এ মাটি।"[৬] অবশেষে এই ভিটেমাটি ছাড়তে হয় বৃদ্ধকে। এক সময় যারা ছিল আত্মার আত্মীয়, তাদের সঙ্গে রচিত হয় ব্যবধান। নাতির হাত ধরে বৃদ্ধ তাই রাস্তায় এসে দাঁড়ায় আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু গল্পটির পরিশেষে বৃদ্ধের দ্বিতীয়বার আশ্রয়হীনতার মধ্য দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দেয়-

ক. "আমরা বিদেশী বহিরাগত। কিন্তু কোন বাইরের দেশ থেকে এলাম আমরা? একই দেশে তো ছিলাম। আমরা বিদেশী হলাম কী করে?"[৭]

খ. "ভূমিপুত্র মানে কি আদিম অধিবাসী? সে আদিমকে কি এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে? নাকি ভূমিকে যে মায়ের মত ভালোবাসে সে ভূমিপুত্র।"[৮]

গ. "আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের এ যাত্রার বোধ হয় শেষ নেই।"[৯]

৩. 'সন্তোষ বিশ্বাসের গল্প' - অভিজিৎ চক্রবর্তী

অভিজিৎ চক্রবর্তী অসমের একজন পরিচিত লেখক। তাঁর রচিত গল্পটিতে দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল বাঙালি জীবনে একদিকে উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা অন্যদিকে অস্তিত্বের

সংকটের ছবি ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ সন্তোষ বিশ্বাস ১৯৫৭ সালে স্বপরিবারে পাকিস্তান থেকে ভারতের অসমে চলে আসে। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে ১৯৬০-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭৯-এর বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন, জাতিদাঙ্গা ইত্যাদি নানা অবিঘাতে তার জীবন বিপর্যস্ত হয়। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়ে সন্তোষ বিশ্বাস অনাথের মতো সারাটা জীবন কাটাল ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। তাই পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় শেষ বেলায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে বুক ভাঙা আক্ষেপ - "কে আমি ? কার আমি ? আমি পাকিস্তানের কেউ নই,বাংলাদেশের কেউ নই,ইণ্ডিয়ারও কেউ নই। আমার নিজের কোনো ভাষা নেই।...আমি বাঙালির কেউ হতে পারলাম না, অসমিয়ারও কেউ হতে পারলাম না, বোড়োদেরও কেউ হতে পারব না, জানি। ... গভীর রাতে মৃত্যু দেখি পাশে এসে দাঁড়ায়। মাথার কাছে আমার ছোট ছেলেটা। কী বলে যাব ওকে ? ওর জীবনটাও কি ঢেউয়ের পিঠেই কাটবে?"[১০] এভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত হলেও, উত্তরাধিকারীদের জীবনও কী একই ভাবে কাটবে ? ভবিষ্যতের স্বপ্ন কী বিপন্ন হবে ? এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না সন্তোষ বিশ্বাস।

৪. 'আব্বাজানের হাড়- একটি প্রামাণ্য দলিল' - দেবব্রত চৌধুরী

বরাক উপত্যকার একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হলেন দেবব্রত চৌধুরী। তাঁর বহু প্রচারিত গল্প 'আব্বাজানের হাড়- একটি প্রামাণ্য দলিল' (১৯৯০ খ্রিঃ)। এই গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে 'অসম আন্দোলন'। এই আন্দোলনের অবসানে সম্পাদিত চুক্তি, বিদেশিদের বহিষ্কারের অঙ্গীকার প্রভৃতির ফলে বরাক উপত্যকার মানুষেরা যে সমস্যায় কন্টকিত হয়ে উঠেছে, যার পেছনে প্রায়শই কাজ করে কুটিল রাজনৈতিক ইন্ধন, তার ফলশ্রুতিতে মানুষের বিশেষত প্রান্তিক মানুষের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। সে বিপর্যয় মূলত নিজ দেশেই 'বিদেশি' হিসেবে চিহ্নিত হওয়া। এই জীবন বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রন্তিক মানুষেরা নেমে যেতে পারে মনুষ্যত্বের নিম্নতর স্তরে। 'বিদেশি' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মনুষ্যত্ব অবনমনের চুড়ান্ত দলিল হল দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হাড়- একটি প্রামাণ্য দলিল' গল্পটি।

এই গল্পের প্রধান চরিত্র আমিরুদ্দি। দৈনিক আট টাকা ভাড়ায় রিকশা চালিয়ে সংসার চালায়। স্থায়ী কোন আস্তানাহীন আমিরুদ্দি নানা জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে জবর দখল কলোনিতে। এ দেশে সে তার বাবার সঙ্গে বহু বছর আগে এসেছিল। তাই এই দেশের মাটি তার বিশ্বাসের জায়গা – "আমি তো জানি এ মাটি আমার- এই দেশেরই মানুষ আমি, কবে কোন আদ্যিকালে বাপের সঙ্গে এপারে আসা। ওপার তো কবেই তামাদি হয়ে গেছে স্মৃতির খাতায়।"[১১] কিন্তু তার সমস্ত ধারণা ও বিশ্বাস চুরমার হয়ে যায় যখন 'বিদেশি' নোটিশ আসে তার কাছে। উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলে সে বিদেশি বলে গণ্য হবে। ফলে নাগরিক অধিকার হারিয়ে কুকুর-বেড়ালের মতই বেওয়ারিশ জীবন অথবা তার চেয়েও অধম পরিণতি নেমে আসতে পারে জীবনে।

নিরুপায় আমিরুদ্দি শেষপর্যন্ত 'বিদেশি' হওয়ার নোটিশ ফেরানোর টাকা জোগাড় করতে নেমে পড়ে অবৈধ কঙ্কালের ব্যবসায়। একদিন মধ্য রাতে তার আব্বাজান বদিরুদ্দিকে কবর থেকে টেনে তোলে-"এক পলাতক আসামীকে গেপ্তার করার মতো।"[১২] যে বদিরুদ্দি সাত বছর মাটির নীচে ফেরারী জীবন কাটিয়ে এখন শুধু হাড়ের কাঠামো। পিতার এই কঙ্কাল বিদেশে বিক্রি করে যে টাকা পাবে তাই দিয়ে আমিরুদ্দি 'বিদেশি' নোটিশ ফেরাতে পারবে। অথচ এই অমানুষী কাজ করতে সে বাধ্য হয়েছে। তাই আমিরুদ্দির অসহায় অক্ষম আক্রোশ ভাষা পায় সেই কঙ্কালকে ঘিরেই – "অন্তত একবার আমাকে পৃথিবীতে কষ্ট দিতে আনার কষ্ট তুমি ভোগ করে দেখো। সেই ছেটো বেলায় অভুক্ত পেটে চায়ের দোকানে খাটতে পাঠানো থেকে আজকের এই নোটিশ তাড়া করা জীবনের স্বাদ একবার ভোগ করে দেখো। আমার হৃদ-আদালতে তুমি যে গুরুতর অপরাধী আব্বা। তোমার শাস্তি হোক। তাই তোমাকে মরণোত্তর দীপান্তরে পাঠাচ্ছি।"[১৩] অথচ এই অসহায় আক্রোশের অন্তরালেই রয়ে গেছে আমিরুদ্দির বুক ভাঙা কান্নারও প্রস্রবণ। জন্মদাতার সঙ্গে শেষ সংযোগটুকু ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে অসহায় আমিরুদ্দির মানুষী অস্তিত্বই যে বিপন্ন, আলোচ্য গল্পে সেই ব্যঞ্জনাই প্রকাশিত।

৫. 'ডি-ভোটার' - হিমাশিস ভট্টাচার্য

এই গল্পের প্রধান চরিত্র বিশ্বনাথ। তার পিতা সন্দেহ জনক ভোটার (ডাউটফুল ভোটার) হিসেবে জেলে বন্দি রয়েছে অনেকদিন। থানার পুলিশ বিশ্বনাথকে খবর দিয়ে গেলেন যে, তার বাবার শরীরটা ভালো নেই। দশ বাই বারো মাপের একটা খুপরি ভাড়া ঘরে কোনো রকম করে থাকা বিশ্বনাথ রাতে কিছুতেই ঘুমাতে পারেন না। কারণ একদিকে জেলবন্দি অসুস্থ পিতার জন্য তার দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে দুই হাজার টাকার জন্য মহাজনের তাগাদা। যে টাকা তিনি পিতাকে ছাড়ানোর জন্য নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পিতাকে জেল মুক্তির জন্য বিশ্বনাথ আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। তবুও জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই তৈরি হয়নি। তাই নিরুপায় হয়ে জেলবন্দি পরান দাস পুত্র বিশ্বনাথকে বলেন- "এ জীবনে আমার আর মুক্তি মিলবে না রে। কোনদিন শুনবি গভীর রাতে গাড়িতে তুলে নিয়ে বর্ডারে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, ওদেশে গিয়েও জেলে পচে মরতে হবে। ভাগ্য ভালো থাকলে বি.ডি.আর- এর গুলি খেয়ে মরব।"[১৪] অসহ্য যাতনা আর নিদারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করেও যখন পরিত্রান মেলে না তখন জীবন নয় মৃত্যুই যে শতগুণে শ্রেয় তা পরান দাসের মনে হয়েছে।

পুলিশের নির্মমতার পরিচয় পাই এই গল্পে। যে সমস্ত সন্দেহ ভাজন জেলবন্দি (ডি-ভোটার) যথাসাধ্য টাকা খরচ করেও সরকারি কাগজপত্র জোগাড় করতে পারে না। তাদের রাতের অন্ধকারে বাংলা দেশের সীমানার ওপারে ঠেলে দিয়ে আসে। এভাবেই শত শত উদ্বাস্তু সন্দেহ ভাজন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে দায় এড়াতে চায় সরকার। এদেশ থেকে অন্যদেশে ঠেলে দিলেও সেখানেও এই সমস্ত মানুষের কোনো

হিসেব থাকেনা। তাদের কাছেও এরা অনুপ্রবেশকারী মাত্র। এদের সেখানেও একেবারে নিকেশ করে দিলে কারও কাছে কোনো জবাব দিহির দায় থাকে না।
কিন্তু আলোচ্য গল্পে সরকারের হ-য-ব-র-ল নীতির খোলোস থেকে আসল রহস্য বেরিয়ে পড়ে। যে এখন সন্দেহ জনক ভোটার সে কিছুদিন আগে শুধু ভোটার ছিলেন। তাহলে যিনি এই সমস্ত মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাওতো ডাউটফুল নির্বাচিত প্রতিনিধি। গল্পের শেষে পরান দাস এভাবেই অসমের সরকারের দিকেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন।

৬. 'আসরাফ আলির স্বদেশ' - মলয়কান্তি দে

মলয়কান্তি দে'র 'আসরাফ আলির স্বদেশ' (১৯৮৭ খ্রিঃ) একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পকারের জন্ম দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জে। লেখক পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, থাকেন গুয়াহাটিতে। 'আসরাফ আলির স্বদেশ' গল্পটিতে গল্পকার উদ্বাস্তু জীবনের নানা প্রতিকূলতার ছবি যেমন অঙ্কন করেছেন তেমনি বাঙালির অস্তিত্বের সংকটকেও তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আসরাফ বহুদিন আগে পরিবারের ১১ জন সদস্যসহ এ দেশে এসেছিল। তখন থেকেই তারা চিহ্নিত হয়ে গেছে বিদেশি বলে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এরকম বাধ্য হয়ে বরাক উপত্যকায়। চলে আসার সময় পথে তার মনে হয়েছিল- "পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থান।...কই কোনো বাধার প্রাচীর তো নেই কোথাও? যেন নেহাত এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় যাওয়া।... ভারতবর্ষ কোন আলাদা দেশ নয়।[১৫] কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আসরাফের এই ভাবনা বদলে গেছে। ছোটবেলায় এদেশে আসার সময় সে বোঝেনি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হবার যন্ত্রণা। তার সেই আনন্দ বিষন্নতায় পরিবর্তিত হয়েছে। সিটিজেনশিপ আর মাইগ্রেশন-এর আবর্তে পড়ে আসরাফের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। নির্দেশ আসে ওদের সেই আগের ভিটেতেই তাদের ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমরা জানি সেটা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ ওদেশের পাহারাদারেরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে না। অর্থাৎ মানুষগুলির বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম বাসস্থান এ পৃথিবীর কোথাও নেই। সে জানে আগের ভিটেমাটি সব কবেই নো-ম্যানস ল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ওদেশে ইরফান চাচা এদেশে কাদের মিঞার চক্রান্তে সে তার জমি-বাড়ি হারিয়েছে। উদ্বাস্তু হতে হতে তার অস্তিত্বই এখন চরম সংকটে। গল্পকার তাই শেষে লিখছেন "নো ম্যানস ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা আসরাফ আসলে এখন নো ম্যান-একটা নন্ এন্ টিটি।"[১৬]

এভাবেই দেশভাগ পরবর্তীকালে অসমের বাংলা ছোটগল্পগুলিতে কথাকারেরা এই অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালির উদ্বাস্তু হওয়া, কখনো-বা ডি-ভোটার হওয়া, কখনো-বা বিদেশি হওয়ার আশঙ্কা, আবার কখনো বা ডিটেনশন ক্যাম্পের নরক যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে। বাঙালি জীবনের এই দুঃখ-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, হতাশা-ক্ষোভ, সর্বোপরি অস্তিত্বের সংকট এই অঞ্চলের বাঙালিকে সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত রাখে। এই সমস্ত আশঙ্কার মূলে রয়েছে দেশবিভাগ। দেশভাগের এই অভিঘাতে অসমের বাঙালি

নিজভূমে পরবাসীর জীবন অতিবাহিত করছে। এমন নিদারুণ বেদনার ঘটনা আর কোথাও বোধহয় ঘটেনি। অসমের বাঙালি তাই আজও তার নিজস্ব ভূ-খণ্ডের সন্ধান করে চলেছেন। এই সংকটময় অবস্থা থেকে কবে তাদের সম্পূর্ণ মুক্তি হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এই অঞ্চলের মানুষ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ে যদি যৌথভাবে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহলেই এই অঞ্চলের বাঙালিরা ছিন্নমূলের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, মহাদেব, 'উত্তর-পূর্বভারত সেদিন ও আজ' (১ম খণ্ড), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ৩৮।

২. মণ্ডল, মননকুমার, 'পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি', গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩০২।

৩. পুরকায়স্থ, রণবীর (সম্পাদনা), 'আসামের বাংলা ছোটোগল্প', একুশ শতক,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৫২।

৪. নন্দী, কান্তারভূষণ (সম্পাদনা), 'যাপন কথা' গল্পের উত্তর-পূর্ব, অষ্টম সংখ্যা 'দ্যাশ', জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ২৬১।

৫. তদেব, পৃ. ২৬০।

৬. তদেব, পৃ. ২৬২- ২৬৩।

৭. তদেব, পৃ. ২৬৩।

৮. তদেব, পৃ. ২৬৩।

৯. তদেব, পৃ. ২৬৩।

১০. পুরকায়স্থ, রণবীর (সম্পাদনা), 'আসামের বাংলা ছোটোগল্প', একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৫ ।

১১. তদেব, পৃ. ১৫২।

১২. তদেব, পৃ. ১৫৯।

১৩. তদেব, পৃ. ১৫৯।

১৪. নন্দী, কান্তারভূষণ (সম্পাদনা), 'যাপন কথা' গল্পের উত্তর-পূর্ব, অষ্টম সংখ্যা 'দ্যাশ', জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৪৪ ।

১৫. পুরকায়স্থ, রণবীর (সম্পাদনা), 'আসামের বাংলা ছোটগল্প', একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ২৪২।

১৬. তদেব, পৃ. ২৪৪।

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প : সাম্প্রদায়িকতার তমসাচ্ছন্ন ধ্বংসভূমিতে 'চৈতন্যবান মানব'এর সন্ধান

সাথী ত্রিপাঠী
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পঞ্চাশের দশকের কথাকার প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪) একজন অক্লান্ত ও অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁর কালচেতনা, ইতিহাসচেতনা, বিষয়ভাবনা ও রচনাশৈলীর জাদু পাঠককে মুগ্ধ করে। বিবিধ ধর্মাবলম্বী, বিবিধ ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে দেশ, কাল, সময় ও বেঁচে থাকার টানাপোড়েনকে ধরতে চেয়েছেন তিনি। দাঙ্গা-দেশভাগ জনিত নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তিনি বারংবার। সর্বোপরি তাঁর রচনায় প্রাধান্য পায় মান আর হুঁশ বিশিষ্ট মানুষ। গত শতকের চার-পাঁচের দশকে দুনিয়া জুড়ে চলতে থাকা সংকটময় বাতাবরণে যখন সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় পর্বের সূচনা হয়ে যায়, নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মানুষ যখন নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত সেই পরিস্থিতিতেও প্রফুল্ল রায়ের রচনার পাত্র-পাত্রীরা সদর্পে ঘোষণা করে- 'জয় হোক মানুষের।' সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে ছাপিয়ে অন্তরের নিত্যধর্মে তারা উজ্জ্বল। সত্তর বছর ধরে লিখে চলা কথাকারের সুবিপুল সাহিত্যভাণ্ডার থেকে আলোচনার প্রয়োজনে নির্বাচিত গল্পের ('মাঝি', 'চর', 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী', 'গন্তব্য' 'কিছুক্ষণ', 'ভারতবর্ষ') পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণের নিরিখে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের পটভূমিতে চেতনাসম্পন্ন মানুষকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ: সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, বিস্ফোরন, নারীলুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, সম্প্রীতি, মানবিকতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ।

মূল আলোচনা:

'বিন্দুমাত্র' গ্রন্থে প্রফুল্ল রায় লিখেছেন- "সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। তার এপিসেন্টারে রয়েছে পারস্পরিক বিদ্বেষ আর ঘৃণা।"[১] বিবিধ ধর্মীয় জনসম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিভেদ-বিরোধিতাই হল সাম্প্রদায়িকতা। ভারতে এহেন সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশের বিষয় নিয়ে নানা যুক্তি তর্কের অনুষঙ্গ উল্লেখ্য- শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জামাত-ই-ইসলাম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সাম্প্রদায়িক দলের উদ্ভব, হিন্দু মৌলবাদ, মুসলিম মৌলবাদ, ব্রিটিশদের 'Divide and Rule' পলিসির মতো বিভেদনীতি যার মূলে থেকে গেছে বলে মনে করা হয়। সম্প্রদায় সম্পর্কিত অহংবোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক স্বার্থ-প্রতিহিংসার বশে মানুষ ভুলতে বসে তার প্রকৃত ধর্ম-মনুষ্যত্ব।

অবলুপ্তি ঘটে তার শুভচেতনার, বিচার-বিবেচনাবোধের। কবিগুরুর বাণী স্মরণে এনেই বলতে পারি আসলে "ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে, অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।"[২]এই সম্প্রদায় বৈরিতাই থাকে দাঙ্গার মূলে। ভারতবর্ষে দাঙ্গার ইতিহাস বহু প্রাচীন। তবে ভয়াবহতায়-নৃশংসতায়-হত্যালীলায় পূর্বের সব দাঙ্গাকে অতিক্রম করে যায় '৪৬ এর দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ সহমতে আসতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ ১৬ই আগস্ট লীগের তরফ থেকে নেতা জিন্নাহ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর ডাক দিলে শুরু হয় কলকাতা সহ সারা ভারতব্যাপী বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। উপমহাদেশের চারিদিকে শুরু হয় রক্তলোলুপ নরপিশাচদের অস্ত্রসহ আগুন নিয়ে খেলা। দিকে দিকে মৃতদেহের স্তূপ। শুধুই ধ্বংস আর ধ্বংস। দীর্ঘকাল যে হিন্দু-মুসলমান স্নেহ-প্রেম-প্রীতির বাহুডোরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সৌভ্রাতৃত্ববোধে মহান ছিল, পারস্পরিক সহাবস্থানে উজ্জ্বল ছিল তারাই 'সাম্প্রদায়িক রোবটে' পরিণত হয়ে একে অন্যের জানের দুশমন হয়ে ওঠে। বিপন্ন অস্তিত্বের অসহায়তা সাংঘাতিক যন্ত্রণা তৈরি করে, বিশেষত যখন কয়েক প্রজন্মের প্রতিবেশী হঠাৎ করে অচেনা হিংস্র চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। দাঙ্গার এহেন নির্মমতা, লুঠ, হত্যা, ধর্ষণ, নৃশংসতা, মানবতার অপমৃত্যু, স্বার্থান্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, পশুদের তাণ্ডবলীলা, দেশভাগ পরবর্তী অভিবাসন- বাংলা কথাসাহিত্যের থিম হয়ে ওঠে। এসব গল্প-উপন্যাসে রক্ত-লাশ, ঘৃণার ছবি, পৈশাচিক উল্লাস আর নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন। অবিশ্বাসে ঘন হয়ে আসা চোখ, কূটিল সন্দিগ্ধতা, অবলীলায় বন্ধুর বুকে ছুরি বসানো, ভগিনীসমা নারীকে ধর্ষণ, রক্তস্রোতে আর পচা রক্তের গন্ধে ভারী বাতাস, বাস্তুচ্যুত হওয়ার বেদনা-হাহাকার।

প্রফুল্ল রায় দাঙ্গা-দেশভাগ বিধ্বস্ত সেই তমসাচ্ছন্ন কালটিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর" গ্রন্থের ভূমিকায় স্বয়ং লেখক জানাচ্ছেন- "গত শতকের ছেচল্লিশে আমি বারো বছরের কিশোর। তখন থেকেই এই উপমহাদেশের নানা ভাঙন এবং বিপর্যয়ের আমি সাক্ষী।"[৩] এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে দেশত্যাগের মিছিলেও সামিল হতে হয়। দাঙ্গা ও দেশভাগের মর্মান্তিক স্মৃতি তাঁকে দুঃস্বপ্নের মতো নিয়ত তাড়া করে বেড়ায়। দাঙ্গা-দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্য রচনায় তিনি যেন সর্বভারতীয় কথাকার। দেশভাগের আগে এবং পরবর্তীকালে শুধু বাংলাই নয়, বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মুম্বাই যেখানে যেখানে দাঙ্গা হয়েছে তার পটভূমিতে তিনি অজস্র গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে অনুরণিত হয়েছে দাঙ্গাবিরোধী সুর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা, মানুষের কথা, মানবিকতার কথা। দাঙ্গা-দেশভাগের সময় বারবার দেখা গেছে অমানুষদের, গুণ্ডা-বদমায়েশ-লম্পটদের। কিন্তু সেই অমানুষ-নরপিশাচদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দেখা মিলেছিল মানবের। কবি জীবনানন্দ দাশের কথায়- "মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়;"[৪] প্রফুল্ল রায় তাঁর একাধিক গল্পে এমন কিছু চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন যাঁরা তমসাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার ধ্বংসভূমিতেও মানবতার

দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত রাখে। জীবন বাজি রেখেও মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিন্নধর্মী মানুষের প্রাণভিক্ষা করে নিজেদের বিপন্নতা, গ্লানি অস্বীকার করে। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার সীমিত পরিসরে আমরা প্রফুল্ল রায়ের নির্বাচিত কিছু গল্পের ('মাঝি', 'চর', 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী', 'গন্তব্য' 'কিছুক্ষণ', 'ভারতবর্ষ') নিরিখে 'চৈতন্যবান মানব' দের সন্ধান করব। যে গল্পগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ যেমন চিত্রিত হয় নির্মোহভাবে তেমনি পাশাপাশি বড় হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত 'Human Kindness' এর কথা।

তারিণী 'মাঝি'

প্রফুল্ল রায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মাঝি' ('দেশ'-১৯৫৪) এবং দ্বিতীয় গল্প 'চর'(পরিচয়)-উভয়ই পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার ('৪৬) প্রেক্ষিতে নারীলাঞ্ছনার নক্কারজনক অধ্যায়। দেশভাগ-দাঙ্গার সুযোগে ভিন্ন ধর্মের পুরুষের দ্বারা মেয়েদের ঘটে– "Widespread sexual savagery." বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়কে, তাদের মানুষকে অপমান করার চূড়ান্ত উপায় হল নারীধর্ষণ। ছিন্নমূল নারীরাই একমাত্র জানে দাঙ্গা-দেশভাগের ঘটনায় কতভাবে লাঞ্ছিত হয় নারীশরীর। **'মাঝি'** গল্পের তরুণ সাদাসিধা মানুষ ফজল মাঝি ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা পারাপারের কাজ করে। তার ভালোবাসার মানুষ ষোড়শী সলিমা; তার যৌবনের কামনা। দু'জনের বুকে ঘরবাঁধার প্রবল স্বপ্ন। কিন্তু তাদের মিলনের মাঝে প্রধান বাধা পণপ্রথার সামাজিক নিয়ম ও সলিমার বাজানের অর্থগৃধ্ন মানসিকতা। ফজলকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- "সলিমারে শাদি করাতে চাও! সাত কুড়ি ট্যাকা ডাইন হাতে দিয়া বাঁও হাতে মাইয়ারে নিয়া যাইও।"[৫]গরিব কিন্তু সৎ, পরিশ্রমী ফজল দিনরাত সওয়ারি পারাপার করে যৌতুকের অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা করে তার স্বপ্নচারিনীকে একান্ত আপন করে পাওয়ার আশায়। ইতিমধ্যে অখণ্ড বাংলার আকাশে দাঙ্গার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। দাঙ্গার এই আতঙ্কময় পরিবেশে সংখ্যালঘু হিন্দুর দল সাতপুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে বেবাজিয়াদের মতো পাড়ি দিতে লাগে কলকাতার পথে। কারণ সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা আজ ধ্বংসপুরী, মৃত্যুপুরী। নারীদের ইজ্জত আজ ভূলুণ্ঠিত, হিন্দু ধর্মস্থানের ওপর আক্রমণ, হিন্দু গৃহে অগ্নিসংযোগ সর্বোপরি চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা দেশভাগের পূর্বেই অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। স্বাধীনতার মাসখানেক আগেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল –"পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু পরিবার সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।"[৬]এই স্থানান্তর ফজল মাঝির জন্য এনে দেয় বিশেষ সুযোগ। একটা 'কেরায়া' মিললেই পাঁচ-দশ টাকা পারানি আর তার স্বপ্নপূরণের পথে আরো একধাপ অগ্রসর হওয়া। এমন একটা ভাবনায় যখন মুসলমান মাঝির মন অভিসারে গমনোন্মুখ তখনই 'মাঝি কেরায়া যাইবা নাকি?' প্রবল হাঁক তুলে নদীর কিনারে এসে পৌছায় মালখাননগরের ইয়াছিন শিকদার ও এক বোরখা পরিহিত রমণী। এই রাতের আন্ধারেই সে যেতে চায় চর ইসমাইল। তার জন্য ফজল মাঝিকে সে

দশটাকা ভাড়া দিতেও রাজি। প্রাথমিক ওজর-আপত্তি কাটিয়ে ফজল মাঝি নৌকা বাইয়ে দিতে চাইলে নৌকায় উঠতে না চেয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বোরখা পরিহিত রমণী। ফজল মাঝি সন্দেহ প্রকাশ করলে পারানির কড়ি আরও বাড়িয়ে দেয় ইয়াছিন। আর ফজল মিঞাও ভাসিয়ে দেয় সাধের তরণী। কিন্তু ক্রমশ ইয়াছিন আর রমণীর বাক্যালাপ, ছনের ভিতর ধস্তাধস্তি ফজল মাঝির বুকে ঝড় তোলে। এরপর যখন তীব্র গলায় চিৎকার করে আর্ত নারীটি সাহায্য প্রার্থনা করে বলে ওঠে- "আমারে বাচাও মাঝি, বাচাও। আমার সব্বনাশ কইরা ফালাইল"[৭] তখন আর স্থির–অবিচল থাকতে পারে না মুসলিম মাঝি। জাগ্রত হয় তার অন্তর্নিহিত পৌরুষ। গল্পকারের ভাষায়- "শিরায় শিরায় রক্তস্রোতে কী বিস্ফোরণ ঘটে গেল ফজলের।...হৃৎপিণ্ডের ওপর কী এক প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল অতর্কিতে"[৮] আর অজ্ঞাতসারেই ফজলের হাতের থাবা থেকে কোঁচটা সাঁ করে ছুটে এসে বিদ্ধ করে দুঃশাসনরূপী ইয়াছিনকে। জাতভাই বলে ধর্মের জিগির তুলে সে কিন্তু ইয়াছিন মিঞাকে বরদাস্ত করেনি। নরপিশাচ, নারীলোলুপ ইয়াছিনের হাত থেকে রমণীটিকে উদ্ধার করে প্রকৃত ত্রাতার ভূমিকা পালন করে ফজল। শুধু তাই নয় নারীটিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে চাইলে সে জানতে পারে নারীটি হিন্দু তাঁতি বাড়ির বউ, দাঙ্গায় তার স্বামীকে হত্যা করে তাকে লুঠ করে জোর করে নিজের বিবি বানাতে চেয়েছিল শয়তান ইয়াছিন। আর এই প্রেক্ষাপটে আপাত দৃষ্টিতে ফজল মাঝি খুনী, হত্যাকারী হলেও তার এই নিকেষ কর্ম, খুন পাপ নয়- পবিত্রতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পশু শক্তিকে ধ্বংস করাই মানবের পবিত্র কর্তব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নোয়াখালি দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী মিস মারিয়ান লিস্টারের উক্তি- "দুর্দশা সবচেয়ে শোচনীয় ছিল নারীদের। এদের মধ্যে অনেককেই স্বচক্ষে আপন স্বামীকে নিহত হতে দেখতে হয়েছে এবং তারপর বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত হবার পর স্বামীর হত্যাকারীদেরই কোন একজনকে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়েছে।"[৯] কাহিনির অন্তিমে ফজল মিঞা চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মানবিকতার পরাকাষ্ঠা রূপে যখন দেখি নিজের ও সলিমার যৌথলালিত স্বপ্নের মূল্যের বিনিময়ে সে অসহায়, নিঃসম্বল বিধবা নারীটিকে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। অপমৃত্যু ঘটে একটি আশার, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত হয় মনুষ্যত্বের দীপশিখা। তবে কেবল ভিনধর্মী এক নারীর ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হয় না ফজল, ব্যক্তিগত প্রেম-প্রত্যাশা-প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সংকীর্ণ বৃত্তের জাল ছিন্ন করে (পুরুষ)মানুষ হিসেবে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ফজল। অস্ত্রে শান দেওয়ার প্রতীক সেই ভাবনাকেই জয়যুক্ত করে।

'চর' গল্পে আছে দেশভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ('৫০) বিষাক্ত পটপরিবেশে ভিনধর্মের লোভী, কামার্ত পুরুষ কর্তৃক নিরন্তর নারীধর্ষণের ও হত্যার ষড়যন্ত্রের কুখ্যাত ইতিহাস। গল্পের পটভূমি পূর্বপাকিস্তান। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সিদ্ধান্তই যখন চূড়ান্ত হয় তখন সকল মুসলিমকে পাকিস্তানে এবং সকল হিন্দুকে ভারতে স্থানান্তরিত করলেই সমস্যার সমাধান হত, কিন্তু নেতাদের উদারতায় পাকিস্তানে

হিন্দু ও শিখদের অবস্থান এবং ভারতে মুসলিমদের অবস্থান 'সংখ্যালঘু' হিসেবে স্থিরীকৃত হয়। অন্যদিকে সংখ্যাগুরুর দাপটে ক্রমশ কুঁকড়ে যেতে বাধ্য হয় এই সংখ্যালঘুর দল। অত্যাচারে, নির্যাতনে- নিরাপত্তাহীনতায় বাধ্য হয় সীমান্ত ত্যাগে, গণপ্রবজনে। ১৯৫০-এর সেই ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতিচারণ করে গল্পের নায়িকা সুখী- "তখন চারিদিকে দাঙ্গা চলছে। শুধুই রক্তপাত, ধর্ষণ, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। দেশটা দু'টুকরো হয়ে গেছে। হাজারে হাজারে ভয়ার্ত মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে-হিন্দুস্থানে।"[১০]গল্পের কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র সুখী হিন্দু তাঁতি ঘরের সন্তানহীনা বিধবা। সারাদিন মাকু চালিয়ে গামছা বুনে, মোটা কাপড় বুনে স্বাধীন, স্বাবলম্বী জীবন অতিবাহিত করত সুখী। কিন্তু এই দাঙ্গার সুযোগে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়ে সুখীকে অপহরণ করে এনে একটি ভাঙা বাড়ির ভিতর আটকে রেখে এক বছর ধরে লাগাতার রাতের পর রাত, দিনের পর দিন তাকে ধর্ষণ করে নিজের কামলিপ্সা চরিতার্থ করে লম্পট কামুক মহাজন মুসলিম ছদন শিকদার। আর অবৈধ সঙ্গমের দরুন সুখী গর্ভবতী হয়ে পড়লে 'পাপ' বিদায় করতে চেয়ে মাঝি তমিজ আর হালিমকে বহাল করে সে সুখীর লাশ কেটে ম্যাঘনার জলে ভাসিয়ে দিতে। এভাবেই দাঙ্গার দিনে শত শত মানুষরূপী জানোয়ারের জিভ লকলকিয়ে উঠেছিল। চিরকালই 'ধর্ম'যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয় নারীর দেহ। লাম্পট্য, নারীলুণ্ঠন ও ধর্ষণ। কিন্তু প্রফুল্ল রায় এ গল্পেও 'তারিণী' (পরিত্রাতা) রূপে হাজির করান মাঝি ভাইদের। যে দরিদ্র মাঝি ভাইদের পয়সার লোভ দেখিয়ে পোয়াতি নারীহত্যার 'সুপারি' দিয়েছিল ছদন, সেই দুই মাঝি ভাই তমিজ আর হালাম নিজেদের জীবন বাজি রেখে সুখীকে রক্ষা করে। এতদিন ধলাকর্তার কথায় সর্বোপরি পেটের জ্বালায় নানা অপকর্ম করলেও আজ তমিজের অন্তরে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটে বলেই সে হালিমের উদ্দেশ্যে তীব্র বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে বলে ওঠে- "তুই মানুষ না আর কি!...তুই মাইয়ামাইনষেরও বেহদ্দ হালিম।"[১১] শুধু তাই নয় সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- না না, নিজের হাতে আমি মাইয়ামানুষ খুন করতে পারুম না। হেয়া ছাড়া ও পোয়াতি।"[১২] তমিজ এবং হালিমের আন্তরিক শুভবুদ্ধি চেতনার জাগরণে নতুন জীবন পায় অন্তঃসত্ত্বা সুখী, চরের বুকে শুরু হয় সদ্যোজাতকে নিয়ে তার নবজীবন। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে প্রফুল্ল রায় বহুবার সাক্ষাৎ পেয়েছেন এমন প্রকৃত মানুষদের, মাঝিমাল্লাদের। তাঁর 'জলে স্থলে আকাশতলে' নামক স্মৃতিচারণমূলক গদ্যকবিতায় দেশত্যাগ করে সীমান্তের এপারে আসার মুহূর্তের যে অনুভূতিরাজি তিনি সজ্জিত করেছেন তাতেই উঠে আসে সেই 'চৈতন্যবান মানব'দের কথা- " সে কি অলীক কোনও ভোর, কুয়াশাবিলীন/ উনিশ শ' আটচল্লিশ/ ...দু মাল্লাই নৌকার ছইয়ের ঝাঁপ বন্ধ/ এক গলুইতে রাজেক, আর-এক গলুইতে তমিজ- দুই ভাই/ শা জোয়ান মাঝি তারা, বুকে পাথরের পাটা,/ বৈঠা টানছে অবিরাম/ ...পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘাতকের দল/ হিংস্র উল্লাসে হাঁকে, 'কি রে মাঝি,/ ক্যাঠা আছে তোগো নায়- হিন্দু নিকি?/ তাদের উঁচানো মুঠিতে ট্যাটা বর্শা রামদা-/

এমনি প্রাচীন আয়ুধ/...তমিজ রুখে ওঠে, 'সুমুন্দির পুতেরা, নায়ে আছে/ তোগো বাপেরা-'/ রাজেক হুংকার দেয়, 'ভাগ হালারা, ভাগ।/ নাইলে কলিজা ফাইড়া ফালামু-"[১৩]লক্ষণীয় এখানে আক্রমণকারীরা মুসলমান হলেও রক্ষাকারীরাও মুসলমান। নৌকার মধ্যে থাকা আতঙ্কিত হিন্দু যাত্রীদের পারের কাণ্ডারী। "কালান্তরের কালে ওপার বাংলার মুসলমানরা যে কেবল লুণ্ঠনকারী শক্তি ছিল না হিন্দু উদ্বাস্তুর রক্ষাকারীও ছিল – সেই কালান্তক ঐতিহাসিক জীবনসত্যের রুপায়ণে"[১৪] প্রফুল্ল রায় একজন ঐতিহাসিক দায়বদ্ধ শিল্পী।

উলটপুরাণ

দাঙ্গা-দেশভাগ বিষয়ক বাংলা গল্পের প্লট যেখানে মূলত পূর্ব সীমান্তেই আবদ্ধ, সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংকট, উৎপীড়ন, দেশত্যাগের মত ঘটনাই যেখানে মুখ্য সেখানে প্রফুল্ল রায় ভারতভাগের কথাকার। তাঁর গল্পে বিহার সহ ভারতবর্ষের বিবিধ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দরুন হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হওয়া সংখ্যালঘু মুসলিমদের সংকটের ছবি অঙ্কিত হতে দেখি। **'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী'** গল্পের পট উত্তর বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম হেকমপুরা। 'পৃথিবীর হট্টগোল থেকে বহুদূরে, তুচ্ছ হেকমপুরা টাউনটা জুড়ে অগাধ শান্তি' বিরাজ করত '৪৬ এর আগস্টের কয়েকমাস আগেও। পূর্বে অবশ্য ১৯৪২-এ একবার উত্তাল হয়ে উঠেছিল হেকমপুরা-বারহৌলি সহ বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। আকাশ বাতাস তখন 'আংরেজ ভারত ছোড়ো' স্লোগান ধ্বনিতে মুখরিত থাকত। কারণ স্বরাজের দাবিতে 'গানহীবাওয়া' আগস্ট আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তারপর আবার এই '৪৬ এ পুনরায় শান্তি বিঘ্নিত হয় হেকমপুরা টোনের। এবারের খবর –"অনেক দূরে কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, দিল্লি, পাঞ্জাব আর কোথায়ই বা লাহোর- এই সব জায়গায় নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে। রোজ কত মানুষ যে খুন হচ্ছে, কত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কত যুবতী মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে, তার নাকি লেখাজোখা নেই...আরো শোনা যাচ্ছিল, দেশটা নাকি দু'টুকরো হয়ে যাবে। এক ভাগ হবে হিন্দুর, আর এক ভাগ মুসলমানের।"[১৫] আর সেই ধ্বংসলীলার রেশ ধরেই বিহারের এই নগণ্য টাউনে এসে পৌছায় দাঙ্গার উত্তেজনা। হেকমপুরা টাউন এলাকাটি মূলত হিন্দু বিহারী অধ্যুষিত, মুসলিমরা এখানে সংখ্যালঘু। তবু এতদিন পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে জড়িয়ে থাকতে তাদের খুব একটা অসুবিধে হয়নি। কিন্তু দাঙ্গার আঁচে আজ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দৃষ্টি জুড়ে কেবল সন্দেহের বিষ আর প্রতিহিংসাপরায়নী মানসিকতা। হেকমপুরা টোনের প্রভাবশালী জমিদার গৈবীনাথ মিশ্রর মতো দুর্বৃত্তদের উদ্যোগে শহরে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রচার শুরু হয়, তাদের একটাই বক্তব্য- "কলকাতা নোয়াখালি লাহোরের বদলা নিতে হবে। দাঁতের বদলে দাঁত, খুনের বদলে খুন চাই।"[১৬]এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখিত- "বিহার দাঙ্গায় মদত দিয়েছিল হিন্দু জমিদারশ্রেণি আর হিন্দু মহাসভার প্রচার।"[১৭] হাজার হাজার উন্মত্ত হিন্দুজনতা অস্ত্রশস্ত্রসহ একতরফাভাবে আক্রমণ চালায় মুসলমানদের

ওপর। শহর জুড়ে রক্তের বান ডাকে। অগ্নিসংযোগ করা হয় মুসলমান পাড়ায়। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আকাশ-বাতাস যখন কলুষিত তখন দাঙ্গা বাধাবার জন্য জমিদারের পক্ষ থেকে ডাক পড়ে গল্পের নায়ক ধুন্নিলালের। কারণ ধুন্নিলাল এই শহরের সবচেয়ে সেরা বন্দুকবাজ এবং গৈবীনাথ মিশ্রের কর্মচারীও বটে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সময়ে যখন এতদিনের সাদাসিধে, নিরীহ, ভীরু মানুষগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে মারাত্মক এক একজন হত্যাকারী তখন ধুন্নিলালের মত দরিদ্র, অচ্ছুৎ হিন্দু ধুন্নিলাল ভিনধর্মের নিরীহ, নির্দোষ মানুষের প্রতি তার আন্তরিক মমত্ব বজায় রাখে। ছোটবেলার বন্ধু মৃত রাশেদের বৃদ্ধ পিতা জমিরুদ্দিন ও তার নাতনি আসমাকে এই সংকট মূহুর্তে সে নিজের বাড়িতে গোপনে আশ্রয় দেয়, আশ্বস্ত করে, ভরসা দেয়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসেও দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু সুতারা আশ্রয় পায় মুসলমান তমিজউদ্দিন আহমেদের বাড়িতে। কিন্তু যখনই সে খবর ছড়িয়ে যায় তখনই সংকট নেমে আসে জমিরুদ্দিন সহ ধুন্নিলালের পরিবারের ওপর। হেকমপুরার উন্মত্ত, দুর্বৃত্তের দল, ঘাতকবাহিনী যখন এগিয়ে আসে তার বাড়ির দিকে তখন ঘোড়া আর বন্দুক এই দুই সঙ্গীকে হাতিয়ার করে বছর পঞ্চাশের ধুন্নি অন্তর্নিহিত শৌর্য-বীর্য ও মানবিকতার পরিচয় দেয়। চরম সর্বনাশের হাত থেকে জমিরুদ্দিনদের উদ্ধার করতে নির্বিঘ্নে তাদের নিকটবর্তী রিলিফ ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে নিজের ও কন্যার জীবনের তোয়াক্কা না করে, জাতভাইদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে তাকে বলতে শুনি- "হোঁশিয়ার, গোলি মারকে সিনা ফোঁড় দুঙ্গা-"[১৮]অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসের নায়ক বিলুর অনুভবের সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে পারি- "মানুষই মানুষকে ভালোবাসে। মানুষই মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে। আবার আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়।"[১৯]গৈবীনাথের মতো বড়ো বড়ো ধনকুবেররা যখন দাঙ্গা বাধায়, সংকীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে প্রশয় দেয় তখন ধুন্নিলালের মতো সাধারণ মানুষরা বিপত্তারণ রূপে মানবতার পবিত্র ধর্ম রক্ষা করে।

'গন্তব্য' গল্পেও উঠে এসেছে বিহারের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ, দাঙ্গার তমসাঘন পট-পরিবেশে মনুষ্যত্বের জাগরণ। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ঘোর নিষ্ঠাবান শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ জনকলাল মিশ্রজী। ব্রাহ্মণত্বের যাবতীয় গোঁড়ামি, জাতপাতের সংস্কারের কট্টর ধারক ও বাহক তিনি। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে যিনি চাকরি-বাকরি না করে আজীবন যাগযজ্ঞ, পূজা, শাস্ত্রপাঠ করেই জীবন নির্বাহ করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ তাই সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। জগৎসংসারে একমাত্র মেয়ে পার্বতী ছাড়া তার আর কেউ নেই। সেই মেয়ে কিনা পণের অত্যাচারে শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিতা, অত্যাচারিতা। তাই বাবা হয়ে মেয়েকে বাঁচাতে জনকলাল যজমানদের দাঙ্গা বিষয়ক আগাম সর্তকতাকে তুচ্ছ করে দক্ষিণা বাবদ প্রাপ্ত সাত হাজার টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে মোটর গাড়িতে করে চলেন নহরপুরা উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথে তিনি দাঙ্গা ও দাঙ্গাবাজদের তাণ্ডবলীলা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু খুব দ্রুত এই অগ্নিগর্ভ এলাকা পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে

এক যুবকের ভীত কণ্ঠের কাতরধ্বনি- 'বঁচাইয়ে পণ্ডিতজি, হামনিলোগকো বঁচাইয়ে-' জনকলালের চেতনাস্রোত ছিন্ন করে। অসহায় এক মুসলিম দম্পতি উৎকট উল্লাসে মদমত্ত একদল নরপিশাচদের হাত থেকে বাঁচতে পণ্ডিতজির স্মরণাগত হয় এই আশ্বাসে যে 'দুনিয়ার সব আদমি জানে পণ্ডিতজি মেহেরবান।' কিন্তু তারা বোধহয় পড়তে পারেনি মিশ্রজীর মনের ভাষা। কারণ সেই মুহূর্তেও পণ্ডিতজির হৃদয় সংকীর্ণতায় আবিল। ভিনধর্মের দুই অপরিচিত যুবক-যুবতির স্পর্শ সান্নিধ্যে এতটা পথ পাড়ি দেওয়ায় চিন্তায় সারা শরীর কুঁকড়ে আসে জনকলালের। যদিও বিহ্বল ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে নিঃসংকোচে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেন জনকলালজি। শুধু তাই নয় যাত্রাপথে আরো বেশ কয়েকবার দাঙ্গাকারীদের মুখে পড়েওই দম্পতির প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে সর্বস্বহারা হন মিশ্রজী। এর দরুন নিজের কন্যার নিরাপত্তার বিষয় ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেও "নিজের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন ছেলেমেয়ে দু'টোকে বাঁচাবেন। জীবনে কখনও সংকল্পের নড়চড় হয়নি তাঁর।"[২০]গল্পের অন্তিমেও দেখি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি এগিয়ে চলেন ছওরপুর রিলিফ ক্যাম্পের পথে। গন্তব্যের অভিমুখ পরিবর্তন করে নেন। এতকাল সমাজ ও আচারের যে মূঢ় নাগপাশে আবদ্ধ ছিল পণ্ডিতজির মন, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ধ্বংসভূমিতে তা নতুন ভাবনায় পুনরুজ্জীবিত হয়। বৃহত্তর কল্যাণচিন্তায়, মানবসেবায় ব্রাহ্মণ জনকলাল জাত-পাতের সংকীর্ণ 'ছোট আমি'কে অতিক্রম করে 'বড়ো আমি'কে জয়যুক্ত করেন।

অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন- "যখন মানুষের ভিতর থেকে অমানুষেরা জেগে ওঠে, তখনও কিন্তু মানুষ থেকে যায়।"[২১]প্রফুল্ল রায়ের এইসব মানবিক কাহিনির কুশীলবরা নিতান্ত হিন্দু ছিল না, নিতান্ত মুসলিম ছিল না, একেবারে মানুষ ছিল। এই মানুষই ফজলের মত মানুষ, তমিজের মত মানুষ, ধুন্নিলাল কিংবা জনকলালের মত মানুষ যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিধর্মীদের নির্গমন পথের নিরাপত্তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

মায়েদের কোনো জাত হয় না

'কিছুক্ষণ' গল্পের সূচনায় লেখক জানান- "দিন সতেরো আগে এ অঞ্চলে বড় রকমের দাঙ্গা হয়ে গেছে। পাঁচ ছ'টা গাঁ ভেঙ্গেচুরে জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জখম হয়েছে বিস্তর,...জ্বালিয়ে দেওয়া গাঁয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে হাজারের মতো সন্ত্রস্ত, দিশেহারা, অসহায় মানুষকে তুলে এনে ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।"[২২]- গল্পের পটভূমি উত্তর বিহারের 'মাধোপুরা রিলিফ ক্যাম্প'। প্রেক্ষাপট '৪৬ এর ভয়াবহ দাঙ্গা। যে দাঙ্গার প্রমত্ততা বাস্তবিকেই অনেককে স্তম্ভিত করে। ডা. মাহমুদের হিসাবে ৩.৫ লক্ষ মুসলিম পরিবার উদ্বাস্তু হয় বিহারের দাঙ্গায়।[২৩] মাধোপুরা রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয়প্রাপ্ত শরণার্থীরা মুখ্যত মুসলমান তবে ভিন্ন চরিত্রবৈশিষ্ট্যের। কেউ উগ্র সাম্প্রাদায়িক কেউ দৃঢ়চেতা আবার কেউ বা রফিকের মত সাদাসিধে আর ভালমানুষ গোছের। নওশেরগঞ্জের বাসিন্দা রফিক আর তার বিবি ফরিদা শিশুপুত্র সহ আশ্রয় নিতে বাধ্য

হয় ক্যাম্পে, কারণ তাদের গাঁ-য়ে অগ্নিসংযোগ করে মানুষ মারার নৃশংস পাশবিক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় দুর্বৃত্তরা। রিলিফ ক্যাম্পটা কাঁটাতারে ঘেরা, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের কড়া নিরাপত্তা বলয়ে আচ্ছাদিত। পাছে ক্যাম্পের ওপর হামলা হয় তাই এর ত্রিসীমানায় বহিরাগতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ক্যাম্পের শরণার্থীদের জীবনও বন্দির মতো, চলাফেরার স্বাধীনতা নেই। কয়েদিদের ন্যায় এমন আটক থাকতে ভাল লাগে না ফরিদার, দৃষ্টি তার করুণ। ইতিমধ্যে একদিন বিহারের প্রত্যন্ত গাঁ-গঞ্জের একদল ভুখা, নাঙ্গা আদমি-অওরত বন্যাপীড়িত হয়ে সর্বহারা উদভ্রান্তের মত একটা কাজের খোঁজে বেরিয়ে ত্রাণশিবিরের একেবারে গায়ে এসে পড়লে রীতিমত হুলস্থূল বেধে যায়। উত্তেজনা ছড়ায় ক্যাম্পবাসী ও সি আর পি ফোর্সদের মধ্যে। হামলাকারী রূপে সন্দেহের বশে ‘ভূচ্চরের ছৌয়া’গুলোকে ভাগাতে চায় পুলিশ, যদিও তাদের কাতর আবেদনে শেষমেষ কাজ হয়। সাময়িক বিশ্রামের অনুমতি মেলে। এই দলের এক দম্পতি গণুয়া আর লছিমা। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্তির ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে। সাতদিনের অন্তহীন পরিক্রমায় তারা প্রায় চলচ্ছক্তিহীন। আর তাদের রোগা হাড়গিলে শিশুটা অসহ্য খিদের জ্বালায় ‘চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে’ আকাশ-বাতাস বিদারিত করতে থাকে। লছিমাকে লাথি মেরে, খিমচে ধরে বিধ্বস্ত করতে থাকে। হবে নাই বা কেন? মা’র বুক যে মরুভূমি প্রায় শুষ্ক, শিশুটি যে অমৃত সুধারস পানে বঞ্চিত, তিনদিন ধরে আটাগোলা জল খাইয়েও তাই তাকে নিবৃত্ত করা যায় না। অসহায় ক্রন্দনরতা লছিমা তাই প্রবল যন্ত্রণায় স্বামীর উদ্দেশ্যে জানায়- “গলা আর টিপতে হবে না। ওর জন্যে যদি কিছু জোগাড় করতে না পার, আজই ওর মৌত (মৃত্যু) হয় যাবে।”[২৪] কিন্তু কি করবে নিঃস্ব বাবা! গরিবি, উপোস দেওয়া- এই তো তাদের মত অচ্ছুত প্রান্তিক ক্ষেতমজুরদের নিয়তি। এই গণুয়ার সাথে বেশ আলাপ জমে যায় ফরিদের কারণ ক্যাম্পের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিমদের কাছে যখন গণুয়ার ব্যক্তিগত চরিত্র পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বিরাট হয়ে দেখা দেয় তার ধর্মপরিচয়, প্রচন্ড ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হয়ে যারা বলতে থাকে ‘ওর কসুর নেই। লেকেন ওর জাতভাইরা তো আমাদের গাঁ জ্বালিয়েছে, মানুষ মেরেছে’ সুতরাং ও আমাদের জানি দুশমন, তখন রফিক-ফরিদার মত অসাম্প্রদায়িক দম্পতির চোখে তারা কেবল তাদেরই মত এক ‘গরিব দুখি আদমি’-অওরত, এক অসহায় পিতা-মাতা। তাই তো লছিমার সন্তানের দুধ-মা হয়ে উঠতে ফরিদার এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। ক্ষুধার্ত শিশুর কাতর আর্তি ফরিদার বুকে মোচড় তোলে কারণ সেও তো একজন মা। আর মায়েদের কোনও জাত-ধর্ম হয় না। মায়েদের একমাত্র ধর্ম মাতৃত্ব। যে মাতৃত্ববোধে উজ্জ্বল চরিত্র ফরিদা। গল্পের শেষে দেখি দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মুসলমান রফিকের স্ত্রী ফরিদা দাঙ্গাকারী হিন্দু জাতির প্রতিনিধি গণুয়ার মৃতপ্রায় শিশুকে স্তন্যপান করিয়ে ধর্মীয় ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, কাঁটাতারের বেড়ার ঊর্ধ্বে মাতৃত্বের জয় ঘোষণা করে। সাম্প্রদায়িকতার কালো অন্ধকারেও এমন মিলন দৃশ্য, এমন মুহূর্ত পাঠকের চোখে জল এনে দেয়।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পাঁচ দশক পরেও অবসান ঘটে না সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি আর বিশ্বাসহীনতার। সন্ত্রাস, জঙ্গি হামলার আতঙ্ক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সব মিলিয়ে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও ভারতবর্ষ যেন এক বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রফুল্ল রায়ের **'ভারতবর্ষ'** গল্পটি। **১৯৯২** সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুনরায় উত্তাল হয় দেশ। যা জন্ম দেয় আতঙ্কবাদের। বোম্বের পটভূমিতে লেখা 'ভারতবর্ষ' গল্পে গল্পকার জানান- "গত মাসে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় পরপর ব্লাস্ট ঘটানো হয়েছে বম্বেতে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। হত্যা, আগুন, অবাধ লুঠতরাজ। সেই দাঙ্গা এখনও চলছে। ভয়াবহ আকারে, দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে নতুন নতুন এলাকায়। মহানগর এখন জ্বলছে।"[২৫]-এই বিস্ফোরণে স্বামীকে হারিয়ে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র মারাঠি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বিধবা সুমিত্রা তলোয়ারকার যখন শোকবিহ্বল তেমনই একদিন ঘাতকবাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে 'ভয়ার্ত ইঁদুরের মতো' তাড়া খাওয়া এক গরিব দিনমজুর বৃদ্ধ মুসলিম জহিরুল তার বছর উনিশের আসন্ন প্রসবা পুত্রবধূ আমিনাকে নিয়ে জান বাঁচাতে প্রবেশ করে সুমিত্রাদের বাড়ির বাগানে। কারণ বম্বে তখন হননকারীদের দখলে। হিংস্র আদিম জন্তুর দল দঙ্গল বেধে শিকারের খোঁজে মত্ত, তাদের হাতে লোহার ডাণ্ডা, বর্শা, তলোয়ার, বন্দুক এমনকি বিরাট দা। প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সুমিত্রা জহিরুলদের ঘরে তোলে শুধু তাই নয় ঘাতকবাহিনী তাদের খুঁজতে এলে সে মিথ্যে কথা বলে তাদের ফেরত পাঠায়। অশোক মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় জানান, হত্যাকান্ডের ভয়ঙ্কর দুর্যোগের দিনেও মানবিক গুণের প্রকাশ ব্যত্যয় হয় নি- "সবথেকে সাহস ও প্রাণভয় বিসর্জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন মহিলারা। অন্য সম্প্রদায়ের পরিবারকে অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়ে বাড়ির কর্ত্রী সদর দরজা আগলে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে হামলাকারীদের দরজার চৌকাঠ থেকে হার মেনে চলে যেতে বাধ্য করেছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।"[২৬]কাহিনি পরম্পরায় দেখি জহিরুল তার পুত্রবধূকে রেখে পরিবারের অন্যান্যদের খোঁজে বেরিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না, পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে জহিরুল লাশ হয়ে গেছে। কিন্তু আমিনা? কি হল তার? জহিরুলের পক্ষে যে আর কোনোদিন ফেরা সম্ভব নয় তা অনুমান করতে পেরে এতকালের ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার, গোঁড়ামির আবরণ ছিঁড়ে ফেলে সুমিত্রা হয়ে ওঠে মুসলিম কন্যার 'মা'জি। সে নিজেও কন্যার মা, গর্ভবতী মেয়েদের কাছে মা যে কতবড় ভরসার স্থল তা অনুভব করে প্রসব যন্ত্রণার এই কঠিন সময়ে সুমিত্রার মন আমিনার প্রতি মায়ায় ভরে ওঠে। সন্তানস্নেহে তার ব্যথা ভোলাবার চেষ্টা করে সে। দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কের প্রহর পেরিয়ে অবশেষে আসে নবজাতকের জন্মের খুশির খবর। কিন্তু খুশি হতে পারেনা সুমিত্রা! সেভাবে এ পৃথিবীকি আদৌ শিশুর বাসযোগ্য? ভারতবর্ষে কী ভবিষ্যত আমিনা ও তার সদ্যোজাতের? দায়মুক্ত হয় না সুমিত্রা বরং আরো গভীরতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমিনার

সাথে তার। রবিকবির গানের সুরেই মন বলে ওঠে- 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।' জাত-পাতের ঊর্ধ্বে এ গল্পেও জয়ী হয় মাতৃত্ব। সুমিত্রা হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের প্রকৃত মুখ।

প্রফুল্ল রায় মানবতাবাদী। তাই তাঁর গল্পে অনুরণিত হয় দাঙ্গাবিরোধী সুর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা। অনেক ভাঙনের পরেও শেষ অব্দি বেঁচে থাকে মনুষ্যত্ব। সমাজের শুভবোধ সম্পন্ন মানুষের সুষ্ঠ মানসিকতা। আশা জাগে এখনো সূর্য উঠতে পারে। স্বামীজী বলেছিলেন – "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমায় মানুষ কর।"[২৭]মানুষ অর্থে চৈতন্যবান হওয়া। যে চৈতন্যের জাগরণে বন্ধ হবে দাঙ্গা, যুদ্ধ, হিংসা, হানাহানি। প্রফুল্ল রায়ের গল্পে সেই 'চৈতন্যবান মানব'দের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, প্রফুল্ল, নভেম্বর ১৯৯৯, 'বিন্দুমাত্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-৫৭

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ ১৩৫০, 'পরিশেষ', কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃ-১৫৫

৩. রায়, প্রফুল্ল, এপ্রিল ২০২৩, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রসঙ্গত

৪. দাশ, জীবনানন্দ, মে ১৯৫৪, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', কলকাতা, নাভানা, পৃ-১২৬

৫. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "মাঝি", পৃ- ১৫৩

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, বইমেলা ২০০৭, 'দেশভাগ দেশত্যাগ', কলকাতা, অনুষ্টুপ, পৃ-৬৩

৭. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "মাঝি", পৃ- ১৫৮

৮. তদেব, পৃ-১৫৮-১৫৯

৯. সিকদার, সুকুমার, ২৮ জুলাই ২০০১, 'বাংলা ভাগের দায়ভাগ কাদের কাঁধে চাপাব', চিঠিপত্র, কলকাতা, 'দেশ', পৃ-১৪

১০. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "চর", পৃ-১৮৩

১১. তদেব, পৃ-১৭৮

১২. তদেব

১৩. রায়, প্রফুল্ল, বইমেলা ২০১০, 'প্রফুল্ল রায় ৭৫', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ৫২৭-২৮

১৪. হোসেন, সোহারাব, ২০১৭, 'সংগ্রামশীল নিম্নবর্গের দ্বিতীয় পৃথিবী হয়ে উঠেছে প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প', দ্র. অমর দে (সম্পা), 'গল্পসরণি'(প্রফুল্ল রায় বিশেষ সংখ্যা), পৃ- ১৩৪

১৫. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী", পৃ-১৬১

১৬. তদেব, পৃ-১৭০

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, জানুয়ারি ২০০০, 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা', কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, পৃ-৬৮

১৮. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী", পৃ-১৭৭

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, ২০০১, 'মানুষের ঘরবাড়ি', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, পৃ-৮৮

২০. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "গন্তব্য", পৃ-১৯৬

২১. সিকদার, অশ্রুকুমার, ডিসেম্বর ২০০০, 'ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, সাহিত্যলোক, পৃ-৮৪

২২. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "কিছুক্ষণ", পৃ-১৯৭

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা', পৃ-৬৯

২৪. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "কিছুক্ষণ", পৃ-২০০

২৫. রায়, প্রফুল্ল, 'দাঙ্গা দেশভাগ এবং তারপর', "ভারতবর্ষ", পৃ-২৪৬

২৬. মিত্র, অশোক, ১৯৫৯, 'তিনকুড়ি দশ'(দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-২৯৩-৯৪

২৭. স্বামী বিবেকানন্দ, ১৩১২, 'বর্তমান ভারত', কলকাতা, উদ্বোধন কার্য্যালয়, পৃ-৬৫।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত ছোটগল্প : নারী ভাবনার আলোকে

রিয়া সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রপরবর্তী লেখক যাঁরা মূলত কল্লোল যুগের সময়পর্বে আবির্ভূত তাদের মধ্যে অন্যতম এবং ব্যতিক্রমী একজন গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। অপরদিকে তাঁর জন্ম যেহেতু দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় সেহেতু এই সময়পর্বের একটা প্রতিফলন তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেশিরভাগ গল্পই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের গল্প। ফলত সেই রকম কিছু গল্প পাই যেখানে, মধ্যবিত্ত নারী চরিত্রগুলির জীবনের বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলন রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারীজাতি তাদের স্বাধীনতার রসদ খুঁজে পেতে কোন কোন সময় প্রতিবাদী হলেও, অবশেষে তাদের প্রতিবাদ- বঞ্চনা ও ব্যর্থতায় পরিণত হয়। আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আজও নারীদের ঘরবন্দী করে রাখতে চায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্পগুলিতে নারী ভাবনার যে বিচিত্র দিক দেখিয়েছেন সেগুলিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ: প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারী ভাবনা, বিংশ শতাব্দী, কল্লোল যুগ, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত।

মূল প্রবন্ধ:
'নারী' এই শব্দটি শুনতে ছোট হলেও এর অর্থ ব্যাপক। নারীজাতির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সেই ভ্রুণাবস্থা থেকেই। নারী ধরা দিয়েছেন কখনও জননীরূপে, কখনও ভগিনীরূপে, কখনও প্রেয়সী আবার কখনও বা সহধর্মিণীরূপে। বর্তমান সমাজে নারী ভাবনার বিকাশ ঘটলেও, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যদি একবার চারপাশে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব নারীর প্রতি সমাজের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক যুগে এসে নারীরা অপমান, অবমাননা, অবহেলার বিপক্ষে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেও পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সর্বাংশে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি, এখনও তাদের ওপর চলে নির্যাতন।

বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার। যাঁর গল্পগুলির মধ্যে নারী ভাবনার বিবর্তনের বিভিন্ন দিক দেখতে পাই। যেখানে কোন নারী কুসংস্কারের বেড়াজাল কেটে কিভাবে বেরিয়ে আসছে, আবার কেউ কেউ নিজের জীবন রক্ষার জন্য অসৎ পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে তার স্পষ্ট ছবি দেখতে পাই। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বাংলা ছোটগল্প যাঁদের কলম ধরে নতুন পথে পা বাড়াচ্ছিল আরও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী।

তাঁর জন্ম দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়। এই বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভাঙ্গন ও বিপর্যয় কল্লোল যুগের লেখকদের গড়ে তুলেছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন এই গোষ্ঠীর লেখক, ফলে তাঁর গল্পগুলিতে দেখতে পাব মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, পারিবারিক দাম্পত্য কলহ এবং দুর্ভিক্ষের ছবি। -"মেয়েদের আত্মজীবনী মাত্রেই এক হিসেবে নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙ্গার প্রয়াস। কিন্তু নিম্নবর্গের মেয়ের ক্ষেত্রে তো সে নীরবতার পর্দা বহুগুণ বেশি নিরেট। তাইতো ভেঙে ফেলতে পারা এতটাই বিস্ময়কর।"[১] প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই বিস্ময়কর কাজটিই করেছেন। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে নারীদের ভাবনাকে কিভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন সেই দিকগুলিই দেখতে পাব।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাগরসঙ্গমে' গল্পে দুটি মুখ্য নারী চরিত্র তিনি এঁকেছেন যারা একে অপরের বিপরীত। একজন সংস্কার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে জীবন অতিবাহিত করতে চায় আর অন্যজন যাকে সভ্যসমাজ মেনে নিতে নারাজ, নীচু জাতের মেয়ে বলে যে পরিচিত। গল্পের প্রথমেই আছে গঙ্গাসাগর তীর্থ করতে যাওয়ার ঘটনা, যেখানে দাক্ষায়ণীর পরিচয় পাচ্ছি এইভাবে – "কিন্তু দাক্ষায়ণী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহে। পাড়ার ডাকসাইটে তেজী মেয়ে মানুষ বালিকা বয়সে বিধবা হইবার পর লোকে তাঁহার অননুকরণীয় নিষ্ঠা ও ধর্মাচারণের জন্য শ্রদ্ধা যতখানি করে, তাঁহার প্রচণ্ড মুখের ধারাকে ভয় করে তাহার চেয়ে অনেক বেশি।"[২] - অর্থাৎ এর থেকে বুঝতে পারছি দাক্ষায়ণী নিজের ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং সংযমশীল একটি চরিত্র। অন্যদিকে আট বছরের ফুটফুটে বাতাসি চরিত্রটি যে সমাজে পরিচয়হীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাকে স্পর্শ করলে অশুচি হয়ে যাবে এই ভাবনা দাক্ষায়ণীর। প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মের পট্টি এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে ধর্মের বাইরে সবকিছুকে অপবিত্র মনে করছে মানুষ। গল্পে দেখতে পাই পরিচয়হীন আট বছরের ছোট্ট বাতাসিকে ঘৃণা করছেন দাক্ষায়ণী। 'সাগরসঙ্গম' গল্পে ডুবে যাওয়া যাত্রী বোঝাই নৌকাটি থেকে একমাত্র দাক্ষায়ণী ও বাতাসিকেই বাঁচানো যায়। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র দাক্ষায়ণীকে এতটাই কঠোর ভাবে দেখিয়েছেন যে নীচু জাত বলে বাতাসিকে না বাঁচিয়ে ফেলে চলে আসছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে দেখতে পাই যে তার জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতা ভুলে বাতাসিকে বাঁচিয়ে নৌকায় তুলে আনেন। তখন মাঝিদের বলতে শুনি – "যা জম্পেস করে তেনার কাপড়টা ধরেছিলেন মাঠাকরুন, আমি তো পেরথমে ছাড়তেই নারলুম।...আর একজন বলে, তা জম্পেস করে ধরবেনি? মায়ের প্রাণ তো বটে।"[৩]

গল্পের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষায়ণীর চরিত্রেরও পরিবর্তন দেখতে পাই। ধর্মপ্রাণ দাক্ষায়ণী ধীরে ধীরে বাতাসিকে কাছে টানতে শুরু করেন। গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন ধর্মকে ছাপিয়ে গেছে স্নেহ-ভালোবাসা। কঠোর দাক্ষায়ণী দূরে ঠেলে ফেলতে পারেননি বাতাসিকে, কাছে টেনে নিয়েছিলেন। জেগে উঠেছে মাতৃত্ব– "তবু

বহুদিনের সংস্কারে শরীরটা তাঁহার কেমন যেন সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু কণ্ঠলগ্ন শীর্ণ শুভ্র হাতখানা সরাইতে গিয়াও সরাইতে তিনি কেন জানি পারিলেন না।”[৪] - এরপর দাক্ষায়ণী বাতাসিকে নিজের মেয়ের মতো সেবাযত্ন করতে শুরু করলেন। কিছুদিন আগে যেখানে বেশ্যা ঘরের মেয়ে, নীচু জাত বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। আজ সেই জাত পাতের বাঁধাকে দূরে ঠেলে ফেলে বাতাসিকে কাছে টেনে নিয়েছেন। পরে বাতাসির জীবন সম্পর্কে মনে পড়তেই একটু অস্বস্তি অনুভব করলেও, বাতাসির প্রতি আগেকার মনোভাব তার আর নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন এই গল্পের মধ্যে দিয়ে ধর্মপ্রাণ নারী কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দাক্ষায়ণী তার মনের সংস্কারবদ্ধ চেনা পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃত্বধর্মকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন এই 'সাগরসঙ্গম' গল্পে তার স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ে।

দাক্ষায়ণী বারবার তাঁর মনের কুসংস্কারকে ঘিরে থাকতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সেই ভাবনার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। তার নিজের অজান্তেই সংস্কারবদ্ধ জীবনকে মেরে ফেলে একটা সুন্দর মাতৃত্বের জন্ম দিয়েছেন। তার এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কারবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে বাৎসল্যের তাগিদে বাতাসিকে হাসপাতালে পাঠানোর মধ্যে দিয়ে, আধুনিকতার স্পর্শ পাই। গল্পকার এখানে নারী ভাবনার পরিবর্তনের স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শেষ পর্যন্ত বাতাসিকে বাঁচাতে পারেননি দাক্ষায়ণী। সে মারা যাওয়ার পর ডাক্তার যখন বাতাসির মৃতদেহ দাহ করার জন্য তার পরিচয় পত্রের খোঁজ করেন তখন সমস্ত সংকীর্ণতা মুছে ফেলে নিজের বদ্ধ বেড়াজাল ভেঙে বাতাসিকে নিজের মেয়ের পরিচয় দিলেন দাক্ষায়ণী। মানবিকতার জয় ঘটেছে। সংস্কারবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে মাতৃত্ববোধ অর্থাৎ- “সমস্ত সংস্কারের চেয়ে যাহা পুরাতন, সমস্ত ধর্মের অপেক্ষা যাহা প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁহার মনের সমস্ত সংকীর্ণ সীমার বেড়া তখন ভাঙিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।”[৫] অর্থাৎ গল্পের শেষে তার প্রমাণ পাই যেখানে নারী তাঁর গন্ডীবদ্ধ সংকীর্ণ জীবন ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃত্বের পরিচয় দিয়ে গল্পটিকে একটি অনন্য সাধারণ রূপদান করলেন।

'মহানগর' গল্পটি 'মহানগর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই 'মহানগর' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে হয় এক মহান শহর যেখানে মানুষ তাদের মধ্যবিত্ত নাম মুছে ফেলার জন্য হানা দেয়। অর্থাৎ- “যে পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত।”[৬] কিন্তু আমরা এই মহানগরের আর একটা দিক পাই যেখানে মানুষ হারিয়ে যায় অন্ধকারের তলদেশে। যেখান থেকে বেরোনোর পথ পাওয়া দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে মানুষের পক্ষে। সেই অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া এক নারীর পরিচয় পাই আমরা এই গল্পে। রতনের দিদি চপলা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গেলে সেখানে তাকে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কিন্তু সেই অত্যাচার সহ্য না করে বাড়ি ফিরে এলে তার বাবা আবার তাকে ফেরত পাঠালে সে শেষ পর্যন্ত স্থান নেয় শহরে গিয়ে। যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায়

যেতে চায় না, তার পারিপার্শ্বিক সমাজ তাকে যেতে বাধ্য করে আলোকময় শহুরের অন্ধকার জগতে। যার ফলে চপলাকে জীবিকাবৃত্তি ও টাকা রোজগারের তাগিদে বেছে নিতে হয়েছে অন্ধকার জগতকে। এই মহানগরের অন্ধকারময় জগতে তলিয়ে যাওয়া রূপটি চপলা নামক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন লেখক। যেখান থেকে তার উদ্ধারের পথ বন্ধ।

সমাজের নিষ্ঠুর চোখ রাঙানিকে সাধারণ মানুষ ভয় করে বলেই এই হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য কোমল, স্নেহময়ী নারীদের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে কেউ সাহস করে না। সেই অন্ধকার জগতেই তাদের জীবনের আশা খুঁজে নিতে হয়। তাই চপলা কাতর মুখে তার ভাই রতনকে বলে– "আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!"[৭] অর্থাৎ মহানগরের আকাশে, বাতাসে বুঝি বিষ আছে – "মহানগর সবকিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।"[৮] প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে নারীকে দেখিয়েছেন এই ভাবে যে মুখ বন্ধ করে তার জীবনের সমস্ত অপারগতাকে স্বীকার করে নিয়ে এই অন্ধকার গণ্ডির মধ্যেই নিজেকে বদ্ধ করে রাখতে চায়। তাইতো চপলা তার ভাইকে ফিরে যেতে বলে। এই গল্পের শেষে লেখক দেখিয়েছেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চপলার ভাই রতন আবার হারিয়ে যায়, আর– "মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।"[৯] প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে দেখিয়েছেন নারীদের জীবনের এই কঠিন অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে, যেখানে রতনের দিদির মত এরকম অজস্র বালকের দিদি যারা স্বাভাবিক জীবন থেকে হারিয়ে যায় সমাজের অবিচারে। অর্থাৎ এই গল্পে নারীদের জীবন ভাবনা যে কতটা সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ, যেখান থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই সেই রকমই একটি বাস্তব উদাহরণ মহানগর গল্পে চপলা নামের নারী চরিত্রটি।

'নিশীথ নগরী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'পুনর্মিলন' গল্পটিতে একটি সুন্দর পারিবারিক ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গল্পে প্রৌঢ় মাতা হিরন্ময়ী চরিত্রটি তার জীবনের ফেলে আসা বহু সমস্যা অতিক্রম করে বর্তমান জীবনকে উপলব্ধি করছেন। এই গল্পে আমরা প্রতিটি নারীর মানসিক পরিবর্তনের একটা দিক লক্ষ করি। হিরণ্ময়ীর বড় মেয়ে অমলা চরিত্রটির মধ্যে কর্তৃত্বের ভূমিকা প্রকাশিত হতে দেখি। যেখানে সে বড়দিদি অর্থাৎ মায়ের মতো সকলকে শাসন করে, যার মধ্যে একটা মনোভাব ফুটে উঠেছে। এবং মেজোমেয়ে কমলা বর্মায় থাকে, যার জন্য তার বাঙালিয়ানা একটুও অবশিষ্ট নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ সন্তানহীনা মহিলাদের 'বাঁজা' আখ্যা দিয়ে সমাজের হীন দৃষ্টির পাত্রী করে তোলে, সেখানে এই বিকৃত মানসিকতাকে তোয়াক্কা না করে কমলার এই সিদ্ধান্ত নারী স্বতন্ত্রের ধারাকে প্রবাহিত করে। কমলার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক নারী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। তার ফলে তাকে বলতে শুনি- "ছেলেপুলে হলে যেন ভারি সুখ, উনি তো বলেন ওসব nuisance আমাদের দরকার নেই।"[১০]

হিরণ্ময়ী দেবীর সেজমেয়ে বিমলা অসাধারণ সুন্দরী। যার ফলে তাকে সুপুরুষ এবং ভালো পরিবারে পাত্রস্থ করা হল। কিন্তু কিছুদিন পরে 'পুনর্মিলন' উৎসবে যখন সে আসে তখন তার বিয়ের পূর্ববর্তী যে তারুণ্য ও চাঞ্চল্য তার মধ্যে আর দেখা যায় না। শহুরে ধনী পরিবারে বিয়ে হওয়ার ফলে তার মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সে যে জীবনে সুখী নয় এটা মাতা হিরণ্ময়ী দেবী বুঝতে পারেন। তাই হিরণ্ময়ী বলেন– "মেয়েদের ঠিক যেমনটি তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন তেমনি কি তাহারা আর আছে? ইহারা তাহারই কন্যা, অথচ ঠিক যেন তেমনটি আর নাই। নিস্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলায় এই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রথম যেন তিনি সৃষ্টি, সংসার ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় অতল রহস্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"[১১] অর্থাৎ জীবনকে মানুষ নিজের মতো চালাতে চাইলেও জীবন যে তার মতো চলে না, সে সংসার এবং পরিবারের দুর্জ্ঞেয় চাপে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে থাকে। 'পুনর্মিলন' গল্পে এই পরিবারটি তার উদাহরণ। গল্পের এই চরিত্রগুলির মধ্যে গল্পকার সমাজের একটা মিশ্র সংস্কারকে তুলে ধরেছেন। সময় এবং পরিস্থিতির পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার রূপান্তর ঘটছে সেটা এই গল্পের নারী চরিত্র গুলির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে। নদীর পাড় যেমন ভাঙে, সম্পর্কের এই বদলও যেন তেমন প্রকৃতির নিয়ম, জগতের নিয়ম। এক বোনের সঙ্গে অন্য বোনের সম্পর্ক বদলে যায়, সকলেই নিস্পৃহ হয়ে পড়ে সময়ের স্রোতের সঙ্গে। লেখক এই গল্পের মধ্যে দিয়ে সেকালের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীদের ভাবনার বিকাশের বিভিন্ন রূপ দেখিয়েছেন। সমাজের একটা মিশ্র সংস্কারকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ 'পুনর্মিলন' বলতে আমরা বুঝি মানসিক তৃপ্তি যা এই গল্পের চরিত্রগুলি পায়নি, এই মিলন হয়ে উঠেছে বাহ্যিক মিলন।

'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্টোভ' গল্পটি একটি ব্যঞ্জনাধর্মী গল্প। এখানে স্টোভটি যেন সংসারের প্রতীক হয়ে উঠেছে, আর সেই প্রতীকটি কখন যে চরিত্রে পরিণত হয়ে গেছে গল্পটি পড়লে সেটা বুঝতে পারি। স্টোভটির দপ দপ করে জ্বলে ওঠা, আঁচ নেমে যাওয়া আবার তীব্র গর্জনে জ্বলে ওঠা- এইসব গল্পের চরিত্র গুলির মনস্তত্ত্বকে ও তাদের আচরণকে নির্দেশ করে। মল্লিকা নামে নারী চরিত্রটি এখানে স্টোভ গল্পের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মল্লিকা শশিভূষণের পুরনো প্রেমিকা, যাকে কথা দিয়ে কথা রাখেনি শশিভূষণ। পারিবারিক সংশয়াচ্ছন্ন, মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে অতিক্রম করতে পারেনি; যতটা পেরেছিল এম.এ পাশ চাকরি করা মল্লিকা। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেকালে নারী শিক্ষার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে, তাই মল্লিকা নামের নারী চরিত্রটি এখানে পুরুষ চরিত্র শশিভূষণের তুলনায় অনেকটা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তাই হঠাৎ মল্লিকা আবিষ্কার করে শশিভূষণকে না পেয়ে তার খুব ক্ষতি হয়নি– "আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় দুর্বল মানুষটির জন্য গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্ত সে নিঃশব্দে পুড়ে পুড়ে খাক হয়েছে, কিন্তু একে জয় করে নিলে সে কি

সত্যি সুখী হত? ভিজে সলতেয় সারাজীবন ধরে আগুন ধরিয়ে রাখার ব্রত ক্রমশ একদিন দুর্বহ হয়ে উঠত না কি?”[১২]

স্টোভটি বাসন্তী প্রথম বের করে পাম্প দিতে থাকে এর থেকে বুঝতে পারছি স্টোভটি গল্পে অবাঞ্ছিতভাবে আসেনি তাকে জোর করে আনা হয়েছে। শশিভূষণ ও বাসন্তীর পাঁচ বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক, কিন্তু শশিভূষণের অবাঞ্চিত নীরবতা তাদের সম্পর্ককে তিক্ততায় পরিণত করে। তাই বাসন্তী শশিভূষণের পুরনো প্রেমিকা মল্লিকাকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে তার এতদিন ধরে পেয়ে আসা জ্বালা-যন্ত্রণার মধুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল– “সত্যিই কোন জ্বালা, কোন সংশয় বাসন্তীর মনে আর নেই।.... তার এই পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনই মল্লিকাকে সে এনে দেখাতে চেয়েছিল যত জ্বালা সে এতদিন পেয়েছে, এ যেন তারই ঋণ শোধ।”[১৩] প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে দুটি নারী চরিত্রের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। যেখানে তারা চুপ করে থেকে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা মনোভাব ব্যক্ত করেছে একটি ছোট্ট যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। দুটি নারী কেউই প্রতিবাদ করেনি। লেখক এখানে নারীদের চুপ রেখে স্টোভটিকে যেন বেশি জীবন্ত করে দেখিয়েছেন। তিনটি চরিত্রের নির্যাসকে ব্যঞ্জিত করেছেন স্টোভ এর মধ্য দিয়ে। তিনজনের জীবনের নিয়ন্ত্রণকারীই যেন এই স্টোভ। তার হিংস্র, কর্কশ গর্জন যেন সকলের প্রতি নিষ্ঠুর কৌতুক প্রকাশ করেছে। গল্পে নারীর মনস্তত্ত্বের দিকটি বেশি প্রস্ফুটিত করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাংলা সাহিত্যে ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা কে উপস্থাপিত করে মনস্তাত্ত্বিকতার এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন লেখক এই গল্পের মধ্যে দিয়ে।

আজও সমানভাবে এই সভ্য সমাজের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে নারী প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত, বঞ্চিত হয়ে চলেছে। উপরিউক্ত গল্পগুলিতেও নারী তার স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য কীভাবে সমাজের তথাকথিত নীচ বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছে; আবার নিজের স্বাধীনতাকে খর্ব, পরিবারের কথা সমাজের কথা ভেবে কীভাবে সবকিছু মেনে নিয়ে দিনের পর দিন শ্বশুর বাড়িতে পড়ে আছে সেই দিকগুলোও পরিস্ফুট হয়েছে। তবে শুধু তিনি নারীর অত্যাচারের দিকটিকেই দেখান নি, দাক্ষায়ণী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর সংকীর্ণতা থেকে মহত্ত্বের পথে উত্তীর্ণ হওয়ার দিকটিকেও তুলে ধরেছেন। যা নারীকে বৃহৎ জগতে অবতীর্ণ হবার লড়াইয়ে ইন্ধন যোগায়। তাই প্রতিনিয়ত নারী করে চলেছে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু লড়াই করতে গিয়েও বারবার পরাজিত হতে হয় পেশী শক্তির কাছে। তাই তো আজও সরকারকে নারীদের প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য নতুন সংসদ ভবনে প্রথম বিল হিসেবে ‘নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম’ নামক বিল পাশ করতে হয়। তাই যতদিন পর্যন্ত সমাজে নারীদের প্রতি এই অত্যাচার চলতে থাকবে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চলতে থাকবে; যতদিন পর্যন্ত সরকারকে আলাদাভাবে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিল পাশ করতে হবে ততদিন পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নারীর অধিকার আদায়ের, নারীর মানিয়ে নেওয়ার এই গল্পগুলি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, সুতপা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, 'মেয়েদের স্মৃতিকথা আত্মঅন্বেষণ ও আত্মদর্শনের নানা পর্যায়', কলকাতা, সিগনেট প্রেস, পৃ.১১০।

২. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প' ১ম খন্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৩২।

৩. তদেব পৃ. ১৩৭।

৪. তদেব পৃ. ১৪০।

৫. তদেব পৃ. ১৪৮।

৬. তদেব পৃ. ৩৭৬।

৭. তদেব পৃ. ৩৮২।

৮. তদেব পৃ. ৩৮২।

৯. তদেব পৃ. ৩৮৩।

১০. তদেব পৃ. ৪৫০।

১১. তদেব পৃ. ৪৫৫।

১২. তদেব পৃ. ৫৭৪।

১৩. তদেব পৃ. ৫৭৬।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা, প্রথম প্রকাশ ২০05, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প মননে ও সৃজনে', কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬, 'কালের পুত্তলিকা'(বাংলা ছোটগল্পের একশ বিশ বছর), ১৮৯১-২০১০, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৩. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, পৌষ ১৩৯৪, 'কল্লোলের কাল', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ফেব্রুয়ারী ২০২২, 'নারী চেতনা মননে ও সাহিত্যে', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬/২ রোমানাথ মজুমদার স্ট্রিট।

৫. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৫, বৈশাখ ১৪২২, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ' ১ম খন্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, জানুয়ারি ২০১৭, পৌষ ১৪২৩, 'স্মৃতিকথা ও অন্যান্য', সুধাংশুশেখর দে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট।

৭. চৌধুরী, শীতল, এপ্রিল ২০১১ ‘ বাংলা ছোটগল্পে তিন নক্ষত্র বনফুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র-নারায়াণ গঙ্গোপাধ্যায়’, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়।

৮. ভট্টাচার্য, সুতপা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৮, 'মেয়েদের স্মৃতিকথা আত্মঅন্বেষণ ও আত্মদর্শনের নানা পর্যায়', কলকাতা, সিগনেট প্রেস।

৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, অগাস্ট ১৯৯৮, 'প্রেমেন্দ্র মিত্র (জীবনী গ্রন্থ মালা ১৮)', কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, জুন ২০০৪, ‘ছোটগল্পের বিষয়-আশয়’, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

নবনাট্য ভাবনায় গঙ্গাপদ বসুর নাটক ‘সত্য মারা গেছে’ : একটি পর্যালোচনা

সঞ্জীব গরাই
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিশ শতাব্দীর চারের দশকে বাংলায় যে নাট্য-আন্দোলন গড়ে ওঠে তার সংগঠনগত রূপ ছিল ‘গণনাট্য সংঘ’। এই নাট্য আন্দোলন যে বাস্তব পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ। সেই পরিস্থিতিতে ‘গণনাট্য সংঘ’ মঞ্চায়িত করে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের নিয়ে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’ ও ‘নবান্ন’ নাটক। শুরু হয় নাট্য-আন্দোলন। ‘জবানবন্দী’ ও ‘নবান্ন’ নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একজন অভিনেতা হিসেবে গঙ্গাপদ বসু বাংলার এই নাট্য-আন্দোলনে প্রবেশ করেন। চারের দশকের শেষে সংগঠনগত মতাদর্শের বিভেদের কারণে ‘বহুরূপী’ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ‘গণনাট্য’ ভেঙ্গে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়। নবনাট্য আন্দোলনের সূচনাকারী ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠীর একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে গঙ্গাপদ বসু অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক লিখতে শুরু করেন এই সময়পর্বেই। মঞ্চের প্রয়োজনে লেখেন বারোটি নাটক। তাঁর সব নাটকগুলিতে নবনাট্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লেও ‘সত্য মারা গেছে’ (১৯৬৫) নাটকে নবনাটকের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে সার্থকভাবে। নাট্যকার বারবার নাটকের মাধ্যমে বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের কথা বলেছেন। ‘সত্য মারা গেছে’ নাটকে এই সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়ে। একই সঙ্গে সমাজে কীভাবে মিথ্যা, জালের আবরণে আমাদের জীবন সত্যকে ঢেকে ফেলার, মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত সেই ছবি দেখানোর পাশাপাশি দেখিয়েছেন শত চেষ্টাতেও সত্যকে মেরে ফেলা যায় না। সাময়িকভাবে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়াল করলেও সত্য মৃত্যুহীন। লক্ষ করলে দেখতে পাব নাট্যকার নাট্যবিষয় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন আমাদের জীবনের অনুভূতিগুলো। সমসাময়িক নাট্যকারদের থেকে গঙ্গাপদ বসুর এখানেই স্বতন্ত্রতা যা তাকে নবনাট্যকার হিসেবে সফল করে তুলেছে। নাট্যকারের এই অভিনব ভাবনাতেই ‘সত্য মারা গেছে’ নাটকটি হয়ে উঠেছে নবনাট্যের সার্থক একটি নাটক। প্রবন্ধে সে বিষয়েই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : গঙ্গাপদ বসু, নাট্য-আন্দোলন, গণনাট্য, নবনাট্য, জবানবন্দী, নবান্ন, বহুরূপী।

মূল আলোচনা :

বিশ শতকের চারের দশক বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চারের দশকেই মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার প্রভাবে সূচনা হয় 'গণনাট্য সংঘে'র এবং তার সঙ্গে নাট্য-আন্দোলনের। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিস্ট বিরোধীতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা এবং ভারতবর্ষ তথা বাংলার প্রেক্ষাপটে ১৩৫০-এর মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অভিপ্রায়ে গড়ে ওঠে 'গণনাট্য সংঘ'। পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব বাংলার প্রত্যেকটি গ্রামের মানুষ ও তার পরিবারকে গৃহছাড়া করল। গ্রামের মানুষ পেটের জ্বালায় ভিড় জমাল শহর কলকাতায়। কলকাতায় বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে শোনা যেতে লাগলো 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' চিৎকার। বাংলার এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে নাটকে রূপ দিলেন বিজন ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে তাঁর প্রথম নাটক 'জবানবন্দী' এবং 'জবানবন্দীর'ই পূর্ণ রূপ নিয়ে তার পরেই লেখেন 'নবান্ন' যেখানে বিষয়ের সমগ্রতা আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মন্বন্তর পরিস্থিতিকে নিয়ে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকের প্রধান চরিত্র বৃদ্ধ চাষি 'পরাণ মন্ডলে'র ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গঙ্গাপদ বসু সক্রিয়ভাবে নাট্য-আন্দোলনে যোগদান করেন। 'গণনাট্য সংঘে'র সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। এরপর চল্লিশের দশকের শেষে মতাদর্শগত বিভেদের কারণে 'গণনাট্য সংঘ' ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। ঠিক এই সময়েই 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গঙ্গাপদ বসু এই সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। একজন অভিনেতা হিসেবে নাট্য-আন্দোলনে যোগ দিলেও 'বহুরূপী'তে মঞ্চের প্রয়োজনে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন এবং নবনাট্য ধারায় তিনি লেখেন বারোটির মতো নাটক। তাঁর প্রথম নাটক 'অংশীদার' (১৯৫৫)। গঙ্গাপদ বসুর 'সত্য মারা গেছে' (১৯৬৫) নাটকটি নবনাট্য ধারায় জনপ্রিয় একটি নাটক।

গঙ্গাপদ বসুর নাটক নিয়ে আলোচনার পূর্বে তাঁর নাট্য-আন্দোলন পূর্ববর্তী জীবনকে ফিরে দেখা প্রয়োজন কেননা কৈশোর থেকেই তিনি এক বিশেষ আদর্শের দ্বারা জীবনে চালিত হয়েছেন। সেটি হল দেশপ্রেমের আদর্শ, সমাজপ্রেমের আদর্শ। অনেক পরে নাট্য-আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময়েও এই আদর্শ থেকে তিনি সরে যাননি। তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের আদর্শের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল পরবর্তী জীবনের আদর্শ। গঙ্গাপদ বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার খাসিয়াল গ্রামে। কৈশোরে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার সময়ও তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ থেকে পিছিয়ে আসেননি। পড়াশোনা শেষ করে পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকের জীবন যার পিছনেও ছিল ওই দেশপ্রেম। এই প্রসঙ্গে গঙ্গাপদ বসুর সাংবাদিক জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন – "...সাংবাদিকদের চেহারাতেও ছিল একটু অন্য ধরণের ছাপ। এখনকার সঙ্গে ঠিক মেলে না। আসলে তখনকার সাংবাদিকদের

বেশ বড় একটা অংশ এসেছিলেন দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে। কিংবা নির্যাতিত দেশকর্মী হিসেবে। সাংবাদিকতা ছিল পেশার চেয়েও বেশি।”[১] গঙ্গাপদ বসু সাংবাদিকের পেশায় যোগ দিয়ে সহকর্মী হিসেবে পেলেন বিজন ভট্টাচার্য, কবি অরুণ মিত্র প্রমূখ স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের। এঁদের সংস্পর্শেই গঙ্গাপদ বসু পরিচিত হন নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে। কৈশোর ও কর্মজীবনের সেই দেশপ্রেমের আদর্শকে সামনে রেখেই এবার তিনি যোগ দিলেন নাট্য-আন্দোলনে। যেখানে নিছক অভিনয়ের জন্যই তিনি নাট্য-আন্দোলনে যোগ দেননি, যোগ দিয়েছেন দেশের জন্য কাজ করার তাগিদে, মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদে। ‘নবান্ন’ নাটকের অভিনয়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গঙ্গাপদ বসু তাই খুব সহজেই বলেছেন- “‘নবান্ন’ করবার সময় কখনওই মনে হয়নি থিয়েটার করছি। দেশের কাজ করবার যে মনোভাব নিয়ে ছাত্রজীবনে আখড়া করেছি, নুন তৈরি করেছি নারকোলপাতা থেকে, সুতো কেটেছি চরকায়, মিটিং করেছি মাদক বর্জনের বা দাদাদের হুকুমে সারারাত হেঁটে কোনও চিঠি বা ‘যন্ত্র’ নিয়ে দূর-দূরান্তর গ্রামে পৌঁছে দিয়ে ভোরবেলায়ই বাড়ি ফিরেছি, নেতাজির সঙ্গে এক নৌকায় তিনরাত কাটিয়েছি জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কাজে, নানারকম সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রেপ্তার এড়িয়েছি বা স্কুল কলেজ আদালতে পিকেটিং করেছি, ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই যেন আবার নতুনভাবে নাটক করেছি- নতুন দিনের নতুন সমাজ গড়ার নাটক- যার প্রযোজনা অভিনয়ধারা এবং বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন।”[২] ‘নবান্ন’ পরবর্তী গঙ্গাপদ বসুর সমস্ত নাট্য জীবনে এই আদর্শই চালিকা শক্তি রূপে কাজ করেছে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ‘বহুরূপী’র জন্মলগ্ন থেকে শিল্পকে রাজনৈতিক মতবাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার তাগিদে এবং নাটককে আরও বেশি শিল্পগুণান্বিত করার উদ্দেশ্যে যে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেই নবনাট্য আন্দোলনে একজন সক্রিয় নাট্যকর্মী হিসেবে গঙ্গাপদ বসু নিজের অবস্থানকে প্রথম থেকেই স্পষ্ট করেছেন। ‘ভালো করে ভালো নাটক করার’ যে উদ্দেশ্য নিয়ে ‘বহুরূপী’ নাট্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে সেই উদ্দেশ্যকে আরও বেশি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি গঙ্গাপদ বসুর নবনাট্য সম্পর্কিত একটি উক্তিতে- “সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্পসুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক। এবং এই রকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ-সচেতন শিল্পীর সত্য ও রিয়্যালিটির যে অন্বেষা তাকেই বলতে পারি নাট্য-আন্দোলন।”[৩] ‘বহুরূপী’ সূচনাপর্ব থেকে এই ভাবনাকে সামনে রেখেই একের পর এক নাটক অভিনয় করে গেছে। যেমন- ‘ছেঁড়া তার’, ‘উলুখাগড়া’, কিংবা রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘রক্তকরবী’, ‘রাজা’। গঙ্গাপদ বসুও নাটক লেখা কিংবা অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যকে এড়িয়ে যাননি, এই বক্তব্যকে গ্রহণ করেই তিনি লেখেন তাঁর নাটকগুলি- ‘অংশীদার’, ‘নমঃ যন্ত্র’, ‘সত্য মারা গেছে’ প্রভৃতি। তাঁর সমস্ত নাটকই বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের কথা বলে, সমাজ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করে।

'সত্য মারা গেছে' নাটকটি গঙ্গাপদ বসু রচনা করেন তাঁর জীবনের প্রায় শেষদিকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ মঞ্চের একজন মানুষ হিসেবে যখন তাঁর অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় মাইতি বলেছেন- "গঙ্গাপদ বসু নাটক লিখতে শুরু করেন তখন, যখন নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি পরিণত ফসলের মতোই সমৃদ্ধ। বিষয়বস্তু- অর্থাৎ সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি যখন কুয়াশা মুক্ত, স্বচ্ছ ও শান্ত। কোন সৃষ্টিকে স্থায়ী মূল্যে পৌঁছতে হলে এই উপাদানগুলি অপরিহার্য।"[৪] 'সত্য মারা গেছে' নাটকের মধ্যে এই স্থায়ী মূল্যের সঞ্চয়ই তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে। গঙ্গাপদ বসুর নাটকগুলির দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাব তিনি প্রায় সবকটি নাটকেই বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের অনুভূতিগুলোকে। যেখানে বৃহৎ কোনো সামাজিক আন্দোলন বা ঘটনার ঘনঘটা নেই। নাট্যকারের ভাবনায় আমাদের জীবনের অনুভূতি যেমন- 'বিশ্বাস', 'সত্য', 'প্রেম' এই অনুভূতিগুলোই হয়ে উঠেছে নাট্যকাহিনির মূল কেন্দ্রবিন্দু। 'সত্য মারা গেছে' নাটকটিতেও সমাজে আমাদের জীবনের সত্যকে কীভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে সেই ভাবনা ফুটে উঠেছে নাটকে। নাটকে 'সত্যচরণ' এই সত্যের প্রতীক। যে ছয় বছর বয়সে হারিয়ে গিয়ে নানা অত্যাচার সত্ত্বেও জঙ্গলে এক সাধুবাবার আশ্রয়ে বেঁচেছিল। আজ সে শহরে এসে পৌঁছেছে। তার কথাবার্তা, আচরণ শহরসুলভ নয়, সে শহরে বেমানান। নাট্যঘটনায় পরে জানা যায় এই সত্যচরণ বড়লোক জমিদার সূর্যনারায়ণ চৌধুরীর ছেলে। সূর্যনারায়ণের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সে। কিন্তু সূর্যনারায়ণের ভাগ্নে সুশোভন এতদিন সম্পত্তির মালিক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে এসেছে। ফলে হিংসা, লোভের কারণে সকলে একজোট হয়ে সত্যচরণকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে এবং তা না পেরে শেষে জাল, মিথ্যা, বলে ঢেকে দিতে চায় সত্যকে। শেষ পর্য্যন্ত সত্যের যে মৃত্যু হয়না, নানা অত্যাচারেও সে বেঁচে থাকে এমনকি সত্যকে কখনই মিথ্যা দিয়ে, জাল বলে আড়াল করে দেওয়া যায়না নাট্যকারের এই ভাবনায় যেন নাটকে প্রকাশ পেয়েছে সত্যচরণের বাবা সূর্যনারায়ণের উক্তিতে- "না- না- না। সত্য মরেনি। সত্য মরে না। সত্য মরতে পারে না। এই সত্য। এই আমার সত্যজীবন!!!"[৫] 'সত্য মারা গেছে' নাটকে নাট্যকার আমাদের সমাজে জীবনসত্যকে ভাবতে চেয়েছেন এইভাবে- "আজকের দিনের শহুরে সমাজের জীবন-বিড়ম্বনার এই রঙ্গচিত্রে তাই প্রথমেই জানা যাচ্ছে: সত্য জীবন অপহৃত। সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে জানা গেল, নানা অত্যাচার পীড়নেও সে কিন্তু মরেনি- এ দেশের আদিম আরণ্যক সভ্যতার ছায়া-স্নিগ্ধ বনবীথিকায় বড় হয়ে সে শহরে এসে উঠেছে। সত্য এই শহরেই আছে- কিছুটা বেঢপ বেমানান হয়ে, কিন্তু আছে। হয়তো শহরের নিয়ন আলোর চোখ-ধাঁধানো জৌলুসে তাকে চেনা যায় না, হয়তো কেউ চিনতে চায়ই না। বরঞ্চ জাল বলে, মিথ্যা বলে সত্যকে বেঁধে ফেলতে চায়, হয়তো-বা পারলে একেবারে শেষ করে ফেলতেই চায়।"[৬] নাট্যকারের এই ভাবনায় সমগ্র নাটকে ফুটে উঠেছে যেখানে সত্যের প্রতীক সত্যচরণ।

আমাদের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সমাজে নবনাট্যকারের এই ভাবনা সমাজে নবনাটককে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

'সত্য মারা গেছে' নাটকে এই মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার নাটকে আর এক বাস্তব ছবির ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। আমাদের কাছে সেই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয় নাটকের ভূমিকায় লেখা নাট্যকারের বক্তব্য থেকে। যেখানে নাট্যকার বলেছেন- "মানুষের জীবনই আজ অসম্ভব রকমের কুশ্রীতায়, লোভে আর অনৃতভাষণে জটিলতার চরমে গিয়ে পৌঁছেচে। যে যা নয় সে তাই বলে নিজেকে জাহির করবার জন্য লেলিহজিহ্ব। এই অবস্থাটা হাস্যকর, কিন্তু এর ট্র্যাজিক দিকটাও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।"[৭] নাট্যকারের এই বক্তব্যকে স্মরণে রেখে নাট্যকাহিনিতে দেখতে পাব শহরের তথাকথিত ভদ্র, সভ্য লোকের মেকি ও ভণ্ড নাগরিক জীবনকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন নাটকে। সেখানে মানুষ যা নয় তাই দেখাতে চাইছে নিজেকে ফলে সেই মানুষগুলোও একভাবে সত্যকে লুকাতে চাইছে মেকি জীবনযাপনের আড়ালে। 'সত্য মারা গেছে' নাটকে সেই রকম চরিত্র মি. জি ডি মিটার ও মিসেস মিলি মিটার। যারা নিজের মেয়েকে টোপ করে বড়লোক ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা ধার নেওয়ার সাথে সাথে আরও অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়ে থাকে। পরের থেকে টাকা ধার নিয়ে নিজেদেরকেও বড়লোক বলে জাহির করে। নাটকে এদের পরিবারকে কেন্দ্র করে একে একে আসে গড়গড়ি, মি. বিষ্টুচরণ ডাটা এবং সোম। গড়গড়ি একজন ঠক, যে বিয়ের জন্য মেয়ে দেখার ছল করে জোচ্চুরি করে বেড়ায়। মেয়েদের সর্বনাশ করতেও সে পিছপা হয় না। অপরদিকে বিষ্টুচরণ, জি ডি মিটার এবং মিলির বন্ধু। এই বিষ্টুচরণই বন্ধু জি ডি মিটারকে অন্যায়ভাবে ব্যবসার পার্টনার থেকে সরিয়ে দেয় এবং সেই বন্ধুর বউয়ের প্রতি সে আসক্ত অর্থাৎ সে পরস্ত্রীকাতর। বিষ্টুচরণও মিলির মেয়ে ডলিকে তার ছেলের বউ করতে চায় ফলে সহজেই মিলি তার মেয়ে ডলিকে টোপ হিসেবে রেখে বিষ্টুচরণের থেকে নগদ ধার এবং তারও বেশি হাতাতে থাকে। একই অভিপ্রায়ে চাল-ডালের ধনী ব্যবসাদার সোমও নগদ ধার সাথে চাল-ডাল দিতে থাকে মিলি ও জি ডি মিটারকে। এদের সকলকে ব্যবহার করে জি ডি মিটার ও মিলি মিটার লোকসমাজে তাদের ভণ্ড বড়লোকের ঠাটবাট বজায় রাখে। চাল-ডালের ব্যবসায়ী সোমের চালই এঁরা খান। সোমের উক্তিতে- "শুধু খায় না, সেই চাল নিয়ে চাল মারে।"[৮] এদের পাশাপাশি এদেরই মতো জমিদার সূর্যনারায়ণের ভাগ্নে সুশোভন, সেও সম্পত্তির লোভে প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের মামাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সে তার মামার চিকিৎসার কথায় বলে- "...দুটো হাত পর্যন্ত অসাড় হয়েছে। আর একটু, আর অল্প একটু, হার্টটা ঘায়েল হলেই- ব্যস, খতম। সমস্তটা আমার ব্যবস্থামতোই হচ্ছে, হবেও। চিকিৎসার ভড়ং একটা চলছে বটে- বাট- দ্যাটস-ওনলি অ্যান আই-ওয়াশ।"[৯] সুশোভনের কাছে টাকা মানেই 'সোশ্যাল স্ট্যাটাস'। সেও জি ডি মিটারকে টাকা দিয়ে ডলিকে কিনতে চায়। সে বলে- "...আমি আপনাকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেকও সই

করে দিচ্ছি,- কোনও তারিখ থাকবে না চেকে। আমি টাকার দখল পেয়ে গেলেই আপনি তারিখটা বসিয়ে নিয়েই ব্যাংক থেকে ক্যাশ করে নেবেন।"[১০] যে টাকা সে এখনও পায়নি সেই টাকা দিয়ে সে ডলিকে কিনতে চায়। এও তো একরকম মিথ্যা, যা সে নয় তাই দেখানোর চেষ্টা। নাট্যকার হয়তো বলতে চেয়েছেন এরা কেউই প্রকৃত জীবনসত্যে বাঁচছে না। একটা মিথ্যার আবরণে নিজেদেরকে ঢেকে রেখেছে। নাটকে যে ডলিকে বারে বারে টোপ সাজানো হয়েছে সেও এই চক্রে পড়ে ভিতরে ভিতরে দুঃখী হওয়া সত্ত্বেও এই মিথ্যার জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারছে না। নাটকে তার এই অবস্থা সত্যচরণ ওরফে ক্যাবলার উক্তিতে বুঝতে পারি যখন ক্যাবলা জানায় ডলি ভিতরে দুঃখী একজন মানুষ এবং বলে- "কী দুঃখ সে আমি জানি না। কিন্তু তোমার চারপাশের সব কিছু কী রকম খারাপ লাগছে তোমার। যা করছ তা হয়তো করতেই চাও না তুমি। যা খুঁজছ তা হয়তো খুঁজেই পাচ্ছ না।"[১১] নাট্যকার এই কাহিনি ভাবনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নাগরিক জীবনের কুশ্রী রূপ। যেখানে প্রতিনিয়ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে মিথ্যার নাগপাশের মধ্যে।

গঙ্গাপদ বসুর নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল- হাস্যরসের মধ্য দিয়ে নাট্য-বক্তব্যের উপস্থাপনা। এই হাস্যরস নিছক ভাঁড়ামি নয়, এই হাস্যরস মার্জিত এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। গঙ্গাপদ বসুর নাটকের হাস্যরসের বিশিষ্ট মনোভঙ্গি প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- "এই মনোভাব রঙ্গ ও কৌতুকের ঢেউ তুলে সরল ও সহজভাবে আমাদের সমাজ ও জীবনের বাস্তব সমস্যাকেই উদঘাটনে উৎসাহী। হাসিকে বাদ দিয়ে তিনি ভাবতে কিংবা ভাবাতে চাননি।"[১২] 'সত্য মারা গেছে' নাটকেও এই বুদ্ধিগ্রাহ্য রসিকতা আছে যা আমাদের হাসির বাইরে গিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। যেখানে দেখি জি ডি মিটার ও মিলি তাদের মেয়েকে টোপ করে বড়লোক ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা-পয়সা হাতাতে থাকে এবং মেকি ও ভণ্ডামিতে ভরে আছে তাদের জীবন। এই ঘটনা হাস্যকর কিন্তু হাসির পিছনে যে ট্র্যাজিক রয়েছে তাকেও যেন স্পষ্ট করে দেখতে পাই আমরা। নাটকে আরও অনেক ছোট ছোট ঘটনা যেমন- সোম যে চাল নিয়ে ব্যবসা করে সেই চালের কাঁকড় নিয়ে সোমের প্রতি ক্যাবলার উক্তি- "যে এককিলো চাল কিনবে তাকে একশো গ্রাম কাঁকর কিনতেই হবে- আলাদা, এইরকম আর কী? তা হলে অনেক সুবিধা হয়, জানেন? মানুষের দাঁতও ভাঙ্গে না, পেটেও পাথরকুচি যায় না, বাছাবাছিও করতে হয় না, আবার আপনাদের লাভটাও ঠিকই থাকে।"[১৩] এ কোন ভাঁড়ামি নয় এ হল বুদ্ধিগ্রাহ্য হাসির উক্তি; এই বক্তব্যে যেমন আমরা হাসি তেমনই হাসির মধ্য দিয়ে বাস্তব সত্যের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। এছাড়া সত্যচরণকে শহুরে আচার আচরণে অভ্যস্ত করানোর যে প্রক্রিয়া নাটকে বর্ণিত হয়েছে তাতেও আমাদের হাসি আসে। এই হাস্যরসের মাধ্যমে নাট্যকার তুলে ধরতে চান নিজস্বতা হারিয়ে মেকি জীবনচর্চার নগ্ন রূপ। দর্শককে হাসানোর জন্যেই হাস্যরস, এটা নাট্যকার গঙ্গাপদ বসু কখনই মনে করতেন না। সেই বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়েছে 'সত্য মারা গেছে' নাটকে।

নবনাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের মধ্য দিয়ে সামাজিক সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি সমস্যা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। গঙ্গাপদ বসু নবনাট্যের নাটক সম্পর্কে বলেছেন নাটক সমাজ গঠনে সাহায্য করবে। ভারসাম্যহীন সমাজের ছবি তুলে ধরার পাশাপাশি উৎকেন্দ্রিক সমাজে মানুষের মনকে একটা কেন্দ্র খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এই নবনাটক। 'সত্য মারা গেছে' নাটকেও নাট্যকার আমাদের জীবনসত্যকে কীভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা হয় সেই ছবি দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি। তার সঙ্গে দেখিয়েছেন মানুষ এই মিথ্যাচার, ভণ্ড জীবনচর্চা থেকে সরে এসে কীভাবে সৎ এবং সত্য জীবনে ফিরে যেতে পারে। নাট্যকার এই নাটকে জি ডি মিটার, ডলি, মিলির ভণ্ড জীবন পরিহারের পর তাঁদের সৎভাবে বাঁচার যে চিত্র এঁকেছেন সেই ছবি নবনাটক হিসেবে 'সত্য মারা গেছে' নাটকটিকে সার্থক করে তুলেছে। নাট্যকাহিনিতে আমরা দেখতে পাই পরের সম্পদের দ্বারা জি ডি মিটার ও মিলি তাদের মেকি বড়লোকি চাল বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এমনকি সত্যচরণের সম্পত্তির প্রতিও তাদের লোভ আমরা দেখতে পাই। ডলি প্রত্যক্ষভাবে বাবা-মায়ের মতো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হলেও পরোক্ষভাবে সেও জড়িয়েছিল এই লোভে। এই চরিত্রগুলির সৎ জীবনে উত্তরণের মাধ্যমে নাট্যকার নবনাটকের বৈশিষ্ট্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নাট্যকারের ভাবনায় উঠে এসেছে জি ডি মিটার যখনই মিথ্যা, মেকি জীবন ছেড়ে সত্যজীবনকে বেছে নিয়েছে সেই মুহূর্তেই সে একা হয়ে গেছে। তার বউ, মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেই মুহূর্তে জি ডি মিটার অনুভব করেছে "এক মহাশূন্যের মাঝখানে একেবারে নিঃসঙ্গ, একা।" নাট্যকার যেন বলতে চেয়েছেন মিথ্যাকে অতিক্রম করে সত্যকে যারা তাদের জীবনে গ্রহণ করেছে তাঁরা সবসময় নিঃসঙ্গ। সত্যের জন্য তাদেরকে একাই লড়ে যেতে হয় এবং লোভী ও মিথ্যুকের দল সবসময় জোটবদ্ধ। অপরদিকে ডলির কাহিনিতে দেখতে পায় সে লোভের কারণেই বাবাকে ছেড়ে কয়লাকুমারের সাথে বেরিয়ে যায়। পরে ডলি জানতে পারে কয়লাকুমার ঠক, তার টাকাপয়সা কিছুই নেয়। উল্টে কয়লাকুমার ডলির সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়ে ডলির সর্বনাশ পর্যন্ত করতে ছাড়ে না। তখন ডলি ফিরে আসে বাবার কাছে, সত্যচরণের কাছে এবং জানায়, সেও একটা সত্যকারের জীবন চায়। ডলির উক্তিতে- "এখন মান খুইয়ে নিজের মনকে যে আমি চিনতে পেরেছি। তাই আজ আর কোনও লোভ নেই আমার। অর্থ নয়, বিত্ত নয়, নাম নয়, গোত্র নয়, আজ আমি চায়: একটা সুস্থ সুন্দর প্রাণবান মানুষ।"[১৪] চরম নাট্যমুহূর্তে পৌঁছে দেখি মিলিও ফিরে আসে স্বামী এবং মেয়ের কাছে। ফিরে আসার প্রসঙ্গে সে মেয়ে ডলিকে বলে- "হ্যাঁ মা না এসে থাকতে পারলুম না। বিবেকটা এখনও মরেনি যে!"[১৫] এই ভারসাম্যহীন, হিংসা ও লোভের সমাজে মানুষের বিবেক মরে যায়নি শুধু অন্ধকার, কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এই ভাবনায় যেন ফুটে উঠেছে নাটকে। সমাজের এইরকম পরিস্থিতিতে এই নাটক আমাদের বিবেককে কুয়াশামুক্ত করতে সাহায্য করে এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ডলির বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া প্রসঙ্গে সত্যচরণের

উক্তিতে- "...আমার মনে হয়, মানুষ আসলে সবাই সৎ আর ভাল। চারপাশের চাপে পড়ে সে অসৎ হয়, খারাপ হয়ে যায়। আর খুব সহজেই আমরা মানুষকে বড় ভুল বুঝি। ...সে হয়তো ভুল করেছে। কিন্তু পাপ করেনি"[১৬] আবার ডলি যখন কয়লাকুমারের কাছ থেকে অশুচি হয়ে ফিরে আসে তখন সত্যচরণ বলে- "...সাধুজি আমাকে বলতেন: মানুষের আসল শুচিতা তার মনের মধ্যে- সেখানে দাগ না ধরলে, সে খাঁটি সোনা।"[১৭] নাটকে পরপর এই বক্তব্যগুলিতে সুস্পষ্টভাবে নাট্যকারের মানবভাবনার পরিচয় মেলে। নাট্যকার মানুষকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নাম, গোত্র, অর্থের উপরে। নাট্যকারের উপলব্ধিতে শারীরিক অশুচিতাও মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। নাট্যকারের এই নবভাবনায় মানুষ আবার নিজেকে সম্মান করতে পারবে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে। এও তো নবনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গঙ্গাপদ বসু যখন নাটক লিখতে শুরু করেন তখন তিনি মঞ্চের একজন পরিণত শিল্পী। ফলে তাঁর নাটকে চরিত্র, কাহিনি, নাট্যঘটনা কোথাও ব্যাহত হয়নি। নবনাটক হিসেবে 'সত্য মারা গেছে' নাটকে এক নায়কের পরিবর্তে সমস্ত চরিত্রই হয়ে উঠেছে নাট্য-বক্তব্যের সুস্পষ্ট মাধ্যম। নাটকে কোনরকম রাজনৈতিক প্রচার বা বক্তব্যকে প্রাধান্য না দিয়েই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তুলে ধরেছেন বাস্তব সমাজকে। এই নাটকের মাধ্যমে গঙ্গাপদ বসু একজন নবনাট্যকার হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে গেছেন শেষ পর্যন্ত। ফলে 'সত্য মারা গেছে' নাটক মানুষকে বুঝে নিতে সাহায্য করেছে বাস্তব সমস্যাগুলোকে। সেই সমস্যাকে অতিক্রম করে মানুষ কীভাবে সৎ এবং সত্যজীবনে পৌঁছাবে সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন নাট্যকার। ফলে সত্য মারা গেছে নাটকটি হয়ে উঠেছে নবনাট্যের সফল একটি নাটক।

তথ্যসূত্র:

১) বসু, স্বদেশ, ২০১০, গঙ্গাপদ বসু স্মারক-গ্রন্থ, কলকাতা, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ- ৯৭।

২) বসু, গঙ্গাপদ, ২০১০, নাটক ও নাট্যকথা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ- ১২।

৩) তদেব, পৃঃ- ৪।

৪) বসু, স্বদেশ, ২০১০, গঙ্গাপদ বসু স্মারক-গ্রন্থ, কলকাতা, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ- ২৫৮।

৫) বসু, গঙ্গাপদ, ২০১০, নাটক ও নাট্যকথা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ- ৪৩২।

৬) তদেব, পৃঃ- ৭৬৩।

৭) তদেব, পৃঃ- ৭৬৩।

৮) তদেব, পৃঃ- ৩৯৮।

৯) তদেব, পৃঃ- ৪১৫।

১০) তদেব, পৃঃ- ৪১৭।

১১) তদেব, পৃঃ- ৩৯২।

১২) বহুরূপী পত্রিকা, ১১৩ সংখ্যা, পৃঃ- ২৩।

১৩) বসু, গঙ্গাপদ, ২০১০, নাটক ও নাট্যকথা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃঃ- ৩৯৯

১৪) তদেব, পৃঃ- ৪২৫।

১৫) তদেব, পৃঃ- ৪২৯।

১৬) তদেব, পৃঃ- ৪২২।

১৭) তদেব, পৃঃ- ৪২৪।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চৌধুরি, দর্শন, ২০১৯, গণনাট্য আন্দোলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

২) দত্ত, সুনীল, ১৯৭২, নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

৩) বসু, গঙ্গাপদ, ২০১০, নাটক ও নাট্যকথা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪) বসু, স্বদেশ, ২০১০, গঙ্গাপদ বসু স্মারক-গ্রন্থ, কলকাতা, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

৫) মজুমদার, স্বপন, ১৯৮৮, বহুরূপী ১৯৪৮-১৯৮৮, কলকাতা, বহুরূপী।

৬) মিত্র, শম্ভু, ১৪০৮, সন্মার্গ-সপর্যা, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৭) মিত্র, শম্ভু, ১৯৭১, প্রসঙ্গঃ নাট্য, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

৮) মিত্র, শাঁওলি, ২০১৫, গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৯) রায়, অনুরাধা, ২০০০, সেকালের মার্কসীয় সংস্কৃত আন্দোলন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১০) রায়, মন্দিরা, ২০১২, গণনাট্য এবং নবনাট্য একটি বিতর্ক, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়।

১১) সিকদার, অশ্রুকুমার, ২০১৯, কিল মারার গোঁসাই, কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

উনিশ শতকের আলোকে বাঙালি নারীর চিত্রশিল্প ও আলোকচিত্র চর্চা

শতাব্দী ধন
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতিরও শিল্পচর্চার জগতে বাঙালি নারীদের অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ করা যায়।তারা উনিশ শতক জুড়ে নারীজীবনের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও নিজেদের আত্মপ্রকাশ করেছেন। শুধুমাত্র আত্মপ্রকাশই নয়, কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেদের স্বকীয়তার পরিচয়ও দিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে বাঙালি মহিলারা সেভাবে স্কুল, কলেজের লেখাপড়ার সাথে যুক্ত ছিলেন না।কেননা, ঐ সময় বাড়ির মেয়েদের শিক্ষারপথ সেভাবে সুগম হয়ে ওঠেনি। যারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পের ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন তারা বাড়িতেই চর্চা করতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষাচর্চার পথটা কিছুটা সুগম হয়। অনেকেই শিক্ষার জন্য স্কুলে, কলেজে পড়তেন।তার পাশাপাশি অনেকে সাংস্কৃতিক দিক, শিল্পের নানা দিক নিয়েও চর্চা করতেন। এই আলোচনায় আমি সেই সমস্ত বাঙালি নারীদের ওপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি, যারা উনিশ শতকের আলোতে নিজেদের আলোকিত করেছেন, চিত্রশিল্পে ও আলোকচিত্র চর্চাতেও নিজেদের মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।
সূচক শব্দ : পরিবার, নারী, চিত্র, পেশাদার, ফোটোগ্রাফি, শিল্প বিদ্যালয়।

মূল আলোচনা :

আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের জগতে নবযুগ নিয়ে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীরা। এঁদের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে রাজা রবি বর্মা এবং আরও কয়েকজন শিল্পী পাশ্চাত্যে বিশেষ করেই ইতালীয় শিল্পীদের অনুকরণে চিত্র রচনা করতেন, যদিও তাদের ছবির বিষয়বস্তু ছিল ভারতের নানা পৌরাণিক কাহিনি। এঁদের আঁকা ছবি দক্ষিণ ভারত থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ই.বি.হ্যাভেলও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় চিত্রকলায় নব রীতির প্রবর্তন ঘটেছিল। নবজাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের পরিচয়টিও বড় হয়ে উঠেছিল। "সাহিত্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ঘরে ডেকে ফিরিয়ে আনলেন, শিল্পকলার ক্ষেত্রে তেমনি অবনীন্দ্রনাথ।"[১]

পাল যুগের বাংলার নিজস্ব শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের একটা বিশেষ গৌরব ছিল।সেই সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন দুজন অনন্য সাধারণ শিল্পী বীতপাল ও ধীমান। কবে এবং কীভাবে যে শিল্পের সেই প্রাণবন্তধারাটি চিরতরে হারিয়ে গেল, তার কোনো

সঠিক কারণ আজ আর জানা যায় না।দীর্ঘকাল পরে আধুনিক যুগের নতুন করে চিত্রকলার যে বিশেষ একটি ধারা দেখা গেল, সেই শিল্প আন্দোলনের পুরোধা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সম্পর্কে এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন—"The Bengal school is the name given to a new style of painting that was the first aesthetics development that appeared at the turn of the century... The Bengal school, while it originated in Bengal with the work of Abanindranath Tagore, nevertheless soon became national. The student of Ababindranath himself were mostly Bengali, but in the second generation the activity of his followers spread over the country and their students (the third generation) where from many parts of India."[২]

বাংলার এই নিজস্ব নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তাতে কোন সন্দেহ নেই।এই বিষয়ে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, ভারতের নিজস্ব চিত্র শিল্পের কোনো আদর্শ ছিল না।প্রাচীন চিত্রশিল্পের ধারায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল।ভারতের পশ্চিমাংশে তাও রাজস্থানী বা কাংড়া রীতির চিত্রশিল্পের প্রচার ছিল।পূর্বাঞ্চলে সেই চিত্রের চর্চাও ছিল না।পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পই তখন আমাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।এই পথে দক্ষিণের চিত্রশিল্পী রবি বর্মা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।কিন্তু তা তো বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিস।এই গ্লানি থেকে ভারতকে মুক্তি দেবার ভার নেন এই ঠাকুরবাড়িরই এক সন্তান।তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ।"[৩]

উনিশ শতকের চিত্র আন্দোলনের সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছিল সে বিষয়টি আরও বিশদে আলোচনা করলে দেখা যাবে—প্রথম একজন বিদেশীর চোখেই ধরা পড়েছিল ভারতের শিল্পকলার মহান স্বরূপটি।কলকাতার নব প্রতিষ্ঠিত সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ের ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ইংরেজ শিল্পী আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল।"যদিও তিনি ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল ভারতের প্রাচীন ও নিজস্ব শিল্পধারার মূল সূত্রকে খুঁজে বের করা ও তার মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।তিনি এদেশের এবং বিদেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন ভারতবর্ষ কলা শিল্পে দীন তো নয়ই বরং মহিমান্বিত।ভারতের একটি নিজস্ব সুপরিণত শিল্পের ভাষা আছে, আদর্শ রূপ আছে এবং তা দেশ ও জাতির আধ্যাত্মিক জীবন ও উচ্চ মানসিকতারই সুষ্ঠু প্রতিফলন। তিনি নানা লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, ভারতের শিল্প অদ্ভুত ও তো নয় বরং জাগতিক সাধারণ সৌন্দর্যের অনেক ঊর্দ্ধেমার ভাব ও আদর্শ আছে এতে নিহিত।"[৪]ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিল্প রসিকেরা ও ভারতীয় শিল্পের তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহ এবং আগ্রহে

অবনীন্দ্রনাথ, সরকারি শিল্প শিক্ষালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ রূপে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে অবনীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য শিল্পী গিলার্ডি ও পামার সাহেবের কাছে কিছু পরিমাণে শিল্পশিক্ষা করেছিলেন। পরে সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে তিনি ছবি আঁকতে লাগলেন। অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পরীতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছিল দেশজ, মুঘল রাজস্থানী, পারসিক ও জাপানি রীতির। এইভাবেই একদিন দেখা গেল নব্য ভারতীয় চিত্রশিল্পের সূচনা হল।

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে শিল্প চেতনার অভাব কোনোদিনই ছিল না।তাঁরা যে পরিবেশে দিন অতিবাহিত করতেন, সেখানে রং তুলি নিয়ে কাগজ বা কাপড়ের রেখায় ও রঙের চিত্র রচনা অবকাশ বিশেষ ছিল না। কিন্তু তাঁদের স্বভাবে, সুন্দর শিল্পী মনের পরিচয় তারা দিতেন বার-ব্রতের আল্পনায়, কাঁথার সেলাইয়ে, চিত্রিত হাঁড়ি, সরা বা কুলায়, মাটির পুতুল গড়ার মধ্যে, বাড়ির আলপনায়, আমসত্ত্ব বা খাবারে ছাঁচগড়ে।অনেকে আবার তুলি বা কলম নিয়ে ছবিও আঁকতেন।তার সামান্য কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—**গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত** তার আঁকা ছবি 'সখি-সমিতি'তে প্রদর্শনীর জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর 'শিক্ষা'(১৮৯৬) নামক কাব্যগ্রন্থে ৭৬ টি কবিতার সঙ্গে কবির সহস্তে অঙ্কিত চিত্র সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল। মৃৎশিল্পেও কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর দক্ষতা ছিল তার প্রমাণ দেয় তাঁর তৈরি 'মাটির গ্রাম্য ছবি'। 'সখি সমিতি'র প্রদর্শনীতে এই শব্দটি দেখে অনেকে ভেবেছিলেন কৃষ্ণনগরের কারিগরদের তৈরি। এই কাজটির জন্য তিনি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মহারানী সুচারু দেবীর চিত্রাঙ্কনেরও খ্যাতি ছিল। ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়ে ও বউ ছবি আঁকা শিখেছিলেন। তাঁদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নীপময়ী দেবী ও তাঁর কন্যা প্রতিভা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি শিল্পী কালিদাস পাল ও হোয়াইট সাহেবের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। 'পুণ্য' পত্রিকাতে এঁদের আঁকা কিছু ছবির প্রতিলিপিও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এঁরা ছবি আঁকতেন, কিছু পরিমাণে নিজেদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য। প্রথম যে মহিলা চিত্র রচনা অসাধারণ নিষ্ঠা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনিও ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই কন্যা সুনয়নী দেবী। বাড়ির পরিবেশই তাঁকে শিল্পী হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

সুনয়নী দেবী (১৮৭৫ - ১৯৬২)

সুনয়নী ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ কন্যা এবং গগনেন্দ্র, অর্ধনীন্দ্র ও সমরেন্দ্রনাথ এর সহোদরা।সুনয়নী দেবীর ১২ বছর বয়সে আইনজীবী রজনী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়।প্রায় ৩০ বছর বয়স থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে ছবি আঁকতে শুরু করেন।তাঁর চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য ছিল— তিনি সরাসরি রং তুলি দিয়ে মনের মত চিত্র কাগজে বা কাপড়ে ফুটিয়ে তুলতেন।পেন্সিল দিয়ে প্রাথমিক কোন খসড়া তৈরির প্রয়োজন হতো না তাঁর। দাদাদের কাছে সামান্য রকম তালিম নিয়েছিলেন।বলা যায়, তিনি এক প্রকার স্বশিক্ষিত চিত্রশিল্পী ছিলেন।জলরঙে ও 'ওয়াশ'

পদ্ধতিই তিনি তাঁর ছবির ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় নির্বাচন করেছেন।চিত্রের ক্ষেত্রে সর্বত্রই তার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুটা পটুয়াদের রীতিতে ছবিগুলো আঁকা হত।পৌরাণিক ও বাস্তব জীবনের নানা বিষয় নিয়ে চমৎকার সব ছবি এঁকেছিলেন সুনয়নী দেবী।যেমন- হর পার্বতী, রাধা, মা যশোদা, অর্ধনারীশ্বর, বৃন্দাবনের গোপিনী, গোকুল থেকে কৃষ্ণের বিদায়, রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক বিষয়। এছাড়াও অন্তঃপুরিকা হিসেবে তিনি ঘর গৃহস্থালীর জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর লাজুক গৃহবধূ, বিবাহের দৃশ্য, প্রসাধনরতানারী, বরণডালা হাতে রমণী, জাপানী মেয়ে, গ্রাম্য বধু, পূজারতা নারী প্রভৃতি চিত্রে। তাঁর চিত্রে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য তেমন দেখা যায় না।সহজ অনায়াস ভঙ্গিতে তিনি একএকটি ভাবকে চিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। প্রতিমা দেবী এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন—“আমার মাসিমা সুনয়নী দেবী।সনাতন প্রথা অনুসারে তাঁকে চলতে হত, সংসারে যেমন সব সাধারণ গৃহিণীরা গৃহিণীপনা করে থাকেন। অসংখ্য ছেলেমেয়ে চাকর-বাকর এর বৃহৎ পরিবার, তারই মাঝখানে কোন দূরান্তরের মানুষ যেন।মেয়েলি গল্প গুঞ্জন হাসিঠাট্টা সবকিছুর মধ্যেই তিনি নিজেকে সমানভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, তবু তাঁর মন নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি জীবনের খুঁটিনাটি অবান্তর জিনিসের মধ্যে।”[৫] সুনয়নী দেবীর চিত্রে স্বকীয়তা কোথায় সে সম্পর্কে প্রতিমা দেবী বলেছেন— “আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নব উদ্বোধনের যুগে অবনীন্দ্রনাথ যেমন পার্শিয়ান ও মোগল টেকনিক গ্রহণ করলেন, গগনেন্দ্রনাথ নিলেন জাপানি ও কিউরিস্টিক টেকনিকের ধারা, তেমনই তাদের ভগ্নী সুনয়নী দেবী একেবারে জনসাধারণের আর্ট পটুয়া শিল্পের ভিত্তির উপরতাঁর চিত্রাবলী রচনা করলেন।”[৬] শিল্পী যামিনী রায়ের আবির্ভাবের অনেক আগেই সুনয়নী দেবী পটের রীতিতে নিজস্ব ভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে বিশেষ একটি আঙ্গিক চিত্র রচনা করে গুণী সমাজে সমাদর পেয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। আধুনিক এক চিত্রসমালোচক সুনায়নী দেবীর আঙ্গিক সম্পর্কে বলেছেন—“One of Abanindranath’s sister sunayani Devi also painted gentle native pictures, related to primitive art but wearing the impress of her sereve and quiescent personality.”[৭]

এই মহিলা শিল্পী দেশী-বিদেশি বহু চিত্ররসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।স্টেলা ক্র্যামরিশতাঁর ছবির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন।তিনি সুনয়নী দেবীর শিল্পকলা বিষয়ে ‘modern review’ পত্রিকায় জুলাই ১৯২২-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।লন্ডনে সুনয়নী দেবীর আঁকা ছবির ১৯২৭ এ একটি প্রদর্শনীরও আয়োজনলন্ডন ইউমেস ক্লাবের সদস্যরা করেছিলেন। কলকাতা, চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ), মহীশূর, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে চিত্র সংগ্রহশালায় সুনয়নী দেবীর চিত্র রক্ষিত আছে। সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় হল আধুনিক চিত্রকলার জগতে তিনি প্রথম বাঙালি মহিলা চিত্রশিল্পী। তাঁর বোন বিনয়িনীর

মধ্যেও সূক্ষ্ম শিল্প চেতনা ও রুচিবোধ ছিল। বিশেষত নানা ছাঁচের কেশ বিন্যাসে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁরই কন্যা প্রতিমা দেবীর মধ্যেও শিল্পী সত্তার সঞ্চার হয়েছিল।

সুখলতা রাও (১৮৮৬ – ১৯৬৯)

সুখলতা ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। শৈশবে পিতার কাছেই তাঁর চিত্রশিল্পের অনুশীলন হয়। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে লেখাপড়া করবার অবসরে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা করতেন। ডক্টর জয়ন্তী রাও এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সর্বমোট কুড়িটি গ্রন্থের রচয়িতা। 'বেহুলা' নামে নিজের লেখা বইতে লেখিকা নিজেই চিত্রাবলী অঙ্কন করেছিলেন। একাধিকবার তাঁর আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল। 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান' রিভিউতে সুখলতার অনেক চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়।

প্রতিমা দেবী (১৮৯৩ – ১৯৬৯)

প্রতিমা দেবী ছিলেন একাধারে ঠাকুরবাড়ির কন্যা ও ঠাকুর বাড়ির বধূ।প্রতিমা দেবীর পিতা হলেন শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও মা ছিলেন বিনয়নী দেবী।প্রতিমা দেবী ছিলেন বাল্যবিধবা।সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নানা শিল্পী সত্তার বিকাশ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিমা দেবীর ছবি আঁকার হাতে খড়ি হয়েছিল তার মামা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে।এছাড়াও তিনি তাদের বাড়িতে একজন জাপানী শিল্পীর কাছেও আঁকা শিখতেন। প্রতিমা দেবীর আঁকা ছবির প্রতিলিপি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরবর্তীতে তার বিয়ে হয়.রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে বিশ্বভারতীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এই শান্তিনিকেতন পর্বে বিশ্বভারতীতে থাকাকালীন তিনি বাটিক ও অন্যান্য কারুশিল্প শিক্ষার আয়োজন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'নৃত্য', 'চিত্রলেখা', 'স্মৃতি চিত্র', 'নির্বাণ' প্রভৃতি।

শান্তা দেবী (১৮৯৩ - ১৯৮৩)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মনোরমা দেবীর কন্যা সন্তা দেবীর পিতৃ গৃহে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তিনি কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি শিল্পেরও সাধনা করেছেন। তাঁর প্রাথমিক শিল্পশিক্ষার সূচনা হয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সুযোগ্য স্বনামধন্য শিষ্য নন্দলাল বসুর কাছে।তাঁর অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, বেশ কিছু পরিচিত ও অপরিচিত মানুষের প্রতিকৃতি ও গোয়ালিনী, বালিকার পুতুলের সংসার প্রভৃতি বিখ্যাত।উনিশ শতকে বিশ্বভারতীর কলাভবনে যে সমস্ত মহিলা শিল্পী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শান্তা দেবী অন্যতম।

আলোকচিত্রেজ্ঞানদানন্দিনী দেবী

সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা, গৃহবধূরা ছিলেন অগ্রণী, তেমনই ফটোগ্রাফি চর্চাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন এ বিষয়ে পারদর্শিনী। তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী **১৯৪৬** সালের মার্চ মাসের তৎকালীন একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার দেবলীনা সেন রায়কে চিঠি লেখেন।সেখানে তিনি তার প্রসঙ্গক্রমে বলেন— "আমার মা প্রায় শতাধিক বছর আগে বোর্ন-শেফার্ড এর কাছে ছবি তুলতে শিখে বাড়ির এমন সব লোকের ছবি তুলেছিলেন যাদের অন্য কোন ছবি নেই বা হবার সম্ভাবনা ছিল না।"[৮]এই সময়কার মহিলারা শুধুমাত্র শখের ফটোগ্রাফি চর্চা করতেন না, একাধিক পেশাদার বাঙালি মহিলা আলোকচিত্রীরও সন্ধান পাওয়া যায়।সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পেশাদারী মহিলা ফটোগ্রাফার ছিলেন **সরোজিনী ঘোষ**।তিনি নিজের স্টুডিও খুলেছিলেন।'অমৃতবাজার' পত্রিকায় 'এ লেডি ফোটোগ্রাফার' এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল— "৩২ কর্নওয়ালি স্ট্রিট এর মহিলা আর্ট স্টুডিওর সুদক্ষা হিন্দু মহিলাশিল্পীর কাজ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।আমাদের জন্য তিনি কিছু কাজ করেছেন যার 'ফিনিশ' লক্ষ্য করলে ফটোগ্রাফার রূপে তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।"[৯]
পরবর্তীকালে অনেক বাঙালি মহিলা এই ফটোগ্রাফির পরিসরে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।তবে এই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নামটি হলো **অন্নপূর্ণা দত্ত** (১৮৯৪-**১৯৭৬**)।ইনি ফটোগ্রাফিকে জীবিকার রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল এই পেশায় নিযুক্ত থেকে নিজের শিল্পী সত্তার প্রভূত পরিচয় রেখে গেছেন।অন্নপূর্ণা দেবী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।তাঁর পিতা ছিলেন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্র। **১২** বছর বয়সে উপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।উপেন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহারজীবী হলেও, ফটোগ্রাফি ও ছবি আঁকা ছিল তার নেশা।অন্নপূর্ণা দেবী ছিলেন পাঁচ সন্তানের মা।তাঁর এক কৃতি সন্তান হলে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অন্নপূর্ণা দেবী সম্পর্কে এক গবেষক বলেছেন—"পেশাদার ফটোগ্রাফার রূপে তিনি **১৯৩০–১৯৪০**এর মধ্যে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন।কোনো ফলকধারী স্টুডিও অবশ্য তিনি স্থাপন করেনি।তিনি নিজের বাড়িতেই ফটোগ্রাফির কাজ করতেন।অনেক সময় বাইরেও ছবি তুলতে যেতেন।ছবির ডেভেলপিং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং- সবই তিনি একা হাতেই করতেন।অন্নপূর্ণা দত্তের আত্মপ্রতিকৃতিএকটি মূল্যবান সম্পদ।"[১০]

পরিশেষে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি নারীদের মৌলিক চিত্র শিল্পচর্চা ও আলোকচিত্রচর্চা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা শিল্পচর্চার ইতিহাসেও বাঙালি নারীরা এক নতুন পালক যুক্ত করেছেন। তারা ভবিষ্যতে বাঙালি নারীদের শুধুমাত্র চিত্রশিল্প অথবা আলোকচিত্র শিল্পচর্চার ক্ষেত্রকে নয়, সমগ্র শিল্পের পরিসরে নারীদের জন্য এক অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন ও নতুন প্রজন্মের পথকে যথাসম্ভব মসৃণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. গাঙ্গুলী অর্ধেন্দুকুমার, ‘ভারতের শিল্প ও আমার কথা’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-১৭৩
২. Jaya Appasamy, ‘Abanindranath Tagore and The Art of His Times’, Page- 8
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় হিরন্ময়, ‘ঠাকুর বাড়ির কথা’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২২০
৪. গাঙ্গুলী অর্ধেন্দুকুমার, ‘ভারতের শিল্প ও আমার কথা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, কলকাতা, বইমেলা, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৪২-৪৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫
৬. দেবী প্রতিমা, ‘স্মৃতিচিত্র’, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-৩৪
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭
৮. ঘোষ সিদ্ধার্থ, ‘ছবি তোলা-বাঙালির ফটোগ্রাফি চর্চা’, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১০১
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫
১০. তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৫।

দয়ারাম দাসের 'লক্ষ্মীচরিত্র' : পুনর্পাঠ

অর্ঘ্য ব্যানার্জ্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ : ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছর মঙ্গলকাব্যের সময়কাল। মঙ্গলকাব্যগুলি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এই কাব্যগুলি সৃষ্টির প্রেরণা কোন একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাস থেকে আসেনি। বিভিন্ন সময়ে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক, লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্ম মতে অপূর্ব সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। দয়ারামের 'লক্ষ্মীচরিত্র' বা 'বিনন্দ রাখালের পালা' কাব্যটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেবী লক্ষ্মীর মহিমার কথা ও লোকজীবনে তার প্রভাবের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। দয়ারাম যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন তাই তাঁর কাব্যে আমরা যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভটুকু পাই তেমনি ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের বাংলাদেশের ভয়াবহ মন্বন্তর তথা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'লক্ষীচরিত্র' কাব্যটি বাংলার মন্বন্তরের (১১৭৬) পটভূমিকায় লেখা। কাব্যে লক্ষ্মীদেবীর মহিমা বর্ণনার পাশাপাশি বিনন্দের ধান রোপন, বিরাট রাজা কর্তৃক ধান অপহরণ, বিনন্দের ঘরে লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান, বিনন্দের জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মাণ, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক বিরাট রাজাকে শাস্তিদান এবং রাজার সিংহাসন লাভ ও তার কন্যার সঙ্গে বিনন্দের বিবাহ কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যে মন্বন্তর পীড়িত মানুষের হাহাকারের চিত্র প্রকাশিত।
সূচক শব্দ : দয়ারাম, দেবী, কমলা, লক্ষ্মী, মঙ্গলকাব্য, মধ্যযুগ, অষ্টাদশ শতক, ধান, জীবনদর্শন, প্রাসঙ্গিকতা।

মূল প্রবন্ধ :

খ্রিঃ ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী পর্যায় (তুর্কি আক্রমণ) থেকে খ্রিঃ অষ্টাদশ শতক (ভারতচন্দ্রের কাল) পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। এই সময় বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা লক্ষ করা যায়। যেমন – গীতিসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি। এর মধ্যে মঙ্গলকাব্য ধারাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল বাংলার জনসাধারণের নিজস্ব জীবনদর্শন। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন –

> "আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক

শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"[১]

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগুলিকে প্রধান মঙ্গলকাব্য আর 'কমলামঙ্গল' বা 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'শীতলামঙ্গল', 'কালিকামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'সারদামঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যগুলিকে অপ্রধান বা স্বল্পচর্চিত মঙ্গলকাব্য। স্বল্পচর্চিত মঙ্গলকাব্য ধারার 'কমলামঙ্গল' বা 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যটির বিশেষ তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। দয়ারামের 'লক্ষ্মীচরিত্র' বা 'বিনন্দ রাখালের পালা' কাব্যটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেবী লক্ষ্মীর মহিমার কথা ও লোকজীবনে তার প্রভাবের কথা উল্লেখ করে মানুষের দুঃখ জয়ের রসদের দিকটিকে আলোচনা করা যেতে পারে।

আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে দয়ারাম সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। মধ্যযুগের কবি দয়ারাম দাস সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানা এলাকার ভোগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরচকের বাসিন্দা। স্থানীয় জমিদারের অনুগ্রহ লাভ করে তিনি সেখানেই বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি নিজের সম্পর্কে কাব্য মধ্যে বলেছেন-

"সর্বোত্তম ইন্দ্রজিৎ বৃন্দাবন বিরাজিত
জগন্নাথ যাহার তনয়।
তাহার পুন্যের ফল অবতীর্ণ মহীতলে
দয়ারাম রচে রসময়।।"[২]

অর্থাৎ তাঁর পিতা ছিলেন জগন্নাথ, পিতামহ ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে পিতামহের নাম বলেছেন পরীক্ষিত। আর প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ বলেছেন। এখন আমরা তাঁর কাব্য মধ্যে উল্লেখ্য ভনিতাগুলি আলোচনা করে কবি দয়ারামের সময় সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করবো। পুথি গবেষক শ্যামল বেরা মহাশয় দয়ারামের 'লক্ষীচরিত্র'র প্রাপ্ত যে পুথিগুলির উল্লেখ করেছেন তার ভনিতাগুলি নিম্নরূপ –

ক. পুথির লিপিকাল ১২২৬। ভণিতাটি হল-

"কাসিজোড়া মহাস্থান নরনারায়ণ
ধন্য হে ধার্মিক নরপতি
হইয়া তাহার পৃতষ্ঠী
কিসরচৌকে তাহার বসতি।"[৩]

খ. অপর পুথির লিপিকাল ১২৭৩। ভণিতা টি হল-

"কাশীজোড়া মহাস্থান মহারাজ সুন্দরনারায়ণ
ধন্য হে ধার্মিক নরপতি
হইয়া তাহার পৃত দআরাম রচে গীত

কিশোরচকে জাহার বসতি।”[৪]

কবি দয়ারামের কাব্যের ভণিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নরনারায়ণ, রাজনারায়ণ, সুন্দরনারায়ণ-এই তিন রাজার অনুষঙ্গ ছড়িয়ে আছে। তবে সুকুমার সেনে ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে দয়ারামের আশ্রয়দাতা হিসাবে কোন রাজার নাম নেই বলে উল্লেখ করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেছেন “সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত্রের কবি দয়ারামের সময় সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যায় না। কাব্যমধ্যে তিনি নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ন। ...স্থানীয় জমিদারের অনুগ্রহে তিনি সেই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে বাসকালীনই তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বর্তমান ছিলেন।”[৫] যোগেশচন্দ্র বসু ‘বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর’ এ দয়ারামের আশ্রয়দাতা হিসাবে নরনারায়ণের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৩৭১ এ প্রকাশিত ‘বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস’ গ্রন্থে যুধিষ্ঠির জানার অভিমত - ‘কবি রাজনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। সে হল ১৭৫৬-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের কথা’।

এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসটা একটু জেনে নেওয়া যাক। মেদিনীপুর জেলা ছিল ওড়িশা বৃত্তের অন্তর্গত। ১৭৫১ সালে এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তৎকালীন ওড়িশা রাজ্যের অনুমোদন নিয়ে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানারায়ণ কাশীজোড়ার প্রথম রাজা হন। তিনি উওরপ্রদেশের অধিবাসী। গঙ্গানারায়ণের পর যথাক্রমে রাজা হন জিৎনারায়ণ (১৭২০-১৭৪৪), নরনারায়ণ (১৭৪৪-১৭৫৬), রাজনারায়ণ (১৭৫৬-১৭৭০), সুন্দরনারায়ণ (১৭৭০-১৮০৬)। এই রাজন্যবর্গ যে কাব্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করতেন তার প্রমাণ দয়ারাম। তিনি ছিলেন কাশীজোড়ার সভাকবি।

আমরা যদি ‘লক্ষীচরিত্র’ পুথি দুটির ভণিতা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে একটি তে নরনারায়ণ আশ্রায়দাতা ও অপরটি তে সুন্দরনারায়ণ আশ্রয়দাতা। তাহলে বলা যেতে পারে যে নরনারায়ণ থেকে সুন্দরনারায়ণ অর্থাৎ ১৭৪৪-১৭৭০ বা ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দয়ারাম কাব্য সাধনা করেছেন আর সময়কাল অনুসারে দেখা যাচ্ছে রাজা রাজনারায়ণ এই দুই রাজার রাজত্বের মধ্যবর্তী সময়ে আসীন ছিলেন। এই দীর্ঘকাল পরিধির মধ্যেই দয়ারাম কাব্যরচনা করেছেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তিনি কাব্য রচনা করেছেন। আঠারো শতকের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতালিপ্সা, ষড়যন্ত্র, লালসা, লড়াই, হত্যালীলা আর নির্বিচারে শোষণের চিত্র। মনে রাখতে হবে দয়ারাম যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন তাই তাঁর কাব্যে আমরা যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রারম্ভটুকু পাই তেমনি ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দের বাংলাদেশের ভয়াবহ মন্বন্তর তথা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র প্রকাশিত। তাঁর ‘লক্ষীচরিত্র’ কাব্যটি বাংলার মন্বন্তরের (১১৭৬) পটভূমিকায় লেখা। কাব্যে লক্ষ্মীদেবীর মহিমা বর্ণনার পাশাপাশি

বিনন্দের ধান রোপন, বিরাট রাজা কর্তৃক ধান অপহরণ, বিনন্দের ঘরে লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান, বিনন্দের জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক পুরী নির্মাণ, লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক বিরাট রাজাকে শাস্তিদান এবং রাজার সিংহাসন লাভ ও তার কন্যার সঙ্গে বিনন্দের বিবাহ কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যে মন্বন্তর পীড়িত মানুষের হাহাকারের চিত্র প্রকাশিত।

কাব্যটির শুরুতে প্রথাগত মঙ্গলকাব্যের মতো বন্দনা অংশ নেই। তবে কবি ‘শ্রীশ্রীহরিজীউ শ্বরণং অথ লক্ষিচরিত্র বিনন্দরাখালের পালা লিক্ষতে’ বলে কাব্য শুরু করেছেন। অর্থাৎ কবি সমুদ্র নন্দিনী লক্ষ্মী মাতার নাম স্মরণ করে ‘বিনন্দরাখালের পালা’য় বিরাটনগরে বসবাসকারী বিনন্দ রাখালের দুঃখ কথা বর্ণনা করেছেন। বারো দিনের পুত্রকে ঘরে রেখে বিনন্দের পিতা স্বর্গে লাভ করেন। স্বভাবতই তখন তার অনাহারে দিন কাটে; আবার কখনো বনকচু, খুদের জাউ খেয়ে দিন কাটায়। কিছুকাল মাতুলালয়ে থাকার পরে বিনন্দ মালাকারদের গরুগুলি চড়ানোর কাজ পায়। এই কাজের জন্য সে পারিশ্রমিক হিসাবে ‘অর্দ্ধকচা খুদ পাবে এক পন কড়ি’। কিন্তু তার ভাগ্য এত মন্দ যে কোন দুঃখ ঘুচলো না। ‘কমলা কৃষ্ণের’ কথা থেকে কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষ বিংশতি দিবসে বিনন্দ জানতে পারে যে, যার ঘরে লক্ষ্মী পুজো হয় না সে অদৃষ্টের ফল ভোগ করে। অথচ এদিকে তার বংশে লক্ষ্মী পুজো কোন কালে হয় নাই। অঘ্রাণে ও পৌষে প্রতি ঘরে ঘরে দেবীর পুজো হয়। এই দুই মাসেই দুঃখিনির দুঃখ দূর হয়। দেবীর গীত প্রতি গুরুবারে অর্থাৎ শুক্রবারে যে যে শোনে, তাদের ধনলাভ হয় –

“এই গিত জে বা শুনে প্রতি গুরুবারে।
ধনে ধানে বাড়ে লোক কমলার বরে।”[৬]

বিরাট দেশের রাজা প্রথম শুক্রবারে অষ্টমীর ক্ষণে দেবীর পুজো করেন। শঙ্খ ধ্বনিসহ পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের মধ্যে দিয়ে ভক্তিভরে পূজিত হন দেবী।

“পূজা লয়ে ঘরে ২ সমুদ্রনন্দিনী ফিরে
সভাকার চিন্তিয়া কল্যাণ।”[৭]

বিনন্দ রাখাল দেবীর উদ্দেশ্যে বলেন ‘লক্ষি পূজা জানি নাহি যুগ যুগান্তর’। আরও বলেন ‘চাষেবাসে খেতি বৃত্তি না করি কখন।’ বিনন্দ খুদের কুঁড়া খেয়ে নিত্য দিন যাপন করেন। আর প্রতিদিন গোরু নিয়ে গোষ্ঠে চরাতে যায়। দুঃখেই তার জীবন কাটে। এমনকি অন্নের আকালে তার সাত ভাই মারা যায়। এই অবস্থায় বিনন্দর দুঃখ কথা শুনে দেবী লক্ষ্মী বলেন –

“এত বলি ঈশ্বরি দিলেন দিলেন পরিচয়।
ইন্দ্রের অবিষ্ট আনি বরূন তনয়।।
দুঃখ শুনে দর্পে হিয়া দয়া বাড়ে চিত্তে।
বড় বাঞ্ছা হয় তোরে ইন্দ্রপদ দিতে।।
লক্ষি পূজা কর তুমি প্রতি গুরুবারে।
কালি পাবে রাজপদ কমলার বরে।।”[৮]

ভক্তিভরে লক্ষ্মীর পুজো করলে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাবে, মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে ও ধন-ধান্য-বংশ বৃদ্ধি পাবে। এই কথা শুনে বিনন্দ দেবীকে জানান রাজ্যে তার কোন লোভ নেই, দুবেলা খেতে পেলেই হবে। আরও জানান প্রতি গুরুবারে তিনি দেবীর আরাধনা করবেন। তখন দেবী লক্ষ্মী বিনন্দ রাখালকে বর প্রদান করে অন্তর্হিত হন।

দেবীর কৃপায় বিনন্দর বাড়িতে সরু চালের ভাত, ঝোল, ব্যঞ্জন সব রান্না হয়। মায়ের সঙ্গে বিনন্দ মনের আনন্দে তা ভোজন করে। আর মনে মনে ভাবে এসব যেন 'জানিল লক্ষির দয়া হৈল আমার প্রতি'। আবার পরের দিন মাঠে গিয়ে বিনন্দ অন্য দৃশ্য দেখল; মুষল ধারায় বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় শুরু হল। চড়াতে নিয়ে যাওয়া ধেনুগুলি যে কোথায় চলে গেল তা জানতে পারলো না। এই পরিস্থিতিতে বিনন্দ দেবীকে স্মরণ করল।

বিনন্দ রাখাল বিষ্ণুর পত্নী দেবী লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বলে 'অসাধ্য চাসের কর্ম অসাধ্য কথা'। অর্থাৎ বিনন্দর চাষ যোগ্য ভূমি নাই। আর বীজ ও ধান্যই বা সে কোথায় পাবে। তখন কমলা অভয়া দিয়ে বলেন – কার্তিকের গুরুবারে 'আড়াই পোয়া বীড়া ধান্য' তাকে দেবেন। লক্ষ্মী দেবীর আশীষে বিনন্দ নদীর তীর, নালা, ডোবা, বিল, জলা, খাল প্রভৃতি স্থানে একে একে বীজ ধান বপন করলে দেখা যাবে 'আড়াই দিবসের ধান্য হবে লক্ষ আড়া'।

এর ফলে বিনন্দ এদেশে ইন্দ্রের থেকেও উচ্চ স্থান লাভ করবে। বিনন্দ দেবী চরণে প্রণাম নিবেদন করে ঈশান কোণে বীজ বপন করে অন্য স্থানে গেল। খাল-বিল সবস্থানে বীজ রোপন করে তা সত্ত্বেও 'পুয় দেড় বীড়া ধান্য বাকী আছে তবু।' দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ধান হয় অফুরান। 'লাজরাত' জমি আর নাই কোন স্থানে। এমনকি দেবী লক্ষ্মীর বচনে পর্বতে ধান রোপন করল বিনন্দ। ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করতে লক্ষ্মীর 'সর্ব্ব-কর্ম্ম করে'। শ্রীকৃষ্ণের গোগুাকা ভিতর দেবী নিবাস রচনা করেন। চার মাসে ধান বোনা ও কাটা শেষ হয়। দেবীর কৃপায় নানা জাতির ধান পাকে 'হীরা নীলা কিছু হৈলো মতি'। বিনন্দ রাখালকে দেবী লক্ষ্মী কৃপা করলেন। আড়াই দিবসের পর দেবী বিনন্দকে ধান কেটে আনতে বললে বিনন্দ চিন্তায় পরে। তখন দেবী অভয় দিয়ে বলেন -

"অর্জুনের রথে জেন গোবিন্দ সারথি
লক্ষী বলেন থাকি আমি সেবকের প্রতি।।"[৯]

অতঃপর বিনন্দ ধেনু নিয়ে হরষিত মনে মাঠের থেকে ফিরে গৃহস্থের ঘরে ধেনু পৌঁছে দেয়। বাড়ি ফিরে মায়ের সঙ্গে ভোজন করেন। দেবীর কৃপায় ভাগ্য লাভ ঘটে।

গোঠে, মাঠে, পর্বতে, পাহাড়ে দেবী লক্ষ্মীর বরে ধান পাকে অতীব সুন্দর। আড়াই দিবসের ধান পাকে নানা জাতির, যেমন - মউরপতা, আগিরমান, আছাড়মনি, কজরনিমাই, গন্ধতুলশী, গয়াবালি, মুক্তারগিরি, আধারকুলি, কণকচুর, গবরমতী, লীলাবতী, বুয়ানদাড়, মটাহারা, বাশমোন, মাগুরবিচ, কলমিড়কি, মাণিকমুকুতা,

কর্পূরশালি, কালীমলতা, গুলিকপ, রামসালি, আধারমানিক, লক্ষিকাজল, কাশসালি ইত্যাদি।

বিনন্দ রাখাল সব ভুবন মোহন ধান দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। চারিদিকে নানা প্রজাতির ধান প্রদক্ষিণ করে দেবীকে প্রণাম জানায়। দেবী লক্ষ্মীর পাদপদ্ম স্মরণ করে এরপর বিনন্দ ঘরে ঘরে গিয়ে সকল চাষী ভাইগণকে বলে 'গড় করি গটা দশ জন দেহ ভাঞা'। পাকা ধান সব তার জমিতে, তাই ধান কাটার জন্য যখন সবার কাছে গেল তখন কেউ তাকে বলে বাপের বংশে তো কোনোকালে চাষ ছিল না আবার কেউ বলে কবে ধান রোপণ করেছিলে? কেউবা বলে 'কামাই করিলে মোরে কড়ি দিতে হবে।' বিনন্দ রাখালের উপর দেবীর করুণাচিত্র সকলে প্রত্যক্ষ করল। ধান দেখে চাষীগণ বিনন্দকে শুধায় কবে ধান উঠেছিল। লক্ষ্মীর করুণা বিনন্দের প্রতি। অর্থাৎ দেবী লক্ষী দয়ায় তার ঘরে ধান্যলাভ হয়েছে। বৃদ্ধা মাকে রাখালিয়া বলে কমলা দেবীর দর্শন পাবার পর তার এই প্রাচুর্য। বিনন্দের মাতা তখন আনন্দিত হয়।

ভাগাড়ে, শ্মশানে বিনন্দ ধান চাষ করেছে। কিন্তু রাজাকে কর না দিয়ে যত গো-চর ও জায়গা ছিল সেখানে চাষ করেছে বলে রাজার কাছে অভিযোগ করলে রাজা চাষিদের উদ্দেশ্যে বলে -

"গোচরের জমি শ্বসানের ভূমি
জোত করি খায় জোরে।
রাখাল বর্ব্বর নাহি রাজকর
ধান্য আন রাজঘরে।"[১০]

রাজা এরপর হুকুম দিলেন রাখালিয়াকে রাজ দরবারে নিয়ে আসার জন্য আর সেই সঙ্গে বাহান্ন পৌটি ধান্য কুড়িটি খামার সব কিছু লিখে নেয় রাজা। বিষণ্ণ বদনে বিনন্দ 'কচা দুই ধান্য গুড়ইল লাড়া বিলে।' এরপর সন্ধ্যাকালে বাড়ি ফিরে যায় বিনন্দ। মাত্র 'কচা দুই ধান' পেল বিনন্দ। জননীকে সকল ঘটনা বিবরণ করার পর জননী বলেন 'বৃথা পুজি কমলার চরণ'। মা ও ছেলে বিষণ্ণ বদনে আছে, সেকথা ধ্যানের মাধ্যমে দেবী জানতে পারলেন এবং বর দিলেন আজ থেকে বিনন্দের উদরের জ্বালা ও দুঃখ মোচন হবে। দেখা যায় দেবীর কৃপায় বিনন্দের ধান্য হয় অপ্রমিত। ইন্দ্রের সমান ধন লাভের বর দেন। আর দেবী বলেন -

'আমার আসিশ্যে হবে রত্নময়পুরি।।'[১১]

আরো বলেন, রাজার কন্যার সঙ্গে বিনন্দের বিবাহ হবে, সেই সঙ্গে -

"রাজ সিংহাসন দিব সুবর্ণের ছাতা।।
ধন ধান্য নিল ভূপতির গৌরব দেখিয়া।
দুহিতা করিবে দান দ্বারে তে বহিয়া।।"[১২]

বিষ্ণুর বণিতা দেবী লক্ষ্মীই বিনন্দে আশ্রয়স্থল, রক্ষাকর্তা। দেবী সৃষ্টিকর্তা জগতের অধিকারী, তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরুণ, পবন, ধর্ম, নিরঞ্জন। দেবী বিনন্দ কে জানায় -

"কাষ্ঠ বিনে কোঠরে কেমনে আছে শুঞা।
মায়ে পোয়ে আছি তাতে মৃৎবৎ হয়্যা।।"[১৩]

বিনন্দের যেহেতু আগে চাষবাস ছিল না তাই কেমন করে মাচা বাঁধতে হয় সে জানে না। এই নিয়ে বিনন্দ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, দেবী কমলা ভুবনমোহন মাচা বাঁধলো। যেমন ঘর, তেমন তার দ্বার। আর সেই সঙ্গে নির্মিত হল মাচা। দেবী লক্ষ্মীর মরাই যেন লক্ষ্মীর ভান্ডার। কার্তিক মাসে ত্রয়োদশ তিথিতে শুক্রবারে দেবী আজ্ঞা দিলেন গোধূলি সময়ে বিনন্দ ও তার মা একসঙ্গে ধান্য যেন মরায়ে তুলে রাখেন -

'রাখালিয়া বহি দেয় লক্ষি ঢালেন ধান।'[১৪]

কাব্যের পরবর্তী লহরে দেখি কুবেরকে ডেকে দেবী লক্ষ্মী বিনন্দের ধান নেবার জন্য অর্থাৎ বিক্রি করার জন্য আদেশ দেন। কমলার আদেশ পেয়ে কুবেরের নির্দেশে - 'বিশাসয়ে বলদ সঙ্গে বিংশতি ব্যাপারি'র আগমন ঘটে। মহাজন এই বিস্তর সম্পদ কিনবে কিন্তু কাঙালের কাছে কোন হিসাব নেই। তখন দেবী নিজেই ধানের দর-দাম করে দেন। এরপর বিনন্দ ধারণ বিক্রি করতে লাগলে দেখা যায় যে ধান যতই বিক্রি করে ততই ধান যেন অফুরন্ত। এই কাণ্ড দেখে কুবের কানে হাত দিল আবার কেউ কেউ প্রভু জগন্নাথের কৃপা করল এইভাবে সেই দিন বিনন্দ শত কোটি টাকা অর্থের ধান বিক্রি করল কমলার কৃপায়।

দেবী লক্ষ্মী আশীষে বিনন্দ রাখালের ঘর সোনা রূপায় পরিপূর্ণ হল। 'আড়াই হালা' শষ্যের ধান্যে ঘর করতে চাইলে দেবী বলেন - 'কালি তুল্য দিব রত্নময় পুরি'। দেবীর কৃপায় নির্মিত হয় রত্নময় পুরি। সোনার প্রাচীর আর সোনার গৃহ। সেই সঙ্গে 'ইশাপে' লক্ষ্মী পুজোর বাসর তৈরি হয়। মনি, মানিক্য কত সব অমূল্য রত্নে সে গৃহ পরিপূর্ণ। সোনার কলসে বিচিত্র চামোর সজ্জিত। হাতি, ঘোড়া, উট, রাজদারে চাকর-বাকরে সেই রাজপুরী পরিপূর্ণ হল। দেখে মনে হয় - 'কর্ণের সমান হৈল কমলা বরে'।

দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় বিনন্দ রাখালের ভাগ্য পরিবর্তন হয়। বিনন্দের রাজপুরীতে লক্ষ্মীর ঘট পুজিত হয়। দেবী হনুমানকে আদেশ দিলেন -

"বিরাট ভূপতি তেজ বড়াই ধার্মিক রাজা
বয়া আন তার জত ধান।।"[১৫]

দেবীর আদেশ পেয়ে হনুমান শত যোজন লাফে রাজার মহল থেকে বয়ে আনে ব্রাহ্মণের ধন। হীরা, নীল, মতি, পলা, সোনা, রুপা সহ সম্পদের ভান্ডার। তখন থেকেই বিরাট রাজা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পড়ে।

পরবর্তী লাচারিতে কবি, বিরাট রাজার দুঃখ কথা কে তুলে ধরেছেন। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হলে রাজার ঘর ও প্রাচীর ভেঙে পড়ে; এমন কি রাজরানী ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে দেখা যায় ভিক্ষা করে তার দিন চলতে লাগে, কমলার রুষ্ট হওয়ার কারণে বিরাট রাজার জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। এই অবস্থার পরে রাজা জানতে পারেন যে বিনন্দ রাখাল দেবীর বর পুত্র। আর তার নিন্দা করার জন্যই রাজা

লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে। দেবী রাজাকে জানাই যে তার সব দোষ ক্ষমা করা হবে তবে দেবীর বর পুত্র বিনন্দের হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করতে হবে।

দেবী কমলার কথায় বিরাট রাজা, তার কন্যাকে বিনন্দের হাতে সমর্পণ করে। এরপর বিরাট রাজা ভাগ্য ফিরে পায়। রাজকন্যার সঙ্গে বিনন্দের বিবাহ উপলক্ষে নানান ঘটা দেখা যায়। বিনন্দকে আইবুড়ো স্নান করানো হয়। নানা ভূষণে বিনন্দকে ভূষিত করে সাজানো হয়; গলায় মালা, মাথায় রত্ন মুকুট। এই অংশে কবি নানা বিবাহের লোকাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। নারীগণের সঙ্গে নৃপতি জায়া এসে জামাতার চাঁদ মুখ দেখে সব দুঃখের অবসান হয়। 'কপালে চন্দন চাঁদ সীন্দূরের ফোটা' দিলে দেখে মনে হয় তরুণ অরুণের উদয় হলো। বিনন্দকে বিচিত্র বসন ও কর্ণ কুণ্ডল সহ স্বর্ণ সমুদায় দেওয়া হল। এরপর অধিবাস আনন্দের কথা দয়ারাম দাস রচনা করলেন।

বিরাট রাজা বিনন্দকে কন্যাদান করেন। দ্বিজগণ বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে শুভক্ষণেই উলুধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি সহ বিরাট রাজার কন্যাকে বিনন্দের হাতে সমর্পণ করেন। রাজা বিনন্দকে রথ, হাতি, ঘোড়া সহ সুবর্ণ হার দিয়ে বরণ করেন। কাব্যের মধ্যে দেখা যায় বিনন্দ কর্তৃক গুরুবারে কমলা পুজো করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কৃষ্ণের সাক্ষাতে রাজা হওয়ার প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনই বিষ্ণুর বনিতা দেবী লক্ষ্মীর বিবরণ কথা ভূপতিকে শোনানো হয়েছে। ভক্তিভরে বিনন্দ কমলার পদধুলি মাথায় নিয়ে প্রভাত কালে বিরাট রাজা জামাতাকে বিদায় জানায়। আর বিবিধ যৌতুক তাকে প্রদান করে সেই সঙ্গে অর্ধেক রাজ্য, ধনরত্ন সমস্ত কিছুই বিনন্দকে রাজা দেন। সংস্কার অনুযায়ী দুর্বা দিয়ে জামাতা ও কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। যাত্রাকালে কন্যা পিতৃ-মাতৃপদ পূজা করে চোখের জলে বিদায় নেয়। কৌশল্যার মত রানী ক্রন্দন দৃশ্য সম্পর্কে কবি লিখেছেন –

"শ্রাবণে নয়ন হইল ছমাসের পথ।।"[১৬]

জননী, কন্যাকে জানায় প্রতি মাসে সমাচার নেবেন; আর যত্ন ভরে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে। এর ফলস্বরূপ ধনধান্য বাড়বে। এরপর বাদ্য বাজিয়ে ঐরাবতে চড়ে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে দেবী কমলাও শঙ্খধ্বনি করেন। যথাসময়ে রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে বিনন্দ নিজের গৃহে প্রবেশ করেন। পুত্রবধূকে কাছে পেয়ে খুশিতে বিনন্দের মাতা কমলার চরণ স্মরণ করেন। পুত্র ও পুত্রবধূকে সংস্কার অনুযায়ী দ্বিজ ব্রাহ্মণ ধান, দূর্বা দিয়ে বেদ মন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করেন। কমলার বরে রাজটীকা রত্ন সিংহাসন লাভ করেন। বিনন্দ কমলার বর পুত্র। বিনন্দ দানের ক্ষেত্রে কর্ণের সমান। পুত্রের মতো সকল প্রজাকে তিনি পালন করেন। দয়ারাম লক্ষ্মীর এই অমৃত কথা রচনা করেন।

কাব্যের অন্তিমে দেখা যায়, বিনন্দ এরপর থেকে কমলার বরে সুখ-শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকে। বিনন্দের মাতা ও বিনন্দ প্রতি শুক্রবারে তথা গুরুবারে দেবী লক্ষ্মীর পুজো করেন। সংস্কারবশত ঐদিন রীতি মেনে খই ভাজা ও মৎস্য পোড়া ভক্ষণ করেন না। এখানেই কবি দয়ারামের লক্ষ্মীর মঙ্গল গান সমাপ্ত হয়।

প্রথাগত মঙ্গলকাব্যের মতো এই লোককাব্যগুলিতে বিস্তৃত কাহিনি না থাকলেও লোকায়ত ও পৌরাণিক পরিমণ্ডলে এই সমস্ত দেব-দেবী নির্ভর কাব্য-কথায় গ্রামীণ সমাজমানস স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এই পালাগুলির কাহিনিতে কোথাও জটিলতা নেই। সরলতাই পরিলক্ষিত হয়। ভূমিহীন বিনন্দর দেবী কর্তৃক কৃপা লাভের কাহিনির মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার ছবি যেমন প্রকাশিত হয়েছে; তেমনি দেবতা কর্তৃক সংকট থেকে মুক্তি পাবার চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যেও দেখা গেছে হত দরিদ্র রাখালিয়া বিনন্দ দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় অভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। অর্থাৎ এ কাহিনি সূত্রে আমরা দেখি অনাবাদী জমিকে আবাদী করা হয়েছে। আর রাজকর না দেওয়ার জন্য বিরাট রাজা কর্তৃক বিনন্দ অপহৃত হয়েছে। দেবী লক্ষ্মীর বরপুত্র বিনন্দ। তাই তার দুঃখ ভোগের জন্য বিরাট রাজার পতন ও লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। পরে আবার রাজা নিজের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজের পাপ স্খালন করেন। এই কাহিনির বয়নে গ্রামীণ মানুষের জীবন কথা, নানান লোকাচার, ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানের কথাও লুকিয়ে আছে। এই কাব্য লোকায়ত জীবনের কাব্য। এই সব কাব্যকে লোকসংস্কৃতির পাঠক্রমেও যুক্ত করা দরকার। লক্ষ্মী পুজোর সময় এসব কাব্য কাহিনি আজও পাঠ করা হয়। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এই পালাগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তা এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করা যায়। সেই সঙ্গে মেদনীপুরের সাংস্কতিক পরিমণ্ডলটিও পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য আশুতোষ, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', কলকাতা ৭৩, এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন, পৃ. ৮-৯। (অতঃপর গ্রন্থটি 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' নামে উল্লেখিত)।
২. বেরা শ্যামল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৪১৪, 'কবি দয়ারাম পঞ্চানন্দের গীত', মন্দির পাড়া, হাওড়া ৭১১১১১, মনফকিরা, পৃ. ১৫। (অতঃপর গ্রন্থটি 'কবি দয়ারাম পঞ্চানন্দের গীত' নামে উল্লেখিত।)
৩. 'কবি দয়ারাম পঞ্চানন্দের গীত', পৃ. ১৭।
৪. 'কবি দয়ারাম পঞ্চানন্দের গীত', পৃ. ১৭।
৫. 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭৪৫।
৬. বেরা শ্যামল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), 'লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)', বসন্ত ২০১১, সূচনাপত্র পত্রিকা (ক্রোড়পত্র), মন্দিরপাড়া, জগাছা, হাওড়া ৭১১১১১, সহজপাঠ, পৃ. ৫১। (অতঃপর গ্রন্থটি 'লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)' নামে উল্লেখিত।)
৭. 'লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)', পৃ. ৫১।
৮. 'লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)', পৃ. ৫২।

৯. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৫৫।
১০. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৫৮।
১১. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৫৯।
১২. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৫৯-৬০।
১৩. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৬০।
১৪. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৬১।
১৫. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৬৪।
১৬. ‘লক্ষ্মীচরিত্র (বিনন্দরাখালের পালা)’, পৃ. ৭০।

একুশ শতকে চিত্তরঞ্জন দাশের চিন্তনের প্রাসঙ্গিকতা : একটি ঐতিহাসিক বীক্ষণ

ইন্দ্রজিৎ দাস
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ : পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ভক্তিসাধক শ্রী চৈতন্যদেব যেমন তাঁর ভাবের ধারায় বাংলা তথা বাঙালিকে গভীর ভাবে জারিত করেছিলেন তেমনি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক নব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সমাজের রক্ষণশীলতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল দরিদ্রনারায়ণের সেবা। একদিকে তিনি ছিলেন সমাজের পরিত্রাতা এবং অন্যদিকে দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিকপর্বে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিলেতে শুরু হলেও সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন ১৯১৬ সাল নাগাদ। রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্বে কংগ্রেসে যোগদান এবং পরবর্তীতে গান্ধীজীর সঙ্গে মতপার্থক্যের দরুন নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা, এ-সবই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে তিনিই প্রথম আঞ্চলিকতার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন এবং এভাবেই তিনি 'চিত্তরঞ্জন' থেকে 'দেশবন্ধু' হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রবন্ধ, চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর চিন্তাভাবনা কিভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অতি-গুরুত্বপূর্ণ বিক্ষান হয়ে উঠেছিল তাঁর গভীর অনুসন্ধান করতে চায়।

সূচক শব্দ : বাঙালি, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাজনীতি, আঞ্চলিকতা।

।। ১ ।।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি বাঙালির হৃদয়রঞ্জন নামে বেশি সমাদৃত। চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম ১৮৭০ সালে ৫ই নভেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতি ছাত্র আইসিএস পরীক্ষায় দু'বার অকৃতকার্য হয়েও মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে চিত্তরঞ্জন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু দাতা, পরিত্রাতা কিংবা দেশনেতা হিসাবে নন, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁর সমকালের দেশের সবচেয়ে প্রখ্যাত আইনজীবীও। তদুপরি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশও ঘটেছিল কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। কিন্তু এসকল পরিচয়ই লীন হয়ে একাত্ম হয়েছিল তার 'দেশবন্ধু' নামে।[১] শ্রী চৈতন্য থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু, মুজিবর রহমান,

অমর্ত্য সেন অবধি বহু শ্রেষ্ঠ বাঙালির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু কোনো বাঙালি তাঁর মতো দেশবন্ধু হয়ে উঠতে পারেননি।

চিত্তরঞ্জন দাশ বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর জীবনের প্রথম মামলাতেই তীব্র ধিক্কার জানালেন শেতাঙ্গ বিচারককে তাঁর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জন্য। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি একের পর এক বিখ্যাত মামলায় অংশীদার হয়ে উঠলেন। আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে তিনি সওয়াল শুরু করলে, তাঁর খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে দেখেই অরবিন্দ ঘোষ চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন- 'স্বয়ং নারায়ণ এসে হাজির হয়েছে'।[২] চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯০৯ সালের আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দকে "দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত দ্রষ্টা, মানবিকতার প্রেমিক" বলে বন্দিত করেছিলেন। তিনি সেদিন হয়তো বুঝতে পারেননি যে ঠিক এই কথাগুলিই তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে উঠবে, এই ভাবেই তিনি পরবর্তিকালের ইতিহাসে বর্ণময় চরিত্র হয়ে উঠলেন। বর্তমান প্রবন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা ও অবদানকে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

।। ২ ।।

একবিংশ শতাব্দীর এই উত্তর আধুনিকতার পর্বে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন হচ্ছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু তৎকালীন সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ সমাজের প্রথাগত ধ্যানধারণা, জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর আগমন এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। তাঁর রাজনীতির আবর্তে ছিল সাধারণ জনগণ। এর পাশাপাশি সর্বভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও যেভাবে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন তা প্রশংসনীয়। সামাজিক জীবনে চিত্তরঞ্জন দাশের অমায়িকতা, সৌজন্য ও বদান্যতা ছিল উদাহরণযোগ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন ধণবান ব্যারিস্টার, অথচ জনসাধারণের সহিত ব্যবহারে তার অহমিকার লেশমাত্রটুকুও নেই। যথার্থই তিনি ছিলেন দরিদ্র, দীন, আর্তের বন্ধু। তিনি জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন কিন্তু দীন আতুরের সেবায় তাঁর দান অফুরন্ত বলে বিদিত। যা কিছু উপার্জন করেছেন তা কখনও সঞ্চয় করেননি-তাঁর সঞ্চয় ছিল দিলীপের "ত্যাগায় সংভৃতার্থানাম"।[৩] চিত্তরঞ্জন দাশ স্বাধীন মুক্তিকামী মননের এক আদর্শ উদাহারণ হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁকে অন্যায়ের বন্ধনে কখনো আবদ্ধ হতে হয়নি। আসলে তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারী।

চিত্তরঞ্জন দাশের জনহিতকর মনন ইতিহাসে তাঁকে স্বাতন্ত্র স্থান প্রদান করেছে। তিনি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় উদাত্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে তিনি সর্বস্ব দান করেছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে, বেলগাছিয়ার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায়, পুরুলিয়াতে নিজ অট্টালিকাকে অনাথ আশ্রমে পরিণত করার পরিকল্পনাগুলিতে তাঁর দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার

আশ্রমে (নিত্যানন্দ আশ্রম) দুই লক্ষ টাকা দানের পাশাপাশি তিনি নিজ ভগিনী অমলাকে নিয়োগ করেছিলেন সেখানকার দেখভাল করার জন্য। কলকাতার ভবানীপুরের অনাথ আশ্রমেও তিনি অর্থ ব্যয় করেছিলেন আর্ত-পীড়িত মানুষদের কল্যানের জন্য।

চিত্তরঞ্জন দাশ অধিকাংশ সময় অযাচিতভাবে দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর সাহায্যকল্পে টাকা দান করেছিলেন। তিনি বহু সাহিত্যসেবীর অভাব মোচন, এবং বহু রচকের গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারে অর্থ-সাহায্য করেছিলেন। উদাহারণস্বরূপ বলা যায় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বেদবিদ্যার প্রচারকল্পে চিত্তরঞ্জন দাশ সাহায্য দান না করলে তার প্রচারই হত না। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন ঋনের দায়ে তাঁর বড় সাধের "সাহিত্য" পত্র বন্ধ করতে প্রায় বাধ্য, সেইসময় বাংলা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ চিত্তরঞ্জন দাশ তার সাহিত্য পত্রের ঋন পরিশোধ করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল মানুষ। একদা চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহশিক্ষক ছিলেন পূর্ণ বাবু। তিনি ছাত্রের কাছে 'ঋণ' হিসাবে টাকা নেওয়ার কথা বলতেই চিত্তরঞ্জন বললেন, 'মাস্টারমশাই, ও-কথা বলবেন না ওতে আমার পাপ হবে। পিতৃঋনের মতো গুরুঋণও তো একটা আছে'।[৪] তাঁর জমানো বহু মূল্যবান পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অর্পণ করেছিলেন। দাশ সাহেবের পুঁথিগুলি স্বতন্ত্র করে একটি আলমারিতে রাখার ব্যবস্থা হল। নামকরণ হল 'দেশবন্ধুর দান'।[৫]

এই সমস্ত ঘটনাবলির মধ্যে উদারবাদী চিত্তরঞ্জন দাশের দানশীলতার নানান পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীভেদের ঊর্দ্ধে অবস্থান করতেন। কলকাতায় ফিরে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। কিন্তু সেই সময় চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। এরকমই সময়ে বিক্রমপুরের নওগাঁর বাসিন্দা বরদানাথ হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রশ্ন তুলেছিল, 'ঈশ্বরের বিদ্রোহী' 'মাতাল' 'নাস্তিক' চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিয়েটা হচ্ছে কেন? এমতাবস্থায় সমাজের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে 'আমি হিন্দু নই' এই মর্মে উদ্ধৃত করে ১৮৯৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।[৬] তাঁর তীব্র আপত্তি ছিল ব্রাহ্মবিবাহের প্রণামী ও আচারগুলি নিয়ে। তাই দুজনে বিয়ের রাতে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমাদের ছেলেদের বিয়ের প্রণামীতে কখনোই আবদ্ধ করা হবে না।[৭] জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাশের অবস্থান ছিল সমাজের ঊর্দ্ধে। এই অবস্থানটি অনুভব করেছিলেন তাঁর বাড়ির লোকজনও। বড়িশালের কংগ্রেস কর্মী ভেগাই হালদার, জাতিতে ছিলেন নমঃশুদ্র। কলকাতায় এসে তিনি চিত্তরঞ্জনের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়িতে প্রচুর আত্মীয়স্বজনের আপত্তিকে দেশবন্ধু অমান্য করে একই আসনে অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে ভেগাইয়ের আহারের ব্যবস্থা করলেন। এর পাশাপাশি তিনি নিজ কন্যা অপর্নার শ্বশুর বাড়ি বিক্রমপুরের হাঁসড়ায় গিয়ে দূর্গা পুজোর দিন গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে বোঝালেন, চন্ডীমন্ডপে উঠে সকলের একসঙ্গে অঞ্জলি দেবার অধিকার রয়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সামাজিক চিন্তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক মানচিত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রকট হয়েছিল বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে সঞ্চারমান আঞ্চলিক-সাংস্কৃতিক জাতীয়তার উজ্জ্বল প্রকাশ। শৈশবকাল থেকেই তাঁর মননে দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটেছিল। দেশ চিন্তা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তিনি সক্রিয়ভাবে ১৯১৭-১৯২৫ পর্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করলেও তাঁর যোগদানের প্রেক্ষাপট শুরু হয়েছিল বিলেতে থাকাকালীন। ভারতীয় রাজনীতির শিক্ষাগুরু দাদাভাই নৌরজীর পার্লামেন্টে প্রবেশ লাভের সময় থেকেই চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর পক্ষসমর্থন করে বিলেতের নানাস্থানে ইংরেজ নর-নারীকে তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্নে রাজনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ভিক্ষামূলক নীতি। প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে ১৯০৬ সালের কলিকাতা অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক বক্তৃতা ছিল মূলত একটা সখের। ভারতবর্ষে রাজনীতি দেশের ধর্মনীতিতে পরিণত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীতে। চিত্তরঞ্জন দাশের দেশ-সাধনার দীক্ষা শুরু হয় স্বদেশি আন্দোলনের সময়কালীন। তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯০৫ সালের ৬ই জুলাই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির অ্যাসোসিয়েশন কক্ষে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রাচীনপন্থী কংগ্রেস ও উদীয়মান নবীন দলের মধ্যে যে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল, সেখানে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বাধীন নবীন দল জয়লাভ করে। বাংলার তথা সমগ্র ভারতে এখান থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সুত্রপাত ঘটে।[৮] আর এই যজ্ঞের হোতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি ১৯০৭ সালের কংগ্রেসের ভাঙ্গনের সময়কাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত অনন্যাকর্মা হয়ে আইন ব্যবসায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিলেন।

যে সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে গোপালকৃষ্ণ গোখলের হাত ধরে মহাত্মা গান্ধী তাঁর নতুন ধারার আন্দোলন অর্থাৎ সর্বভারতীয় রাজনীতির নির্মানের দিকে এগোচ্ছেন, এবং আস্বাদ করছেন অভূতপূর্ব সাফল্যের গৌরব, ঠিক তখনই বাংলায় অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করছেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি অসংশয়ী, আত্মপ্রত্যয়ী 'বাঙালি জাতীয়তার' বার্তা নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। তিনিই প্রথম বাঙালিকে পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন যে, সমস্ত মাটির সন্তানরা তাদের ধর্মীয়, জাতিগত বা অন্যান্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে উঠুক।[৯] চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলার জাতীয়তাবাদ ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে বিশেষ মাত্রা পায়। সেই কারণে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকটির বাংলার ইতিহাসে একটা পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করলেও গান্ধীর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তিনি নিজের দূরত্বও বজায় রেখেছিলেন। তিনি আঞ্চলিক জাতীয়তাকে তুলে ধরে কেবল ক্ষান্ত হননি, সেই আঞ্চলিক জাতীয়তার বাস্তবে পা রেখে, অঞ্চলের

মধ্যে যে বিভিন্ন সাম্প্রদায় ভিত্তিক স্বার্থের সংঘর্ষ, তার মীমাংসার মাধ্যমে নতুন রকম প্রশাসনিক ও সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, আর সেই কাঠামো ছিল অঞ্চল ভিত্তিক রাজনীতির কাঠামো। এই প্রাশাসনিক বন্দোবস্তের নাম হল 'বেঙ্গল প্যাক্ট'। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে তিনি মোটেই সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসাবে দেখেননি। বরং সেই জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁর কাছে নতুন রাজনীতি নির্মাণের অস্ত্র। আসলে তা ছিল বাংলা ও বাঙালিকে ঢেলে সাজিয়ে নতুন ভাবে গড়ে তুলবার মন্ত্র।[১০]

দেশবন্ধু চিরকালই অভিজাতবর্গের একাধিপত্যভোগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতি রুপে চিত্তরঞ্জন দাশের সরাসরি রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও এর স্বার্থকতার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন- 'বাঙলার কথা, বাঙালিকে মানুষ করে তোলার কথা'।[১১] তাঁর রাজনীতিতে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে ছিল বাংলার মানুষ। কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্বের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহন না করার কারণে তিনি শিক্ষিত সমাজকে দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেন যে, আমাদের উপর দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নেই কারণ আমরা যে তাদের ঘৃণা করি। অর্থাৎ তিনি এখানে একাত্ববোধের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ 'মর্ডান রিভিউ'- তে রবীন্দ্রনাথের 'নেশন' বিরোধী বক্তৃতার বয়ান পড়ে প্রথম দিকে বিচলিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কবির 'নেশন' চিন্তার মর্ম উপলব্ধি করে খানিকটা গ্রহন করেছিলেন। তিনি অগাধ অর্থোপার্জ্জনের মায়াকে দূরে সরিয়ে রেখে ১৯১৭ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার সম্পর্কে প্রচার করতে লাগলেন। স্বায়ত্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, - "ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন স্বার্থের লোককে একতাবদ্ধ করিতে হইলে এবং সর্বসাধারনের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে তাহাদিগকে একত্র হইয়া একই মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনের সুযোগ দিতে হইবে, সুতরাং আমাদের ধর্মগত, জাতিগত ও স্বার্থগত বৈষম্য ও অনৈক্য দূর করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনই একমাত্র উপায়"।[১২]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২০ সালে উচ্চ আদালতে রাজকীয় টাকার অঙ্কের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় বিক্ষোভ শুরু হল, জনগণ 'বন্দে মাতরম' ও 'দেশবন্ধু দাশ কি জয়' ধ্বনি দিল।[১৩] ১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু আইসিএস ত্যাগ করে কলকাতায় তাঁর নিকট দেখা করতে আসেন। তাঁর অসামান্য উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র "এক জন নেতাকে খুঁজে পেলেন" এবং "এঁরই পদানুসারী হবেন" বলে সংকল্প করলেন। দেশবন্ধুর সহধর্মিণী ও সুভাষচন্দ্রের মাতৃসমা বাসন্তী দেবীর গ্রেফতারের ফলে অসহযোগ আন্দোলনে নতুন জোয়ার এল। ১৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র একই সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মতিলাল নেহেরু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সংকটময় মূহূর্তে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিকল্প প্লাটফর্ম হিসেবে 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনেবিশক শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বরাজ দলের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দলটি ভারতের রাজনীতিতে বেশ কিছু নতুন ধারা চালু করেছিল। ১৯২৩ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট স্বরাজীরা খুব ভালো ফলাফল করেছিল। ইংরেজদের 'ডায়ার্কি' প্রথার সাম্রাজ্যবাদী দ্বিচারিতাকে প্রকাশ্যে এনে দেশবন্ধু দুইবার মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন। ১৯২৪ সালে স্বরাজ দল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিপুল আসন লাভ করে। দেশবন্ধু কলকাতার মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং ডেপুটি মেয়র হিসাবে হোসেন সোহরাওয়াবর্দী শপথ গ্রহন করেন। কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ড্যারম্যান হন শরৎ চন্দ্র বসু, এবং দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ করলেন।

এই সময়কাল থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ 'বাঙ্গালার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা'র কাজে মনোনিবেশ করেন। এর জন্য তিনি অনুধাবন করলেন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা। এবং তিনি এই প্রশাসনিক মডেল নির্মাণের কাজে মনস্থির করেন। যে প্রশাসনিক মডেলের প্রতিটি পদক্ষেপে থাকবে আঞ্চলিক জাতির আত্মপ্রত্যয়। তাঁর প্রাদেশিক প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন। তাঁর মতে জাতিই হোক কিংবা জাতি-পরিচয় হোক, সেটা তৈরি হয় বিশ্বাস এবং কল্পনার থেকে। তাই তিনি তাঁর প্রতিটি ভাষণে সেই বিশ্বাস ও কল্পনাকে শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। এই সময় চিত্তরঞ্জন ঢাকায় একটি বক্তৃতা দেন, যার বিষয়বস্তু ছিল-

> 'The Nationalist ideal' .... When I speak of the Hindus, I am at ones reminded of the Mahammedans of Bengal. They have also lived in Bengal.When I am speaking of Provincial autonomy, I am not forgetting any community ore members pf any particular region. I want to include all of them, and I say, taking the whole of them, there is a distinct individuality of bengal. It is on that individual nature that we are must like our stand. Now, gentlemen provincial government must be so formed that it will not loss the particular interest which that individuality requires.[১৪]

তিনি কেবল চিন্তাবাদী নন, তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ রাজনৈতিক নেতা, বাংলার আন্দোলনের হোতা, বাংলার প্রাদেশিক শাসনের ধারক ও বাহক। তাই ১৯২৩ সালের

ডিসেম্বর মাসে ঘোষিত হল ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’। তাঁরপ্রধান লক্ষ্য ছিল ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ এর মাধ্যমে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান সমাজকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে উদবুদ্ধ করা। বেঙ্গল প্যাক্টে উল্লেখিত হল স্বরাজ লাভ হলেই মুসলিমদের জন্য সমস্ত প্রশাসনিক পদের ৫৫ শতাংশ সংরক্ষিত করা হবে। বেঙ্গল প্যাক্টই ভারতের প্রথম প্রশাসনিক বন্দোবস্ত, যাতে বহুধা বিভক্ত স্বার্থ গুলিকে জোর পূর্বক একত্রিত করা হয়নি, বরং স্বার্থগুলিকে সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল নানান উপায়ে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায় বিচারের একটি দৃষ্টান্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্থাপন করলেন। এই একটি কাজের মধ্যে দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের যে পরিমান আস্থা অর্জন করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, তা অভূতপূর্ব। অবশ্যই তিনি অবহিত ছিলেন সংরক্ষন নীতির সম্পর্কে। কারণ সংরক্ষনের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে একটা সংঘর্ষময় পরিস্থিতি, তাই ‘আইডেন্টিটি পলিটিক্স’- কে জায়গা দিতে হলে ‘আইডেন্টিটির’-র সংঘাতকে ও মাথায় রাখতে হবে বলে মনে করতেন।

।। ৩ ।।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা বলা যায় যে, তৎকালীন সামাজ ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। দেশের অবহেলিত, নিষ্পেষিত মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ সেবা হয় না, একথাই কেবল তার মুখেই সাজে। তাই জন্য তাঁর উপার্জনের একটা বড়ো অংশ তিনি দান কার্যে ব্যয় করতেন। এত বড়ো উচ্চাঙ্গের স্বদেশ –প্রেম – তন্ময়তা ক’জন দেখাতে পেরেছেন। বর্তমানকালে যেভাবে সামাজিক নৈতিক বোধের অবনমন ঘটে চলেছে, সেক্ষেত্রে তিনি উদাহারণযোগ্য। আলোচ্য সময়কালে জাতিভেদ প্রথা গোটা সমাজকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রেখেছিল, তিনি হিন্দুত্ববাদীদের কাছে চক্ষুশূল হয়েও সেই বেড়াজালকে ভেঙ্গে নিজের বাড়িতে একজন নমঃশুদ্রকে কেবল আশ্রয় দান করা নয়, এবং নিজপুত্র চিররঞ্জনের জন্য অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা করা এগুলি তারই প্রমাণ। এর পাশাপাশি তিনি বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান অর্থাৎ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপন করেছিলেন তা এক স্মরনীয় ঘটনা। ঐতিহাসিক এ, লিওনার্ডো গর্ডনের মতে, “চিত্তরঞ্জনের কাছে এমন কিছু অসাধারন গুণ ছিল যা অন্য কোনো বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ছিল না, শুধু বাঙালি মুসলিম নয় সমগ্র ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে বিশ্বাস করত”।[১৫] ব্রিটিশ প্রশাসনেই হোক কিংবা কালক্রমে ভারতের প্রশাসনেই হোক, সংরক্ষণ যে ভারতের বাস্তবকে সামাল দেওয়ার একটি অবশ্যম্ভাবী পথ, সেটা ক্রমেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন ভবিষৎদ্রষ্টা। পরাধীন ভারতের মানচিত্রে তিনিই বাঙালিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভারতের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর ‘গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন’ নামক রচনায় তুলে ধরছেন যে, চিত্তরঞ্জন দাশ সারা ভারতের নেতা হয়েও ‘অঞ্চলের নেতা’ হতে পেরেছেন, কেননা অঞ্চলের জাতীয়তাবাদে তিনি

বিশ্বাস রেখেছিলেন। আসলে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদকে প্রশমন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরবর্তিকালে আঞ্চলিক সত্তা ও আঞ্চলিক স্বার্থের হয়ে কথা বলাটা ধীরে ধীরে এদেশে সংকীর্ণতা কিংবা পশ্চাৎমুখিতার নামান্তর হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর চিন্তাভাবনা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন সামজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিক থেকে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ১৯২৫ সালের ১৬-ই জুন দার্জিলিং এ চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন- "এনেছিলেন সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই করে গেলেন দান"। ব্রুমফিল্ডের মতে, তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় রাজনীতিতে এক যুগের অবসান ঘটেছিল। ওই সময় পত্র-পত্রিকা গুলি তাঁকে বাংলার মুকুটহীন রাজা (Uncrowned King) বলে আখ্যায়িত করেছিল।[১৬] তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি হৃদয়ে এক গভীর শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সাম্যের ভিত্তিতে দেশবন্ধু একটি উদার দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের পথকে আলোকিত করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের পথ ধরেই ভারতবর্ষের ধর্মীয় বিভিন্নতার বিষয়ে এই উদার মহানুভবতার আদর্শকে সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনীতিতে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক স্বাধীনতার সুমহৎ আদর্শের জন্য দেশবন্ধু যে ভাবে ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, তা আজ প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত। বাঙালী যদি তার কিছুর জন্য চিত্তরঞ্জনের নিকট কৃতজ্ঞ না থাকে তবে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির সাহিত্য-প্রীতির জন্য থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্যসুত্র:

১. Paul Greenough: *The death of an uncrowned king - C. R. Das and political Crisis in Twentieth Century Bengal*, London, Cambridge University Press, 2009, P- 421

২. D. K Chatterjee: *C. R. Das and National Movement, A study,* Calcutta, Postgraduate Book Mart, 1965, P- 7

৩. সত্যেন্দ্রনাথ বসু: *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন*, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩২৪ সন, পৃষ্ঠা-৫৮

৪. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন*, কলকাতা, পারুল প্রকাশনী, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ১৪৪

৫. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তশ: *তদেব*, পৃষ্ঠা- ১৪৭

৬. অর্ঘ্য বন্দোপাধ্যায়: *দেশনেতা চিত্তরঞ্জন*,আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ এপ্রিল, ২০২১

৭. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৭৮

৮. সত্যেন্দ্রনাথ বসু: *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৬৫

৯. Johon Broomfield: *Elite Conflicts in a Plural Society: Twentieth- Century Bengal*, Barkeley and Los Angeles, University Of California, 1968, P- 221

১০. সেমন্তি ঘোষ: স্বজাতি স্বদেশের খোঁজে, কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৬৪

১১. Manindranatrh Dutta and Haradhan Datta (edit): *Deshbandhu Rachanasamagraha, vol 1*, Calcutta, Tulikalam, 1977, P- 22

১২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু: *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৬৮

১৩. John, Broomfield: *op.cit.* P- 221

১৪. সেমন্তি ঘোষ: *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৬৭

১৫. Leonard A Gordon: *Bengal: The Nationalistic Movement 1876-1940*, Newyork, Columbia University Press, 1974, P- 220

১৬. *Ibid.* P- 421।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর : সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের উপর অভিঘাত

সুরজিৎ ঘোষ
গবেষক, সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিস অ্যান্ড মিউজিয়াম
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ১৩৫০ বঙ্গাব্দ তথা ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অংশে যে দুর্ভিক্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল- তা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক সেনা ও যুদ্ধে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য বিপুল পরিমাণে খাদ্য মজুত করতে থাকলে চালের দাম আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে কালোবাজারির দল ব্যাপকভাবে খাদ্য মজুত করার ফল স্বরুপ খাদ্যশস্য বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া জাপান ভারত দখলে অগ্রসর হলে ব্রিটিশ সরকার জাপানী হামলার ভয়ে নৌকা ও গোরুর গাড়ি বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে খাদ্য সরবরাহের সম্পূর্ণ কাঠামোটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যার ফলস্বরুপ প্রকটিত হয়েছিল দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সেই নায়করা আজ বাংলার বুকে নেই, শুধু রয়ে গিয়েছে সমকালীন শিল্প-সাহিত্য - যা এই দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ অনুসন্ধানের জন্য না হলেও দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিবৃত করবার জন্য এই সাহিত্য কর্মের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Mortality এর হিসেব অন্যান্য সমীক্ষা থেকে জানা সম্ভব হলেও Morbidity এর হিসেবের ক্ষেত্রে এই শিল্প-সাহিত্য অপরিহার্য। যা একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষকালীন পরিবেশের সামাজিক সংকটকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছে অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালায় ডাস্টবিনের পচা খাবারকে কেন্দ্র করে মানুষ ও কুকুরের মধ্যে লড়াইয়ের এক করুণ চিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি রুপায়ণে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস। মানুষকে বাদ দিলে ইতিহাস নেই আবার মানুষ যখন সত্যিই একা, তখনও ইতিহাস নেই। কিন্তু একলা মানুষটির দেখা মিলতে পারে সাহিত্যে।[i] ইতিহাস মানুষের, কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। একজন সাহিত্যিক কিন্তু ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং সৃজনী কল্পনার সাহায্যে এই কাজটি করতে পারেন।[ii] তাই একজন সাহিত্যিক যেমন স্রষ্টা হতে পারেন তেমন দর্শক হিসাবেও নিজেকে তুলে ধরতে পারেন, সেখানে ঐতিহাসিক শুধুই দর্শক। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। তাইসাহিত্য চিরকালই সমসময়ের অবধারক। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সমকালের কণ্ঠস্বর প্রতিধবনিত

হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙিনায়। এইক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষও বাংলা সাহিত্যে এক চিরন্তন স্বাক্ষ্য রেখে গেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যের পরিসরেও বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখায় ফুঁটে উঠেছিল সেই দেশের মহামারী বিষয়ক নানা চিত্র। তবে চলমান সমাজের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় ঘটে যাওয়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র রুপায়ণে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সামাজিক বিপন্নতার চিত্র ভাষারুপ পেয়েছিল বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। এক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ-আকাল-মন্বন্তরের বহু জীবন্ত চিত্রকে সেই সময়ের সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখণীতে তুলে ধরেছিলেন - যা আজও আমাদের কাছে সেই সময়ের জীবন্ত দলিল।

১৩৫০ বঙ্গাব্দে ঔপনিবেশিক বাংলায় এই দুর্ভিক্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল বলেই এটি পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানি সেনাবাহিনীর হাতে বার্মার পতন হলে, সেখান থেকে বিপুল চাল আমদানির পথ বন্ধ হয়ে যায়।[iii] এর পাশাপাশি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক সেনা ও যুদ্ধে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য বিপুল পরিমাণে খাদ্য মজুত করতে থাকলে চালের দাম আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে কালোবাজারি দলের ব্যাপকভাবে খাদ্য মজুত করার প্রবণতা এবং সরকারি অব্যবস্থাপনার ফলস্বরুপ খাদ্যশস্য বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া জাপান ভারত দখল করতে উদ্যত হলে ব্রিটিশ সরকার জাপানী হামলার ভয়ে নৌকা ও গোরুর গাড়ি বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে খাদ্য সরবরাহের সম্পূর্ণ কাঠামোটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যার ফলস্বরুপ প্রকটিত হয়েছিল দুর্ভিক্ষ। সরকারী অনুসন্ধানের নিরিখে গঠিত হয়েছিল Famine Inquary Commission India.[iv] এই Famine Inquary Commission এর রিপোর্ট অনুযায়ী পঞ্চাশের মন্বন্তরে মৃতের সংখ্যা পনের লক্ষ। যদিও সংখ্যাগত বিরোধীতার দিকটিও পরিলক্ষিত হয়েছিল।[v] কারণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষক পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনায় গভীরভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন। এর মধ্যে আমেরিকার পল. আর. গ্রিনো, বি. এম. ভাটিয়া, ও অমর্ত্য সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন গবেষণার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন অন্যদিকে কমিশন প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্যসমূহকে যুক্তি সহযোগে বিশ্লেষণ করতে এবং প্রয়োজনে তথ্যপ্রমাণ খণ্ডন করতে তৎপর হয়েছিলেন।[vi]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সেই নায়করা আজ বাংলার বুকে নেই, শুধু রয়ে গিয়েছে সমকালীন শিল্প-সাহিত্য - যা এই দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ অনুসন্ধানের জন্য না হলেও দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাবিবৃত করবার জন্য এই সাহিত্য কর্মের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। Mortality এর হিসেব অন্যান্য সমীক্ষা থেকে জানা সম্ভব হলেও Morbidity এর হিসেবের ক্ষেত্রে এই শিল্প-সাহিত্য ছিল অপরিহার্য। দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিঃস্ব রিক্ত মানুষের হাহাকারে রিদ্ধ

হয়েছিল এই ইতিহাস। শুধু কঙ্কালসার শরীরের মৃত্যুমিছিল আর শেয়ালের হুক্কাহুয়া শব্দের সাথে কান্নার রোল মিলে মিশে প্রতিটি রাতকে ভয়ংকরী করে তুলত।[vii] পেটের ক্ষুধা মুখের হাসিকে করেছিল ম্লান আর বদলে দিয়েছিল তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা। সেই সমস্ত ম্লান মুখগুলির প্রতিচ্ছবিই নির্মীত হয়েছিল সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। যেখানে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারের প্রতিবাদহীন জীবন যন্ত্রণা এবং অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়া হতশ্রী গ্রামের চিত্রও পরিস্ফুটিত হয়েছিল। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সেদিন চোখের ওপরেই দেখেছিলেন কতরকমভাবে নরবলি দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ। দেখেছিলেন, গ্রামবাংলা থেকে দলে দলে মানুষ খাদ্যের প্রত্যাশায় শহরের দোরে দোরে ফ্যান ভিক্ষা চেয়ে ঘুরছে। রাস্তার কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। আর ভাই বোনের হাত থেকে, মা সন্তানের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিচ্ছে। স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রী, বাপ-মা পরিত্যক্ত ছেলে রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথের পাশে পড়ে আছে কঙ্কালসার মৃতদেহ। কালোবাজারিদের দৌলতে ঔষধ দুর্লভ হয়ে পড়ায় বিনা চিকিৎসায় মরেছিল অসংখ্য মানুষ।[viii]

দীর্ঘকাল ক্ষুধার জ্বালায় ক্রমে নিঃশেষিত এবং পরিণামে মৃত্যু - এই ছিল দুর্ভিক্ষের সারকথা। কিন্তু এছাড়াও দুর্ভিক্ষ বিভিন্ন চেহারায় প্রকাশ পেয়েছিল। বাঙালির ধারণায় অনাহারই যে দুর্ভিক্ষের চরম উপসর্গ ছিল এমন নয়, দুর্ভিক্ষের কারণে সামাজিক ও নৈতিক অবয়বটাও ধ্বসে পড়েছিল।[ix] সমস্ত বাংলার বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগী লিখেছেন, চাষীরা বিদায় নিয়েছে, বিদায় নিয়েছে গৃহস্থরা, গৃহস্থের বাড়ি থেকে চাল উধাও হয়েছে। দুধ দেবার গোরু নেই। দেবতার পূজা হয় না, সন্ধ্যায় গৃহস্থের ঘরে প্রদীপ জ্বলে না। এইভাবে বাংলার অতীতের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।[x] যা অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙিনায়। যেখানে চরম ক্ষুধায় সামাজিক সম্পর্কগুলি আলগা হয়ে গিয়েছিল। এক টুকরো আলু ছেলে মায়ের পাত থেকে নিয়ে নিলে, মা তাকে প্রহার করতে শুরু করে। এছাড়া ত্রাণশিবিরে মা খেতে খেতে কোলের শিশু সন্তান তার কোলেই মারা গেছে - এরকম ঘটনা ছিল খুবই সাধারণ।[xi] এই ঘটনাগুলিই বাংলা সাহিত্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

এই চরম বিপর্যয় ও বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চল্লিশের দশককে পর লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের লেখণী ও শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের নিরন্তর চাপা কান্নার প্রতিধ্বনিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের সামাজিক প্রভাব আলোচনাকালে অতি অবশ্যই সমকালীন পরিস্থিতির উপর রচিত সাহিত্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। যেখানে লেখককুল অনন্য ভঙ্গিতে সমকালীন সমাজের অবক্ষয়ী চিত্রটিকে উপস্থাপিত করেছেন। তবে এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন চিত্র রুপায়ণে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তিটিও ছিল বিশাল। বাংলা কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের সমন্বয়ে একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষের করাল

ভয়াবহ বীভৎস রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছিল অন্যদিকে বাংলা নাটক, গান ও চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়েও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, ক্ষুধিত পীড়িত অসহায় মানুষের চিত্র ফুটে উঠেছিল। তবে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় সমসাময়িক উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি হয়ে উঠেছিল দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে চিত্রিত করার অন্যতম ঐতিহাসিক দলিল। কারণ অনেক সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক এই দুর্ভিক্ষের করুণ ছবিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁদের লেখনীতে চিত্রিত করেছিলেন।

সংখ্যাগত বিচারে পঞ্চাশের মন্বন্তরের চিত্র রূপায়ণে ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসের সংখ্যা ছিল সীমিত। কারণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে বাস করে ছোটোগল্পে জীবনের সমগ্রতা ফুটিয়ে তোলার দরকার হয় না, কিন্তু উপন্যাসে একটা বৃহৎ পরিধির সমগ্রতা ফুটিয়ে তুলতে হয়। তবে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে লিখিত উপন্যাসগুলি দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করে মানুষের চিত্র রূপায়িত করতে পেরেছিল।[xii]এই প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্বন্তর ছিল একটি বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রাম থেকে আসা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর খাদ্যাভাবের ফলে দারুণ দুর্দশার কথা প্রতিফলিত হয়েছিল এই উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছিল কানাই। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন - "১৯৪৩ এ মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্করী মূর্তি- দুর্ভিক্ষ, তার পিছনে আসছে মহামারী, আকাশ বারুদের ধোঁয়ায় কালো, প্লেন-শকুনি যেন এক হয়ে গেছে। ঝাপসা চারিদিকে ঝাপসা।[xiii] তদানীন্তন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয়ও পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। এছাড়া নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জাপানী বোমার ভয়ে পলায়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক অবিরত সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়েছিল এই উপন্যাসে।

দুর্ভিক্ষের পটভুমিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অশনি সংকেত" ছিল আর একটি অন্য ধরনের উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি গ্রাম এবং প্রধান চরিত্র ছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাচরণ যিনি পাঠশালায় শিক্ষকতা ও পূজাঅর্চনা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে দুর্ভিক্ষের ছবি প্রতিফলিত না হলেও মূলত প্রাক-দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটে উঠেছিল। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার অভাবী চিত্রটি হয়ে উঠেছিল জীবন্ত। গ্রামের লোকেরা ধানের দর বেশি পাওয়ায় সব ধান বিক্রি করে দিয়েছিল। অনঙ্গ বৌয়ের কথার উত্তরে ভানুর বক্তব্য যার প্রমাণ বহন করে –“আ মোর কপাল, ক্ষেতের ধান ছ- টাকা মন যেমন হল, অমনি কাকা সব ধান আড়তে নিয়ে গেল গাড়ি পুরে, বিক্রি করে নগদ টাকা ঘরে আনল। নবাবি করে সে টাকাও উড়িয়ে ফেললে, এখন সে ধানও নেই, সে টাকাও নেই...”[xiv] ফাঁকা চালের গুদামের চিত্রও ফুটে উঠেছিল এই উপন্যাসে। দোকানদাররা দোকানে চাল রাখতে ভয় পাচ্ছিল, পাছে লুট হয়ে যায় বা পুলিশ মিলিটারির জন্য কম দামে নিয়ে যায়। একটি উক্তির মধ্য দিয়ে যা ফুটে উঠেছিল- “কি করবো বাপু সেদিন

পাঁচু কুণ্ডুর দোকান লুঠ হবার পর কি করে এখানে সাহস করে মাল রাখি বলুন, সবারই যে দশা, তার উপর শুনছি পুলিশে নিয়ে যাবে চাল কম দামে মিলিটারির জন্য”[xv]এছাড়া যুদ্ধ, বার্মার পতন, ইভ্যাকুয়েশন এবং সরকার ও মজুতদারদের শস্যসঞ্চয় নীতির ফলে আস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কাহিনীও এখানে উল্লেখিত হয়েছে। গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস ‘পঞ্চাশের পথে’, ‘ঊনপঞ্চাশী’, ও ‘তেরশ পঞ্চাশ’ ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বিনয় ডাক্তার চরিত্রটি বিশেষভাবে উঠে এসেছে। ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। নগর ও গ্রাম উভয় জায়গারই দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে।[xvi] মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের‘চিন্তামণি’ উপন্যাসটিও দুর্ভিক্ষের আঙ্গিকে সীমিত পরিসরে দুর্দিনের ছবি তুলে ধরেছিল। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র চিন্তামণিকে ক্ষুধার জ্বালায় অন্যের বাড়িতে কাজ নিতে হয়েছিল কিন্তু সেই গ্রামেও দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রকটিত হয়েছিল। কমলকুমার মজুমদারের ‘খেলার প্রতিভাও’ একটি অন্যতম দুর্ভিক্ষের উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক যেন শুধু মানুষ নয়, মানুষের ব্যঙ্গচিত্র - যারা শুধু খিদে মেটানোর উপায় খুঁজতে ব্যস্ত। যারা পেটের খিদেয় দিশাহারা হয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে বেরিয়েছিল। সামাজিক সম্পর্কের বাঁধনগুলি কীভাবে আলগা হয়েছিল তার চিত্রও ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। সুবোধ ঘোষের ‘তিলাঞ্জলী’ উপন্যাসটিতেও দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতির রুপরেখা পরিস্ফুটিত হয়েছিল। একদিকে এক অফুরান অন্ত্যোষ্টির মিছিল অন্যদিকে ক্ষুধার জন্য হাহাকার। তারই মধ্যে পথের ওপরেই একটা শুকনো নারকেলের ডেগোর ওপর ছোট্ট একটা ছেলে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার চোখের কোটর দুটো মাছিতে ভরতি- বিকট পক্ষ্মহীন প্রেতচক্ষুর মতো দেখাচ্ছে। মরেনি এখনও, পেট আর পাঁজরাগুলির মধ্যে নিশ্বাসের স্পন্দন এখনও লুকোচুরি খেলছে।'[xvii]এইভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ভয়াবহ বীভৎস রূপ আছড়ে পড়েছিল গ্রাম বাংলায় এবং প্রতিফলিত হয়েছিল সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সবথেকে খারাপ দিকটি ছিল সামাজিক অবক্ষয়। মন্বন্তরের করাল ছায়ায় সুখী সামাজিক পরিকাঠামোটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর্থিক ও সামাজিক ভাঙ্গনকে কেন্দ্র করেই শিথিল হয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারের ঐক্য এবং ক্ষুধার তীব্রতা সমাজের সুখী আবরণকে ঢেকে দিয়েছিল। চোখের সামনে মেয়েদের জগৎ বদলে গিয়েছিল দ্রুত গতিতে। টাকার প্রয়োজনে এবং বাঁচার প্রয়োজনে মেয়েদের অন্দরের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সমস্ত ছবিগুলিই প্রতিফলিত হয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা বিভিন্ন বাংলা ছোটোগল্পগুলিতে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের পরিসর ছিল বিশাল।[xviii]এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল পরিমল গোস্বামি সম্পাদিত মহামন্বন্তর - যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। যেখানে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে ফুটে উঠেছিল দুর্ভিক্ষ

তাড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার। প্রথম গল্পটি ছিল অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের লেখা। গল্পটিতে ক্ষুধার জ্বালা চিত্রিত হয়েছিল- যে জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বাড়ির মেয়েরাও বাইরে বেরিয়েছিল খাবারের সন্ধানে। এছাড়াও তিনি অনেক গল্প লিখেছিলেন দুর্ভিক্ষের বীভৎসতাকে তুলে ধরতে। এক্ষেত্রে 'শতগল্পে' পাওয়া বাঁশবাজি, কালনাগ, হাড়, চিতা, কাক, কালোরক্ত, বস্ত্র প্রভৃতি গল্পগুলি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[xix]খাদ্যাভাবের পাশাপাশি মেয়েদের বস্ত্রাভাবের চিত্রটিও ফুটে উঠেছিল তাঁর বস্ত্র গল্পটিতে। একটি ছিন্ন ধুতিকে কেন্দ্র করে শাশুড়ি আর বউয়ের শোকপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল। এছাড়া অনেকে লজ্জা নিবারণ করতে আত্মহননের পথও বেছে নিয়েছিল।

মন্বন্তরকালীন পরিস্থিতিতে ঘরছাড়া নিরন্ন বস্ত্রহীন মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ ছবি ও সমাজে তার প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিভিন্ন ছোটোগল্পগুলিতেও। এর মধ্যে 'পোষলক্ষ্মী', 'ইস্কাপন' গল্পগুলি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। এছাড়া 'মরামাটি', 'অহেতুক' প্রভৃতি গল্পগুলিতেও দুর্ভিক্ষের ছায়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিভিন্ন ছোটো গল্পগুলিতেও এই কালবেলার বীভৎস রুপ প্রকাশিত হয়েছিল। আড়তদার ও মজুতদারদের সীমাহীন লোভ, তহবিলে আরো কিছু জমা রাখার উদগ্র বাসনা এবং ধনী ব্যবসায়ীদের দ্বারা তৈরি করা কৃত্রিম মন্বন্তরের চিত্র ফুটে উঠেছিল তাঁর লেখা 'অসহযোগী' গল্পে। তিনি চিহ্নিত করেছিলেন সেই সমস্ত মানুষদের, যাদের কাছে মন্বন্তর ছিল সৌভাগ্যের সোপান। মানুষের অকাল মৃত্যুর মিছিল তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। তাঁর লেখা 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' গল্পটিতেও এই সময়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর আজ কাল পরশুর গল্পের বইটিতেও বিভিন্ন দুর্ভিক্ষকালীন পরিস্থিতি উত্থাপিত হয়েছিল। যেখানে গ্রীষ্মের দীর্ঘায়িত দিনে গ্রাম-বাংলা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, খিদের জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে মানুষের পেট এবং ব্যাপক খাদ্যাভাবের জন্য এক তীব্র সংকট। দলে দলে ক্ষুধার্থ মানুষের ভিড় জমতে থাকে শহরে। গোরু- ছাগলের খাদ্য নিয়ে মানুষে-মানুষে কাড়াকাড়ি। মৃতদেহ মায়ের পাশে বসে তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষূধার্ত শিশুর টানাটানি। দুর্ভিক্ষের আগে পথে কুকুরের দলের হল্লায় গোটা গ্রাম জেগে উঠতো, কিন্ত এই মহামারীর কবলে পরে মানুষ ও কুকুর একসঙ্গে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে।[xx] ১৩৫০ এর মন্বন্তরে শুধুমাত্র যে খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল তা নয়, এর পাশাপাশি দেখা গিয়েছিল মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য লজ্জা নিবারণের বস্ত্র সংকট। এক্ষেত্রে অনেক মেয়েই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। যা তাঁর গল্পের একটি অংশে উল্লেখিত হয়েছে।[xxi]

এছাড়া সমকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে চিত্র অঙ্কণ করেছিলেন - তা ছিল ক্ষুধা পীড়িত মানুষের হাহাকারের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। এখনে উল্লেখিত হয়েছিল কীভাবে সৈন্যবাহিনীর আগ্রাসী ক্ষুধা না খেতে পাওয়া মানুষের

মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। একদিকে সারা বাংলা জুড়ে নিরন্ন বিবস্ত্র নরনারীর গগনভেদী হাহাকার, আর তারই বুকে বসে মুনাফাশিকারী, মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ স্বকর্ণে শুনেছেন এবং সাহিত্যের পাতায় সেই সমস্ত নিরন্ন মানুষজনদের বাস্তব চিত্র অঙ্কণ করেছেন। তাঁর ‘বীতংস’, ‘হাড়’, ‘নক্রচরিত’, ‘পুষ্করা’ প্রভৃতি ছোটোগল্পে দুর্ভিক্ষের কবলে পরে মানুষের অসহায় অবস্থার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। মৃত মানুষের মিছিল রাস্তায় রাস্তায় দেখা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি লেখায় ফুটে উঠেছে–“ মতি পালের বউ গলায় দরি দিয়ে ঝুলছে। শেষ সম্বল ছিন্ন লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে - লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পুর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারীদেহটা একটা দানবীয় বিভীষিকা যেন...”[xxii]এইরকম অসংখ্য মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল সমসাময়িক বিভিন্ন ছোটোগল্পে। এক্ষেত্রে রমাপদ চৌধুরীও এই দুর্ভিক্ষের করুণ ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শহরময় “একটু ফ্যান দে মা, একটু ফ্যান দে মা” বলা কণ্ঠস্বরকে এবং ফ্যানের জন্য কাড়াকাড়িকে তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষের চিত্র রূপায়িত হয়েছিল সমকালীন বাংলা কবিতাতেও। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি লেখকদের কবিতায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাংলার মানুষের বিপর্যস্ততার চিত্র প্রতিভাত হয়েছিল। নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটকটি। "নবান্ন" এর পূর্বে 'জবানবন্দী' নাটকটিও ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তুলসী লাহিড়ীর লেখা 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার' এবং জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তের 'চালের দর' ও 'বনফুলের নমুনা' নাটকটিতেও দুর্ভিক্ষের ছবি ফুটে উঠেছিল।[xxiii] যেখানে মা কোলের ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় উপন্যাস, ছোটো গল্প, কবিতা ও নাটককের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের করুণ সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি উদ্ভাসিত হয়েছিল। যেখানে দুভিক্ষের নির্মম আঘাতে পরাস্ত হয়েছিল মানুষের রচিত বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ। মন্বন্তর জনিত তীব্র খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, নারীর লাঞ্ছনা, দ্রব্যমূল্যের লাগামছাড়া বৃদ্ধি ও মনুষত্বের পরাজয়ের মত বিষয়গুলিও ফুটে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যে। এইভাবেই সাহিত্য ও ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বুভুক্ষ মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবিকে অপূর্ব নিপুণতার সাথে সাহিত্যের পাতায় গেঁথে রেখেছেন সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা- যা আজও এই দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

তথ্যসূত্র :

---

i অশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ - ১৬

ii তদেব, পৃ - ২৯

iii পল গ্রীনো, আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র : দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-১৯৪৪, (বাংলা অনুবাদ) কে পি বাগচী কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ - ৮৪

iv Famine Inquiry Commission Report on Bengal, Usha, 1984

v শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রসংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪২৫, পৃ - ৪

vi Amartya Sen, Poverty and Famines, Oxford University Press, Dellhi, 2011, P-52-54

vii সোমনাথ হোর, অতীতের ক্ষতগুলি, in ক্ষুধার্ত বাংলা, মধুময় পাল (সম্পাদনা), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, পৃ - ৯১

viii অনুরাধা রায়, মহামন্বন্তর: নাটক, গান, সাহিত্য, ক্ষুধার্ত বাংলা, মধুময় পাল (সম্পা), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৫, পৃ-২৪৯

ix পল গ্রীনো, আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র : দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-১৯৪৪, (বাংলা অনুবাদ) কে পি বাগচী কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৭, , পৃ - ১২৭

x তদেব, পৃ - ১৫৫

xi মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র, সেতু প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৭, , পৃ - ১৬৬

xii তদেব, পৃ - ২৭০

xiii তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্বন্তর, তৃতীয়মুদ্রন, ২০১০, কলকাতা, পৃ - ১৮০

xiv বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশনি সংকেত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৮, পৃ - ৯১

xv তদেব, ৯৪

xvi অনুরাধা রায়, মহামন্বন্তর : নাটক, গান, সাহিত্য, in ক্ষুধার্ত বাংলা, মধুময় পাল (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ - ২৭২

xvii তদেব, পৃ - ২৭৪

xviii ড. বিনতা রায় চৌধুরী, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য লোক,১৯৯৭,

xix অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শতগল্প, আনন্দধারা, ১৯৬৫

xx মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প, সম্পাদনা- যুগান্তর চক্রবর্তী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ - ৮৯

xxi তদেব, পৃ - ৯৭

xxii নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৪০৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ -৩৫৮

xxiii অনুরাধা রায়, মহামন্বন্তর : নাটক, গান, সাহিত্য, in ক্ষুধার্ত বাংলা, মধুময় পাল (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ – ২৫৪-২৫৫।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫৭)

জগবন্ধু সরদার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
পাঁচুড় কলেজ

সারসংক্ষেপঃ দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যা সদ্য স্বাধীন ভারতে জটিল আকার ধারণ করে। দেশভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হলে, সেখানে ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে হয় যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ ছাড়া ঐ রাষ্ট্রের ওপর অমুসলমানদের কোন অধিকার নেই। বড়জোর তারা 'জিম্মি' হয়ে থাকতে পারে। জীবন ও সম্পত্তি হানির আশঙ্কাও ছিল। তাই নিজেদের জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করে দলে দলে ভারতে আসতে থাকে। ভারতে তাদের পরিচয় হয় উদ্বাস্তু। পাঞ্জাব অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা আরও জটিল ছিল। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুরা এসেছিল মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। আর কিছু এসেছিল হায়দ্রাবাদ থেকে। ভারত সরকার পূনর্বাসন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি দিলেও, প্রথমদিকে ত্রাণশিবির ও অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এবিষয়ে উদাসীন ছিল। ফলে স্থায়ী পূনর্বাসনের দাবিতে গড়ে ওঠে উদ্বাস্তু আন্দোলন। বাংলার বামপন্থী নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে সক্রিয় সাহায্য করেছিল। ফলে বাধ্য হয়ে সরকার পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে উদবাস্তুদের পূনর্বাসনের চেষ্টা করে।
সূচক শব্দঃ উদ্বাস্তু, পুনর্বাসন, বাস্তুহারা, ক্যাশডোল, কলোনী।

দেশ বিভাগের পর ভারত সরকার পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের আশ্বস্ত করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ভারত সরকার তাদের পুনর্বাসনের পূর্ণদায়িত্ব গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন,-"We also think of our brothers and sisters cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike."[১] কয়েক বছর পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার দুজন সদস্য সি. সি.বিশ্বাস এবং কে.সি. চন্দকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে সংখ্যালঘুদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দেরিতে চলে আসলেও 'নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি'-র শর্তানুযায়ী তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবে।

কিন্তু কংগ্রেস সরকার প্রথম থেকেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে কোন সন্তোষজনক ফল দেখাতে পারেনি। পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে কংগ্রেস সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল, উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কোনরকমে থাকার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন

মত আর্থিক সাহায্য করা। কারণ নিরবচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু প্রবাহ ব্রিটিশের ফেলে যাওয়া দুর্বল রাজকোষ ও পঙ্গু প্রশাসন নিয়ে সদ্যজাত স্বাধীন ভারতের পক্ষে সামলানো মুশকিল ছিল। ফলে প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তারা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে থাকে।

এরূপ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক ও মানবিক স্বার্থে উদ্বাস্তুদের বোঝাতে থাকে যে, কংগ্রেস সরকার তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সুতরাং নিজেদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিজেদেরই পালন করতে হবে। তখন উদ্বাস্তুরা নিজেদের জীবন-জীবিকা ও পূনর্বাসনের জন্য সাংগঠনিকভাবে আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। ১৯৫০ সালে গড়ে ওঠে উদ্বাস্তুদের বৃহত্তম সংগঠন 'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ'(UCRC)। শুরু হয়েছিল একের পর এক উদ্বাস্তু আন্দোলন। বিভিন্ন সরকারী ক্যাম্প ও জবরদখল কলোনীগুলিতে বামপন্থীদের গোপন 'সেল' তৈরি হয়েছিল। উদ্বাস্তুরাও নিজেদের ভাগ্য গড়ার তাগিদে বামপন্থীদের আদর্শ ও কর্মপন্থা মেনে নিয়েছিল।

উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী আদর্শ ও কর্মপন্থা ঠিক করেছিলেন। তারা সরকারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তারা প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন যে, সরকার, বিরোধী দলের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনে এগিয়ে আসুক। একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করুক। কিন্তু সরকার তাদের এই দাবি মেনে নেয়নি। এমনকি সরকার ১৯৫১ সালে বিধান সভায় 'অবৈধভাবে জমি দখলকারীদের উচ্ছেদের আইনের খসড়া' পেশ করে। উক্ত আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে,-

১.জমির প্রকৃত মালিক, জমি দখলকারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা করতে পারবে। ২.জমি দখলকারী যতদিন জমি দখল করে রাখবে, ততদিন তাকে জমির প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩. অপেক্ষাকৃত কমদামী জমি উদ্বাস্তুদের মধ্যে ন্যায্য দামে বিক্রি করার ব্যবস্থা হলেও, বেশি দামী জমির ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করার নীতি কার্যকর করা হয়। অবশ্য উচ্ছেদের পূর্বে উদ্বাস্তুদের দখলিকৃত জমির কাছাকাছি বিকল্প আশ্রয় দানের ব্যবস্থা খসড়া বিলে ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই খসড়া আইনের উদ্দেশ্য ছিল জমিদার ও সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা এবং জবরদখলকারী উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা।

এরূপ পরিস্থিতিতে জবরদখলকারী উদ্বাস্তুরা সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে আন্দোলনে নেমে পড়ে। তারা CPI-এর উদ্যোগে 'সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ'-এর নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাস্তুহারা পরিষদের নেতৃবৃন্দ উক্ত খসড়া আইনের কতকগুলি ধারার সংশোধনের দাবি জানিয়ে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তারা প্রত্যেক জবরদখল কলোনীতে একটি করে কমিটি গঠন করেন। তার উপরে গঠন করা হয় আঞ্চলিক কমিটি। আর সবার

উপরে ছিল কার্যনির্বাহী কমিটি। ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করতেন।

উদ্বাস্তুরা সরকারী দমননীতি অগ্রাহ্য করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উদ্বাস্তু উচ্ছেদ খসড়া আইন বাতিলের দাবি জানায়। সরকার বাধ্য হয়ে আইনটি সংশোধন করে। এই সংশোধিত আইনে বলা হয়- **১.** পুর্ববঙ্গে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর থেকে ১৯৫০ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যেসকল নরনারী এদেশে শরনার্থী হয়ে এসেছে,তারা বৈধ উদ্বাস্তুর স্বীকৃতি পাবে। **২.** খসড়া আইনে, যে যোগ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে, হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে, কোন বিচার বিভাগীয় অফিসারের মধ্য থেকে সরকার তাকে নিয়োগ করবে। **৩.** ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসকল জমি অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে, উদ্বাস্তুরা সেই জমির উপযুক্ত দাম দিয়ে নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ঐ জমির দাম নির্ধারণ করবে। বসবাস স্থানের কাছাকাছি উপযুক্ত স্থান না দেওয়া পর্যন্ত, তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। **৪.** উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরদ্ধে, ট্রাইবুনালে আপিল করা যাবে। অবশেষে বিধানসভায় এই খসড়া আইন '১৯৫১-র আইন নং ১৬' নামে পাশ হয়ে যায়।

কিন্তু উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দ এই সংশোধিত খসড়া আইনেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই তারা সম্মিলিতভাবে পুনরায় সরকারের কাছে দাবি তুলেছিল, **১.** উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা চলবে না। **২.** জবর দখল কলোনীগুলির স্বীকৃতি দিতে হবে। **৩.** পতিত ও জলাজমি উদ্ধার করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। **৪.** বিভিন্ন পরিত্যক্ত গৃহও মিলিটারী ব্যারাকগুলি, উদ্বাস্তুদের ন্যায্য ভাড়ায় বসবাস করতে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, নীতিগতভাবে কলোনীগুলির বিধিবদ্ধ করার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল।

উদ্বাস্তু-বামপন্থী মেলবন্ধন, ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থীদের বেশ সাফল্য এনে দেয়। "বিধানসভায় ৭২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে তারা ২৮টি আসন লাভ করেছিল এবং লোকসভায় ৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল ৫টিতে।"[২] প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তার 'The Marginal Men' গ্রন্থে বলেছেন, "The success of the candidates of the left in the polls in areas with concentration of refugees in large numbers is a convincing proof of the refugee swing to the left."[৩] এরপর বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ক্যাম্প ও জবরদখল কলোনীর উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধ করে, ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের জন্য, UCRC নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বামপন্থীদের সাফল্য, কংগ্রেসের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে মনোযোগী হয়। নেহরু

সরকার পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করার জন্য, ১৯৫২ সালের ১৫ই নভেম্বর একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি (Fact Finding Committee) গঠন করে। ১৯৫৫ সালে সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পুর্বাসনের জন্য ঋণদান বা প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে নেহরু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য বিহার, উড়িষ্যা, আন্দামান, আসাম, মহিশূর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আসলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নয়- উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে উদ্বাস্তু জনগণকে কমিউনিষ্টদের ছত্রছায়া থেকে বের করে আনা।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। পুনর্বাসনের সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব, অজানা অচেনা পরিবেশ, সরকারী কর্মচারী ও স্থানীয় মানুষের ঘৃণা ও বিদ্বেশ- তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে বাধ্য করে। শিয়ালদহ স্টেশন, হাওড়া স্টেশন ও ময়দানে তারা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রধান দাবি ছিল- পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যেকোন স্থানে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ও বেঁচে থাকার মতো অন্নসংস্থান। কিন্তু সরকার বিরূপ.ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় একটি সরকারী বিবৃতিতে জানায়,-"পশ্চিমবঙ্গে আর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্ভব নয় এবং যাহারা এইভাবে শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাদের পুনর্বাসন বা সাহায্যের জন্য সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা নাও করিতে পারেন।"[৪] ১৯৫৭ সালের মে মাসে হাওড়া ময়দানে বেতিয়া প্রত্যাগতদের, হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করে বলেন,- "আপনারা ভুল করিতেছেন, ...বেতিয়ায় আপনাদের ফিরিতেই হইবে। ইহা সরকারের নীতি, পশ্চিমবঙ্গে আপনারা পূনর্বাসন পাইবেন না।"[৫]

এরূপ পরিস্থিতিতে, UCRC নেতৃবৃন্দ বেতিয়া প্রত্যাগতদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে জানায়- ১. শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে, ফুটপাতে ও ময়দানে অবস্থ্যনকারী উদ্বাস্তুদের অবিলম্বে সরকারীআশ্রয় শিবিরে নিয়ে যেতে হবে। ২. বেতিয়া ক্যাম্প ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং ৩. জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাসহ সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হবে। সরকার কর্ণপাত না করলে, UCRC ১৯৫৭ সালের ১২ই এপ্রিল সরকারী পুনর্বাসন নীতির প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে ক্যাম্পে আশ্রয় ও রিলিফের দাবিতে বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের সমর্থনে ওয়েলিংটনে এক জনসভা করে। সভায় শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ ইলিয়াস তার বক্তৃতায় বলেন,-"অবিলম্বে সরকার উদ্বাস্তুদের দাবি না মানলে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করা হবে।"[৬] বাস্তহারা নেতা অম্বিকা চক্রবর্ত্তীও বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করছে, ততোদিন উদ্বাস্তু আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খ্রিঃ UCRC ও কমিউনিষ্ট পার্টিসহ পাঁচ বামপন্থীদল (কমিউনিষ্ট পার্টি, পি এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি),

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃবিধান চন্দ্র রায়ের নিকট কতকগুলি দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। তাতে বলা হয়,- **১.** উদ্বাস্তুদের আর্থিক পুনর্বাসন দানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে, তাদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ দান এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । **২.** হাওড়া ময়দান, হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে অবস্থানরত বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের অবিলম্বে ক্যাম্পে প্রেরণ ও রিলিফ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। **৩.** বেতিয়া থেকে কেন উদ্বাস্তুরা প্রত্যাগমন করছে তার সম্যক অনুসন্ধানের জন্য একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন ও বেতিয়া পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উক্ত দাবির প্রেক্ষিতে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকরে জানান যে, তিনি উপরোক্ত দাবিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। তিনি আরও বলেন যে, বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বার বেতিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয় হবে। তৎকালীন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় বেতিয়া শিবির পরিদর্শনের পর কলকাতায় এসে বলেছিলেন,- "আমি উদ্বাস্তুদের শিবির ত্যাগের কোন কারণ দেখতে পায়নি। সুতরাং উদ্বাস্তুদের কোন সরকারী সাহায্য করা হবে না।"[৭]

বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের দূর্দশা দেখে সরকার যখন নির্বিকার, তখন তাদের দুঃসময়ে বিভিন্ন বামপন্থীদল, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসভা সম্মিলিত ভাবে ২১-শে ও ২৪-শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খ্রিঃ 'উদ্বাস্তু দিবস' ঘোষণা করে সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল। ২৫-শে এপ্রিল সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কার্যকরী সমিতির এক সভায় স্থির হয়,-"অবিলম্বে উদ্বাস্তুদের বাংলার মধ্যে আশ্রয় ও রিলিফের ব্যবস্থা না করলে ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হবে। এমনকি সরকার তাদের দাবী না মানলে সত্যাগ্রহ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হবে।"[৮] এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য, উদ্বাস্তুরা সকল বামপন্থী সংগঠনকে নিয়ে 'বাস্তুহারা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেছিল।

বাস্তুহারা সংগ্রাম পরিষদের প্রধান কমিউনিষ্ট নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সনৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। তাদের কর্মসূচী ছিল- বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তুরা এসে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, কলেজ স্কোয়ার ও মনুমেন্ট ময়দানে মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে ১৪৪ নং ধারা অমান্য করে কারাবরণ করা। ১৯৫৭ খ্রিঃ-এর ৪-ঠা জুন সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। ঐ দিন ১৫৪ জন উদ্বাস্তু কারাবরণ করে। আন্দোলনের নবম দিন পর্যন্ত মোট ২,৪২২ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে বলে জানা যায়।

শেষ পর্যন্ত ৬-ই জুন, ১৯৫৭ খ্রিঃ 'বাস্তুহারা সংগ্রাম পরিষদ', পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনার প্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। আলোচনায় বিরোধী দলের নেতা শ্রী জ্যোতি বসু এবং

যতীন চক্রবর্তী, হেমন্ত বসু, অপূর্ব মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার ভিত্তিতে সরকার তাদের যে সকল দাবি পূরণে সম্মত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরিষদের আহ্বায়ক হেমন্ত বসু বলেন যে,- **১.** পশ্চিমবঙ্গে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে বেতিয়ার ক্যাম্পগুলিতে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। **২.** বেতিয়া ক্যাম্প গুলির উন্নতির জন্য যে সুপারিশগুলি করা হয়েছে, তা সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে। **৩.** ডাঃ রায় শ্রী খান্নার পরামর্শ ক্রমে জানিয়েছেন যে, বেতিয়া শিবির ত্যাগী উদ্বাস্তুদের যাবতীয় বকেয়া ক্যাশ ডোল, উদ্বাস্তুরা রওনা হওয়ার পূর্বেই তাদের কিছু দিনের জন্য দেওয়া হবে। **৪.** ধৃত বন্দীদের মুক্তির আশ্বাস দেওয়া হয়। সরকারের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে অধিকাংশ উদ্বাস্তুই পুনরায় বেতিয়ায় ফিরে গেল।তবে তাদের অবস্থা পূর্বের মতই হল। সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

এরূপ ডামাডোল পরিস্থিতিতে, এসে গেল **১৯৫৭** সালের সাধারণ নির্বাচন। উদ্বাস্তুদের ভোটে বামপন্থীদের আসন সংখ্যাও ভোটের অনুপাত বেড়েছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাব্য রাজনৈতিক পালাবদল ঠেকাবার জন্য নেহরু **১৯৫৭** সালের জুন মাসে ‘জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ-এর অধিবেশনে, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিকট ঘোষণা করলেন যে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য প্রস্তাবিত ‘দণ্ডকারন্য প্রকল্প’- এ তার সম্মতি আছে। নেহেরু যুক্তি দেখিয়ে বলেন,-“জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে উদ্বান্তদের ঠাঁই হবে না। এখানে পুনর্বাসনের জমি নেই, অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্ত সম্ভবনা নিঃশেষিত। ফলে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। যদি তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তে নারাজ হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ক্যাশডোলও বন্ধ হবে।”[৯]

এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার **১৯৫৭** সালের জুলাই মাসে বিধানসভাতে, উদ্বাস্তুদের স্বার্থবিরোধী ‘উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও অননুমোদিত জমিতে বসবাসকারী উচ্ছেদ (সংশোধন) বিল **১৯৫৭**’ পাশ করে। এই আইনের প্রধান সংশোধনগুলি ছিল, **১.** উদ্বাস্তুদের জমি অথবা জমি ক্রয়ের জন্য টাকা মঞ্জুর করেই উচ্ছেদ করা যাবে এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিকল্পটি উপযুক্ত তা রাজ্য সরকার স্থির করবে। **২.** খেসারত আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট প্রথার শর্ত রাখা হয়েছিল। **৩.** অর্থ নগদে আদায় না হলে উদ্বাস্তুদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করা যাবে। **৪.** উচ্ছেদ বা খেসারতের ব্যবস্থা থাকাপাকি করতে যোগ্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী পুলিশী শক্তি ব্যাবহার করা যাবে।

উদ্বাস্তুরা ২২শে ও ২৩শে জুন UCRC-এর নেতৃত্বে সোদপুরে বিশেষ সম্মেলনে ‘উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও অননুমোদিত জমিতে বসবাসকারী উচ্ছেদ (সংশোধন) বিল **১৯৫৭**’- বাতিল করার ডাক দিয়েছিল এবং এর পরিবর্তে জবর দখলকারীদের সুষ্ঠু বন্দোবস্তের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দাবি জানায়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী **১০**ই জুলাই, **১৯৫৭** খ্রিঃ আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিধানসভা

অভিযানের কর্মসূচী নিয়েছিল। এই অভিযানে UCRC, অন্যান্য উদ্বাস্তু সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে প্রবল বিরোধিতার মুখে সরকার পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১০ই আগস্ট বিরোধী পক্ষের সাথে মতৈক্যের ভিত্তিতে 'উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও 'অননুমোদিত জমিতে বসবাসকারী উচ্ছেদ (সংশোধন) বিল-১৯৫৭' সংশোধিত আকারে বিধান সভায় গৃহীত হয়েছিল। বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী, উদ্বাস্তু উচ্ছেদে পুলিশের হাতে বিশেষ ক্ষমতাদানের ধারাটি সরকার পক্ষ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এছাড়া উদ্বাস্তুদের বিকল্প জমি বা জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণদানের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট উদ্বাস্তুদের ইচ্ছাধীন করার জন্য একটি সরকারী সংশোধনীবিল গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বদলে সরকারের হাতে ক্ষমতাদান, ১৯৫০ সালের পর যারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তারা সরকারী সংজ্ঞানুসারে উদ্বাস্তু বলে গন্য না হওয়া এবং সার্টিফিকেট জারি করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধান সম্পর্কে কোন সংশোধনী সরকার গ্রহণ করেনি। তাই বিরোধী দলগুলি এই সংশোধিত বিলে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কমিউনিষ্ট দলের নিরঞ্জন সেন, খগেন রায়চৌধুরী, রবীন মুখার্জী, গোপাল বসু, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, সুরেশ ব্যানার্জী (প্রজা সমাজতন্ত্রী দল), হরিদাস মিত্র (প্রজা সমাজতন্ত্রী দল), হেমন্ত বসু (ফঃ বঃ), চিত্ত বসু (ফঃ বঃ) প্রমুখেরা বিলের বিরোধিতা করেন। তবে বিরোধী দলের নেতা শ্রী জ্যোতি বসু বাস্তুহারাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, বিরোধী পক্ষের সাথে মতৈক্যের ভিত্তিতে সরকার এই বিল সংশোধনী আকারে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। তাতে উদ্বাস্তু একতা শক্তির আংশিক জয় হয়েছে।

১৯৫৭-এর পরও বামপন্থীদের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলন চলতে থাকে। আবার ধর্মীয় ও নিরাপত্তার কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের আসাও থেমে থাকেনি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এর হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সরকারী সাহায্য কমবেশি পেলেও, মূলত নিজেদের শ্রম ও উদ্যোগে জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তারা ভোটাধিকার সহ অন্যান্য অধিকার পেলেও ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। তাই উদ্বাস্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি। কেন্দ্রের BJP সরকার 'Citizenship Amendment Act-2019' পাশ করেছে। কিন্তু এর জটিল শর্ত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরোধিতার কারনে, তা এখনও কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য যে, উদ্বাস্তুদের সর্ববৃহৎ সংগঠন 'মতুয়া মহাসংঘ' নিঃশর্ত নাগরিকত্ব আইনের দাবিতে আন্দোলন জারি রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১. Biswas Sukriti Ranjan- 'The Citizenship(Amendment) Act-2003-A History of Betrayal to the Refugees of East Bengal'. P-10

২. বসু জ্যোতি - 'যতদূর মনে পড়ে'। পৃষ্ঠা-১২০
৩. Chakraborty Prafulla Kumar- 'The Marginal Men'. P-139
৪. স্বধীনতা পত্রিকা- ১৫-ই মার্চ, ১৯৫৫
৫. তদেব- ১৫-ই মে, ১৯৫৭
৬. তদেব- ১২-ই এপ্রিল, ১৯৫৭
৭. তদেব- ২১-শে এপ্রিল, ১৯৫৭
৮. চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার- 'প্রান্তিক মানব'। পৃষ্ঠা-৮৯
৯. বসু জ্যোতি - 'যতদূর মনে পড়ে'। পৃষ্ঠা-১২১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় হিরন্ময়- 'উদবাস্তু', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০
২. মুখোপাধ্যায় কালিপ্রসাদ- 'দেশবিভাগের অন্তরালে', বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৩
৩. সিংহ অনিল- 'জবরদখল উপনিবেশ' কলকাতা-৫১, ১৯৯৫
৪. চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার- 'প্রান্তিক মানব'-পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন লিমিটেড, কলকাতা- ১৩, ১৯৯৭
৫. বসু জ্যোতি-'যতদূর মনে পড়ে'- রাজনৈতিক আত্মকথন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৮
৬. দে অমলেন্দু- 'প্রসঙ্গঃ অনুপ্রবেশ', কলকাতা, জুন- ১৯৯৩
৭. Biswas Sukriti Ranjan- 'The Citizenship(Amendment) Act-2003-A History of Betrayal to the Refugees of East Bengal', Calcutta, 2005
৮. Chakraborty Prafulla Kumar- 'The Marginal Men'-The Refugee and the Left Political Syndrome in West Bengal, Lemiere Books, 1990, Published by Bimal Chakroborty.

সংবাদপত্র:

'স্বাধীনতা' পত্রিকা-১৯৫৭।

উনিশ শতকের বাঙালি 'মন' ও 'কথামৃত' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

পিয়ালী বসু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সংস্কার, দেশাচার এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসমান বাংলায় নতুন জোয়ার এনেছিল উনিশ শতক। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির অভিঘাত বিভিন্ন বিষয়ে সমকালের বাঙালি মননকে আন্দোলিত করেছিল নানাভাবে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বাঙালিই অধিকতর আগ্রহী হয়েছিল তার ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, অনুসরণ ও পুনর্প্রতিষ্ঠায়। মানবতাবাদী আধুনিকতাকে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার সমর্থনে গ্রহণ করতে গিয়ে স্বভাবতই নানা জটিলতা, অস্থিরতায় ভরপুর থেকেছে এই সময়ের বাঙালি মনন। ঠিক এই আবহেই উনিশ শতকের একেবারে শেষপাদে গড়ে ওঠা একটি জনপ্রিয় সৃষ্টি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর একটি বিশ্লেষণী পাঠ নির্মাণ এই আলোচনার উদ্দেশ্য। সঙ্গত কারণেই দ্বিধাজর্জর ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্থির, সংশয়ী বাঙালি 'মন'গুলি যেভাবে এই 'কথামৃত'-এর পাতায় উঠে এসেছে এবং যেভাবে সময়ের দাবিতে সেই অস্থিরতাকে মোকাবিলা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে, মূলত তার একটি গবেষণাধর্মী অনুসন্ধানই এই আলোচনা নিবন্ধের উপজীব্য।
সূচক শব্দ: উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ, ঔপনিবেশিকতা, মনোবিজ্ঞান, মন ও কথামৃত।

বহুবর্ণে রঞ্জিত উনিশ শতক বাঙালির পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় 'স্বাভাবিক' জীবনচর্যায় আমূল বদল আনে। বিবিধ ভাঙা-গড়ার আবহে, বিরাট অংশের জনমানস অনেক ক্ষেত্রেই সরলরৈখিক সহজ যাপনের অবস্থান থেকে বাধ্যত সরে এসেছিল এই সময়। অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধ, কোলাহলের আবর্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি 'মন' নিশ্চিতভাবেই এক অদ্ভুত অস্থিরতার প্রতিলিপি। এই অস্থিরতার আবহেই সমকালের অন্যতম চমকপ্রদ সৃষ্টি 'কথামৃত'-র এক বিশ্লেষণী পাঠ আমরা নির্মাণ করতে চাইছি বর্তমান নিবন্ধে।

বাংলার নবজাগৃতিকালের এক গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাসবেদ্য-অধ্যাত্মসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধন জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দুর্লভ কিছু উপলব্ধি অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে থাকা কিছু অধ্যাত্মপিপাসুদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন রামকৃষ্ণদেব। ঘটনাচক্রে, ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় প্রতি সপ্তাহে বা সপ্তাহান্তে, দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দেবালয়-চত্বরের এক সংকীর্ণ ঘরে উপস্থিত

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্ত-অনুরাগীদের কথোপকথনের সংক্ষিপ্তসার শর্টহ্যান্ডে নিজের ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে মাষ্টারমশাই বা 'শ্রীম'। পরবর্তীতে এই দিনলিপি থেকেই প্রথমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, পরে গ্রন্থাকারে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর আত্মপ্রকাশ। রামকৃষ্ণের মুখের কথা, দিনযাপনের বিবৃতির বুনিয়াদ এই 'কথামৃত', নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ জীবন-আদর্শ পাঠের এক উল্লেখযোগ্য আকর। পাশাপাশি, সমকালের চিন্তন-মনন, সমাজ-সংস্কৃতিকে বুঝে নেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও উনিশ শতকে নির্মিত এই বিশেষ 'টেক্সট'-টি। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির জোয়ার-প্লাবিত 'রামকৃষ্ণের সময়'-এর নগর কলকাতায় তথাকথিত শিক্ষিত, নবজাগরণের আলোয় 'আলোকপ্রাপ্ত' মানুষের অভাব ছিল না। অথচ, ওই পরিসরে তথাকথিত 'পাণ্ডিত্যবর্জিত', একপ্রকার 'গ্রাম্য' ছাঁচ-বহনকারী ঈশ্বর-সাধক রামকৃষ্ণদেবের কাছে নানাভাবে, নানাসূত্রে বারংবার হাজির হয়েছিল উনিশ শতকের সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সমাজের প্রতিষ্ঠিত অভিজাতবর্গের একটি বৃহদাংশ। অর্থাৎ কোনওরকম প্রাতিষ্ঠানিক 'ক্যারিশমা' ব্যতিরেকেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ কথোপকথনের গুণে আপামর জনমানসের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণদেব। আর এখানেই দুটি সঙ্গত প্রশ্ন তৈরি হয়।

১. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ বিচলিত মধ্যবিত্ত জন-'মনে'র কোনো গুরুত্বপূর্ণ দাবিপূরণে কি সমর্থ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ?
২. যদি হয়ে থাকেন, কীভাবেই তা সম্ভবপর হয়েছিল?

এই অনুসন্ধানের প্রথম পর্বের সঙ্গে অবধারিতভাবে জড়িয়ে আছে উনিশ শতকের সমাজ-রাজনীতির ইতিহাস। বস্তুত 'কথামৃত'-এর বয়ান অনুযায়ী অধ্যাত্ম-সাধক রামকৃষ্ণের মানুষকেন্দ্রিক ঈশ্বর সাধনার স্বরূপলক্ষণকে বুঝতে গেলে এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটি স্মরণ করা জরুরি।

প্রথাজীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বহুপ্রকার বিধিনিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন বাংলার মধ্যযুগীয় অচলায়তনে নজিরবিহীন ফাটল ধরিয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ। আর সেই সূত্র ধরেই ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড পরিণত হয়েছিল নতুন রাজশক্তির শাসনদণ্ডে। নতুন এই শাসনযন্ত্রের দুর্নিবার স্বাক্ষর শুরু হতে না হতেই বাংলা বিধ্বস্ত হয় মন্বন্তরের প্রবল কোপে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কেবল বাংলার অগণিত সাধারণ জনগণই নয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল বাংলার প্রাচীন অভিজাত বংশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষও।[১] তাঁদের শূন্যস্থান দখল করেছিল ইংরেজ সংস্রবে বিত্তবান, শাসক-অনুগ্রহে পুষ্ট, ভুঁইফোঁড় এক সম্প্রদায়। শাসককে তোষামোদ ক'রে শঠতা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অর্থোপার্জনই ছিল এই 'হঠাৎ-বাবু'দের একমাত্র মোক্ষ। আবার অন্যদিকে ঔপনিবেশিক নতুন অর্থ-কাঠামোয় গড়ে ওঠা জীবিকানির্ভর শিক্ষাকে গ্রহণ করে সমাজে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সদ্য-আগত ইংরেজি শিক্ষার আলোয় এই মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহদাংশেই ক্রমশ এক নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। ভিন্ন

দৃষ্টিতে তাঁরা প্রবাহমান সমাজের চিরাচরিত ধর্মীয় ও সামাজিক অন্ধ-প্রথাগুলির মূল্যায়নে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঐতিহ্য-সংস্কার ও কু-সংস্কারের বাইনারিতে পড়ে অতীত সবকিছুকেই অস্বীকার করার এক ভয়ংকর প্রবণতা দেখা যায় এ সময়ে। তবে, খ্রীষ্টান মিশনারী প্রভাব যুক্ত এই নতুন আধুনিকতার পাদপীঠে এসে পুরোনো সব ঐহিহ্যকে অস্বীকার করার সর্বগ্রাসী প্রয়াস বেশিদিন একমুখী ছিল না। কারণ ইংরেজ শাসনজাত নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় অতি পরিচিত একটি লক্ষ 'জাতিগত ভাবে ভারতীয় অথচ রুচিগত ভাবে ইংরেজ' তৈরির যে প্রকল্পে নগরকেন্দ্রিক জনমানস সামিল হয়েছিল, তাদের অনেকেই এর অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করতে পেরেছিল। অচিরেই তাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছিল এই নতুন জীবিকানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় সনাতন ভারতীয় সমাজের শিকড় এবং ভাবজগত বিপর্যস্ত হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে যে নবজাগরূক সমাজে প্রায় সব ধরণের দেশজ প্রথা, ঐতিহ্য-সংস্কার অস্বীকৃত হয়েছিল, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই ঐতিহ্য-সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নই বাঙালি মধ্যবিত্ত মননকে বহুধাবিভক্ত করল।[২] একদিকে বহাল ছিল খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুবিদ্বেষী অপপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ছিল এই সব অপপ্রচার-কুৎসা ও ধর্মীয় মেরুকরণের প্রচেষ্টা রুখতে ব্রাহ্মসমাজের প্রথমে একাধিক সংস্কারপন্থী আন্দোলন। পরে অবশ্য আদর্শগত ও আচরণগত বিবিধ মতপার্থক্যের জোয়ারে ক্রমাগত বিভাজিত সেই ব্রাহ্মসমাজেরই সাক্ষী সমকালীন সমাজ। এর পাশাপাশি ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অতি-আলোয় উদ্ভাসিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর যাবতীয় প্রাচ্য ঐতিহ্য-সংস্কারকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার বিরুদ্ধ জনমত হিসাবে প্রবলভাবে সেই প্রাচ্য, সনাতন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রশ্নেই জন্ম নেওয়া হিন্দুপুনরভ্যুত্থানবাদী ধর্মান্দোলন। কার্যত, উনিশ শতকের এই ত্রিমুখী আক্রমণে তীব্রভাবে উদ্বেলিত, দ্বিধা-জর্জর বাঙালি মধ্যবিত্তের নানারকম আত্মিক সংকট, অস্থিরতা, মানসিক জটিলতাকে তুলে ধরেছে 'কথামৃত'-এর দিনলিপি। নবজাগরণের সুতীব্র কোলাহল, উন্মাদনা থেকে সচেতন দূরত্বে অবস্থান করেও রামকৃষ্ণদেব তাঁর মানব-সম্পৃক্ত অধ্যাত্ম সাধনার জীবনে এই যুগগত চাঞ্চল্যকে বিচার করেছিলেন নিজস্ব মাপকাঠিতে। 'কথামৃত' তাই কেবলই এক ঈশ্বর-সাধকের ধর্মজীবন যাপনের জীবন্ত আলেখ্য নয়, রামকৃষ্ণের সঙ্গে সমকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির কথোপকথনে 'কথামৃত'-এ ধরা পড়ে দ্বন্দ্ব পীড়িত উনিশ শতকের নানা ওঠা-পড়ার বয়ান।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বাংলায় জ্ঞান-অর্জনের নতুন দিগন্ত খুলে দিলেও এই শিক্ষা পরিকাঠামোয় বারংবার উপমহাদেশের শিক্ষাকে সংকুচিত করার প্রয়াস চলেছে।[৩] অবশ্য, শাসকের চরিত্র এক্ষেত্রে সবসময় কূট চক্রান্তকারী থাকেনি এ কথা যেমন ঠিক, তেমন এও স্বীকার্য যে শাসকের উপযুক্ত, বশংবদ কেরানী তৈরির এই শিক্ষাকাঠামোয় বেশিরভাগ শিক্ষাসূচীই ছিল জীবনমুখীনতা বিরূপ। পদে পদে অবিশ্বাস, স্ববিরোধিতা এবং খণ্ডিত মনোভাব ছিল তার মানসচরিত্র। 'কথামৃত' উনিশ শতকের এই

উপলব্ধিশূন্য পুথিপড়া জ্ঞানচর্চার আবহে এক বিকল্প ডিসকোর্স তৈরি করে। ‘কথামৃত’ শুরুই হয়, পাশ্চাত্যের ভাবে আধুনিকমনস্ক 'বই' পড়া, কলকাতার মেধাবী মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথের অবাক বিস্ময় দিয়ে। আত্মীয় বাড়ি ঘুরতে এসে তাঁরই উৎসাহে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস দেখতে গিয়েছিলেন শ্রীম। স্বাভাবিক সংস্কারবশত তিনি ভেবে নিয়েছিলেন, যাঁর কথা ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় লেখেন, সেই রামকৃষ্ণ বুঝি খুব বইপড়া, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। অথচ, রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই দক্ষিণেশ্বরের বৃন্দে ঝি'র কাছে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত খবর পান যে পরমহংস মহাশয় বইপত্র আদৌ পড়েন না, সব কথা ওঁর মুখে।[৪] আধ্যাত্মিক কিংবা জাগতিক জ্ঞানার্জন বই না পড়ে কী করে সম্ভব এখানেই আশ্চর্য হন শ্রীম। কথার ভেলকি জাল ব্যতিরেকেই শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অনর্গল বলে চলেন রামকৃষ্ণ তথাকথিত পণ্ডিত সব ব্যক্তিসান্নিধ্যে। মহেন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা, তাই এক্ষেত্রে যেন যুগ-জিজ্ঞাসারই বয়ান সামনে আনে ‘কথামৃত’-এ। 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা' কখনওই শিখতে চাননি রামকৃষ্ণ। তাঁর কাছে জ্ঞানচর্চা বস্তুতান্ত্রিকতার সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং পুথিপড়া, উপযোগবাদী জ্ঞান তাঁর কাছে পরাবিদ্যার নামান্তর। ‘কথামৃত’-এ জ্ঞানের সংজ্ঞায় তাই বারংবার প্রাধান্য পেয়েছে অহংশূন্যতার কথা, “আমি আর আমার এইটিই অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে যাকে আমি আমি করছ, দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার করো-তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু? তখন দেখবে, তুমি কিছু নও। তোমার কোনো উপাধি নেই।”[৫] রামকৃষ্ণের কাছে কেরানি তৈরির কর্মশালা এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভূত মধ্যবিত্তের ‘চাকরি’, কর্তৃপক্ষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য; সবই ছিল প্রকৃতপক্ষে দাসত্বেরই নামান্তর। ভোগবাদ ও অনৈতিকতার জাঁতাকলে পিষ্ট, নিজের উৎসকে ভুলে কেরানিগিরির মোহে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি ‘মন’-এর প্রতি ‘কথামৃত’-র ধিক্কার – “পরের কর্ম স্বীকার করে কী হয়ে রয়েছো। আর দেখ, অত পাশ করা, কত ইংরেজি পড়া পণ্ডিত, মনিবের চাকরি স্বীকার করে তাদের বুট জুতার গোঁজা দু’ বেলা খায়।”[৬] কথামৃত অনুসারে রামকৃষ্ণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে কোথাও টাকার গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। বাজারে যথার্থ বিনিময় মূল্য দিয়ে জিনিস কিনতে গেলে হকের ‘ফাউ’ জিনিসটি নিতে যেন ভুল না হয় – এ কথাও যেমন বলেন রামকৃষ্ণদেব, তেমনি একইভাবে মধ্যবিত্তের সীমাহীন লোভ ও অর্থদাসত্ব, অহেতুক প্রভুত্ব স্বীকার, চাকরিজীবি মধ্যবিত্তের বাড়ির দেওয়ালে রানী ভিক্টোরিয়ার ছবি টাঙানোকে তীব্রভাবে সমালোচনাও করেন শ্রীরামকৃষ্ণ।[৭]

উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে ‘কথামৃত’ অনেক বেশি করে সেই বিদ্যাকে জরুরি করে তোলে যেখানে প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মায়, ঐশীজ্ঞান লাভ হয়। ‘পরোক্ষ’ থেকে পরখ করতে করতে ‘প্রত্যক্ষ’-এর পথে উত্তরণের ইঙ্গিত লক্ষ্য করি ‘কথামৃত’-এ। 'পড়ার চেয়ে শোনা ভালো এবং শোনার চেয়ে দেখা ভালো'-য় আস্থা রাখা ‘কথামৃত’ তাই যেন নিদান দেয়, কাশীর বিষয় পড়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, তার চেয়ে ঢের

বেশি হয় কাশীদর্শনে। উপযোগবাদের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করে ফেলে পেশাজীবির এই উনিশ শতকের জ্ঞানচর্চা মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালির মনে প্রচ্ছন্ন ‘অহং’- এর ভিত্তিস্থাপন করছিল যার সুবাদে সে আপামর জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, সেই ‘অহং’-কেই আসলে সমালোচনা করে ‘কথামৃত' বলে অহংকার থাকলে জ্ঞান হয় না। মুক্ত হব কবে– ‘আমি’ যাবে যবে।[৮]

উনিশ শতকের বাংলায় বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন এবং নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে সৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ে আচার-নিষ্ঠার বাড়াবাড়ি, খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, জাতিভেদ নিয়ে মারাত্মক রকমের কু-অভ্যাস সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল ঠিকই।[৯] তবে জাতিগত সংস্কার, জাত্যাভিমান নিয়ে অহেতুক ছুঁতমার্গ সমকালের বাঙালি মানস থেকে প্রায় কোনোদিনই দূরে ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এ লিখেছেন, "গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওা যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন।"[১০] বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তেও একই ধরণের চিত্র উঠে এসেছে। বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে যুগে বাড়িতে নিত্য পূজা করতেন।[১১] বৈদ্য সন্তানরাও অনেকে ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করতেন না। অথচ, ‘কথামৃত’-এ আমরা এর বিপরীত চিত্র পাই। লোকাচার, জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে কথামৃত অনেকাংশে উদার মতাবলম্বী। আচারের বাড়াবাড়ি নিয়ে রামকৃষ্ণ কথামৃত পরিসরে হাজির এক চরিত্র হাজরাকে বলছেন, “শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার ততটুকুই করবে। বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।”[১২] কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামকৃষ্ণের সঙ্গে সন্ধ্যের অবসরে বসেই তাঁর মুখে শুনেছেন, হরিনামে অশ্রুপাত হলে আর সন্ধ্যাদি-কর্মের কোনো দরকার নেই সেখানে। সাধুদর্শনে এসে তৎকালীন শিক্ষিত জনসমাজের প্রতিনিধি মহেন্দ্রনাথ এ কথায় আশ্চর্য হয়েছিলেন খুবই। ‘কথামৃত’ প্রচলিত গুরুবাদ, সন্ত সাধকদের অলৌকিকতা, সিদ্ধাই, ভোজবাজিতে আস্থা রাখেনি। এমনকী তৎকালীন শিক্ষিত বঙ্গসমাজে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মোদ্ভূত পাপবোধ ও তদ্দজনিত অনুতাপকে নস্যাৎও করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ‘কথামৃত'-এ।[১৩] উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির অস্থির মন, তার নানারকম জিজ্ঞাসা এবং অবস্থা নিয়ে এভাবেই হাজির থেকেছে রামকৃষ্ণের কথোপকথনের মাঝেই। কেমন করে এই অস্থির মনগুলিকে মোকাবিলা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা কীভাবে রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালি মনগুলির

মোড় ঘুরে গেছিল, তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে 'কথামৃত'-এ। এই পর্বের অনুসন্ধানে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে 'কথামৃত'-এ বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করা যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির দু'জন বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট জোসেফ লাফ্ট এবং হারেভিংটন্ ইঙ্গহাম-এর মতে মানুষের মনের স্পষ্টত চারটি ভাগ। মানবমনের বিভাজন সংক্রান্ত এই চমকপ্রদ ধারণা– 'জেহারি উইন্ডো'[১৪] অনুযায়ী আমাদের মন 'ওপেন-এরিয়া', 'ব্লাইন্ড-এরিয়া', 'হিডেন-এরিয়া' এবং 'আননোন-এরিয়া' এই চারভাগে বিভক্ত। নাম থেকেই খানিকটা আন্দাজ করা যায় এই চারভাগের মধ্যে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর ওই 'আননোন-এরিয়া' অর্থাৎ মনের সেই অংশ, যা ব্যক্তিবিশেষে আমরা নিজেরা তো জানিই না, এমনকি অন্যরাও জানে না। ফলত, পৃথিবীর যাবতীয় সব কঠিনতম কাজগুলির মধ্যে একটি – আমাদের মনের এই না জানা অংশকে জানা।

উনিশ শতকের কলকাতায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক ঈশ্বর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের দপ্তর যেন ছিল আধুনিক মনের বিভাজন সংক্রান্ত তত্ত্ব এই 'জোহারি উইন্ডোর'-ই এক মূর্তিমান প্রকাশ। জাতপাত নির্বিশেষে সমকালের সাধারণ ছাপোষা মানুষ থেকে শুরু করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নামী ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, ব্যবসায়ী, সমাজসংস্কারক, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক ঝাঁক তরুণ, ধর্মগুরু প্রমুখ রামকৃষ্ণের অদম্য আকর্ষণে তাঁর কাছে এসেছেন বারবার। কারণ এখানে এঁরা প্রত্যেকেই বুঝি তাঁদের মনের ওই 'আননোন এরিয়া'-কে জানার পাঠ পেয়েছিলেন যে যার নিজের মতো করে। নাতিদীর্ঘ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মানবজীবনের সারসত্য স্বরূপ যে যে সত্যিগুলো সমকাল এবং অনাগত ভবিষ্যতের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তার মূলে আছে নিজের এই না চেনা 'আমি'টাকে চিনতে, জানতে চেষ্টা করার কথা। রামকৃষ্ণকে উনিশ শতক যেন এখানে এক মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় আবিষ্কার করল যিনি প্রত্যেকের মন বুঝে যার জন্য যে ধরনের থেরাপি প্রয়োজন তার জন্য সেরকম কথাই বলছেন। 'কথামৃত'-র পাতায় একই সমস্যায় গৃহীদের জন্য তাই একরকম নিদান, সংসার ত্যাগীদের জন্য আবার ভিন্ন। আর এসবকিছুই শ্রীরামকৃষ্ণ করছেন গল্পের ছলে, গান গেয়ে, হাসতে হাসতে, বাস্তব জীবন থেকে উদাহরণ তুলে, একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে। তবে, কোথাও একটুও এই 'বুঝিয়ে বলা' ভাব নেই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে। অন্তঃসারশূন্য হৃদয়ে লম্বা-চওড়া কথা, বুঝিয়ে বলার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাকার নিরাকার প্রসঙ্গে মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন তাঁকে বলছেন, যারা মাটির প্রতিমা পুজো করেন তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত তারা মাটির অবয়বের সামনে আসলে চিন্ময় ঈশ্বরের আরাধনা করছেন, এক লহমায় শ্রীম-র সেই ফাঁপা অহংকার চূর্ণ করছেন রামকৃষ্ণদেব। বলছেন, "তোমাদের কলকাতার লোকের ঐ এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই! তুমি বুঝাবার

কে?...।"[১৫] উপলব্ধিশূন্য মনোভাব নিয়ে হুজুগে মেতে কোনো বিষয়ে যেনতেন প্রকারে অন্যকে বোঝাতে যাওয়ার যে মনুষ্য-স্বভাব আমাদের, সেই ভাবনার স্পষ্ট বিরোধী স্বর শোনা যায় 'কথামৃত'-এ। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন যখন হিন্দুধর্মকে আচার, সংস্কার, কুসংস্কারের পাঁক থেকে বের করে 'ব্রহ্ম'-এর মুখোমুখি করতে চাইছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে চাইছেন মধ্যবিত্ত বাঙালিকে, সেখানেও রাশ ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কথোপকথন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সুবক্তা কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণ 'ব্রহ্ম'-এর স্বরূপ প্রসঙ্গে বলছেন, "একলাফে ছাদে ওঠা যায় না।"[১৬] 'আমার মতই শ্রেষ্ঠ' এই 'ডগমাটিজম'-কে অস্বীকার ক'রে কীভাবে একই গন্তব্যে পৌঁছনোর বিবিধ পথকে মান্যতা দিতে হয় সেই বয়ানকেই সামনে এনেছে 'কথামৃত'। শ্রীরামকৃষ্ণ সমকালের মধ্যবিত্ত বাঙালি মনকে এমন এক চরিত্রের হদিশ দেন যেখানে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রকাশ মনোজগতের দিশারী। মন যখন মানুষের নিয়ন্ত্রক তখন তার একরকম আচরণ, আবার সেই একই মন যখন মানুষের সচেতন বোধের নিয়ন্ত্রণে তখন তার সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ। মনের চিরকালীন এই খামখেয়ালিপনাকে 'কথামৃত' সজাগ দৃষ্টিতে বিচার করার নিদান দেয়। রামকৃষ্ণের মতে "মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে।"[১৭] মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব হিসাবে 'আত্মপ্রেম' বা narcissism একটি বহুচর্চিত প্রসঙ্গ। সুস্থকর 'আমি'-কে ছাপিয়ে প্রতিযোগিতামূলক, জাহিরসূচক 'আমিত্ব'-এর প্রকাশ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানেই দ্বন্দ্ব, কলহে বিপর্যস্ত হয় মানবতা। নিজের 'আমি'-কে প্রধান প্রতিপন্ন করতে না পারলে জাগতিক সম্পর্কের পরিকাঠামোয় অন্যের 'আমি'-ও আমার 'আমি'-কে দমন করবে, পীড়িত করবে—সাধারণ মননে এই ভয় সর্বক্ষণ ক্রীয়াশীল। 'কথামৃত' এই আত্মবিশ্বাসহীন 'আমি'-কেই বর্ণনা করেছে 'কাঁচা আমি' বলে।[১৮] পরিণত মনন বুঝতে পারে, মহাবিশ্বের আঙিনায় এই 'আমি' বোধ নেহাতই সীমিত। জীবনকে বাস্তবিকপক্ষে গ্রহণ করলে এই সৃষ্টিকার্যের বিরাটত্বের কাছে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। এই দার্শনিক সত্য উপস্থাপিত হয়েছে 'কথামৃত'-এ। রামকৃষ্ণদেবের 'আমিত্ব বোধ' ওই 'কাঁচা আমি' থেকে 'পাকা আমি'-তে পরিণত হওয়ার নামান্তর। 'আমি'-র মধ্যেই সকল 'তুমি'-কে একত্রিত করতে পারতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অপরের সঙ্গে তাই তাঁর এত নিবিড় একাত্মতা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উল্লেখ আছে, গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার করার সময় এক মাঝি অপর এক ব্যক্তির পিঠে সজোরে আঘাত করছেন এই ঘটনা বহুদূর থেকে দেখলেও রামকৃষ্ণদেব প্রহার-যন্ত্রনার ব্যথায় কেঁদে উঠলেন। একবার কাশীতে যাওয়ার সময় জশিডির রাস্তায় হতদরিদ্র দেহাতি মানুষের করুণ অবস্থা দেখে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দরিদ্র পূজারী গদাধর চট্টোপাধ্যায় তাঁর মালিকপক্ষ রাসমণির সেজোজামাই মথুরানাথের কাছে দাবি রেখেছিলেন, সেই দুঃস্থ, নিরন্ন 'নারায়ণ'-কে না খাওয়ানো পর্যন্ত তিনি এদের ছেড়ে কোন তীর্থদর্শনের পুণ্যেই যাবেন না। অনেক বুঝিয়েও যখন এই প্রতিজ্ঞা থেকে একচুলও টলানো গেল না গদাধর ওরফে রামকৃষ্ণকে, তখন বাধ্যত

তাঁর জেদের কাছে মাথা নুইয়ে রামকৃষ্ণদেবের দাবি মতো সেই নিরন্ন মানুষগুলোর যথাসাধ্য সেবা করেছিলেন মথুরবাবু।[১৯] আধুনিক বিহেভিয়ারিস্ট বি.এফ.স্কিনার মানুষের আচরণের গুরুত্বপূর্ণ দিক 'সমানুভূতি' ও 'করুণা' অর্থাৎ 'কম্প্যাশন'-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তাঁর বই 'Beyond Freedom and Dignity'-তে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মানসিকতারই উল্লেখ করেছেন, "...his feelings were not a by-product of effective action; with all the power of his samadhi he had nothing to offer but compassion।"[২০] গোটা 'কথামৃত' জুড়েই উনিশ শতকের সাধারণ মানুষ নানাভাবে নানা আঙ্গিকে এই 'সমানুভূতি'-র হদিশই উপলব্ধি করেছে। স্বার্থযুক্ত 'আমি'ময় জঞ্জালকে ছুঁড়ে ফেলে সমগ্রতার বোধে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া — 'কথামৃত'-এর এই শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য 'গেস্টাল্ট থিয়োরি'র[২১] আশ্চর্য এক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই তত্ত্বেরও মূল কথা পৃথিবীতে মানুষের অভিযোজন হয়েছে তার অন্তর্দৃষ্টির সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্যই, আর তাই মানুষ ক্রমাগত নিজেকে পেরিয়ে যেতে চাইছে। স্বার্থগণ্ডী পেরিয়ে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়াই 'কথামৃত'-এর বয়ানে 'মানুষ' হয়ে ওঠা হওয়া। সেই 'মান-হুঁশ' যুক্ত 'মানুষ' হওয়ার হদিশই উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি মন খুঁজে নিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

মানসিক অস্থিরতা ও অসুস্থতার চিকিৎসায় বর্তমানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রচলিত থেরাপি হল 'CBT' বা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি।[২২] এই থেরাপির মূল কথা মানুষের চিন্তা করার ধরন পরিবর্তন করলে তার আচরণেরও পরিবর্তন হবে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দোসর অনিশ্চিত পরিস্থিতে নিজের পেশাগত জীবনের অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি, মৃত্যুশোক এবং অন্যান্য আরও কিছু সঙ্গত কারণে স্কুলশিক্ষক মহেন্দ্রনাথ যখন নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার আগে নিরিবিলিতে একটিবার দক্ষিণেশ্বরে সময় কাটিয়ে আসবেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পৌঁছেছিলেন, সেই দিন থেকে তিনি যেন রামকৃষ্ণদেবের এই CBT থেরাপির আওতায় এসে পড়লেন। উপনিবেশের শিক্ষাকাঠামোয় এতদিন যে ভাবে নিত্য-অনিত্য, বিদ্যা-অবিদ্যা, ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-জ্ঞানী-অজ্ঞানী ইত্যাদি নানা বিভাজনকে জেনেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তার বিকল্প এক বয়ান সামনে এল রামকৃষ্ণসান্নিধ্যে। ধীরে ধীরে চিন্তা প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন হল মহেন্দ্রনাথের, ফলে তার আচরণেরও পরিবর্তন হল, মৃত্যুচিন্তা কোথায় হারিয়ে গেল। শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর বুনিয়াদ সেই বিকল্প বয়ান, যাতে ক্রমশ আগ্রহী হয়েছিল ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমাগত টিকে থাকার চেষ্টায় রত মধ্যবিত্ত বাঙালি মনন। রামকৃষ্ণের ভূমিকা এক্ষেত্রে একেবারে আধুনিক, অনুভাবী মনোবিদের মতো, আর তাঁর মুখের কথার আকর এই 'কথামৃত' সেক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেসক্রিপশন। রোগলক্ষণ, অস্থিরতা, যুগযন্ত্রণা, সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সব 'বিষয়'গুলোকে ধরে ধরে যেন আলোচনা করে সেই রোগ-নিরাময়ের পথ অনুসন্ধানের

স্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে প্রকাশিত। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি মনকে এক প্রয়োজনীয় 'আত্ম সচেতনতা'-র পাঠ শিখিয়েছিল 'কথামৃত'। শতাব্দী প্রাচীন এই টেক্সটির আজও তুমুল জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও এইটিই।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১) বসু, স্বপন, ১৯৭৬, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা– ৯৫

২) বসু, স্বপন, চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ (সম্পা.), ২০০৩, 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, সম্পাদকের নিবেদন।

৩) বসু, স্বপন, ১৯৭৬, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা– ১৮

৪) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ১৫

৫) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ১৭১

৬) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৪৭০

৭) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৯২০

৮) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৮২০

৯) প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য স্বপন বসু এবং ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে স্বপন বসুর লেখা 'সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

১০) শাস্ত্রী, শিবনাথ, ২০০৩, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', সম্পাদনা– বারিদবরণ ঘোষ, হাওড়া, প্রথম সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, নিউ এজ, পৃষ্ঠা– ৩৭

১১) রায়চৌধুরী, সুনীতিরঞ্জন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, 'উনিশের শতকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা– ৭০

১২) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৩৫৩

১৩) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৮৮

১৪) Luft, J ; Ingham.H, 1955, 'The Johari Window, a graphic Model of interpersonal awareness', Los Angeles, University of California দ্রষ্টব্য।

১৫) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ১৮

১৬) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৮৫

১৭) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ৮৬

১৮) শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ১৯৮৬-৮৭, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃষ্ঠা– ১০০

১৯) প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত, স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', প্রথম ভাগ, সাধকভাব, গুরুভাব–পূর্বার্ধ দ্রষ্টব্য।

২০) Skinner, B.F, 1974, 'Beyond Freedom and Dignity', England, Reprint ed., Penguin. দ্রষ্টব্য।

২১) প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য The Columbia Encyclopedia, 2018, 'Gestalt', Columbia University press দ্রষ্টব্য।

২২) Beck, JS, 2011, 'Cognitive behaviour therapy: Basics and beyond', New York, 2nd ed., The Guilford Press, pp–19 to 20.

বিবর্তনের বঙ্গ সমাজে চৈতন্য আদর্শ : সেকাল ও একাল

অরিন্দম মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কে.এন.কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সারাংশ- বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে নতুন চেতনা ও দ্বান্দিক সম্পর্ক বিরাজমান। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও প্রায় সমস্ত মধ্যযুগ ধরে ইসলামি শাসন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে একটি স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। এই মধ্যযুগের সংকট মুহূর্তেই বাংলার আকাশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক জ্যোতিষ্কের মত, যা সমস্ত দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁর জ্ঞান, তিতিক্ষা, ধর্মবোধ দিয়ে সমাজে শুধু আলোড়ন সৃষ্টি করেন নি, তাঁর দুর্জয় ব্যক্তিত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগের মানসিকতা একদিকে যেমন ধনিক শ্রেণীর দম্ভকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনি অচণ্ডাল- দরিদ্র শ্রেণীকে বুকে তুলে নিয়ে সামাজিক ভেদাভেদের গণ্ডি অতিক্রম করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর মানবপ্রেম ও মানবতা, তাঁর ভক্তি সাধনা, কৃষ্ণপ্রেম ও বেদান্তবাদী সন্ন্যাসজীবন বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার আনে। তাঁর তীর্থভ্রমণ ইতিহাসে শুধু ধর্ম আন্দোলন ছিল না, বরং বলা ভালো, সেটি ছিল ভারতবর্ষে এক অভিন্ন সংস্কৃতির সুর খোঁজা। শ্রীচৈতন্য কীর্তনের মধ্য দিয়ে আদ্বিজ-চণ্ডালের নামে প্রেম প্রচার করে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ-মূর্খ-বিদ্বান, পাপী-পুণ্যবান সকলকে এক ভাব ঐক্য সূত্রে গাঁথতে সমর্থ হয়েছিলেন।
শব্দ সূচক- শ্রীচৈতন্য, সমাজ, মানবপ্রেম, কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তি, সংকীর্তন।

মূল আলোচনা

নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে।[১] বাংলায় তখন মুসলমান শাসন। বাঙালী হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ে মুলত বিভক্ত। হিন্দু সমাজে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রসহ আরো নানা উপভাগ ছিল। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন যখন বাংলার অধীশ্বর তখন বাংলার রাজনৈতিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করেছিল। সেই সময়েই অতর্কিত ইকতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষণ সেনের প্রাসাদ আক্রমণ করেন মাত্র ১৭জন অশ্বারোহী নিয়ে। ফলত লক্ষণ সেন পালিয়ে যান এবং বখতিয়ার খলজি দ্রুত অগ্রসর হয়ে রাজধানী লক্ষণাবতী তথা গৌড় দখল করেছিলেন।[২] তবে পরবর্তীতে বাংলায় ইলিয়াশ শাহ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে রাষ্ট্রকে সংগঠিত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থিক উন্নতি হয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর আমলে

সরকারি উচ্চপদে এমন কি সেনাপতি হওয়ার সুযোগ হিন্দুরা পেয়েছিল যা বাংলায় ধীরে ধীরে একটি উদার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল যা বারবাক শাহের আমলেও স্থায়ী হয়েছিল।

চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা ছিলেন শচীদেবী। শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন জ্যোতিষী। দৌহিত্রের জন্মলগ্ন, রাশি-নক্ষত্রাদি দেখে প্রকাশ্যে নবদ্বীপে ঘোষণা করেছিলেন এই নবজাত শ্রীচৈতন্য সাধারণ শিশু নয়, এক অসাধারণ মহাপুরুষ। পিতা জগন্নাথ পুত্রের নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর, মাতা শচীদেবী আদর করে নাম রেখেছিলেন নিমাই। এই নিমাই নামেই তিনি নবদ্বীপবাসীর নিকট পরিচিত ছিলেন। গৌর বর্ণের ছিলেন বলে গৌরাঙ্গ বলা হত। ক্রমে নিমাই এর পাঁচ বছর বয়স হলে তাঁর পিতা-মাতা নিমাই-এর হাতে খড়ির ব্যবস্থা করে পাঠশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা হল।[৩] পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের নিকট থেকে বাংলা ভাষা, হিসাব, দলিল পত্রাদি লেখার শিক্ষা গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যেই টোলে শাস্ত্র অধ্যায়ন শুরু করেন। তবে লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধুলাতেই বালক নিমাই-এর বেশি মনোযোগ ছিল। চতুর নিমাই তাঁর মায়ের শুচিবাই বুঝতে পেরে তাঁকে অশুচি-অস্পৃর্শ্য দ্রব্যসামগ্রী স্পর্শের ভয় দেখিয়ে নানান ফন্দি-ফিকির করতেন। মা তাঁর আবদার পূরণ না করলে নিমাই আস্তাকুড়ে গিয়ে বসে থাকতেন, অথবা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে মা-কে ছুঁয়ে দেবার ভয় দেখাতেন।[৪] নিমাই ছোট থেকেই মেধাবী ও বলিষ্ঠ। সহপাঠী, সমবয়সীদের সাথে রাস্তাঘাটে খেলা করতেন। তবে গঙ্গাঘাটই তাঁর প্রধান খেলার জায়গা ছিল। তবে ছেলেবেলা থেকেই মাঝেমধ্যেই অস্বাভাবিকতা দেখা যেত। গায়ের দীপ্তি যখন বেড়ে যেত তখন তিনি তত্ত্বকথা বলতেন। এই ঘটনায় তাঁর পিতামাতা চিন্তিত হতেন এবং নানা জন নানাকথা বলতেন ও নানারকমের উপদেশ দিতেন। সেসময়ে শান্তিপুর নিবাসী কমলাক্ষ ভট্টাচার্য নামে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বাস করতেন, যিনি অদ্বৈতচার্য নামেই বেশি খ্যাতি পান। অদ্বৈতাচার্য ও জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুত্ব ছিল। সেখান থেকেই তাঁরা নিমাইকে স্নেহ ও আদর করতেন। নিমাই-এর দাদা বিশ্বরূপ সংসারের মায়ামোহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে গভীর রাতে পিতামাতাকে ছেড়ে চলে গেলে নিমাই-এর পিতামাতা শোকে কাতর হয়ে পড়েন। দাদার গৃহত্যাগের ঘটনা নিমাইয়ের জীবনে নানা পরিবর্তন এনেছিল। চঞ্চলতা, খেলাধুলা ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনায় বেশি মনযোগী হয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিমাইয়ের উপনয়ন হলে সে সান্ধ্যা উপাসনা, পূজার্চনা শিক্ষা লাভ করতে থাকে। তবে নিমাই পাঠশালা, পড়াশুনায় অতি মনোযোগ দিলে তাঁর পিতা বড় ছেলের ঘটনায় ভয় পেয়ে নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিতা জগন্নাথের মৃত্যু তাঁকে শোকাতুর করে তুলেছিল। তবে তিনি অল্প বয়সেই সংসারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে মা-কে যত্ন করতেন।

পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যকরণ শিক্ষা শুরু করেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যায়নের জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিত মহেশ্বর বিশরদের টোলেও

ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর আকাঙ্খা ছিল একজন নৈয়ায়িক হবেন। ছাত্রাবস্থাতেই নিমাই ন্যায়ের একটি প্রধান গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেছিলেন। পড়াশুনা শেষ করে নিমাই ব্যকারণের টোল খুলে ছাত্রদের ব্যকরণ শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং দ্রুত অল্পদিনের মধ্যেই পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মায়ের আগ্রহে নিমাই লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করে সংসার পেতেছিলেন যা কালের নিয়মে ভালোই চলছিল। তবে ঈশ্বরপুরীর সুগভীর পাণ্ডিত্যের কাছে নিমাই জীবনে প্রথমবার পরাজিত হওয়ার স্বাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁর আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[৫] এই পর্যায়ে নিমাই-এর কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিমাই তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমাজপতিদের তথা স্মৃতিকার ও নৈয়ায়িকদের জ্ঞানচর্চার বিপরীতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রকৃতি অর্থাৎ সঙ্গিনীসহ যুগল সাধনা শুরু হয়েছিল। সেই কারণে তিনি শিক্ষা দিতেন যে জিতেন্দ্রিয় ছাড়া কেউ যুগল সাধনার অধিকারী নয়। অর্থাৎ নারী, তোমার সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে লীলা করলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু নারীকে জননীরূপে সম্মান জানানোই কর্তব্য।[৬] অর্থাৎ সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদা স্থাপনে তিনি জোড় দিয়েছিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের আলোকেও বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে নিমাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মনেই হিল্লোল নিয়ে এসেছিল। শ্রীচৈতন্য অনুভব করেছিলেন তত্ত্বজ্ঞান নয়, শুষ্ক শাসনও নয় সবার আগে প্রয়োজন মানুষের সংগঠিত হওয়া। তাই তিনি নামগানকে সর্বমন্ত্রসার বলে আখ্যা দিয়েছেন। চৈতন্যের হরিনাম সংকীর্তন সেকালের জনসংঘকে শুধুমাত্র প্লাবিত করে নি, যথেষ্ট শক্তিও যুগিয়েছিল। ইসলামীয় শাসনের উৎপীড়নে বহু মানুষ ধর্মান্তরিত হতে শুরু করেছিল মধ্যযুগীয় বাংলায়। এই অবস্থায় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন, আত্মবিশ্বাসহীন ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে টেনে তোলার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাসের সঙ্গে যৌথভাবে নামসংকীর্তন বাঙ্গালী সমাজকে আন্দোলিত করে তুললেন। তাঁর আহ্বানে, সংকীর্তনের মধুমাখা নামগানে অল্পদিনের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ যোগ দিলেন নামসংকীর্তনে। তবে হুসেন শাহর আমল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি কাজি কোতোয়ালদের এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে, যদি কেউ চৈতন্যদেবের ধর্মকাজে বাধা দেয় তবে তাঁর প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। হুসেন শাহের সময়ে সাধারণ মানুষও নিজ ধর্মাচারণের অধিকার ভোগ করতেন এবং তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। শ্রীচৈতন্যদেবও সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হুসেন শাহকে মহা বিদগ্ধ রাজা বলে অভিহিত করেন।

শ্রীচৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষ, সদাসাত্ত্বিক ভাব, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, মানবপ্রেম, সংগঠন, শক্তির প্রকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনকে দেশজোড়া খ্যাতির আলোকে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শ্রীচৈতন্য তৎকালীন

ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। কীর্তনের সম্মিলিত সঙ্গীতের পাশাপাশি নাট্যাভিনয়ের দিকেও নজর দিয়েছিলেন।[৯] শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের প্রসার অবশ্যই সমাজের নিচুতলার মানুষদেরও প্রভাবিত করেছিল। ক্রম উদ্দীপনাময় ভক্তি আন্দোলন যে আগামীদিনে বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মন্য অনুশাসনের উপরে চরম আঘাত হানবে তা তারা বুঝতে পেরেছিলেন। অদ্বৈতের বাড়িতে চৈতন্য দশদিন ছিলেন। ঐ সময়েই তাঁর নীলাচলে যাওয়ার ও থাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল।[১০] তবে কিছুদিনের মধ্যে নীলাচল থেকে ফিরে এলেও শচী এই সময়ে ১২দিন অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের মত কৃষ্ণভক্তের ক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করতে নীলাচলে যাওয়াটা তেমন কেনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আবার শ্রীচৈতন্য দক্ষিণের পথে যেখানেই গেছেন সর্বত্র সাধারণ মানুষকে, এমনকি ব্রাহ্মণদেরও কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করেছিলেন। তবে বলে রাখা দরকার দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্য আসার অনেক আগে থেকে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যপক প্রচার ছিল। তবে দেশে-বিদেশে ভক্তদের প্রতি তিনি বর্ণ বা জাতির বিচার করতেন না। শ্রীচৈতন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এমনকি শূদ্রকেও আলিঙ্গন করতেন। যবন হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্য দেবের এই মনোভাব ও আচারন তাঁর মহানুবভতাকেই তুলে ধরে। তাই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'The Hindus of Bengal were fused with a new life by the example and ideal of Chaitanya and the moral uplift that he had brought about all round.''[১১]

চৈতন্য প্রভাবিত ভক্তি আন্দোলনের ধারাটি হল যেকোনো ভাবে মানুষকে আধ্যাত্মিক ভক্তিরসে উজ্জীবিত করা এবং সেই পথে জীবনযাপনের একটি সহজ সরল, স্বচ্ছ ও সুন্দর দিক নির্দেশ করা। তাঁর এই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে সমাজের শ্রেণী বিভাজন ও জাতপাত কোনো বাঁধা হয় নি। তবে শ্রী চৈতন্যদেবের পথ যথেষ্ট কঠিন ছিল। তাঁর তীর্থভ্রমণ বা দেশ ভ্রমণ কেবল একটি ধর্ম আন্দোলন বা প্রচার নয়, বরং তার সাথে ভূগোল সন্ধানও বটে। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনযাপন সমকালীন ধর্মীয় আধিপত্যবাদকে প্রশ্নের সম্মুখীন দাঁড় করিয়েছিল। চৈতন্যের আধ্যাত্ম চেতনায় প্রকাশ হল মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক। তাই চৈতন্যের ধর্মে শুধু ভগবান আর ভক্ত, এর মাঝখানে কেউ নেই। আবুল কালাম আজাদ ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যে বারে বারে জোর দিয়ে বলেছেন 'হিন্দুর পুরুত ঠাকুর, খ্রিষ্টানের খ্রিষ্ট, অনেক পরে ইসলাম এসেছে মোল্লাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে মানুষই বড় কথা।[১২] মহাপ্রভুর শিক্ষায় হরিভক্ত পরায়ণ চণ্ডাল, বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ জীবনে যে অসদাচারী সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ সে নয়। শ্রীচৈতন্য তাঁর ভালবাসা ও নাম প্রেম দিয়ে সকলকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেন। বড় বড় রাজকর্মচারী, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দুঃখী দাসদাসী, গৃহভৃত্য ঈশান, যবন হরিদাস থেকে অদ্বৈত আচার্য, নামপ্রেমী শ্রীবাস ও গদাধর, পাঠান রাজকুমার বিজলি খান, ভূস্বামী রঘুনাথ দাস, উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্র, বাসুদেব সার্বভৌমের মত হাজার হাজার মানুষ সমাজের প্রায়

প্রতিটি স্তর থেকে তাঁর প্রেম কথা ও নামগানে সামিল হয়ে এক আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। নবদ্বীপ নগরের দুই কোতওয়ালের জগাই- মাধাইকে ক্ষমা করে দিয়ে সমাজে ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, শূদ্রদের সাথে স্পষ করে নামগান করে সব ভেদাভেদ মুছে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জাতপাতের ব্যবধান ঘোচানোর জন্য এবং ব্যপক গণসংযোগের জন্য চিড়ে-দধি মহোৎসব ও বৈষ্ণব উৎসবের আয়োজন করেছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণ ভজনের মধ্য দিয়েই জাতপাত দূর করতে চেয়েছেন। এভাবেই তিনি সমাজকে প্রেম ভালবাসা বিলিয়ে দুবৃত্তায়ন মুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

বিশ্ব সংসারে শ্রীচৈতন্য কঠোর সত্য উপলব্ধির কথা বলেছেন। অহংকার সুরাপানের চেয়েও নিকৃষ্ট। আত্মগরিমা প্রচার নরকবাসের থেকেও অধম। তাই নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটোছুটি করতে বারণ করেছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবন দিয়ে বুঝিয়েছেন এই পার্থিব জগতের লোভ-লালসা সাময়িকমাত্র। ইংরেজী ১৫৩৩খ্রিঃ ৯ই জুলাই শ্রীচৈতন্য মাত্র ৪৭বছর বয়সে জগন্নাথ মন্দির থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।[১৩] কিন্তু রেখে গেলেন মানবপ্রেম, ভালবাসা ও কৃষ্ণ নামে শান্তি ও মুক্তি পাওয়ার শিক্ষা। বহু খোঁজাখুঁজি করেও মহাপ্রভুর মরদেহের সন্ধান মেলেনি যা শ্রীচৈতন্য আলোচনায় একটা খামতি তৈরী করে। তবুও সেকেলে সমাজ- সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে মহাপ্রভুর প্রভাব স্পষ্ট। বৈষ্ণবদের ভক্তিরস তত্ত্বে পাঁচটি রসের কথা বলা হয়েছে, এগুলি হল শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস , বাৎসল্য রস ও মধুর রস।[১৪] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণের লীলা অনুষঙ্গ, হোলী উৎসব , দোল উৎসব বাংলাতেও ছাড়িয়ে পরেছিল। বিশেষ করে বাংলার দোলযাত্রায় এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিলেন মহাপ্রভু। তিনি তৎকালীনহীন বাঙ্গালী সমাজকে টেনে তোলার চেষ্টা চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভগবানকে পাওয়া যায় খুব সহজে– এই কথা বলে। তিনি বলেছিলেন কৃষ্ণকে পেতে যাগ-যজ্ঞ করতে হয় না। শুধু তাঁর নাম করলেই পাওয়া যায়। তাঁকে ভক্তি করলেই তিনি সদয় হন। এই বক্তব্য পুরোহিততন্ত্রকে আঘাত করে ফলে নানাপদে শ্রীচৈতন্যেকে হেয় জ্ঞান করার চেষ্টা হয়।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের ফলে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকে কৃষ্ণের সাথে সম মর্যাদা দেওয়া হয়। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভগবতে বিবৃত করেছেন-

সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ।।[১৫]

শুধু নারী নয়, তিনি সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর প্রতি আবেগময় ছিলেন। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে নাম প্রচারের দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে। মহাপ্রভুর নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে নবদ্বীপের পিছিয়ে পড়া শ্রেনি সমাজের উচ্চবর্ণের সাথে যোগাযোগের স্থাপন social mobility বা সামাজিক সচলতা সৃষ্টি করেছিল। আসলে

চৈতন্য জীবন বাংলার সমাজ জীবনে ভাবাবেগ সম্পন্ন চেতনা নয়। তার জীবন, সাধনা, ভক্তি, প্রেমরস, কৃষ্ণপ্রেম বাঙালী মননে চির গ্রথিত ও চিন্তা জগতের উদ্দিপক হয়েই বেঁচে আছে।

তথ্যসূত্র :

- নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি, চৈতন্যদেব, দীপ প্রকাশন, কোলকাতা,২০১২, পৃ- ২৭
- সতীশ চন্দ্র, হিস্টোরি অব মেডিয়াভ্যাল ইণ্ডিয়া (৮০০-১৭০০) ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, নিউ দিল্লি,২০০৭, পৃ-৭২
- স্বামী সারদেশানন্দ, শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব্, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ১৯৮৬,পৃ-৭
- ঐ, পৃ-৮
- তুহিন মুখোপাধ্যায়, লোকায়াত শ্রীচৈতন্য, গাঙচিল, কোলকাতা, ২০১,পৃ-২৫৯
- ঐ,পৃ-১১৯
- দেশ পত্রিকা, মার্চ সংখ্যা, ২০১১
- বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রিপুরা রাজমহল, ১৯৫৭, পৃ-৩০
- তুহিন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮
- ঐ, পৃ-১৩৪
- ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিস্ট্রি অফ মেডিয়াভ্যাল বেঙ্গল, ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কোলকাতা, ১৯৭৩, পৃ-২০৩
- দা সানডে ইণ্ডিয়ান পত্রিকা, মার্চ সংখ্যা, ২০১২
- দেবাশিষ পাঠক, শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান রহস্য, দীপ প্রকাশন, কোলকাতা, ২০১৬, পৃ-২
- শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বৈষ্ণব রসামৃত, চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাবলিকেশান, বারুইপুর, ২০২৩, পৃ-২৫৭-২৬১
- তদেব, পৃ-৩২৪
- বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত, আদি – দশম, পৃ-৮৩।

শৈবাল মিত্রের ইলিশের রাত : এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারিক জটিলতার উদ্ভাসিত ছবি

স্নিগ্ধা কর্মকার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : শৈবাল মিত্রের 'ইলিশের রাত' গল্পটিতে একজন নিম্নবিত্ত মানুষ অর্থাৎ সনতের একাকী একটি ইলিশ মাছ খাওয়ার বাসনাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতা এবং তার পারিবারিক নানা ওঠা পড়ার ছবির উদ্ভাসিত দিকটি নিয়েই এই গল্পটি রচিত। এই প্রসঙ্গে তার মায়ের মূল্যবোধের পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ। এই গল্পে মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র সনৎ, পেশায় তিনি স্কুল মাস্টার। তার জীর্ণ সংসারে মা, বাবা, দুই ভাই সুকুমার ও সন্দীপ এবং দুই বোন অনিমা ও প্রতিমা থাকে। কিন্তু এত বড় সংসারে অর্থনৈতিক উপার্জনের স্বাবলম্বী শুধুমাত্র সনৎ বাবু একাই। তখনকার সময়ে স্কুল মাস্টারদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই সচ্ছল ছিল না। ফলে এত বড় পরিবারে তার অতি অল্প আয়ে সাংসারিক অভাব অনটন মাত্রাতিরিক্ত। সনৎ খুবই খাদ্যরসিক একজন মানুষ, তার ইচ্ছার মধ্যে শুধু একটি অভিপ্রায়ই ছিল। সেটা হল, সে একা একটা গোটা ইলিশ মাছ সম্পূর্ণ একাই খাবেন। তিনি সালকিয়ার একটি স্কুলে পড়াতেন, যেখানে তাকে গঙ্গার উপর দিয়েই নিত্যদিন যেতে হত। তার স্কুলেরই এক ছাত্রের বাবা নফর কুণ্ডু পরাণের ঝাঁক থেকে তাকে একটি দেড় কেজির মাছ দিয়েছিল। সেই সময়ে সনতের কাছে টাকা না থাকা সত্ত্বেও তাকে সেই মাছ দেয়। কারণ, নফরের ছেলের স্কুল মাস্টার সনৎ, তাই তাকে এত খাতির করেন এবং পরে টাকাটা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। তার পরিবারের সকলের খাবার খাওয়ার পরে রাতে অগোচরে বাড়িতে ঢুকে মাকে পদ্মার ইলিশ রান্না করার কথা বলেন সনৎ। কিন্তু সনতের সেই সখ পূরণ হল না। তবে যতই সবাই ঘুমিয়ে পড়ুক না কেন ইলিশের গন্ধে সবারই ঘুম ভেঙে যায় এবং ইলিশে ভাগ বসাতে চলে আসে। সনতের মনের মধ্যে সুপ্ত রাগ হলেও সে দেখে তার মায়ের মুখে অগাধ প্রশান্তি। এবং তার মা তাকে সেই রাতে একটা গোটা ইলিশ মাছ খাওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে।

সূচক শব্দ : বাসনা, জটিলতা, মূল্যবোধ, বাস্তবতা, খাদ্য রসিক, বিষণ্ণতা, বিধ্বস্ত, অগাধ প্রশান্তি, একাকী, স্বার্থপরতা, গূঢ়চারী।

মূল প্রবন্ধ :

শৈবাল মিত্রের জন্ম- ১৯৪৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এবং মৃত্যু ২০১১ সালের ২৭শে নভেম্বর। তিনি বর্তমান প্রজন্মের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান লেখক। ছত্রিশ

বছর কলেজে শিক্ষকতার দায়িত্বে ছিলেন। ষাট ও সত্তরের দশকে বাম রাজনীতি এবং ছাত্র আন্দোলনের সাথে গুরুতরভাবে জড়িত থাকায় অনেকবার কারাবাস জীবনেও নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর উপন্যাস এবং ছোট গল্পের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সামাজিক কর্মী হিসেবে সৃজনশীল মৌলিক রচনার মাধ্যমে পাঠকের কাছে মনোনীত হয়ে আছেন আজও। তিনি নাগরিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের জন্য একজন প্রবল নায়ক। একজন সৃজনশীল লেখক ছাড়াও তিনি নিঃস্বার্থ সমাজচিন্তক ও মানবতাবাদী।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের জগতে শৈবাল মিত্রের গল্প গুলির মধ্যে একটা বিশেষ ব্যতিক্রমী উদ্ভাসিত দিক ধরা পড়ে তা স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। যেখানে তিনি অতি সাধারণ ঘটনাগুলোকে তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। যেই ঘটনা গুলো প্রায়শই মানুষের চোখে পড়ে না তাকে তিনি তাঁর উপস্থাপনের মুন্সিয়ানায় উত্তরিত করে দিয়েছেন। তিনি এক অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ও উচ্চতায় তিনি তাঁর গল্পের শৈলী নির্মাণ করেছেন।

তাঁর 'ইলিশের রাত' গল্পটির ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হয় নি। এ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে সনৎ বাবু ও তার পরিবারের সদস্যেরা। সনৎ বাবু ছাড়া তার পরিবারে রয়েছে মা আভারানি ও বাবা একাত্তর বছর বয়সী সবল বৃদ্ধ। যিনি দশ বছর আগে সামান্য চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও আছে তার আরও দুই ভাই সুকুমার ও সন্দীপ, দুই বোন অনিমা ও প্রতিমা।

সুকুমার পঁচিশ বছর বয়সী এক তরুণ যুবক ছেলে। অন্তত সে যদি কিছু আয় উপার্জন করত তাহলে সংসারে এত অভাব অনটন থাকত না। কিন্তু সে গত দু-তিন বছরে ব্যবসা চাকরি কিছুই করে উঠতে পারে নি। দু-একটা টিউশনি করলেও সেই টাকা পরিবারের কেউই চোখে দেখে নি। দুই বোনের মধ্যে বড় বোন অনিমা বাইশ বছরের আর প্রতিমা উনিশ বছরের যুবতি। তাদের মা আভারানি জানেন, এই আধ মরা সংসারের পুরো দায়িত্ব সনতের উপর থাকলেও সে বোনেদের বিয়ের জন্যে প্রতি মাসে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমায়।

একটি সংসারে প্রাপ্তবয়স্ক সম্পূর্ণ সাত জনের আশ্রয়, সেখানে শুধুমাত্র সংসারের আর্থিক দায়িত্বের ভার সনতেরই উপর। এর ফলে বোঝাই যায় যে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা দুর্বল। তাদের বাড়ি-ঘরের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়, সব মিলিয়ে দম বন্ধ করা একটা পরিবেশ। ঘুপচি হতশ্রী অন্ধকার রান্নাঘর, ঝুল ও চুনে ভর্তি বাঁশের বাতা, সুরকির দেওয়ালে পোঁতা পেরেকে ঝুলছে ন্যাতা, পুরোনো কাঠের দুটো তাকে অ্যালুমিনিয়ম আর কাঁসার কিছু ট্যারাবাঁকা ফুটো-ফাটা বাসন রয়েছে। কেরোসিন স্টোভের সামনে ছোটো জলচৌকির উপর একটা কুপি জ্বলছে সেখানেই আভারানি চল্লিশ বছর ধরে রান্না করে যাচ্ছে। বাড়ির দুটো ঘরে ইলেকট্রিকের আলো থাকলেও রান্নাঘরে সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

এ গল্পের কেন্দ্রে যে সনৎ চরিত্রটি আছে, তিনি পেশায় স্কুল মাস্টার। যে সময় এই গল্পটি লেখা হয়েছে তখন স্কুল মাস্টারদের অবস্থা খুব সম্পন্ন ছিল না। তাইতো স্কুল মাস্টার সনতের একার আয়ে জীর্ণ আধ মরা একেবারে সাধারণ সংসার ধুকতে ধুকতে কোথায় যে চলেছে তা বলা খুব শক্ত। সেখানে কে কোথায় থাকেন, সেটা জানিয়ে শৈবাল মিত্র লিখেছেন-

"রান্নাঘরের পাশে একচিলতে উঠোন, তারপর গায়ে গায়ে লাগানো দুটো ঘর। একটায় তক্তপোশের ওপর সনতের বাবা শোয়, মেঝেতে আভারানি আর দুই মেয়ের বিছানা। পাশের ঘরে থাকে সনৎ এবং তারই দুই ছোটোভাই, সুকুমার আর সন্দীপ।"

তবে এই আর্থিক দুরাবস্থার কারণে সনৎকে তার জীবনের যথাযথই সব আশা এবং আহ্লাদ ত্যাগ করতে হয়েছে। তার বড়ো ইচ্ছা ছিল একদিন পুরো একটা গোটা পদ্মার ইলিশ মাছ সে একাই খাবে। কিন্তু শৈবাল মিত্র তার এই ইচ্ছাটাকে এ গল্পে যেমন অত্যন্ত বাস্তব বলে নির্দেশ করেছেন, তেমনি বহুজনের সংসারে তার ইচ্ছাটা কীভাবে একটা অন্য পর্যায়ে পৌঁছে গেল তার অনুপম এক বাস্তব ছবি এঁকেছেন। এত বড় সংসারে একাকী কোনো কিছুই সম্ভব নয় বা বলা যেতে পারে উচিতও নয় শোভাও পায় না খুবই দৃষ্টিকটু একটা বিষয়। প্রত্যেকটা ছোট ছোট জিনিসও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াটাই সৌজন্যপূর্ণ, তাতেই সবথেকে বেশি আনন্দ। তাই যেন লেখক এই গল্পের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

সনৎ সপ্তাহে ছয় দিন গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়ার একটি স্কুলে পড়াতে যান। পরিশ্রমের পাশাপাশি এই কম মাইনের অভাবী সনৎবাবু যথেষ্ট খাদ্য রসিক তাইতো তার বিভিন্ন নিমন্ত্রণে খাওয়া দাওয়ার বিষয়টি শৈবাল মিত্র অত্যন্ত বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে বসলে তিনি নির্দ্বিধায় একের পর এক খাবার নিমেষে খেতে থাকেন। তিনি কোনো নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে বসলেই হই-চই পড়ে যায়। এমনকি একদিনে তিন-চারটে নিমন্ত্রণ পড়লেও সবগুলোতেই উপস্থিত থেকে ভরপুর খেয়ে নিতে পারেন। এক-দেড় কেজি মাংস, পঁচিশ-ত্রিশ পিস্ মাছ, এক হাঁড়ি দই, চার-পাঁচ গণ্ডা সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি। তার কাছে এসব কিছু একসাথে খাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু এখন দিন বদলেছে সনৎ কোথাও গিয়ে বেশি খেতে পারে না লোকের কথা শোনার ভয়ে। তবে হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে মন ভরে খাবে সেই সামর্থ্য তার নেই।

তিন–চার বছর আগে তার এক বন্ধুর বউভাতে একবার এমন একটি কেলেঙ্কারি ঘটনা ঘটেছিল সনতের সাথে যা অতীব লজ্জিত। তার সঙ্গে খেতে বসা গোটা ব্যাচ খেয়ে উঠে পড়ার পরেও তার পাতে তখনও রাশিকৃত খাবার রয়ে গেছে- একগাদা সন্দেশ, রসগোল্লা, দইয়ের হাঁড়ি। তার খাবার খাওয়ার ধরণ দেখার জন্য রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু সে কাউকে পাত্তা না দিয়ে নিজের মতো নিজেই

হাসিমুখে অবলীলায় খেয়ে চলেছেন। সকলের সামনে তার বন্ধুর ক্ষিপ্ত ছোট কাকা তাকে বকরাক্ষস বলে গাল দেওয়াতে লজ্জায় পড়ে গেছিলেন।

শৈবাল মিত্রের গল্প কথনে একটা বিশেষত্ব এই যে তিনি পূর্বের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে এমন করে সাজিয়ে তোলেন যে তার গল্পে বর্তমান ঘটনাটি তার আগের এবং পরের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে চরিত্রগুলির উন্মোচনে নিয়ে আসে একটা অসাধারণ গতি ও বাস্তবতা। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে–

> "ইলিশের দুটো বড়ো টুকরো কড়ার গরম তেলে ছাড়তে ছ্যাঁক- ছ্যাঁক করে দুবার শব্দ হল। নিপুণ হাতে খুন্তির ডগা দিয়ে টুকরো দুটো কড়ার দুপাশে সামান্য সরিয়ে দিলেন আভারানি। কয়েক সেকেন্ড যেতেই গঙ্গার টাটকা ইলিশ থেকে হু-হু করে তেল বেরোতে লাগল।"

সনৎ মেঝেতে বসে আছে তার সামনে একটা কাসার থালা। অন্ধকারে শুধু মাছ ভাজার শব্দ ছ্যাঁক... কলকল... ছ্যাঁক। আভারানি সনৎকে ভাজা ইলিশ মাছের টুকরো গুলো দিচ্ছেন কিন্তু সনৎ আচমকা বলে উঠলেন–

> "বেশি আওয়াজ কোরো না, রাবনের গুষ্টি জেগে উঠবে।"

চোখের পলকের মতো মাছ ভাজা সাবাড় করে নেয় সনৎ। মনে মনে সে ভেবেছিল আজ পুরো একটা ইলিশ মাছ সে নিজেই খাবে। অভাবী জীবনে এমন সুযোগ বড়ো একটা আসবার নয়।

এরপরেই গল্পটি যাত্রা করেছে কিছুটা অতীতে। সনৎ কীভাবে ইলিশ মাছটি কিনে এনেছিল। নফর কুণ্ডু অনেক খুঁজে খুঁজে পরানের ঝাঁকার থেকে একটা কেজি দেড়েকের পঁচিশ টাকার মাছ সনৎকে দিয়ে বলেছিল একেবারে সেরা মাছ। সনৎ মাছের রং চাকচিক্য দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে যান, যেন ঢালাই রুপোর পাত সুগন্ধে পূর্ণে বাতাস ম-ম করছে। টাকা না থাকায় সনৎ মাছটি নিতে চাইছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও নফর সনতকে মাছটি জোর করে ধরিয়ে দেয়। নফর তাকে বলে–

> "কাল, পরশু বা সামনের মাসে দিয়ে দেবেন।"

সনতেরও এতদিনের ইচ্ছে ছিল তাই সে লোভ সংবরণ করতে না পেরে মাছটি নিয়ে নেন। আদতে সনৎ জানতেন নফর কেন তাকে এত খাতির যত্ন করে। তার একটাই কারণ, নফর কুণ্ডুর ছেলে কীর্তিমান কুণ্ডু ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আর সনৎ সেই স্কুলেই পড়ায় এবং সে সেই স্কুলেরই ক্লাস সিক্সের ক্লাস টিচার।

সনৎ যখন চটের থলিতে মাছ নিয়ে লঞ্চে করে বাড়ি ফিরছিল তখন যেন বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশটাও তার কাছে অন্যরকম লেগেছিল অন্যদিনের তুলনায়। স্যাঁতসেঁতে মেঘলা বিকেলটা যেন মায়াবি। লঞ্চের চাকার শব্দ, গঙ্গার ঘোলা জলের ঢেউ ও বাঁক, ধূসর শহর সবকিছু যেন অপরূপ এক দৃশ্য। কথকের যেন মনে হয়েছে একটা ইলিশ মাছ মনমরা ফ্যাকাসে বিকেলের আকাশ, বাতাস, পরিবেশ সব বদলে দিয়েছে। এমনটা সনতেরও ভাবার কারণ আছে, কারণ আজ সে পদ্মার ইলিশ নিয়ে বাড়িতে

ঢুকছে। অন্যান্য সময়ে কোনো বড়োলোকেদের কেনা চুনো, চিংড়ি ও জোড়া ইলিশ মাছের গন্ধে পরিবেশ ভেসে থাকে, কিন্তু আজ সনতদের বাড়িতে সেই আবেগময় আবহাওয়া।

এ গল্পের কাহিনি একটি ইলিশকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হলেও সনৎ চরিত্রটির মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে একটা মনস্তাত্ত্বিক ওঠাপড়া। তার মন মানসিকতা হীন, নীচ, স্বার্থপর, বর্বর প্রকৃতি বিশিষ্টেরই পরিচয় পাওয়া যায়। দেড় কেজির একটা মাছ তিনি পরিবারের মানুষদের সাথে ভাগ করে নিতে চান না। বাড়িতে পাঁচ ভাই-বোন এবং বাবা-মা যাদেরকে সে বয়লার বলে আখ্যা দিয়েছে। মন বিকারগ্রস্ত সনতের মনে হয় তাদের পেট যেন দিন দিন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, যা পাচ্ছে গিলে নিচ্ছে, শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুই পারে এই আগুন নেভাতে। লোভী সনৎ চেয়েছিল দেড় কেজির মাছটা তিনি একাই খাবেন। তাইতো তিনি অপেক্ষা করছিলেন-

> "রাত দশটার পর, খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ির সকলে ঘুমোলে, তার খাবার নিয়ে শুধু মা জেগে থাকবে, তখন, পা টিপে টিপে সে বাড়িতে ঢুকবে। একটা আস্ত ইলিশের আবির্ভাবের খবর মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ জানবে না।"

কোনো অভাবী মানুষের এমন আশা করাটা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। মাথা বাদ দিয়ে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ পিস রয়েছে, তার মধ্যে চারটে মাছ ভাজা হয়েছে, এখনও অনেক গুলো ভাজা বাকি আছে। একটু আগেই পরিবারের আর পাঁচটা মানুষ শুকনো রুটি আর আলু বেগুনের তরকারি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আভারানির মনে হয়েছে ঘুমন্ত মানুষ গুলোর জন্যে পাঁচ পিস মাছ রেখে দিলে ক্ষতি কী। যতই বড় ছেলে খাদ্য রসিক হোক না কেন মা তো চায় সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার জন্য। নিজের কথা তিনি একবারের জন্যও ভাবেন নি। আর সাধারণ পাঁচটা মায়ের মতো শুধুমাত্র ভেবেছেন তার সংসারের মানুষদের কথা। আভারানি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সনৎ তাকে ফিসফিস করে বলেছিল কোনো কথা না বলে চুপচাপ রান্নাঘরে যাওয়ার জন্য।

সনতের ইলিশ মাছ খাওয়ার এমনই ঘটা যে আভারানির মাছ ভাজা শেষ হওয়ার আগেই তার খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার থালা একেবারেই পরিস্কার, কোথাও কোনো মাছের টুকরো তো দূরের কথা কাটা পর্যন্তও নেই। এমনই থালা ঝকঝক করছে যেন থালাতে যে খাওয়া হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে না, ঘষেমেজে পরিস্কার করা থালার মতো লাগছে।

গল্পকার বারেবারেই গল্পের মধ্যে আগের পরের ঘটনা এলোমেলো করে সাজিয়েছেন। কিন্তু তিনি গল্পটিকে তেমনি ফ্ল্যাশব্যাকেও নিয়ে গেছেন। এই সামান্য এক রাতে ইলিশ মাছ খাওয়ার প্রসঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাবের ছাপ ফেলেছেন। সনতের এমন

খাওয়ার প্রতি লোভ লালসা দেখে আভারানির সেই বহু বছর আগে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার কথা মনে পড়েছে।

পঞ্চাশ সালের মহামারি দুর্ভিক্ষ যখন তুঙ্গে রাস্তায় ভিখিরিরা মিছিল করেছিল একটু ফেনের জন্যে, তখন আষাঢ় মাসে আভারানির বাপের বাড়ি বাগবাজারে পুরোনো বাড়ির একতলায় সনতের জন্ম হয়েছিল। আভারানির সব ছেলেমেয়েই বাড়িতে জন্মেছে। সনৎ যখন চারদিনের শিশু তখন একদিন দুপুরে আভারানির মা আঁতুড়ঘরে একবাটি গরম দুধ রেখে যায়। চারদিক নিঃশব্দ, নিঝুম, ঘুমন্ত ছেলেকে পাশে রেখে আভারানি একা বসে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন এক পঁচিশ–ত্রিশ বছরের হাড়গিলে কঙ্কাল মেয়েটি জানলার লোহার গরাদ ধরে কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন আভারানি ভুলতে পারে নি। মেয়েটি এমন অদ্ভুতভাবে দুধের বাটির দিকে তাকিয়ে ছিল আভারানি বাটির দুধটা জানলা দিয়ে কানাভাঙা অ্যালুমিনিয়মের তোবড়ানো থালায় দুধটি ঢেলে দিয়েছিল। হতভাগিনী মেয়েটি সেই দুধ পেয়ে কোলের বাচ্চাটির কথাও ভুলে গেছিল তার একটুও তর সয় নি চুমুক দিয়েই খানিকটা খাওয়ার পর বাচ্চাটির কথা মনে পড়েছিল। তারপর তার ময়লা শাড়িতে ভিজিয়ে খাওয়াতে গেলে দেখে বাচ্চাটি একটুও খেল না। আভারানি বুঝতে পারলেন বাচ্চাটি মারা গেছে, আর কেউ নেই খানিকটা দুধময় থালাটা ছাড়া। তিনি অনুভব করলেন-

বড়ো ধু – ধু শূন্য হয়ে গিয়েছিল বুকের ভেতরটা। কাঁথা, বালিশে চারদিনের সন্তানকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে সেই ভয়ার্ত শূন্যতাকে তিনি কাটাতে পারছিলেন না। ঘটনাটা যেন সারা জীবনের মতো বুকে গেঁথে গেছে। জেগে, ঘুমিয়ে, আবছা তন্দ্রার মধ্যে, প্রায়ই ওই দৃশ্যটা, খিদেতে মরে কাঠ হয়ে যাওয়া একটা বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে এক দুর্ভাগিনী মা ছুটে পালাচ্ছে, আভারানি দেখতে পান। নিজের ছেলেমেয়েদের তখন আভারানির অচেনা লাগে। আভারানির বারেবারে মনে হয় সামনে থালা নিয়ে বসে থাকা ছেলেটি সনৎ নয় হয়তো সেই আঠাশ বছর আগের মরা ছেলেটা। ইলিশের গন্ধে মৃত বাচ্চাটা আবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু গল্পের পরিণামে দেখা গেল একটি রোগা, লম্বা, কঙ্কালের মতো ছায়া মূর্তি চৌকাঠের বাইরে সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সেটি আর কেউই নয়, তিনি হলেন সনতের বাবা। ইলিশের গন্ধে তার ঘুম ভেঙে গেছিল। আভারানি তাকে ভিতরে ঢুকে একটা ভাজা মাছ খেতে বলল। মাছ খেতে খেতে তিনি সনতের থালার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাবা ছেলেতে মাছ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সনৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে তার বাবাকে গাদার মাছটি দেয় যাতে প্রচুর কাটায় সে খেতে না পারে কিন্তু তার বাবা হার মানবার পাত্র নয়। সনৎ তার বাবার বয়সের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন-

> “শরীর আর কী খারাপ হবে? বয়স হয়েছে, মরতে যখন একদিন হবে, তখন খেয়ে মরাই ভালো।... ভারী চমৎকার মাছ। তবে পদ্মার জাত আলাদা। আমরা খেয়েছি চার আনায় চারটে।”

তার বাবার এমন কথা শুনে সনতের যেন ঘৃণায় গা পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু যে সনৎ পুরো ইলিশ মাছটি একাই খাবে বলে ভেবেছিল সেখানে তার বাবার পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একে একে অনেকগুলি ছায়া– সুকুমার, অনিমা, প্রতিমা এবং তার ছোট ভাই সন্দীপ, রান্নাঘরে তখন ইলিশ খাওয়ার মেলা। প্রত্যেকের মুখ দেখা না গেলেও দেয়াল জুড়ে তাদের হা মুখের ভুতুড়ে ছায়া।

এই ঘটনায় সনতের মনের মধ্যে বিধ্বস্ততা এলেও তিনি দেখলেন তার মায়ের মুখে একটা অগাধ প্রশান্তি। স্বামী, ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতে পেরে তার মুখের সমস্ত বিষণ্ণতা মুছে গেছে এবং পরিণামে সনৎ উপলব্ধি করেছেন এই মা তাকে মাঝরাতে একটা সম্পূর্ণ গোটা ইলিশ খাওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এক গভীর রাতে ইলিশকে কেন্দ্র করে নিম্নবিত্ত পারিবারিক জটিলতার যে উদ্ভাসিত ছবি ফুটে উঠেছে তা যেন আভারানির জন্যে স্থিতিশীল হয়েছে। বাবা ছেলের মাঝে পড়ে মা শুধু পিষেছে। এখানে তাদের মা আভারানির গুরুত্ব মূল্যায়ন অপরিসীম।

সহায়ক গ্রন্থ :-

১। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল সংকলন ও সম্পাদনা, ২০২১, বাংলা গল্প সংকলন চতুর্থ খণ্ড; রবীন্দ্র ভবন, ৩৫, ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, সাহিত্য অকাদেমি।

২। মিত্র শৈবাল, ২০১৭, শৈবাল মিত্র শ্রেষ্ঠ গল্প; ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০৭৩, দে’জ পাবলিশিং।

রবীন্দ্রনাট্যে ও প্রহসনে হাস্যরস

সুস্মিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম

সারসংক্ষেপ : স্বল্প সময়ের ছোট নাটককে আমরা নাটিকা বা নাট্য জাতীয় রচনা বলে থাকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের ক্ষুদ্র নাটক রচনা করেছেন যার অনেকাংশই হাস্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই প্রহসন ও নাটিক রচনাতেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। মঞ্চের ক্ষেত্রেও এ এক অভিনব প্রয়াস। নাটিকাগুলো শিশু ও কিশোর মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ নাটিকাগুলো লঘু রস, নৈতিক বোধ গঠন, কৌতুক রস নিয়ে রচিত হয়েছে। হেঁয়ালি নাট্য বা charade এর আদলে রচিত 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের নাটিকাগুলোর আলোচনায় হাস্যরসের বিষয়, ধরন, উপাদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। 'হাস্যকৌতুক' নাট্য সংকলনে পনেরোটি নাটিকা স্থান পেয়েছে। 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থে ছয়টি নাট্য জাতীয় রচনা রয়েছে যা মূলত ব্যঙ্গাত্মক। এছাড়া তাঁর রচিত তিনটি প্রহসন 'গোঁড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা' -তে হাস্যরস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো প্রহসনে কৌতুক, কোথাও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, কোথাও বাস্তব সিরিয়াস চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।
সূচক শব্দ : হাস্যরস, প্রহসন, কৌতুক, ব্যঙ্গ, নাটিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তিনি উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলিকে নানা পর্যায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সেগুলির একটি ভাগ হচ্ছে প্রহসন জাতীয় রচনা। মূলত প্রহসনগুলিকে কৌতুকপ্রধান-নাট্যও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ হাস্যরসের মধ্যে তা পর্যায়ভুক্ত করা চলে। এছাড়াও তাঁর রচিত দুটি নাট্য জাতীয় গ্রন্থকেও রবীন্দ্র-হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের পর্যায়ে ধরা যায়। তবে শুধুমাত্র নাটকেই নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে হাস্যরস পাওয়া যায় তাঁর রচিত নানা রচনাতেই। তিনি হাস্যরস ব্যবহার করতেন প্রয়োজন মতো, সহজভাবে। যেমন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও সমালোচনায় এমনকি কথোপকথনে ও চিঠিতে হাস্যরসের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বেই হাস্যরসের ব্যবহার রয়েছে কিন্তু তা মূলত ব্যঙ্গ- বিদ্রুপের আড়ালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই রীতি ব্যবহার করেছেন খুবই সামান্য। বরং তিনি কৌতুকবোধ জাগ্রত সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মোড় নেন। তিনি

কৌতুকও রচনা করেছেন বাস্তব প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে। সমাজ, সময়ের প্রভাব বাকি সব সাহিত্যের মত তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনাতেও বিদ্যমান। বাঙালি সমাজ এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যরস প্রয়োগ সম্পর্কে অজিত দত্ত বলেছেন -

> "ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটি বৈচিত্রময় বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার এক প্রান্তে বঙ্কিম যুগ, কিন্তু আর এক প্রান্তে অতি আধুনিক যুগের বিষয়, রীতি ও ভঙ্গিতে পরিণতি লাভ করেছে।"[১]

'গোড়ায় গলদ' তাঁর রচিত তিনটি প্রহসনের মধ্যে অন্যতম। প্রহসনটি ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে সংশোধন করে 'শেষরক্ষা' নাম দিয়েছেন। তাঁর প্রচুর লেখা তিনি বারংবার পরিবর্তন এবং সংশোধন করেছেন। তাঁর উপলব্ধি গভীর ভাবনা চিন্তা শুধু নতুন লেখায় নয়, প্রতিফলিত হয়েছে নানা প্রকাশিত লেখাতেও। 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটির সূচনা ঘটে ভ্রান্তি দিয়ে। এতে রয়েছে কৌতুকবোধ। বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন -

> "গোড়ায় গলদ প্রহসনটি যে সকলকে অনাবিল আনন্দ দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।"[২]

'গোড়ায় গলদ' যেমন তাঁর রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন তেমনি এই প্রহসন প্রথম সমাজ- জীবন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত কৌতুকহাস্য-প্রধান রচনা। রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন -

> "নির্মল হাস্যের দীপ্তিতে ভাস্বর কৌতুক রসাশ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কমেডি গোড়ায় গলদ।"[৩]

'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটির শুরুতে গলদ বা ভ্রান্তি দেখতে পাওয়া যায়। ভুল নাম, ভুল পরিচয় এবং সেই ভুল পরিচয়েই ভালোবাসা জন্মে এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, নিমাই সবাই বন্ধু হলেও এখানে বিবাহিত শুধুমাত্র চন্দ্রকান্ত। চন্দ্রকান্তের পড়শীর বাড়িতে দুই মেয়ে রয়েছে ইন্দমতী ও কমল। একজন নিবারণবাবুর কন্যা এবং আরেকজন বন্ধুর কন্যা। পিতা কমলের সব দায়িত্ব শেষ অবস্থায় বন্ধু নিবারণের হাতে তুলে দেন। কমলের গানে মুগ্ধ হয় সদ্য পাশ করা উকিল বিনোদবিহারী এবং বিয়ে প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ায় বিবাহ ঠিক হয়। এদিকে ইন্দুমতীর নিমাইকে দেখে ভালো লাগে। নিমাই ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী ভাবে, আবার বিনোদবিহারী ও কমল এর মধ্যেও দেখা যায় পরিচয় এর লুকোচুরি খেলা। ললিত চাটুজ্যে এবং কাদম্বিনী হিসেবে পরিচয় ঘটলে পরবর্তীতে সত্যিটা সামনে আসে। আরেকদিকে বিনোদবিহারী ও কমলের বিয়ের পর কমলকে অভাবের জন্য নিবারণবাবুর বাড়িতে রেখে যায়। বিনোদবাবু জানত না যে কমলের পিতা তার জন্য কত সম্পদ রেখে গেছে। নিবারণ বাবুকে কমলের পিতা সম্পত্তির কথা লুকাতে বলেছিল কারণ কেউ যেন

সম্পত্তির লোভে কমলকে বিয়ে না করে। পরবর্তীতে এই কথা কমল জানে এবং পরিচয় লুকিয়ে কমলও এই ভুলের খেলায় মেতে উঠেছিল। কমল নিজের পরিচয় গোপন রেখে তার পিতৃ- সম্পত্তির মালিকানার উকিল হিসেবে তার স্বামীকে নিযুক্ত করেন। শেষে যদিও মিলন ঘটে। চন্দ্রকান্ত ও তার স্ত্রী ঘটকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই নির্মল কৌতুকে বিবাহ হাসি-ঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠেছে। 'গোড়ায় গলদ' শব্দটি আমরা প্রহসন হিসেবে ব্যবহার করি যার অর্থ 'মূলেই ভুল' রয়েছে। এখানে দেখা যায় গলদ শুরু হয় পরিচয় নিয়েই। অনেক সংশয়ের সৃষ্টি হলেও শেষে ভ্রান্তির অবসান ঘটে। শেষে যদিও শেষ রক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিনোদ, নিমাই চরিত্রগুলি কৌতুকে ভরা। তবে সংশোধিত রূপ 'শেষরক্ষা'র গদাই চরিত্রটি ও বিশেষত অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত হিসেবে গড়েছেন। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি কৌতুক সৃষ্টি করেছে জীবন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে। শেষের সব জটিলতার অবসান ঘটে অর্থাৎ যা কিছু গলদ তার সমাপ্তি ঘটান। তাঁর হাস্যরসের কৌশল নিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন-

> "গোড়ায় গলদে রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস উৎপাদনের কৌশল হিসেবে প্রধানত ব্যবহার করেছেন সিচুয়েশন বা ঘটনা সংস্থান এবং সংলাপ।"[৪]

শুধু কৌতুক-প্রধান রচনা বলেই নয়, মঞ্চের ক্ষেত্রেও এ অভিনব প্রয়াস। অভিনয়ের জন্য তাঁর দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম। সংগীত সমাজে অভিনীত হয় প্রহসনটি। পরিচালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয়ও পাওয়া যায় এখানে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যতটা কৌতুক বা হাস্যরসের আশ্রয় প্রয়োজন হয়েছে ততটাই তিনি গ্রহণ করেছেন। অজিত ঘোষ প্রহসনগুলির রচনা নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন।

"গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, ও চিরকুমার সভার মধ্যে একান্নবর্তী বাঙালি পারিবারিক জীবনের রস ও মাধুর্য স্নিগ্ধ পুষ্প সৌরভের ন্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। রোমান্সের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটারঞ্জিত জগতে স্নিগ্ধ রসিকতা যেন বৃষ্টিধৌত রোদ্রের মতো প্রহসনগুলির মধ্যে শোভা পাইয়াছে।"[৫]

তাঁর কৌতুকহাস্য-প্রধান প্রহসনের আরেকটি হল 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এই প্রহসনটি প্রকাশ পেয়েছে ১৩০৬ সালে। এই প্রহসনটি একেবারে জন্যও তিনি সংশোধন করেননি অর্থাৎ বলা যায় তার এই রচনাটিকে তিনি পরিবর্তন করতে চাননি। তিনি সেই সময়ের পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক সমাজকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য রচনা করেছেন তাই শুধুমাত্র বিশেষ একটি রস বা রীতিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র করেননি। বরং তিনি প্রয়োজন মত রীতি বা রসের ছাঁচে লেখাকে সুনিপুণভাবে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনে বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। এই দুই ভাই দু-ধরনের। বৈকুণ্ঠ চরিত্রটিকে দেখা যায় বাস্তব প্রেক্ষিতে যাকে দেখে করুণা ও সহানুভূতি

সৃষ্টি হয়, একদিকে অবিনাশের বিয়ে করার ফলেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবাহ জিনিসটা গোড়ায় গলদের মতো এখানেও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও কেদার, তিনকড়ি, ঈশান চরিত্র বাস্তবিক চরিত্র রূপে দেখা যায়। স্ত্রী চরিত্রের গুরুত্ব নেই।

প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথ প্রবাহ গ্রন্থে বলেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথের সবগুলি প্রহসনের মধ্যে এই স্বল্পায়ত, স্ত্রী চরিত্রবর্জিত শ্লেষমন্ডিত প্রহসনখানি শিল্প সৃষ্টি হিসেবে সার্থকতম।"[৬]

অবিনাশ চরিত্রটি বাস্তব বাঙালি বাড়ির ছেলে। বই লেখার নেশা এবং আবেগময়তা বৈকুন্ঠের পরিচয়। কিন্তু সে বোকা নয়। সে জানে তার বই নিয়ে কতটা ঠাট্টা হয়। রামের মতো স্নেহ দেখা যায় তার মধ্যে। বৈকুন্ঠের ভাই অবিনাশের বিয়ে দিতে রাজি করায় কেদার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। বিয়ের পর অবিনাশের বাগানের সখ আর থাকে না। কেদার কুচক্রী, স্বার্থপর চরিত্র। তাই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রহসনগুলিতে বাস্তবের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এই প্রহসনের চোখের জল মিশে আছে। ট্রাজেডি ও কমেডি দুই দেখা যায়। প্রমথনাথ বিশী এই কথা স্বীকার করেছেন।-

> "এই প্রহসনখানি ট্রাজেডি কমেডির সংকীর্ণ যোজকের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, এক দিক হইতে আসিয়াছে হাসির শুষ্ক হাওয়া আর এক দিক হইতে আসিয়াছে লবণাম্বুশীকর।"[৭]

বৈকুণ্ঠ চরিত্রটি নিয়ে মানুষ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে। বৈকুন্ঠ চরিত্রটি বাতিকগ্রস্ত, সেই নিয়ে হাসির উদ্রেক হয়। ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বান বৈকন্ঠ চরিত্রের দিকে বর্ষিত হলেও এই চরিত্রটির প্রতি পাঠকের মনে বিদ্রুপের কোন স্থান নেই বরং রয়েছে সহানুভূতি। তবে অবিনাশ চরিত্রটির মধ্যে বাস্তবতা রয়েছে। দেরি করে বিয়ে হবার ফলে তার গাছপালার বাতিক পরিবর্তিত হওয়াতে হাস্যরস উৎপন্ন হয়। বৈকুন্ঠের খাতায় কুচক্রী কেদারের ষড়যন্ত্র করে প্রবেশ এবং বৈকুন্ঠের ভাইয়ের সঙ্গে তার শালিকার বিবাহ দেওয়া এবং বৈকুন্ঠকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করা - এসব আমরা দেখতে পাই ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে। এই বাস্তব চিত্র সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন -

> "ইচ্ছা করিলে বাস্তবের নিখুঁত ছবি যে তিনি আঁকিতে পারেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বৈকুন্ঠের খাতা প্রহসন।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ যখন কৌতুক বা ফান লেখালেখি শুরু করেন তখন বাংলা সাহিত্যে কৌতুক বা ফান নেই বললেই চলে। কারণ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ প্রচলন থাকলেও ফান প্রবণতা দেখা যায়নি। এই বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন অজয় দত্ত। তিনি বলেছেন -

> "বঙ্কিমের যুগ ছিল ব্যঙ্গ বিদ্রুপের যুগ, সমাজ সংস্কারের ও নীতি প্রতিষ্ঠার যুগ। রবীন্দ্রনাথ যাকে কৌতুকহাস্য বলেছেন, সেই নিছক হিউমার তখনো বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।"[৯]

তবে নিছক কৌতুক হাস্য পরিবেশনের জন্য এই প্রহসন তিনি রচনা করেননি। চিরকুমার সভা প্রহসন তার প্রমাণ। এই প্রহসনে রয়েছে তত্ত্ব। এখানে ট্রাজেডি ও কমেডির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তার ফলে করুন হাস্যরস বা হিউমারের প্রবর্তন হয়েছে।

'চিরকুমার সভা' প্রহসন তিনি ১৩০৭ সালে সরলা দেবীর অনুরোধে রচনা করেন। প্রহসনটি প্রজাপতির নিরবন্ধ'- এর নাট্যরূপ আবার 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের তত্ত্ব নিহিত রয়েছে । সেই তত্ত্বকে তিনি অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের সন্ন্যাস ব্রত যেন এখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'চিরকুমার সভা' প্রহসনে এক দল যুবকের সন্ন্যাস ব্রত পালনের ইচ্ছে এবং সেই ব্রত ভাঙ্গার প্রবণতা দুইই রয়েছে। যুব সম্প্রদায়ের হুজুগ রয়েছে এই প্রহসনে। পূর্ণ, বিপিন, শ্রীশ প্রমুখ চরিত্ররা সবাই সন্ন্যাস ব্রতকে পিছনে ফেলে কুমারত্ব হারায়। অক্ষয় চরিত্রটিকে রসিক এবং বুদ্ধিমান বলে চিহ্নিত করা যায়। অক্ষয় চরিত্রটি সম্পর্কে সরোজকুমার বসু লিখেছেন-

> "কিন্তু অক্ষয়ের উস্কানিতে এই দুটি বিবাহ উৎসুক প্রাণীর হাস্যকর উন্মত্ততার যে পরিচয় আমরা পাই এবং বিশেষ করে অক্ষয়ের হাতে খেলার পুতুলের মত এদের যে মর্মান্তিক নাকানি চোবানি, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যেই প্রকৃষ্ট হাস্যরসের উপাদান নিহিত রয়েছে।"[১০]

আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন ভিন্ন মতধারায়। তিনি বিশ্বাস করতেন সেই মত এর আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছেন। -

> "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"[১১]

হেঁয়ালি নাট্য বা শ্যারাড (charade) বলতে আমরা বুঝি যেই নাটকগুলি ছোট ছোট দৃশ্যে অভিনীত হয়ে থাকে এবং সহজ করে না বলে, যা ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে বলা হয়ে থাকে। হেঁয়ালি শব্দের অর্থই হল প্রহেলিকা বা ধাঁধা। শ্যারাড শব্দের বাংলা তর্জমা হল হেঁয়ালি নাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ধরনের রচনা রয়েছে 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থে।

আবার এই রচনাগুলিকে নাটিকাও বলা যেতে পারে। নাটিকা শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রকার নাটক বা ছোট নাটক। নাটকের একটি বিশেষ রূপ হল নাটিকা। নাটকে অনেক চরিত্রের সমাবেশ থাকে এবং তা দীর্ঘ সময়ের হয়। নাটিকায় চরিত্রের সংখ্যাও স্বাভাবিক ভাবেই কম। স্বল্প দৈর্ঘ্যের, স্বল্প চরিত্রের ব্যবহারে যে কাহিনি রচিত হয় সেটাই নাটিকা। নাটিকায় সম্পূর্ণ পরিবেশনা জুড়েই থাকে climax।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটিকাগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত এই ধরনের রচনাগুলি হল – 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক'। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাসির মধ্য দিয়ে পরিবেশনা করে নাটিকাগুলি শিশু ও কিশোরদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

'হাস্যকৌতুক' সংকলনে মোট পনেরোটি নাটিকা রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৪ সালে। এই গ্রন্থটির অধিকাংশ রচনা শিশু ও কিশোরের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পূর্ণাঙ্গ নাটিকা হিসেবে সফলতা না পেলেও হাস্যরসাত্মক রচনা হিসেবে এর মূল্য রয়েছে। এখানে যে পনেরোটি নাটিকা রয়েছে তার মধ্যে নিছক হাসি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। কিছু নাটিকা যেমন কিশোরদের জন্য উপভোগ্য তেমনি তা নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করে। তাঁর হাস্যকৌতুক গ্রন্থটি নিয়ে সমালোচক লিখেছেন।-

> "হাস্যকৌতুকের রচনাগুলিতে আঘাত অপেক্ষা আমোদই বেশি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তীব্র হাস্যরসবোধ এবং উইটের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সংলাপজাত হাসি উৎপাদনে যেন রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে আনন্দ পেতেন। উক্তি এবং প্রত্যক্তির মধ্য দিয়ে যে উইট মিশ্রিত হাস্যরস তিনি হাস্যকৌতুক এ পরিবেশন করেছেন।"[১২]

তিনি সংলাপের ক্ষেত্রে উইটের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন যা রচনাগুলিকে শিশু, কিশোরদের কাছে করে তুলেছে সুখপাঠ্য।

'ছাত্রের পরীক্ষা' নামক ক্ষুদ্র নাটিকাতে দেখা যায় কৌতুক হাস্যরসের প্রয়োগ। কিশোরের জন্য রচিত বলা যেতে পারে। পড়াশুনা নিয়ে শিশু কিশোরের যে অনীহা এবং মারের ভয়ে মাস্টারের থেকে বাঁচতে কিশোরের বুদ্ধির প্রয়োগ দেখা যায়। সংলাপে উইট প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন এখানে মাস্টার মশাই একটি উদ্ভিদের নাম বলতে বলল যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে তখন ছাত্রের জবাবে উইট সৃষ্টি হয়েছে। সংলাপে হাস্যরস ফুটে উঠেছে -

> "অভিভাবক। আচ্ছা সিরাজউদ্দৌলা কে কেটেছে?
> মধুসূদন। পোকায়।"[১৩]

ছাত্রের উত্তরের মধ্য দিয়ে বোকামি বা অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় না। প্রখর বুদ্ধির যে প্রয়োগ দেখা যায় তাতে হাসির সঞ্চার ঘটে। সব সঠিক উত্তর জানা সত্ত্বেও ভুল উত্তর দেওয়ায় হাসির সৃষ্টি হয়। মধুসূদন সেই শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্র যেখানে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাস্টারের শেখানোর কৌশল ছিল বেত। এই মাস্টার অর্থাৎ বেতের হাত থেকে বাঁচতে পিতার সাথে বুদ্ধির প্রয়োগে সে মুক্তি পায়। এখানে একদিকে তার বুদ্ধি এবং অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং হাস্যরসে এখানে প্রধান। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কৌতুক বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা আদর্শ ছিল ভিন্ন পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনে তা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনে বেতের প্রহার ছিল। পরবর্তীতে তিনি উল্লেখ করেছেন জীবনস্মৃতি গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন-

"শিশুদের প্রতি সে কালে মাতা সরস্বতীর মাতৃ ভাবের কোন লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মত ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না।"[১৪]

'পেটে পিঠে' নাটিকাটি নিছক কৌতুক। কিন্তু এখানে রয়েছে নৈতিকতার পাঠ। শিশু-কিশোর বয়সে এইসব নাটিকা পড়লে তাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হবে। সাত বছরের শিশু বনমালী তিনকড়ির সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগ এবং শেষে চালাকির ফল সে পায়। পেটে খেলে পিঠে সয় বাগধারার ব্যবহার আমরা এখানে পাই।

'অভ্যর্থনা' নাটিকাতে শুরু থেকেই দেখা যায় নায়কের প্রতি অবহেলা। বরং বিড়ালটি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্ভুজের থেকে বিড়ালের অভ্যর্থনা বেশি হয় কিন্তু সে আশা করে বসেছিল যে তাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে কিন্তু তার উল্টোটি ঘটে। চতুর্ভুজ ভেবেছিল MA দিয়ে আসা নিয়ে প্রচার হবে। কিন্তু তা নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি হয়। নিজে MA পাস করার সুনাম শুনবে আশা করেছিল। কিন্তু তার ঠিক বিপরীত দিকেই ঘটনা মোড় গ্রহণ করল। আশাহত হওয়ার দৃশ্যই এখানে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। বিড়াল নিয়ে এসেছিল কিন্তু শেষে দেখা যায় সে বিড়াল রেখেই চলে যায়। এখানে উইটের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। -

"কী বললে? মেয়ে দিয়ে এসেছ ? কাকে দিয়ে এসেছো?"[১৫]

MA কে মেয়ে বলায় হাসি থামানো যায় না। এখানে হাস্যরসের যে ব্যবহার চোখে পড়ে তার নাম pun। বুদ্ধির ব্যবহারে নানা ভাবে শব্দকে জব্দ করে প্রকাশ করা pun এর কাজ।

'রোগের চিকিৎসা' নাটিকাতেও ব্যঙ্গ নেই, রয়েছে নিছক হাসি।-

"চৈতন্য কাকে বলে দেখবি? (পিঠে কিল মারিয়া) চৈতন্য একে বলে।"[১৬]

মায়ের সংলাপে ও হাসি থামানো যায় না।-

"বাবা হারু, তোকে আর হাঁসের ডিম খেতে দেব না-তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাকছে কী হবে।"[১৭]

চুরি বিদ্যা করলে যে ধরা পড়তেই হয় এবং তার ফলে কেমন পরিণতি হয় তা নিয়েই রোগের চিকিৎসা নাটিকা রচিত হয়েছে। এখানে কোন গভীর কথা না থাকলেও নৈতিকতা শিখিয়েছেন ছোটদের।

'রোগীর বন্ধু' নাটিকায় রোগীর বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মরবার জো হয়। কিশোরদের আনন্দ দেওয়াই এই নাটিকা রচনার উদ্দেশ্য।

'ভাব ও অভাব' নাটকটি শিক্ষনীয়। হাস্যরসের মাত্রা কম হলেও পেটে খিদে, গায়ে জামা না থাকলে যা অবস্থা হয় তা নিয়ে রসভোগ চলে না। নামকরণের ক্ষেত্রে উইটের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

'সূক্ষ্ম বিচার' নাটিকাতে চণ্ডীচরণের বিচারে সূক্ষ্মতা এত সূক্ষ্ম যে হাস্যরস সঞ্চারিত হয়। এছাড়া 'আশ্রমপীড়া', 'রসিক', 'গুরুবাক্য'তে রয়েছে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রঙ্গ- নাট্যের পূর্বে যে ব্যঙ্গাত্মক রচনা রয়েছে তার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে বিদ্রুপ। রবীন্দ্রনাথ সামান্য বিষয় নিয়েই সৃষ্টি করলেন হাস্যরস -

"সমাজে বৃহত্তর কোন সমস্যা লইয়া তিনি কোন ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার এই বিষয় নাটক - ক্ষুদ্র কিংবা উন্নয়ন যেমনই হউক না কেন বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সর্বত্রই নিতান্ত সাধারণ।"[১৮]

কিন্তু নাট্যজাতীয় রচনায় দেখা মেলে বিদ্রুপের। 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থে ছয়টি নাট্য জাতীয় রচনা রয়েছে। ব্যঙ্গকৌতুকের এই ছয়টি নাট্য জাতীয় রচনা এই মূলত ব্যঙ্গাত্মক। প্রমথনাথ বিশী এই সংকলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

"হাস্যকৌতুকের তুলনায় ব্যঙ্গ কৌতুক অনেক পরিমাণে পরিণত শক্তির রচনা।"[১৯]

'বশীকরণ' নাটকটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ দেখা গেছে এখানে। ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রহসনগুলিতে নেই কিন্তু এই সংকলনে ব্যঙ্গ এর দেখা মেলে। 'নতুন অবতার' নাটিকায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতিভেদ সম্পর্কিত ভাবনার দিকটি। 'বিনি পয়সার ভোজ' একক সংলাপ নাটিকা। এখানে বিনা অর্থের ভোজে অক্ষয়বাবুর দুর্দশা দেখে আমরা হেসে উঠি। অন্ধভক্তি দেখানোর মধ্যে এখানে বিদ্রুপ রয়েছে।

যেমন হাস্যকৌতুক আমরা কৌতুকের প্রাধান্যই বেশি দেখতে পাই তেমনি ব্যঙ্গকৌতুকে ব্যঙ্গ বা খোঁচার অধিক গুরুত্ব দেখতে পাই। হাস্যকৌতুকের কিছু রচনায় ব্যঙ্গ থাকলেও তাতে কৌতুকই প্রধান।

"বিচার করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির ন্যায় তাঁর হাস্য রচনাগুলিতেও বুদ্ধির ঝিকিমিকি ও সহৃদয়তার স্পর্শে ভাবে ও অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।"[২০]

এই কথা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি তাসের দেশের মতো রূপক নাটকেও তিনি কৌতুক জাগ্রত করেছেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যদিও তার মূলে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নাটক ও প্রহসনে হাস্যরসের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হিউমার, উইট, তবে নানা ক্ষেত্রে স্যাটায়ারের দেখাও পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১) দত্ত অজিত, প্রকাশ ২০১৫ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ২৪০

২) ঘোষ ড. অজিত কুমার, প্রকাশ ২০১৬ আগস্ট, রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ২১৩

৩) চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, প্রকাশ ১৯৯৫, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ৭৫

৪) পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা ২৫১

৫) ঘোষ অজিত কুমার, প্রকাশ ২০১৫, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ২৭৬

৬) বিশী প্রমথনাথ, প্রকাশ ২০১৪ রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ৭৩, পৃষ্ঠা ২৯৭

৭) তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৯

৮) তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৯

৯) পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা ২৪০

১০) বসু সরোজ কুমার, প্রকাশ ১৩৫৭, রবীন্দ্র- সাহিত্যে হাস্যরস, হিন্দুস্থান বুক ডিপো লিঃ, কলকাতা ১২, পৃষ্ঠা ৪৬

১১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ১৪২১, জীবনস্মৃতি, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ১৩৯

১২) পূর্বোক্ত ১ নং, পৃষ্ঠা ২৪৬

১৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ১৪০৬, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৫৭

১৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশ ১৪২১, সংস্করণ পঞ্চম, জীবনস্মৃতি, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা ২৮

১৫) পূর্বোক্ত ১৩ নং, পৃষ্ঠা ৫৬৩

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৬৫

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৬৬

১৮) ভট্টাচার্য আশুতোষ, প্রকাশ ১৩৭৩, রবীন্দ্র-নাট্য ধারা, সংস্কৃতি প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২২৪

১৯) পূর্বোক্ত ৬ নং, পৃষ্ঠা ৩০০

২০) পূর্বোক্ত ১০ নং, পৃষ্ঠা ৯৬।

ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় ধর্মের ধারণা : একটি আলোচনা

নবনীতা রায়
গবেষক, দর্শন বিভাগ
ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, বারাসাত

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় **ধর্ম**কে সকল নৈতিক ধারনার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। **ধর্ম** শব্দটি যদিও বহুঅর্থবোধক তবুও এর একটি মুখ্য অর্থ আছে, ধর্ম শব্দের একটি প্রাচীন অর্থ অনুযায়ী ধর্ম হল তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ করে, ধর্ম জগতের সকল কিছুকেই ধারণ করে, 'সর্বস্য ধারকম'। ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায়, বেদে, উপনিষদে, বিভিন্ন মহাকাব্যে এবং বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় যেমন ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তেমনই আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের নৈতিক ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাখ্যাও প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্ম শব্দটি বহুঅর্থবোধক, ধর্ম শব্দ দ্বারা যেমন কিছু সৎ গুণাবলীকে(virtues) নির্দেশ করা হয় আবার ধর্ম শব্দ দ্বারা কর্তব্যকেও (duties) বোঝানো হয়। আবার ধর্ম শব্দটি একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ দেখা যায়। আবার একটি প্রয়োগ অনুযায়ী ধর্মের অর্থ ব্যবহার, যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের কর্তব্যকে বোঝায় আবার ধর্মকে সমাজের নৈতিক বিধি বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার পরাতাত্ত্বিক অর্থে ধর্মকে একটি বিশ্বনীতি বলা হয়েছে, যার দ্বারা বিশ্বজগত পরিচালিত হয় এবং বিশ্বের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারা অনুসরণে ধর্মের স্বরূপ, ভূমিকা ও সমাজে তার প্রয়োগের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ধর্ম শব্দটি ভারতীয় নৈতিক চিন্তা ধারায় গুরুত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণ করাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।
সূচক শব্দ (Keywords): ধর্ম, বেদ, উপনিষদ, কর্তব্য, গুণাবলী।

ভূমিকা: ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় **ধর্ম** (Dharma) হল এক কেন্দ্রীয় নৈতিক ধারণা। এটি একটি বিস্তৃত নৈতিক ধারণা যার আলোকে বাকি নৈতিক আদর্শ বা ধারণাগুলিকে বোঝা যায়। ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায়, ধর্ম শব্দটির অর্থ নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভ্রান্তির শেষ নেই। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম শব্দটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত ও ব্যাখাত হয়েছে। এটি এমন এক ধারনা যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাৎপর্যে উল্লেখিত হয়েছে। তাই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের অনুধাবনের সময় ধর্ম শব্দটি কোন প্রসঙ্গে, কোন তাৎপর্যে

উল্লেখিত হয়েছে, সেইদিকে সতর্ক থাকতে হয়। ধর্ম শব্দটি বেদে, উপনিষদে, বিভিন্ন মহাকাব্যে, নীতিশাস্ত্রে, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদে নানান ভাবে প্রয়োগ হয়েছে। আবার এর একটি সাধারন অর্থও আছে। এই প্রসঙ্গে Cromwell Crawford এর উক্তিটি উপস্থাপন করা যায়,

.... to know India, try grasping the myriad forms of *dharma*, for in the depths of this single word lies an entire civilization.[1]

মূল আলোচনা:

ধর্ম শব্দটি জনপ্রিয় বা বহুল প্রচলিত অর্থে সৎ গুনাবলি (virtues) ও কর্তব্যকে (duties) বোঝায়। এছাড়াও শব্দটি কোন নির্দিষ্ট আইন বোঝাতে, নৈতিক আদেশ বোঝাতে, শাস্ত্রীয় কর্তব্য বোঝাতে, মানুষের সাধনার উদ্দেশ্য বোঝাতে, ধর্মীয় অনুষঙ্গে, ন্যায়পরায়ণতা রূপে ব্যাবহৃত হয়েছে। যদিও ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় সৎ গুণাবলী ও কর্তব্য অর্থেই ধর্ম শব্দটির অধিক প্রয়োগ হয়েছে। এই দুই শব্দ যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঅর্থেই প্রয়োগ হয়েছে। সহজ কথায় বলা যায় ধর্ম শব্দটির প্রয়োগ কোন ক্ষেত্রে কীভাবে আলোচিত হয়েছে তার সম্বন্ধে জানা আবশ্যক, কেননা তা ছাড়া ধর্মের স্বরূপ ব্যাখা করা অসুবিধাজনক। এই প্রবন্ধটিতে ধর্ম শব্দটির বহুল প্রচলিত অর্থ সৎ গুনাবলি ও কর্তব্য এই দুটি অর্থেই বেশি আলোকপাত করা হয়েছে।

গুণাবলী ও কর্তব্য (virtues and duty): গুণ ও কর্তব্য হল যৌক্তিক ভাবে পৃথক দুটি ধারণা। যদিও সৎ গুণ(virtues) কিছু ভালো স্বভাব, চরিত্রের কিছু গুণাবলী, আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে কর্তব্য হল প্রকাশ্য কিছু কর্ম, যা কিছু আইন দ্বারা নির্ধারিত, কিছু লক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত ইত্যাদি। দান করা, সৎ কাজ করা, দুঃস্থদের সেবা করা, এইগুলি হল কর্তব্য আবার প্রেমবিনয়, পরোপকারিতা, ক্ষমা ইত্যাদি হল গুণাবলী। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সবসময় সম্ভব না হতেও পারে। বলা যায় যে, নৈতিকতা আমাদের চরিত্রের কিছু আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে Leslie Stephen এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে,

morality is internal. the moral law has to be expressed in the form ‘be this’, not in the form ‘do this’.[2]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, এই মন্তব্যটি যথাযথ নয়, কারণ বাস্তবে সৎকর্ম না করলে তা নৈতিকভাবে অকার্যকর। অতএব গুণাবলী ও কর্তব্য এমনভাবে জড়িত যে, এদের পার্থক্য করা খুবই জটিল। তাই ভারতীয় নৈতিক চিন্তাবিদেরা গুণাবলী ও কর্তব্য, উভয়কেই বোঝাতে **ধর্ম** শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। এখন বেদ, উপনিষদ ও

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে উল্লেখিত বিভিন্ন গুণাবলী ও কর্তব্যের যথা ধর্মের ধারণা উপস্থাপনা করা হচ্ছে।

বেদ ও উপনিষদ: প্রাচীন বেদের সময়কাল থেকেই ভারতীয় চিন্তাধারায় নৈতিকতার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বেদ ও উপনিষদে গুণাবলী ও কর্তব্যের মধ্যে সেভাবে পার্থক্য করা হয়নি। বেদ ও উপনিষদে উল্লেখিত সর্ব উৎকৃষ্ট গুণাবলী গুলি হল, অহিংসা, সত্য, তপ, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা, দান ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও, বন্ধুত্ব, সমবেদনা, করুনা ইত্যাদি উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বা কর্তব্য। এই গুণাবলী গুলি পালন করলেই মানুষ তাঁর চরম লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। এগুলি ছাড়াও উপনিষদে মানুষের চারিত্রিক উন্নতি সাধনে বেদ অধ্যায়ন, আত্মনির্ভরতা, আত্ম প্রতিরক্ষা গুণাবলীর নির্দেশ আছে। যা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়ক।

ধর্মসুত্র ও ধর্মশাস্ত্র: এই গ্রন্থগুলিতে মানুষের দুই ধরনের ধর্মের কথা বলা হয়েছে যথা, সাধারন ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম। সাধারন ধর্ম বলতে বোঝায় প্রত্যেক মানুষের পালনীয় ধর্ম। অপরদিকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু ধর্ম। ধর্মসুত্র ও ধর্মশাস্ত্রেও বেদ ও উপনিষদে বর্ণিত গুণাবলী ও কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। সারকথা হল, এই গুণাবলী ও কর্তব্যগুলি পালনের কথা বলা হয়েছে, মানুষের চিত্ত শুদ্ধির জন্যে।

এখন ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় উল্লেখিত বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে:

বর্ণাশ্রম ধর্ম: সাধারণভাবে মানুষকে যে বিভিন্ন গুণ ও কর্তব্য পালন করার পরামর্শ দেওয়া হয় সেগুলো সামান্য বা সাধারণ ধর্মের অধীনে আসে। তারা সাধারণ এই অর্থে যে, সেগুলি প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সে যে শ্রেণীরই অন্তর্গত হোক না কেন। সাধারণত হিন্দু ধর্ম সমাজকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকালকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে ফলস্বরূপ এটি জীবনের প্রতিটি শ্রেণী এবং স্তরের সাথে সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ করে। ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং ভগবত গীতা ছাড়াও প্রশস্তপাদ প্রতিটি বর্ণ ও আশ্রমের সাথে সম্পর্কিত গুণাবলী এবং কর্তব্য গুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি বর্ণ ও আশ্রমের সাপেক্ষে নিম্নলিখিত গুণাবলী বা কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে।

বর্ণধর্ম: প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ত্রিগুন (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) বর্তমান। তবে সকলের মধ্যেই এই ত্রিগুন সমান মাত্রায় থাকে না। কোন মানুষ সত্ত্ব প্রধান হয়, আবার কোন মানুষ রজঃ প্রধান হয় আবার কোন মানুষ তমঃ প্রধান হয়। ভারতীয় শাস্ত্রে গুনের এই তারতম্য অনুযায়ী বর্ণভেদ করা হয়েছে। চারটি বর্ণ হল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী ও কর্তব্যের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণের অনুসরণীয় গুণাবলী এবং কর্তব্য:

(ক) গুণাবলী: শম (নির্মলতা), দম(আত্মনিয়ন্ত্রন), তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, ন্যায়পরায়নতা, প্রজ্ঞা, ধর্মে বিশ্বাস

(খ) কর্তব্য: বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও দান গ্রহণ

ক্ষত্রিয়ের অনুসরণীয় গুণাবলী ও কর্তব্য:

(ক) গুণাবলী: সৌর্য (বীরত্ব), প্রাণশক্তি (তেজ), স্থিরতা, দক্ষ, যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা, উদারতা এবং নেতৃত্ব ভাব।

(খ) কর্তব্য: বাহ্যিক আগ্রাসন এবং আভ্যন্তরীণ ঝামেলা থেকে মানুষকে রক্ষা করা এবং সেই সাথে তাদেরকে শাসন করা, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দুষ্টদের শাস্তি প্রদান, দান করা।

বৈশ্যর অনুসরণীয় কর্তব্য: কৃষি, গবাদি পশুপালন এবং বানিজ্য করা।

শূদ্রের অনুসরণীয় কর্তব্য: অন্য তিনটি শ্রেণীর সেবা করা।

আশ্রম ধর্ম: ভারতীয় চিন্তাধারায় মানুষের সমস্ত জীবনকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে যথা, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচারীর গুণাবলী/ কর্তব্য: ব্রহ্মচর্যই মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে। এটি শিক্ষা লাভের অধ্যায়। জ্বালানি সংগ্রহ করা, হোম অগ্নির অর্চনা করা, ধর্মগ্রন্থ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভিক্ষা সংগ্রহ, মদ ও মাংস পরিহার করা অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় একজন ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হলো সহজ সরল জীবন যাপন করা।

গার্হস্থের গুণাবলী/ কর্তব্য: সকাল ও সন্ধ্যায় পাঁচটি মহাযজ্ঞ পালন। ভূতযজ্ঞ- যাবতীয় ভূত দ্রব্যের সেবা ও সংরক্ষণের জন্য বলিপ্রদান করা। মনুষ্য যজ্ঞ- জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবা করা। দেবযজ্ঞ- দেবতাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র হোম ধুপ নিবেদন করা। পিতৃযজ্ঞ- পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শ্রাদ্ধ আচার অনুষ্ঠান পালন করা এবং ব্রহ্মযজ্ঞ- পবিত্র গ্রন্থ পাঠ ও বেদপাঠ করা।

বানপ্রস্থের গুণাবলী/ কর্তব্য: অরন্যে বসবাস করা, গাছের চামড়া ও ছাল পরিধান করা, খাদ্যের জন্য শুধুমাত্র অরণ্যের ফলের ওপর এবং যজ্ঞের পরে যেগুলি অবশিষ্ট থাকে সেগুলির উপর জীবনযাপন করা।

সন্ন্যাসীর গুণাবলী/ কর্তব্য: সন্ন্যাসী একজন বিচরণকারী তপস্বী যা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ধরনের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে বর্জিত। তার জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারিত নেই। তিনি এক অর্থে অধিনৈতিক (supra-ethical) সত্তা কিন্তু তারপরও তিনি যম ও নিয়মের আকারে কল্পনা করা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর্তব্যকে অবহেলা করেন না বলে আশা করা হয়। এই ধরনের মানুষকে তার মনের নির্মলতা, তার ভদ্রতা, সমস্ত প্রাণীর প্রতি তার করুণা এবং আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা থেকেই জানা যায়। এবং ব্রহ্মের প্রতি তার ধ্যান ও একাগ্রতা দৃঢ় হয়।

এখন বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে উল্লেখিত ধর্মের ধারনার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে:

ন্যায়-বৈশেষিক: সামান্য বা সাধারন ধর্মের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রশস্তপাদ দ্বারা উপস্থাপিত বৈশেষিক চিন্তাধারায় আর একটি বাৎসায়ন দ্বারা উপস্থাপিত ন্যায় চিন্তাধারায়। প্রশস্তপাদ দ্বারা উল্লেখিত সাধারন ধর্ম গুলি হল- ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অহিংসা, প্রত্যেক জীবের মঙ্গল কামনা করা, সত্যবাদিতা, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য, বিশুদ্ধতা, ক্রোধ সংযম, পরিস্কার-পরিছন্নতা, বিশুদ্ধ খাবার ভোজন, স্বীকৃত দেবতার প্রতি ভক্তি, উপবাস এবং নৈতিক সতর্কতা। উপরিউক্ত তালিকায় দেখা যায় কিছু গুণাবলী বা কর্তব্য, ধর্মীয় প্রকৃতি, কিছু স্বাস্থ্যকর উপদেশ। তবে বেশিরভাগ গুণাবলী স্পষ্টতই নৈতিক। আবার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা এবং নৈতিক সর্তকতার মতে গুণাবলী গুলি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

অপরদিকে বাৎসায়ন ধর্মকে শ্রেণীবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট গুন বা কর্তব্য অনুশীলনের সাথে জড়িত করে। তার মতে, ধর্ম দেহের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, মনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে আবার বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একইভাবে তিনটির সাথেই সংশ্লিষ্ট দুষ্কর্ম থাকতে পারে। বাৎসায়ন তিনটির সাথেই সম্পর্কিত উভয় সৎ গুণ এবং অসৎ কাজ বা খারাপের একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন। দেহ সম্পর্কিত সৎ গুণাবলী হল, তার মতে, পরিত্রান (দুখিদের সেবা করা বা রক্ষা করা) দান এবং পরিচরণ। বাক্যের সাথে সম্পর্কিত গুণগুলি হল, সত্য (সত্যবাদিতা), প্রিয় বচন (সম্মত বাক্য), হিতবচন (উপকারী বাক্য) এবং স্বাধ্যায় (শাস্ত্র পাঠ)। মনের সাথে সম্পর্কিত গুণগুলি হল দয়া (দয়া করা), অস্পৃহা (নিরাসক্তি) এবং শ্রদ্ধা। অপরদিকে শরীরের সাথে সম্পর্কিত অসৎ গুণ গুলি হল, হিংসা, স্তেয় (চৌর্য বৃত্তি), নিষিদ্ধ যৌন মিলন। বাক্যের সাথে সম্পর্কিত অসৎ গুণ হল, মিথ্যা বচন, কঠোর বচন, পরোক্ষ ভাবে উক্ত বচন, রটনা। মনের সাথে সম্পর্কিত অসৎ গুণগুলি হল, পরদ্রোহ (প্রতিকূল আচরণ), অনের জিনিসের প্রতি লোভ এবং শাস্ত্রে অবিশ্বাসের ইচ্ছা।

বাৎসায়নের উল্লেখিত তালিকায় সৎ গুণ এবং কর্তব্যের এবং খারাপ কাজ বা গুণ ও ভুল কাজের মধ্যে মিশ্রণটি তালিকায় স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক সমাজ সম্পর্কিত ধর্মের উপর এখানে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। পরিত্রান, দান এবং পরিচরণ, সত্য (সত্যবাদিতা), প্রিয় বচন (সম্মত বাক্য), হিতবচন (উপকারী বাক্য), দয়া (দয়া করা), অস্পৃহা (নিরাসক্তি) ইত্যাদি হল সামাজিক ধর্ম।[3]

যোগ: পতঞ্জলি আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে (মোক্ষ) পৌঁছানোর জন্য কতগুলি সাধারণ গুণাবলী ও কর্তব্যের কথা বলেছেন যেগুলি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করাই কর্তব্য। সেই কর্তব্য বা গুণাবলী গুলি হল পঞ্চযম এবং পঞ্চ নিয়ম।

পঞ্চযম- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটি ধারনাকে একত্রে পঞ্চযম বলা হয়। অহিংসা বলতে শুধু হিংসা থেকে বিরত থাকাকে বোঝায় না। কায়-মন-বাক্যে সম্পূর্ণ অহিংস থাকার কথা বলা হয়েছে। আবার সত্য বলতেও শুধু মিথ্যা বচন বলা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয় না বরং কোন প্রকার খারাপ কথা বলা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়। অস্তেয় বলতে শুধুমাত্র চুরি না করাকে বোঝায় না, বরং অপরের অনুমতি ছাড়া কোন জিনিস গ্রহণ না করাকেই বোঝায়। ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয় সংযম এবং অপরিগ্রহ বলতে পার্থিব সকল জিনিসের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্তিকে বোঝায়। পতঞ্জলি যেভাবে যমদের ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাদের অনেক ইতিবাচক বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ **অহিংসা**, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম ইত্যাদির দিকে পরিচালিত করে যা সমস্ত ইতিবাচক গুন। একইভাবে সত্যবাদিতা কেবল মিথ্যা পরিহার নয় বরং এটি ইতিবাচক সত্য বলার মধ্যে রয়েছে। ব্রহ্মচর্য শুধুমাত্র সাধারণ ইন্দ্রিয় অঙ্গের উপর সংযম নয় এটি ইন্দ্রিয় গুলিকে সঠিক দিকের দিকে নিয়ন্ত্রিত করার একটি ইতিবাচক পথ। অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ অবশ্যই প্রধানত সংযমের গুণাবলী কিন্তু তাও সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয় তারা বরং জাগতিক বস্তুর প্রতি অবক্ষয় এবং উদাসীনতার একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ দেয়, যাতে মন উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে নিযুক্ত হতে পারে।

পঞ্চনিয়ম- শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রনিধান এইগুলিকে একত্রে নিয়ম বলা হয়। পরিস্কার-পরিছন্ন থাকার নিয়ম হল শৌচ। অল্পে সন্তুষ্ট থাকাকে বলে সন্তোষ। শাস্ত্রে উল্লেখিত ব্রত পালন হল তপস্যা বা তপঃ। শাস্ত্রকে নিয়মত অধ্যায়ন করার নিয়ম হল স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরে প্রতিনিয়ত চিন্তা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকে বলা হয় ঈশ্বরপ্রনিধান। এই নিয়মগুলির প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রয়োগ হয়েছে। পতঞ্জলিকে অনুসরন করে বলা যায় যে, যম ও নিয়ম উভয়ের মধ্যেই একত্রে সৎগুণ (virtues) ও কর্তব্য(duty) রয়েছে। নিয়ম গুলির মধ্যে শুধুমাত্র সন্তোষ যথাযথ গুণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাকিগুলো হল কর্তব্য যার শেষটি (ঈশ্বরপ্রনিধান) একটি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে পতঞ্জলির চিন্তাধারায় একে স্বতন্ত্র নৈতিকতার একটি উপাদান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

রামানুজ: রামানুজ অন্যদের মতো নিজেও মানুষদের দ্বারা অনুসৃত এবং অনুসরণ করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় গুণাবলীর তালিকার কথা বলেছেন, তবে তার তালিকার নিজস্ব একটি বিশেষত্ব রয়েছে। ভারতীয় নৈতিক চিন্তা ধারায় এমন কিছু চিন্তাবিদ বা ব্যবস্থা রয়েছে যারা কিছু গুণাবলী প্রচার করে যা কঠোরভাবে ধর্মীয় বলা যেতে পারে। রামানুজ সাধারণভাবে ঈশ্বরকে সর্ব উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলীর দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে মানুষের কর্তব্য হল, ঈশ্বরের গুণগুলোকে পরম বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সাথে অনুকরণ করা। ভগবানের সর্ব উৎকৃষ্ট গুণাবলী হল জ্ঞান, ক্ষমা,

শক্তি, কৃপা, বাৎসল্য, কমলতা, শীল, সঠিকতা, সৌহার্দ, এবং ভদ্রতা। মানুষ এই গুণাবলী গুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আবার রামানুজের পরামর্শের বিশেষত্ব আছে। গুণাবলী গুলিকে বিশেষভাবে তাদের দিকে নির্দেশিত হতে হবে যাদের এই গুণাবলীর অভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাদের হৃদয় দুষ্ট তাদের প্রতি সহানুভূতি পরিচালিত হতে হবে কারণ তার মধ্যে এই গুণের অভাব রয়েছে। একইভাবে যারা দুর্বল তাদের প্রতি শক্তি পরিচালিত হতে হবে ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ও জৈন: ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় অন্তর্ভুক্ত জৈন এবং বৌদ্ধ চিন্তাধারা রয়েছে যা হিন্দু ধর্মের সাথে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের নিজস্বতা ও বিশেষত্ব রয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈনদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী(virtues) গুলির মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধদের **পঞ্চশীল** ও জৈনদের **পঞ্চ মহাব্রত** ও অনুব্রত, যদিও উভয়ই মূলত হিন্দু চিন্তা ধারায় উল্লেখিত **পঞ্চযমের** মতই। বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীল গুলি গৃহস্থদের জন্য অবশ্যই পালনীয়। সেগুলি হল-

১. প্রাণাতিপাত-বিরতি: এই শীল অহিংসাকে নির্দেশ করে, যার অর্থ হল কায়-মন-বাক্যে সকল প্রাণীর প্রতি অহিংস থাকা।

২. অদত্তাদান-বিরতি: এই শীল অস্তেয়কে নির্দেশ করে, যার অর্থ হল চুরি না করা, অপরের অনুমতি ছাড়া কোন জিনিস গ্রহণ না করা।

৩. ব্রহ্মচর্য: ব্রহ্মচর্য পালন করার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয় সংযম করা।

৪. মৃষাবাদ-বিরতি: মিথ্যাভাষণ থেকে বিরত থাকা, এমনকি কোন মানুষকে মিথ্যা ভাষণে প্রবৃত্ত করাও উচিৎ নয়।

৫. মদ্যমাদকার্থ-বিরতি: নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা।

বৌদ্ধদের পঞ্চশীল ইতিবাচক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে এই অধীনে থাকা গুনাবলী বা কর্তব্য গুলির প্রয়োগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়।

অপরদিকে জৈন মহাব্রতও এইরকমই গুণাবলীর নির্দেশ করে, জৈন পঞ্চ মহাব্রতগুলি হল, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই গুণাবলী গুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে, তাই এই পঞ্চ মহাব্রত সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। জৈনদের মতে এই পঞ্চ মহাব্রত গুলি কোঠর ভাবে সন্ন্যাসীদের জন্য পালনীয়। তিনি এই গুণাবলী গুলিকে গৃহস্থদের জন্য শিথিল করেছেন, যাদের পঞ্চ অনুব্রত বলা হয়। জৈনদের এই গুণাবলী গুলিকে পালন করলে সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও কতকগুলি গুণাবলী বা পালনীয় কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। যাকে ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করা হয় এবং যা সমস্ত মানুষের জন্য সাধারণ ধর্ম। এই দুই চিন্তাধারায় কোন বর্ণাশ্রম ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

উপসংহার: ভারতীয় চিন্তাবিদদের মানবিক গুণাবলী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রশংসিত হতে হয়। কারণ তারা সৎগুণ ও অসৎ গুণ উভয়কেই বিশদ বিবরণে গণনা করে, কখনো কখনো তাদের আলোচনা এতটাই বিস্তৃত হয় যে তারা কায়-মন-বাক্যের সাথে সম্পর্কিত গুণগুলির মধ্যে বিশদভাবে পার্থক্য করে।

ভারতীয় নৈতিক চিন্তাধারায় সাধারণ ও বর্ণাশ্রম ধর্মের বিশেষত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সাধারণ ধর্ম হল শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য পালনীয় কিছু ধর্ম। তাদের মধ্যে কিছু ধর্ম বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে। অপরদিকে বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী বলা যায়, প্রত্যেক মানুষ সকল সামাজিক কর্ম বা কর্তব্যের প্রতি সমানভাবে দক্ষ নয়। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করতে হয়। ভগবত গীতায় বিশেষ ভাবে স্বধর্ম পালনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নিজের বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে নিজের ধর্ম প্রতিপালন করার কথা বলা হয়েছে, সেই ধর্মই মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে (মোক্ষ) পৌঁছাবে।

মহাভারতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লড়াই করতে প্ররোচিত করেন এবং বলেন ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন করাই হল তাঁর প্রধান কর্তব্য। এখানে এক আপত্তির সৃষ্টি হয়, কেননা আমরা জানি অহিংসা হল এক পালনীয় সাধারণ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মের স্বার্থে হিংসা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। এইভাবে সাধারণ ধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্মের চেয়ে নিম্নস্তরে স্থাপন করা হয়। কিন্তু যদিও সাধারণ ধর্মগুলি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

সুতরাং ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মকে যেমন গুণাবলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনই কর্তব্য হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করাও যায়নি, অর্থাৎ সমান অর্থেও প্রযোজ্য হয়েছে। ধর্মকে পরিত্যাগ করে জীবনের কোন অভিষ্টই লাভ করা যায় না। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ ও বর্ণাশ্রম উভয় ধর্মের গুরুত্ব ও মূল্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

Note :

1. I. Ravi, *Foundations of Indian Ethics,* p. 55.
2. K. N. Tiwary, *Classical Indian Ethical Thought,* p. 132.
3. K.N.Tiwari, *Classical Indian Ethical Thought*, p. 141.

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Dasgupta, Surendranath. *A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY.* New Delhi: Rupa Publications India pvt. ltd.
২. Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami. *BHAGAVAD-GITA as it is.* Mumbai: The Bhaktivedanta Book Trust, 2018.

৩. Radhakrishnan, Sarvepalli. *INDIAN PHILOSOPHY.* New Delhi: Oxford University Press, 1923.
৪. Ravi, Illa. *Foundations of Indian Ethics.* New Delhi: Kaveri Books, 2012.
৫. Sharma, I.C. *Ethical Philosophies of India.* Londan: George Allen & Unwin LTD, 1965.
৬. Sinha, Jadunath. *Outlines of Indian Philosophy.* Varanasi: Pilgrims Publishing, 1963.
৮. Tiwari, Kedar Nath. *Classical Indian Ethical Thought.* Delhi: Motilal Banarasidass Publishers, 2013.
৯. Tripathi, A. N. *HUMAN VALUES.* New Delhi: New Age International (P) Limited, 2014.
১০. গুপ্ত, দীক্ষিত. *নীতিশাস্ত্র,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭.
১২. চক্রবর্তী, লোকনাথ. *চাওয়ার চতুর্মুখ,* কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৭।

মেরুদণ্ড ও জয় গোস্বামীর নির্বাচিত কবিতা

মহম্মদ ওমর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: গণতন্ত্র কী - তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর Gettysburg Address-এ বলেছিলেন- "...democracy is the government of the people, by the People, for the people." কবি জয় গোস্বামীর বিখ্যাত 'গরাদ, গরাদ' কবিতাগ্রন্থটি (প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৫) পড়তে গিয়ে মনে পড়ে গেল লিঙ্কনের সর্বজনমান্য এই উক্তিটি। কারণ, গণতন্ত্রের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমাদের দেশে জাঁকিয়ে বসেছে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র। যেখানে Common People-রাই হচ্ছে সবচেয়ে হতভাগা, সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। আমাদের গণতন্ত্রের এই ভয়ংকর দশার স্বরূপ উন্মোচনই বর্তমান আলোচনার অন্যতম অভিমুখ। আমরা সকলেই জানি, দেশে আইন যেমন আছে, তেমনি তার মধ্যে আছে বহুবিধ ফাঁক-ফোকর। সেই ফাঁক-ফোকরই হয়েছে আমাদের যারা মহান পরিত্রাতা, সেই দেশ-নেতাদের মূল অস্ত্র। ছোটো ছোটো সত্তরটি কবিতার সংকলন এই গ্রন্থ। কবিতগুলোতে কবির সময়, সমাজ, বাস্তব, প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মৃত্যুচেতনার বিবিধ দৃষ্টান্ত মুক্তারাশির মতো ছড়িয়ে আছে। তবে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিবেকবান কবির মূল্যবান 'মেসেজ' সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নেতিবাচক কবিতাগুলোর মধ্যে। বক্রোক্তির মতো এই কবিতাগুলোতে বর্ণিত নিষেধ (Negation) আমাদের মননে বিধিতে (Affirmation) পর্যবসিত হয়। এই ধরনের কবিতাগুলোকে আমরা বলবো মেরুদণ্ডহীনের কবিতা, ঘাড় কাত ও লেজ-নাড়াদের কবিতা। মেরুদন্ডহীনের কবিতা বলতে -লিঙ্কনের উক্তিটির অনুসরণে আমরা বলতে পারি- মেরুদণ্ডহীনের দ্বারা, মেরুদণ্ডহীনের জন্য, মেরুদণ্ডহীনতার কথা-কবিতা। জীবনানন্দ দাশের মত কবি জয়ও অনুভব করেছেন - 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। সভ্যতার সেই অন্তরঙ্গ অসুখই কবির লেখনীতে মূর্তরূপ ধারণ করেছে। একদা নিজের কবিতা-ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জয় গোস্বামী জানিয়েছিলেন - "কবিতার বিষয় বা কবিতাটি রচনার সময়ে আমার জীবন কবিতাটির বাক্‌ভঙ্গি নির্ণয় করে...।" আলোচ্য 'গরাদ গরাদ' গ্রন্থটি তাঁর এই মন্তব্যের যথার্থ পরিচয় বহন করছে।]

সূচক শব্দ : মেরুদণ্ডহীনতা, আপোস, অসহায়তা, হাহাকার, স্থবিরতা, ভান, ভর্ৎসনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, অন্যায়, অবিচার।

মূল প্রবন্ধ :

বর্তমান সময়-সমাজ-রাষ্ট্র কবির চোখে ধরা পড়েছে এক চোরাবালির রূপকে। আর সকল মানুষের পা দুটো গাঁথা আছে সেই চোরাবালির মধ্যে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে কিংবা বেশি ছটফট করলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা প্রবলতর হয়ে ওঠে। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর নিরুপদ্রব জীবনে অভ্যস্ত কবির মনে হয়েছে -

"বরং যেমন আছি, থাকি।
তাতে যদি আরো কিছুদিন
শ্বাসবায়ু পাই।" (চোরাবালি)

সমস্যা ও সঙ্কটের সঙ্গে এই নিরন্তর আপোসের ভাবনাই 'টিপিক্যাল' মধ্যবিত্ত মানসিকতার বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে।

ভয় মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তা মানুষকে কাপুরুষ বানায়, ক্ষেত্রবিশেষে, এমনকি নপুংসকও। আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধে বলেছেন -

"সাহিত্যিকের কাছে সত্যই বড়ো কথা। সত্যের সঙ্গে যদি জাতীয় আদর্শ, ধর্ম বা শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে, নিঃসন্দেহে বিনা দ্বিধায় সাহিত্যিক সত্যের পক্ষাবলম্বন করবে। সাহিত্যিকের যদি কোনো আল্লাহকে মানতে হয়, তাহলে সে আল্লাহ্ হচ্ছেন 'আল্ হক্কুন'। অর্থাৎ যিনি হক বা সত্য।"[১]

কিন্তু জয় গোস্বামী আক্ষেপ করেছেন - তাঁর লেখা আর সত্য নয় ব'লে, তাঁর লেখা আর মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারছে না ব'লে। নিজেকে তিনি বাংলাদেশের চির নিষ্পেষিত গৃহবধূদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দিনভোর খাটা-খাটনির পর শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন বউরা বিছানায় একটু নিরুপদ্রব বিশ্রাম লাভ করতে চায়। কিন্তু সেখানেও তার নিস্তার নেই। স্বামী দেবতার শরীরের খিদে না মেটানো পর্যন্ত সে নিদ্রার ছাড়পত্র পায় না। এটাই তার ভবিতব্য। আমাদের প্রিয় কবি জয় গোস্বামীকেও অনুরূপ বাধ্যবাধকতায় সহবাস করতে হয় নানাবিধ অনাচার-অবিচার-নৈরাজ্যের সঙ্গে। কিন্তু কেন এই মেরুদণ্ডহীনতা, কেন এই ভান, এই ছদ্মবেশ ধারণ। কবি দোহাই দিচ্ছেন কতকগুলো 'নীল আশঙ্কার' -

"আবার কি এ বয়সে আগের মতন
অসম যুদ্ধের মধ্যে জড়াব নিজেকে ?
আবারও কি চুপ করে না থেকে
অনিশ্চয়তার খাদে ঠেলে দেব সংসারজীবন ?" (লেখা)

বোঝাই যায়, জীবনের প্রতি মোহমুগ্ধতার যে আবেশ, তার নীল রঙই কবির আশঙ্কাগুলোকেও রঙিন মোড়কে ঘিরে ফেলেছে।

কবি জানাচ্ছেন - এই অঞ্চল, এই প্রদেশ এখন ছত্রপতিদের সুবাতে পরিণত হয়েছে। যে কোনো একটা ছাতাকে আমাদের বেছে নিতে হবে - টিকে থাকার জন্য। এর যদি অন্যথা হয়, অর্থাৎ কোনও ছাতার তলায় যদি নিজেকে বন্দি রাখতে না চাই, তাহলে কিন্তু জীবন্ত পুড়ে মরতে হবে আমাদের। পরিস্থিতি এমনই ভয়ানক এবং এর

কোনো বিকল্পও নেই। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি জানেন - তাঁর পরিণতি কেমন হবে। কিন্তু কোনো প্রতিষেধকের ভাবনা তাঁর সাধ্যের বাইরে। কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়াই যেন তাঁর নিয়তি। আমরা শুনতে পাই কবির মর্মভেদী কান্না -

"আমার কী হবে আমি জানি।
যে ট্রেন আমাকে পিষে যাবে,
আমি গেটম্যান হয়ে ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে
সেই ট্রেনকেই আজ আসবার সংকেত দিচ্ছি
পতাকা নাড়িয়ে...।" (ছাতা)

আমাদের সন্দেহ জাগে, 'পতাকা' শব্দটির ব্যবহারে কবি কোনো বিশেষ পন্থা ও পন্থীদের প্রতি ইঙ্গিত হয়তো করতে চেয়েছেন। এই 'সংকেত' দেওয়ার অর্থ সায় জানানো। অর্থাৎ তুমি আমার উপর দিয়ে তোমার কঠিন চাকাগুলো নিয়ে যেতে পারো। ক্রমাগত ঘাড় নাড়তে নাড়তে একসময় তা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। তখন কোনো বিরোধাভাস মনে ঠাঁই পায় না; ঘরে-বাইরে ঘাড় কাত করে কেবল সম্মতি জ্ঞাপন। কবির এই মুদ্রাদোষ একসময় গ্রাস করে তাঁর সৃজনশীলতাকেও। 'সায়' কবিতাটিতে আছে তারই স্বীকারোক্তি -

"সায় দিয়ে যাওয়া কাজ। ঘরে-বাইরে-ঘরে
ঘাড় কাত করে শুধু সায়....
এভাবে চালিয়ে যাচ্ছি আমার সাহিত্য-ব্যবসায়" (সায়)

লক্ষণীয় যে, কবিতাটির শেষে কিন্তু কবি কোনো বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করেননি। অর্থাৎ মেরুদণ্ড সোজা হবার কোনো আশাই তিনি দেখতে পান নি এখানে। মাত্র তিন লাইনের, মন্ত্রের মতো অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটি কবিতা হ'ল – 'চুপ'। মন্ত্রের মতোই অমোঘ এর বার্তা ও ব্যঞ্জনা। কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না -

"মেরুদণ্ডহীন,
মুখ বুজে এই মেনে নেওয়া
আর কতদিন ?"

কবির এই উদ্যত প্রশ্নের উদ্দিষ্ট কারা ? সমাজের তথাকথিত ভদ্রজনেরা, নাকি কবি নিজে ? যেই হোন না কেন, কবিতাটি আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের মনেও তীব্র অভিঘাত ফেলে। চারিদিকে ঘটে চলা অন্যায়-অত্যাচার-অনাচার-অবিচারের মাঝখানে নিজেদের এই চরম স্থবিরতায় এক ধরনের বিবমিষা জাগে মনের মধ্যে। কবি-বর্ণিত মেরুদণ্ডহীন-এর সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। মহৎ কবির আত্মবোধ তাঁর লেখনীগুণে এভাবেই সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠক থেকে পাঠকান্তরে।

আলোচ্য কাব্যের নামকবিতা 'গারদ'-এ কবি জয় গোস্বামী ক্ষমতাকে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা - ক্ষমতা আসলে এক বিশেষ গারদ। তা কেবল উৎসর্গীকৃত স্বেচ্ছাসেবকদেরই নয়, সেইসঙ্গে চিত্রকর, গায়ক, নায়ক, এমনকি সূক্ষ্ম কবিতার সুকুমার শিল্পীকেও ক্ষমতা ক্রমেই তার কয়েদিতে পরিণত করে। এইভাবে সমস্ত দেশটাই একসময় জেলখানায় রূপান্তরিত হয়, যে জেলখানার দেয়াল সহজে ভাঙা যায় না। তাছাড়া, পদলেহন করতে করতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মানসিকতাটাই তো লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। যার ফল, কবির জবানীতে -

“লেখা আঁকা ঘুরে চলে বাঁধাধরা দেয়াল-নিয়মে।
কবিও গারদে বসে একদিন প্রাক্তন কবিতে
রূপান্তর পায় - কিন্তু অন্য অন্য কয়েদিরা
সোৎসাহের হাততালি দিতে দিতে
তাকে সেটা বুঝতে দেয় না, তাকে সেটা বুঝতে দেয় না...।” (গারদ)

এই যে গারদের ধারণা কবি করেছেন, সেই গারদের মধ্যে রাখা আছে একটি সিংহাসন। কিছু সময়ের ব্যবধানে একেকজন শিল্পী সেই সিংহাসনে ওঠেন এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাঁকে নামিয়েও দেওয়া হয়। যিনি যখন আসনটিতে বসবার সুযোগ পান, অন্যদের তখন তিনি প্ররোচিত করেন আসনের পায়াগুলো চাটতে। নেমে আসবার পর তাঁকেও ঐ কাজেই লিপ্ত হতে হয়। এটা একটা বৃত্তীয় প্রক্রিয়া। তথাকথিত শিল্পীরা নিজেদেরই অপদার্থতাহেতু গড়ে ওঠা এই বৃত্তের গণ্ডীতে একটা সময় ভালোরকমে আটকা পড়ে যান। সবাই তখন মরিয়া হয়ে ওঠেন সিংহাসনটাকে আগে পেতে। শুরু হয়ে যায় ইঁদুর দৌড়। কিন্তু কেন এই হ্যাংলামি, এই আত্মবিক্রয় বা আত্মবিসর্জন ? কবির চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এই কঠিন ব্যাধির মূল জড়টি -

“কাব্য নয়, গান নয়, চিত্রকলা নয়
অর্থ হা হা কীর্তি হি হি স্বচ্ছলতা হু হু...।” (ক্ষমতা বিষয়ে আরো একটি)

-এই সকল শিল্পীদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে কোনো বিপন্নতা-বোধ কিংবা কোনো তীব্র বিস্ময়-বোধ খেলা করেনি। করলে হয়তো তাঁরা জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন'[২] কবিতায় বর্ণিত লোকটার মতো আত্মহত্যার পথকেই শ্রেয় মনে করতেন। অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতার প্রাচুর্যের মধ্যে যে জীবনের চরম সার্থকতা থাকতে পারে না, প্রাণ দিয়ে লোকটা তা প্রমাণ করে গেছে।

ছেলেমেয়েরা কলেজে যায় লেখাপড়া শিখতে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য গান-বাজনা, আড্ডা-হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদির জমাটি আসর বসে যায়। এই ধরনের মজলিসে সবাই নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু এই কলেজের সঙ্গে জয় গোস্বামীর কলেজের বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। কবির মনে হয়েছে - আমাদের এই সমাজ, এই প্রদেশ আসলে একটা কলেজ - হাসির কলেজ। সেখানে হাসানোর দায়িত্ব কেবল

রাষ্ট্রীয় দাদা-দিদিদের। আর আমাদের কাজ কেবল হেসে যাওয়া অথবা হাসবার অভিনয় করা। আর তা না পারলে ? -

"না পারলে বাইরে দাঁড়িয়ে, মানে-মানে
লেজ নাড়ো, লেজ...।" (হাসি)

অর্থাৎ এখানে থাকতে গেলে হয় জোকার সাজতে হবে, নয়তো প্রভুভক্ত চতুষ্পদ প্রাণী। ব্যাগ, বাক্স, ড্রয়ার, আলমারি - এগুলো মানুষের নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস। কিন্তু আজকের দিনে এই ধরনের ব্যক্তিগত এবং নৈতিক ক্ষেত্রেও কবি বিষধর সাপেদের অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। বলাই বাহুল্য, 'সাপ' শব্দটি এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত। এমন বিপদসঙ্কুল, ভয়ংকর পরিবেশে কি সুস্থভাবে বাস করা যায়, না ভাল থাকা যায়? যায় না। কিন্তু না গেলেও ভাল থাকার ভান করতে হয়। ঠিকঠাক ভান করতে না পারলে আবার দাদাদের হাতে কানমলা খাবার চান্স থেকে যায়। তাই কবি অবলম্বন করেন এক হীন কৌশল -

"অত ছোবলের সঙ্গে 'ভাল তো ভাল তো' বলে
দেখা যাক কতদিন থেকে যেতে পারি!" (ভাল তো?)

'ভাল তো ভাল তো' বলে এই যে সৌজন্য প্রদর্শন, কুশল বিনিময়, হাসি বিনিময়, - তাতো আসলে সাপের মুখে চুমো খাওয়ারই সামিল। ক'জন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ এ কাজটা করতে পারেন?

'ডনবৈঠক' মাত্র দুটি পংক্তি নিয়ে রচিত এক অসাধারণ কবিতা। কবিতাটি আকারে ছোটো হলেও ভাবে ও তাৎপর্যে সুগভীর। গোটা কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল -

"মাথার ওপরে থাকবে ডন
আমরা শুধু নীচে বসে বৈঠক চালাব পরপর" (ডনবৈঠক)

এখানেও সেই দাদাদের গল্প। এখানেও সেই হীন দিনযাপনের কথা। যদিও বাহ্যিক আচরণে আমরা প্রাণপণে সেই হীনতাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে যাই। এমন ভাব দেখাই যেন - দেশোদ্ধার একমাত্র আমাদের হাতেই সম্ভব, এই বুঝি একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেললাম। কিন্তু সবকিছুর পিছনেই যে এক ডনে'র তর্জনী সক্রিয় থাকে, তিনি এক জায়গার জলকে উঁচু বললে আমাদেরও যে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে হয় - তা বুঝি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের কেবল মনকে চোখ ঠারা।

জয়ের কবিতায় এই 'ডনে'র নানা রূপভেদ। কোথাও তিনি ছত্রপতির রূপকে, কোথাও গারদ, কোথাও তাঁকে নামহীন, কেবল এক সর্বনাম 'উনি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'উনি' প্রশ্ন করা পছন্দ করেন না। মুখ বন্ধ রাখতেই তাঁর আগ্রহ। যদি তুমি বাঁচতে চাও, তাহলে তোমাকে মুখ ও চোখ - দুটিকেই প্রাণপণে বন্ধ রাখতে হবে। এইভাবে অন্ধ ও বধিরের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে আমাদের আত্মা ও হৃদয় ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়েছে। বাহ্যিক কাঠামোটা মানুষের মতোই আছে বটে, কিন্তু ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো, বিশেষ করে মানসিক অস্থিগুলো তাদের দৃঢ়তা ও স্বাভাবিক

কর্মক্ষমতা হারিয়ে তালগোল পাকিয়ে নরম উলের বলের আকার ধারণ করেছে। আর আমরা তো জানি, বলের কোনো দিকজ্ঞান থাকে না। তাকে যেদিকে মারা হয়, সেদিকেই সে গড়িয়ে যায়। গড়াতে গড়াতে যদি কোনো অগ্নিকুণ্ডে গিয়ে পড়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো ক্ষমতাও তার থাকে না। তাঁর 'দাহ' কবিতায় কবি জয় আমাদের স্থবিরতাকে, আমাদের জড়ত্বকে উলের বলের দহনীয়তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কোথাও জয় অনুভব করেছেন - এক একটা কাঠের পুতুল যেন আমরা। অথবা জঙ্গলে দাঁড়ানো শব - গাছের বদলে। খোলা চোখ, কিন্তু কিছু দেখছি না; মুখের হাস্যরেখাটি যদিও বজায় থাকছে। একটা পুতুল ছাড়া আমাদের অন্য সব সত্তা বিলীন হয়ে গেছে। কারুর ভিতর প্রাণের উত্তেজনা, চারপাশে চেয়ে দেখবার সৎ সাহস একটুও বজায় থাকলেই চারদিক থেকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে, তাকেও লাইনে আনা হয়। তাঁর 'মৃতদেহ' কবিতায় কবি জয় এমনই এক পুতুলের দেশের ছবি এঁকেছেন।

বেশ কিছু বছর আগের (সেপ্টেম্বর, ২০১৪-তে) এক সকালবেলায় জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে রেললাইনের পাশে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত বিবস্ত্র দেহ পাওয়া যায়। তার অপরাধ – আগের দিন গ্রামের এক সালিশি সভায় তার বাবাকে মারধোর করার সময় রুখে দাঁড়িয়েছিল সেই কিশোরী। সেই 'অপরাধে' তাকে থুতু চাটার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তখন অপমানে ক্ষোভে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সেইদিন সারারাত তার আর কোনো খোঁজ মেলেনি। পরদিন সকালে রেললাইনের ধারে তার লাশ উদ্ধার হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরকে অসাধারণ দক্ষতায় শিল্পসার্থক এক কবিতার রূপ দান করেছেন জয়। সুদূর জলপাইগুড়ির এক অজানা অচেনা মেয়ের কথা বলতে গিয়ে কত সহজে নিজেকে ঘটনার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছেন কবি। কারণ তিনিও তো একজন বাবা। তাঁরও তো ঘরে মেয়ে আছে। ধূপগুড়ির মেয়েটির বাবার অসহায়তায় রূপান্তরিত কবিকণ্ঠের বিলাপ আর আর্ত হাহাকার, (সেইসঙ্গে কিছুটা অনুত্তেজিত আত্মসমালোচনাও) সমাজের সকল বাবাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে -

"আমি স্বার্থপর বাবা। তোর কথা ভাবি না রে, মা !
আজ তোকে এমন করল - তোকে না – তোদের –
কাল যদি আমার মেয়েকে...
পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মনে হয় জোড় হাতে বলি
ঘরে যদি মেয়ে থাকে বেরোতে দেবেন না বাড়ি থেকে।" (ধূপগুড়ি-১)

অজানা বিপদ সম্ভাবনার এক মর্মদাহী আশংকা যে আজকালকার নিরুপায় সব বাবা-মায়ের নিত্যসঙ্গী - তা বোধহয় না বললেও চলে। এই কবিতারই সমগোত্রীয় আর একটা কবিতা হল 'ডিসেম্বর ২০১২'। এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নারীদের উপর

ঘটে চলা অত্যাচার জনগণমনে কিংবা বুদ্ধিজীবি-মহলে কেমন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়ে চলেছে - তারই বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কবি লিখেছেন -

"দুহাতে দু কান চেপে ধরে আছি –
কিচ্ছু শুনবো না...
শুনবো না, শুনবো না !"

মরুভূমিতে যখন ঝড় ওঠে বালিতে মুখ গুঁজে দেয় উটের দল। তারা ভাবে ঝড়কে না দেখলেই বুঝি ঝড়ের প্রকোপকে এড়ানো যাবে। আমাদের মধ্যবিত্ত মনের ধারণাও অনেকটা তদ্রূপ। সেইজন্যেই আমরা হাত দিয়ে কানদুটো চাপা রাখতে চাই, যাতে করে বহির্জগতের ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব হয়?

যে আবহাওয়ায় আমরা এখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, তা যেন ক্রমে বিষিয়ে যাচ্ছে বারুদের গন্ধে। কোথাও বা দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণের ভয়ংকর ক্ষত। বিঘ্নিত হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন শান্তি। এই শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার এক চমৎকার উপায় বাতলেছেন কবি -

"চারপাশে অনেক বারুদ।
যতদিন পারো
সন্তর্পণে জল দিয়ে ভেজাও।
তারপর বসে থাকো চুপচাপ বাড়িতে।" (শান্তি)

সহজ জীবন এবং অন্তে এক শান্তিপূর্ণ মৃত্যুই কামনা করেছেন কবি, আমাদের হয়ে। তাঁর পূর্বসূরি কবিদের অনেকেই অবশ্য এমন সহজপথে হাঁটেননি। চল্লিশের বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মে দিনের কবিতা'য় লিখেছিলেন -

"শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।"[৩]

কবি জয় অবশ্য এমন কোনো গনগনে জীবনের মাঝে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চাননি।

'বারবার তিনবার' কবিতায় অনেক দিনের পুরোনো একটা বিপর্যয়ের বর্ণনা দিয়েছেন জয় গোস্বামী। একদা কোনো এক নামকরা শিক্ষাক্ষেত্রে আয়োজন করা হয়েছে কবিতাসভার। সমবেত হয়েছেন ছোটো-মাঝারি-বড়ো নানা মাপের বহু কবি। রয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে জয় গোস্বামীও। অকস্মাৎ একটা 'সিন্ ক্রিয়েট' করে গেলেন নাম না জানা এক 'তরুণ তুর্কী'। রাজনৈতিক মতানৈক্যই ছিল তাঁর ক্ষোভের কারণ এবং তাঁর শক্তির উৎসও বটে। প্রকাশ্য সভায় একজন বরিষ্ঠ এবং যশস্বী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে তাঁর রুচিতে এতটুকু বাধেনি। এমনই ছিল তাঁর শিক্ষা। ঘটনাটির অন্য একটা দিকও ছিল। যেখানে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম -

সমবেত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে থেকে প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধের কোনো কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠলো না। জয় গোস্বামীও ঐ দলেই ছিলেন। লজ্জা, ঘৃণা, অপমানবোধ - কোনো কিছুই তাঁকে সভা ত্যাগ করাতে পারেনি। বরং নিপাট ভালোমানুষ সেজে চুপচাপ বসে থেকে সবকিছু হজম করে গেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, পরে বাইরে গিয়ে সেই অপমানকারীর সঙ্গে চা-পানের মজাও নিয়েছিলেন। সত্যি, বড়ো কঠিন এই সময়। চোখের সমুখে কোথাও কোনো আলো, কোনো দৃষ্টান্ত নেই এযুগের যাত্রিকের। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে বলা যায় - এ বড়ো সুখের সময় নয়, এ বড়ো আনন্দের সময় নয়। দেখেও না দেখার এই ভান, মুখ ঘুরিয়ে থাকার এই প্রবণতা কবিকে একসময় দূষিত করেছে। বিশুদ্ধ লেখার সঙ্গে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে তাঁর। কেবল খাতা- কলম নয়, কবিকে ভর্ৎসনা করেছে আশেপাশের ঘুরন্ত হাওয়াও -

"কবি হতে চেয়েছিলে,
জীবন কাটিয়ে দিলে নপুংসক হয়ে।" (বারবার তিনবার)

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কবি হয়তো তাঁর পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন নিজের বিবেকের কাছে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'কবিতার কথা'তে মন্তব্য করেছিলেন- 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'[৪] কিন্তু এখন শত-সহস্র ছোট পত্রিকা, নানা প্রতিষ্ঠানের দৌলতে কবির সংখ্যা গুনে শেষ করা যায়না। মাঝে মাঝে মনে হয় - 'সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়'। এই ব্যাপারটাই উঠে এসেছে জয় গোস্বামীর কলমে। তিনি লিখেছেন

– "আমার চারপাশে শুধু মোটা মোটা লোহার গরাদ।
আমার চারপাশে শুধু কবি কবি। লেখক লেখক।" (ভুল)

এরপরেই কবি উচ্চারণ করেছেন সেই নগ্ন-সত্যটি, একালের কবি-লেখদের যা সাধারণ ধর্ম – 'গরাদে গরাদে গিয়ে মাথাঠোকা একমাত্র কাজ।' প্রতিবাদহীন একান্ত আত্মসমর্পণ ও ভিক্ষা-প্রার্থনা ছাড়া আর কোনো দ্ব্যর্থ নেই এই মাথাঠোকার।

নিজের কিংবা স্বশ্রেণির নৈতিক অধঃপতন কবিকে ভেতের ভেতরে এতটাই বীতশ্রদ্ধ ও বিধ্বস্ত করেছে যে, একজন স্বৈরিণীর সঙ্গে একজন কবির কোনো পার্থক্য তিনি দেখতে পাননি। আমরা জানি, দেহব্যবসায়ী যত পুরোনো হয়, তার চাহিদা ততই কমে যায়। আর এই ব্যবসায় একবার নামলে ফিরে যাবার রাস্তা প্রায়শই রূদ্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাকে নিজের দর ক্রমশ কমিয়ে ফেলতে হয় - অস্তিত্বের তাগিদে। কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় - কোনো একটা দল বা প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে বেরোনোর রাস্তাও ভীষণ কঠিন হয়ে ওঠে। এই ধরনের ছত্রছায়াকে কবি অভিহিত করেছেন কোঠিবাড়ি বলে এবং তীব্র বিদ্রূপ মাখানো কণ্ঠে পরামর্শ দিয়েছেন -

"... যদি টিকে থাকতে চাও
আলো যেরকম কমে আসে

তেমনই দিনের পর দিন
দর আরও কমাও তোমার...। (কোঠিবাড়ি)

মোটেও অস্বাভাবিক নয় এই পরিণতি। কারণ কোঠিবাড়িতে প্রবেশের সময় নিজের অবস্থানকে অনেকটা নামিয়েই তো সেখানে প্রবেশ করতে হয়।

জয় গোস্বামীর কাব্য-বিষয়ের দিকে খেয়াল করলে কবি-চরিত্রের দুই পরস্পর-বিরোধী মেরুর সন্ধান মেলে। একদিকে তিনি যেমন ক্ষমতার সামনে মাথা নত করেছেন, কুৎসিত বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন; অন্যদিকে তেমনি কৃতকর্মের জন্য সময় সময় অনুতাপও করেছেন। যেমন-

"কী করেছি ! কী করেছি !
অনুতাপ করি।" (ভুল)

কোথাওবা প্রকাশ পেয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামবার সাহস জোটাতে না পারার জন্য তীব্র মর্মবেদনা -

"আমার কবিতা, তুমি সমর্থন কোরো না কখনও
আমার আপস।" (লেখা)

আবার এই পরাধীনতার জ্বালা থেকে বাঁচবার জন্য মরিয়া হয়ে মেট্রোরেলে আত্মহত্যার কথাও একসময় মনে এসেছে তাঁর -

"এভাবে জীবন কাটবে, আমার উপায় নেই পালিয়ে যাওয়ার
মেট্রো টিকিটের দাম পাঁচ টাকা। মাত্র পাঁচ টাকায়
এসবের থেকে কিন্তু সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় !" (মুক্তি)

স্বাভিমানী, বিবেকবান, মুক্তিপিয়াসী কবিচিত্তে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক ছটফটানি থাকলেও সাহস ও শক্তির মেলবন্ধনের অভাব, কিছুটা পিছু টানও, কবিকে গণ্ডীর বাইরে বেরোতে দেয়নি। আসলে বিদ্রোহী হতে গেলে যে কলজের জোর লাগে, তা বোধহয় কবির ছিল না। তাইতো তাঁর ধিক্কার-তিরস্কারের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে এক করুণ আর্তনাদ।

জয় গোস্বামীর কবিতা বিষয়ে যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম, তার মধ্যে মেরুদণ্ডহীন মানুষ বলতে কবি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের, শান্তিকামী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের, নির্বিবাদী-নির্বিরোধী ভদ্রজনদের; নাকি কবি নিজেরই মূঢ়তাকে, নিজেরই স্থবিরতাকে, ভীরুতাকে ক্রমাগত ভর্ৎসনা করে গেছেন। আমাদের মনে হয় কবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ থেকে কেউই রেহাই পায়নি। তিনি নিজেও না। রাজনৈতিক দাদা-দিদি, প্রশান্ত কাপুরুষ, মুখ বুজে অন্যায় সহ্যকারী, অন্যায়ের সঙ্গে আপোসকামী থেকে শুরু করে যশস্বী ও যশোলোভী সাহিত্যব্যবসায়ী, পদলোভী চিত্রকর-গায়ক-নায়ক, বিবেকহীন স্বামী পর্যন্ত সবাই তাঁর প্রচ্ছন্ন আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন। তবে তাঁর এই আক্রমণ কিন্তু সরাসরি প্রত্যক্ষ পথে যায়নি। তার ওপরে বক্রোক্তির একটা মৃদু চাদর জড়ানো আছে।

ভূগোলে তিন রকমের আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায় - মৃত, সুপ্ত ও জীবন্ত। কবি জয়ের মধ্যেও এক ধরনের আগ্নেয়গিরি আছে। প্রকৃতিতে তা জীবন্ত হলেও কাজী নজরুলের মতো তার মধ্যে থেকে কোনো গলিত লাভা বার হয় না। যা বার হয়, তা হল- অন্তরের জ্বালা, অশান্তি ও অসন্তোষজাত কালো ধোঁয়া। এই ধোঁয়া থেকেই প্রমাণিত হয় তাঁর মধ্যেকার আগ্নেয়গিরির সজীবতা।

তথ্যসূত্র :

১। উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠসঞ্চয়ন ('ক' পাঠক্রম - গদ্য) – **১৯৯২** - প. ব. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-এর পক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা **১৭** - পৃ. **১১৮**

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.) - জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ – জানুয়ারি **১৯৯৩** - ভারবি, কলকাতা ৭৩ - পৃ. ২২০

৩। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ - পদাতিক - চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ **১৪১৭** - দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩ - পৃ. **১৪**

৪। দাশ, জীবনানন্দ – কবিতার কথা - দশম সংস্করণ, মাঘ **১৪১৩** - সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩ - পৃ. ৭

৫। আলোচনায় ব্যবহৃত জয় গোস্বামীর 'গরাদ, গরাদ' কাব্যের সবক'টি উদ্ধৃতিই প্রথম সিগনেট প্রেস সংস্করণ (জানুয়ারি, ২০১৫) থেকে নেওয়া।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১। গোস্বামী, জয় – গরাদ, গরাদ – প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০১৫ - সিগনেট প্রেস, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯

২। দাশ, জীবনানন্দ - কবিতার কথা - দশম সংস্করণ: মাঘ, **১৪১৩** - সিগনেট প্রেস, কলকাতা ০৯

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.) - জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ – জানুয়ারি, **১৯৯৩** – ভারবি, কলকাতা

৪। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ – পদাতিক - চতুর্থ সংস্করণ: বৈশাখ, **১৪১৭** - দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সামন্ত, সুবল (সম্পা.) - বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা - প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০০২ - এবং মুশায়েরা, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা

২। উচ্চমাধ্যমিক পাঠসঞ্চয়ন ('ক' পাঠক্রম - গদ্য) – **১৯৯২** - প.ব. উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-এর পক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা।

বাংলার বৃক্ষকেন্দ্রিক দেবদেবী, লোকাচার ও পূজাপার্বণ

অর্পণ মণ্ডল
স্নাতকোত্তর, প্রথম বর্ষ, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:- পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলায়, এমনকী শহরগুলিতেও লৌকিক দেবদেবীর অন্ত নেই। বাংলার পথে-ঘাটে, মাঠে-প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে অথবা জটাজুটধারী বৃক্ষ তলে কত শত দেবদেবী আসন পেতেছেন। পুরাণবর্ণিত দেবদেবীর তালিকায় এঁদের অনেককে দেখতে পাওয়া যাবে না, আবার কেউবা সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত, কেউবা হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। তবে এ প্রবন্ধের মূল আলোচিতব্য বিষয় হল বাংলার বৃক্ষকেন্দ্রিক দেবদেবী। বেল, সিজ, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি গাছগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলার মানুষ বহু যুগ ধরে পুজো করে এসেছে, ব্রত করেছে, মানত করেছে, চড়িয়েছে নানান নৈবেদ্য, এখনও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সেই সমস্ত বৃক্ষকেন্দ্রিক দেবদেবী এবং তাদের সাথে জড়িত নানান লোকশ্রুতি, আভিচারিক ক্রিয়া, ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়েই এ প্রবন্ধের অবতারণা।
সূচক শব্দ:- লোক-দেবদেবী,বৃক্ষ-উপাসনা, ব্রতানুষ্ঠান, বৃক্ষকেন্দ্রিক উপাচার।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৃক্ষপূজা প্রচলিত। প্রাচীন গ্রিস, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, চিন প্রভৃতি দেশে বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। পূর্ব আফ্রিকার ওয়ানিকা (Wanika) জাতির বৃক্ষকেন্দ্রিক বিশ্বাস একটু ভিন্ন, তাদের বিশ্বাস প্রতিটা নারকেল গাছেরই আত্মা বর্তমান। নারকেল গাছের ধ্বংস তাদের কাছে মাতৃহত্যার সমতুল্য[1] [2]। মধ্য আফ্রিকার বাসোগাস (Basogas) জাতি বিশ্বাস করে, কোনও কোনও বৃক্ষে অপদেবতা বাস করে, সেই বৃক্ষ কর্তিত হলে,ওই অপদেবতার রোষে পরিবারের কর্তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী[3]। সারা পৃথিবী জুড়েই বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় ইতিহাসে বৃক্ষপূজা বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নেই।

---

1. (FRAZER, 1894, p. 59)
2. J.L. KRAPF সাহেব বলছেন,” The Wanika believe that every tree,especially every cocoa-nut tree...The destruction of a cocoa-nut tree is regarded as equivalent to matricide...” (Krapf , 1968, p. 198)
3. (SAHAY, 1960, p. 59)

অত্যুৎসাহী পাঠক ফ্রেজার সাহেবের *The Golden Bough : A Study in Magic and Religion* বইটির *'Tree Worship'* শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও বৃক্ষপূজার প্রচলন আর্য আগমনের বহু পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং তা আজও লুপ্ত হয়নি। সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন অনেক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে বৃক্ষাধিষ্ঠিত শক্তিতে মানুষের বিশ্বাসের দিকটি স্থাপিত। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সীলিঙের (Pl.XII,12) এক পৃষ্ঠে একটি দেবীমূর্তি উৎকীর্ণ আছে, যার ভঙ্গি উত্তানপাদ। সেই দেবীমূর্তির গর্ভ হতে উৎসারিত হচ্ছে চারাগাছ। এ জাতীয় নজির থেকে মার্শাল অনুমান করেছিলেন সিন্ধু সভ্যতায় বৃক্ষ-উপাসনা প্রচলিত ছিল[4]।তবে সিন্ধু সভ্যতার দেবী-রহস্যের সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের সম্পর্ক ইঙ্গিত শুধুমাত্র এই সীলটির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। অন্যান্য সীলেও দেবীকে উদ্ভিদ-পরিবৃতা বা উদ্ভিদ অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে অঙ্কিত করা হয়েছে[5]।

আসলে বৃক্ষপূজা আদিমযুগের ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে, আধুনিক কালেও এই বিশ্বাস একেবারেই নির্মূল হয়নি। বর্তমান কালেও ভারতের সর্বত্রই বৃক্ষপূজার প্রচলন। এখনও বাংলাদেশের লোকায়ত পূজাচারের মধ্যে বৃক্ষপূজা অন্যতম। যে সকল বৃক্ষের প্রতি সাধারণ লোক শ্রদ্ধা দেখায় ও পূজা করে তার মধ্যে বিশেষভাবে অশ্বত্থ, বট, ধাত্রী, পলাশ, তুলসী, বেল, তাল, শাল, সিজ- মনসা, শেওড়া, খেজুর, ঘেঁটু, দূর্বা, কদম, আমলকী, মহুয়া, পাকুড়, নিম, বাঁশ, তাছাড়াও বিভিন্ন শস্য যেমন ধান,গম, যব প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য। যে সকল বৃক্ষাদি পূজিত হয় তার একখানা বিস্তৃত তালিকা অবশ্য ভবিষ্য পুরাণেই পাওয়া যায়। এইসমস্ত বৃক্ষাদির সঙ্গে কোনও না কোনও দেবদেবীর ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায়। বাঙালিরা যেমন সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে অশ্বত্থ গাছকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো করে আসছে। শুধু বাঙালিরাই নয়,সারা ভারতবর্ষ জুড়েই অশ্বত্থ গাছ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়। অশ্বত্থবৃক্ষের পূজার নিদর্শন আমরা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকেই পাই। সেখানকার আরও কিছু সীল থেকেই জানা যায় ওই সভ্যতার বাহকরা অশ্বত্থবৃক্ষের বিশেষ আরাধনা করত। ভগবদগীতার বিভূতিযোগে কৃষ্ণর কণ্ঠ হতে উৎসারিত হয়---'অশ্বত্থ সর্ব বৃক্ষাণাং' (ভগবদগীতা ১০.২৬) অর্থাৎ বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বত্থ...। এছাড়াও বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থাদিতে বহুবার অশ্বত্থের উল্লেখ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে অশ্বত্থবৃক্ষের মাহাত্ম্য ঠিক কোন পর্যায়ে ছিল।বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এই গাছ অত্যন্ত পবিত্র-সে কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। তাই বোধ করি অশ্বত্থ গাছের এই ধর্মীয় গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদেরাও এই গাছের নাম দিয়েছেন Ficus Religiosa। বাংলায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায়

---

4. (Marshall, 1931, p. 52)
5. Marshall.1.pl.xii 13,14,18,19,22 (1931)

জঙ্গল কেটে নগর প্রতিষ্ঠার সময় কলকেতু বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখেন[6], তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল অশ্বত্থ। বৈশাখ মাসব্যাপী পাড়াগাঁয়ের পুণ্যলোভাতুর মহিলারা বিশেষত প্রৌঢ়ারা অশ্বত্থ গাছে জল দেন নিয়মিত। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের লোকেরাও অশ্বত্থ গাছে ঘট বেঁধে তাতে প্রত্যহ তিল, জল ও দুধ ঢালেন পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তি কামনা করে। দেবদেবীর অধিষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে এখনও বাঙালিরা অশ্বত্থ গাছের ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে না[7]।

এছাড়াও অশ্বত্থ গাছকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে মেয়েরা সমৃদ্ধি,আয়ু ও বন্ধ্যাত্বমোচনের জন্য চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত 'অশ্বত্থ-নারায়ণ ব্রত' (স্থানভেদে এর নাম 'অশ্বত্থ পাতার ব্রত') নামক একটি ব্রতানুষ্ঠান উদযাপন করে। অশ্বত্থগাছ পূজা পায় অসাধারণ প্রাণ শক্তির জন্য। শুধু অশ্বত্থই নয়,বট (Ficus benghalensis) গাছও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, তাই এই দুই গাছ মানুষের কাছে এক বিস্ময় মহাশক্তির আধার।

বটবৃক্ষের আরাধনাও বাঙলাদেশে সেই কোন সুপ্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে[৪]।কথিত আছে সীতাদেবীর দশরথকে পিণ্ডদানের সাক্ষ্য দেওয়ায় দেবী প্রসন্ন হয়ে বটবৃক্ষকে "অক্ষয় হও" বলে আশীর্ব্বাদ করায় বটবৃক্ষ অমর হয়ে রয়েছে। বট গাছকে কেন্দ্র করে মহাপ্লাবনের সময় বৃক্ষ হিসেবে একমাত্র বটবৃক্ষের বেঁচে থাকা', 'বটগাছের তলায় যমরাজের কাছ থেকে স্বামী সত্যবানের জীবন ভিক্ষা পাওয়া সাবিত্রীর কাহিনি' --এ জাতীয় কত শত উপাখ্যান গড়ে উঠেছে বট গাছকে কেন্দ্র করে।সাবিত্রী-সত্যবানের পৌরাণিক কাহিনির কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশের মেয়েরা বহু স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে সাবিত্রীব্রত উদযাপনের দিনে বট গাছ পূজা করে।

শুধু গাছকে পুজো করাই নয়,ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে গাছেদের বিয়ে দেওয়ার মতো বিচিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অবশ্য এ ধারণাও ভারতবর্ষে নতুন কিছু নয়, বৃক্ষেরও যে কামনা-বাসনা আছে সে ধারণা কালিদাসের লেখাতেও পাই--

---

6. (চক্রবর্ত্তি, ১৯২১, p. ৭৮)

7. (মিত্র, ১৩৮১, p. ১৮৮)

৪ . দ্বাদশ শতাব্দীর কবি গোবর্ধন আচার্যের লেখায় পাই-

ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মীঃ।

পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা।।

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস বইতে এই শ্লোকের উল্লেখ আছে (রায়, ১৪২০, p. ৪৮২)

সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে
ভর্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্ ।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্
অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ।।

(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্/চতুর্থ অঙ্ক)

পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে বট ও পাকুড় (Ficus rumphii{Syn: F infectoria}) গাছের কৃত্রিম বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা আজও উৎকল দেশে[9]এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজবংশী সমাজে বর্তমান। রাজবংশীরা বিশ্বাস করে বট-পাকুড়ের বিয়ে দিলে অপুত্রকের পুত্র লাভ হয়। তাই এই বিবাহের দায়িত্ব এবং ব্যয়ভার যিনি গ্রহণ করেন তিনি সর্বদাই অপুত্রক হয়ে থাকেন। বটগাছকে পুরুষ এবং পাকুড় গাছকে স্ত্রী রূপে কল্পনা করে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। কোচবিহার অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন উপলক্ষ্যেও অপুত্রক ব্যক্তিরা বট ও পাকুড় গাছের বিবাহ দান করে থাকেন। সেখানে বট গাছকে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাকুড় গাছকে শ্রীরাধা বলে কল্পনা করা হয়।

বট গাছের সঙ্গে যোগ রয়েছে বাংলার আরেক লৌকিক দেবী,সন্তানদাত্রী ও সন্তান রক্ষয়ত্রী রূপে পূজিতা ষষ্ঠী দেবীর। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ আছে-।

বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধা
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম
মূল বান্ধিবারে আসিল খৈকর[10]।

এছাড়াও বিভিন্ন পুরাণাদিতে ষষ্ঠীর বিবিধ প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়।ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে দেবী ষষ্ঠী ব্রহ্মার মানসকন্যা,যার প্রকৃত নাম দেবসেনা,আবার অন্যদিকে স্কন্দপুরাণে পাই দেবী ষষ্ঠী কার্তিকেয় ভার্যা।

বারোমাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবী ষষ্ঠীর বিবিধ নামে ব্রতাদি সংস্কার পালন করা হয়।এর মধ্যে সূতিকা ষষ্ঠীর পূজায় বটবৃক্ষের যোগ সবচেয়ে বেশি। সাধারণত শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে ষষ্ঠীর অর্চনার বিধি আছে। ষষ্ঠদিনে যে-ষষ্ঠীপুজো হয় সেটি ‘সূতিকাষষ্ঠী’ বা 'ঘাটষষ্ঠী' নামে পরিচিত। কোনো-কোনো অঞ্চলে একেই আবার ‘ষেঠেরা’ বা ‘ষাটষষ্ঠী' বলে। মূলত আঁতুড়ঘরে পুজোটি হয় বলে একে সূতিকাষষ্ঠী বলে।পূর্বেই বলেছি বারো মাসে শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে বারোটি ভিন্ন নামে ষষ্ঠীব্রত পালিত হয়[11]। এই ষষ্ঠী ব্রতগুলির আবার স্থানভেদে নাম পরিবর্তিত হয়ে

9. (Choudhury, 2012, p. 55)

10. (চক্রবর্ত্তি, ১৯২১, p. ৭৮)

11 ব্রতীরা এক বুক জলে দাঁড়িয়ে দূর্বার আঁটি দিয়ে নিজের চোখে জল ছেটায় আর বলে:

গেছে। এই প্রত্যেকটি ষষ্ঠীব্রতকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।তবে এ কথা বলে রাখি যে ষষ্ঠীব্রতের সাথে বৃক্ষপূজার এক নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, গ্রামের ষষ্ঠীথানগুলি গাছের নীচেই হয়ে থাকে, মূলত নিম, বট, অশ্বত্থ কিংবা মনসা বা সিজগাছের নীচে।তাছাড়াও ষষ্ঠীপূজাকে উপলক্ষ্য করে বৃক্ষকেন্দ্রিক বহুরকম উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, ষষ্ঠীব্রত অনেক সময়েই কাঁঠাল বা বটগাছের ডাল পুঁতে করা হয়ে থাকে। এছাড়া ষষ্ঠীপূজার অন্যতম উপাচারগুলি হল দূর্বা, বাঁশের কিশলয় বা কোড়া, করঞ্জা, আমের পল্লব, মূলো, ঝিঙে ইত্যাদি। এই সব কিছুই অরণ্যজীবনের অনুষঙ্গ।

বট গাছের পরই আমাদের আলোচনা করতে হয় সিজ গাছ (Euphorbia nerifolia) সম্পর্কে। সিন্ধু সভ্যতার সময়েও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে সমাদৃত সিজবৃক্ষ বর্তমানে বঙ্গদেশে, সর্পদেবী মনসার প্রতীক। বিদ্বৎসমাজের একাংশ মনে করেন, খুব সম্ভবত মনসা পূজার এই প্রাকরণিক রূপটির আগমন দক্ষিণ ভারত থেকে,কেননা 'মনসা পূজার অনিবার্য উপকরণ যে মনসা-সিজ গাছ,দ্রাবিড়-বলয়ে তার প্রতিনাম হল চেম্মুডু'[12]।মনে রাখা দরকার বঙ্গদেশে মনসা ঠাকুরানীর আরেক নাম কিন্তু 'চ্যাংমুড়ী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে 'মনে মনচাম্মা' নামক এক মূর্তিহীন সর্পদেবী পূজিতা হন। চেম্মুডুর ডাল মাটিতে পুঁতে তাকেই দেবীর প্রতীক

অগ্রহায়ণে মুলো ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
পৌষে লোটন ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
ফাল্গুনে গুণো ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
বৈশাখে দই ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
অরণ্যে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে
আষাঢ়ে চাপড়ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
ভাদ্রে অক্ষরা ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
আশ্বিনে বোধন ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
কার্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
শ্মশানে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে II
(https://harappa.co.in/img/aranyasasthii_harappa.pdf)

12. (সেনগুপ্ত, জুলাই,১৯৫৯, pp. ৭২-৭৩)

হিসেবে পুজো করেন ভক্তবৃন্দ।এই গাছের সঙ্গে সর্পদেবীর ঘনিষ্ঠতার কথা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের ধর্মশাস্ত্র রচয়িতা জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' গ্রন্থেও পাওয়া যায় [13]। আষাঢ়ের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ঘটে কিংবা সংস্কৃতে স্নূহী নামে পরিচিত[14] এই সিজবৃক্ষে অথবা চালির পিছনে অঙ্কিত মনসা দেবীর পূজার প্রচলন বঙ্গের নানা স্থানে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুক্ত স্থানে যেখানে সাধারণত মনসা পূজা করা হয় সেখানে অন্তত একটি সিজগাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়।সিজ গাছের সঙ্গে সর্পদেবী মনসার সংযোগের কারণ হিসেবে ড.অতুল সুর তাঁর 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' বইতে বলছেন,সাপে কামড়ালে একসময় সিজ গাছের আঠা প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হত, খুব সম্ভবত সেই সূত্র ধরেই মনসা দেবীর সঙ্গে সিজ গাছের যোগ সম্ভব হয়েছে[15]।রাঢ় অঞ্চলের অনেক বাড়িতে দশহারার দিন সিজ মনসা গাছ রোপণ করা হয়।পঞ্চমীতে সিজ মনসা গাছের পুজোও হয় ঘটা করে।বিজয়া দশমীর দিন সেই সিজবৃক্ষ তুলে পুকুরে বিসর্জন দেওয়ার রীতিও বর্তমান।।

শুধু সিজ বৃক্ষই নয়,বহু গ্রামে বট[16] কিংবা নিম গাছকেও নাগদেবী হিসেবে পুজো করা হয়।বর্তমানে মনসা পুজোর সাথে নিম গাছের (Azadirachta indica) সেভাবে যোগ না থাকলেও জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় মধ্যযুগের প্রথম দিকে মনসা পূজায় নিম পাতা ব্যবহৃত হত[17]। এখনও দাক্ষিণাত্যে নিম গাছকে সর্পদেবীর প্রতীক হিসেবে পূজা করার বহুল প্রচলন আছে, শুধু তাই নয় দক্ষিণ ভারতে অশ্বত্থ গাছকে বিষ্ণু এবং নিম গাছকে সর্পদেবী Mãriamma রূপে কল্পনা করে অশ্বত্থ ও নিম গাছের কৃত্রিম বিবাহ প্রদান করার মতো ব্যবস্থাও চালু আছে[18]

হাম ও বসন্তের দেবী শীতলার প্রতীক হিসেবেও পূজিত হয় নিম গাছ।বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিম গাছের পাতা দিয়ে বাতাস করার প্রথা লক্ষ্য করা যায়।

তবে বঙ্গদেশে শিবের প্রতীক হিসেবেই নিমগাছই সর্বাপেক্ষা বেশি পূজিত হয়।নিমগাছকে কেন্দ্র করে শিবের এই পূজাকে বলে পাট গোঁসাই বা নীল পূজা।পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া জেলায় এই পুজো উদযাপিত হয়।বাঙালি গৃহিণীরা নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনায় এবং নীরোগ সুস্থ জীবন কামনা করে চৈত্র মাসের ২৯ তারিখ উদযাপন করেন এই নীল পূজা।এই

---

13. (মাইতি, মাঘ ১৪২১,জানু.২০১৫, p. ৩৮)

14.Ibid.p.৩৮ ও (Maity, APRIL,1966, pp. 220-21,292)

15 (Benthall, 1946, p. 370)

16 কাটোয়া থানার ছোটমেইগাছি অঞ্চলে (সিঙ্গি গ্রাম ভ্রমণের সময়,পরবর্তীতে আলোচনা করেছি) বটগাছের নীচে বিশাল থান নির্মাণ করে পূজা করা হয় মনসার।

17 (মাইতি, মাঘ ১৪২১,জানু.২০১৫, p. ৪৫)

18 (MITRA, 1931, p. 427)

পূজার জন্য একটি সরল নিম গাছ (না পাওয়া গেলে বেল গাছ,আসছি সে প্রসঙ্গে) সংগ্রহ করে তা থেকে নীলের মূর্তি তৈরি হয়। গাছটির দৈর্ঘ্য সাধারণত দেড় হাত থেকে সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থ বারো ইঞ্চি থেকে এক হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে । নীল পূজার প্রায় তিন দিন অথবা তিন সপ্তাহ পূর্বেই নীলকে মণ্ডপ থেকে নিচে নামানো হয়। নীলপূজার আগের দিন, অধিক রাত্রে হয় হাজরা পূজা অর্থাৎ শিবের বিয়ে উপলক্ষে সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ করা। হাজরা পূজায় শিবের চেলা বা ভূত-প্রেতের দেবতাকে পোড়া শোল মাছের ভোগ দেওয়া হয়। পরদিন নীলপূজার সময় নীলকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লালশালু কাপড় পরিয়ে অন্ততপক্ষে সাতটি বাড়িতে নীলকে ঘোরানো হয়।এই পূজার উদ্ভব আসলে শিবের বিবাহ উপলক্ষ্যে।নীল পূজা উপলক্ষ্যে যে গানগুলি গাওয়া হয়,তাতে শিবের বিবাহের প্রসঙ্গ স্পষ্ট।চিত্তরঞ্জন দেব তাঁর 'বাংলার পল্লীগীতি' (ন্যশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম মুদ্রন ১৯৬০, পৃঃ৫০-৭৫) বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নীল পূজার গান সম্পর্কে।

এরপর আসি শিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেলবৃক্ষ (Aegle marmelos) এবং তার পূজা সম্পর্কে। নীলের মূর্তি তৈরিতে নিম গাছ না পেলে যে বেল গাছ ব্যবহৃত হয়,সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বেলগাছের সঙ্গে শিবঠাকুরের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিল্বপত্রের ত্রিফলক পত্রের মাঝখানের পাতাটি শিব স্বরূপ। বাম পত্র ব্রহ্মা স্বরূপ এবং ডান পত্র বিষ্ণু স্বরূপ।।বেল গাছের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক কীভাবে স্থাপিত হল,তার বিস্তারিত পরিচয় বিভিন্ন পুরাণাদিতে মেলে।বেলগাছের জন্ম সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রচলিত এবং আশ্চর্যজনক কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে শিবপুরাণে, যেখানে পাই শিবের বরে লক্ষীর অঙ্গ থেকে বেলগাছের উৎপত্তি।তবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।বেল পাতা যে কেবল শিবের পূজায় ব্যবহৃত হয় তাই নয়,অন্যান্য দেবদেবীর পুজোতে ও হোমের জন্যও বেল গাছের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।বাংলার হারিয়ে যেতে বসা ব্যাধ-সম্প্রদায় 'পাখমারা'-দের মধ্যেও তাদের আরাধ্য দেবতা শিবকে বেলপাতা নিবেদনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানোর চল আছে।'দাঁইহাটের পাখমারেরা বেলপাতায় নিজের রক্ত লাগিয়ে শিবকে নিবেদন করেন। আবার হরিপুরে শিবকে নিবেদন করা হয় পাখির রক্তে রঞ্জিত বেলপাতা। এই কাজের মধ্যে রয়েছে পাখমারদের নিজস্ব লোকবিশ্বাস। পাখমারদের মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারে তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন জরা ব্যাধ। সেই জরা ব্যাধের ছোড়া সাতনলীতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল কৃষ্ণের। মৃত্যুর সময়ে কৃষ্ণের এক ফোঁটা রক্ত নাকি পড়েছিল তাঁর পায়ের কাছে থাকা শিবলিঙ্গের মাথায়। সেই থেকেই পাখমারেরা পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের জন্য নিজেদের রক্ত শিবকে নিবেদন করেন[19]

---

19 (হারিয়ে যাচ্ছেন বর্ধমানের পাখমারেরা, ২০১৯)

বেলগাছকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া অঞ্চলে পূজিতা হয় আরেক লৌকিক দেবী বাঘরাই বুড়ী। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত চয়নপুর,গোবিন্দধাম ইত্যাদি গ্রামে সাধারণত বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বেল গাছের তলায় কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ডকে(প্রস্তরখণ্ডটির মাপ সাধারণত দৈর্ঘ্যে ১ ফুট এবং প্রস্থে ৯ ইঞ্চির মতো) বাঘরাই দেবী রূপে কল্পনা করে পুজো করে। বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ কোনও এক ব্যক্তির দ্বারা জল,বিল্বপত্র এবং সিঁদুর দিয়ে পূজিতা হন বাঘরাই বুড়ী।আষাঢ় মাসের সাত তারিখে অর্থাৎ অম্বুবাচীর প্রথম দিনে দেবীর পূজার থানে বৃহদাকৃতির পুরুষ শূকর বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বাঘরাই দেবীর পূজা করা হয় অকাল মৃত্যু, অনাবৃষ্টি ও বন্যার হাত থেকে রক্ষা লাভের জন্য।এই পূজার জন্য পৃথক কোনও মন্ত্র না থাকলেও 'বাঘরায় দেব্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রটি পূজারী কয়েকবার উচ্চারণ করেন।

এরপর আলোচনা করতে হয় বাংলার আরেক লৌকিক দেবী ঢেলাই চণ্ডীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র তথা খেজুর গাছ সম্পর্কে।এই দেবী এবং পূজার কথা প্রথম প্রকাশ করলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়,১৯০২ সালে (রয়েল)এসিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গলের(part-III) জার্ণালে। পরবর্তীতে L S S O'Malley সাহেব তাঁর চব্বিশ পরগণা জেলার গেজেটিয়ারে লিখছেন,"A curious form of survival of tree worship. which still practised in the district (24 parganas) under the name of Dhelai Chandi, was discovered a few year ago by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri."(page 72)।শাস্ত্রী মহাশয় বর্ণিত চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তরাংশে নৈহাটি রেলস্টেশনের মাইল দুই দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে গোয়ালফটক পল্লী ছাড়াও,হালিশহর, কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহু পথের ধারেই দেখা যায় বিশেষ কোনও খেজুর গাছের পাদদেশে ঢেলাই চণ্ডীর নৈবেদ্য হিসেবে এক টুকরো ঢেলা বা ইঁট সেই বৃক্ষের তলায় ছুঁড়ে দিয়ে সভক্তিতে প্রণাম করতে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেন কিংবা কাঁদুনে সন্তানদের কান্না থামিয়ে দেন ঢেলাই চণ্ডী দেবী।

কত বিচিত্র গাছকে যে বাঙালি কত বিচিত্র দেবদেবীর প্রতীক রূপে পূজা করে তার অন্ত নেই।যেমন শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও রক্ষাকল্পে এবং অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্ত অঞ্চলে করম বা কদম গাছের ডাল প্রতীকে ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন করম রাজার পূজা হয়। আদিবাসীদের কৃষিকেন্দ্রিক এই লোকোৎসবে করম রাজার উদ্দেশে ছড়া কেটে কিশোরীরা বলে-

'আয়রে করম রাজা হাথি চাপি আয়।

---

https://www.anandabazar.com/editorial/traditional-bird-catchers-are-less-in-numbers-in-bardhaman-1.927016

আয়রে করমরানি ঘোড়া চাপি আয়।।'

বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানে দেখা যায় মেয়েরা সন্তানের মঙ্গল কামনায় বনদুর্গা ও বুড়ি ঠাকুরণী পূজা করছেন সেওড়া গাছের পাদদেশে ।সেওড়া গাছে ভূত ও অশুভ আত্মা অবস্থান করে, এই বিশ্বাসের জন্যও লোকে ভয়ে শ্যাওড়া গাছের পূজা করে।

শ্যাওড়া গাছকে আবার ভূতবাবা নামক এক বিচিত্র লোকদেবতার প্রতীকে পুজো করতে দেখা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থানার বিশিষ্ট লোকদেবতা হলেন ভূতবাবা বা 'ভূতেশ্বরবাবা'। আদিগঙ্গার তীরে শুলিপোতা (কৃষ্ণমোহন রেলস্টেশনের নিকটে) রেলগেটের কাছে 'ভূতবাবা-র' থানটি অবস্থিত।এটি স্থানীয়দের ভাষায় ছোটকাছারী নামে পরিচিত, অন্যদিকে ভূতবাবার বড়কাছারীটি অবস্থিত বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ঝিকুরবেড়িয়া গ্রামে। বাৎসরিক ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে যেকোন শনিবার ধরে কিংবা প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত পুজো হয় এই ভূতবাবার।বাবার পুজোর উপকরণে থাকে শোলমাছ , মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, বাতাসা ও ফলমূল।স্থানীয়দের বিশ্বাস 'ঘাড়ে লাগা ' বা 'ঘাড়ে খটকা 'লাগার মতো ব্যাথা ইত্যাদি সেরে যায় ভূতবাবার কাছে মানত করলে।এছাড়া রিকেট রোগী, শিশুর সুস্থতার জন্য মানত পূজা হয়। এই দেবতার সাথে বাংলাদেশের অজ পল্লী অঞ্চলের এক বিচিত্র এবং ভয়াবহ আকৃতির লৌকিক দেবতা পাঁচুঠাকুরের মিল পাওয়া যায়।যাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই মারা যায় বা যাদের সন্তান শৈশবকালে রিকেটস্(প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই রোগকে বলে পেঁচোয় ধরা,বা পুঁয়ে পাওয়া) রোগের শিকার হয়,সেই সমস্ত বাপ মা এই দেবতার শরণ নেন।পেঁচোপাঁচী বা পাঁচুঠাকুর শিশুরক্ষক ও শিশুমারী দেবতারূপে ভয় ও ভক্তিতে সেবিত হন।সাধারণত এই দেবতার থান নির্মিত হয় একগোড়ায় সৃষ্ট তাল ও খেজুর গাছের তলে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই দেবতার বাসস্থান আসলে তালগাছ।

কুল গাছও পূজিত হয় বঙ্গদেশে। ক্ষেত্রঠাকুরের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক। বাংলাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে এ জাতীয় বিশ্বাস বর্তমান যে ক্ষেত্রঠাকুর বা ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কুল গাছ,যদিও এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল,গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১-এ কাশীরাম দাসের জন্মস্থান হিসেবে খ্যাত সিঙ্গি গ্রাম ভ্রমণকালে দেখি,সেই গ্রামের উত্তর-পূর্বভাগে একটি প্রাচীন ও বিশাল বটবৃক্ষতলে পূজিত হচ্ছে ক্ষেত্রপাল ঠাকুর।সেখানে কোনও বিগ্রহ নেই, পুজো হয় ঘটে ও যন্ত্রে। গ্রামের শৌণ্ড্রিক সম্প্রদায় সেখানকার সেবাইত ও পূজারী।সিঙ্গি গ্রামের ক্ষেত্রপালতলার বর্তমান সেবাইত এবং পূজারী অভিজিৎ সাহার কাছে জানতে পারলাম, সিঙ্গি গ্রামের ক্ষেত্রপাল শিশুরক্ষক শাসন দেবতা হিসেবে পূজিত।তিনি আরও বলেন,প্রত্যেক বৎসর আষাঢ় মাসে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে ষোড়শোপচারে ক্ষেত্রপালের পূজা বেশ জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।আর বলিদান হল এই পুজোর অন্যতম অঙ্গ। তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব বইতে

অবশ্য ক্ষেত্রপালের এ জাতীয় পূজার উল্লেখ আছে,"...গ্রাম্য লোকেরা জীব বলি দিয়ে পাথর পূজা করে...গাছতলায় ক্ষেত্রপাল অর্চনা করে..."[20]।

এছাড়াও শাল গাছ প্রতীকে ইঁদ পূজা সীমান্ত বাংলায় অর্থাৎ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় এবং বীরভূম ও বর্ধমানের বেশ কিছু অঞ্চলে সুপ্রচলিত। করম পূজার পরের দিন অর্থাৎ ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বন থেকে দু'তিনটি শাল গাছ কেটে এনে তাকে কোনও মাঠের (এই মাঠকে বলা হয় ইঁদকুড়ির মাঠ) একটি বিশেষ স্থানে পোঁতা হয়। এরপর সবচেয়ে বড় শালগাছটির মাথায় কাপড়ে জড়ানো একটি বড় ঝুড়ি ঝোলানো হয়। এই গাছটিকে ইঁদ বলা হয়,যাকে ইন্দ্রের প্রতীক কল্পনায় পূজা করা হয়।অপর গাছগুলিকে মাসির প্রতীক হিসেবে পূজিতা হয়।

এ জাতীয় আরেকধরণের পরব লক্ষিত হয় বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুড়িয়া থানার দামোদরপুর, প্রতিহারপুর প্রভৃতি গ্রামে,সেখানে ভাদ্রমাসের শুক্লা দশমী তিথিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা ছাতা পরব অনুষ্ঠান উদযাপন করেন।শালখুঁটি পুঁতে তার উপর ছাতা লাগিয়ে তারা তাদের দেবতা বোঙার পুজো করে। বৃহৎসংহিতা, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তবে এ কথা বলা ভারী শক্ত, যে সাঁওতালরা হিন্দুদের থেকে এই উৎসব গ্রহণ করেছে নাকি হিন্দুরা সাঁওতালদের থেকে এই উৎসব নিয়েছে। তবে এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে,আদিম যূথবদ্ধ সমাজের শত্রুবিজয়ের জন্য জাদুভিত্তিক অনুষ্ঠানে বিশাল বৃক্ষপূজাই কালক্রমে শত্রুত্থান বা ইন্দ্রধ্বজোৎসবের রূপ নিয়েছে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন বাস্তু দেবতার প্রতীক হিসেবে বাঁশ গাছ পূজিত হয়।এটি মূলত রাজবংশীদের পুজো।উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের রাজবংশি সমাজে বাঁশকে কেন্দ্র করে অন্তত তিন ধরনের পূজা প্রচলিত আছে তার হল- মদনকাম, গারাম ও বাহুস্ত (বাস্তু)। এছাড়াও মালদা অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত চলা গম্ভীরা পূজায় বাঁশ পূজিত হয়।

হিন্দু ধর্মে দূর্বা ঘাস, কলা গাছ, তুলসী গাছ প্রভৃতির গুরুত্ব যে অপরিসীম, সে কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

আমাদের মনে রাখা উচিত, বৃক্ষ পূজা বলতে শুধু কোন বৃহৎ গাছকে পূজা করা বোঝায় না। বৃহত্তর অর্থে শস্য ও যে কোন উদ্ভিদকেও বোঝায় । বাংলাদেশের ধান্য উপাসনা (Paddy Cult) বা ফসল কাটার অনুষ্ঠান ও পূজা (Harvest Festival) তাও বস্তুত বৃক্ষ পূজারই অন্তর্গত।সে সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ পাইনি, পরবর্তীতে এ নিয়ে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গ্রাম বাংলায় লৌকিক দেবদেবীর অন্ত নেই, তাদের মধ্যে থেকেই বৃক্ষকেন্দ্রিক কয়েকটি লোকদেবদেবী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে সমর্থ হলাম মাত্র। গ্রামের

20 (বসু, ১৯৭৮, p. ১৮৫)

পথে-ঘাটে, বিশাল প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে অথবা জটাজুটধারী বটবৃক্ষতলে গ্রামীণ দেবদেবী আসন পেতেছেন। পুরাণবর্ণিত দেবদেবীর তালিকায় এঁদের অনেককে দেখতে পাওয়া যাবে না, আবার কেউবা সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত, কেউবা হিন্দুসমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন।

এ কথা বলেই এই প্রবন্ধের পতন করব যে লৌকিক দেবদেবীর উৎস, এদের পূজাপদ্ধতি অথবা এদের মাহাত্ম্য বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য এই লৌকিক দেবদেবীর অধিষ্ঠান সেই লোকজীবনের কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করে লৌকিক দেবদেবীর আলোচনার প্রয়োজন আরও বিশেষ ভাবে। লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণের সার্বিক পর্যালোচনা এবং অভ্যন্তরীণ গতিবিধি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনজীবনের মূলগত তাৎপর্য বহুলাংশে উদ্ঘাটিত হতে পারে। গ্রামীণ মানুষের জীবনচর্যার একটা বিশেষ দিক এর সাহায্যে প্রতিফলিত হওয়ার বিশেষ একটা সুযোগ রয়েছে।

Bibliography

Choudhury, J. (2012, JUNE). Tree Worship Tradition in India and Origin of Jagannath Cult. *Odisha Review*(Lecturer in History,Shree Jagannath College, Kaipadar, Khurda.JUNE 2012), 55-57.

Krapf , J. L. (1968). *Travels, researches, and missionary labors during an eighteen years' residence in Eastern Africa : together with journeys to Jagga, Usambara, Ukambani, Shoa, Abessinia and Khartum, and a coasting voyage from Mombaz to Cape Delgado* (2nd ed.). LONDON: FRANK CASS & CO. LTD.

Marshall, J. H. (1931). *Mohenjo Daro and the Indus Civilization* (Vol. I:TEXT). 41 GREAT RUSSELL STREET,LONDON: ARTHUR PROBSTHAIN.

বসু, গ. (১৯৭৮). *বাংলার লৌকিক দেবতা* (১ম দে'জ সংস্করণ ed.). কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

Benthall, A. P. (1946). *TREES OF CALCUTTA AND ITS NEIGHBOURHOOD.* Calcutta: THACKER SPINK & CO. LTD.

FRAZER, J. G. (1894). *THE GOLDEN BOUGH:A STUDY IN COMPARATIVE RELIGION* (Vol. I). NEW YORK, LONDON: MACMILLAN & CO.

MACKAY, E. J. (1938). *FURTHER EXCAVATIONS AT MOHENJO-DARO* (Vol. I : TEXT). DELHI: THE MANAGER OF PUBLICATIONS.

Maity, P. K. (APRIL,1966). *Historical Studies In The Cult Of The Goddess Manasa (A SOCIO CULTURAL STUDIY)* (1st ed.). CALCUTTA: PUNTHI PUSTAK.

MITRA, S. C. (1931, JULY). Studies in Plant-Myth. No. XIII. *Quarterly journal of the Mythic society vol.22*(VOL:XXII,NO.1).

PILLAI, V. G. (1948). *TREE WORSHIP AND OPHIOLATRY.* CHIDAMBARAM, TAMIL NADU: ANNAMALAI UNIVERSITY PUBLICATION.

SAHAY, K. N. (1960). TREE CULT IN TRIBAL CULTURE. In S. SENGUPTA (Ed.), *TREE SYMBOL WORSHIP IN INDIA:A NEW SURVEY OF A PATTERN OF FOLK-RELIGION* (pp. 58-75). CALCUTTA, WEST BENGAL: INDIAN PUBLICATIONS.

চক্রবর্ত্তি, ম. (১৯২১). *কবিকঙ্কণ চণ্ডী (সচিত্র)* (২য় ed.). এলাহবাদ: ইণ্ডিয়াণ প্রেস লিমিটেড.

মাইতি, প. (মাঘ ১৪২১,জানু.২০১৫). বাঙালির বৃক্ষপূজা. In স. ভৌমিক (Ed.), *ধর্মবিশ্বাস বৃক্ষপূজা দেবদেবী* (১ম টেরাকোটা সংস্করণ ed., pp. ২৯-৫১). তিলবাড়ি, বিষ্ণুপুর,বাঁকুড়া: টেরাকোটা.

মিত্র, অ. (১৩৮১, ভাদ্র). লৌকিক বিধিনিষেধ. (আ. সেনগুপ্ত, Ed.) *সমকালীন*(দ্বাবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা), ১৮৭-৯১.

রায়, ন. (১৪২০). *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)* (অষ্টম ed.). কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

সেনগুপ্ত, প. (জুলাই,১৯৫৯). *পূজা-পার্বণের উৎসকথা* (১ম ed.). কলকাতা: পুস্তক বিপণি.

হারিয়ে যাচ্ছেন বর্ধমানের পাখমারেরা. (২০১৯ , জানুয়ারি ০৫,০৫:৩৫). *আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন.* Retrieved from https://www.anandabazar.com/editorial/traditional-bird-catchers-are-less-in-numbers-in-bardhaman-1.927016.

স্বাধীনোত্তর বাংলার তপশিলি সমাজ-শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে

রবি ঘোড়াই
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিগোপাল জানা
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিভাজন ও পরস্পরের মধ্যে নানা ভেদ রেখার চিত্র দেখা যায়। আদিম যুগের গোষ্ঠীপতি থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ, বণিক সম্প্রদায় সকলের পায়ের তলায় থেকেছে এই সমাজের তথাকথিত নিচু তোলার মানুষজন। অতীতে আর্য আগমন থেকে শুরু করে, সুলতানি-মোগল আমলে তুর্কো-আফগান জাতি এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে, নানা সময়ে শাসক ও শাসনব্যবস্থার রদবদল হলেও শাসকের হাতে শোষিতের বঞ্চনার তেমন কোনো হেরফের হয়নি। সমাজের সমস্ত রকম বঞ্চনা শিকার হয়ে যুগের পর যুগ কাটিয়ে যাচ্ছে, ন্যূনতম লেখাপড়া টুকু শেখা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষজন হলেন তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত। আধুনিক সমাজ উত্তরণের ইতিহাসে জাতিভেদ প্রথা একটি অমানবিক সামাজিক ব্যবস্থা। একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণের এই বিভাজনের পেছনে প্রধান কারণটি হল সামাজিকভাবে ভারতবর্ষ আজও একটি জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও আজও ভারতবর্ষ তথা বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ) ধর্ম, বর্ণ, ভাষাগত কারণে সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে রয়ে গিয়েছে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সুস্থ-সাংস্কৃতিক চর্চা চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছে। ফলে জাতপাতের সমস্যা দূর করা যাবে কিনা তা আজও প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সূচক শব্দ : ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, তপশিলি সম্প্রদায়, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা।

জাতি ব্যবস্থা (caste system) ও জাতপাত (casteism) বর্তমান ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষ হলো মূলত বহু ধর্মালম্বী, বহু ভাষাভাষী ও বহু

সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র। এই বৃহৎ দেশে বহুত্ব সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই আমাদের সমাজে রয়েছে শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক। একদিকে উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত বৃত্তশালী মালিক সম্প্রদায়, অন্যদিকে অশিক্ষিত বিত্তহীন খেটে খাওয়া বঞ্চিত মানুষ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরা অপমানিত এবং শোষিত হয়। এদের জীবন সমস্যা অতীত থেকে এখনোও পর্যন্ত বিদ্যমান। এই জীবন সংগ্রামের ক্রমান্বয়ে মানুষ সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে পড়েছে। এই সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হলো বেঁচে থাকার নীতি, যার দ্বারা মানুষ বেঁচে থাকার পন্থা গুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। তবে অতীত কাল থেকেই মহান ব্যক্তিরা এই নিচু তলার মানুষের কথা ভেবেছেন। চৈতন্যদেব মানব প্রেমের মন্ত্র দ্বারা সমস্ত জাতি ধর্মকে একসুত্রে বেঁধেছেন। চতুঃবর্নের মানুষদের জন্য বৌদ্ধধর্ম তার দরজা খুলে দিয়েছিল। সকলেই সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষু হতে পারতেন।[১]

ভারতে বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে আর্যদের আগমনের সময় অর্থাৎ আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতে মূলত অনার্য জাতিসমুহ বিশেষ করে নিগ্রিটো, মোঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীর (Racial community) অস্তিত্ব ছিল যারা বর্ণব্যবস্থার দ্বারা বিভাজিত সমাজে বসবাস করতেন না। কিন্তু আর্যগণ স্থানীয় (আদি ভারতীয়, আদিম জাতি বা উপজাতি- indigenous/ aboriginals/ tribals) সমাজের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করে আর্যসংস্কৃতির জয়পতাকা উড়ানোর পাশাপাশি আর্যরা মূলত তিনটি সামাজিকবর্গে বিভক্ত হয়ে যান - রাজন্য, ব্রাহ্মণ, কৃষক ও কারিগর শ্রেণী। প্রথম অংশ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হিসাবে 'রাজন্য' হিসাবে পরিচিত হয় যা ক্রমশ ক্ষত্রিয়বর্ণের আকার লাভ করে। দ্বিতীয় ভাগটি যাগযজ্ঞসহ বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কৃষিজীবী কারিগর বা অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা 'বৈশ্য বর্ণ' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অন্যদিকে আর্যদের দ্বারা পরাজিত কৃষ্ণবর্ণের সম্প্রদায়গুলো শূদ্র বর্ণে স্থান পায়। পেশার গুণগত মানের ভিত্তিতে অনেকেই আবার 'অবর্ণতে' বা 'অস্পৃশ্যতে' পরিণত হন।[২]

জাতি-চেতনার সূচনা হিসাবে সাধারণভাবে উপনিবেশিক শাসনকালে আদমশুমারির প্রচলন অর্থাৎ ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দকে চিহ্নিত করা হয়। কারণ এই সময় থেকেই ভারতীয় জনসমাজের শ্রেণীকরণের (Stratification) প্রধান সূচক হিসাবে 'জাতি' বা Caste প্রাধান্য পেতে শুরু করে। বিংশ শতকের প্রথমভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের নিম্নবর্ণের জাতিগুলির ক্ষেত্রে আরোও কয়েকটি নতুন পারিভাষিক শব্দের জন্ম দেয়, যেমন-'Depressed Caste' বা 'Depressed Class'। এই নামকরণ একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন (The Government of India Act, 1935) গৃহীত হওয়ার পর, ১৯৩৬ এর The Government of India (Scheduled Caste) Order এর মাধ্যমে। এখানে

Depressed Class বা Depressed Caste-এর পরিবর্তে Scheduled Caste বা (SC) তপশিলি জাতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[৩]আদমশুমারিগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে রাজবংশী, নমঃশূদ্র, বাগদি, পৌণ্ড্র (পোদ), বাউরি, মুচি এই কয়েকটি জাতি ছিল বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ তপশিলি জাতি। অন্যদিকে ধোবা, ডোম, হাড়ি, জেলিয়া কৈবর্ত্য, মালো, লোহার, মাল, শুঁড়ি, তিয়র; প্রভৃতি ছিল বাংলার মাঝারি মাপের তপশিলি জাতি। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- ভূইমালি, করেঙ্গা, কেয়ট, মাল্লা, রাজওয়ার, কাদার, বাহেলিয়া, বিন্দ, ভোক্তা, দোয়াই, ঘাসি, গোনড়ি; ইত্যাদি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির তালিকা

ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি	ক্র. স.	জাতি
১	বাগিদ, দুলে	১৬	দোয়াই	৩১	কাউর	৪৬	নমঃশুদ্র
২	বোহিলয়া	১৭	ডোম (ধাঙ্গর)	৩২	কেওট	৪৭	নট
৩	বাইটি	১৮	দোসাদ (দুসাদ, ধারি, ধাবরি)	৩৩	খৈরা	৪৮	নুনিয়া
৪	বাটনার	১৯	ঘাসি	৩৪	খটিক	৪৯	পালিয়া
৫	বাউরি	২০	গোনড়ি	৩৫	কোচ	৫০	পান (স্বয়াসি)
৬	বেলদার	২১	হালালখোর	৩৬	কোনাই	৫১	পাসি
৭	ভোগতা	২২	হাড়ি (মেতর, মেথর, ভাঙ্গি, বাল্মীকি)	৩৭	কোনো-ওয়ার	৫২	পাটনি

৮	ভুঁইমালি	২৩	জেলিয়া কৈর্বত্য	৩৮	কোটাল	৫৩	পোদ (পৌন্ড্রু)
৯	ভুঁইয়া	২৪	ঝালো মালো (আলো)	৩৯	কুরারিয়ার	৫৪	রাজবংশী
১০	বিন্দ	২৫	কাদার	৪০	লালবেগি	৫৫	রাজওয়ার
১১	চামার (চমর্কার, মোচ, মুচি, রবিদাস, ঋষি, রুইদাস)	২৬	কামি (নেপালি)	৪১	লোহার	৫৬	সার্কী (নেপালি)
১২	চৌপাল	২৭	কাঁদরা	৪২	মাল	৫৭	শুঁড়ি (সাহা বাদে)
১৩	দাবগার	২৮	কঞ্জর	৪৩	মাহার	৫৮	তিয়র
১৪	দামাই (নেপালি)	২৯	কাওড়া	৪৪	মাল্লা	৫৯	তুরি
১৫	ধোবা (ধোবি)	৩০	করেঙ্গা	৪৫	মুসাহার	৬০	চাই

তথ্যসূত্রঃ - https://socialjustice.gov.in/common/76750[৪]

সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে ব্যক্তি বা সমষ্টির অর্জিত আচরণ বা সংস্কার কে বোঝায়। সত্য, সুন্দর ও সৌন্দর্যের সাধনা করে থাকে সংস্কৃতি। সকলের সংস্কৃতি এক নয়, আলাদা। তাই এক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন হয়। একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিও আলাদা হয়ে থাকে। আর এই

সংস্কৃতি বিকাশে যেমন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনই মানব সমাজের উন্নতি ও বিবর্তনে শিক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে সনাতন শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে ক্রমান্বয়ে একাধিক আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে।[৫] কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক উত্তরণের অন্যতম একটা শর্ত হল শিক্ষার অগ্রগতি। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা সমাজের উচ্চবর্ণ বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কুক্ষিগত থাকায় এই শিক্ষা সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করতে পারেনি, বরং এটি শ্রেণীবিন্যাসকে আরও জটিল করে তুলেছিল।[৬] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সামান্য অধিকার প্রদান করা হলেও সমাজের বৃহৎ অংশের নিম্নবর্ণের মানুষে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।[৭] প্রাচীনকালের বিভিন্ন গ্রন্থে যে শিক্ষালাভের কথা জানা যায় তা মূলত ব্রাহ্মণ গুরুগৃহে উচ্চবর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা লাভের কথা। সেখানে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চজাতি কর্তৃক নিম্নজাতিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা বা তাঁদেরকে শিক্ষিত করার ঘটনা বিরল। কিন্তু কিছু বীরের নিদর্শন পাওয়া যায়,যারা নিজ প্রতিভাবলে বলিয়ান।যারা নিম্নবংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রতিটি পদে অবহেলিত, লাঞ্ছিত হয়েও অবশেষে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র এর একট অংশে শূদ্রদের বেদ শিক্ষার উল্লেখ রয়েছে।[৮] বিভিন্ন জাতক কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায় বস্ত্রকার, ধীবর প্রভৃতি শূদ্ররা শিক্ষা অর্জন করতে পারত।[৯] তেমনি আমরা কলহনের রাজতরঙ্গিণী-তে শূদ্রদের শিক্ষালাভের কথাও জানতে পারি। শূদ্র ধাত্রীর কাছে মানুষ হয়েও লেখাপড়া শিখে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে সমাজে শূদ্রদের লেখাপড়া শেখা স্বীকৃত ছিল।[১০]

ব্রিটিশ আমলে বাংলার উচ্চবর্ণের জমিদাররা সমাজে নিজেদের অবস্থানের নিরাপত্তার স্বার্থেই রাজভাষা ও সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলা ভাষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠা বা নিম্নবর্ণের মানুষের শিক্ষা প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না।[১১] তদানীন্তন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ টোল-পাঠশালাগুলি প্রধানত ব্রাহ্মণ ও অভিজাত জমিদার মহাজনদের পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত হত। শিক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টাগুলি সীমাবদ্ধ ছিল জমিদার, ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে, যারা নিজেদের আর্থিক প্রয়োজনে বৃত্তিগত শিক্ষা ধারা এবং পুরোহিত শ্রেণীর ধর্মীয় প্রয়োজনে শাস্ত্র শিক্ষা, মুসলিমদের মধ্যে আরবি স্কুলে কোরান পাঠ এবং কিছু সংখ্যক স্কুলে ফারসী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বর্ণের এবং অস্পৃশ্য জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষার আলো একেবারেই প্রবেশ করেনি। নিম্ন বর্ণের সমাজে শিক্ষার আলো না পৌঁছানোর কারণ হল - এই নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল অসম্ভব দরিদ্র, কৃষি, তাঁতী, জেলে, কুমার, কামার, প্রভৃতি পেশাভুক্ত। তাঁদের দরিদ্র জীবন যাপনের উপর জমিদার, মহাজনদের শোষণ, অত্যাচার তাঁদের নিস্ব ও রিক্ত করে তুলে

ছিল। জমিদার মহাজন যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে উন্নত তারা দরিদ্র কৃষকদের 'অধম' হিসাবে প্রতিপন্ন করতেন। কারণ তাঁরা হিসাব নিকাশ জানতো না, ঠিক সময়ে কর খাজনা দিতে পারতো না, নিজেদের জমি মহাজনদের কাছে বিক্রি করে দিতো, পাঁচ টাকা ঋণের জন্য সাতটাকা সুদ দিতো।[১২] অতিকষ্টে শ্রমদান ও বেগার খেটে বেঁচে থাকাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আর্থিক বোঝায় তারা সর্বদা জর্জরিত থাকত। প্রতিমাসে টাকায় চার আনা সুদ অর্থাৎ বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিনশো ভাগ ছিল একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।[১৩]

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্নের জাতি গুলি বর্ণবিন্যাস জনিত কারণে একদিকে যেমন উচ্চবর্ণের তুলনায় আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অন্যদিকে ভেদ বৈষম্যের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রেও অতি অনগ্রসর। ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে আজও পর্যন্ত নিম্নবর্ণের জাতি গুলির মধ্যে শিক্ষার বিষয়ে অনগ্রসতা চোখে পড়ে। অধিকাংশ দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টোল ও পাঠশালা গুলি ব্রাহ্মণগুরুদের দ্বারা চালিত হত এবং উচ্চ বর্ণের ছাত্রদের পাঠগ্রহনে একাধিকত্ব ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্ণকাঠামো জনিত ধর্মীয় শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় শাস্ত্র গ্রন্থ ও ন্যায়দর্শন শিক্ষাদান করা হত, যেখানে নিম্ন বর্ণের মানুষদের কদাচিৎ প্রবেশাধিকার ছিল।[১৪]২০০১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার ছিল ৫৫.৯ শতাংশ। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও তপশিলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। মেদিনীপুর, বীরভূম এবং পুরুলিয়া জেলাতে কিছু প্রান্তিক বিদ্যালয়ে নিম্ন বর্ণের ছাত্রছাত্রীদের জোরপূর্বক শ্রেণীকক্ষে আলাদা করে বসানো হয়। [১৫] তেমনি ঝাড়গ্রাম মহকুমার রোহিণী গ্রামে শিক্ষকরাই নিম্ন বর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি থেকে মাদুর আনতে বলেন।[১৬] এমনকি ওই ছাত্ররা কোন বিষয় বুঝতে না পারলে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষকরা তাদের বোঝাতে চান না। চুণী কোটালের ভাষায় - একটু কোথাও ভুল হলে ওদের ছেলেমেয়েদের গায়ে মাথায় হাত বুলাতেন, সেখানে আমাদের ভুল হলে পেতাম অকথ্য বেতের ঘা, বলতেন ভদ্র হবি বলে স্কুলে এসেছিস আর পড়াশোনা করতে পারিসনি।[১৭] রোহিনিতে বসবাসকারী তপশিলি সম্প্রদায় বিশেষ করে ডোম, হাড়ি ইত্যাদি নিম্ন বর্ণের লোকেদের পাড়ার বাইরে যেতে হলে তাদেরকে গলায় ঘন্টা গড়তে হত, যাতে উচ্চবর্ণের লোকেরা আগে থেকে সতর্ক হয়ে যায়। তাদের সংস্পর্শে এলে ব্রাহ্মনসহ অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকেদের শুদ্ধস্নান আবশ্যিক ছিল, কেননা অস্পৃশ্য নিম্ন বর্ণের লোকেদের দর্শন করা তাদের পক্ষে অমঙ্গল স্বরূপ ছিল। তাদের কাছ থেকে উচ্চবর্ণের লোকেরা জল গ্রহণ করত না, এমনকি নপিতরাও তাদের চুল দাড়ি কাটতে অস্বীকার করত। [১৮] শুধু তাই নয়, বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর জেলাগুলিতে বিভিন্ন গ্রামে যে কোন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের আগে মোড়ল বা গ্রাম প্রধান সভা ডাকতেন। সেখানে অনুষ্ঠানের যাবতীয় বিষয় আলোচনা হত। এই আলোচনাতেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দায়িত্ব একাধিক মানুষের মধ্যে

ভাগ করে দেওয়া হত, গ্রামের মোড়লই জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সভা ডেকে সকলের সামনে বয়স্ক ব্যক্তিদের মতামত নিয়ে বিচার করতেন কিন্তু উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা প্রান্তিক শ্রেণীর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের যোগ সাধনের কথা অস্বীকার করেন।[১৯]

ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত উচ্চবর্ণের মানুষের জন্য ছিল। তপশিলি জাতি ও উপজাতি (SC/ST) এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বহির্ভূত ছিল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, ফলে তপশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। স্বাধীনতার পরে, ভারতের সরকার শিক্ষাকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করে। সংবিধান প্রণয়নের সময় তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ সংরক্ষণ এবং শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। এই উদ্যোগগুলি পশ্চিমবঙ্গেও প্রভাব ফেলেছে, যা তপশিলি সমাজের শিক্ষার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতের সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতির উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আর্টিকল ৪৬ এই ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র তপশিলি জাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষ যত্ন নেবে। এটি বিশেষভাবে তাদের প্রতি বৈষম্য রোধ এবং শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আর্টিকল ১৫(৪) এই ধারা তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য শিক্ষায় বিশেষ বিধান রাখার ক্ষমতা প্রদান করে, যা তাদের শিক্ষার প্রসারে সহায়ক হয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তপশিলি সমাজের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগ নিম্নরূপ:

1. সার্বিক শিক্ষা অভিযান (Sarva Shiksha Abhiyan - SSA): সার্বিক শিক্ষা অভিযান একটি কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প, যার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সার্বজনীন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তপশিলি সমাজের শিশুদের জন্য স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নীত হয়েছে।
2. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিমান (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan - RMSA): মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারে এই প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, এবং বিশেষ পাঠ্যক্রম গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করেছে।

3. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্কলারশিপ প্রোগ্রাম; তপশিলি সমাজের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, যেমন প্রাক-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ। এর ফলে শিক্ষার্থীরা আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারছে।
4. আদিবাসী এলাকার জন্য বিশেষ স্কুল ও হোস্টেল: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ আবাসিক বিদ্যালয় এবং হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি তপশিলি সমাজের শিক্ষার্থীদের প্রথাগত পরিবেশ থেকে বের করে এনে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।[২০]

স্বাধীনোত্তর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষায় তপশিলি সমাজের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুলে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মিড-ডে মিল প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা তপশিলি সমাজের শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং স্কুলছুটের হার কমাতে নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলে তাদের উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু বাধা থাকলেও বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে অগ্রগতি ঘটেছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ড্রপআউটের হার কমানোর জন্য স্কুলগুলিতে পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়েছে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। [২১]

তপশিলি জাতি ও উপজাতির শিক্ষার্থীরা বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের জন্য আগ্রহী। সংরক্ষিত আসন এবং স্কলারশিপের ফলে তারা পেশাগত শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত পাঠ্যক্রম গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। [২২]

তপশিলি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়। অনেক শিশু তাদের পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে প্রায়শই স্কুল ছেড়ে দেয়.দুর্বল অবকাঠামো এবং শিক্ষার মানের অভাবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় আগ্রহ হারায়। অনেক গ্রামীন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক এবং শিক্ষার সরঞ্জামের অভাব রয়েছে, যা শিক্ষার মান নিম্নগামী করে। তপশিলি সমাজের শিক্ষার্থীদের জন্য আরও বেশি স্কলারশিপ এবং অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে তারা শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে। সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বৈষম্যহীন শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, এবং পেশাগত শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।[২৩] শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং স্কুল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো যেতে পারে। স্বাধীনোত্তর বাংলায় তপশিলি সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তবে এখনও অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে। সমাজের শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং শিক্ষায় সাম্য নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সংস্থাগুলোরও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

তপশিলি সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিতে প্রাকৃতিক উপাসনার প্রাধান্য রয়েছে। বন, নদী, পাহাড়, এবং গাছপালা তাদের কাছে পবিত্র। তাদের মধ্যে জাদু-টোনা, ভূত-প্রেত, এবং আত্মার পূজা প্রচলিত। কিছু তপশিলি সম্প্রদায়ে ভূত পূজার প্রচলন আছে। তারা বিশ্বাস করে যে, প্রাকৃতিক শক্তি এবং আত্মারা তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য তারা নিয়মিত আত্মা পূজা করে এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে যাতে আত্মারা সন্তুষ্ট থাকে।[২৪] তপশিলি সমাজের গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি গ্রামেই গ্রাম দেবতা থাকেন, যাঁকে গ্রামের সমস্ত মানুষ পূজা করে। এই দেবতার পূজার সঙ্গে তাদের কৃষি, মৎস্য, এবং অন্যান্য জীবিকা সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানগুলি জড়িত। তপশিলি সমাজের উৎসব ও পার্বণ তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বড় অংশ।[২৫] এই উৎসবগুলি সাধারণত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কৃষিকাজের সময়, ফসল তোলার সময় অথবা বর্ষা মৌসুমে উদযাপন করা হয়। সোহরাই উৎসব মূলত সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত একটি বিখ্যাত উৎসব, যা ফসল কাটার শেষে উদযাপন করা হয়। এই উৎসবে গ্রামের প্রতিটি পরিবার তাদের গরু এবং অন্যান্য পশুদের সম্মান জানায় এবং ঘরবাড়ি সাজায়।[২৬] উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু তপশিলি সমাজের মধ্যে বাঁশফল উৎসব উদযাপন করা হয়, যেখানে বাঁশের ফুল ফোটার সময় এই উৎসব পালন করা হয়। এটি একটি ঋতু পরিবর্তনের উৎসব এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতীক।[২৭]

তপশিলি সমাজের লোকশিল্প এবং হস্তশিল্প তাদের ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শিল্পকর্মগুলি তাদের জীবনযাত্রার একটি অধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি সমাজের মধ্যে পটচিত্র খুবই জনপ্রিয়। পটুয়ারা মাটির বা কাগজের উপর চিত্রাঙ্কন করেন এবং সেই চিত্রের মাধ্যমে পুরাণের কাহিনি, সমাজের ঘটনাবলি এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এই চিত্রগুলি সাধারণত গ্রামীণ উৎসব ও পার্বণে প্রদর্শিত হয়।[২৮] দোকরা শিল্প তপশিলি সমাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতব কাজ, যা ঐতিহ্যবাহী মোম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এই ধাতব কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন মূর্তি, গৃহস্থালির সামগ্রী এবং অলংকার তৈরি করা হয়, যা তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[২৯]

তপশিলি সমাজের গান ও নৃত্য তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অংশ। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, প্রকৃতি, এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিফলন গান এবং নাচের মাধ্যমে প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি সমাজের মধ্যে ভাদু গান বিশেষভাবে প্রচলিত, যা মূলত ভাদ্র মাসে ফসল তোলার সময় গাওয়া হয়। এই গানগুলিতে তাদের দুঃখ-কষ্ট, আশা, আকালঙ্কা এবং আনন্দ প্রকাশ পায়।[৩০] পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া অঞ্চলের তপশিলি সমাজের মধ্যে ছৌ নৃত্য বিশেষভাবে পরিচিত। এই নৃত্যটি মূলত মুখোশ পরিধান করে এবং মহাকাব্যের গল্প, ধর্মীয় কাহিনি, এবং লোককথা পরিবেশন করা হয়।[৩১]

তপশিলি সমাজের সামাজিক কাঠামো সাধারণত গোষ্ঠী ভিত্তিক, যেখানে পরিবার, গোত্র, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে। পঞ্চায়েত এই কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তপশিলি সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীভুক্ত সম্পর্কগুলি অনেকটাই আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভিত্তিতে তৈরি হয়। গোত্রের প্রধানরা সমাজের নীতি-নৈতিকতা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করে।[৩২] পঞ্চায়েত তপশিলি সমাজের মধ্যে একটি প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তগুলি সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। এটি সামাজিক সুরক্ষা, বিবাহের ব্যবস্থা, এবং বিবাদ সমাধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩৩]

আধুনিক সমাজের সঙ্গে তপশিলি সমাজের সাংস্কৃতিক সংকট বাড়ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রথাগত রীতিনীতি এবং সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ কমছে। শিক্ষার প্রসার এবং শহুরে জীবনের সঙ্গে সংযোগের ফলে তাদের প্রথাগত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষা এবং মিডিয়ার প্রভাবের কারণে তপশিলি সমাজের মধ্যে প্রথাগত সংস্কৃতির পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক মিডিয়ার প্রভাবের কারণে তপশিলি সমাজের মধ্যে অধিকারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা তাদের প্রথাগত সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য নানা আন্দোলন এবং উদ্যোগ গ্রহণ করছে।[৩৪] তপশিলি সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা, মিডিয়া, এবং প্রযুক্তির প্রভাব বাড়ছে, যা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন পরিবর্তন আনছে। তবে, এই পরিবর্তনগুলি অনেক সময় তাদের প্রথাগত সংস্কৃতি এবং সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে। তপশিলি সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। শিক্ষার মাধ্যমে তারা আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে এবং তাদের প্রথাগত সামাজিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।[৩৫]

পরিশেষে বলা যায় স্বাধীনোত্তর বাংলায় তপশিলি সমাজের সংস্কৃতি একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা তাদের ঐতিহ্য, সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, লোকশিল্প, এবং আধুনিক প্রভাবের মিশ্রণে গঠিত হয়েছে। এই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে একটি স্পষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা

যায়। তপশিলি সমাজের সংস্কৃতি প্রধানত তাদের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকশিল্প, এবং সামাজিক রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, এবং লোকসংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে প্রথাগত বিশ্বাস এবং সামাজিক বন্ধন প্রতিফলিত হয়। এই প্রথাগত সংস্কৃতি তাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ এবং এটি তাদের আত্মপরিচয়ের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনোত্তর কালে শিক্ষার প্রসার, আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের আগমন, এবং শহুরে জীবনের সঙ্গে সংযোগের ফলে তপশিলি সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে তারা নতুন ধারনা এবং জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, যা তাদের প্রথাগত সংস্কৃতি এবং সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনছে। যদিও আধুনিকতা তাদের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়ক, তবে এটি তাদের প্রথাগত সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং সংস্কৃতিক সংকটও সৃষ্টি করছে। স্বাধীনোত্তর বাংলার তপশিলি সমাজের সংস্কৃতি একদিকে তাদের ঐতিহ্যগত রীতি-নীতির ধারাবাহিকতা এবং অন্যদিকে আধুনিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। যদিও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে তাদের সংস্কৃতির মূল সুরকে ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে তপশিলি সমাজের সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তাদের আত্মপরিচয় এবং সামাজিক অবস্থানকে আরও মজবুত করবে।

তথ্যসূত্র:

১. শর্মা, রামশরণ, প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯,পৃ. ১৩৫.

২. The Government of India Scheduled Caste Order, 1936, At the Court at Buckingham Palace, The 30 day of April 1936.

৩. Singh, Ekta Caste System in India: A Historical Perspective, (Delhi, Kalpaz Publications, 2005), p.p 34-36,100.

৪. https://socialjustice.gov.in/common/76750.

৫. হোসেন মোহ জাহাঙ্গীর, অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৮৬-১৯৪৭) গতিধারা, ঢাকা, ১৪১৫, পৃ. ২৫১।

৬. কি এফ.ই.এ., হিস্ট্রি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, এস, চাঁদ অ্যান্ড কোং, নিউ দিল্লি, ১১৭০, পৃ. ১২।

৭. সুর অতুল, বাংলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.৩২।

৮. শর্মা রামশরণ, প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কে.পি, বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.১২৩।
৯. শর্মা রামশরণ, প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কে.পি,বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ.১২৪।
১০. স্টেইন এম.এ., কলহনস রাজতরঙ্গিনী, মতিলাল বানারসীদাস, ভালুম ১, বারানসী, ১৯৬১, পৃ. ১৯৬।
১১. আচার্য পরমেশ, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা,অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৮৫।
১২. হালদার, মহানন্দ 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' প্রথম সংস্করণ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ওড়াকান্দি, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ১০০।
১৩. গুহ, রনজিৎ, 'একটি সুরের কাহিনী' ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পাদিত) "নিম্নবর্গের ইতিহাস," আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮ পৃষ্ণ-৮৩-৮৪।
১৪. Chand, Tara History of Freedom Movement in India' Vol I, Patiala House, Delhi, 1961, P.-97-98.
১৫. ঘোষ শাশ্বতী, 'মেয়েদের কাজ। ক্ষমতার অন্য নাম?, যোজনা ধনধান্যে, মার্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯।
১৬. দ্য স্টেটসম্যান, কলকাতা, ১১ নভেম্বর, ২০০১।
১৭. কোটাল চুনী, 'আত্মকথা; আমার জীবন', বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ (সম্পাদিত), দলিতের আখ্যানবৃত্ত, মৃত্তিকা, কলকাতা, ২০১০, ৭, ১৩৫।
১৮. সেন শুচিব্রত, 'বীরভূমের অতীত ও বর্তমান সমাজচিত্র; সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা', পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম জেলাসংখ্যা, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১১১।
১৯. ওয়াইজ জেমস, দ্য রেস কাস্ট অ্যান্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ, অনুবাদ, ফজলুল করিম, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ভলিউম ২, ঢাকা, ২০০০, পৃ.পৃ. ২৩-১৪।
২০. National Sample Survey Organisation (NSSO), "Education in India: National Report 2011," Government of India.
২১. Ministry of Human Resource Development (MHRD), "Educational Statistics at a Glance 2019,"Government of India.
২২. University Grants Commission (UGC), "Annual Report 2017-18," Government of India.
২৩. "Caste, Class and Education in West Bengal: A Historical Overview," "Journal of Social Inclusion Studies, 2020.

২৪. Dube, S. C. Indian Village. Routledge, 1955, p.55.

২৫. Roy, Sarat Chandra. The Oraons of Chotanagpur. Asia Publishing House, 1960, p. 106

২৬. Sinha, Surajit. Culture Change in Tribal Bihar. Mouton, 1965.p.85.

২৭. Majumdar, D. N. Himalayan Polyandry. Asia Publishing House, 1962, p. 198.

২৮. McCutchion, David. The Patuas of Bengal. Firma KLM, 1983, p. 37.

২৯. R. N. Tribal Art and Crafts of West Bengal. Indian Museum, 1987, p. 62.

৩০. Gupta, Shankar Prosad. Folk Songs of West Bengal. Visva-Bharati, 1980, p. 123.

৩১. Sanyal, Hitesranjan. The Social Mobility in Bengal. Papyrus, 1981, p. 112.

৩২. Majumdar, R. C. The Tribes of India. Bharatiya Vidya Bhavan, 1955, p. 234.

৩৩. Bose, Nirmal Kumar. The Structure of Hindu Society. Orient Longman, 1975, p. 58.

৩৪. Bhowmik, S. K. Tribal Culture in West Bengal. Seagull Books, 1990, p. 119.

৩৫. Guha, Ramachandra. The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya. University of California Press, 1989, p. 144.

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের দার্শনিকতা : সৌন্দর্যবোধ ও বিশ্বসত্য সম্পর্কে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সেখ সামিম আলি
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: এক কথায় রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বলতে বুঝতেন পরম সংগতির আদর্শকে। তিনি মনে করতেন খন্ড খন্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে যদি আমরা কোনও বস্তুর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করি তবে তা সৌন্দর্যের অনেক দোষে দুষ্ট হতে পারে। সৌন্দর্য একটা মানব মন সাপেক্ষ আপেক্ষিক বিষয়। আর যাই হোক রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ বস্তুগত নয়। কীটসের মতোই রবীন্দ্রনাথও চিরন্তন সৌন্দর্যে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর কাব্যকলায় সৌন্দর্যের যে মানসী প্রতিমা গড়েছিলেন তা চিরন্তন নিরুদ্দেশগামী সত্যের পথের অভিযাত্রী। তিনি বিশ্বাস করেন মানব-প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য সহজে দেখা যায় না। অনেক সময় গুণের উপরও সৌন্দর্য নির্ভর করে। একটি মানুষের রূপকেন্দ্রিক যে সৌন্দর্য তা কিন্তু মানুষটির সামগ্রিক সৌন্দর্যকে ডিফাইন করতে পারে না। মানুষটির সামগ্রিক জীবনচর্যার মধ্যে ভাবগতভাবে সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে। মানুষটির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সৌন্দর্য তা চিরন্তন সৌন্দর্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই যে সমস্ত বা বিশ্বপ্রকৃতি কে নিয়ে পরম সংগতির যে আদর্শ আমাদের মানসিকতাকে পূর্ণতা এনে দেয় রবীন্দ্রনাথ একেই সৌন্দর্য বলে অভিহিত করেন।

আর রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বসত্য হলো, বিশ্বমনের নিখুঁত অনুধাবন। সৌন্দর্য যেমন মানবমন সাপেক্ষ বিষয় অপরদিকে সত্য কিন্তু মানবমন সাপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। মানুষ থাক বা না থাক সত্যের অস্তিত্ব কিন্তু চিরন্তন। মানুষ বা কোনো প্রাণী যখন কোনো একটি বস্তুতে সৌন্দর্য অনুভবের আকাঙ্ক্ষা রাখে তখন সেটাই সৌন্দর্যের মানদণ্ড হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা ব্যক্তি বা বস্তুই সত্য কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যক্তি বা বস্তু খন্ড খন্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে সুন্দর নয়। কেননা, সৌন্দর্য পরম সঙ্গতির ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল।

সূচক শব্দ: সৌন্দর্যবোধ, বিশ্বসত্য, বিশ্বপ্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি, ভূমা, অখন্ড সত্তা, মন সাপেক্ষ, আপেক্ষিক, চিরন্তন, পরমসংগতি, বিশ্বরন ইত্যাদি।

মূল আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'সুন্দর' প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য বোধ সম্পর্কে বিস্তর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ কিন্তু মানবপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা সহজ নয় । কারণ তিনি অনুমান করছেন-

> "... কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে,আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি, মানব সংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই না !"[১]

আসলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে কোনও বিষয়বস্তুকে যদি টুকরো-টুকরো বা খণ্ড-খণ্ড করে দেখা হয় অর্থাৎ যুক্তিনির্ভর নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক বিষয়বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু বিরোধ ও বিকৃতি রয়েছে। সমগ্রতার মধ্যেই যে সৌন্দর্যের অবস্থান এ প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ স্বরূপ বলছেন:

> " ... এই যে আমাদের চোখের সামনেই ওই গাছটি ওই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে যদি আংশিক ভাবে দেখতে যায় তাহলে দেখতে পাবো এর মধ্যে কত গ্রন্থি কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে। ... কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা কিছু তুচ্ছ- যা কিছু ব্যর্থ-যা কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটা-ছাঁটা বেড়া দেওয়া গণ্ডি কাটা জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।"[২]

আসলে রবীন্দ্রনাথ এখানে সত্যকেই সৌন্দর্য বলছেন না, কিন্তু তিনি সৌন্দর্যকে সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেখছেন। শুধু তাই নয় সৌন্দর্যকে অখন্ড সত্তা হিসেবেই অনুমান করছেন। কেউ কেউ আবার খন্ড খন্ড বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য অনুভব করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মতে অখণ্ড সত্তার মধ্যেই সৌন্দর্য আছে। কিন্তু কেউ যদি কোনও খন্ডবস্তুর বিকৃতি ও বিরোধ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সার অংশটুকুর মধ্যে সৌন্দর্য অনুভব করে থাকেন তবে কি আমরা বলতে পারি যে এই মানুষটির মধ্যে সৌন্দর্যবোধ নেই ? অবশ্যই না । কারণ, মানুষের সৌন্দর্যবোধ একটা মানসিক বিষয়। আসলে কোনও বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব নেই। সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সাধারণত মানব মনেই আছে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুর মধ্যে যদি সৌন্দর্যের অস্তিত্ব থাকত তাহলে প্রত্যেকটা বস্তুকেই কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের সুন্দর মনে হতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। এক বস্তু একজনের ভালো লাগে তো অন্য আর একজনের ভালো লাগে না। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সৌন্দর্যবোধ বা সৌন্দর্যতত্ত্ব একটা মানব মন সাপেক্ষ আপেক্ষিক বিষয়। এ প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত 'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধটির এই নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য:

> "... যে তাজমহলের শুভ্র সমুজ্জ্বল মূর্তি রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল, অলডস হক্সলির বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা স্থাপত্য শিল্পের অজস্র দোষে দুষ্ট ।...বিচারের বৈপরীত্য প্রমাণ করছে যে তাজমহল স্বয়ং সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয় ।"[৩]

- এই মন্তব্য প্রমাণ করছে যে সৌন্দর্যবোধ আসলেই একটা মনোগত বা মন সাপেক্ষ বিষয়। এখানে তাজমহল সত্য হিসাবে অস্তিত্বশীল। তাহলে কি বলা যেতে পারে যে মানুষের মন না থাকলে সৌন্দর্যের কোনও অস্তিত্বই নেই ? এর উত্তর আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের একটি সংলাপচারিতা থেকে জানা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইনের মধ্যে কাপুথ-স্থ বাসভবনে ১৪ ই জুলাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বৈকালে একটা বিশেষ আলাপচারিতা হয়েছিল যেখানে সৌন্দর্য বিষয় সম্পর্কেও যে একটা তত্ত্ব উঠে এসেছিল তা প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

> "আইনস্টাইন: অর্থাৎ সত্য কিংবা সুন্দর মানব মন-নিরপেক্ষ নয় ?
>
> রবীন্দ্রনাথ: না ।
>
> আইনস্টাইন: যদি কোন মানুষের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে বেলভিডিয়ার-এর অ্যাপোলো আর সুন্দর থাকবে না ?
>
> রবীন্দ্রনাথ: না।
>
> আইনস্টাইন: সুন্দর সম্বন্ধে এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে নয় ।"[৪]

অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি আইনস্টাইনের সৌন্দর্যবোধ শুধুমাত্র মনোগত কিনা তা আমরা বলতে না পারলেও কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য বোধ যে বস্তুগত নয় তা আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। আইনস্টাইনের সৌন্দর্যবোধ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত যা আমাদেরকে এমন এক দার্শনিক স্তরে নিয়ে যায় যেখানে বোঝাতে চাওয়া হয় কোনো কিছু সত্য হওয়ার জন্য তার সৌন্দর্যের কোনো আবশ্যিকতা নেই। তিনি মনে করতেন মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে সৌন্দর্যের কোনো অর্থ হয় না। এ প্রসঙ্গে আমরাও বলতে পারি, যেকোনও প্রাণ বা মানুষের সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার কারণেই সেটা সৌন্দর্যের রূপ লাভ করে। মানুষের রুচি যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সৌন্দর্যবোধও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সত্য সম্পর্কে মানুষের রুচি নির্ভর করে না। সত্য সবসময় চিরন্তন , যার জন্ম ও মৃত্যু নেই। সৌন্দর্যের জন্মও আছে, আবার মৃত্যুও আছে। আমরা যদি মানুষের রূপ সৌন্দর্যের কথা বলি তা তো অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী একটা বিষয়। মানব দেহের মধ্যেই কঙ্কাল আছে, তাহলে কঙ্কালকে কি মানব দেহের থেকে বেশি সুন্দর বলা চলে ? আমরা একটা কঙ্কাল দেখে ভয় পাই, কিন্তু একটা মানুষ দেখে বলি, আহা! কী সুন্দর শিশুটি! চমৎকার ছেলেটি! কী সুন্দর মায়াবী মুখ মেয়েটির! ইত্যাদি। সৌন্দর্য কখনো চিরন্তন হতে পারে না। তাহলে যে মেয়েটি সুন্দর তার কখনো মৃত্যু হতো না। তাঁর রূপ যৌবনকে কখনো কবর দেওয়া যেতো না। কোনও কীটের ক্ষমতা থাকতো না

সৌন্দর্যকে আহার হিসাবে ভক্ষণ করার। কিন্তু সত্যকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, কারণ সত্য সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। মিথ্যেকে কখনো নিজের কাছে গোপন করা যায় না, একথার অর্থ হলো আমি যখন আমার বন্ধুকে একটা মিথ্যে কথা বলি, তখন বন্ধুর কাছে আমি সত্য গোপন করলেও নিজের কাছে মিথ্যে গোপন করবার কোনো উপায় নেই, অন্যের কাছে মিথ্যে বলা একটা মায়া বা বিভ্রম। যেমন ধরুন, পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা পৃথিবীর এই ঘূর্ণন প্রক্রিয়াটি সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না। বিজ্ঞানের মত অনুযায়ী এর কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবী যেমন ঘুরছে এটা সত্য, তেমন ভাবেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য পৃথিবীতে থাকা মানুষজনের পৃথিবীর এই ঘূর্ণন দেখতে না পাওয়াটাও সত্য। অতএব সত্য বিভিন্ন ভাবে থাকলেও সত্যের অবস্থান ধ্রুবক। আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন আমরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করি সূর্যের উদয়কে। কিন্তু সূর্যের এই উদয় সকলের কাছে সুন্দর রূপে ধরা দেয় না । সূর্যের উদয় যখন মনোরম হয় তখন সূর্যকে সুন্দর মনে হয়, আবার সূর্যের উদয় যখন তীব্রতর হয় তখন সেই সূর্যকেই অসুন্দর মনে হয়। আসলে কোনও কিছুর গুণের ওপরেও সৌন্দর্য নির্ভর করে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যবোধকে পুরোপুরি মনোগতও বলা যাবে না, আবার বস্তুগতও বলা যাবে না। কারণ তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে :

> "...সুন্দরের অধিষ্ঠান পরম সংগতির আদর্শের মধ্যে। সেই পরম সংগতির অধিষ্ঠান বিশ্বজনীন সত্তার মধ্যে। বিশ্বমনের নিখুঁত অনুধাবনই হচ্ছে সত্য। আমরা ব্যক্তি মানুষেরা ভুল করতে করতে, হোঁচট খেতে খেতে, আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আমাদের বিভাসিত চৈতন্যের মধ্য দিয়ে, সেই সত্যের অভিমুখে চলি- এছাড়া আর কোন পথে আমরা সত্যকে জানতে পারি ?"[৫]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ বিশ্বের পরম সংগতির আদর্শকেই নির্দেশ করছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ সত্য ও সুন্দরকে যে ইকুয়াল হিসাবে দেখছেন তা কিন্তু নয়। এ প্রসঙ্গেই বলি, ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি জন কিটস যিনি সত্য ও সুন্দরকে ইকুয়াল হিসেবেই দেখেছিলেন । এখানে সত্য ও সুন্দর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছি। তিনি Ode On a Grecian Urn নামক বিখ্যাত কবিতার শেষে সত্য ও সুন্দর সম্পর্কে বলছেন:

> "Beauty is truth, truth is beauty, - that is all
> Ye know on earth, and all ye need to know"[৬]

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কীটসের সৌন্দর্যবোধ আমাদেরকে বোঝাচ্ছে যা সত্য, তাই সুন্দর আর সুন্দর হয় সত্য। এই সত্যও তো চিরন্তন, এটা সকলেই মানেন, কীটসও মানতেন। কীটস এখানে সৌন্দর্যকে সত্য হিসাবে কল্পনা করছেন। তিনি এখানে সত্য ও সুন্দরকে অভেদ জ্ঞান করছেন। সৌন্দর্যকেও তিনি চিরন্তন মনে করতেন। কিন্তু

চিরন্তন সৌন্দর্য বলে কি কিছু রয়েছে ? কীটসের কবিতার সৌন্দর্যের মূল্য কোথায় ? নিশ্চয়ই কীটসের কবিতার সৌন্দর্য পাঠকের কবিতা পড়ার কারণে! মানুষ তাঁর কবিতা না পড়লে তাঁর কবিতার মূল্য কোথায় ? পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে কীটসের কবিতার সৌন্দর্য কে অনুভব করবে ? বইয়ের পোকা বই খেতে পারলেও বইয়ের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে না। তাহলে সত্যের মতো সৌন্দর্যকেও চিরন্তন বলা কি যুক্তিসঙ্গত হবে ?

কীটসের মত অনুযায়ী সত্যকেই যদি সুন্দর হিসাবে দেখা হয় তাহলে একটা নিখুঁত বৃত্তকে মোনালিসা ছবির চেয়েও বেশি সুন্দর বলতে হয়। বৃত্তও সত্য, আর মোনালিসা ছবিও সত্য। সত্যের তো কম বেশি হয় না। সত্য তো ধ্রুবক। আসলে সমাজে বৃত্তের মূল্য সত্য হিসেবেই কিন্তু মোনালিসা ছবির মূল্য সত্য হিসেবে তো বটেই সত্যের চেয়ে বেশি কিছু সৌন্দর্যের মূল্য হিসেবেও বহু মূল্যবান।

যাই হোক রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ কীটসের মতোই চিরন্তন হলেও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা আগেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের সৌন্দর্যবোধের কিছুটা মিল রয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ বস্তুগতও নয়, আবার মনোগতও নয়। তিনি সৌন্দর্য বলতে বুঝতেন বস্তু ও মনের এমন এক মেলবন্ধন মূলক অবস্থা যা অখন্ড বিশ্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তবে এই পরম সংগতির ঐক্যে মানব মনের আকাঙ্ক্ষা থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বিশেষ। মানুষ বা যে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব না থাকলে সৌন্দর্যের অভিসার সম্ভব নয়। একটা বাবুই পাখি যেমন ভাবে সুন্দর বাসা বানায়, সে তেমন ভাবেই তার সৌন্দর্যকে অনুভব করে থাকে? রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে তাঁর কবিতা লিখে গেছেন, তেমন ভাবেই তিনি তাঁর নিজের কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করে গেছেন? তাঁর কবিতার সত্যতা অস্তিত্বে নির্ভর করে, কিন্তু তাঁর কবিতার সৌন্দর্য তাঁর পাঠকদের বা তাঁর কবিতা পাঠের কারণে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সত্যকেই সৌন্দর্য হিসাবে দেখতেন না। তবে এই সত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে এটাও তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। আসলেই তিনি মনে করতেন মানুষ যখন সৌন্দর্য অনুভব করতে চায় বা সৌন্দর্য অনুভবের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তখনই সে সৌন্দর্যকে পায়। সৌন্দর্য মানুষের মনের মধ্যেও থাকে না, আবার কোনও বস্তুর মধ্যেও থাকে না। আসলে সৌন্দর্য এমন এক অবস্থা যখন মানুষটি সৌন্দর্যের জন্য লালায়িত হয় তখন বস্তুটির মধ্যে সৌন্দর্য আরোপিত হয় মাত্র। একই ভাবে আবার যখন আরেকটি মানুষ অসৌন্দর্যের জন্য লালায়িত হয় তখন বস্তুটির মধ্যে অসৌন্দর্য আরোপিত হয়ে থাকে। আমরা সাহিত্যে রস বলতে যা বুঝি, মানব সংসারে সৌন্দর্য বলতে সেই একই বিষয়। ঠিক এই কারণেই একই বস্তু একজনের সুন্দর মনে হলেও অন্য আরেকজনের অসুন্দর বলে মনে হয়। আসলে সুন্দর সব সময় পরম সংগতির আদর্শের মধ্যেই অবস্থান করে। রবীন্দ্রনাথের মতে দ্রষ্টা আমিকে বস্তুটির সঙ্গে প্রবল ভাবে পরম সঙ্গতির অনুভব আকাঙ্খা রাখা প্রয়োজন। তা নইলে দ্রষ্টা আমি

বস্তুটিকে সত্য হিসাবে দেখতে সক্ষম হলেও সৌন্দর্য হিসাবে দেখতে সক্ষম হবে না। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধ এই কারণেই অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে যেমন একটি বিশেষ সংগতির আদর্শ আছে তেমনভাবেই অসংগতির বিশৃঙ্খলা কে তিনি অসুন্দর হিসাবেই দেখেন। আমাদের মনে ক্রোধ ও কূট চিন্তা যেমন রয়েছে, তেমনভাবেই আমাদের মনে সহৃদয়তা ও সুচিন্তাও রয়েছে। কোনও মানুষের মধ্যে যখন ক্রোধ ও কূট চিন্তা কাজ করে, তখন তার বাহ্যিক রূপেরও পরিবর্তন হয়। একটা মানুষ যখন ভীষণভাবে রাগান্বিত হয় তখন তার স্বাভাবিক রূপের বিপরীতে কিছু বিকৃতি ও বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটা বাঘ কিংবা সিংহ যখন একটা হরিণ শিকার করতে উদ্যত হয় তখন সেই শিকারি বাঘ ও সিংহটি ভীষণ গর্জনের মধ্য দিয়ে ভয়ংকর ভাবে অসুন্দর প্রকাশ করে হরিণটিকে এমন উপায়ে ভয় প্রদর্শন করায় যাতে করে হরিণটি মানসিকভাবে আহত হয় এবং বাঘ ও সিংহটির শিকার প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ কিংবা যে কোনও প্রাণীর মধ্যে যখন ক্রোধ উৎপন্ন হয় তখন সেই মানুষ বা প্রাণীটির স্বাভাবিক রূপে বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এই বিকৃতি কারো কাছে সুন্দর মনে হতে পারে আবার কারো কাছে অসুন্দর মনে হতে পারে। আসলে বাঘ বা সিংহের গর্জন হরিণটির কাছে অসুন্দরের প্রতীক। কিন্তু বাঘ বা সিংহটির কাছে তাদের এই গর্জন অসুন্দর বলে মনে হবার কোনো কারণ নেই। মানুষের মধ্যেকার রাগ বা ক্রোধের যে বীভৎস রূপ আছে তাতে বিকৃতি ও বিরোধ থাকার জন্যেই তা অসুন্দর। কিন্তু এই বিকৃতি সেই রাগান্বিত মানুষটির মনে অসৌন্দর্যের বোধ নাও উৎপন্ন করতে পারে, কারণ সৌন্দর্যবোধ একটি মানব মন সাপেক্ষ আপেক্ষিক বিষয়। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানবপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল বিষয়, যেকারণে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মানব সংসারের মধ্যে সৌন্দর্যকে অত সহজে দেখা যায় না। মানব সংসারের মধ্যে সৌন্দর্য দেখতে হলে অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই সমস্ত বিকৃতি ও বিরোধ যা কিছু আছে সবকিছু নিয়েই এই বিশ্ব অখণ্ড ভাবে সুন্দর। পরম সংগতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্যবোধ আমাদেরকে সীমা থেকে অসীমের দিকে যেতে আহ্বান করে। তাঁর সাহিত্যে, গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে এই সৌন্দর্য বোধ দার্শনিক রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ৫ নম্বর কবিতায় সুন্দর সম্পর্কে বলছেন :

> "অন্তর মম বিকশিত করো
> অন্তরতর হে।
> নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
> সুন্দর করো হে।"[৭]

অর্থাৎ মানবিক বিকাশের মধ্যেই সৌন্দর্য রয়েছে এই মানবিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন মানব মন অখণ্ড বিশ্বমনের সঙ্গে পরম সংগতি স্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা রাখে।

রবীন্দ্রনাথের এই ঐক্যের মধ্যে সৌন্দর্যের ভাবনা আমাদের মনে পরম বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আর সত্যের অনুভব বলতে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যবোধ' প্রবন্ধে জাগতিক বিরোধ ও বিকৃতিগুলোকে বড়োর মধ্যে দৃষ্টিনিশ্বাস নেওয়ার কথা বলেছেন। বড়ো বলতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চৈতন্যপূর্ণ আদর্শের কথা বলতে চেয়েছেন। এরপর তিনি 'সত্য হওয়া' প্রবন্ধে বলছেন যে, নিজেকে সহজ করে তুলতে চাইলে এই বিশ্ব জগতের সঙ্গে সচেষ্ট ভাবে একাত্ম হতে হবে। যেমনভাবে একটি ভ্রুণ মাতৃগর্ভে তার নিশ্চেষ্টতায় বড় হয়ে ওঠে কারণ সে তখন মায়ের সচেষ্টতার সঙ্গে একাত্ম। রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক চিন্তা আমাদের সহজভাবে সত্য হতে শেখায়। এরপর তিনি 'সত্যকে দেখা' প্রবন্ধে বলছেন, নিজের মধ্যে সত্য যেমন রয়েছে তেমন সত্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। তিনি মানুষের মধ্যেকার এই সত্যের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে বলছেন-

> "এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়া-ফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে; সেদিন আমরা যেদিকে চাব কেবল খণ্ডবস্তুকে দেখবো না, অখন্ড সত্যকে দেখব। যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা এই হচ্ছে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা!"[৮]

অতএব আমরা সিদ্ধান্তস্বরূপ বলতে পারি যে, ভারতজুড়ে প্রচারিত শংকরাচার্যের বিখ্যাত স্লোগান 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' আসলেই রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি ভ্রান্ত ধারণা। তাই তিনি তাঁর 'শেষ লেখা' কাব্যের 'রূপনারানের কূলে' কবিতায় এই জগৎকে স্বপ্ন বা মিথ্যা নয় বলে জানাচ্ছেন এইভাবে-

> "রূপনারানের কূলে
> জেগে উঠিলাম;
> জানলাম এ জগৎ
> স্বপ্ন নয়।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্ভবত রূপের মধ্যেই অরূপের সাধক। জাগতিক কিছু বিরোধ ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে মানব মনের যখন চৈতন্যে উত্তরণ ঘটে তখনই তার সত্যের সাধনা সফল হয়ে ওঠে। একমাত্র তখনই একটা মানব-আত্মা সত্যের স্বাধীনতা পায় এবং নিজের মধ্যে পরম বিষয় সঞ্চরণ করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬খ্রিস্টাব্দ, শান্তিনিকেতন, সুন্দর, রবীন্দ্র রচনাবলী, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৬১২।

২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬খ্রিস্টাব্দ, শান্তিনিকেতন, সুন্দর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৬১২।

৩) আইয়ুব, আবু সায়ীদ, সেপ্টেম্বর ১৯৭১খ্রিস্টাব্দ, সুন্দর ও বাস্তব, ঢাকা-১, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, পৃষ্ঠা ১৬।

৪) লাহিড়ী, আশীষ, সেপ্টেম্বর ২০১১খ্রিস্টাব্দ, রবীন্দ্রনাথ : মানুষের ধর্ম, মানুষের বিজ্ঞান, কলকাতা, অবভাস পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৬০।

৫) লাহিড়ী, আশীষ, সেপ্টেম্বর ২০১১খ্রিস্টাব্দ, রবীন্দ্রনাথ : মানুষের ধর্ম, মানুষের বিজ্ঞান, কলকাতা, অবভাস পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১।

৬) Keats, Jhon, 1819, Ode on a Grecian Urn।

৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,ভাদ্র১৩১৭ বঙ্গাব্দ, গীতাঞ্জলি, ৫ নম্বর কবিতা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১৯।

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬খ্রিস্টাব্দ, শান্তিনিকেতন, সত্যকেদেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৬২৮-৬২৯।

৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পৌষ ১৩৯৬বঙ্গাব্দ, শেষ লেখা,১১নম্বর কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১২২।

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬খ্রিস্টাব্দ, শান্তিনিকেতন, সত্যবোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ৬২২-৬২৫।

১১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ, শান্তিনিকেতন, সত্য হওয়া, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৬২৫-৬২৮।

১২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৩খ্রিস্টাব্দ, চিত্রা, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা ১৩৩-২০৩।

বাংলা বানান চর্চায় দেশ পত্রিকার ভূমিকা

জয়ন্ত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : বাংলা বানান চর্চা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বানান চর্চার বলা ভালো নিয়ম বা সূত্র নির্ধারণের জন্য রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজও বর্তমান। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা বানানের নিয়ম নিয়ে ভাঙ্গা গড়া চলেছে। এই যাত্রাপথে অন্যতম শরিক ছিল 'দেশ' পত্রিকা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দেশ পত্রিকা বাংলা বানান চর্চায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। খ্যাতনামা ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, কবি, লেখকদের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এই পত্রিকায়। বাংলা সংস্কৃতি জগতে দেশ পত্রিকার পদচিহ্ন অস্বীকার করা যায় না। সেই ধারা দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আজকের দিনেও দেশ পত্রিকা বাংলা সমাজ সংস্কৃতির ধারক, বাহক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, বাংলা বানান চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিজস্ব ভাবনা দিয়ে অভিধান রচনা করতেও সক্ষম হয়েছে। বলা যায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত দেশ পত্রিকা স্বতন্ত্র একটি অভিধান তৈরি করেছে। বিশেষ করে বাংলা বানান চর্চার ক্ষেত্রে এই অভিধানের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই পত্রিকায় যে সমস্ত পণ্ডিতেরা নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারই একটি রূপরেখা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। বিশেষজ্ঞদের বাংলা বানান নিয়ে তাঁদের ভাবনা চিন্তা কি, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি দেশ পত্রিকার নিজস্ব বানান রীতিতে বা পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাংলা বানানের নিয়ম বা সূত্র নির্মাণ করেছে, তারা কতটা এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছে বা দেয়নি তার যুক্তি- অযুক্তির পর্যালোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

মূল শব্দ (Key word) : ভাষাতাত্ত্বিক, সংস্কৃতি, অক্ষর, বর্ণবিন্যাস, সম্মুখীন প্রভৃতি।

মূল আলোচনা (Discussion):

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেশ, ২১শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২১-২৬

বাংলা বানানে বিদেশি নাম ও শব্দ লেখার যে নিয়ম আনন্দবাজার পত্রিকা নির্দেশ করেছে, তার ফলে বাংলা লিপি, বর্ণবিন্যাস এবং উচ্চারণরীতির সঙ্গে ঐক্য থাকবে না। তার বিরোধিতা করেই এই প্রবন্ধ রচিত। প্রবন্ধে তিনি অনেকগুলো নিয়ম তুলে ধরে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বাংলা বানানে রোমান পদ্ধতির চেয়ে সোজা রোমান লিপি গ্রহণ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। এছাড়া সংযুক্ত

বর্ণের পরিবর্তনে হসন্ত চিহ্ন দিয়ে লেখার প্রচার চালিয়ে গেছে আনন্দবাজার পত্রিকা। তাঁর মতে রেফ বর্জন করে বা সংযুক্ত বর্ণ তুলে দিয়ে অধিকমাত্রায় হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করলে লেখার সময় ও স্থান অনেক বেড়ে যাবে। তাই এই রীতিকে তিনি নিরর্থক বলে মনে করেন। এভাবে একাধিক যুক্তি দিয়ে আনন্দবাজারের বানান রীতিকে অস্বীকার করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ', বিজয়া দাশগুপ্ত, দেশ, মাঘ, ৩৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১৭০

প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বাংলায় ঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করা অভিধান সংকলকদের পক্ষে এখনও প্রায় অসম্ভব কাজ। তাঁর মতে বাংলা শব্দের বহু বিচিত্র উচ্চারণের ভাষাতাত্ত্বিক কারণ ও নিয়ম যে মোটেই বের করা যায় না তা নয়, কিন্তু এত ব্যাপক ও পরিবর্তনশীল যে, একবার উল্লেখ করলেই সব সময় সমস্যার সমাধান হবে না। তারপর প্রয়োগকর্তা শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাব এড়াতে অক্ষম বলে আরো বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হন।

এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত উচ্চারণ পার্থক্যের কারণে তৎসম ও অ-তৎসম শব্দের আলাদা বর্ণমালা হওয়া প্রয়োজন। কারণ বাংলা ভাষা থেকে তৎসম শব্দের সম্পূর্ণ বিলোপের সম্ভাবনা নেই। তিনি মনে করেন, শুধু আ-কারের নয়, তৎসম শব্দের প্রায় সব স্বরবর্ণের উচ্চারণ বাংলায় অল্পবিস্তার পাল্টে গেছে। এছাড়া তিনি ঐ, ঔ-এর বাংলা উচ্চারণ, ওই, ওউ রাখার বিপক্ষে। কারণ ই বা উ কারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়ে যায়। এটাই ভাষাতত্ত্বের নিয়ম। তাই 'ওই' ও 'ওউ' থেকে 'অই' ও 'অউ' অনেক যুক্তিসংগত বলে মনে করেন।

তিনি উচ্চারণভিত্তিক বানানকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ বাংলার মতো অন্য অনেক ভাষাতেই আছে। তবে একই শব্দের উচ্চারণভেদে যখন অর্থ পাল্টায় তখন বানানে প্রকারভেদ প্রবর্তন করা ও মানা উচিত বলে মনে করেন। এর প্রধান কারণ বানানের সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাই তিনি কোনদিন বোঝাতে 'কোনদিন' এবং কোনোদিন বোঝাতে 'কোনওদিন' শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁর এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে বিদেশি ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্যে বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করা বিবেচ্য নয় বলে মনে করেন। বাংলা ভাষার ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন, এবং অভিধানের ভূমিকা যে উল্লেখযোগ্য একথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা বানানে সুনীতি কু-নীতি', অমিতাভ চৌধুরী, দেশ, ২৮শে মাঘ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (ইং-১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১৭৯-৮২

বাংলা বানানে বৈদেশিক শব্দের নতুন রীতি প্রবর্তনের কথা ভেবে, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রস্তাব আনে। প্রস্তাবের বিপক্ষে 'অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' জানিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেশ পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর

মতামতের উত্তর বা বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী। তিনি ভাষাকে সচল করতে যুক্তাক্ষর বর্জনের পক্ষে মত দেন। তিনি ব্যাকরণ ও উচ্চারণ ঠিক রেখে যদি মুদ্রণের প্রয়োজনে শব্দের বন্ধন ভাঙতে চেয়েছেন। প্রচলিত অভ্যাসকে আমল না দিয়ে তিনি বোমবাই, মাদরাজ লেখার পক্ষে সওয়াল করেন। অমিতাভবাবুর মতে উচ্চারণের এত সূক্ষ্মতা। অমিত, অতুল না লিখে ওমিৎ, ওতুল লেখা উচিত। সুনীতিকুমার মনে করেন যুক্তাক্ষর ভাঙতে হলে, সবটাই ভাঙতে হবে। এই যুক্তি অমিতাভবাবু মানতে পারেননি। তাঁর মতে যুক্তাক্ষরের কাঁটা যতটা সম্ভব সরাতে পারলে অনেক বেশি আধুনিক বাংলা বানান সৃষ্টি হবে। বানানকে তিনি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল করতে আগ্রহী।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', সমীরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮৫

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা অ-সংস্কৃত বিশেষ করে ইংরাজি ভাষা থেকে উদ্ভুত যুক্তাক্ষর শব্দগুলোকে ভেঙে বাংলা বানানের যে সংস্কার সাধন করতে চলছে, তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমীরপ্রসাদবাবু মনে করেন আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে এই বানান সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। প্রবন্ধে তিনি এই উদ্দেশ্যগুলো কতটা বাংলা ভাষার পক্ষে হিতকর হবে, সেই বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

তিনি বাংলা মুদ্রণ বা টাইপের সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরকে বর্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে বাংলা মুদ্রণ যদি সাবলীলতা-সজীবতা এবং যুগোপযোগী করতে হয় তবে যুক্তাক্ষর বর্জন করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই। বিশেষ করে অ-সংস্কৃত শব্দগুলোকে অনায়াসে ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বাংলা ভাষাকে দ্রুত আয়ত্ত করা সহজ হবে বলে মনে করেন। তাঁর যুক্তি ইংরাজি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমৃদ্ধিশালী ভাষা। অথচ সুবিধার জন্য এই ইংরাজি ভাষাতেও একই শব্দকে একাধিক বানানে লেখার রীতি প্রচলিত আছে যেমন-Chatterjea, Chatterjee এবং Chatterji / Coomar, Kumar / Organization, Organisation / Correxion, Correction ইত্যাদি। অতএব দ্রুত মুদ্রণ এবং ভাষাকে যুগোপযোগী করার জন্য বাংলা বানানেরও সংস্কার সাধন করা যেতে পারে। পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে নতুন কিছু করতে হলে ব্যঙ্গোক্তি বা প্রতিবাদের সম্মুখীন হতেই হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি সুনীতিকুমারের বিরুদ্ধেই মন্তব্য করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় পরবর্তীকালে বাংলা আকাদেমি এবং একাডেমী ঢাকা সমীরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে অ-সংস্কৃত শব্দের সংস্কারের পথেই হেঁটেছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি আনন্দবাজারের পক্ষেই সওয়াল করেছেন।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', রামেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮৫

দেশ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ' নামক আলোচনায় রামেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সরাসরি অমিতাভ চৌধুরীকে আঘাত করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় সুনীতিকুমারের দক্ষতা থাকলেও অমিতাভ চৌধুরীর সেই এক্তিয়ার নেই। কারণ তিনি ভাষাবিজ্ঞানী নন। অমিতাভ বাবুর বিরুদ্ধে তাঁর মূল অভিযোগ যে অমিতাভ বাবুর বানানের নতুন রীতিতে প্রেরণা যুগিয়েছেন খ্রিস্টান মিশনারি জন মার্ডক। প্রাবন্ধিকের মতে ভাষাবিজ্ঞানের মার্ডকের কোনো অবদান নেই। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত বাংলা বইয়ের একটি তালিকা সংকলনই তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব। আর অমিতাভ চৌধুরীর মতো বিশেষজ্ঞরা একশ বছর আগে কোনো এক মিশনারি কি বলেছিলেন তার উপর নির্ভর করে মাতৃভাষার নিয়মকানুন ভাঙার কথা বলে চলেছেন।

রামেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে অমিতাভ চৌধুরীর প্রধান যুক্তি, আনন্দবাজার প্রবর্তিত বানান সংস্কারে ছাপার কাজ সহজ হবে। প্রাবন্ধিক মনে করেন ভাষার নিয়ম আর ছাপার পদ্ধতি ভিন্ন পথে চলে। কিন্তু ভাষারই প্রাধান্য থাকে। ভাষার নিয়মকে মেনেই বইপত্র ছাপাতে হয়। তাঁর মতে শুধু ছাপার সুবিধা কেন, ছাত্রদের কত সুবিধা হত যদি শ, ষ, স, ড়, ঢ়, র, ঈ ইত্যাদি বানিয়ে একটি করা যেত। পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ভাষাকে পঙ্গু না করে তা যখন হওয়ার উপায় নেই তখন এটা মেনে নিতেই হবে। উদাহরণ হিসাবে তিনি জাপানের প্রসঙ্গ এনেছেন। জাপান সবদিক থেকে এত এগিয়ে, অথচ বর্ণমালার অসুবিধা আজো পর্যন্ত তারা দূর করতে পারেনি। আমাদের থেকে বেশি অসুবিধার মধ্যে থেকেও মুদ্রণ শিল্পে তারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাঁর মতে খাদ্যের মতোই ভাষা আমাদের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন। তাই ভাষার মৌলিক ধর্ম সংস্কারের মান ক্ষুণ্ণ করলে জীবন পঙ্গু হয়ে পড়বে বলে সাবধান করেছেন। তাই জাপানিরা পাশ্চাত্য জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করলেও ছাপাখানার মুখ চেয়ে ভাষার ধর্মকে রূপান্তরিত করার অপচেষ্টা করেনি।

রামেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে অমিতাভবাবুদের জন্যই আনন্দবাজারের ছাপার কাজ সহজ না হয়ে কঠিন হয়েছে। কম্পোজিটর ও প্রুফরীডাররা স্বভাবতই বিপন্ন। এমনকি পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় পুরনো বানানই বজায় রয়েছে। যেমন-স্টেনোগ্রাফার, ইন্ডিয়া, কার্ডিওলজিক্যাল, কংগ্রেস, স্পোর্টস, রেজিস্ট্রার, ডক্টরেট, কেমব্রিজ, রেস্টুরেনট ইত্যাদি। প্রায় দেড় বছর চেষ্টা করেও আনন্দবাজার এক নিয়ম চালু করতে পারেনি। ফলে কর্মী ও পাঠকরা বিভ্রান্ত হন। মাত্র কয়েকটি বিদেশি শব্দ ভেঙে কম্পোজ করলেই ছাপার কাজ সহজ হবে না। তা প্রকৃতপক্ষে কঠিন হবে, এইরূপ অভিমত দিয়েছেন প্রাবন্ধিক। তিনি বানান সংস্কারের বিপক্ষে মত দিলেও, আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী কিন্তু অমিতাভ চৌধুরীর

অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এবং তারা নিজস্ব একটি বানানবিধি তৈরি করেছে। আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী তাদের প্রণিত বানানবিধিকে মান্যতা দিয়েই ছাপার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রামেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামতকে তাঁরা স্বীকার করে নেয়নি।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', করুণাময় মুখোপাধ্যায়, দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮৬

অমিতাভ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে বাংলা বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে করুণাময় মুখোপাধ্যায় অমিতাভবাবুর ভাষাগত ত্রুটির দিকগুলো তুলে ধরে বাংলা বানান সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলা যায় প্রবন্ধে তিনি সুনীতিকুমারের মতামতের পক্ষে সওয়াল করে বাংলা বানান সংস্কারের অভিমুখ কি হওয়া প্রয়োজন সেদিকেই নজর দিয়েছেন। আমরা বানান সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের নিজস্ব অভিমতকেই বিশ্লেষণ করব, অমিতাভবাবু সুনীতিকুমারকে কি বলেছেন সেই বিচারে যাবে না।

তিনি প্রথমেই স্বীকার করেছেন যে, বাংলা বানান সংশোধনের প্রয়োজন ও পথ সম্পর্কে নিজস্ব মত ব্যক্ত করবেন। মুদ্রণ কাজের সুবিধা সাধনই যে প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সে প্রচেষ্টাকে তিনি গুরুত্ব দেন না। তিনি মনে করেন বাংলা ভাষার একটি প্রধান ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যুক্তাক্ষর। সুতরাং ভাষা শিক্ষার প্রকৃত নিষ্ঠাবানেরা এই সাময়িক দুরূহতার জন্য নিশ্চয়ই কেউ পিছিয়ে যাবে না। তাই এর সর্বাত্মক সরলীকরণের প্রয়োজন নেই। আর বাংলা ভাষার তৎসম শব্দে যদি যুক্তাক্ষর না সরানো হয় বা যায়, তবে অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টারও কোনো প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর যুক্তি, প্রেস থেকে যেহেতু যুক্তাক্ষর একেবারে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন এই অনর্থক প্রচেষ্টা কেন? তাছাড়া যুক্তাক্ষর যখন তৎসম শব্দের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তখন অ-তৎসম শব্দের যুক্ত ধ্বনিকে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাহায্যে উচ্চারণের সুবিধা থেকে সাধারণ পাঠক ও ভাষা শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা সমীচীন নয়। আর আনন্দবাজারের বানান পড়ে কারো পক্ষেই প্রথম শোনা বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণের কাছাকাছি যাওয়া প্রায় অসম্ভব। একথা যে কোনো বিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করবেন না বলে তাঁর ধারণা। প্রাবন্ধিকের এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে আনন্দবাজার গোষ্ঠী কিংবা বাংলা আকাদেমি কেউ মেনে নেয়নি। আনন্দবাজার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য যুক্তব্যঞ্জনকে সরলীকরণ করে বানানবিধি তৈরি করেছে। বাংলা আকাদেমিও যুক্তব্যঞ্জনকে সরলীকরণের পক্ষে মত দিয়ে বানানবিধি করেছে।

তিনি হস চিহ্ন বর্জনকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণের কাছাকাছি যেতে হলে হস চিহ্নের ব্যবহার ছাড়া বিকল্প উপায় নেই। তাছাড়া তিনি মনে করেন বিদেশি শব্দের কোনো প্রকৃতি প্রত্যয় হয় না। সেই শব্দের বানান লিখতে গেলে তার প্রকৃত উচ্চারণের কথা যথাসম্ভব মনে রাখা প্রয়োজন। এর জন্য যদি হস-কে বরণ করতে হয় তাও শ্রেয় বলে মনে করেন। কারণ বাংলায় এই রূপ

বিদেশি শব্দের লিখিতরূপ ও উচ্চারণের মধ্যে অসাম্য আছে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যা একেবারে বাঞ্ছিত নয়। তাঁর মতে Inspector শব্দের মোটামুটি ঠিক উচ্চারণ জানতে গেলে 'নিসপেকটর' বা 'ইন্সপেক্টর' লেখা উচিত। কখনোই 'ইনসপেকটর' নয়। কারণ ইনসপেকটর বানানে একাধিক উচ্চারণ সম্ভব। অনুরূপভাবে James শব্দটি বাংলায় লিখতে গেলে 'জেম্‌স্' কিংবা 'জেম্মস্' লেখাই উচিত বলে মনে করেন। 'জেমস' বা 'জেম্স' বা 'জেম্ম' কোনোটাই সঠিক নয়। তার এই প্রস্তাব পরবর্তীকালে বাংলা আকাদেমি কিছুটা প্রাধান্য দিলেও আনন্দবাজার কিন্তু অমিতাভ চৌধুরীর মতের স্বপক্ষেই মত দিয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে তিনি স্মরণ করে দিয়েছেন যে, বিদেশি শব্দের বানানের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সরলীকরণ যদি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তবে তাকে বর্জন করাই ভালো। কারণ মুদ্রণের অসুবিধার দোহাই দেওয়া এখানে একদেশদর্শিতা, অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনার সমান। সবশেষে তাঁর প্রশ্ন, স্ট্রীট, স্কুল, ফ্লু, প্লেটো, শ্লো প্রভৃতি শব্দের যুক্তাক্ষর তো মুদ্রণের শত অসুবিধা সত্ত্বেও কোনোমতেই ভাঙা সম্ভব নয়। তাই কিছু শব্দ যুক্তাক্ষর যখন রাখতেই হবে, ছাপাখানায় যুক্তাক্ষর যখন ব্যবহার করতেই হবে, তখন আর কিছু ব্যবহার না করে উচ্চারণে সংশয় বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। কারণ তাতে আখেরে কোনো লাভ হবে বলে তাঁর মনে হয়নি।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ ', নীলরতন সেন, দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮৫-৪৮৬

অধ্যাপক নীলরতন সেন মনে করেন বাংলা টাইপরাইটারের 'কিবোর্ড তৈরি করা একটা বড়ো সমস্যা তার উপর আনন্দবাজার যে বানান চালু করতে চাইছে তাতে সে সমস্যার আদৌ কোনও সমাধান মিলবে কিনা তা জানা নেই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বরং শঙ্কিত হয়েছেন এই ভেবে যে জটিলতা অহেতুক বাড়বে বই কমবে না। তাঁর মতে আনন্দবাজার পত্রিকার ন্যায় প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা বাংলা ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ উভয় দিকেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই গুরুদায়িত্বের কথা মনে রেখেই তাকে আরও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। কারণ তখন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বানানবিধিকেই আমজনতা স্বীকৃতির সঙ্গে মেনে নিয়েছে।

আনন্দবাজারের প্রচলিত নিয়মের কথা মাথায় রেখে তিনি মনে করেন যে, 'পাঞ্জাব' বা 'বোম্বাই' কে 'পানজাব', 'বোম্বাই' লিখলে শব্দ দুটির প্রকৃত উচ্চারণের সঙ্গে, পাঠকের অতি পরিচয়ের জন্য হয়ত ততটা অসুবিধা হয় না। যদিও যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ যতটা সংশ্লিষ্ট, এখানে সে উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত শিথিল। কিন্তু পার্টির স্থানে পারটি, টেস্ট স্থানে টেসট, কোর্ট স্থানে কোরট, কম্যুনিষ্ট স্থানে কমিউনিসট, গার্ড স্থানে গারড, চার্জসিট স্থানে চারজসিট, ডিরেক্টর স্থানে ডাইরেকটর, সেন্ট্রাল স্থানে সেন্‌ট্রাল, সার্ভিস স্থানে সারভিস, ইংলান্ড স্থানে ইংলনড, মাদ্রাজ স্থানে মাদরাজ, আফ্রিকা স্থানে

আফরিকা, কলম্বো স্থানে কলমবো, মস্ক স্থানে মসকো প্রভৃতি বানান উচ্চারণে পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে অভিমত পোষণ করেছেন। আনন্দবাজারের বানানবিধিতে নীলরতন সেনের প্রস্তাব গৃহীত না হলেও তারা অনেক স্থানে এইরূপ উচ্চারণ ও লেখনরীতি থেকে পিছু হেঁটেছে। তবে বাংলা আকাদেমি পরবর্তীকালে যুক্তাক্ষরের সরলীকরণ করলেও প্রাবন্ধিকের প্রস্তাবকে অমান্য করেনি।

নীলরতন সেন এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ODBL গ্রন্থে বাংলা শব্দ উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতার যে আলোচনা করেছেন, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন 'জঙ্গল' (জঙ-গল) শব্দে দুটি সিলেবল আছে, ঠিক, কিন্তু দুই সিলেবল শব্দ 'জঙ্গল' আর এক সিলেবল শব্দ 'রাম', 'হাত' এগুলোর মাত্রা সমকত্ব কি মেনে নেওয়া যায়? কাইমোগ্রাফের (kymograph) এর উচ্চারণ দূরত্ব পরিমাপে (measurement of duration), জঙ্গল যেখানে তিন কালমাত্রী (time unit), হাত বা রাম উচ্চারণ সেখানে দুই কালমাত্রার মাপ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে চার, পাঁচ, বা ছয় মাত্রার শব্দকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই দুই, দুই তিন, বা তিন তিন এই ধরনের দুই শ্বাসপর্ব পাঠের সহজাত একটা প্রবণতা রয়েছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কার্য, লেখার স্থানে 'কার্য্য' লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। নীলরতন সেনের মতে কার্য লিখলে য-ফলার যে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য মূল সংস্কৃতে ও কিছু কিছু বাংলা উপভাষায় সেটা রক্ষিত হয় না। সুনীতিকুমারের যুক্তির সারবত্তা মেনেও প্রাবন্ধিকের মতে এই সূক্ষ্ম উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যটুকুর বিনিময়ে বানানের যে সরলতা এসেছে এবং গত তিরিশ বছর সেটা প্রচলিত।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ', বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮৮

দেশ পত্রিকায় সেই সময় বাংলা অভিধান নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রাবন্ধিক মনে করেন এই রূপ আলোচনা অত্যন্ত সময়োচিত। তাঁর মতে আমরা নিজেরা বাঙালী বলে গর্ব করি। কিন্তু আমরা পুরোপুরি বঙ্গভাষী নই। কারণ বাংলা ভাষা নিয়ে এদেশে একটা অবজ্ঞা, অবহেলা, অশ্রদ্ধা চলছেই। রাষ্ট্রভাষা ও ইংরাজির জোয়ারে বঙ্গসরস্বতীর রত্নডিঙা টলমল করেছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন এখন বাঙালী 'বোঝাপড়া', 'আপোস' শব্দ ব্যবহার না করে 'সমঝোতা', 'বন্ধের' পরিবর্তে 'বন্ধ' লেখাই বেশি পছন্দ করে। কোনো প্রস্তাব বর্তমানে আর উপস্থাপন হয় না, সেটা 'রাখা' হয়। বাঙালীর এই দৈন্যের কারণ হিসাবে তিনি শব্দভাণ্ডারের ঘাটতির কথা বলেছেন। তাঁর মতে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শব্দটি যোগায় না বলেই একাধিক ভাষার জগাখিচুড়ি না পাকিয়ে দু-মিনিটও কথা বলা বাঙালীর দ্বারা সম্ভব হয় না।

তাঁর সিদ্ধান্ত এই শব্দকৃচ্ছ্রতা হয়ত হ্রাস করতে পারে প্রতিশব্দের একটি অভিধান। প্রতিশব্দ কিংবা সমনাম বলতে প্রাবন্ধিক একই শব্দের পরিবর্তে আর একটি শব্দের ব্যবহারকে বুঝিয়েছেন। বিকল্পে তিনি জুড়ি বাঁধা শব্দ বা বাক্যাংশ প্রয়োগের

কথা বলেছেন। যেমন অকর্মণ্যের পরিবর্তে 'কুঁটো জগন্নাথ' অথবা অপদার্থের বদলে 'ষাঁড়ের গোবর', এইরূপ অভিধান প্রণয়নের কথা বলেছেন। প্রাবন্ধিকের ভাবনাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। তাঁর এই ভাবনা বাংলা ভাষাভাষীর মানুষের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়, এই কথা বলতে বাঁধা নেই। যখন ভালোভাবে চালু হয়ে গেছে তখন আর পিছনে বানানের জটিলতায় ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ উচ্চারণানুগ বানান লিখতে গেলে তিনটি শ, ষ, স-এর ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হবে। জ, য এর বানানেও নতুন রীতির কথা ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কারণ সেখানে আবার মূল সংস্কৃত Root গুলো হারানোর আশঙ্কা থাকে। এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের অভিমত "বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা একথা সকৃতজ্ঞ মেনে নিয়েও কিছু কিছু মায়ের অনাবশ্যক বোঝা কাঁধ থেকে নামাতে হবে, নইলে নতুন ভার বহন সম্ভব হবে কি করে?" তারপরেও তিনি স্মরণ করে দিয়েছেন যে, শ, ষ, স-এর বোঝাও রয়েছেই, S, Z, ওয়া উচ্চারণের যথার্থ বর্ণের অভাব, দুটি 'ব'-এর আধিক্য, জ, য-এর উচ্চারণ প্রায় এক হয়ে গেছে, ইয়-উচ্চারণের বর্ণ নেই। সমস্ত দিক ভেবে চিন্তে তিনি মেনে নিয়েছেন যে কোনো বৈপ্লবিক উপায়ে বর্ণসংস্কার সম্ভব নয় একথা যেমন সত্য, কিন্তু মুক্ত মনে ভাষার বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে এ নিয়ে ভাববার সময়ও এসেছে একথাও সত্য। এইভাবে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন। তবে আমরা বলতে পারি পরবর্তীকালে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের 'কার্য্য' যেমন বর্জিত হয়েছে, তেমনি নীলরতন সেনের যুক্তিতে 'কার্য' গৃহীতও হয়েছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানই দ্বিত্বের পরে রেফকে বর্জনের পক্ষেই মত দিয়েছে। বলা য়ায় নীলরতন সেনের প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পেয়েছে।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা বানান', বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশ, ১৮ই চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৩৮১

অমিতাভ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকায় বলেছেন যে, তৎসম শব্দের বানানে হাত দেবেন না। অর্থাৎ তৎসম শব্দের বানানে যে যুক্তাক্ষর চলছে তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যুক্তাক্ষর যখন উঠে যাবে না, তখন ছাপাখানা থেকে যুক্তাক্ষরের হরফ, উঠে যাবে কেন? তাছাড়া ছাপাখানার বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে করেন না। তাই পুরোপুরি যদি বানান না পরিবর্তন করা যায়, তৎসম ছাড়া অন্য শব্দের বানানকে যুক্তিহীনভাবে পরিবর্তন করার কোনো কারণ নেই। এর থেকে বোঝা যায় তিনি যুক্তাক্ষর রাখার বিপক্ষে। তিনি বানানকে উচ্চারণ, ব্যাকরণ, আর ভাষার ইতিহাসের পক্ষে সংগতি রেখে বানান পরিবর্তনের পক্ষপাতী। তিনি সোজাসুজি রোমান হরফ ব্যবহারের কথা বলেছেন। তাঁর দেওয়া প্রস্তাবগুলো পরবর্তী বাংলা বানানবিধিতে স্থান করে নিতে পারেনি। তিনি 'লনডন' কে 'লনোডনো' উচ্চারণ করতে চেয়েছেন। যা বাস্তবসম্মত নয়।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা বানান', কালীকৃষ্ণ গুহ, দেশ, ১৮ই চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৯৩৭-৯৪৯

প্রাবন্ধিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত সূত্রের প্রেক্ষিতে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। প্রাবন্ধিক রেফ (') এবং 'র' বর্ণ দুটির কাজ একই, একথা মানতে নারাজ। তাঁর যুক্তি যদি একই কাজ করত তবে দুটো বর্ণ সৃষ্টি হত না। তিনি মনে করেন Form শব্দটিকে বাংলায় 'ফরম' লেখা ঠিক হয়। কারণ, বাংলায় আমরা Form কে Form উচ্চারণ করি। কিন্তু অনুরূপ ইংরাজি অনেক শব্দ আছে, বাংলা করার ক্ষেত্রে যা বিকৃত করে উচ্চারণ করি। সে ক্ষেত্রে Form কে বাংলায় 'ফর্ম' না লিখে 'ফরম' লেখার পিছনে যুক্তি আছে। তবে Park বা Card শব্দকে আমরা বাংলায় যেহেতু বিকৃত উচ্চারণ করি না, ইংরাজি উচ্চারণ করি, তখন 'পার্ক' বা 'কার্ড' না লিখে 'পারক' বা 'কারড' লেখা অনুচিত। তিনি রেফ (') বা 'র' কে বিসর্জন দিয়ে সরলীকরণ করাকে, আসলে ভাষাকে সস্তা করে ফেলা বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ 'পার্ক' কে 'পারক' লেখা হাস্যকর ভাষাবক্তা বলে মনে করেন। পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ভাষার বিকাশের, পরিবর্তনের একটা নিয়ম আছে, একটা ধারা আছে। হঠাৎ ভাষার পরিবর্তন করা যায় না, বিকৃতি করা যায় মাত্র।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বানান সংস্কার', মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেশ, ২৫শে চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১০২৭-১০২৯

বাংলা ভাষার বৈদেশিক শব্দের বানানে আনন্দবাজার পত্রিকা এক নতুন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। আচার্য সুনীতিকুমার এই বানানরীতি সমর্থন করতে পারেননি। দেশ পত্রিকার ৩৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যায় তিনি তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। এরপর ৩৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যায় সুনীতিকুমারের প্রবন্ধের সমালোচনা বের করেন অমিতাভ চৌধুরী। প্রবন্ধে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ অমিতাভ বাবুর ও সুনীতিকুমারের সমালোচনা করেছেন। তিনি যুক্তাক্ষর ভাঙার বিপক্ষে মত দিয়েছেন, কিন্তু 'হায়দরাবাদ' কে 'হায়দ্রাবাদ' এবং 'লখনউ' কে 'লক্ষ্ণৌ' লেখার মধ্যেও যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। অনুরূপভাবে তিনি 'চাক্তি' নয়, 'চাকতি', 'নাগ্রী' নয় 'নাগরী' ও ' 'মোক্তার' বা 'আগরা' লেখার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি উভয় বানান পদ্ধতি রাখার পক্ষে। তাঁর প্রস্তাবগুলো পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমী বা আকাদেমি মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ তিনি বাস্তব পরিবেশ, পরিস্থিতির স্বপক্ষে মতামত দিয়েছেন।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বানান সংস্কার', অমিতাভ চৌধুরী, দেশ, ২৫শে চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১০২৯-১০৩০

প্রাবন্ধিকের এই প্রবন্ধ লেখার পেছনে অন্যতম কারণ হল-বাংলা বানানের সংস্কার প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় প্রচুর সমালোচনা বেরিয়েছিল। সেই সমস্ত সমালোচনার উদ্দেশ্য অমিতাভ চৌধুরীকে কটাক্ষ করা। তিনি উক্ত প্রবন্ধে তার উত্তর দিয়েছেন। তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সম্মান জানিয়ে, তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে

জানিয়েছিলেন যে, 'নার্স' কে 'নারস', 'পার্ক' কে 'পারাক' লিখলে উচ্চারণ বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ রেখে তিনি পার্ক, সারকাস লেখার পক্ষপাতী। দুই রকম বানান রাখলে বিভ্রান্তি বাড়বে বলে অনেকে সমালোচনা করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি, বাংলায় 'বল্লেন' বা 'বললেন' দুই লেখা হয়। আবার বর্তমানে 'হল', 'হলো', 'হোল', 'হোলো' এই চার রকম ভাবে ছাপা হলে তা দৃষ্টিভ্রমের (defecta of vision) জন্য অতটা চোখে পড়ে না সত্য, হরফের উচ্চতা বাড়ালে এই ত্রুটি প্রায় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। বাহাত্তর পয়েন্ট (এক ইঞ্চি) লাইনো বাংলা মুদ্রণের কথা এক দুঃসহ কল্পনা ছাড়া আর কিছু না বলেই অভিমত দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের যুক্তিগুলো অসাধ্য হলেও, তিনি কি করতে হবে সে সম্পর্কে কোন মত দেননি। শুধু অসামঞ্জস্যতাগুলো ধরার কাজে ব্রতী হয়েছেন।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা মুদ্রণ', প্রসূন দত্ত, দেশ, ২৫শে চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১০৩০

তিনি অমিতাভ চৌধুরীর অ-তৎসম শব্দের ফর্মুলা সমালোচনা করে উক্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অমিতাভ বাবুর উদ্দেশ্য বাংলা মুদ্রণের কাজ সহজ করা। কিন্তু তাঁর মতে হরফের সংখ্যাধিক্য বাংলা অক্ষর যোজনার পথে বিরাট বাধা। শুধু অ-তৎসম শব্দের ব্যবচ্ছেদে বাংলা বর্ণমালার আয়তন হ্রাস হয়নি। মুদ্রণ বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলা মুদ্রণ ব্যয় ইংরাজির প্রায় দ্বিগুণ। কারণ বাংলা হরফের পার্শ্ববিস্তৃতি এবং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গতির জন্য (ফলা, আকার-ইকার) Vertical space অযথা ব্যয় হয়। আনন্দবাজারের প্রচলিত নিয়ম কিন্তু এই সমস্যা মেটাতে পারেনি। আনন্দবাজারের মনোটাইপের ছকগুলো বাংলা শব্দের পৌনঃপুনিকতা ভিত্তিতে নিরূপিত হয়নি। এগুলো সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন। আনন্দবাজারের ছকগুলোর পরিবর্তনের কথা চিন্তা না করে শব্দ ব্যবচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করেছে। তাঁর মতে এটা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর সমান। তাছাড়া যান্ত্রিক অক্ষরযোজনা হরফের ছাঁচ (Type matrix) সংস্কার করতে হবে-এ কথা অভিজ্ঞ মুদ্রক মাত্রেই স্বীকার করবেন। কেননা লাইনো বা মনোতে ছাপা বাংলা হরফের দূরত্ব হাস্যকর। ছোট হস চিহ্ন বর্জনের কারণ লেখকের অরুচি নয়ত আয়েস মাত্র। তাঁরা বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধার ধারেন না। প্রাবন্ধিক বণিক, সম্রাট, বুদ্ধিমান, ষড়ঋতু লেখার পক্ষে। কিন্তু আধুনিক বাংলা লেখকেরা লিখতে চান বণিক, সম্রাট, বুদ্ধিমান, ষড়ঋতু। কারণ তাঁরা হস চিহ্ন দেওয়ার শ্রম স্বীকার না করে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চান। তাঁর মতে হস চিহ্ন না থাকলে বিরাট ও বিরাট্, কিংবা যজমান আর হনুমান, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। এছাড়া তিনি বানান সমিতির অতৎসম শব্দের নিয়মের বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। তিনি স্ত্রীলিঙ্গ এবং অতি, ব্যক্তি, ভাষা, ও বিশেষণবাচক শব্দের অন্তে 'ই' কার হবে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছিলেন। তিনিও রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন জানিয়ে অতৎসম শব্দের অন্তে 'ই'কারকে স্বীকার করেছেন। মণীন্দ্রকুমার প্রস্তাবিত হস্ চিহ্ন গৃহীত না হলেও,

অতৎসম শব্দে 'ই'কার পরবর্তী কালে বাংলা বানান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকার করে নিয়েছে।

১৩৭৪ বঙ্গাব্দ: 'বাংলা বানান সংস্কার', প্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ (১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭-১০৯৬

আনন্দবাজার পত্রিকার বানানবিধি নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ চৌধুরীর বাক্যালাপের পরে প্রবোধচন্দ্র সেন বানান সংস্কার সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন। বানান সংস্কার নিয়ে যখন পণ্ডিতমহলে এক 'বিতর্ক' চলছে, প্রবোধচন্দ্র সেন সেই সময় কলম ধরেছেন। তিনি আনন্দবাজার বানানবিধির নতুন বানান কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেন নয় তা নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন যুক্তিবাদী মানসিকতা থেকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার গভীরে গিয়ে বানান ও উচ্চারণকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যা সাধারণের উচ্চারণে ধরা পড়ে না। আর অমিতাভ চৌধুরী হয়ে উঠেছেন 'প্রগতিশীল'। তিনি যুক্তি বা বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিলেও, বাস্তবে তার কতটা গ্রহণীয় সেই প্রশ্ন থেকে যায়। প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, বাংলা লিপি থেকে রাতারাতি যুক্তাক্ষর বর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু অ-সংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষর কমানোর দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন।

তাঁর মতে বানান সংস্কার হওয়া উচিত পাঠকের উচ্চারণ সৌকর্যে বা অর্থ গ্রহণে বাধা যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে। অর্থাৎ যেখানে আশঙ্কা বা সংশয় থাকে সেখানে সংস্কারের আগ্রহ দমন করা উচিত বলে মনে করেন। তিনি উদযান, উদ্যাপন, বিদ্বান, উদ্বিগ্ন এর স্থানে উদযাপন, বিদ্বান, উদবিগ্ন লেখা উচিত বলে মনে করেন। তিনি কোন্ বা কোনো লেখার পক্ষপাতী, কোন নয়। কারণ কোন লিখলে উচ্চারণ ও অর্থে সংশয় দেখা দেয়। প্রস্তাবটি পরবর্তীকালে অনেকটাই মান্যতা পেয়েছে।

তাঁর মতে আধুনিককালে কোনো চলিত ভাষার বানানই সর্বতোভাবে উচ্চারণ অনুযায়ী হয় না। অর্থাৎ সেই চেষ্টাও অনাবশ্যক। কারণ আমরা 'চলি' কে পড়ি চোলি, অনুরূপ ভাবে 'হল' কে পড়া হয় হোলো। বাংলায় পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অ-সংস্কৃত শব্দে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। করতে গেলে অনেক বিভ্রাট ঘটবে। বলা যায় প্রাবন্ধিকের আলোচনা অনেক বেশি যুগোপযোগী।

তথ্যসূত্র (References) :

১. অমিতাভ চৌধুরী : বাংলা বানানে সু-নীতি, কু-নীতি, ২৮ শে মাঘ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

২. অমিতাভ চৌধুরী : 'বানান সংস্কার', দেশ, ২৫শে চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

৩. করুণাময় মুখোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.),

৪. কালীকৃষ্ণ গুহ : 'বাংলা বানান', দেশ, ১৮ই চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

৫. জগন্নাথ চক্রবর্তী : বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব, চৈত্র ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ (১৯ মার্চ ১৯৭৮ খ্রি.)।

৬. নীলরতন সেন : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ,দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

৭. প্রসূন দত্ত : 'বাংলা মুদ্রণ', দেশ, ২৫শে চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

৮. প্রবোধচন্দ্র সেন: বাংলা বানান সংস্কার, ১লা বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ (১৯৬৭ খ্রি.)।

৯. বিজয়া দাশগুপ্ত : 'বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ', দেশ, মাঘ, ৩৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

১০. বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ : 'বাংলা অভিধান প্রসঙ্গ',দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

১১. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা বানান',দেশ, ১৮ই চৈত্র, ৩৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

১২. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। বানান সংস্কার, ২৫ চৈত্র ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

১৩. রামেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

১৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ, ২১ মাঘ ১৩৭৩ (১৯৬৬ খ্রি.)।

১৫. সমীরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী নাম ও শব্দ', দেশ, ফাল্গুন, ১৬ সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬ খ্রি.)।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে আইনি সীমাবদ্ধতা : ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইনের মূল্যায়ন

সীমা ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার-১, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপঃ আমাদের সমাজের অন্যতম কাঠামোগত সংকটের দৃষ্টান্ত হল লিঙ্গগত বৈষম্য। এই বৈষম্যের অন্যতম অভিঘাত হল নারীর ওপর সম্পাদিত হিংসা। নারীর ওপর সম্পাদিত হিংসার অন্যতম রুপ হল গার্হস্থ্য হিংসা। গার্হস্থ্য হিংসা অবশ্যই লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দ। তবে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে রাষ্ট্র মূলত আইন প্রনয়নকেই অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই ২০০৫ সালে গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইন প্রনীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে সকল লিঙ্গের মানুষকেই গার্হস্থ্য হিংসার থেকে রক্ষা করবার কথা বলা হয়েছে। আমি অবশ্য ২০০৫ সালের আইন নারী সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে কিনা বা আইন প্রনয়নের সমস্যার দিক গুলির ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করব। আইন বাস্তবায়ন যদি সঠিকভাবে না হয়ে থাকে তাহলে কেন হচ্ছে না সেই বিষয়কেও উপস্থাপন করতে চেষ্টা করব।
সূচক শব্দঃ গার্হস্থ্য হিংসা, নারী-নির্যাতন,পরিবার, ক্ষমতা-কাঠামো, পুরুষতন্ত্র, লিঙ্গ-রাজনীতি।

মূল আলোচনাঃ

আবহমান কালব্যাপী নারীর বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা মানবতার লজ্জার ন্যায় আমাদের তথাকথিত সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। নারীর বিরুদ্ধে হিংসা বা নির্যাতনের ঘটনা আমাদের ভারতবর্ষেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর ভারত রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার মূল রাজনৈতিক মাধ্যমে পরিনত হয় সংবিধান। ভারতীয় সংবিধান লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠাকে তাত্ত্বিকভাবে মান্যতা প্রদান করেছে।[i] তার কারণ ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তবে সংবিধানের ঘোষিত নীতির সাথে বাস্তব পরিস্থিতির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নারীর লিঙ্গগত পরিচিতির কারনে অত্যচার, হিংসা ও নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। কেবলমাত্র লিঙ্গগত পরিচিতির কারনে হিংসার স্বীকার হওয়ার কারনে নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন অন্যান্য অপরাধের থেকে পৃথকভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। নারীকে তার লিঙ্গগত পরিচিতির কারনে যে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়,সেই বিষয়টিকে দুইটি পরিসরে বিভাজিত করা সম্ভব। বাহ্যিক বা সামাজিক ও আভ্যন্তরীণ বা গার্হস্থ্য পরিসর।[ii] বাহ্যিক পরিসরে নারীর বিরুদ্ধে হিংসার সাথে গার্হস্থ্য পরিসরে সম্পাদিত

অত্যাচারের চরিত্রগত প্রভেদ আছে। বাহ্যিক পরিসরে সম্পাদিত হিংসার থেকে গার্হস্থ্য ব্যাপ্তিতে সম্পাদিত নির্যাতন অধিকতর কাঠামোগত। গার্হস্থ্য পরিসরে সম্পাদিত হিংসার সাথে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো জনিত গৃহ পরিসরে নারীর বিরুদ্ধে সম্পাদিত হিংসা নির্ধারণ করা যথেষ্ট জটিল। তার কারণ গৃহপরিসরকে পবিত্র ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনার প্রবনতার এক ধারাবাহিকতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। আইন যেহেতু বাহ্যিক বিষয়, সেই কারনে পবিত্র পারিবারিক ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ উচিত নয়। এইরুপ বদ্ধমূল পবিত্র ও আইনের অপ্রবেশ্য ধারনার কারণে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা ঘটতে থাকে। গার্হস্থ্য হিংসাকে নির্ধারণ ও নিবারণের ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকে। সেই কারণে আইনের মাধ্যমে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারণের পথ যথেষ্ট মসৃন হয়নি। তবে ১৯৮০ এর দশক থেকে গার্হস্থ্য পরিসরে নারীকে হিংসার থেকে প্রতিবিধান প্রদানের সামাজিক দাবি উত্থাপিত হতে থাকে।[iii] যে দাবির ক্রমপরম্পরার পরিনতিতে ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইন প্রনয়ন করা হয়। এই আইনের প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল গার্হস্থ্য হিংসাকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করা।

২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে গৃহ পরিবেশকে নির্যাতন মুক্ত করা। তবে আমি এই আইনের প্রভাব গৃহ পরিবেশে নারীদের ওপর কেমন হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধের বিষয়টি কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় সর্বদা। তার কারন আমাদের বিবেচনায় পরিবারকে সমাজিকভাবে পবিত্র মনে করা হয়। সেই জন্য গার্হস্থ্য হিংসা নিবারনের কারনে পরিবারের সম্পর্ক কাঠামো ভেঙ্গে যাক তা কখনই চাওয়া হয় না। পরিবারের কাঠামোগত ভিত্তি বিবাহকেও অনুরুপ পবিত্রতার ধারনা থেকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এই কারনে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অত্যাচারের ঘটনা যখন ঘটে তখন আইনি সুরাহার পরিবর্তে মীমাংসাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বিবাহ ও পরিবারের ক্ষেত্রকে আইনের পরিবর্তে বিশ্বাসের নিরিখেই বিবেচনা করা হয়। তাই গৃহ পরিসরে নারীর বিরুদ্ধে সম্পাদিত হিংসা প্রতিরোধ আইনের প্রয়োগ যথেষ্ট জটিল ও সমস্যা সংকুল বিষয়। পরিবারকে পবিত্র ও অকৃত্রিম মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তার কারণ মানব সভ্যতার সূচনাপর্বে মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ জীবন-যাপন করত। মানুষের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উন্মেষের পরই পরিবারভিত্তিক কাঠামো গড়ে ওঠে।[iv] পরিবার কেন্দ্রীক ধারণার সূত্র ধরেই নারীর এক-বিবাহ রীতি গড়ে ওঠে। এই এক-বিবাহ রীতি ভিত্তিক পরিবার গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আসলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রটিকে সমস্যা মুক্ত করা।[v] পরিবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠেনি। পরিবার নির্মানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। পরিবারের মধ্যে সম্পদ তৈরির কাজ মূলত পুরুষের মাধ্যমে সম্পাদিত হত, তাই গার্হস্থ্য কর্মের মূল্য কমতে থাকে। গার্হস্থ্য কর্ম মূলত নারীরা সম্পাদিত করত। সেই

কারণে পরিবারের পরিসরে নারীর কর্মের মূল্য ক্রমশ গৌন হতে যায়। নারীর সম্পাদিত কর্মের মূল্য গৌন হওয়ার পরিনতিতে সামগ্রিকভাবে পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে পারিবারিক সম্পর্ক ক্রমশ বৈষম্যমূলক হয়ে ওঠে। পরিবারে তৈরি হয় লিঙ্গ বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা। নারী পুরুষের সম্পর্ক হয়ে যায় আধিপত্য ও অধীনতার। পুরুষ আধিপত্যকারী আর নারী অধীনত। এই লিঙ্গগত বৈষম্য থেকেই নির্মিত হয়ে থাকে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পরিবার পরিচালিত হতে থাকে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার লিঙ্গগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে। পরিবারের অভ্যন্তরীন ক্ষমতা কাঠামোর বৈষম্য নারীর প্রতি সম্পাদিত গার্হস্থ্য হিংসার অন্যতম কারণ। আধিপত্যবাদী ক্ষমতা কাঠামোর কারনে নারী সর্বদা পরিবারের পরিসরে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই নিয়ন্ত্রন অনেক সময় অদৃশ্য থাকে। তখন নারী উপলব্ধি করতে পারে না তারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বৈষম্যমূলক লিঙ্গভিত্তিক ব্যবস্থাকে সমাজ স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। এর ফলে গৃহ পরিসরে নারীর বিরুদ্ধে সম্পাদিত হিংসার স্বাভাবিকীকরণ ঘটে। এই স্বাভাবিকীকরণ নারী নির্যাতনকে স্থায়ী রূপ প্রদান করে থাকে। পারিবারিক ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ক্রিয়াশীল পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আইনের মাধ্যমে তিরোহিত করা সম্ভব নয়। তার কারণ আইন প্রনয়নের মাধ্যমে মূলত অত্যাচারিত নারীকে সুরাহা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ২০০৫ সালের আইনের ক্ষেত্রেও অত্যাচারিতার ওপর সম্পাদিত হিংসার অন্যায় দূর করবার কথা বলা হয়েছে। তবে কেন অত্যাচারিত হল সেই বিষয় প্রতিকারের ভাবনার উপস্থিতি নেই। নারী নির্যাতন সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যেই একপ্রকার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেখানে নারীর বিরুদ্ধে হিংসাকে কাঠামোত ভিত্তি থেকে বিবেচনা করা হয় না। আইন আসলে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করবার লক্ষ্য থেকে নির্মিত হয়নি, হয়েছে অত্যাচার পরবর্তী সুরাহা প্রদানের উদ্দেশ্যে। ২০০৫ সালের আইনেও পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে দূর করবার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয় না। নারীর বিরুদ্ধে সম্পাদিত গার্হস্থ্য হিংসাকে কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা না করা ২০০৫ সালের আইনের অন্যতম সীমাবদ্ধতা।

২০০৫ সালের আইনে গার্হস্থ্য হিংসার সংজ্ঞায় অত্যাচারের একাধিক চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শারীরিক নির্যাতনের সাথেই মানসিক আঘাত ও অর্থনৈতিক বঞ্চনাকেও যুক্ত করা হয়েছে।[vi] গার্হস্থ্য হিংসার ধারণাকে শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপ্তি থেকে মুক্ত করে সম্প্রসারিত করা অবশ্যই ২০০৫ সালের আইনের অন্যতম ইতিবাচক দিক। তবে এই আইনে নির্ধারিত বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার কারণ শারীরিক নির্যাতন যথেষ্ট স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। তাই শারীরিক অত্যাচার সহজেই অনুধাবন করা যায়। তবে মানসিক নির্যাতন চিহ্নিত করা খুবই জটিল ও কষ্টসাধ্য একটি বিষয়। মানসিক অত্যাচার নির্নয় করবার ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞান থাকা খুবই প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্র শক্তি এব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে

না। আইন প্রনয়ন ও প্রনীত আইন বাস্তবায়ন কখনই একই বিষয় নয়। প্রনীত আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মান না করতে পারলে গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারীকে কার্যকরী সুরাহা প্রদান করা সম্ভব হবে না। অত্যাচারিত নারী বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ জানাবার সঠিক অবলম্বন পায় না। এই ব্যাপারে অত্যাচারিত অসহায় নারীকে সাহায্য প্রদানের দায়িত্ব বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে প্রদান করা হয়েছে। তবে অসহার নারীকে সাহায্য প্রদানের সে প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল। রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই উদাসীনতাকে বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না। আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক প্রবনতার উপস্থিতি রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উথাপিত হতে বাধ্য পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেন গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারীদের সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট? আসলে উত্তর –ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা গনতান্ত্রিক কাঠামোকে অনুসরণ করে থাকে। গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৃহত্তর অর্থকে গ্রহন না করলেও নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহনের অধিকার রয়েছে। এই কারনে নারীর অধিকার প্রদানের প্রতীকী দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অবশ্য নারীর বিরুদ্ধে হিংসা প্রতিরোধে আইন প্রনয়নের সামাজিক তাগিদ তৈরি হয়। গনতান্ত্রিক নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে আইন প্রনীত হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে নারীকে গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মুক্ত করতে চাইলেও সেখানে আন্তরিকতার অভাব থাকে। সেই কারনে আইন প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি রাজনৈতিক তাগিদ থেকে নির্ধারিত হলেও, সেখানে প্রকৃত সমস্যা সমাধানের মৌলিক তাগিদের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো ও আইন প্রনয়নের প্রতীকী ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে নারীর ওপর সম্পাদিত অত্যাচার বিরোধী পদক্ষেপ গুলি। পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামো নারীকে অধস্তন হিসাবেই দেখতে চায়, কিন্তু নির্বাচনী বাস্তবতার কারণে আইন প্রনয়নে বাধ্য হয়েছে। আসলে আইন প্রনয়নের মাধ্যমে লিঙ্গ-রাজনীতির ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করবার উদ্দেশ্য রাষ্ট্র শক্তির নেই। আসলে নারীর অধস্তন অবস্থানের উন্নতি না করতে পারলে গার্হস্থ্য হিংসা মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়।

২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধের আইন নিঃসন্দেহে নারীর বিরুদ্ধে হিংসা প্রতিরোধের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কারন ভারতে ২০০৫ সালের এই আইনটিই হল প্রথম বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যা গার্হস্থ্য হিংসার আইনসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে গার্হস্থ্য হিংসার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। ২০০৫ সালের আইনের পূর্বে ৪৯৮(এ) ধারা অনুযায়ী ন্যায় বিচার প্রদান করা হত। তবে নারীকে সেক্ষেত্রে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতনের প্রথাগত ধারনাকে সম্প্রসারিত করেছে। যেখানে নারীর বিরুদ্ধে হিংসাকে বহুমাত্রিক চরিত্র প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রসারিত হিংসার সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে-

শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, আবেগগত, মৌখিক অবমানার ন্যায় বিষয়গুলি। নারীর বিরুদ্ধে হিংসার ধারনায়নে বিবাহ সংক্রান্ত যৌতুক ও শারীরিক নিগ্রহ এই দুইটি সাবেক বাধাধরা চিন্তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রকল্পের ধাঁচাকে লঙ্ঘন করে নারীর বিরুদ্ধে হিংসাকে অ-বিবাহিত অবস্থা ও অ-শারীরিক নির্যাতনের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করবার প্রবনতা শুরু হয়। নারীর বিরুদ্ধে হিংসার প্রেক্ষিত সম্প্রসারিত করেছিল ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন। আবার এই আইনই প্রথম নারীর বিরুদ্ধে হিংসা বলতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্ক বিন্যাসকে বোঝানোর পরিবর্তে, পারিবারিক সকলপ্রকার সম্পর্কগুলিকে এর আওতাভুক্ত করেছে। ২০০৫ সালের আইনই হল প্রথম বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যা বৈবাহিক কাঠামোর বাইরে অবস্থিতসকল সম্পর্কের মধ্যে সংঘটিত হিংসাকে গার্হস্থ্য হিংসা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসার প্রতিরোধক আইনের সম্প্রসারিত ব্যাপ্তিও নারীর বিরুদ্ধে হিংসার ধারাবাহিকতায় কোন প্রকার ছেদ আনতে পারেনি। বাস্তবিক অভিজ্ঞতা প্রমান করে ২০০৫ সালের আইন নারীর বিরুদ্ধে হিংসা বন্ধ করতে কার্যকরী সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারেনি। এই আইনের মূল সমস্যা হল এখানে গার্হস্থ্য হিংসার সংজ্ঞায় যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার কেন্দ্রীয় একমাত্রিক কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। অন্যভাবে বলা যায় আইন যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছে তার সার্বিক গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেনি। আদালত বা আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে সেই ব্যাখ্যা প্রদান করেন,অনেক ক্ষেত্রেই যা পুরুষতান্ত্রিক নারী বিদ্বেষী ভাষ্যের জন্ম দিয়ে থাকে। ফলে প্রনীত আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের বিপরীত অবস্থা তৈরি হয়। সংজ্ঞায় উল্লেখিত safety, well-being, Dignity of women, Humiliation, ridicule প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যাখ্যার সার্বিক মানদন্ডের অভাব নারীর কাঙ্খিত ন্যায় বিচার পাওয়ার সম্ভাবনাকে দুর্বল করে তোলে। এই আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় নারী অত্যাচারিত হতে পারে। অর্থাৎ নারী একপ্রকার অত্যাচারের বস্তু (Women are the object of oppression)- এই ধারনার ওপর ভিত্তি করে আইন প্রনয়ন হয়েছে (Bhattacharya2008)। এই ধারনার মধ্যে একপ্রকার পুরুষতান্ত্রিকতা কাজ করেছে। সেই কারনেই আইন প্রনয়ন করে অত্যাচারিত নারীকে সুরক্ষা প্রদান করতে বলা হয়েছে। আবার নিরাপত্তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও হিংসার শিকার মহিলাকে প্রমান করতে হয় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা প্রমান করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক। সেই কারনে আইনের অন্তরালে নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ধারাবাহিক থাকে।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে ২০০৫ সালের আইনে একাধিক খামতি রয়েছে। যে খামতির প্রেক্ষিতে একাধিক কারণ দায়ি রয়েছে। যে কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল সমাজ মানসিকতা প্রতিরোধ। আসলে নারীর বিরুদ্ধে হিংসার অভিযোগকে সন্দেহের চোখে দেখবার প্রবনতা আজও সমানভাবে সক্রিয়

রয়েছে। আইন বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত রয়েছে পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থা। যে প্রতিষ্ঠান দুটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সাথে যুক্ত রয়েছে ব্যক্তি মানুষ। যে ব্যক্তি মানুষ অনেক সময় নিজের বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তার ফলে আইনের উদ্দেশ্যও অনেক সময় পূরণ করা সম্ভব হয় না। আইন বাস্তবায়নে ব্যক্তি মানুষের বিবেচনাধীন ক্ষমতা আইনের কার্যকারী প্রয়োগের সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে থাকে।

তথ্যসূত্র:

i. রায় সৌম, লিগাল কনসট্রাকসান অফ ডোমেসটিক ভায়োলেন্স, সোসিওলজিক্যাল বুলেটিন, সংখ্যাঃ৫৫, সালঃ২০০৫, সেজ প্রকাশনী,পৃঃ৪২৭

ii. চ্যাটার্জী পার্থ, ১৯৯৭, দ্যা নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্যাগমেন্টস , অক্সফোর্ড প্রকাশনী,দিল্লী,পৃঃ৬

iii. কোটারী জয়না,ক্রিমিনাল ল্য অন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ইকোনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি,সংখ্যাঃ৪০পৃঃ৪২০

iv. এঙ্গেলস,ফ্রেডরিক,১৯০৯,দ্যা অরিজিন অফ দ্যা ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্যা স্টেট, চার্লস খের কোম্পানি প্রকাশনী,লন্ডন পৃঃ১৩৭

v. তদেব,১৩৮

vi. গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারী সুরক্ষা আইন,https://www.indiacode.nic.in।

সেকাল – একালের সেতুবন্ধন : প্রসঙ্গ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জাতিস্মর’ (গল্প গ্রন্থ)

বনমালী খাটুয়া
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: ব্যোমকেশের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির জন্য বিশেষ পরিচিতি পেলেও ইতিহাসধর্মী গল্প রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। বিশেষ করে জাতিস্মরের গল্পগুলি পাঠক মহলে যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। শরদিন্দুর লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘জাতিস্মর’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এই গ্রন্থে মোট তিনটি গল্প রয়েছে –
‘অমিতাভ’, ‘রুমাহরণ’ও ‘মৃৎপ্রদীপ’। গল্প তিনটি বর্ণিত হয়েছে – গুহাবাসী অরণ্যচর মানুষের প্রাক্ ইতিহাস, ষোড়শ মহাজন পদের চালচিত্রে বুদ্ধদেবের আলোক সামান্য আবির্ভাব, পাশাপাশি চতুর্থ শতকের শুরুতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩১৯ – ৩৩০ খ্রিঃ) রনবীর চন্দ্রবর্মার পাটলিপুত্র আক্রমণের একজীবন ইতিহাস। শরদিন্দু গল্প তিনটির মধ্যে দিয়ে সেকাল – একালের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছেন এক অভিনব জাতিস্মর কল্পনার আশ্রয়ের মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি গল্পে গল্পকার ইতিহাসের সত্যের উপর এক অভিনব কল্পনার রংমশাল জ্বালিয়েছেন এবং জাতিস্মরের ফ্রেমে বসিয়ে দিয়েছেন সেগুলিকে।

সূচক শব্দ : ভূমিকা, ঐতিহাসিক গল্প, জাতিস্মর, অমিতাভ, রুমাহরণ, মৃৎপ্রদীপ।

রবীন্দ্রোত্তর কালের একজন স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক একজন লেখক হয়েও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আপন স্বাতন্ত্র। তাঁর সৃষ্টির বহুমুখীনতা, বিচিত্রময়তা ও উপস্থাপন রীতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তথা মনোমুগ্ধকর। ব্যোমকেশের স্রষ্টা হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ঘটলেও অলৌকিক গল্প রচনায়, চিত্রনাট্য পরিবেশনে এবং ইতিহাসের ধূসর জগতে ডুব দিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পগুলি রচনার ক্ষেত্রে যে পারদর্শিতা তিনি দেখিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এক্ষেত্রে বলতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে গল্প-উপন্যাস লেখার যে অনীহা দেখা দিয়েছিল শরদিন্দু তাকেই উপজীব্য করে বহু ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন । ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে ঘিরে যখন আধুনিক যুগের নান্দীপাঠ শুরু হয়েছে তখন সুদূর অতীতে চোখ মেলেছেন শরদিন্দু। কখনো কখনো জাতিস্মরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অতীতের রোমান্টিক মায়াবী চিত্রকে স্থান দিয়েছেন গল্পে। এই জাতিস্মরের মধ্যে দিয়ে লেখক

অতীতকে নিয়ে এসেছেন বর্তমানে। অতীতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ও কাহিনিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন দুটি কাল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জাতিস্মরের গল্পে লেখক নিজেই কখন জাতিস্মর, আবার কখন বা জাতিস্মরের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন অপর কোন চরিত্রকে। আসলে অনন্ত পথের যাত্রী হল মানুষ, সুদূর অতীতের পথ বেয়ে সে বর্তমানের পথে চলেছেন হেঁটে। অতীতে মানুষ কেমন ছিল, আর বর্তমানে কি হয়েছে, এই ভাবনা ও বিশ্বাসকে জাতিস্মরের মুখে বসিয়েছেন লেখক। তিনি বলেছেন –

> "মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিলনা। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আরেক জনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আর মানুষের মধ্যে ক্রুরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়েই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয় ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুন ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।"[১]

যদিও জীববিজ্ঞানে একথা মানা সম্ভব নয় তবুও জীবন প্রসঙ্গে শরদিন্দুর যে অনুসন্ধান, তা পাঠক হৃদয়ে দাগ কেটে দেয় সহজে। আমার এই আলোচনা সন্দর্ভটি মূলত জাতিস্মর গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত তিনটি গল্প – 'অমিতাভ', 'রুমাহরণ' ও 'মৃৎপ্রদীপ' – এ কিভাবে লেখক সেকাল ও একালের ঘটনার মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছেন তারই এক সংক্ষিপ্ত আলোকপাত।

ঐতিহাসিক উপন্যাস এর পাশাপাশি ইতিহাসধর্মী গল্প রচনাতেও শরদিন্দুর কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর প্রধান গুণ হল - গল্প বলার এক অসাধারণ শক্তি। লেখকের ইতিহাস প্রীতি ও কল্পনার বিস্তার ছিল দিগন্ত প্রসারী, তা যেন মর্তলোক থেকে চন্দ্রলোক পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। দেশ-কাল-নিরপেক্ষ অতীতের কল্পিত বিষয়গুলিকে রক্তিম আভায় নর-নারীর জীবন সত্যে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। তাঁর ঐতিহাসিক গল্পগুলিতে একদিকে যেমন অতীত ইতিহাসের চিত্র রূপায়িত, অন্যদিকে মানব হৃদয়ের জটিল রহস্য উন্মোচিত। লেখক সহজ সরল ভাষায় অভিনব আকারে গল্পগুলিকে যেভাবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন তা পাঠক মনে যথেষ্ট বিস্ময় জাগায়। শরদিন্দু ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বর্ণনা করাই ঐতিহাসিক গল্পের লক্ষ্য মনে করতেন না, বরং তৎকালীন আবহাওয়ায় নতুন কিছু সৃষ্টি করাকেই জীবনের উদ্যম বলে মনে করতেন তিনি। ঐতিহাসিক গল্প লেখার ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এক সাক্ষাৎকারে শরদিন্দু মন্তব্য করেছিলেন -

> "ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় - বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি, গল্প

> আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, অস্ত্র আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী ।"[২]

শরদিন্দু ছিলেন একজন প্রকৃত ইতিহাস পিপাসু পাঠক। তার কল্পনাশক্তি ছিল সুদূর প্রসারী। তাই তাঁর ঐতিহাসিক গল্প গুলির বিস্তার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। তাঁর এই ধরনের গল্প গুলির অভিনবত্ব এই যে - দীর্ঘকালের ইতিহাসকে মনের আরশিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে শরদিন্দু লিখেছেন বহু গল্প। ব্যোমকেশ বা বরদার আখ্যানের পাশাপাশি নানা সামাজিক, অতিপ্রাকৃত গল্পও লিখেছিলেন তিনি। তবে তাঁর ঐতিহাসিক গল্পগুলি ছিল বিশেষ চমকপ্রদ। শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পের সংখ্যা সতের। এই গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

'অমিতাভ', 'রক্ত সন্ধ্যা', 'মৃৎপ্রদীপ', 'বাঘের বাচ্চা', 'রুমা হরণ', 'অষ্টম স্বর্গ', 'চুয়া চন্দন', 'বিষকন্যা', 'চন্দন মূর্তি', 'সেতু', 'মেরু ও সংঘ', 'প্রাগজ্যোতিষ', 'ইন্দ্রতুলক' প্রভৃতি। যদি আমরা দেখি পূর্বকার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লেখা হয়েছে মোগল অন্তঃপুর, শাহী দরবার, আরাবল্লীর গিরিদুর্গ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। সেই কারণে শরদিন্দু মুসলমান অধিকার কালে তিন চারটি গল্পের বেশি লেখার উৎসাহ দেখাননি। আমরা যদি তার গল্পগুলি কালানুক্রমে পড়ি তবে মানব সভ্যতার একটা আবছা ছবি পেতে পারি। শরদিন্দর দুটি গল্পের কাহিনি কাল আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে (শঙ্খ – কঙ্কন), আর একটি গল্প বলা হয়েছে শিবাজী প্রসঙ্গে। উদাহরণ স্বরুপ আমরা বলতে পারি 'বাঘের বাচ্চা' গল্পটির কথা। অন্যদিকে শাহ সুজার রাজত্বকালের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে 'তক্ত মোবারক'। তবে পরিপূর্ণ ধারণা লাভের জন্য সুকুমার সেন প্রদত্ত ঐতিহাসিক গল্পগুলির কালানুক্রমিক সূচি তুলে ধরা হল – খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ – একাদশ শতকের কাহিনি নিয়ে লেখা গল্প – 'আদিম'। খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ শতকে লেখা 'প্রাগজ্যোতিষ', খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ – পঞ্চম শতকের কাহিনি নিয়ে লেখা – 'অমিতাভ', 'বিষকন্যা ', ও 'সেতু'। চতুর্থ – পঞ্চম শতকে লেখা 'মৃৎপ্রদীপ', 'অষ্টম সর্গ' এবং 'মরু ও সঙ্গ'। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাহিনিকে নিয়ে লেখা – 'শঙ্খ – কঙ্কণ', 'রেবা রোধসি'। চতুর্দশ – পঞ্চদশ শতকে লেখা – 'রক্ত সন্ধ্যা' ও 'চুয়াচন্দন'। সপ্তদশ শতকে লেখা দুটি গল্প – 'বাঘের বাচ্চা', 'তক্ত মোবারক'। অবশিষ্ট তিনটি গল্পের মধ্যে 'রুমাহরণ' ও 'ইন্দ্রতূলক' এর কাল অজানা এবং 'চন্দন মূর্তি' গল্পটিরও কাল সঠিক জানা যায়নি । তবে অনুমান করা হয় রচনাটি অধুনা কালের ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ- 'জাতিস্মর'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এই গ্রন্থে মোট তিনটি গল্প ছিল – 'রুমাহরণ', 'অমিতাভ', এবং 'মৃৎপ্রদীপ'। গল্পগুলিতে বর্ণিত হয়েছে গুহাবাসী অরণ্যচর মানুষের প্রাক্‌ ইতিহাস,

ষোড়শ মহাজন পদের চালচিত্রে বুদ্ধদেবের আলোক সামান্য আবির্ভাব, পাশাপাশি চতুর্থ শতকের শুরুতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩১৯-৩৩০ খ্রিঃ) রণবীর চন্দ্রবর্মার পাটলিপুত্র আক্রমণের এক জীবন্ত ইতিহাস। লেখক শরদিন্দু গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে সেকাল - একালের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন এক অভিনব জাতিস্মর কল্পনার আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে। জাতিস্মরের কল্পনায় লেখক আর দুটি গল্প লিখেছিলেন – 'বিষকন্যা' ও 'রক্তসন্ধ্যা'। প্রতিটি গল্পে শরদিন্দু ইতিহাসের সত্যের উপর এক অভিনব কল্পনার রংমশাল জ্বালিয়েছেন এবং জাতিস্মরের ফ্রেমে বসিয়ে দিয়েছেন সেগুলিকে।

'অমিতাভ' (১৩৩৬-১৩৩৭) গল্পে গল্পকথকই জাতিস্মরের ভূমিকায় ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গকে এনেছেন পাঠকের সামনে। গল্পের শুরুতে গল্পকার লিখেছেন-

> "আমি জাতিস্মর, ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানি - জাতিস্মর। উপহাসের কথা - অবিশ্বাসের কথা। কিন্তু তবুও আমি বারবার - বোধহয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখন দাস হইয়া জন্মিইয়াছি, কখন সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে।"[৩]

গল্পকথকের জীবনের নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনি স্মৃতিপটে ভিড় করে রয়েছে। অতীতের মায়াময় জগতের কাছে বর্তমান জগৎ ধূম - কুন্ডলীর মতো যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। গল্পকথক এন্ট্রাস পাস করে সামান্য রেলের কেরানির কাজ করলেও তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাজগীরের ধ্বংসস্তূপ। এই স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তার চোখের সামনে থেকে সরে যায় কালের যবনিকা। দু - তিন হাজার বছরের সভ্যতার বহতা পেরিয়ে সেই মানুষটাই আবিষ্কার করে নিজেকে - কখনো দাস , কখনো বা সম্রাট পরিচয়ে। মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিভিন্ন শিলালিপি দেখে তাঁর মনে উদিত হয় কুষাণরাজ কনিষ্কের যুগে সে ছিল পুন্ডুরিক। পাশাপাশি ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে নানা ঐতিহাসিক চরিত্র, যেমন – অজাতশত্রু, বিম্বিসার, শ্রীমন্মহারাজ, অমিতাভ প্রমুখ। আবার জাতিস্মরের কল্পনায় ভেসে উঠেছে তৎকালীন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ স্থান - মগধ, কোশল, বৈশালী, লিচ্ছবি, তক্ষশীলা, কুশীনগর, রাজগীর প্রভৃতি। গল্পটির একটি বিশেষত্ব হল - ক্ষণিকের জন্য এখানে আনা হয়েছে বুদ্ধদেবকে। এই সময় মগধের সিংহাসনে বসেছেন অজাতশত্রু। পিতা বিম্বিসার বুদ্ধভক্ত হলেও পুত্র অজাতশত্রু ছিলেন বুদ্ধবিদ্বেষী। পিতা-পুত্রের এই যে বিপরীত মানসিক অবস্থান তা আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয় -

> "অজাতশত্রু রাজা হল যবে পিতার আসনে আসি
> পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
> মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে
> সঁপিল যজ্ঞ অনল আলোতে

বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি।”[৪]

অজাতশত্রুর রাজত্বকালে তাঁর দুই প্রতিপক্ষ ছিল - উত্তরে লিচ্ছবি রাজবংশ এবং পশ্চিমে কোশল রাজবংশ। এই দুই শক্তির হাত থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য তিনি ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সঙ্গমস্থলে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য সামন্ত অবস্থান করার মত এক দুর্গ স্থাপন করেছিলেন ,যা অনেকটাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এককথায় 'অমিতাভ' গল্পে গল্পকথক জাতিস্মরের মুখ ও চোখ দিয়ে অতীত ইতিহাসের নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সূত্রে গ্রোথিত করেছেন । ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে বুদ্ধদেব ও অজাতশত্রুকে এই গল্পে স্থান দিলেও বেশিরভাগ ঘটনা ও কাহিনি গ্রন্থনে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন গল্পকার।

'জাতিস্মর' গল্পগ্রন্থের অপর এক গল্প হল – 'রুমাহরণ'। গল্পটিতে তুলে ধরা হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক কল্পিত কাহিনিকে। গল্পের শুরুতে গল্পকার লিখেছেন-

> “চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা নামক জনৈক নাগরিকের ঘৃণিত জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি।”[৫]

এই গল্পের নায়কই জাতিস্মর। গল্পের শুরু তাঁরই পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণের মধ্য দিয়ে। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা পাটালিপুত্রের প্রাসাদভূমির এক অর্ধশুষ্ক কূপের মধ্যে চক্রায়ুধকে নিক্ষেপ করেছিলেন। ঐতিহাসিক চরিত্র চন্দ্রবর্মন ছিলেন পুষ্করণা রাজ্যের একজন রাজা। এই রাজ্যটি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ভূ-খণ্ডে অবস্থিত ছিল। পাশাপাশি জানা যায়, এই রাজ্যটি স্থাপিত হয়েছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের অব্যবহিত পূর্বে। রাজা সিংহবর্মনের পুত্র ছিলেন এই চন্দ্রবর্মন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া অঞ্চলে অনেক শিলালিপিতে চন্দ্রবর্মার রাজত্বকালের মেলে নানা প্রসঙ্গ। এছাড়া গল্পটিতে গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, কুমারদেবী, সোমদত্তা সহ নানা ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। গল্পকার প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রসঙ্গ টানলেও এই গল্পটিতে প্রাধান্য পেয়েছে লেখকের এক কল্পিত কাহিনি।

'রুমাহরণ' গল্পে রেলের কেরানি পূজার ছুটিতে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াতে যান। স্থানটি ছিল নির্জন ও দূরধিগম্য। এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য গল্পকথককে নিয়ে যায় এক কল্পলোকে। বনভূমির উপর আলো ও ছায়ার মায়াময় পরিবেশে কথক শুনতে পায় সুমিষ্ট সুরেলা গীত। এই গানের সঙ্গে কথকের যেন বহুদিনের চেনাজানা। যিনি গানটি গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন নারী । গানটির সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি থাকায় গায়িকা কাছাকাছি এলে কথক বলে ওঠেন –

> “ওঃ, কত কল্পান্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল। আমার প্রিয়া-আমার সঙ্গিনী-আমার রুমা। এতদিন কি তাহারই প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিলাম ?”[৬]

রুমা প্রথমে গল্পকথককে চিনতে না পারলেও পরে কথকের কপালের রক্তবর্ণ জড়ুল প্রসঙ্গ সামনে এলে রুমা চিৎকার করে ওঠে 'গাক্কা' বলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যচর গাক্কা আবিষ্কার করেন পূর্ব-স্মৃতি বিজড়িত জীবনের তথা জন্ম-জন্মান্তরের রুমাকে। রূপকথার গল্পের মত এই রুমা নাকি একসময় নিঃসৃত হয়েছিলেন পাহাড় দেবতার মুখবিবর থেকে। এই অপরূপা রুমাকে গক্কা একসময় দেখেছিলেন যৌবনের চক্ষু দিয়ে। তাকে হরণ করবার জন্য অবলম্বন করেছিলেন নানা কৌশল। এমনকি জোরপূর্বক তাঁর কপালে রক্ত রাঙিয়ে বৌ করে নিয়েছিলেন। গল্পকার গল্পের শেষে তাই লিখেছেন-

> "তুই আমার বউ। তুই আমার রুমা। এই রক্ত দিয়ে আমি তোকে আমার করে নিলাম।"[৭]

আসলে গল্পকার এই গল্পে মানব সভ্যতার একেবারে গোড়ার কথাটাই যেন বলবার চেষ্টা করেছেন। গল্পকারের কল্পনাশক্তি ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে 'রুমাহরণ' গল্পটি আজও পাঠক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত।

'মৃৎপ্রদীপ' (১৩৩৮), 'জাতিস্মর' গল্পগ্রন্থের অপর এক জনপ্রিয় অতীতাশ্রয়ী গল্প। গল্পকার এই গল্পের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি এখানে নিজেকে তুলে ধরেছেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য ঈশানবর্মার সাজে। এই ঈশানবর্মাই জাতিস্মরের ভূমিকায় নিজেকে অবতীর্ণ করে আজ থেকে প্রায় ১৬০০ বছর পূর্বের এক ঐতিহাসিক পটভূমিকে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। আসলে এই গল্পে ঈশানবর্মাই হলেন জাতিস্মর। তারই মুখ দিয়ে গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের নানা ঘটনাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। 'মৃৎপ্রদীপ' প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব মন্তব্য –

> "কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় জঞ্জাল স্তূপের মাঝে একটি মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। মুখের কাছে একটু যেন পোড়া দাগ লেগে রয়েছে। খননকারীরা হয়তো এটা ফেলে গেছেন কিংবা তাদের নজরে আসেনি। সেটি কুড়িয়ে এনে বাড়িতে টেবিলের উপর রেখে দিলাম এবং রাত্রে সেটি জ্বাললাম। কয়েকদিন ওই জ্বলন্ত প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি মাথায় আসে।"[৮]

গল্পটিতে গল্পকথক স্মৃতিকল্পনায় পৌঁছে গেছেন আজ থেকে বহু পূর্বে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এতদিন যে প্রদীপ অযত্নে পড়েছিল , কথক সেই প্রদীপ আবিষ্কার করে তারই উজ্জ্বল আলোয় স্মৃতি রোমন্থনের দ্বারা গুপ্তযুগের নানা তথ্যকে মেলে ধরেছেন পাঠকের সামনে।

আজ থেকে প্রায় ১৬০০ বছর পূর্বে মৌর্য রাজবংশের পতনের পর প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, প্রতিষ্ঠা করেন গুপ্তসাম্রাজ্যের। তখন ভারতের এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল মগধ। ইতিহাসে যে ষোড়শ মহাজন পদের উল্লেখ আমরা পাই তার মধ্যে এটি ছিল

একটি পদ। এই মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। মূলত এই স্থানটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গুপ্ত রাজবংশ, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরে । প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ক্ষুদ্র ভূ-স্বামী ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র। তাঁর বিবাহ হয়েছিল লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীর সঙ্গে। চন্দ্রগুপ্ত মূলত তাঁর শ্বশুরকুল ও শ্যালকদের সহায়তায় গড়ে তুলেছিলেন এক বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য। তিনি গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেও তাকে অনেকটাই প্রভাবিত করতেন তার শ্যালকবৃন্দ। তাছাড়া লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীও বিশেষভাবে প্রভাবিত করতেন তাঁকে। দেখা গেছে রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির পাশাপাশি উৎকীর্ণ হতে থাকে মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম। এমনকি রাজার নামে স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করতে থাকে রানী। ফলে নিষ্ফল ক্রোধে শ্যালককুলের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করে মৃগয়া , সুরা ও দ্যূত ক্রীড়ায় মনোনিবেশ করেন চন্দ্রগুপ্ত। একদিন তিনি তাঁর তিন সঙ্গীসহ মৃগয়া অর্থাৎ শিকারে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন চক্রায়ুদ ঈশানবর্মা। এই শিকারকালে জঙ্গলের মধ্যে এক সুন্দরী নারীকে দেখতে পায় চন্দ্রগুপ্ত। তার নাম ছিল সোমদত্ত , যার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন গুপ্তসম্রাট। শুধু যে সম্রাট মুগ্ধ হয়েছিলেন তা নয়, বাকী সঙ্গীরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন সোমদত্তার রূপে। সোমদত্তাকে দেখার পর চন্দ্রগুপ্ত মনে মনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাকে মহিষী করবার। অন্যদিকে ঈশানবর্মাও তাকে পাওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করেন চন্দ্রগুপ্তকে। কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া সোমদত্তাকে শেষ পর্যন্ত পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে মহিষীর স্থান দেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

এদিকে চন্দ্রগুপ্তের প্রথমা পত্নী কুমারদেবী বিষয়টি জানলেও তাতে বিশেষ হেলদোল দেখাননি। কারণ তখন সমাজে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। তাছাড়া অনেক রাজা একাধিক মহিষী নিয়ে সংসারও করতেন। তবে কুমারদেবী যে সোমদত্তাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি, তা তাঁর ভাবভঙ্গি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কুমারদেবীর মনে হয়েছিল সোমদত্তা আসলে গুপ্তচর। এদিকে সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তকে মনে মনে বসিয়ে ছিলেন স্বামীর আসনে। অন্যদিকে সোমদত্তাকে পেয়ে সমস্ত রাজকর্ম থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেন চন্দ্রগুপ্ত। সারাক্ষণ তিনি অতিবাহিত করতেন সোমদত্তার সঙ্গে। প্রথমা পত্নী কুমারদেবী তাঁর শিশুপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে পরিচালনা করতেন রাজকার্য।

ঠিক এরকম একসময় মগধ আক্রমণ করেন পুষ্করণা রাজ্যের সম্রাট চন্দ্রবর্মা। মগধের বেশ কিছু স্থান দখল করেন তিনি। তবে চন্দ্রবর্মার মূল লক্ষ্য ছিল পাটলিপুত্রের উপর। আর এ কারণেই নিজ কন্যা সোমদত্তাকে কৌশলে মগধে পাঠিয়েছিলেন গুপ্তচর হিসাবে। চন্দ্রগুপ্তের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হলেও খুব একটা বিচলিত হননি তিনি। কারণ এই সময় পাটলিপুত্রে সমস্ত রাজকার্য পরিচালনা করতেন কুমারদেবী। এদিকে কুমারদেবী চন্দ্রবর্মার গোপন অভীপ্সা জানতে পারলে পাটলিপুত্রের চারদিকে নিয়োগ করে অজস্র সৈন্য সামন্ত। এমনকি সমস্ত দুর্গদ্বার গুলিকে আর শক্তপোক্ত করেন অজস্র

প্রহরী দ্বারা। এদিকে চন্দ্রবর্মাও তাঁর সৈন্যসামন্ত দ্বারা ঘিরে ধরেন পাটলিপুত্রকে। তৎকালে জল পথে এদেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। পাটলিপুত্রেও আসত বাইরে থেকে খাদ্য। এই খাদ্য যাতে বাইরে থেকে আসতে না পারে কিংবা পাটলিপুত্রের মানুষজন খাদ্যের জন্য বাইরে যেতে না পারে তার জন্য চন্দ্রবর্মা কড়া নজর দিতে বলেন তার সৈন্যদের । এদিকে একদিন চক্রায়ুদ যখন দুর্গাদার পাহারা দিচ্ছিলেন তখন দূরে এক ঝোপের মধ্যে দেখতে পান প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে সোমদত্তা । চক্রায়ুদ তাকে দেখেই বুঝতে পারে সোমদত্তা আসলে গুপ্তচর । প্রথমে তা অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত তা স্বীকার করেন সোমদত্তা। পাশাপাশি এও বলেন যে , সে তাঁর পিতার নির্দেশে নিযুক্ত হয়েছেন গুপ্তচরের কাজে । উভয়ের নানা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সোমদত্তা তাঁর রূপ-যৌবনের জাদুতে ঈশানবর্মাকে নিয়ে আসেন নিজের অনুকূলে এবং তার পিতা চন্দ্রবর্মা যাতে পাটলিপুত্র অধিকার করতে পারেন সেক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করতে বলেন তিনি। এদিকে চক্রায়ুদ ঈশানবর্মা সোমদত্তাকে নিজের করে পাওয়ার আশায় পাটলিপুত্রের সকল গোপন তথ্য তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তাকে। সোমদত্তা হঠাৎ জানতে পারে তার পিতাকে দমন করবার জন্য বৈশালী থেকে বহু সৈন্য আনছেন কুমারদেবী। এমনকি পাটলিপুত্রে যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল তাও আর থাকবে না। কারণ সম্রাট অশোকের আমলে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহার থেকে সুড়ঙ্গ পথে খাবার আসে এই পাটলিপুত্রে । তবে বুদ্ধির কৌশলে সোমদত্তা অকিঞ্চনের কাছ থেকে জানতে পারে সেই সুড়ঙ্গের কথা । এরপর সোমদত্তা অনুসন্ধান চালায় রাজবাড়ীতে কোথায় রয়েছে সেই ধর্মচক্রব্যহ। শেষ পর্যন্ত জানা যায় সোমদত্তা যে ঘরে রয়েছেন তারই ছাদে রয়েছে সেই ধর্মচক্রব্যহ । এরপর গোপনে চক্রায়ুদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন সোমদত্তা। চক্রায়ুদকে তিনি বলেন অগ্নিসংযোগ করতে হবে রাজবাড়ীতে। তবে এই অগ্নিসংযোগ করবেন সোমদত্তা নিজেই। অন্যদিকে চক্রায়ুদকে যা করতে হবে-তা হল রাজবাড়ির মূল দরজাটিকে খুলে দেওয়া সঠিক সময়ে। কারণ এই পথেই চন্দ্রবর্মার সৈন্যরা প্রবেশ করবে রাজপ্রাসাদে । অগ্নি সংযোগের পর যখন চারিদিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকবে ঠিক তখনই চন্দ্রবর্মার সৈন্যরা প্রবেশ করবে পাটলিপুত্রে এবং দখল করবে তা। এই কথামতো সোমদত্তা একটি মাটির প্রদীপ দ্বারা অগ্নিসংযোগ করেন রাজপুরীতে । আগুনের শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে শোনা যায় এক তীব্র হাহাকার। এই অবস্থায় চন্দ্রবর্মা, তার সৈন্যসহ প্রবেশ করেন এবং অধিকার করেন পাটলিপুত্র। তবে সোমদত্তা পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও চন্দ্রগুপ্তসহ কুমারদেবীর জীবন ঠেলে দেয়নি ধ্বংসের মুখে। বরং তিনি চন্দ্রগুপ্তসহ কুমারদেবী ও তার পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন ঐ সুড়ঙ্গ পথে । চন্দ্রগুপ্ত একা যেতে না চাইলে সোমদত্তা বলেন -

> " না প্রিয়তম, আমি আর তোমার সঙ্গে যাইবার যোগ্য নহি । কেন নহি, তা দেবীর মুখে শুনিও। চন্দ্রবর্মা আমার পিতা – এই কথা মনে

> করিয়া যদি পারো আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা যাও আমি ভিন্নপথে যাইব।”[৯]

হৃদয় বিদারক স্বরে চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তাকে পুনরায় ডাকলে সোমদত্তা অশ্রু ভরা নয়নে বলতে থাকেন -

> “না , না ,ডাকিও না - আমি যাইতে পারিব না, আমায় মরিতে হইবে । প্রাণাধিক, আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে, তখন তোমার সোমদত্তাকে সঙ্গে লইও।”[১০]

এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সোমদত্তাকে ত্যাগকরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না চন্দ্রগুপ্তের।

চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তার দেখানো সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে গেলে পিতার কাছে গুপ্তচর বৃত্তির পুরস্কার চান সোমদত্তা। তিনি পিতার কাছে দুটি আর্জি পেশ করেন। প্রথমত- যেহেতু চক্রায়ুদ তার নারীত্বকে খর্ব করবার চেষ্টা করেছেন তাই তার কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড। দ্বিতীয়ত - একজন নারী হয়েও স্বামীর কাছে যে সম্মান রাখতে পারেননি, সেই কারণে এই নষ্টা দেহকে না বাঁচিয়ে রেখে তার পিতা যেন তাকেও চিরকালের জন্য জীবন থেকে মুক্তি দেন। চন্দ্রবর্মা শেষ পর্যন্ত মেয়ের শেষ ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে চক্রায়ুদকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন এবং কন্যাকে দেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এইভাবে গুপ্তবংশের একটি বিশেষ অধ্যায় কে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন শরদিন্দু । পরবর্তীতে জানা যায় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত তার বীরত্বের জোরে ফিরিয়ে আনেন গুপ্তসাম্রাজ্যের শ্রী।

‘মৃৎপ্রদীপ’ গল্পে শরদিন্দু গুপ্তযুগের একটি বিশেষ অধ্যায়কে তুলে ধরলেও এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে মানবচরিত্রের নানা মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি-জটিলতা। যে সোমদত্তা একসময় গুপ্তচর হিসাবে গুপ্তসাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল সেই সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তকে বসিয়েছিলেন স্বামীর আসনে। পিতার আদেশ পালন করতে গিয়ে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেওয়া চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের ধ্বংসকে তরান্বিত করেছিলেন তিনি । এমনকি নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যের একজন সামান্য সৈনাধ্যক্ষ চক্রায়ুদের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন - যা তার নারীত্বে তীব্র আঘাত হেনেছিল । পাশাপাশি নারী হৃদয়ের গভীরে যে চিরন্তন প্রেম লুকিয়ে থাকে তাও আমরা বুঝতে পারি সোমদত্তাকে দেখে। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখি স্বামীকে অবমাননা করবার ফলস্বরূপ তিনি নিজেই পিতার কাছে চেয়েছেন মৃত্যুদণ্ড। ঐতিহাসিক গল্পে ইতিহাসের স্থান কাল চরিত্রের পাশাপাশি যে সাহিত্যসত্য কিংবা মানবিক সত্যকে তুলে ধরতে হয় তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল শরদিন্দুর এই গল্পে। তবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নাগরিকদের জীবনযাত্রা, খাদ্য, বাসস্থান, যুদ্ধ, রাজপুরীর বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কল্পনা শক্তির আশ্রয় নিয়েছেন গল্পকার শরদিন্দু। ফলে গল্পটি হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক।

যেকোন গল্পের প্রধান গুন মনোহরণ – সামর্থ্য । তাই গল্প সহজে আকর্ষণ করে যে কোনো বয়সের মানুষকে। একটা সময় ইতিহাসের কাহিনি ও ঘটনাকে ঘিরে সূত্রপাত ঘটে গদ্যের। বিগত শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে কিছু গল্প লিখেছিলেন ইতিহাস অবলম্বনে। সেই পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গ রুপকে তুলে ধরেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর তারও পরে শরদিন্দু ইতিহাসকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে শুরু করেন একটি নতুন অধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ হল – 'জাতিস্মর'। যেখানে শরদিন্দু এক এইতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাস কল্পনা ও রোমান্সের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৎকালীন যুগজীবন, আচার – আচরণকে নিজস্ব ভাব ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। 'জাতিস্মর' ভাবনা বাংলা সাহিত্যে তথা শরদিন্দুর রচনায় নতুন হলেও বিদেশি সাহিত্যে তা নতুন নয় । এপ্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন –

> "আমি যতদূর জানি, বিখ্যাত মার্কিন গাল্পিক জ্যাক লন্ডন ও সর্ববিদিত ইংরাজ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক; জাতিস্মরের মুখ দিয়া গল্প বলাইবার চেষ্টা তাঁহাদের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এই দুই স্বর্গীয় লেখকের নিকট আমরা ঋণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি ।"[১১]

বিদেশি দুই লেখকের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করলেও বাংলা সাহিত্যে এধরনের এক অভিনব পর্যায়ের সৃষ্টি করে শরদিন্দু সুদীর্ঘ অতীতকে বর্তমানের সামনে যেভাবে মেলে ধরেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

তথ্য সূত্র:

১) শরদিন্দু অম্‌নিবাস (ষষ্ঠ খন্ড), পৃষ্ঠা- ২

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দুর: ঐতিহাসিক কহিনী সমগ্র,গ্রন্থ পরিচয় অংশ,প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী-১৯৯৮, প্রকাশক-আনন্দ পাবলিশার্স প্রা,লি,পৃষ্ঠা - ৮২৩ ।

৩) তদেব – পৃষ্ঠা – ৮২৩।

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সঞ্চয়িতা:কথা, প্রথম প্রকাশ-বইমেলা-২০০৬, শুভম পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা – ২৪০।

৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু: ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, গ্রন্থপরিচয় অংশ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, প্রকাশক- আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ৭৮।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৮২।

৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৪।

৮) জীবনকথা, শরদিন্দু অম্‌নিবাস, দ্বিতীয় খন্ড।

৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু: ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র, গ্রন্থপরিচয় অংশ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি- ১৯৯৮, প্রকাশক- আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড।

১০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪।

১১) তদেব, পৃষ্ঠা – ৮২৩।

গ্রন্থপঞ্জী:

আকর গ্রন্থ

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু : ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র , ১ম সংস্করণ – জানুয়ারি – ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

২। শরদিন্দু অমনিবাস ৩য় খণ্ড, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য একাদেমি, নিউ দিল্লী , প্রথম সংস্করণ – শ্রাবণ ১৩৮০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গুপ্ত, ক্ষেত্র-রমণীয় শরদিন্দু, গ্রন্থনিলয়, পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯

২। রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ - দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং।

৩। বসু, নিতাই - শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থতীর্থ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

৪। ভট্টাচার্য, ড. প্রমীলা - কথাশিল্পী শরদিন্দু: মনও শিল্প, গ্রন্থনিলয়, পাটাটোলা লেন, কলকাতা-৯

৫। সেন, সুকুমার-বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস-পঞ্চমখন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, মডার্ন বুক এজেন্সি,

৬। গুপ্ত, ক্ষেত্র-বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস- প্রথম ও চতুর্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ- ২০০২, গ্রন্থনিলয়।

৭। চৌধুরী, ভূদেব : ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি,১৯৯৪,

৮। ভট্টাচার্য, জগদীশ : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৯৪।

৯। চট্টোপাধ্যায়, কুণ্ডল - সাহিত্যের রূপরাতী ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৫১।

১০। মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার - কালের পুত্তলিকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং।

১১। পাল, শ্রাবণী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য একাদেমি, প্রথম প্রকাশ– ২০১২।

১২। মণ্ডল, পুলকেশ – সম্পাদনা – বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে তুঙ্গভদ্রার তীরে , প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর , ২০২১ , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা

ইতি বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
খিদিরপুর কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : নারী হল দেশের সম্পদ এবং জাতির উন্নয়নের সূচক তথা প্রেরণার উৎসস্থল। নারীরা সমাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মানবজাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সমাজে তাঁদের অবস্থানকে তাৎপর্য প্রদান করেছে। সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবদান এককথায় অনস্বীকার্য। বহু সমাজচিন্তাবিদ তাঁদের রচনায় সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সমকালীন সংস্কারপন্থীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এমন একজন আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদ তথা দার্শনিক, যাঁর রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে নারীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। তিনি নারী পুরুষের বৈষম্যের ঊর্ধ্বে মানবজাতিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন এবং নারীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নারীকে শুধুমাত্র সন্তান প্রসবের উপায় হিসেবে বিবেচনা করার চরম বিরোধিতা করেছেন এবং ভারতীয় নারীদের চূড়ান্ত অবমাননার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল— আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।" প্রসঙ্গত ভারতকে যতই মহান দেশ হিসেবে আমরা আখ্যা দিই না কেন, তা একান্তই বাহ্যিক। কারণ- ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে মেয়েরা এখনো অবহেলিত, শোষিত, অসম্মানিত, পাশবিক অত্যাচারের শিকার। তাই ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভবপর হবে বা প্রকৃত অর্থে আমরা আমাদের দেশকে মহান বলে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পারব, যখন ভারতীয় সমাজের নারীরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন, প্রকৃত মর্যাদায় ভূষিত হবেন।

বর্তমান প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হল বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর প্রতি স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর যে বিশ্বাস তারই প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

মূল শব্দ : নারী, সমাজে নারীর অবস্থান, বিবেকাননন্দের দৃষ্টিতে নারী, প্রাসঙ্গিকতা।

"মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ, সে জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমিকা:

স্বামীজীর মতে, "কোনো জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল নারীদের প্রতি সে জাতির মনোভাব।" তিনি বলেছেন, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ, সে জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।"[১] স্বামীজী নারীসমাজ বিশেষত ভারতীয় নারীসমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে তিনিও নারীকে আদ্যাশক্তির অংশ বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন জগতের প্রতিটি নারীর প্রতি মাতৃদৃষ্টি ছিল, তেমনই বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক নারী জগত আত্মার অংশ। মানবসভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীশক্তিকে তিনি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় নারীকে তিনি মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করতেন।[২] ভারতের পরিবারের কেন্দ্র হলেন মা। তিনিই আমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভগবানকে বিশ্বজননী বলি, আর গর্ভধারিণী মা হলেন সেই বিশ্বজননীরই প্রতিনিধি। গর্ভধারিণী মায়ের মধ্য দিয়েই নারীর ও শিশুর প্রথম পরিচয়। মা তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসায় শিশুকে বড় করে তোলেন। একটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তার মা'য়ের কোল থেকে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায়। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে,- বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। তাই তিনি জাতির উন্নতিসাধনে নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্বামীজী বলতেন, আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন শিক্ষিত নয় বটে, কিন্তু তাঁরা অনেক বেশি পবিত্র। নারীর কাছে যেমন নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য সব পুরুষই সন্তান তেমনই প্রত্যেক পুরুষের কাছে নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর সকল নারীই মাতৃসদৃশ মনে হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যে নারী জায়ারূপে সম্মানীয়া, ভারতে নারী মাতৃরূপে সম্মানীয়া।[৩] ভারতের মাতা যে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন- সে সন্তান যতই দুষ্ট, হীনপ্রকৃতির হোক না কেন সন্তানের জন্য তাঁর অফুরন্ত স্নেহ। সন্তান জন্মাবার আগে তিনি কোন দীর্ঘ পূজা-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিন কাটান। মাতৃত্বলাভ করে তাঁরা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ। মাতৃত্বের জন্য তাঁরা পবিত্রতা অনুভব করেন। ভারতের এই মাতৃভাবের আদর্শকে তিনি সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছিলেন সীতা চরিত্রকে আদর্শ করে।[৪] তিনি মনে করতেন, সতীত্বই আধুনিক ভারতীয় নারীর জীবনের মুখ্য ভাব। স্বামীজী নারীর পবিত্রতাকে ভালবাসতেন। তিনি মনে করতেন, নারীর এই একনিষ্ঠতা সমাজে স্থিরতা আনবে। দৃঢ় সমাজের ভিত্তি হল সুন্দর পরিবার ও সৎ নাগরিক। তিনি সৎ নাগরিক তথা আদর্শ সমাজ গঠনে নারীশক্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য করেছিলেন।[৫]

স্বামীজী নারীর চরিত্রে সীতার মতো পবিত্রতা, মাতৃত্ব, মাধুর্য, ক্ষমা, ধৈর্য, সেবা, নিঃস্বার্থপরতা, শুদ্ধ প্রেম প্রভৃতি কোমল গুণগুলির সাথে বীরত্বের সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন,

ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের মতো তেজস্বিতা। চরিত্রের এইসব বহুমুখী আদর্শ নিয়ে নিপুণ ভাস্করের মতো তন্ময় হয়ে স্বামীজী রচনা করেছেন ভারতীয় নারীর কল্যাণময়ী দিব্য ভাবপ্রতিমা। তবে পবিত্রতা ও সংযমের ওপর জোড় দিলেও তিনি কিন্তু গার্হস্থ জীবনকে নিন্দার চোখে দেখেননি। বরং তিনি বলেন, পবিত্রতা ও নৈতিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে যদি গার্হস্থ জীবন গড়ে ওঠে তাহলে তা সমাজের পক্ষে পরম কল্যাণকর হবে।

বিবেকানন্দের রচনায় আদর্শ নারী চরিত্র তাঁর চিন্তাধারার এক ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল। স্বামীজীর সমসাময়িক ও তার পূর্ববর্তী একশ বছরে এদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বারেবারেই নারীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। ভারতীয় নারীকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে শিকাগো ধর্মমহাসভা করে ফিরে এসে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা কেবল ধর্মকেন্দ্রিক ছিল না, তিনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানশিক্ষার উপরও জোড় দিয়েছিলেন। স্বামীজীর কাছে নারীমুক্তির অর্থ ছিল সীমার বন্ধনমুক্তি। কিন্তু তাঁর পূর্বে এদেশে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, তা নয়। তবে তিনি নারীর ছকবন্দী জীবনের বিরোধী ছিলেন। ব্যবহারিক জগতে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমদর্শী অর্থাৎ নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। তিনি এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে বলেন, এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন করা হয়েছে, তা বোঝা কঠিন। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি লক্ষ করেছিলেন, এদেশে আদ্যাশক্তি এখনো নিদ্রিত এবং নারীজাতির চূড়ান্ত অবমাননার ফলে এই বিপুল শক্তির অপচয় হচ্ছে। তিনি মনে করতেন, স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে অর্থাৎ নারী পুরুষের জীবন যদি সমভাবে উন্নত না হয় তাহলে ভারত তথা জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্ভব নয়, কারণ- একটি পাখীর পক্ষে কখনোই এক ডানায় ভর করে অনন্ত আকাশে ওড়া সম্ভব নয়। তাই স্বামীজী যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কাম্য নারীজাগরণের কথা বলেছিলেন।[৬]

বর্তমান সমাজে ভারতীয় নারী'র ভাবমূর্তি ও তার বাস্তবতা

ভারতীয় জাতির উন্নয়নের সূচক হিসেবে নারীশক্তির তাৎপর্য যুগের সাথে পরিবর্তনশীল। আদিম যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় নারী সমাজব্যবস্থার বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, আদিম অবস্থায় নারী পুরুষের মধ্যে 'বিবাহ' নামক সম্পর্কটি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী পর্যায়ে পরিবার গঠন হলেও সমাজ তখনও মাতৃকেন্দ্রিক ছিল। ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও অর্থনৈতিক মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামো তথা সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। বৈদিক সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু ক্রমে পুরোহিত শ্রেণীর আবির্ভাবের সাথে সাথে

নারীর অধিকার খর্ব হতে থাকল। বৌদ্ধিক যুগে নারীর আরো অবনতি ঘটল। বিবেকানন্দের মতে, এই যুগসংকটের মধ্যেই নারীরা একটি দৃঢ় ভিত্তি খুঁজতে চাইলেন এবং এই আদর্শকে কেন্দ্র করেই নারীসমাজ নিজেদের মৌলিকতাকে গড়ে তুললেন, যার পরবর্তীতে ভারতের নারী রূপ নিল মাতৃত্বের আদর্শে।[৭] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ভারতের আধুনিক নারীসমাজ হল সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল। আজকের সমাজব্যবস্থায় নারী প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই (যেমন- রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসনিক, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রীড়া, কলা, সংস্কৃতি ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করে। আধুনিক নারী সব ক্ষেত্রেই তাঁদের দায়িত্ব পূরণে পারদর্শী। তাঁরা প্রতিনিয়ত সকল ক্ষেত্রে তাঁদের ভিতরের শক্তি সামর্থ্যকে তুলে ধরতে সদা সচেষ্ট। আজ নারী পরিবারে মা ও স্ত্রী'র দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। শিক্ষিকা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সর্বোপরি, রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তারা সমাজকে সেবা প্রদান করে নিজে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। তাই আধুনিক ভারতীয় নারীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সমাজব্যবস্থার উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি।

এ তো গেল মুদ্রার একপিঠ। ভারতের বর্তমান সমাজে নারীর ভাবমূর্তির আলোচনায় কিন্তু এই একই মুদ্রার উল্টো দিকে রয়েছে এক কঠিন সত্য। বাস্তবটা হল এই যে, আজও আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীরা অবহেলিত, শোষিত, নির্যাতিত, পাশবিক অত্যাচারের শিকার। নারীদের উপর অত্যাচারের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যথা- গৃহবধূ অত্যাচার, পণপ্রথা, নারী ভ্রূণহত্যা, নারী নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, হত্যা প্রভৃতি। একটি কন্যা শিশু জন্ম নেবার পর থেকেই তথা আগে থেকেই সে অবহেলিত। এমনকি কন্যা শিশু জন্ম দেবার অপরাধে আজও আমাদের সমাজে শুধুমাত্র নারীদেরকেই দায়ী করা হয়। পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি চিরায়ত ব্যবস্থা এবং বর্তমানেও তা সমানভাবে প্রচলিত। অধিকাংশ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার পণপ্রথাকে একটি সামাজিক রীতি হিসেবে চাপিয়ে দেয় এবং তারা সেটিকে মেনেও নেয়। এমনকি কিছু শিক্ষিত তথা প্রভাবশালী পরিবারের কাছে পণপ্রথা সামাজিক মর্যাদা রক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে থেকেই দুটি পরিবারের মধ্যে পণপ্রথার বিষয়ে চুক্তিটি সেরে ফেলা হয় এবং কোনো কারণে কন্যা পক্ষের দরিদ্র মাতা-পিতা ও তার পরিবার সেটি পূরণ করতে না পারলে বিবাহের পর শুরু হয় নারীর উপর অত্যাচার, এমনকি অনেকসময় তাকে মৃত্যুবরণও করতে হয়। কিছু নিম্নবিত্ত পরিবারে কন্যা শিশু জন্ম নেবার পর তাকে বাড়তি বোঝা হিসেবে বহন করার পরিবর্তে হত্যা করা হয়। গৃহবধূ অত্যাচার সমাজের আরও একটি মারাত্মক ব্যাধি। পিতা প্রধান পরিবারে স্ত্রী স্বামীর অধীনস্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

আজও পুত্র শিশু'র অগ্রাধিকারের নিয়মে কন্যা শিশু পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি দিক থেকে অবহেলিত হয়। পুত্র শিশু বংশ রক্ষার বাহক, পরিবারের আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় কন্যাশিশুর জন্মগ্রহণে কিছু পরিবার শোক পালন করে। নারী নির্যাতন বর্তমান সমাজে নারী অবমাননার চরম নিদর্শন। জাত-শ্রেণী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বনির্ভর-নির্ভরশীল, বড়-ছোট নির্বিশেষে সকল নারীই এই পাশবিক অত্যাচারের শিকার এবং ক্রমশ তা বেড়ে চলেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুর্যো এর হিসেব অনুযায়ী গত কয়েক বছরে ভারতে অজস্র নারী অবমাননার শিকার হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। ভারতে ২০০৮ সালে ১,৯৫,৮৫৬ টি, ২০০৯ সালে ২,০৩,৮০৪ টি, ২০১০ সালে ২,১৩,৫৮৫ টি, ২০১১ সালে ২,২৮,৬৫০ টি এবং ২০১২ সালে ২,৪৪,২৭০ টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।[৮] ২০১৩ সালে শুধুমাত্র দিল্লিতেই প্রায় ১,১২১ টি ঘটনা ঘটেছে, যা গত ১৩ বছরের থেকে সবচেয়ে বেশী।[৯] সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB) এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৬৮০০০ গুলি নারী নির্যাতনের ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১.৮৯ লাখ নারী নির্যাতনের মামলা ঘটেছে।[১০] ২০২১ সালের NCRB এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে প্রতিদিন গড়ে ৮৬ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।[১১]

বর্তমানে ভারতের মোট জনসংখ্যার (মোট জনসংখ্যা ১.৪৪ বিলিয়ান, যার মধ্যে মহিলা জনসংখ্যা ৪৮.৪ শতাংশ_১২) প্রায় অর্ধেক মহিলা হলেও তারা সমাজে প্রতিনিয়ত প্রকৃত মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার লড়াই করে চলেছে। একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে ভারত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জাতির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার পথে এগোলেও এই সমাজের অভ্যন্তরে নারীদের প্রকৃত উন্নয়ন এখনো ব্যহত। সমাজে নারীদের এই নির্যাতন ও অবমাননার ভয় তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক। আর এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজে নারীর উন্নয়নই জাতি তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন।

উপসংহার

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, আত্মায় কোনো লিঙ্গ ভেদ হয় না। নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে একই আত্মা বিরাজ করে। তাই আমরা নারী বা পুরুষ এইভাবে না ভেবে বরং আমরা সকলেই মানুষ এবং সমাজে সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী এই ভাবনার প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ- শক্তি ছাড়া জগতের উদ্ধার সম্ভব নয়। ভারতের নারীজাতির মধ্যেই সেই শক্তি রয়েছে এবং সেই শক্তির যথাযথ বিকাশ লাভের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। স্বামীজী নারীর শক্তির ও বৃত্তির বিকাশ চেয়েছিলেন, বিনাশ নয়। জীবনকে সার্থক করে তোলা ও পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের জন্ম। তাই আমরা যতক্ষণ না নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ভুলে,

নারীকে পদদলিত করে না রেখে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করছি, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। যদিও আজকের সমাজে নারীর সামনে শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবরকম দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু সমাজের কিছু অংশ নারীদের তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এর পেছনে মূল কারণ হল, বর্তমান সমাজের একটি অংশ নারীকে সম্মান করতে ভুলে গেছে। এরজন্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে তার অভ্যন্তরের শক্তি-সামর্থ্যকে জাগিয়ে তুলতে চাইলেও তারা তাদের প্রকৃত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আজকের সমাজে নারীর এই অবমাননার দিকে তাকিয়ে এটাই বার বার মনে হচ্ছে যে, আমরা নারীকে তথা নিজের দেশকে মর্যাদা দিতে ভুলে গেছি, সর্বোপরি আমরা স্বামীজীর আদর্শকে হারাতে বসেছি। তাই পরিশেষে এই কথাই বলতে পারি যে, বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে সময় এসেছে আরো একবার স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করা তথা ভারতীয় নারীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধাকে অনুসরণ করার। কারণ- ভারতমাতা তথা ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য স্বামীজীর বাণী আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরী প্রসাদ বসু, ১৩৮৫ (বাংলা), পৃঃ ২৭২ এবং ২৭৫

২। মহিমা তব উদ্ভাসিত, ধর্মমহাসভা- শতবর্ষ স্বারক গ্রন্থ, ১৯৯৮; পৃঃ ৫৯২

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ১০০-১০৩

৪। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরী প্রসাদ বসু, ১৩৮৫ (বাংলা), পৃঃ ২৭৭

৫। বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ৪২৬

৬। মহিমা তব উদ্ভাসিত, ধর্মমহাসভা- শতবর্ষ স্বারক গ্রন্থ, ১৯৯৮; পৃঃ ৫৯৩-৬০১

৭। বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ ও ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ২০২ (৬ষ্ঠ খণ্ড) এবং পৃঃ ১০০-১০২ (১০ম খণ্ড)

৮। http://www.firstpost.com/india/rape-a rising-urban-spectre-data-says-otherwise-1060639.html, Accessed on 3 September 2013

৯। http://www.ndtv.com/article/cities/delhi-records-1,121-rape-cases-in-2013-highest-in-13-years-417511, Accessed on 12 September 2013

১০। 'The Hindu' 4 December, 2021. www.thehindu.com Accessed on 2 February 2024

১১। https://www.thehindu.com/news/national/india-lodged-average-86-rapes-daily-49-offences-against-women-per-hour-in-2021-government-data/article65833488.ece Accessed 27 Febrayary on 2024

১২। https://datareportal.com/reports/digital-2024-india Accessed on 6 March 2024.

স্বদেশ-সন্ধানী মন : প্রেক্ষিত ‘নোনা জল মিঠে মাটি’

শবনম মুস্তারী
সহ–শিক্ষক, বাংলা ভাষা
কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উ. মা.)

সারসংক্ষেপ: আমরা যারা দেশ বিভাজন এবং স্বাধীনতার অনেক পরে জন্মেছি, বিভাজনের পূর্বের রাজনৈতিক টানাপোড়েন দেখিনি কিংবা দেখিনি পাঞ্জাব বিভাজন বা বঙ্গ বিভাজনের ফলে ছিন্নমূল মানুষগুলির ভিটে-মাটি, স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে এক অন্ধকার জীবনের সামনে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা। আমাদের মত দেশ বিভাগের উত্তর জন্মানো প্রজন্মের কাছে দেশ বিভাগের প্রেক্ষিতটা বুঝে নেওয়া সম্ভব কেবল তথ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসবৃত্ত এবং লেখকের কলম। ছিন্নমূল মানুষের স্বভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রণা, সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার জন্য যে মানসিক বিপর্যয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তারপর থেকেই নতুন করে ‘দেশ’-এর খোঁজ শুরু হয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষজনের জন্য নিজের সমস্যা বলতে সবচেয়ে মাথা তোলা চেহারা হলো পুনর্বাসন না পাওয়া; কিংবা পেলেও বিদেশের মাটিতে শিকড় চাড়িয়ে দিতে না পারা। কিন্তু দেশহীন মানুষগুলির বিদেশ বিভূয়ে নিজের শিকড় চাড়িয়ে তোলার এক অনবদ্য জীবন আখ্যান হলো ‘নোনা জল মিঠে মাটি’। ঊনিশশো সাতান্ন সালে এক হাজার উদ্বাস্তুর সঙ্গে প্রফুল্ল রায় পাড়ি দিয়েছিলেন পোর্ট ব্লেয়ারে, আন্দামানের ছিন্নমূল মানুষের নয়া বসতি স্থাপনের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত হয়েছিল ‘নোনা জল মিঠে মাটি’ উপন্যাসটি। আন্দামান গ্রীষ্মপ্রধান হলেও সমুদ্রবেষ্টিত, তাই গরম অসহ্য নয়। প্রচুর বৃষ্টি, পর্যাপ্ত মাছ বাংলাদেশের জল হওয়ার সঙ্গে মিল অনেকটাই। তাই পূর্ববঙ্গের মানুষগুলি এই নোনা জলে নিজের স্বদেশ সন্ধান করেছে, এই নোনা জলের মাটিতে ফসল ফলানোর স্বপ্ন দেখেছে। চতুর্দিক জলবেষ্টিত, ভিটেমাটি থেকে বহু দূরে নতুন স্বদেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে। প্রবল জীবন সংগ্রাম আর সুখে-দুঃখে-প্রেমে ও প্রাণের তাপে স্বদেশ সন্ধানের একটি মাত্রা প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

সূচক শব্দ: স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, ছিন্নমূল, পুনর্বাসন, রিফিউজি ক্যাম্প, স্বদেশ সন্ধান, স্বদেশ প্রতিষ্ঠার বাসনা।

বাংলা কথাসাহিত্যে স্বদেশ সন্ধানের অনেকান্তিক স্বর লগ্ন হয়ে আছে দূর অতীতকালের ছায়াময় আখ্যান থেকে একেবারে বর্তমান পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্নের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় চর্যাগীতিকার কাহ্ন পাদ স্বপ্ন দেখে এক স্বদেশের। মধ্যযুগের সাহিত্যেও ছিন্নমূলের ব্যথা কোথাও গোপন থাকেনি। উপনিবেশের

ভারতবর্ষে স্বদেশের খোঁজ চলছে তথাকথিত স্বদেশে বসেই। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বদেশের সন্ধান হলো শিকড়ের খোঁজ; এ এক বিচিত্র স্বদেশ সন্ধান। এক নিমেষে গতকালের 'স্বদেশ' হয়ে গেল বিদেশ। বিমূঢ় মানুষগুলি পায়ে পায়ে পেরিয়ে এলো নিজের জল হাওয়া এবং চেনা আকাশ। স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে বেরিয়েছে রেলওয়ে প্লাটফর্ম থেকে উদ্বাস্তু শিবিরে, ফুটপাতের ধারে। এরপর জবরদখল কিংবা সরকারি অনুদানে নয়াবসতির জন্ম ঘটেছে ঠিকই কিন্তু তখনও স্মৃতিমেদুর বিষন্ন চোখে ফিরে ফিরে আসে স্বভূমি তিলে তিলে গড়ে তোলার এক নিজস্ব জীবনের ঘেরাটোপ।

প্রফুল্ল রায় নিজে একজন ছিন্নমূল মানুষ ছিলেন। দেশবিভাগের পর অন্যান্যদের মতো বাস্তুচ্যুত হয়ে স্থায়ী ঠিকানা হয় এপার বাংলায়। তাই তাঁর অধিকাংশ লেখায় দেশভাগের ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত অশ্রুর রেখায় আখ্যানের বুনোট। পঞ্চাশের দশকের শেষে 'নোনা জল মিঠে মাটি' দিয়ে যাত্রার সূচনা আর সত্তরের দশকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটি দিয়ে। 'আমার নাম বকুল', 'ভাগাভাগি', 'শতধারায় বয়ে যায়', 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা', 'আকাশের নীচে মানুষ', 'একটা দেশ চাই' প্রমুখ উপন্যাসে ওপারের স্মৃতিকে যেমন মুছে ফেলতে পারেন নি, তেমনি নতুন 'দেশ' কেউ নিজের বলে ভাবতে পারেননি। এই যে একদিকে স্বদেশ থেকে চ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা, অন্যদিকে নতুন মাটিকে স্বদেশ বানানোর যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তাই প্রফুল্ল রায়ের কথাসাহিত্যে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। 'আখ্যান পরিক্রমা' গ্রন্থে ড. উদয়চাঁদ দাশ বলেছেন—

> "দেশ বিভাগের জনজীবনের সংকট অজস্র ধারায় পল্লবিত হয়েছে, হয়ে চলেছে। কখনো পুনর্বাসনের সমস্যা, কখনো আত্মপরিচয়ের সংকট, কখনো 'দেশ' ঘিরে মনোবিশ্বে ঘনিয়ে ওঠা অমোঘ এক জটজাল। দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে প্রফুল্ল রায়ের প্রথম দিকে লেখা 'নোনা জল মিঠে মাটি' থেকে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত 'একটা দেশ চাই' এর মধ্যে যে আখ্যান ধারা তার মধ্যে পড়তে পড়তে মিশে আছে ওই সমস্ত সংকটের চেহারা।"[১]

ঊনিশশো ঊনপঞ্চাশ থেকে ঊনিশশো পঞ্চাশের মধ্যে বাংলায় উদ্বাস্তু মানুষজনের ঢল নেমে যায়। সেই উদ্বাস্তু মানুষজনের চাপ সামলানোর জন্য আন্দামানের বহু বাস্তুচ্যুত বাঙালিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা থেকে দফায় দফায় জাহাজে করে মানুষজনকে আন্দামানে পাঠানো হচ্ছিল, শুধু তাই নয় তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল নানা চাষবাসের সরঞ্জাম, শস্য-বীজ, জামা কাপড়, বাসনপত্র এমনকি বিনোদনের জন্য খোল-করতাল পর্যন্ত। পুনর্বাসনের যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এরা কেউ ফিরে আসেনি, থিতু হয়ে পড়েছিলেন নতুন জীবনে, বিদেশকে স্বদেশ গড়ার আবেগ-উৎসাহ অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিটে মাটি' উপন্যাসে। প্রফুল্ল রায় পুনর্বাসিত ঐ ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে গড়ে তোলেন এক নতুন

স্বদেশ খোঁজার আখ্যান বা অন্যভাবে বলতে পারি নতুনভাবে স্বদেশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার বাসনা।

আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ থেকে দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বিস্তারিত রয়েছে এই 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসটিতে, উপন্যাসটির মূল পটভূমি হল আন্দামান। বঙ্গোপসাগরের হৃদয়ে জেগে থাকা জল-জঙ্গল-জারোয়া অধ্যুষিত রহস্যময় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নানা জানা-অজানা কথাকে ব্যক্তিগত অনুভব, অভিজ্ঞতা ও জীবনাদর্শের আলোকে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে প্রফুল্ল রায় বলেছেন:

> "নিজে উদ্বাস্তু বলেই পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষদের সম্বন্ধে আমার মমতা অপরিসীম, সারা ভারতে যেখানে যেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হয়েছে আমি তার প্রতিটি জায়গায় গিয়েছি। পূর্ব বাংলার এসব অপরাজেয় মানুষেরা কিভাবে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে নতুন জীবন নির্মাণ করেছে, দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়েছি। এদের নিয়ে লেখা আমার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা 'নোনা জল মিঠে মাটি', উপন্যাসটির পটভূমি উত্তর আন্দামানের একটি দ্বীপ।"[২]

আন্দামান গ্রীষ্ম প্রধান হলেও সমুদ্রে দিয়ে ঘেরা বলে তেমন গরমের উৎপাত নেই আবার বৃষ্টিও হয় প্রচুর। আর এই কুমারী মাটি, সেই সঙ্গে বেশ ঊর্বর। তাই তো হারাণ এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সম্পর্কে বলে:

> "চাষী কিষানের পোলা, দেখলুম আর কি? দেখলাম মাটি। একদলা মাটি হাতে নিয়ে চাপ দিলাম। ঝুরঝুরাইয়া গুড়া হইয়া গেল। এই মাটিতে সোনা ফলব"[৩]

বৃষ্টিপাত-উর্বর মৃত্তিকা-মাছের আধিক্য সবমিলিয়ে পূর্ব বাংলার জল হওয়ার সঙ্গে অনেক বেশি মিল থাকায়, ছিন্নমূল মানুষগুলি নয়া বসতে নিজেদের বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। বন্ধ্যা বসুন্ধরাতে ফসল ফলানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল কেউ কেউ। যখন নির্জন দ্বীপে ঘন জঙ্গলে আতঙ্কের পরিবেশে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর কথা ভেবে মানুষগুলি চিন্তিত; তখন হারাণ ঘন জঙ্গল ঘুরে এসে সবার দিকে তাকিয়ে হাসে। সকল দ্বীপবাসীরা তাকে উদ্গ্রীব চোখে দেখে। বৃদ্ধা বাসিনী রসিক শীলেরা তার কাছে জায়গার কথা জানতে চাইলে সে বলে—

> "বড় বাহারের জাগা তালই (তালুই)। এই পাহাড়টার পিছে একখান খাল আছে, খালে যা মাছ দেখলাম.... সারা জন্ম হেই মাছ খাইয়া ফুরাইতে পারব না।"[৪]

সুখে–দুঃখে, হাসি–কান্নায়, আর নোনা জল মিঠে মাটির সাহচর্যে কতগুলো মাস কেটে যায় এইসকল সর্বহারা মানুষগুলির। নির্জন ঘন জঙ্গলের এই দ্বীপে স্বজন হারা মানুষগুলি আর পুরাতন জীবনকে মনে করার সময় পায় না। নির্জন দ্বীপে তারা স্বদেশ

গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। এরা প্রত্যেকেই দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে কেউ পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে কেউবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে। ভারত বা পাকিস্তান নবগঠিত দুই রাষ্ট্রের কেউই এদের দায়িত্ব নেয়নি, এদের ভাসিয়ে দিয়েছে স্বদেশ স্বজন হারানোর দলে—এক অজানা ভবিষ্যতের খোঁজে। এই নৈরাশ্যময় জীবনে বৃদ্ধা বাসিনি দাঙ্গা ও দেশভাগের জেরে সর্বস্ব খোয়ানো মানুষগুলির চোখে তুলে ধরে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র:

> "এত বড় সমুন্দর (সমুদ্র) পাড়ি দিলাম, পাঁচ পাঁচটা দিন পারকূল দেখি নাই। ডরে বুকের লৈ (রক্ত) জইমা গেছিল। পারকূল যখন পাইছি, মাটি যহন মিলেছে, তহন আমরা বাচুম। তরা দেখিস।"[৫]

শুধু কি বুড়ি বাসিনী, আজকাল উদ্ধব বৈরাগীও স্বপ্ন দেখে বাঁচবার। শুধুমাত্র একা স্বপ্ন দেখছে তা নয়, আরো দশজনকেও স্বপ্ন দেখাচ্ছে নতুনভাবে জীবনকে শুরু করার—

> "উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে এসে তিন একর অর্থাৎ ন' বিঘে জমি পেয়েছে উদ্ধব। সারাদিন কোদালের মুখে মাটি কেটে কেটে জমি চৌরস করে সে। রাতে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে গানের আসর বসায় সারিন্দাটা ভেঙ্গে গিয়েছে, সেই জন্য দুঃখ নেই তার। আন্দামানে এসে একটা দো-তারা বানিয়ে নিয়েছে। দো-তারায় আঙ্গুলের ঘা মেরে মেরে গুনগুন করে সুর তোলে:

(ক) "পরবাসী নাইয়া রে-এ-এ-এ-"[৬]

(খ) "তুমি কি দিয় ভুলাইলা শ্যামচান্দের মন রে
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি
তোমার কপালের সিন্দুরে
ঝলমল ঝলমল করতাছে
দেখিয়া, দেখিয়া
আচম্বিত আমি।"[৭]

(গ) "না পুড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালের ডালে—"[৮]

কলোনির সমস্ত বাসিন্দারা সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এসে জড়ো হয় উদ্ভবের ঘরে। লোকগীতির সুর মূর্ছনায় তাদের সমস্ত ক্লান্তি দূরীভূত হয়ে পড়ে। মনে মনে যেন তারা অনুভব করে তাদের হারিয়ে যাওয়া মাটির স্বাদ, হারিয়ে যাওয়া জীবনের স্মৃতি। উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের জনজীবনের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে এই ছোট ছোট লোকগীতিগুলিকে কাহিনির মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

সর্বস্ব হারিয়েও সুঠাম সুন্দর যৌবনের অধিকারিনী নিত্য ঢালির মেয়ে কাপাসী মাঝে মাঝে অকারণে হেসে ওঠে। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ও জমির মায়ার জন্য নিত্য হারিয়েছে অনেক কিছু। হীরাকুপী গ্রামের মুসলমানদের নারকীয় যজ্ঞের শিকার হয়েছিল নিত্যের পুরো পরিবার। দুর্বৃত্তরা কাপাসীকে হরণ করল কয়েক দিনের জন্য, আর মেয়ের আব্রুকে বাঁচানোর চেষ্টায় প্রাণ দিতে হলো নিত্যের স্ত্রীকে। ধর্ষিতা-লাঞ্চিতা কাপাসীকে জীবন ফিরে পেলেও হারাতে হয়েছে তার দেশ। নিত্য কাপাসীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পরিত্যাগ করে তার বাস্তুভিটে। কয়েকদিন শিয়ালদহ স্টেশনে কাটিয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে তারা আসে ডিগলিপুরে। তবে সেখানে বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে কাপাসীর সুঠাম যৌবন। এপার বাংলা ওপার বাংলা কোথাও স্থান পায় না কাপাসীরা, তাই তাদেরকে একদিন রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিতে হয় অজানা-অচেনা দ্বীপের উদ্দেশ্যে, তাদের ঠাঁই হয় আন্দামান দ্বীপ।

জাতীয় জীবনে অস্থিরতার ফলস্বরূপ যখন ব্যক্তি জীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, আমরা দেখি একমাত্র নারী হওয়ার কারণেই সমাজের কাছেও অপাংতেও হয়ে যায় সত্তা। হঠাৎ যেন আমাদের সামনে জেগে ওঠে কতগুলি প্রশ্ন; যেমন দেশ ভাগের জন্য দায়ীকে? দেশভাগের ফলে কাপাসী-নিত্য ঢালীর মত লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি সাধারণ লোকের জীবনে যে ভয়ঙ্কর ধ্বংস নেমে এলো এর দায়ভার কার উপর বর্তায়? কাপাসীর মতো লক্ষ লক্ষ মেয়েকে চোখের পলকে ঘর থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য করল সমাজে তথা দেশের কোন অংশে এদের স্থান নির্ধারিত হবে? ঔপন্যাসিকের লেখনী যে কতটা শক্তিশালী তা বুঝতে পারি যখন এই একটি ঘটনা নিপুণভাবে বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি আসলে তুলে ধরেন এই ধরনের কতগুলি প্রশ্ন। সেই সঙ্গে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন সমাজে নারীর প্রকৃত পরিসরকে, যে সমাজে নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় তার ব্যক্তিসত্তাকে দিয়ে নয়, বরং শারীরিক শুচিতাকে দিয়ে। এই 'সমাজ'কেই নারীবাদী দার্শনিক কেট মিলেট, 'patriarey' (পিতৃতান্ত্রিক) বলেছেন। সমাজে নারীর পরিসর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ('This is so because our society,like all other historical civilization is patriarchy', 'sexual politics', p.25)। 'আধুনিকতার শিল্প ও সাহিত্য' গ্রন্থে আফজালুন বাসার 'নারীকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধেও এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। যাই হোক, নারী-পরিসরের এই সীমারেখার প্রতি এই সামাজিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে মিলেট বলেন:

> ".... Sexual dominion obtains nevertheless as perhaps the most pervasive idealogy of our culture and provides its most fundamental concept of power"[৯]

আর সেই জন্য ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় জীবন পর্যন্ত এক বিশাল প্রেক্ষাপটে যেকোন ধরনের ডামাডোলে, তা সে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাই হোক না কেন, নারীকে মুহূর্তের

মধ্যে পরিসরহীন হয়ে যেতে হয়, হয়ে যেতে হয় পরিচয়হীন। তাই বাসিনীর চোখে কাপাসির একটাই পরিচয় নষ্ট মেয়ে।

ছিন্নমূল মানুষগুলিকে নতুন জীবনে থিতু হতে পাল সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। জমি সংক্রান্ত, পারিবারিক বিবাদের সময় দাঙ্গা এবং খুনে জড়িয়ে পড়ে দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে চলে আসেন সি. এ. পাল সাহেব। পিছনে ফেলে এসেছিলেন নিজের দেশ ও নিজের পরিবারকে। সাজা প্রাপ্ত খুনি আসামীরা আর কখনো সুস্থ সমাজে ফিরে আসতে পারে না, মান-সম্মানও বজায় থাকে না। পাল সাহেব তাই কখনো দেশে ফেরার চেষ্টাও করেননি। তবুও কখনো কখনো উদ্ভবের সুরের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে সুস্থ পরিবারের স্বপ্ন — স্ত্রী ও শিশুর মুখ। নিজের হারানোর জমি ও সংসারের ক্ষতিপূরণের জন্য উদ্বাস্তুদের বেশি করে অনুপ্রাণিত করেন পাল সাহেব। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

> "চারপাশে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে মাটি। মাপজোখ করে সেই মাটি সকলকে ভাগ করে দিয়েছে পাল সাহেব। বাসের ছোট ছোট টুকরো পুঁতে সীমানাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পাড়ের মাটি হারিয়ে এসেছে মানুষগুলো। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেল।"[১০]

এ মাটি এই জমিন দেখে স্বপ্নাতুর হয়ে পাল সাহেব গাঢ় আপ্লুত স্বরে বলে ওঠেন—

> "জমিন দিলাম। এবার নতুন করে বেঁচে ওঠ। .....এখানে গাঁও বসাবি, ধান মলবি, দেওয়ালে ঘিউ— সিঁদুর দিয়ে বসুধারা আঁকবি...."[১১]

আন্দামানের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকে বঙ্গীয় লৌকিক জীবন। দেশকে ফেলে আসা মাটিকে ফেলে আসা মানুষগুলো আবার নতুন পরিচয়ে বাঁচতে চায়। একদিন যারা জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিল সবকিছু হারিয়ে আজ আবার তারা নতুন করে গৃহীজীবন ফিরে পেতে চায়। গোলাভরা ধান থাকবে প্রচুর পরিমাণ, গ্রাম বসবে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরের পাড়ে যাবে। যে জীবন ফেলে এসেছে এরা, সেই জীবনের খোঁজ করে চলেছে সমুদ্রের নোনা জলে ঘেরা এক দ্বীপভূমির জীবনের সঙ্গে। উদ্ধবের পদ্মা মেঘনা তীরের উদাসী বাউল গানের প্রাণ মাতাল করা সুর পাল সাহেবকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক সুন্দর অতীতের মৃত্তিকাগন্ধী জীবনে।

জমিকে নিজের পরিশ্রমে সকলের চাষযোগ্য বানিয়ে তুলেছে, নতুন স্বদেশকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছে। সরকার প্রদত্ত ক্যাশ ডোল বা নগদ টাকা, সাময়িক আস্তানা ইত্যাদি থাকলে নিজস্ব জমি-বাড়ি গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে চেয়েছিল পুনর্বাসন দপ্তর। হারাণ, রসিকশীল, নিত্য ঢালী প্রত্যকেই জমিকে করে তোলে

কৃষিযোগ্য। নোনা মাটি সকলের ঘাম ও অশ্রু জলে পর্যবসিত হয় মিঠে মাটিতে; গড়ে ওঠে মিঠে উপনিবেশ। তাইতো লেখক বলেছেন—

> "'মাটি! মাটি! নতুন মাটি' নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটি, সেই মাটি পেয়ে মানুষগুলো মেতে উঠেছে।" [১২]

উত্তর আন্দামানের এই টিলায় যেখানে অজস্র প্রতিকূলতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল নতুন জনবসতি বা জন উপনিবেশ, সেখানে নতুন বেগ সঞ্চার করে তিলির সন্তান, একদল ছিন্নমূল মানুষ মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধ পায় তাই তো পাল সাহেবের চেতনায় ধরা দেয়—

> "সাত পুরুষের বাস্তু ছেড়ে আসার পর তারা তিলে তিলে মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছে। এই দ্বীপে এসে পায়ের নিচে মাটি পেয়ে তারা মৃত্যুকে পেরিয়ে এল। মৃত্যু থেকে তারা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।"[১৩]

বাস্তুচ্যুত ছন্নছাড়া মানুষগুলি যে গৃহস্থ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলো, তিলির সদ্যজাত সন্তান সেই স্বপ্নরেই ফসল—

"এই জাজিরোতে পয়লা মানুষ জন্মাচ্ছে।" নোনা জল মিঠে মাটির এই নতুন উপনিবেশ হয়ে উঠল সর্বহারাদের নতুন দেশ, এই নবজাতক সেই দেশের প্রথম নাগরিক—

> "ফুলের মত নরম, উষ্ণ, ছোট্ট একটি মানুষ। পরম মমতায় তাকে বুকের উপর তুলে নিল পাল সাহেব। একদৃষ্টে এই দ্বীপের প্রথম শিশুটির মুখ দেখতে লাগলো। দেখে দেখে আঁশ তার মেটে না। অতি সুখে হাসে পাল সাহেব। পাগলা অতি সুখে কাঁদে।"[১৪]

উপন্যাসের পরিণামী বাচনে স্বদেশ সন্ধানের বহুস্বরিকতার একটি মাত্র আশ্চর্য ভাষায় প্রকাশিত—

> "এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। সুখে-দুঃখে-প্রেমে আর প্রাণের তাপে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।
>
> অনেক, অনেকদিন আগে পাল সাহেবের জীবন থেকে একটা কৃষাণ গ্রামের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন ধরে সেই ঠিকানাটা, সেই কৃষাণ গ্রামটা, সেই খোয়ানো পৃথিবীটা খুঁজে বেরিয়েছে সে। এতদিনে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপে সেই হারানো পৃথিবীটা খুঁজে পেয়েছে পাল সাহেব।"[১৫]

দেশভাগ বাঙালি মানব জীবনের ভিত্তিমূলকে সজরে নাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতা তথা দেশভাগের হাত ধরাধরি করে এসেছিল উদ্বাস্তু সমস্যা, ছিন্নমূল মানুষের জীবনযাপনের রীতিনীতি ও কলোনী সংস্কৃতি। সেখানে প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে নানান সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ শুধু তার দেশ হারায়নি, হারিয়েছে নিজের আত্মপরিচয়টুকুও। দেশভাগে সংখ্যালঘু মানুষেরা ঘরে-বাইরে মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মধ্য

দিয়ে আবর্তিত হতে হতে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করে ফেলেন কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই। দেশভাগের সময় থেকে উদ্বাস্তু জীবনে পৌঁছানো পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মেয়েরা বিভিন্ন বাস্তব সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। নিজেদের শারীরিক ও মানসিক সংকটের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন রকম বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে হলো। ঋতু মেনন ও কমলা ভাসিনের যৌথ সম্পাদনায় তাঁদের 'বর্ডার এন্ড বাউন্ডারি উইমেন ইন্ডিয়া পার্টিশন' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে (যথা 'অনারেবলি ডেড পার্মেসিবল ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন', 'বর্ডারস এন্ড বাউন্ডারিস রিকভারিং উইমেন ইন দ্য ইনটানিস', 'বিলংগিং উইম্যান এন্ড দেয়ার নেশনস') তারা দেখাতে চেয়েছেন দেশভাগে তৎকালীন নারীদের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা। ঋতু মেনন ও কমলা ভাসিন দেখিয়েছিলেন নারীদের প্রতি কোনরকম দায়বদ্ধতা দেখায়নি সেদিনের সেকুলার রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই অসম্ভব রকমের উদাসীনতা এই ধরনের উদাসীন মানসিকতার জন্যই দেশভাগে নারীরা চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে থাকেন।

'নোনা জল মিটে মাটি'–তে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের উর্বর মৃত্তিকার বদলে আমরা উত্তর আন্দামানের নিবিড় ভয়াল আরণ্যক পরিবেশের পরিচয় পায়। ঔপন্যাসিক ঊনিশশো সাতান্ন সালে আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেখতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তারই ভিত্তিতে রচনা করেন এই উপন্যাসটি। উপন্যাসটির কাহিনি শুরু হয় ' ঊনিশশো ছাপান্ন সালের এক মধ্য দুপুর' থেকে। স্বাধীনতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে এলো দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এপার বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওপার বাংলা থেকে। হাজার, হাজার মানুষ জানলই না কেন, কিভাবে দেশ বিভাগ হল। তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে হলো। সেই উদ্বাস্তুদের এক বিশাল অংশ জাহাজ বোঝাই করেই এলো উত্তর আন্দামানের অরণ্যসংকুল এই দ্বীপে 'নতুন ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব' নিয়ে ('নোনা জল মিঠে মাটি' কথামুখ)। আমরা দেখি পাঠকৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উত্তর আন্দামানের বন্য পরিবেশ। যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম, তাদের স্বদেশকে খোঁজ এবং স্বদেশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। সজল শ্যামল 'রূপসী বাংলায়' (জীবনানন্দ দাশ) আম-জাম-হিজলের ছায়ায় ছায়ায় শান্ত গ্রাম্য জীবন দেশভাগের প্রবল অভিঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রাজনীতির জটিল মার প্যাঁচ থেকে বহু দূরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গের সরল অনাড়ম্বর মানুষের এক শান্তিময় জীবনের মুখোমুখি হয়; যেখানে গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ আর প্রকৃতি মায়ের শীতল ছায়া নিমেষে উধাও হয়ে গিয়ে দেখা দেয় রেলস্টেশনের শক্ত প্ল্যাটফর্ম, ফুটপাত, রিফিউজি ক্যাম্প। বিঘে বিঘে জমিতে সোনালী ধানের ঢেউ যাদের চোখে এনে দিত স্বপ্ন, নতুন চালের সুঘ্রান যাদের প্রাণ মাতিয়ে তুলত— তারাই এক মুঠো খাদ্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলো ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে। একদল মানুষ শিকড় ছেঁড়া যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আসে উত্তর আন্দামানের ভয়াল আরণ্যক পরিবেশে। নতুন জীবনের খোঁজে শুরু হয় এক অভিনব জীবন

সংগ্রাম। সজল শ্যামল নদীমাতৃক দেশের স্বভাবকোমল মানুষেরা আন্দামানের রুক্ষ গহন অরণ্য এবং নোনাজলের মাঝখান থেকে মিঠে মাটি খুঁজে নেওয়ার লক্ষ্যে এক অপ্রত্যাশিত ও হারানো জীবনকে আবার গড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে এক অপ্রত্যাশিত বহমান সময়ের সঙ্গী হয়। আর এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় মূর্ত হয়ে তাতে থাকে পূর্ববঙ্গের লৌকিক জীবন ও আন্দামানের আঞ্চলিক জীবন। একদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার দুই জীবন প্রবাহ, অন্যদিকে মুহুর্মুহু পাল্টাতে থাকা কাল ও পরিসর।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ উদয়চাঁদ, জানুয়ারি ২০১৮, আখ্যান পরিক্রমা, ৪৪/১ এ বেনিয়াটল লেন, কলকাতা: ৭০০০০৯, দিয়া পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-১৯১

২. রায় প্রফুল্ল, জানুয়ারি ২০১৭, গল্পসরণি: প্রফুল্ল রায় বিশেষ সংখ্যা, একবিংশতিতম বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ১৪২৩, ৯১/১, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, পৃষ্ঠা-১৮

৩. রায় প্রফুল্ল, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৯, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ৩১

৪. রায় প্রফুল্ল, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৯, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ৩২

৫. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ৩৪

৬. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ৪৮

৭. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ১৩৮

৮. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ২০৮

৯. Dialogism: Bakhtin and his World, Michael Holoquist, Routledge, London and Newyork, First published-1990, Reprinted- 1994, Page No- 75

১০. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-৫১

১১. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা-৫১

১২. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ৩২

১৩. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ১৯৩
১৪. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ১৯৪
১৫. রায় প্রফুল্ল, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০২১, নোনা জল মিঠে মাটি, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০১২, দে'জ পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা- ১৯৫।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে লিঙ্গভাবনা : প্রসঙ্গ 'দহন'

মঞ্জুরী বিশ্বাস
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

পৃথিবীতে শিশু জন্ম নেয় তার জৈবিক পরিচিতি নিয়ে। কিন্তু শিশুটি বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকভাবে কেউ পুরুষ আবার কেউবা নারী বলে তারা নিজেদের আবিষ্কার করে। কারণ, সমাজ এই লিঙ্গ বিভাজন তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তাই প্রাচীনকাল থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে এক চিরকালীন বিভেদ বা বৈষম্য তৈরি হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য। এই লিঙ্গ বৈষম্যের মূল নিয়ন্ত্রক পিতৃতন্ত্র নামে এক সামাজিক ব্যবস্থা যার প্রভাব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরী। আসলে, জন্মের পর নারী ও পুরুষ উভয়কে দ্বিতীয় জন্ম দেওয়া হয়। নারী ও পুরুষ যে দুই ভিন্ন মেরুর তা শৈশব থেকেই পরিবার-সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা তাদেরকে শেখায় তাদের অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা সম্বন্ধে। সমাজের নিয়মেই তাদের নারী ও পুরুষ করে তোলা হয়। ফরাসি দার্শনিক ও লেখক সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) তাঁর 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' বইতে বলেছেন —

> কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং নারী হয়ে ওঠে। সমাজে যে ভাবে দেখা দেয় স্ত্রীলিঙ্গ মানুষ কোনো জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনীতিক নিয়তি তার রূপ নির্ধারণ করে না; সার্বিকভাবে সভ্যতাই উৎপাদন করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ- প্রাণীটি, যাকে বলা হয় নারী।[১]

পিতৃতন্ত্রের তিনটি সংস্থা- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যেগুলো একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পিতৃতন্ত্র পরিবারের প্রধান পুরুষটিকে সমস্ত কর্তৃত্ব দেয় যা ধর্মীয় বিধানের সাহায্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাবন্ধিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ' বইতে উল্লেখ রয়েছে —

> নারীকে শৈশবে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করে আর বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে, স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই।[২]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নারীরা সেখানে উপস্থিত হয়। তবে সাহিত্যে নারী চরিত্র রূপায়নের দ্বারা পুরুষ লেখককুল নারীর প্রতি সমাজের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে রেখেছে যা অনেকাংশেই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বত্র নারী উপেক্ষিত। পুরুষের কাছে নারী রহস্যময়ী তো বটেই, কারণ যা সুদূর, অজানা তা-ই

রহস্যময়। ফলত অনুভব ও কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করেই তাঁদের নারী চরিত্র নির্মাণ করতে হয়। এই সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

> সাধারণত পুরুষ ঔপন্যাসিকের পক্ষে নিঃসম্পর্কীয় নারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ নিতান্ত অল্প; আমাদের সমাজপ্রথা শুধু যে নারীর মুখের উপরই অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয় তাহা নহে, তাহার মনের উপরও ঘনতর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল রচনা করে। আমাদের নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদেরও ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কতই সামান্য। সুতরাং পুরুষ ঔপন্যাসিক নারী চিত্র অঙ্কনের সময় একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাদত্ত সহজজ্ঞানের উপরই প্রধানত নির্ভর করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে মহিলা ঔপন্যাসিকের সুযোগ ও অবসর অনেক অধিক। তাহার নিকট নারীর অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন স্বতঃই খসিয়া পড়ে; সুতরাং পরিবার যন্ত্রের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন যে তাহার নিকট আরো সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।[৩]

বর্তমান কালে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন ঘটেছে, যা অনেকাংশেই ইতিবাচক। আধুনিক নারী সাহিত্যিকদের রচনাই তার প্রমাণ। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি নারী ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য —

> উদার অর্থনীতির সূত্রে ভোগবাদ, নারী স্বাধীনতা, নারীর নিজস্ব উপলব্ধির জগত, পুরুষের একচ্ছত্র যৌন আধিপত্য ভেঙেচুরে নারীদের ভোগাকাঙ্খা, ভোগ ও ব্যক্তিত্ব আরোপের বিষয় নারী ঔপন্যাসিকদের রচনায় যতখানি ধরা পড়েছে পুরুষ লেখকদের রচনায় ততোখানি ধরা পড়েনি।[৪]

আধুনিক সমাজ ও তার ভালোমন্দ যে নারী ঔপন্যাসিকদের রচনায় সামগ্রিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে অগ্রগণ্য সুচিত্রা ভট্টাচার্য। আধুনিক নারীর চাওয়া-পাওয়া, ভালোলাগা-মন্দলাগা সমেত একান্ত নিজস্ব জগত গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমাদের এই প্রবন্ধে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'দহন'এ লিঙ্গভাবনা আলোচনায় বৈষম্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষিতে জীবনের মহৎ ও বৃহৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীর অধিকারহীনতার জন্য ক্ষোভ, পরিবার ও সমাজে নারীর অবনত অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ, নারীর আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধান প্রবণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে

ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির অভিমুখ স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখতেন। **১৯৯৮** সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় 'দহন'। এই উপন্যাসটি সুচিত্রার বহুজন পঠিত লেখা এবং এর কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন প্রয়াত চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। 'দহন' এক লড়াকু মেয়ের কাহিনি। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তৎকালীন একটি বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের চত্বরে চারজন যুবকের অশ্লীল আক্রমণ থেকে এক গৃহবধূকে বাঁচাতে, ঝিনুক নামের একটি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুষ্কৃতীদের উপর। থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত দৌড়ঝাপ করতেও যার কোনো দ্বিধা ছিল না। তবে সাহসিকতার অভিনন্দনের রেশ ফুরোতে না ফুরোতেই সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল, নানা ধরনের চাপ কত অনায়াসেই তুচ্ছ করে দিতে পারে উদ্যত নারীর এই প্রতিবাদ, এমনকি লাঞ্ছনাকেও। এ-উপন্যাসে লেখিকা একই সঙ্গে বর্তমান সময়ে আর সমাজে নারী স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, ঠুনকো মূল্যবোধের বিশ্লেষণেও দিয়েছেন উৎকর্ষতার পরিচয়। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে —

> পিতৃতন্ত্রের দৃশ্য ও অদৃশ্য নিগড় থেকে যারা সর্বাত্মক মুক্তি চাইছেন এবং সমস্ত ধরনের নিপীড়ক চিন্তাপ্রণালী থেকে মেয়েদের স্বাধীনতা যাঁদের কাম্য অবশ্যই তাঁদের লিখনবিশ্ব উৎসারিত হয়েছে নারীচেতনা থেকে।[৫]

পরবর্তীতে 'এই সময়' নামক একটি সংবাদ মাধ্যমে প্রীতম বসুকে দেওয়া সাক্ষাতকারে লেখিকার কাছে হঠাৎ এরকম একটি বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখার কারণ জানতে চাওয়া হলে, তিনি জানান —

> আসলে আমার মনে একটি প্রশ্ন এসেছিল আর তা হল, এরকম ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে, রাস্তায় মেয়েদের নানাভাবে হেনস্থা করা হয়, কোনও একজন সাংবাদিক মেয়ে ব্যাপারটার প্রতিবাদ করেছিল। এটাই আমার কাছে একটা ক্ষীণ সুতোর মতো ছিল। চিন্তা করে দেখলাম, যে মেয়েটি প্রতিবাদ করেছে, সে যদি সাংবাদিক না হত! সাংবাদিকদের তো অনেক ক্ষমতা! সে তো একজন সাধারণ মেয়েও হতে পারত! আমার মেয়ে বা মেয়ের মতো সাধারণ কেউ, হয়তো একটা স্কুলে পড়ায়, সে যদি প্রতিবাদ করত? আমরা তাকে কতটা এগোতে দিতাম? তার পরিবার, সমাজ, আদালত তাকে কতোটা এগোতে দিত? একজন সাধারণ মেয়ে যদি নারী নিগ্রহের প্রতিবাদ করতে যায় তা হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে সামাজিক

> ভাবে, পারিবারিক বা আইনগত ভাবে সেটাই আমি দেখতে চাইছিলাম।[৬]

ঘরে এবং বাইরে নারীর উপর দৈহিক বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে পুরুষ নিজের প্রভুত্ব ও অধিকারের প্রকাশ ঘটায়। খবরের কাগজ এবং নানা সামাজিক মাধ্যমে 'ধর্ষণ' শীর্ষক খবর আজকাল নিত্যদিনের ঘটনা। নারীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সুচিত্রা ভট্টাচার্য 'দহন' উপন্যাসটি লিখেছেন। বাস্তব ঘটনার প্রেরণায় উপন্যাসটি রচিত হলেও উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা পরম্পরা ছিল কাল্পনিক। তবে লেখিকার রচনাগুণে সেই কাল্পনিক আখ্যানও হয়ে উঠেছে চিরন্তন সত্যের এক অনন্য পাঠ। রমিতা আর ঝিনুক, দুই বিপরীত মেরুর নারী। রমিতা বিবাহিত, সম্পন্ন বাড়ির গৃহবধূ। ঝিনুক অবিবাহিত, চাকুরিরত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অবস্থানগত পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবেশগত পার্থক্য থাকলেও নারীর আভ্যন্তরীণ জীবন ছবি একইরকম। কারণ, সে যে পরিবারে যে পরিবেশে থাকুক না কেন, মেয়ে তো মেয়েই হয়। সমাজের মতে তার একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে যৌবন, রূপ, লাস্য এবং গৃহকর্মে শ্রম দিয়ে তুষ্ট করা। সমাজ পরিবেশ তাকে নম্র তথা নতমুখী দেখতে অভ্যস্ত। বর্তমান সময়ে শিক্ষিত সচেতন নারী কখনও কখনও প্রতিবাদী হয়ে উঠছে ঠিকই কিন্তু তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কত সীমিত তা উপন্যাসের আলোচনাতে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সম্পন্ন বাড়ি, কৃতী স্বামী, অজস্র শাড়ি, দামি গয়না আর স্বামীর আদর রমিতার দিনগুলোকে সুখী করে রেখেছিল। এর বাইরে তার কিছু চাওয়ার আছে বা পাওয়ার আছে সেকথা কখনোই মনে আসেনি। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আত্মসমর্পণ করে এভাবেই হয়তো সুখে কেটে যেতে পারতো দিনগুলি। কিন্তু তা হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, এই সমাজ তো আর রাতারাতি বদলে যায় নি। অত্যাচারী বর্বর পুরুষের অত্যাচারের সবচেয়ে বড় জায়গাই হল নারী। নারী নিপীড়ন, অপহরণ, ও ধর্ষণের মধ্য দিয়ে এক বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে তারা। এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল জনসমক্ষে ভিড় রাস্তায়। কয়েকটি যুবক রমিতার দেহগত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, হিংস্র লালসা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে স্বামী পলাশের সামনেই তার শ্লীলতাহানি করে। এখানেই থেমে থাকেনি, তাকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতেও চেয়েছিল তারা। অদ্ভুত হলেও সত্যি সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শী জনগণ তখন ছিল নিরুত্তাপ, নিরুত্তর। তবে জনতার মধ্যেও একটি মেয়ে নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে লড়াই করেছিল সমস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে। স্বামী নয়, তাকে রক্ষা করেছিল ঝিনুক ওরফে শ্রবণা। তাই সে পলাশকে ছেড়ে ঝিনুকের হাত জড়িয়ে ধরেছিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দুই নারীর জীবনে দু'রকম প্রভাব ফেলে। ঝিনুক তার সাহসিকতার জন্য অভিনন্দিত হয়। আর রমিতার দিন কাটে বোবা অনুভূতিহীন বদ্ধ এক পরিবেশে। সবকিছুই কেমন বদলে যায় তার জীবনে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, জা সকলে তার সঙ্গে এমন আচরণ করছে যেন কোথাও সে সস্তা হয়ে গেছে। তার মনে হয় —

> বড় বেশি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। আজকাল এমন করেই তাকে দেখে সবাই। যেন কোন দাগ ধরেছে রমিতার গায়ে। তার ভেলভেটের মতো সুখী জীবনে এ কি বিড়ম্বনা এল![৭]

রমিতার সুখী জীবন যে বাইরে থেকেই সাজানো ছিল ঝড় না এলে সে তা বুঝতেই পারতো না। স্বামী, সংসার নিয়ে মজে থাকা আর পাঁচটা সাধারণ বোকা মেয়ের মতো চোরাবালিটাকে কোনোদিন সে চিনতেই পারতো না যদিনা এই ঘটনাটি ঘটত। তথাকথিত আধুনিক উচ্চবিত্ত পরিবারে যে ধরনের সূক্ষ্ম মানসিক নির্যাতন হয়, রমিতাকে তার শিকার হতে হয়েছিল। মুখে খারাপ কথা না বলেও যে অপমান, অসম্মান করা যায় রমিতা তা কখনো ভাবতেই পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, বাইরে থেকে সমাজ যতই আধুনিক হয়ে উঠুক না কেন নারীকে সমাজ আজও ভোগ্যবস্তু রূপে বিবেচনা করে। রমিতা ক্রমশ বুঝতে পারছিল তার ভূমিকা পরনির্ভর, অস্তিত্ব পদানত। সে ভেবেছিল সেদিনের ঘটনার পর তার স্বামী অন্তত ওই নোংরা ছেলেগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই ঘটল। স্বামী পলাশ এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রতিবাদের পরিবর্তে ঘটনাটিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যেতে লাগল। তাদের ধারনা এই ঘটনাটি জানাজানি হলে পরিবারের সম্মান হানি ঘটবে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, পলাশের দৃষ্টিতে স্ত্রীর রক্ষক ঝিনুক নাকি 'বিশ্বপাকা'। ঝিনুককে সে সহ্য করতে পারে না। কারণ, এতে তার 'মেল ইগো' আহত হয়। দুর্যোগের রাতটিতে সে স্বামী হয়ে স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে নি। একটি নারীর কাছে হেরে যাওয়া অধিকাংশ পুরুষের মতই পলাশেরও ভালো লাগেনি। তাই ঝিনুক রমিতার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও সে মানা করে দিয়েছে। পলাশ বলেছে —

> সোজাসুজি বলিনি। কায়দা করে বলেছি। যা বোঝার তাতেই বুঝে যাওয়া উচিত। বললাম আপনি আমার বউকে উদ্ধার করেছেন, তার জন্য উই আর এভার গ্রেট-ফুল টু ইউ। আমরা চাই না বাড়ির বউ এই নোংরা ঘটনায় ফার্দার জড়িয়ে পড়ুক।[৮]

সমাজ জীবনে কত রদবদল ঘটে। এক যুগ গিয়ে আসে আরেক যুগ। জাগতিক নিয়মে মেয়েদের যাপন চিত্রও বদলে যাওয়ার কথা। শতাব্দী পেরিয়েও সঞ্চয় সেই বিদ্রূপ, বিরূপতা। অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত রমিতার প্রাপ্য ছিল স্বামীর সস্নেহ সহানুভূতি আর এই ঘটনার কবলমুক্ত হতে সাহায্য করার জন্য ঝিনুকের প্রাপ্য ছিল সম্মান। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক বজ্রকঠিন ঐতিহ্যের বিরোধিতা ক'জন পুরুষই বা করেছে। পলাশও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং পুরুষতন্ত্রের কঠিন মুঠিকে শক্ত করতেই সে আগ্রহী। একসঙ্গে বসবাস করার পরও নিজের স্ত্রীর প্রতি সামান্য বিশ্বাসটুকুও নেই তার। প্রকৃতপক্ষে এই সমাজ তো চিরকাল পুরুষকে শিখিয়েছে, নারী বিশ্বাসের যোগ্য নয়, নারী নরকের দ্বার।

পোশাক পরিচ্ছদে আধুনিক পুরুষ আসলে মননে বসবাস করে সেই আদিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজে। বিবাহ সম্পর্কে মেয়েদের খাটো করে দেখার বিষয়টিকে অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'বিবাহ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন —

> অনুষ্ঠান সব সময়েই প্রতীকী। বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রতীকগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায় বধূটি ভরণপোষণের পরিবর্তে স্বামী শ্বশুর ও তাদের আত্মীয় পরিজনের পরিচর্যায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করবে, এইটেই অপেক্ষিত। আসলে এর মধ্যে অসম্মানজনক কিছুই থাকত না যদি না নারীর হীনতা সমাজে ও পরিবারে স্বতঃসিদ্ধের মত গৃহীত হত। যদি বরেরও শাস্ত্র ও সমাজনির্দিষ্ট কিছু করনীয় থাকত বধূটির পরিবার সম্বন্ধে, অর্থাৎ যদি দাম্পত্যের ভিত্তিতে কোনো সাম্যবোধ থাকত। তা নেই বলেই কর্তব্য সবটাই একতরফা, নারীর কর্তব্যেই অবসিত, এবং অধিকারও একতরফা, পুরুষের। এইখানেই বৈষম্যের ভিত্তি, অশান্তির বীজ।[৯]

নিরন্তর অপমান, অসম্মানে বিপর্যস্ত 'দহন' উপন্যাসের রমিতা এই নারকীয় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু সে আবিষ্কার করে বশ্যতা স্বীকার করতে করতে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে গিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে অতিক্রম করার শক্তি আর ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। তবু কখনও কখনও মধ্যরাতে মাথার ভিতর নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ছটফট করতে থাকে। হেরে যেতে যেতেও কখন যেন অবাধ্য হয়ে ওঠে তার ভাষা —

> থানায় গিয়ে শ্রবণা সরকারের সামনে আন-ইজি লাগছিল? ভাবতে আঁতে লাগছিল, ওই মেয়েটাই তোমার বউকে রক্ষা করেছে? তুমি যা পারোনি?[১০]

নারীর এই স্পর্ধা কোনো পুরুষই সহ্য করতে পারে না। নারীসত্তার প্রতিবাদী স্বরকে শাসন করে রাখে পুরুষ। সমালোচক শেফালী মৈত্র জানান —

> পুরুষতন্ত্রে ক্ষমতার লীলা বড় বিধ্বংসী-তন্ত্রটি একপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করে, আর অপরপক্ষকে নিঃস্ব করে।[১১]

সেই ক্ষমতার দম্ভে পলাশ মত্ত হয়ে উঠে। ঝিনুক রমিতাকে বাঁচিয়েছিল রাস্তার কয়েকটি বিকৃত কাম যুবকের অত্যাচার থেকে, কিন্তু তার নিজের ঘরে স্বামীর উন্মত্ততা থেকে তাকে বাঁচানোর কেউ থাকে না। সে শিকার হয় 'বৈবাহিক ধর্ষণের'। শারীরিকভাবে অসুস্থ দুর্বল রমিতার সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করতে করতে হিংস্র পলাশ নির্দয় কণ্ঠে বলেছিল —

> দেখি কোন শ্রবণা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে। দেখি দেখি।[১২]

ক্ষমতার নির্লজ্জ প্রকাশ আর স্বামীর অত্যাচার তো সমাজ অনুমোদিত। ভোগ্য বস্তুর ওপর নির্বিচারেই অত্যাচার করা যায়। বৈদিক যুগ থেকেই সমাজ নারীকে পিতা, স্বামী বা পুত্র কোনো এক পুরুষের ওপরই দীনভাবে নির্ভর করতে শিখিয়েছে। সেই রক্ষক স্বামীই যখন লালসা পূর্তির উদ্দেশ্যে নারীকে ব্যবহার করে তখনই বোঝা যায় ঘরে বাইরে সে একইভাবে অরক্ষিত। কত অমর্যাদাকর তার অবস্থান। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মন বলে কিছু নেই, সে জড় বস্তু, খেলার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। তৈত্তিরীয় সংহিতা জানাচ্ছে —

> নারীর শরীর তার নিজস্ব অধিকারে নয়, সুতরাং চিরটাকাল ধরে নারীদেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করা চলে, ইচ্ছেমতো তাঁর ওপর অত্যাচার করা চলে।[১৩]

আজও সমানভাবেই নারী ভোগ্যবস্তু এবং তার মন ও অনুভূতিকে গ্রাহ্য করে না সমাজ। আর এভাবেই অজস্র নারী স্বামীর ধর্ষকামিতাকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু স্বামীর অত্যাচার ধর্ষণ বলে পরিগণিত হয় না। এক্ষেত্রে সমাজ, প্রশাসন অদ্ভুতভাবে উদাসীন। সুচিত্রা ভট্টাচার্য উপন্যাসটিতে পরোক্ষভাবে হলেও নারীর ওপর এই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। অধ্যাপক সুতপা ভট্টাচার্যের মন্তব্য —

> দাস্যতার সাংসারিক ছবি দেখেছি 'হেমন্তের পাখি'তে, 'দহন'এ দেখা গেল দাস্যতার যৌনমাত্রা।[১৪]

উপন্যাসের আর এক নারী ঝিনুক গৃহবধূ নয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর লড়াকু এক মেয়ে। সংসারের চার দেওয়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে কর্মজীবনে যোগ দেওয়ায়, আপাতদৃষ্টিতে মুক্ত বলেই মনে হতে পারে তাকে। দুর্যোগের সেই রাত্রিতে রমিতাকে রক্ষা করার ফলস্বরূপ খবরের কাগজ তার সাহসিকতার প্রশংসা করে লেখে। এ ঘটনায় আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সহকর্মী, ছাত্র, প্রেমিক সকলেই তাকে অভিনন্দিত করে। এই অভিনন্দনে আপ্লুত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আবিষ্কার করতে থাকে সমাজের কত ধরনের চাপ নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে প্রতিবাদী মানসিকতাকে। অপরাধী যুবকগুলোকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার পরও চোখের সামনে বেকসুর খালাস হয়ে যেতে দেখে। কিচ্ছু করতে পারে না।

উপন্যাসের কাহিনিতে দেখতে পাই শুধু পলাশ নয়, ঝিনুকের প্রেমিক তূণীরও চায়নি সে এই লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়ুক। অপরাধীদের মধ্যে একজন তূণীরের বসের আত্মীয় ছিল। সেই বস ঝিনুকের এই লড়াই থেকে সরে আসার মূল্যে তাকে বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। শুধু সে কারণে নয়, ঝিনুক যে মনুষ্যত্বের মাপে তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে সেটাও ছিল অস্বস্তির অন্যতম কারণ। ঝিনুক তার সঙ্গে সহমত না হলে

যে সে সম্পর্ক ভেঙ্গে দেবে একথা জানাতেও সে দেরি করেনি। নিজের প্রেমিকাকে এই রূপে আবিষ্কার করে সে অবাক হয়ে যায়। তূণীরের ভাবনায় —

> আহত পৌরুষ লুকনো থাবা প্রকাশ্যে চাটতে শুরু করেছে– হয়তো আমার পক্ষে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না। জীবন শুরু করার আগেই এত ঔদ্ধত্য আমার পক্ষে স্ট্যান্ড করা সম্ভব নয়।[১৫]

স্বভাবতই, ঝিনুকের কাছে অপমানের পর তূণীরের ভালোবাসা মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। ভালোবাসা টিকিয়ে রাখতে অলিখিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হয়নি ঝিনুক এবং বুঝতে পারে নিজেকে সে যতই মুক্তনারী বলে মনে করুক, নারীর অবমাননাকর অবস্থা ভেতর থেকে বদলায়নি। তাইতো —

> ব্যক্তিগত সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে প্রতিটি পুরুষই হয়ে যাবে দুঃশাসন বা রামচন্দ্র! কেউ প্রকাশ্যে নারীকে বিবস্ত্র করতে চাইবে! অথবা প্রেমিকের ছদ্মবেশে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলবে প্রিয়তমা নারীকে! যেন নারী শুধুই তার অধিকারের পণ্যসামগ্রী! প্রিয়তমা থাকতে হলে নারীকে অর্পণ করতে হবে নমনীয় দাস্য! তবেই অটুট থাকবে নারী- পুরুষের প্রেমের বন্ধন! প্রেমও এত নিষ্ঠুর![১৬]

নারী শিক্ষিত হলেও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সেই হারে হচ্ছে না বলে পরজীবিতার শৃঙ্খলে বাধা পড়ে আছে অধিকাংশ নারী, মুষ্টিমেয় উপার্জনশীল নারীও সে শৃঙ্খলের প্রভাব কাটাতে পারছে না। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে 'গ্লোবাল ভিলেজ'- এর প্রণেতাদের হাত ধরে মেয়েরা পণ্যের মতো ধরা পড়েছে। 'দহন' উপন্যাসে ঠাকুমা মৃণালিনীর কণ্ঠে তারই প্রতিবিম্বন এভাবে —

> এখন ছেলেরা তোদের আরও খোলামেলা দেখতে চায়। তাই টিভিতে সিনেমায় বিজ্ঞাপনে তোদের খোলামেলা হয়ে নেচে বেড়াতে হচ্ছে। ছেলেদের মন খুশি রাখার জন্য। আর সেটাকেই তোরা স্বাধীনতা ভেবে ছাগলছানার মতো লাফাচ্ছিস। এটা স্বাধীনতা নয় রে দিদি, স্বাধীনতার মরীচিকা। স্বাধীনতা হল মনের অনুভূতি।[১৭]

মৃণালিনীর জবানিতে কথাগুলি আসলে লেখিকার নিজের। সুচিত্রা বিশ্লেষণ করেন যে বহির্বিশ্বে নারী পুরুষের সহযোগী কিংবা প্রতিযোগী হয়ে পাশে দাঁড়ালেও পুরুষতান্ত্রিক পৃথিবী একান্তই পুরুষের। সেই বিশ্বে নারীর মেধা-মননের কোনো অনুমোদন নেই। তাই 'দহন' উপন্যাসে ইচ্ছেপূরণের কোনো রঙিন গল্প রচনা করেন নি। বরং প্রতিবাদের ভাষা দিয়ে নারীচেতনাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছেন, যেন একটি প্রকৃত

নারীসত্তা এখান থেকেই খুঁজে নেবে তার অস্তিত্বের বোধ আর এখানেই লেখক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে লিঙ্গভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান।

সূত্রনির্দেশ

১) সিমোন দ্য বোভোয়ার, 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', অনুবাদ হুমায়ুন আজাদ, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ১৮৩

২) সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা ৬

৩) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', কলকাতা, নবম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী, ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৫৫

৪) সমরেশ মজুমদার, 'বাঙলা উপন্যাস: সূচনাকাল থেকে ২000', 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা), কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, রত্নাবলী, এপ্রিল ২০০৯, পৃষ্ঠা ৯৭৯

৫) তপোধীর ভট্টাচার্য, 'নারীচেতনা: মননে ও সাহিত্যে', কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭১

৬) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রীতম বসু, 'এই সময়' (পত্রিকা), ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩

৭) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'দহন', 'উপন্যাস সমগ্র ১', কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৫১

৮) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৫

৯) সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'বিবাহ প্রসঙ্গে', কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ক্যাম্প, অক্টোবর ২০১৮, পৃষ্ঠা ২৭

১০) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'দহন', 'উপন্যাস সমগ্র ১', কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৫৮

১১) শেফালী মৈত্র, 'নৈতিকতা ও নারীবাদ: দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা', পঞ্চম সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা ৯৩

১২) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'দহন', 'উপন্যাস সমগ্র ১', কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ৫৫৯

১৩) সুকুমারী ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, নভেম্বর ২০০৬, পৃষ্ঠা ১২৮

১৪) সুতপা ভট্টাচার্য, 'সুচিত্রা ভট্টাচার্য', 'কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা), কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশাদীপ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩১৮

১৫) সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ‘দহন’, ‘উপন্যাস সমগ্র ১’, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ৬২৯

(১৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩১

(১৭) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৪৩।

আসুন, বিজ্ঞাপন পড়ি

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া

অভিমুখ; বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে রকমারি বিজ্ঞাপনের পাঠ আস্বাদন। সেই সঙ্গে সময়কে চিনে নেওয়া সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

অন্ধকার সরিয়ে সকাল হচ্ছে ক্রমশ। কলকাতার গলিতে গলিতে ক্রিং ক্রিং। এক হাত ব্রেকে রেখে অন্যহাতে লক্ষ্য ভেদ। সাইকেলে চেপে এগলি ওগলি পেরিয়ে আমাদের ব্যালকনিগুলোতে উড়ে আসছে 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'এই সময়'— এরকম নানা নাম। আর কত সহজে ৩, ৪, ৫ টাকাতেই আমাদের চায়ের স্বাদকে চমৎকার বা পানসে করে দিয়ে যাচ্ছে। একদিন মনে হল, ক্রমাগত খুচরো থেকে মুখ সরিয়ে নিতে থাকা এই দেশে এত কম মূল্যে কী করে এরা আমাদের সকাল-সঙ্গী হয়? অথচ বাজারযোগ্য করে তুলতেই কাগজগুলোর খরচা বিক্রয়মূল্যের প্রায় পাঁচ থেকে দশগুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিজ্ঞাপনই সেই পৃষ্ঠপোষক যার আর্থিক বিনিয়োগে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্ররা আমাদের কাছে সামান্য টাকার বিনিময়ে পৌঁছে যায়। তবে বিজ্ঞাপনের এই কৃতকর্মে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ কিছু সময় পরে বিজ্ঞাপনের ধাঁধায় বশীভূত হয়ে তাদের খরচের খাতায় লাভের অঙ্ক আমরাই কষে দিই। যদি মনে হয় ক্ষতি হল, তাহলে বলা ভাল—মোটা ছাড়ে কেনা ব্র্যান্ডেড প্রসাধনে আপনাকে যখন কেউ তারিফ করে। তখন কিন্তু আপনি তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন।

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সেই প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, খবরের ভূমিকা কোথায়? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখি বিজ্ঞাপন ও খবর পরস্পরের বৈশিষ্টেও বিশিষ্ট। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনেও থাকে খবর আর খবরে বিজ্ঞাপন। শরদিন্দুর 'পথের কাঁটা'তে প্রায় একই বক্তব্য দেখি। অজিত কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করলে ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে একটু বিস্মিত ভাবে জানায়, 'বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কী?'[১] অজিত আর পাঁচজন সাধারণ পাঠকের মত জবাব দেয়, 'খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে তাই পড়ি—খবর'।[২] ব্যোমকেশ ব্যঙ্গাত্মক স্বরে জানায়, 'অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটি ছেলে হয়েছে এই পড়! ওসব পড়ে লাভ কী? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।'[৩]

একটু জ্যোতিষের বিজ্ঞাপনে আসি। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, কৌলিন্যের স্বাদ পেতে যুক্তির ঘরে বাসা না বেঁধে সহজে ভাগ্য পরিবর্তনের অন্বেষণকারী মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কিছু কম নয়। অতএব বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণ অন্ধকার গুদামে আশ্রয়

খোঁজে আর মানুষ বিশ্বাস রাখে অলৌকিক কিছু ঘটার আসায়। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এই বিশ্বাসই জল-বাতাস-আলো পায়। গ্রহ-নক্ষত্রের পথচলা মানুষের চলার পথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই মানসিক দুর্বলতার উপর ভিত্তি করেই জ্যোতিষিদের মুনাফার ইমারত। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিজ্ঞাপনের চালচিত্রে। এরা কেউ 'মহাস্নাতক', 'যোগবিদ্যাভূষণ', 'সামুদ্রিক রত্ন' –ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত। কে যে এদের ভূষিত করেছেন তার খবর মেলে না! কারোর দাবি 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও তাদের নবরত্ন অঙ্গুরী ধারণ করিয়াছিলেন।'[৪] বুঝুন কাণ্ড! বশীকরণের ক্ষেত্রে 'সিদ্ধ বশীকরণ কবচ', 'সম্মোহিনী অঙ্গুরী', 'সম্মোহিনী রুমাল' — প্রভৃতির বিজ্ঞাপনদাতাদের বক্তব্যে বেশ জোর আছে। তাদের প্রতিশ্রুতি, 'কোন দিক দিয়াই নিরাশ হইবেন না। এই তান্ত্রিক অঙ্গুরী ধারণ করিয়া যে ব্যাক্তির নাম স্ত্রী পুরুষ লইবেন তিনি সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে থাকিলেও সব বাধা বিঘ্ন উল্লংঘন করিয়া আপনার কাছে হাজির হইবেন। ...ইহা ধারণে মনোমত বিবাহ হইবে, চাকুরি মিলিবে, মৃত ব্যাক্তির সঙ্গে আলাপ করা চলিবে, লটারি জুয়া ফাটকা খেলায় জিত হইবে।'[৫] উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনে দুটি জায়গায় আলাদা করে নজর আটকে যায়। বিজ্ঞাপনের শরীরের ভিতরের কিছু খবর এখানে আছে। আমাদের সমাজে চাকরি না পাওয়া আর মনোমত বিয়ে না হওয়ার মধ্যে অবশ্যই প্রথম সমস্যাটি অধিকতর ব্যাপ্ত সমস্যা। কিন্তু জ্যোতিষী কাদের সমস্যা দূর করতে চান তাদের ক্রম তালিকায় বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যাটি প্রথমে আসে। বোঝা যায়। আর্থিক সঙ্গতি আছে অর্থাৎ খরচ করতে পারবে সেই বিয়ে পাগলা মানুষরাই তার অধিক আগ্রহের বিষয়। আর দ্বিতীয়, বিজ্ঞাপনটিতে একটি জনপ্রিয় বাংলা গানের কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্মৃতির সঙ্গে নতুন অনুষঙ্গ জুড়ে দিলে, জুড়ে যাওয়া বিষয়টির স্মৃতি রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তৈরি হয়। বিজ্ঞাপনের জন্মদাতারা সেকথা সব সময়ই মনে রাখেন। আরও নানান বিজ্ঞাপনে একথার সমর্থন মিলবে। বিয়ের বিজ্ঞাপনে আসি, ২৯ শে আগস্ট ১৮৮১-র 'সোমপ্রকাশে' একটি বিয়ের বিজ্ঞাপন এইরকম—

'সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি ব্রাহ্মণকন্যা, বিবাহপ্রার্থিনী বালবিধবা কিন্তু এক্ষণে বয়ঃক্রম ২০ কিম্বা ২১ বৎসর হইবে; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য এই তিনজাতির মধ্যে অবস্থানুসারে বিবাহ দেওয়া যাইবে, যাঁহারা এই প্রস্তাবে ইচ্ছুক হইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা এবং নাম ধাম লিখিয়া ২০ শে আশ্বিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। তৎপরে পত্রাদি পাঠানো বিফল।

ঠিকানা
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫০নং সিকদারের বাগান স্ট্রীট, কলকাতা'[৬]

আজও বিয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তবে অনেক কথা বলবার সুযোগ আজ আর নেই, জনসমুদ্রের এই দেশে অবিবাহিত পাত্র পাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিজ্ঞাপনের বিনিময় মূল্য। অতএব ফলাফল যেটা সেই অমোঘ বাণী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আমাদের বলেন, 'বিজ্ঞাপনকর্মী বলবেন ছাঁটুন, ছাঁটুন কদম ছাঁট মারুন। বিজ্ঞাপনেই তো দেউলে হবেন। সব বিসর্গ মারুন। বিজ্ঞাপনের ঠেলায় ছেলে জুটলেও বিয়ে দেওয়ার রেস্ত থাকবে না। 'শুধু হাসলে চলবে না। আর একটু মনযোগ দিলেই দেখতে পাব, অতর্কিতে এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার মর্মবেদনার কথাও শুনিয়ে দিলেন প্রিয় লেখক। অগত্যা বিসর্গের দারস্থ হই আমরা। এই সময়ের একটি বিয়ের বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখা যাক— 'পুঃ বঃ ভরদ্বাজ গোত্র 33+ 5'3"B+ ব্রাহ্মণ বেঃ সঃ চাঃ (৪000p.m.) স্লিম সুশ্রী পাত্রী চাই।'[৭]

জন সচেতনতায় সংবাদ সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপনের বড় ভূমিকা আছে। তবে এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে করে থাকে সরকার। পরিবার পরিকল্পনা, ভোটাধিকার প্রয়োগ, অস্পৃশ্য দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা, যৌন শিক্ষা, মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা থেকে শুরু করে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু, পালস্ পোলিও টিকাকরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিস্তৃত ভূগোলের মানুষের কাছে দরকারি বার্তা পৌঁছে যায়। সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ায় এর আবেদন অনেকখানি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দেশপ্রেমকে মূলধন করে পণ্যদ্রব্যের বিক্রি বাড়ানোর পরিকল্পিত অভিপ্রায়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে পি. এম. বাগচীর ডাইরেক্টরি ঘোষণা করেছিলেন— 'স্বদেশী হিতৈষণা কোথায়? স্বদেশজাত দ্রব্যের উন্নতির আন্তরিক চেষ্টায়।'[৮]এই সময়েই কেশরঞ্জন তেলের বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'আপনি যদি প্রকৃত দেশ ভক্ত হন, দেশের ধন বৃদ্ধিতে আপনার যদি আন্তরিক অনুরাগ থাকে...তাহা হইলে স্বদেশী শিল্পের গৌরবময় নিদর্শন আমাদের মহাসুগন্ধী কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করুন।'[৯] কারোর বক্তব্য, 'আমাদের কারখানায় বিদেশি কিম্বা জাপানি বিশেষজ্ঞ নাই'।[১০]ব্রিটিশ বিরোধী আবেগকে প্রকাশ্যে ব্যবহারের এমন মজাদার কুশলতাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। আজ এমন বিজ্ঞাপন যা আমাদের মুচকি হাসির উৎস হতে পারে তারই মধ্যে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের সংগ্রামের ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

আবার দেখি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা প্রয়াত জ্যোতি বসুর মানবপ্রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাকেও বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল,

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক। (পরিচয়)

রবি ঠাকুরের এই লেখায় বামপন্থীরা খুঁজে পেয়েছেন তাদের আঁতের কথা! বিজ্ঞাপনের শক্তি কত দেখুন একবার জ্যোতি বসু থেকে মমতা ব্যানার্জিকে এক কবিতার লাইনে মিলিয়ে দিয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার পোষ্টারেও এই কবিতার লাইন দেখা যায়।

গোটা সংবাদপত্রও যে আসলে আপাদ মস্তক বিজ্ঞাপন তা তো আমরা জেনে গেছি। তবুও 'পরিবর্তন' বা 'গণশক্তি'দের আমরা মন্দের তালিকায় ফেলি না, কারণ এগুলির চরিত্র স্পষ্ট এবং সাধারণ মানুষ সে সম্পর্কে কমবেশি অবহিত। কিন্তু আর যে সমস্ত কাগজগুলি নিরপেক্ষতার ছাপ মুখে টেনে বহুল প্রচারের সফলতা গায়ে চোরাস্রোতের মত মনে-মস্তিষ্কে অতর্কিতে আঘাত হানে, যাদের চিনতে আমাদের দেরি হয়ে যায় বা চিনে উঠতে পারি না। তবে রসিকের কাছে বিষয়টি কম উপভোগ্য নয়।

১৮৭০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দ্য বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনের কথা বস্তু হল এই রকম —'এখন কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্রলোক সুদেহী আফ্রিকান-যাদের কথ্য ভাষায় 'কাফরী' বলা হয় মেয়েছেলে চান। তাদের বয়স ১৪ থেকে ২০র মধ্যে হতে হবে। গড়ন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। সকল রকমভাবে যাতে দেহভোগের কাজে লাগে সে রকম হতে হবে।'[১১] সেদিনের পুরুষ সমাজ মানেই তারা নারীমাংস লোভী তা অবশ্যই নয়। কিন্তু সমাজ যে কতখানি পুরুষশাসিত ও শোষিত তার প্রমাণ আছে এই নির্লজ্জ সোচ্চারিত বিজ্ঞাপনটিতে। আর যদি এইসময়ের ভোগী সমাজের রূপ দেখতে চাই তাহলে দেখবো এইরকম চিত্র—'ফ্রেন্ডশিপে'র নাম করে শারীরিক সম্পর্কের জোয়ার কাগজগুলোর নিত্যদিনের সঙ্গী। ভাষায় অতীতের উগ্রতা নেই বক্তব্যে আছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীশিক্ষার বহুল প্রসার হলেও অতীতের চিত্র একটু অন্যরকম। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্ত্রী শিক্ষকের প্রয়োজনে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে বিখ্যাত পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশে'। 'চট্টগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন, বেতন মাসিক ২৫ টাকা আগামী ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদনপত্র হস্তগত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা এবং সচ্চরিত্রতা সম্মন্ধে বিশেষ নিদর্শন দেখাইতে হইবে।'[১২] লক্ষণীয় এখানে শিক্ষার সঙ্গে মহিলাটিকে সৎচরিত্রেরও বিশেষ নিদর্শন দেখাতে বলা হয়েছে। ভাষা প্রয়োগের ভঙ্গী দেখে মনে হয় না বিদ্যালয় কতৃপক্ষ নেহাত একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটে সন্তুষ্ট হবেন! যদিও পুরুষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খুব বেশি প্রযুক্ত নয়। মনে পড়ে যায় পুরুষের সেই আপাত ঔদার্যে ভরপুর লিঙ্গবৈষম্যের রক্তাদাগের একটি বাক্য, 'ঈশ্বর চান, দেবীর পূজা হোক'।

বিজ্ঞাপনে পরিসর বেশি মেলে না। তাই যত সংক্ষেপে বিজ্ঞাপনদাতা তার মূল বক্তব্য বলে বিক্রেতার কাছে বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন ততই গ্রাহকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে হাস্যরসকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের প্রচুর নমুনা পাওয়া যায়। বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্রের ইতিহাসের শুরু থেকেই এই প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন রকমের কলের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত সেসময়ে। শক্তি আখমাড়াই কলের বিজ্ঞাপনে বলা হল, 'আমাদের কলের কখনও মাথা ধরে না।'[১৩] বিজ্ঞাপনের ভাষা তৈরির ক্ষেত্রে বর্ধমান নিবাসী তপন ঘোষের কথা আমাদের মনে পড়বে। মাত্র দুটি শব্দের কারুকার্যে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার পান তিনি। কফির বিজ্ঞাপনে

তার সেই জনপ্রিয় সৃষ্টি হল, 'চুমুকেই চমক'।[১৪] আমূল মিল্ক পাউডার তাদের বিক্রি বাড়ানোর জন্য বলত, 'আপনার দুধওয়ালা কি রাত ১০ টায় দুধ দিয়ে যায়?'[১৫]

বিজ্ঞাপনে ছবির ব্যবহার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাশক্তি ঔষধালয়ে মহাশক্তি সালসার বিজ্ঞাপনের ছবিটি খুবই জনপ্রিয়। এই সালসার বিজ্ঞাপনে রুগ্ন মানুষও কি পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে তা ছবিতে চিত্রিত হয়েছে। হাঁটু অবধি ধুতি পরা একটি পালোয়ান দাঁড়িয়ে; কাঁধের উপর অবলীলাক্রমে ধরা একটি হাতি, ডান পায়ের নিচে চাপা পড়েছে একটি ভিত সন্ত্রস্ত সিংহ, বাঁ পায়ের পাশেই রাখা একটি সালসার শিশি। অর্থাৎ পানকার্য শেষ হতে না হতেই এই অবস্থা। একটি রসনার প্যাকেট থেকে ৩২ গ্লাস পানীয় তৈরি হতে পারে। এই বক্তব্যের সপক্ষে স্বাক্ষর রেখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সই ছাপানো হয়েছে বিজ্ঞাপনে।

সংবাদপত্রের পুরো খবরের পাঠক সংখ্যা খুবই কম। শতকরা ৫০ জন মানুষ শুধু হেডলাইনটা পড়ে। আবার কেউ রাজনীতি, কেউ সাহিত্য সংস্কৃতি, কেউবা শুধুই খেলার সংবাদ পড়তে আগ্রহী। ফলত পণ্যের উদ্দিষ্ট বিক্রেতার পছন্দমত জায়গাতেই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে। নতুবা সমস্ত চেষ্টাই মাটি। যদিও বিজ্ঞাপনের এই স্থান মাহাত্ম্যের সুযোগকে সংবাদপত্রের তুলনায় সাময়িক পত্রে বেশি ব্যবহার করা যায়।

মানুষের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, বেশিরভাগ মানুষই তার দৈহিক খুঁতগুলো ঢেকে ফেলতে চায়। তাই শ্যামলা মানুষের ফর্সা হওয়ার, বেঁটে মানুষের লম্বা হওয়ার, টাক মাথা মানুষের নতুন চুল গজানোর মত নানা বাসনা সর্বদাই উঁকি মেরে যায়। আর অন্যদিকে বেকারত্ব বাড়ার জন্য কাজের সন্ধান না পাওয়া আর এক বৃহৎ সমস্যা— যেখান থেকেও মানুষ মুক্তি পেতে চায়। মানুষের এহেন বৈচিত্র্যময় দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন নানা প্রতিষ্ঠান চারপাশে গড়ে উঠছে। আর তার ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞাপনের কাগজ পড়ছে উপছে। সংবাদ সাময়িকপত্রের পাতায় যত সহজে বিজ্ঞাপনদাতারা মানুষের চাহিদা পূরণ করে থাকেন, বাস্তবে চলার পথ ততটা সুমসৃণ নয়। আবার পুরোটাও অসততা তাও নয়। কারণ কিছুটা সত্যতা না থাকলে যুগের পর যুগ ধরে বিজ্ঞাপন মানুষের জীবনকে অধিকার করে থাকত না। এখন মোদ্দা কথা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের দ্বারা মানুষ উপকৃত হবেন না প্ররোচিত হবেন তা নির্ভর করছে ক্রেতার বিচার ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। বিজ্ঞাপনের হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে মুগ্ধ হলে মুশকিল। নতুবা এহেন প্রতাপাদিত্যের গুরুত্ব আমাদের প্রাত্যহিকে অস্বীকার করা মুখের কথা নয়।

বিজ্ঞাপন ও সংবাদ সাময়িকীর এই রসায়নের বৈচিত্রময় দীর্ঘজীবন আমাদের প্রার্থনায় থাক। গণমাধ্যমের অন্য মাধ্যমগুলির সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই সেরে সে যেন তার ঘরে বিজ্ঞাপন দিতে পারে— তার জন্য থাক শুভকামনা।

তথ্যসূত্র:

১. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শরদিন্দু অমনিবাস'। প্রথম খণ্ড (ব্যোমকেশ)। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৪১৫। পৃ. ৩৩।

২. তদেব।

৩. তদেব।

৪. স্মরজিৎ দত্ত। 'আধুনিক বিজ্ঞাপন অঙ্গ ও অনুষঙ্গ'। অগ্রণী বুক ক্লাব। কলকাতা। বইমেলা ১৯৯৬। পৃ. ১৮২।

৫. তদেব। পৃ. ১৮৪।

৬. স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাঃ)। 'দুই শতকের সংবাদ সাময়িকপত্র'। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০০৫। পৃ. ৫২১।

৭. সৃঞ্জয় বোস (সম্পাঃ)। 'সংবাদ প্রতিদিন'। কলকাতা। ১০ই জানুয়ারি। পৃ. ৬।

৮. স্মরজিৎ দত্ত। 'আধুনিক বিজ্ঞাপন অঙ্গ ও অনুষঙ্গ'। অগ্রণী বুক ক্লাব। কলকাতা। বইমেলা ১৯৯৬। পৃ. ২৬।

৯. তদেব। পৃ. ২৭।

১০. তদেব। পৃ. ২৭।

১১. স্বপন বসু ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাঃ)। 'দুই শতকের সংবাদ সাময়িকপত্র'। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০০৫। পৃ. ৫১৮।

১২. তদেব। ৫২২।

১৩. স্মরজিৎ দত্ত। 'আধুনিক বিজ্ঞাপন অঙ্গ ও অনুষঙ্গ'। অগ্রণী বুক ক্লাব। কলকাতা। বইমেলা ১৯৯৬। পৃ. ৫৪।

১৪. তদেব। পৃ. ৫৫।

১৫. তদেব। পৃ. ৫৬।

ভারত – জাপান সম্পর্ক : একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা

সুরজিৎ মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
সুন্দরবন মহাবিদ্যালয় (কাকদ্বীপ), দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ: এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দুটি প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে ভারতবর্ষ এবং জাপান – এই দুটি দেশকে অবশ্যই সর্বাগ্রে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ, যার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে রয়েছে আরব সাগর। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তিন দিকেই রয়েছে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস। অপরপক্ষে জাপানকে এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার স্থান প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় এই দুটি দেশের পারস্পারিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন। কথিত আছে উভয়ের মধ্যে পারস্পারিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার শুরু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে জাপানি সংস্কৃতি অবশ্যই ভারতীয় একটা বিশেষ বোধ ও দর্শনের দ্বারা চালিত হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নানা পালা বদল এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছে এই দুটি দেশ। কিন্তু তাদের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য যেহেতু শান্তি সেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – উত্তর পৃথিবীতে ভারত এবং জাপান পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। সেই সূত্রে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে—

(ক) রাজনৈতিক নানা আদান-প্রদান

(খ) সংস্কৃতিক সম্পর্কের নানা ওঠাপড়া

(গ) অর্থনৈতিক নানা চলাচলের সম্পর্ক ও চুক্তি সমূহ এবং

(ঘ) ভারত জাপান শিক্ষা বিষয়ক পারস্পরিক ও সহমর্মিতার সেইসব ক্ষেত্রগুলি।

মূল গবেষণাপত্রে ভারত এবং জাপানের সেইসব চুক্তি এবং ভারত ও জাপানের প্রতিবেশী চীনের প্রভাব কিভাবে সেখানে মূর্ত হয়ে উঠছে, তারও একটা বিশ্লেষণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের আগ্রাসনের ক্ষেত্রগুলিও তুলে ধরা হবে।

সূচক শব্দ : এশিয়া, ভারতবর্ষ, জাপান, চীন, রাজনীতি, সংস্কৃতি, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য চলাচল, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

মূল আলোচনা

।।এক।।

জাপান পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। এই দেশটি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাপান সাগর, পূর্ব চীন সাগর, চীন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়ার পূর্ব দিকে উত্তরে ওখোৎস্ক সাগর থেকে দক্ষিণ পূর্ব চীন সাগর ও তাইওয়ান পর্যন্ত প্রসারিত। যে কাঞ্জি অনুসারে জাপান নামটি এসেছে, সেটির অর্থ 'সূর্য উৎস'। একারণে জাপানকে প্রায়শই 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' বলে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। যার সঙ্গে জাপানের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় এই সম্পর্কটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন। জাপান ও ভারতের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি, বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে জাপানি সংস্কৃতির উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছে এবং এটিই ভারতের সাথে জাপানিদের ঘনিষ্ঠতার মূল উৎস। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তার 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে জাপান সম্পর্কে লিখেছেন—

'জাপান 'উদীয়মান সূর্যের' দেশরূপে পরিচিত এবং তার এই পরিচয় বিশেষভাবে প্রাচ্য জগতের কাছে একদা উদীয়মান সূর্যের আলোর মতই আশার ও আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিতেছিল। কারণ, সারা এশিয়া মহাদেশ যখন কার্যত পদানত ছিল, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের আধিপত্যের নিকট নত শির ছিল, তখন একমাত্র স্বাধীন জাপান পূর্বদিকে নবোদিত সূর্যের মতই গৌরবোজ্জ্বল ছিল। তার সামরিক শক্তি ও মহিমার কাছে ইউরোপের বিশালতম জারের সাম্রাজ্য রাশিয়াও হতমান হইয়াছিল – ১৯০৪ খৃস্টাব্দে। অতএব ইউরোপীর শক্তিগুলির অধিকৃত দেশের জনগণের এবং বিশেষভাবে পরাধীন ভারতের নিকটও জাপানের একটা আলাদা মর্যাদা ছিল।'[১]

১৮৫৩ সালের আগে জাপানে চলেছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন। কিন্তু এটাই অবাক করবার মতো একটি বিষয় যে, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান প্রথম, যারা মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে বেরিয়ে আসছে সামর্থ্য হয়েছিলো। ইতিপূর্বে জাপানে যে রাজতন্ত্র চলেছিল, সেখানে জাপানিরা বিশ্বাস করত যে, দেবতারূপী এই রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যে আত্ম–বিসর্জন করাটাই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আধুনিক জাপানে লক্ষ্য করা গেছে যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জাপানে কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচন্ড গতিতে অগ্রসর হতে শুরু করলো। তাছাড়া জাপানের হাতে এই সময় ছিল, মিৎসুইদের ব্যাঙ্ক এবং তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মিৎসুবিশিদের হাতে ছিল অস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সেইসব ক্ষেত্রগুলি, যাদের চাহিদা সারা বিশ্বে ছিল অত্যন্ত রকমের বেশি। তবে সারা বিশ্বব্যাপী ১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতেই জাপানে পুনরায় একটা নতুন শক্তির জন্ম হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত তাদের বড় একটা বিচলিত না করলেও, ১৯৪১ সালে যখন হিটলারের বাহিনী মস্কো লাল ফৌজের প্রতিরোধে বিপর্যস্ত, তখন জাপান আঘাত হেনেছিল পাল হারবারে। যার ফল স্বরূপ আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের অবনমন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে তৈরি হলো জাপানের একটা চরম বিপর্যয়। ঐতিহাসিকগণ জানাচ্ছেন তারপর থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হতে শুরু করে। তবে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের বিপর্যয় সম্পর্কে লেনিন ১৯২০ সালেই লিখেছিলেন—

'...a most stubborn struggle has been going on for many decades between Japan and America over the pacific ocean and the mastery of its shores, and the entire diplomatic, economic and trade history of the Pacific ocean and its shores is full of quite definite indications that the struggle is developing and making war between America and Japan inevitable.'[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু টোকিওর উয়েনো চিড়িয়াখানায় একটি ভারতীয় হাতি দান করেছিলেন। এটি জাপানি জনগণের জীবনে একটি আলোর রশ্মি নিয়ে এসেছিল যারা এখনও যুদ্ধে পরাজয় থেকে সেরে ওঠেনি। জাপান ও ভারত একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ২৮ এপ্রিল, ১৯৫২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই চুক্তিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান স্বাক্ষরিত প্রথম শান্তি চুক্তিগুলির মধ্যে একটি। ১৯৫৭ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নোবুসুকে কিশির ভারত সফরের পর, জাপান সরকার কর্তৃক প্রসারিত প্রথম ইয়েন ঋণ সহায়তা হিসাবে ১৯৫৮ সালে ভারতকে ইয়েন ঋণ দেওয়া শুরু করে। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকাল পেরিয়ে এসে ১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত, ভারত এবং জাপানের রাজনৈতিক সম্পর্ক উভয় দেশের শীর্ষ- ব্যক্তিদের পারস্পরিক রাজনৈতিক যে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, নিম্নে সেইসব নির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা গেল—

২০০০ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিরো মোরির ভারত সফর জাপান-ভারত সম্পর্ককে শক্তিশালী করার গতি প্রদান করে। মিঃ মরি এবং প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী 'জাপান ও ভারতের মধ্যে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। এপ্রিল ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির ভারত সফরের পর থেকে, জাপান-ভারত বার্ষিক শীর্ষ বৈঠক নিজ নিজ রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে জাপান সফর করেন, তখন জাপান-ভারত সম্পর্ক 'গ্লোবাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে' উন্নীত হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাপানে একটি সরকারী সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের সাথে একটি শীর্ষ বৈঠক করেন। তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'বিশেষ

কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব'-এ উন্নীত করতে সম্মত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ সালে, প্রধানমন্ত্রী আবে ভারতে একটি সরকারী সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে একটি শীর্ষ বৈঠক করেন। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

'দুই প্রধানমন্ত্রী জাপান-ভারত বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বকে একটি গভীর, বিস্তৃত-ভিত্তিক এবং কর্ম-ভিত্তিক অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করার সংকল্প করেছেন, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত লক্ষ্যগুলির একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রকে প্রতিফলিত করে। তারা ঘোষণা করেছেন 'জাপান এবং ইন্ডিয়া ভিশন ২০২৫ বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল এবং বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধির জন্য, 'জাপান-ভারত সম্পর্কের নতুন যুগের জন্য কাজ করবে।'[৩]

নভেম্বর ২০১৬ সালে, প্রধানমন্ত্রী মোদি জাপানে একটি সরকারী সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রী আবের সাথে একটি শীর্ষ বৈঠক করেন। অক্টোবর ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদির জাপান সফরের সময় জারি করা জাপান-ভারত ভিশন বিবৃতিতে, দুই নেতা 'মুক্ত এবং উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক' এর দিকে একসাথে কাজ করার জন্য তাদের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, প্রধানমন্ত্রী সুগা, যিনি দ্বিতীয় জাপান-অস্ট্রেলিয়া-ভারত-মার্কিন শীর্ষ বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটন ডিসি সফর করছিলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির সাথে একটি শীর্ষ বৈঠক করেছিলেন। ২০২১ সালের অক্টোবরে, প্রধানমন্ত্রী কিশিদা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী মোদির সাথে একটি শীর্ষ বৈঠক টেলিফোনে কথা বলেন। ২০২২ সালের মার্চ মাসে, প্রধানমন্ত্রী কিশিদা জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সাড়ে চার বছরের মধ্যে প্রথমবার ভারত সফর করেন। ২০২২ সালের মে মাসে, প্রধানমন্ত্রী মোদি জাপানে অনুষ্ঠিত জাপান-অস্ট্রেলিয়া-ভারত-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলনের জন্য জাপান সফর করেছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি আবার জাপান সফর করেছেন। ২০২৩ সালের মার্চ এবং সেপ্টেম্বরে, প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ভারত সফর করেন এবং ২০২৩ সালের মে মাসে, প্রধানমন্ত্রী মোদি জাপান সফর করেন এবং শীর্ষ বৈঠক করেন। ২০২৩ হল সেই বছর যেখানে দুটি দেশ যথাক্রমে G7 এবং G20-এর সভাপতিত্ব করে। দুই নেতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছেন এবং জাপান-ভারত সম্পর্ককে আরও উন্নত করতে একমত হয়েছেন।

।।দুই।।

জাপান এবং ভারতের মধ্যে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে, প্রধানত জাপানি বৌদ্ধধর্মের উপর ভিত্তি করে, যা আজও জাপানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে চর্চা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ভারত এবং জাপানের যাপিত জীবনের মধ্যেকার অনুসৃত

বেশ কিছু পারিবারিক এবং সামাজিক সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে হর্ষ আদিত্য লিখেছেন—

'Similarity 1 : Honorifics

The Japanese have a well- developed system of hierarchy and use of honorifics, such as '-san', '-sama' for a noble person, 'sensei' for teacher, etc.. India too has a system of using honorifics. However, the main difference between the two cultures in this regard is that unlike the Japanese who have an established, common system throughout the country, the use of honorifics vary across the length and breadth of India. This is mainly due to the existence of numerous vernacular languages. Some examples of Indian honorifics include 'Shri' for a man (Sanskrit), 'ji' for all (Hindi), Pandit for a scholar (similar to Sensei) , and 'Sadguru' for religious leader.

Similarity 2 : Respect to elders

Both the cultures give a huge emphasis on expressing respect to elders, especially senior citizens. In India it is expressed by touching the elder's feet for blessings. In Japan, the expression is through deep bows, care and words. Joint family systems are common in both, and the oldest member is often the head of the family.'[৪]

দুই দেশ ২০০৭, ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক চুক্তির ৫০তম বার্ষিকী বর্ষকে ভারত-জাপান মৈত্রী এবং পর্যটন-উন্নয়ন বছর হিসাবে ঘোষণা করেছে, উভয় দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এরকম একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল বার্ষিক নমস্তে ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল, যা বিশ বছর আগে জাপানে শুরু হয়েছিল এবং এখন এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব। ২০১৬ উৎসবে, ওনাগাওয়া শহরের প্রতিনিধিরা গ্রেট ইস্ট জাপান ভূমিকম্পের সময় ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহায়তার জন্য প্রশংসার চিহ্ন হিসাবে পরিবেশন করে। ভারতীয় জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) দলটিকে তার প্রথম বিদেশী মিশনের জন্য ওনাগাওয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছিল।

ওসামু তেজুকা ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত একটি জীবনীমূলক মঙ্গা বুদ্ধ লিখেছিলেন। ১০ এপ্রিল ২০০৬ এ, একটি জাপানি প্রতিনিধি দল বিহারের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র, বিশ্ব-বিখ্যাত প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব দেয়। জাপানি অ্যানিমের

মাধ্যমেও ভারত ও জাপানের একটি দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম ভারতীয় অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি প্রকৃতপক্ষে জাপান দ্বারা সহ-প্রযোজনা এবং অ্যানিমেটেড - রামায়ণ: দ্য লিজেন্ড অফ প্রিন্স রামা। অনেক জাপানি অ্যানিমে রয়েছে যা ভারতে প্রচারিত হয় যা হিন্দি ভাষায় ডাব করা হয় এবং এটি খুব জনপ্রিয়। ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে, ডোরেমন ভারতে প্রবর্তিত প্রথম অ্যানিমে হয়ে ওঠে যেটি বর্তমানে ডিজনি চ্যানেল এবং হাঙ্গামা টিভিতেও প্রচারিত হয়। ডোরেমন সিরিজের তারিখ পর্যন্ত ৩০ টিরও বেশি হিন্দি ডাব করা চলচ্চিত্র সম্প্রচার করা হয়েছে, এটি একটি নির্দিষ্ট অ্যানিমে সিরিজের সর্বাধিক সংখ্যক চলচ্চিত্র যা ভারতে প্রচারিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য জনপ্রিয় অ্যানিমেগুলির মধ্যে রয়েছে পোকেমন সিরিজ, ক্রেয়ন শিন-চ্যান, ড্রাগন বল, নিনজা হাট্টোরি ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক অ্যানিমেশন সিনেমা ভারতীয় থিয়েটারে মুক্তি পায়। এই প্রসঙ্গে চিত্র সমালোচক মৈনাক চক্রবর্তী লিখেছেন—

‘জাপানে তৈরি এইসব অ্যানিমেশন এবং শিশুদের মনোরঞ্জনের নানা ক্ষেত্রগুলি, সারা পৃথিবীর শিশুদের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য তৈরি করবার ক্ষেত্র তৈরি করবার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। শুধু তাই নয় এইসব চলচ্চিত্রগুলি যেমন শিশুদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পক্ষে সচেতন করে তুলতে পারে, ঠিক তেমনি আবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে এতখানি ডিজিটাল নির্ভর বিনোদনে চালিত করে দেওয়াটা, তাদের প্রথাগত লেখাপড়া থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। তবুও সব কিছুরই একটা ভালো এবং মন্দের দিক রয়েছে। আমাদেরকে মন্দ নয় ভালো দিক থেকে বেছে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় কিছু কার্টুন চরিত্রকে জাপান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তাতে করে এই বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।’[৫]

তামিল সিনেমা জাপানে খুব জনপ্রিয় এবং রজনীকান্ত এই দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেতা। তার চলচ্চিত্র মুথু জাপানে একটি বিশাল বাণিজ্যিক ব্লকবাস্টার ছিল এবং জাপানি দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। অন্যান্য ভারতীয় সিনেমা যেমন মাগধীরা, থ্রী ইডিয়টস, এনথিরান, এবং বাহুবলী জাপানেও সফল হয়েছিল। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বলিউড জাপানিদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং ভারতীয় যোগী এবং শান্তিবাদী ধলসিম জাপানি ভিডিও গেম সিরিজ স্ট্রিট ফাইটারের অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র। ৩ জুলাই ২০১৪ থেকে, জাপান ভারতীয় নাগরিকদের স্বল্পমেয়াদী থাকার জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা ইস্যু করছে।

।।**তিন**।।

চীন সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা সংক্ষেপে গণচীন, পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ১৪২ কোটি জনসংখ্যার দেশটি ভারতের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনবহুল রাষ্ট্র। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশটি শাসন করে। বেইজিং শহর দেশটির রাজধানী। গণচীনের শাসনের আওতায় পড়েছে ২২টি ও ১টি অধীন প্রদেশ, পাঁচটি স্বায়ত্বশাসিত

অঞ্চল, চারটি কেন্দ্রশাসিত পৌরসভা (বেইজিং, থিয়েনচিন, সাংহাই এবং ছুংছিং), এবং দুইটি প্রায়-স্বায়ত্বশাসিত বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (হংকং এবং মাকাউ)। এছাড়াও চীন তাইওয়ানের ওপরে সার্বভৌমত্ব দাবী করে আসছে। দেশটির প্রধান প্রধান নগর অঞ্চলের মধ্যে সাংহাই, কুয়াংচৌ, বেইজিং, ছোংছিং, শেনচেন, থিয়েনচিন ও হংকং উল্লেখযোগ্য। চীন বিশ্বের একটি বৃহৎ শক্তি এবং এশিয়ার মহাদেশের একটি প্রধান আঞ্চলিক শক্তি। এই চীনের সঙ্গে জাপানের একটা চিরকালের অমূল্য মধুর সম্পর্ক রয়েছে। সুদূর অতীতে চীন এবং জাপানের যুদ্ধ ঐতিহাসিক একটা অধ্যায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দেখা গেল, চীন এবং জাপানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন অভিমুখ। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

'সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, চীনা ও রুশ সরকারকে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান-মন্ত্রী এ্যাটলি সম্রাট সম্পর্কে এই মর্মে এক সংশোধনী প্রস্তাব জুড়িয়া দিলেন যে, জাপ গবর্নমেন্ট ও জাপানী হাইকমান্ডের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদান সম্রাট কর্তৃক সুনিশ্চিত করিতে কিন্তু, চীনে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি'র তাঁর বিরোধের জন্য জাপানী সৈন্যদের আত্মসর্পণের প্রশ্নেও তিক্ত মতভেদ দেখা দিল। কারণ, চীনা কমিউনিস্ট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চুতে কমিউনিস্ট দখলীকৃত এলাকাগুলিতে জাপানী সৈনাদেরকে তাঁদের (কমিউনিস্টদের) নিকট আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন।'[৬]

একদা তার ভক্তি কবিতার সূচনায় লিখেছিলেন, জাপানিরা 'শক্তির বান মারছে চীনকে আর ভক্তির বান মারছে বুদ্ধকে' জাপান একতা সাম্রাজ্যবাদী একটি শক্তি হলেও কথনা ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি গুলি নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

- শান্তি চুক্তি (১৯৫২)
- বিমান পরিষেবার জন্য চুক্তি (১৯৫৬)
- সাংস্কৃতিক চুক্তি (১৯৫৭)
- বাণিজ্য চুক্তি (১৯৫৮)
- দ্বৈত কর এড়ানোর জন্য কনভেনশন (১৯৬০)
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার চুক্তি (১৯৮৫)
- জাপান-ভারত ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (২০১১)
- প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি স্থানান্তর সংক্রান্ত জাপান সরকার এবং ভারত প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে চুক্তি (২০১৫)
- শ্রেণীবদ্ধ সামরিক তথ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত জাপান সরকার এবং ভারত প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে চুক্তি (২০১৫)

- সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে জাপান এবং ভারত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে চুক্তি (২০১৬) পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে সহযোগিতার জন্য জাপান সরকার এবং ভারত প্রজাতন্ত্র সরকারের মধ্যে চুক্তি (২০১৭)
- জাপানের স্ব-প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী (২০২১)-এর মধ্যে সরবরাহ এবং পরিষেবার পারস্পরিক বিধান সম্পর্কিত জাপান সরকার এবং ভারত প্রজাতন্ত্রের সরকারের মধ্যে চুক্তি

উপরিউক্ত চুক্তিগুলি ভারত এবং জাপানের পারস্পারিক সম্পর্কের পক্ষে ক্রিয়াশীল হলে, জাপান এবং ভারতের যে একটা যৌথ শক্তির ক্ষেত্র, তাকে চীন কখনোই তাদের পক্ষে হিতকর বলে মনে করেনা। সেক্ষেত্রে চীন তাদের আগ্রাসী শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ এবং পূর্বের দেশগুলিতে তাদের আগ্রাসন বৃদ্ধি করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অধুনা শ্রীলংকা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের যে পরিস্থিতি সেখানে চীন তাদের অর্থনৈতিক এবং নৌ-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধু নয় নেপালেও তারা সেখানকার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তীব্র আগ্রাসন জারি রেখেছে। বিষয়টিকে অধ্যাপক শ্রীকান্ত কোন্দাপল্লী তার একটি বিশেষ নিবন্ধে তাইওয়ান এবং তিব্বত পর্যন্ত চীনের যে আগ্রাসন, তার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি চীনের আচরণের তুলনা করেছেন। আর এই চীনের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেতে এই মুহূর্তে ভারত এবং জাপানের সম্পর্কটিকে মজবুত এবং পারস্পরিক রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার সঙ্গে অবশ্যই সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে ভারত এবং জাপান উভয় রাষ্ট্রকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ, ২০১২, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, পৃষ্ঠা – ৪৪৮।
২. Lenin Vladimir, 1971, The Anti-Hitler Coalition, Moscow, 1ssraeljan, P. 82.
৩. স্টাফ রিপোর্টার, ২০১৫, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৪।
৪. Aditya Harsha, 2024, Similarities between Indian Culture and Japanese culture, Quora.
৫. চক্রবর্তী মৈনাক, ২০১২, অ্যানিমেশন ও চলচ্চিৎত্র, কলকাতা, সুরভি পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা – ৩৮।
৬. মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ, ২০১২, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, পৃষ্ঠা – ৫৫৪-৫৫৫।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'মধুকর': দর্পণে নৌ-শিল্পীদের জীবনালেখ্য

বাবলী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার

সারসংক্ষেপ (Abstract): সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের সাতের দশকের একজন প্রখ্যাত কথাকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত বিশ শতকের সাতের দশকে হলেও তিনি একবিংশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনাবসান ঘটে ১৬ই মার্চ, ২০২০ সালে। তিনি কুড়িটির অধিক উপন্যাস এবং শতাধিক ছোটোগল্প লিখেছেন। সাবেক নৌ-শিল্পীদের জীবনের সেকাল-একালকে নিয়ে তিনি আলোচ্য 'মধুকর' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। প্রবাদ মতে মনে করা হয় ভগীরথ যেদিন মা গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন সেই সময় থেকেই এই নৌ-শিল্পের পত্তন। আর হুগলীর শ্রীপুর-বলাগড় হল নৌ-শিল্পের আদি জন্মস্থল। এখানেই নৌ-কারিগরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের সাবেক আমলের বহু প্রাচীন এই নৌকা তৈরির মত জাত ব্যবসাকে ধারণ এবং বাহন করে আসছেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা বিশ্বকর্মা কতৃক নৌকা তৈরির কথা জানতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরণের নৌকার প্রকারভেদ ও নামকরণ সম্পর্কে অবগত হই। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতের এবং কাজের জন্য এক এক রকমের নৌকা তৈরির ফরমায়েসের কথা আমরা যেমন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করলেই জানতে পারি তেমনি আমরা নৌ-শিল্পের মত একটি সাবেক প্রসিদ্ধ এই শিল্পটির অবক্ষয় এবং নৌ-শিল্পীদের জীবনের অনেক অজানা কথা একালের বিংশ শতাব্দির কথাকার সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'মধুকর' উপন্যাসটি পাঠ করে ঋদ্ধ হই। নৌ-কারিগরদের জীবনের সেকাল-একাল, ধর্ম-সংস্কার, অভাব-বঞ্চনা, আনন্দ-যন্ত্রণার কথাকে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এক বিপন্ন শিল্পের অবক্ষয়ি রূপ একালের আর এক শিল্পীর তুলিতে ভাষ্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি এই অবলুপ্তপ্রায় নৌ-শিল্পটির এবং এই শিল্পটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষগুলির জীবনের হাসি-কান্না, হীরা-পান্নার কথাকে উপন্যাসটি অবলম্বনে আলোচনার একটি প্রয়াস।

সূচক/মূল শব্দ (Keywords): সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মধুকর, নৌ-শিল্প, নৌ-কারিগর, নৌকা, জীবন দর্পণ, সেকাল ও একাল।

মূল আলোচনা (Discussion):

জীবনরসের রসিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০-২০২০) বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একজন সুপরিচিত কথাশিল্পী। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত সাতের দশকে ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে হলেও তিনি একই সঙ্গে উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চরাচর’ নামে একটি ছোট্ট চৌষট্টি পৃষ্ঠার রচনা যেটি সাতের দশকেই লেখা হয়েছিল। এরপর তিনি আমৃত্যু সময়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সময়পর্বে কুড়িটির অধিক উপন্যাস লিখেছেন। নয়ের দশকে লেখা ‘রসিক’ (১৯৯১) উপন্যাসটি তাঁকে পরিচিতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস স্বতন্ত্র আখ্যানের শিল্পনিপুণতায় এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে রচিত। আলোচ্য ‘মধুকর’ উপন্যাসটি লেখা হয় শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় আশির দশকে ১৯৮৯ সালে। উপন্যাসটিতে হুগলী জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ের নৌ-শিল্পীদের বিপন্ন এবং অবলুপ্তপ্রায় একটি শিল্পের কথাকে তিনি সাহিত্যে রূপদান করেছেন মরমী শিল্পীর তুলিতে। সংস্কৃতে ‘বলাহ’ শব্দটির অর্থ নৌকা। তাই বলাগড় স্থানটির নামকরণ হয়েছিল পরিচিত নৌকার নাম থেকেই। প্রসিদ্ধ এই পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ে দীর্ঘদিন ধরে যেসকল মানুষ পরম্পরাগত ভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের জীবনের সেকালের সঙ্গে একালের রুচিবোধ এবং সর্বোপরি এই শিল্পটিকে ঘিরে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষের কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য হীন মানসিকতার ব্যাধিতে নৌ-শিল্পীরা যেভাবে বিপন্ন এক কোনঠাসা পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়ত তারই মলিন বাস্তব রূপ আমরা উপন্যাসটিতে দেখি। প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা আর্থিক মরীচিকার রাহু যখন কোন শিল্পকে কুৎসিত দৃষ্টি দিয়ে ছেয়ে ফেলতে চায় তখন যেকোন শিল্পই তার জন্মগত প্রকৃতি প্রদত্ত বিশুদ্ধতা হারাতে বসে। বিশেষত নৌকা তৈরির মত একটি লোকশিল্প যখন রাজনৈতিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক লালসার অগ্নিগর্ভে জড়িয়ে পড়ে তখন তার ফলস্বরূপ শিল্পের বিপন্ন-অবক্ষয়ি রূপ শিল্পীদেরকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে ফেলতে চায় তার কথা আমদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। শিল্পের এই ভয়াবহ অবক্ষয়ি তথা ধ্বংসাত্মক রূপ উপন্যাসে মধুকর বারিকের জীবনকে কীভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তা যেকোন বিদগ্ধ জনকেই ভাবিত করার মত।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজ তথা বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণ, সে দর্পণে কোন কিছুই অধরা রয় না। শিল্পী সাহিত্যিকরা সেই দর্পণের চিত্র প্রদর্শক। তাঁরা বিধাতার প্রদত্ত মেধাবৃত্তির দ্বারা অর্জিত শিল্পশৈলীতে সবকিছুকেই আঁকতে সক্ষম। তাই প্রকৃতিপ্রদত্ত এক শিল্প যখন কোণঠাসা বিপন্ন সময়ের সম্মুখীন হয় তখন আর এক শিল্পী সেই অবক্ষয়ি শিল্পের বিপন্নতার ছবি সাহিত্যে কিংবা অন্যকোন শিল্পমাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এখানেও সেই শিল্পের কোণঠাসা এক বিপন্নতার দৃশ্য শিল্পীর কলমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ‘মধুকর’ উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে। সমকালীন সময়ের রাজনীতির নগ্ন রূপকে

পাঠকের সামনে এনেছেন এযুগের আর এক চিত্র প্রদর্শক রসিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটির সূত্রপাত হয় নদী এবং মানুষের এক সুসম্পর্কের বা যোগসূত্রের মাধ্যমে –

> "নদী দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। এ হেন সোনার নৌকা জলে ভেসে যায়। সেই কবে কোনকালে শোনা হয়েছিল গানখানি। দেশভাগের অনেক আগে ওপার বঙ্গের এক মাঝি মহাজন ছোকরার মুখে। এতকাল পরেও গঙ্গার ঘোলা জল বেয়ে পদ্মা মেঘনার ভারি জলের ঢেউয়ের মাথায় এ গান ছুটে আসে। জলে তো পারাপার নেই, ভাগাভাগি নেই।"[১]

নদীর সঙ্গে মানুষের যে আত্মার আত্মীয় স্বরূপ সম্পর্ক তা আমরা পূর্বসূরি লেখককুল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু প্রমুখের রচনা সম্ভারে পাঠ করেছি। আলোচ্য উপন্যাসটিতে আমরা নদী এবং মানুষের আত্মীয়তার কথাকে আর একবার স্মরণ করি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নদী পারাপারের জন্য আর এক মাধ্যম নৌকা, যা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। চর্যাপদগুলি পাঠ করলে আমরা দেখি সে সময়ের মানুষের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গমন কিংবা যাতায়তের জন্য একমাত্র বাহন ছিল নৌকা –

> "গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাই।
> তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।।" [২]
> অথবা
> "নৌবাহী নৌকা টাগুঅ গুণে।
> মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ।।" [৩]

চর্যাপদগুলির রচনাকাল দশম-একাদশ শতাব্দী। বাংলা সাহিত্যের সূচনা মূলত চর্যাপদের হাত ধরেই। তবে এই চর্যাপদগুলিতে নৌকার প্রসঙ্গ এসেছে রূপকের মাধ্যমে। নৌকা সম্পর্কে পদকর্তারা বলেছেন – সোনায় ভরে গেছে করুণা-নৌকা, দাঁড় বেয়ে নৌকা মাঝনদীতে এগিয়ে এল, পাটিনী মেয়ের নৌকা চালানোর প্রসঙ্গ, পারানী কিংবা কড়ির বিনিময়ে নৌকা পারাপারের কথা। এছাড়া একটি পদে বাণিজ্য তরীর ওপর জলদস্যুদের আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে, এর থেকে স্পষ্ট হয় যে সেকালের যাত্রাপথে নদীপথ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এরপর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও রাধা-কৃষ্ণের নৌ-পারাপারের প্রসঙ্গ রয়েছে এবং একটি খণ্ডের নাম রয়েছে 'অথ নৌকাখণ্ডঃ' নামে। এই কাব্যের নৌকাখণ্ডের শুরুতেই কবি বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণ কর্তৃক নৌকা নির্মাণের উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে কাঠ কেটে নিয়ে 'দাণ্ডার পাতন' এর মাধ্যমে নৌকার শিরদাঁড়া নির্মাণ করছেন –

> "কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
> শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতানে।।
> চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে।

তাত গুড়া যোড়ী দিল তৈলঝাঁপে।।
ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ।।” [৪]

মধ্যযুগের আর একটি বিশিষ্ট ধারা মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যগুলিতেও নৌকার বর্ণনা এসেছে। নৌ-বাণিজ্য, নৌ-বহর, নৌ-নির্মাণের বিস্তৃত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের সময়কাল, এই সময়ের মঙ্গলকাব্য রচয়িতা বিজয় গুপ্ত (পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল), বিপ্রদাস পিপিলাই (মনসাবিজয়), নারায়ণ দেব (পদ্মপুরাণ), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল), জগজ্জীবন ঘোষাল (মনসামঙ্গল), মুকুন্দ চক্রবর্তী (চণ্ডীমঙ্গল) দের কাব্যে বাণিজ্য যাত্রার একমাত্র পথ নদীপথের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। এই কাব্য গুলিতে দুই ধরণের জলযানের উল্লেখ রয়েছে ডিঙ্গা এবং নৌকা। আবার ‘জঙ্গা’ নামক একপ্রকার নৌকার কথাও রয়েছে। বাণিজ্যযাত্রায় বিভিন্ন রকমভেদের নৌকার ব্যবহার ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছ। যেমন –

“একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা বাওয়াইয়া দিল।
প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।।
যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু।
গাঙ্গের দুই কূল ভাঙ্গিয়া বেঁকা করে উজু।।
তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি।।...” [৫]

মঙ্গলকাব্যগুলিতে নৌকার নিজস্ব নামের সাথে সাথে নৌকা নির্মাণ কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে। জগজ্জীবন ঘোষাল ও মুকুন্দ চক্রবর্তী নৌকা নির্মাণের জন্য যেসকল কাঠের উল্লেখ করেছেন তা যথাক্রমে - শাল, পিয়াল, খেজুর, পিয়ালী, শিমালী, চম্পা, বকুল, কাঁঠাল, নিম, নারকারল, জলপাই, তাল, গামার ইত্যাদি। নৌকা নির্মাণের পর গাবের আঠার ব্যবহার, ধুনো দিয়ে দুই তক্তার মাঝের গর্তকে ভরাট করার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। নৌকা নির্মাণের জন্য এক এক কবি আবার এক এক জনকে নিযুক্ত করেছেন। মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত সপ্তডিঙা বানিয়ে নিয়েছিলেন। সঙ্গে হনুমান কত্তৃক শত সাল, পিয়াল কাঠ জোগাড় করে বিভিন্ন দ্রব্য বহনের একখানি লম্বা ডিঙা বানিয়ে নেন। অন্য আর এক কবি জগজ্জীবন ঘোষাল তাঁর কাব্যে কুন্দাই ছুতোরকে দিয়ে চৌদ্দ ডিঙা নির্মাণ করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী বিশ্বকর্মা ও তাঁর পুত্র দারুব্রক্ষ্ম সঙ্গে হনুমানকে দিয়ে সপ্তডিঙা নির্মাণ করেছেন -

“দেবত্বষ্টা বিশ্বকর্ম তার পুত্র দারুব্রক্ষ্ম
শিরে ধরি চণ্ডিকার পান

চারি প্রহর রাতি জ্বালিআ রত্নের বাতি।
সাত ডিঙা করয়ে নির্মাণ
হনুমান মাহাবীর নখে করে দুই চির
কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল” [৬]

এছাড়া পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ-গীতিকাগুলিতে নৌকার ভিন্ন ভিন্ন রকমভেদের ব্যবহারের উল্লেখ দেখি –

“আমারে ভজহ্ কন্যা রাখহ মোর মন।।
এমন সোনার পানসী্ তাতে মাঝি নাই।।” [৭]

মধ্যযুগের সাহিত্যগুলিতে নৌকার উল্লেখ সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হলেও এই সময়কালের মন্দিরগুলির গায়ের অলংকরণে নৌকার প্রকারভেদের চিত্রাবলী দৃশ্যমান। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণে কখনো নৌকা কিংবা কোথাও জাহাজের অবয়ব ধরা দিয়েছে। বর্তমানেও অনেক মন্দিরের গায়ে এই অলংকরণ এবং নৌকো দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গড়নের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় অলংকরণে কখনো প্রমোদতরণী, বা কখনো গৃহস্থলী, আবার কখনো যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়োজিত নৌকাগুলি সজ্জিত। যে সব শিল্পী পোড়ামাটির কাজ করতেন তাঁরাই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এই কাজ করতেন।

বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের কাল থেকে জলপথে নৌকাযোগে বাণিজ্য, পারাপার, পরিবহন, ভ্রমণ, জলবিহারের উল্লেখ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার গঙ্গা এবং হুগলী নদীর তীরবর্তী শ্রীপুর-বলাগড়ের নৌ-শিল্পের উত্থান সপ্তগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক। সপ্তগ্রামে জাহাজ আসত, মধ্যযুগের বাণিজ্য বন্দর সপ্তগ্রাম এখন অবলুপ্ত এক বন্দর। এই সপ্তগ্রামেই আনুমানিক বলগড়ের মিস্ত্রীরা মেরামতির বিভিন্ন কাজ করত। ফলে বাণিজ্য বন্দর বন্ধ হলেও কারিগরেরা নৌকা তৈরির নিজস্ব ধারা বহমান রাখেন। তবে নৌকা গড়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের চেয়ে পারাপার, বিভিন্ন সামগ্রী পরিবহণ করার কাজে অনেকেই যুক্ত হয় এবং নৌকা নির্মাণের সঙ্গেই বেশী সংখ্যক মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তাই মাছ ধরা প্রধান জীবিকা থেকে উপজীবিকায় পরিণত হয়। নৌকা নির্মাণকেই সকলে জীবিকা নির্বাচন করে জীবনধারণের জন্য। বলাগড় অঞ্চলে যেহেতু বাঁশ ও কাঠের যোগানের পক্ষে উপযোগী অঞ্চল তাই সহজেই এই শিল্পের সঙ্গে অনেকেই নিযুক্ত হয়। নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমনকি মুসলিমরাও ক্রমে নৌকা তৈরির পেশাকে রপ্ত করে নিজেরা নৌ-কারিগর কাজে নিযুক্ত হয়। তবে এই কারিগরি বিদ্যা পরম্পরাগত। সে পরম্পরা বংশ কিংবা গুরু পরম্পরাগত হয়ে চালিত। একজনের অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পূর্ণতা পায়। এভাবে বলাগড়ের নৌ-শিল্প পরম্পরায় চালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এই বলাগড়-শ্রীপুর অঞ্চলের পূর্বকালে নাম ছিল আঁটিশেওড়া গ্রাম। পরবর্তীতে এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী উলা গ্রামের জমিদার রঘুনন্দন মুস্তৌফি হুগলী জেলার রাজা রঘুদেব রায়ের কাছ হতে পঁচাত্তর বিঘা

ভূমি গ্রহণ করে আঁটিশেওড়া গ্রামে বাস করতে শুরু করেন। মহারাজা এই বৈষ্ণবীয় নামটি বদল করে নতুন নাম রাখেন শ্রীপুর। সেই থেকেই শ্রীপুর নামকরণ। হুগলীর শ্রীপুর, বলাগড়, চাঁদরা, তেঁতুলিয়া, সোনাপুর ইত্যাদি স্থানগুলি হুগলী নদীর তীরবর্তী অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলগুলিতে নৌ-বাণিজ্য এবং নৌ-শিল্প আনুমানিক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সময়কাল থেকে বহমান। এমনকি অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকেও লোকজন নৌকা ক্রয় করার জন্য এই অঞ্চলে আসত। রাজা প্রতাপাদিত্যে বজরা নৌকা ক্রয়ের জন্য এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন বলেও প্রচলিত রয়েছে লোকমুখে। কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি রচনার পূর্বে বলাগড়ে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তাঁদের কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন –

> "... এখন মনে পড়ে যাচ্ছে 'মধুকর' লেখার আগে বলাগড়ের নৌ-কারিগরদের বাড়ি কিছুকাল বাস করেছি, তাঁদের কাজের ধারা, রীতি-প্রকৃতি দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরা আমার আত্মীয়। এখানে রক্তের সম্পর্ক কোন ছার।" [৮]

লেখক তাঁর এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই শিল্পে রূপায়ণ করেছেন। বলাগড়ের এই সুপ্রাচীন শিল্পটির ইতিকথা এবং পরের কথাকে জানতে নিকট আত্মীয় স্বরূপ মানুষগুলির সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছেন নিত্য কর্মব্যস্ততার মাঝেও। পাঠকের সামনে কালের গর্ভে বিলীয়মান বিশ্বায়নের কবলে তলিয়ে যেতে বসা এই লোকশিল্পটির কথাকে চিত্র প্রদর্শকের মত সকলের দৃষ্টির সম্মুখে নিয়ে এসেছেন এবং শিল্পের শাশ্বত রূপকে ধরে রাখার জন্য কলম ধরেছেন, যাতে শিল্পটি তার বিশুদ্ধতা নিয়ে মানুষের মুখে অন্ন যোগাতে পারে। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক এই নৌ-কারিগরদের জীবন নানা সমস্যা এবং দূরাবস্থায় পূর্ণ। যাদের একমুঠো অন্ন জোগাড় করতে দেহের ঘাম ঝরিয়ে নৌকো তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তাদের জীবনে দুঃখ-দৈন্য নিত্য সাথি। শিক্ষার আলো এই প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনে পৌঁছতে পারে না, অন্নের সহাবস্থান করতেই যারা ভয়ংকরভাবে জর্জড়িত, তাদের কাছে শিক্ষা দূর জগতের অধিবাসী। তাই সকলের কাছে কেবল প্রাণ নিয়ে টিকে থাকাই একমাত্র লড়াই হয়ে ওঠে। অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ তাদের কাছে যেন উপহাস স্বরূপ।

উপন্যাসটির কেন্দ্রিয় চরিত্র মধুকর বারিক, যিনি বংশ পরম্পরায় একজন নৌ-কারিগর। দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলায় পিতার সঙ্গে নৌ-কারিগরি বিদ্যাকে রপ্ত করেছিলেন। তাই দেশভাগের ফলে এপারে এসেও বলাগড়েই আশ্রয় নেন নিজ বাপ-ঠাকুরদাদার জীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে। মধুকরের দুই পুত্র চন্দ্রপাল ও ফকিরচাঁদ, এক মেয়ে বাসন্তী। বড় ছেলে চন্দ্রপাল পিতা মধুকরের জীবিকাকে নয়, অন্য পেশাকে বেঁচে নিয়েছে এবং পরিবারকে নিয়ে ভিন্ন সংসারে আলাদা হাড়িঁতে বাস করে। ছোটছেলে ফকিরচাঁদ পাশ্ববর্তী নৌ-কারখানায় সোনাপুরে মহাজনের নৌকা তৈরির কাজে

সোনাপুরেই বাস করে এবং বিয়ে করে বউ পলাশীকে পিতা মধুকরের কাছে রেখে গিয়েছে। মধুকর তাঁর একমাত্র কন্যা বাসন্তীর পুত্র বাদলকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সামান্য পুঁজিতে কোনমতে নিজ কারিগরি পেশাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে সাধ্যমত। মধুকর তার নিজ পুঁজিতে নিজেই মালিক নিজেই শ্রমিক। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মধুকরের মনে হয় জীবন যেন অপার নদী –

> "মধুকর বারিক গোপনে বুঝতে পারে এ জীবন তো আসলে বেয়ে যাওয়া। বয়ে যাওয়া সংসার সমুদ্র পথে। সেই বেয়ে যেতে যেতে আজ এতো পথ পার হয়ে এসে মনে হল, সংসার যেমন সমুদ্র তেমনি যে বয়ে যায় সেই জীবনখানিও জলধি। অপার নদী। ... মধুকর আরো বুঝতে পারে এই দেহ এক নৌকাবিশেষ। এই সংসারের প্রতিটি মানুষই এক এক পদের নৌকা। কেউ জেলে ডিঙা, খিলে নৌকা, ছোট্ নৌকা, বাছড়ি, আবার কেউ বা পেটমোটা ভোঁড় নৌকা কিংবা হাল আমলের মেশিন বসানো বোট, লঞ্চ। সবেক দিনের ময়ূরপঙ্খী কিংবা বাহারি বজরার দিন কি আর আছে।" [৯]

মধুকরের একা জীবনে দ্বন্দ্বদীর্ণ পথের মাঝে অনেক স্মৃতি পর পর ভেসে ওঠে ছবির মত। স্ত্রী কমলার অকাল মৃত্যু তাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। একা সংসারে তার জীবনের সেকালের এবং একালের মানুষজনের যে শিক্ষা, রুচিবোধ, মানসিকতা তা প্রতিমুহূর্তে তার মর্মে আঘাত করে। মধুকরের ছোট্ট মহাজনি কারবারে এক শীতের সকালে কলকাতার শহুরে সভ্যতার সন্দীপ এবং অজয় নামে দুজন খরিদ্দার এসে হাজির হয় নৌকা তৈরির বায়না নিয়ে, যে নৌকায় তারা দেশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বে দুই বন্ধুতে মিলে। তাদের শহুরে মানসিকতার সঙ্গে মধুকরের পরিবার নিজেদের ধুলায় তুল্য জীব মনে করে। তাদের কথা, চালচলন, খাদ্যাভ্যাস সবই যেন ভিন্ন জগতের আধিবাসী স্বরূপ। কলকাতার বাবুদের নৌকা তৈরির কাজের তোড়জোড়ের মধ্যেই উপন্যাসের আখ্যান এগিয়েছে এবং নৌকাটি নির্মাণ সম্পূর্ণ করে অজয়-সন্দীপদের হাতে নৌকা তুলে দিয়ে তা নদীতে যাত্রার মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। আখ্যানে নৌ-শিল্পীদের দৈনন্দিন রোজনামচার কথা বিনি সুতোয় গাঁথা মালার মত নিখুঁত করে সাজিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নৌকা পত্তনের উপযুক্ত দিনক্ষণ দেখার জন্য মধুকর বারিক পণ্ডিতবাড়ি ছুটে যান। কারিগরা যে নিজস্ব লোকাচার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে তার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগর ওঝার গণনা না শুনে সপ্তডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়ায় মাঝপথে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। এই বিশ্বাসে নৌ-শিল্পীরা তাদের পাঁজি, পুঁথি নিয়ে পণ্ডিতের কাছে দিনক্ষণ দেখে তবে শুভকর্মে হাত দেন। প্রকৃতির সঙ্গে যেন এক আত্মার যোগ এসকল

গ্রামের প্রান্তিক কারিগরদের কেননা প্রকৃতিই তাদের মাতৃ স্বরূপ, প্রকৃতির কোলেই তাদের কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। নদীর সন্তান তারা যেন, তাই মধুকরের উক্তি –

> "এতো পথ ভাঙবেন বাবু। রাতের বেলা তো ওই চাঁদ তারাই ভরসা। তেনারা আলো না দিলে পথ চিনবেন কিসে?" [১০]

মাঝিমল্লারা যে চাঁদ তারার উপর বিশ্বাসেই বেঁচে রয়েছে, তাই সূর্যকে তাদের খাতির করে চলতে হয়। এমনকি নৌ-শিল্পীদের বাড়ির মেয়ে বউরাও তাদের হাতের কাজের শিল্পনিপুণতায় নিজেদের কর্ম, ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলে। মধুকরের ছোট পুত্রবধূ পলাশী তার নিজহস্তে তৈরি চটের ব্যাগে পোড়ো শিবমন্দিরের গায়ে দেখা সাবেক একখানি বজরার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যেটি নদীর ঢেউ ভেঙে চলেছে বিদেশি সাহেব মেমদেরকে নিয়ে দূরপাল্লার দেশে। দেশভাগের ফলে নৌ-শিল্পীরা যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তার কথা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতাপাদিত্যের দেখানো পথ ধরে অনেকেই আসত শ্রীপুরে নৌকা ক্রয় করতে। দেশভাগের পরে শ্রীপুর-বলাগড়ের কারিগরদের মাথায় যেন বাজ পড়ে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পরেও গোপনে অনেক নৌকা সীমানা পার হয়ে এপারে এসেছে। পুরনো খরিদ্দাররা যে সাবেক দোকানিদেরকে ভুলতে পারেনি তার প্রমাণ এখানে লক্ষণীয়। তাই মধুকরও একসময় দেশভাগের পূর্বে নৌকা খরিদ করেতে পিতার সঙ্গে বলাগড়ে আসত প্রতাপাদিত্যের দেখানো পথ ধরে। প্রতাপাদিত্যের ছিল নৌকার সখ। তিনি নিজে অনেক প্রকারের নৌকা নিজের সংগ্রহে রাখতেন। এমনকি বাংলাদেশের যশোহরে পরে নিজেই নৌ-কারখানা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। আখ্যানে দেখি অবিভক্ত বাংলার তিরিশ বছর পূর্বের মধুকরের বিশ্বস্ত বন্ধু খুলনার একরাম মিঞা দেশভাগের পরেও মধুকরের কাছে এক ঝড় বাদলের বর্ষার রাতে জলে পরিপূর্ণ কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নৌকা খরিদ করতে আসে এপার বাংলায়। যার বিনিময় মূল্য স্বরূপ মধুকরকে একটা কাঁসার গ্লাস উপহার দেয়। দুই দেশের মাটির ভাগ হলেও মানুষের মনের বন্ধন যে অটুট ছিল তার প্রমাণ এই দৃশ্যে পাই –"... এ হল সামান্য বস্তু। সালামী বা ভেট নয়। মনে রাখবার, মনে পড়বার তুচ্ছ একটি গিঁঠ।"[১১] এরপর একালের রাজনীতির অনেক দৃশ্য প্রতিম্বিত করেছেন লেখক। এক শ্রেণীর সুবিধভোগী মনভাবাপন্ন মানুষের কবলে কীভাবে সহজ সরল কারিগররা প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত দেখি। একালের সাধন পরামাণিকদের মত বড় বড় নৌ-কারখানার মহাজনদের সামনে মধুকরের মত স্বল্প পুঁজির মানুষদের কি বিপদে পড়তে হয় তা ভাবনার বিষয়। মধুকর কলকাতার বাবুদের নতুন নৌকার বায়না করেছে সেই খবর শোনা মাত্রই কারখানার নেতা বিশ্বনাথ পাড়ুই তার কাছে কাজের ভাগ চাইতে আসে। অন্যদিকে রেণুপদ বাছাড় নিজে এন ভি এফ পুলিশের চাকরি করেও আই আর ডি পি -র সরকারি লোন পেয়ে নৌ-কারিগর হয়ে যায় রাতারাতি। এরকম অনেক প্রসঙ্গের উপস্থাপন রয়েছে উপন্যাসটিতে। যেখানে সমকালীন রাজনীতির সুবিধাভোগী মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, পাশাপাশি বিশ্বায়নের

ফলে এবং স্বল্প পুঁজির কারণে বাণিজ্যিক কারখানাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে নারাজ প্রকৃত পরম্পরাগত নৌ-শিল্পীরা। শিল্পীদের নিজ ঘরেও যেমন তাদের জীবিকা নিজ উত্তরসূরির কাছে উপযোগী নয় বলে গণ্য তেমনি তারা বাইরের বাণিজ্যিক বাজারেও নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম। কেননা তাদের পুঁজি স্বল্প, একালের উন্নত প্রযুক্তি তাদের নাগালের বাইরে, পুঁথিজ্ঞান হীন জীবনে তারা উন্নত শিক্ষাকে আয়ত্ত করতে পারেনি। ফলে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুটির শিল্পগুলি যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে আলোচ্য নৌ-শিল্পটিও একটি। শিল্পীদের জীবনের এই করুণ বিষাদভরা জীবনালেখ্য সেকাল একালের দৃষ্টিতে কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিনি সুতোয় গাঁথা শিউলি ফুলের মালার মত গেঁথেছেন। তাদের জীবনের পরম্পরাগত সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্য যে দিনের শেষে বৈকালিক সুরের মতই সকলের মনকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে তাকে বাণীরূপ দিয়েছেন। সেকালের সপ্তগ্রাম তথা বলাগড়, শ্রীপুর কিংবা বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর, নোয়াখালীর নৌ-শিল্পীরা যে আজ তাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে দিশাহীন হয়ে পড়ছে। তাদের অতীতের সুদিনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে একালের অজগর রূপি বিশাল হা করা পুঁজিবাদীদের দাপটের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হতে হয় তা সত্যিই মর্মস্পর্শী। কিন্তু শিল্পের অবক্ষয় যে আর এক শিল্পীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না তাকে দর্পণে লিপিবদ্ধ হতে হয় তার সৃষ্টি বিধাতার হাতে তা হয়েছে 'মধুকর' উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নিপুণ হস্তকমলে।

তথ্যসূত্র (References):

১) মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, উপন্যাস অমনিবাস, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃ. ১৪৩।

২) সেন, সুকুমার, চর্যাগীতি-পদাবলী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, সপ্তম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০১৪। পৃ. ৬০।

৩) তদেব। পৃ. ৭১।

৪) রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন, (সম্পা.) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চণ্ডিদাস বিরচিত পৃ., একাদশ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৬। পৃ. ৫৫।

৫) বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত কালী কিশোর (সম্পা.), পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত, পুনঃমুদ্রিত, জানুয়ারী, ২০১৭, বেনীমাধব শীল লাইব্রেরী, ১৬৭, ওল্ড চীনবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০১। পৃ. ১২৩।

৬) সেন, শ্রীসুকুমার, চণ্ডীমঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৬২, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নয়াদিল্লী-১, ব্লক ৫বি রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯। পৃ. ২২৩।

৭) সেন, দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ-গীতিকা (পূর্ববঙ্গ গীতিকা), পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯। পৃ. ৫০।

৮) মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, উপন্যাস অমনিবাস, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃ. লেখকের নিবেদন অংশ।

৯) মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, উপন্যাস অমনিবাস, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃ. ১৪৩।

১০) তদেব। পৃ. ১৬০।

১১) তদেব। পৃ. ১৮৪।

কামনাতাড়িত প্রবৃত্তির উন্মাদনা ও ব্যক্তিজীবনের অসহায়তা : 'বৃষ্টিতে দাবানল' এবং 'তৃষ্ণা' তুলনামূলক পাঠের আলোকে

মিন্টু নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
খড়গপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : মানুষ প্রবৃত্তির দাস। মানুষের মধ্যেকার জৈবিক প্রবৃত্তি কখনো তার চরিত্রকে মহনীয় করে, প্রেমিক করে তোলে, আবার কখনো করে তোলে নৃশংস হত্যাকারী। কামনাতাড়িত প্রবৃত্তির বশীভূত মানুষ ভুলে যায় শ্লীলতা-অশ্লীলতা বোধ। অদ্‌স (ID)-এর চোরা স্রোত তার প্রবৃত্তিকে ভোগলিপ্সার চরম সুখ নিতে হিংস্র করে তোলে। 'বৃষ্টিতে দাবানল' গল্পের আপাত সরল, লাজুক, অন্তর্মুখী চরিত্রের নিঃসঙ্গ নারাং- এর ব্যক্তিসত্ত্বা নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে কামনাতাড়িত প্রবৃত্তির কাছে। 'তৃষ্ণা' গল্পের বাশেদওএক আপাদমস্তক নিঃসঙ্গ, কামনাতুর মানুষ। লোভ তার জীবনে নিয়তির অমোঘ পরিণাম রূপে নেমে এসেছে। মনুষ্যত্বের আলোর গভীরে লুকিয়ে থাকা অসহায় মানুষদের প্রবৃত্তিজাত অন্ধকারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ : জৈবিক কামনা, ব্যক্তিজীবনের অসহায়তা, মূল্যবোধের সংকট, আত্মদংশন, নিঃসঙ্গতা

আলোচনার শুরুতেই কয়েকটি কৈফিয়ৎ সেরে নেওয়া যাক। শিরোনামে উদ্ধৃত 'বৃষ্টিতে দাবানল' এবং 'তৃষ্ণা' যথাক্রমে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও হাসান আজিজুল হকের দুটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। গল্পদুটি নির্বাচনের মূলে অবশ্যই তাদের আখ্যানগত সাম্যতা, সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনায় আসছি। এই দুই লেখককে নির্বাচনের মূলেও রয়েছে সচেতন প্রয়াস। কারণ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও হাসান আজিজুল হকের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যের ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছে প্রায় একইরকম ভৌগোলিক পরিবেশে। মুর্শিদাবাদের খোসবাসপুর অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ে সিরাজের জন্ম ও বড়ো হয়ে ওঠা। আর হাসান আজিজুল হক দেশত্যাগের আগে জীবনের ষোলোটি বছর কাটিয়েছেন বর্ধমানের যবগ্রাম অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ে। এই দুই অঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে রয়েছে গভীর সাদৃশ্য। রাঢ়ের প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির অপার রহস্যের মাঝে বাস করা প্রান্তিক মানুষদের প্রতিদিনের লড়াই করতে করতে বেঁচে থাকা, শোষণ-বঞ্চনা, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক আবেদন দুই কথাসাহিত্যিকের আখ্যানবিশ্বকে একই সমভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। যদিও দেশভাগ

হাসান আজিজুলের জীবনে এনেছিল আমূল পরিবর্তন, তবুও শৈশব ও কৈশোরের আজন্ম দেখা রাঢ় তাঁর কলম থেকে হারিয়ে যায়নি। তাঁর নিজের কথায়— 'রাঢ় থেকে যা পাই দক্ষিণবাংলার নাবি অঞ্চলে এসে তা হারাই না।... রাঢ়কে নতুন করে পেতে শুরু করি আর একইসঙ্গে আমার গল্পের জায়গা- জমি বাড়তে থাকে।'[১] রাঢ়বঙ্গের অভিজ্ঞতা দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে হাসানের লেখায়। বিশেষত তাঁর প্রথমদিককার লেখা 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪), 'আত্মজা একটি করবী গাছ' (১৯৬৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পে উঠে এসেছে রাঢ়ের জীবন ও প্রকৃতির অফুরান রহস্য। কেমন ছিল সে রাঢ়? 'গল্পের জায়গা জমি, মানুষ' নামের ব্যক্তিগত গদ্যে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন লেখক নিজেই—

> *আমার কাছে রাঢ় কখনো শীতরাত্রির হিমকালো আকাশ। বিশাল প্রান্তরের উপরে যেন বিশালতার ঢাকনা। তার ঝকঝকে তারা, তারাদের অস্পষ্ট চাপা আলো।... রাঢ় হচ্ছে ধান কেটে নিয়ে যাবার পর জমির নাড়া, চৈত্র মাসের শুকনো এলোমেলো বাতাস, শাদা ধুলো। এইভাবে এখন আমি রাঢ় গড়ে তুলি— কামারশালে গনগনে আগুন জ্বলে, মাঠের পানি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মানুষের মাথা ফাটে, জ্বরের ঘোরে কোঁকাতে কোঁকাতে মানুষ ইয়ার্কি করে, জমিতে কাজ করে মোষের আর মানুষের জিভ বেরিয়ে যায়, মানুষ রক্তমুখী হয়ে ওঠে, ভয়ানক বিষ ওগরায়, হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষে... সাময়িকভাবে মানুষ হারিয়ে যায়। আবার গলায় গলায় মানুষ ফিরে আসে— হুঁকো থেকে কলকেটি খুলে নিয়ে মানুষকে দেয়। এই রাঢ়। কাদায় গোটা মোষ ডুবে থাকে শুধু শিরদাঁড়াটি মাত্র কালো চাবুকের মতো বেরিয়ে থাকে, উলঙ্গ মানুষ কাদা মেখে ডোবায় মাছ খোঁজে, জমিতে শস্য কুড়োয়, মেয়েরা ঘর নিকোয়, সন্ধেবেলায় তার পুরুষমানুষকে গুড় মুড়ি পেঁয়াজ খেতে দেয়, কঠিন শক্ত হাতে চাষী তার বুকে টেনে পেষে।*[২]

প্রায় একই ধরনের অভিজ্ঞতা, বা তার থেকে আরও দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে সিরাজ খুঁজে পেয়েছেন মুর্শিদাবাদের রাঢ়ের গ্রামাঞ্চলে। দ্বারকা নদী তীরবর্তী হিজলের অপার্থিব নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং সেখানে বাস করা দুর্ধর্ষ হিংস্র মানুষ— কখনো তারা প্রবৃত্তিতাড়িত কামনার কাছে বাঁধা পড়ে আবার কখনো মাটি আর ফসলের অধিকার নিয়ে মেতে ওঠে রক্তাক্ত হত্যার নেশায়। প্রকৃতিসঞ্জাত স্বাধীনতার আবেগে ভরপুর রাঢ়ের সেই মানুষেরা সিরাজের কথাসাহিত্যের মূল উপকরণ। 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি' নামক আত্মজৈবনিক রচনায় প্রায় একই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন সিরাজও—

> *এলাকার মানুষের মধ্যে যে আদিম স্বাধীনতাবোধের আবেগ ছিল, তা ইচ্ছা করেই মন ভরে পেতে নিয়েছিলাম। প্রকৃতিসঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদ মানুষকে প্রেমিক করে, দার্শনিক করে আর যোদ্ধাবেশধারী*

> *হত্যাকারীও করে। মানুষ তখন রাষ্ট্র ও অন্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করে।...প্রকৃতির সন্তান বলে তার কাছে শ্লীলতা, অশ্লীলতা নেই। শুধু আছে জীবন-মুক্ত উদ্দাম জীবন। এই জীবনকে আমি দেখেছি। ভালোবেসেছি। তাদের কথাই লিখতে চেয়েছি। সভ্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও আরোপ করে দেখতে চেয়েছি কেমন মানায়। তাই আমার সব উপন্যাসে এত স্বাধীনতা, হত্যাকাণ্ড ও মৃত্যু, অকপট কামনার ঝাঁঝালো প্রয়োগ।* [৩]

সিরাজের ও হাসানের অভিজ্ঞতার জায়গা-জমি-মানুষের এই আপাত সাদৃশ্যের কারণেই 'বৃষ্টিতে দাবানল' এবং 'তৃষ্ণা' গল্পদুটিকে আমরা তুলনামূলক পাঠের আলোকে বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করেছি।

প্রথমেই আসি হাসানের 'তৃষ্ণা' গল্পের প্রসঙ্গে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাশেদ। 'বোশেখ মাস থেকে ছোঁড়াটা লম্বা হতে শুরু করেছে। তারপর সেই বছরেই যখন মাঘ মাস তখন তার দিকে আর চাওয়া যায় না।'[৪] দেখতে দেখতে সাত ফুট ছাড়িয়ে যায় বাশেদ। তার চোখ-মুখ থেকে যৌবনের লাবণ্য ঝরে গিয়ে জন্ম নেয় এক বিশ্রী কঠিন আর নির্বোধ মুখ। বেঢপ লম্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাশেদ ক্রমশ একা হতে থাকে। সেই একাকিত্বের যন্ত্রণা ভুলতে দু-হাতে নিজের জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে, প্রতিমুহূর্তে বাঁচতে চায়; আর সেইসঙ্গে প্রত্যাশা করে খাবার— 'পোত্যেকদিন সকালে উঠেই মনে হয়, শালা বেঁচে তো আছি খাবার লেগে!'[৫] মরে হেজে বাঁচা নয়, বাঁচার মতন বাঁচা। রাতের অন্ধকারে তাই মাঠ থেকে ধান চুরি করে এনে উঠোনে গাদা দেয়, খাল-বিলের কাদা ঘেঁটে ধরে আনে মাছ, পাখির বাচ্চা জবাই করে, এটা ওটা চুরি করে এনে বাঁচার স্বপ্নটাকে সার্থকতা দেয়। ধান চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে সাদাম মণ্ডল যখন সর্বশক্তি দিয়ে তার টুঁটি টিপে ধরে তখন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অব্যক্ত গুমরানো কণ্ঠে শপথ করে— 'আর করব না চাচা, আর কোনওদিন এ্যামোন করব না।'[৬] তারপর পরম মমতায় লিকলিকে দুটো হাতে গলায় হাত বুলোয়। একসময় প্রার্থনার মতো করে কঁকিয়ে ওঠে—

> *খোদা আমি আর নোম্বা হব না, আমরা গায়ে খুব বল দাও। আমি যেন আর লড়তে পারছি না। হাঁটতে গেলে আমার ঠ্যাং জড়িয়ে যেছে। আমি আর চুরি করব না, মাছ ধরব, নাংগল দোব আর খাব। খালি খাব।'* [৭]

—গল্প যত এগোয় তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাশেদের খিদের স্বরূপ। শীতের নিশুতি রাতে কবরের মতো মাটির ছোটো ছোটো ঘরগুলোয় ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে কামনাতপ্ত নারী-পুরুষ। লম্বা ঢ্যাঙা হলেও বাশেদও একজন পরিপূর্ণ পুরুষ। কামনার চোরা স্রোতে কনকনে ঠাণ্ডার রাতে, হঠাৎ চিন্তার আক্রমণে তার শরীরে জেগে ওঠে প্রবৃত্তির আদিম খিদে। মেয়েমানুষের সঙ্গে শোয়ার মরিয়া লোভে

সেই খিদের পৃথিবীতে বাশেদ তাই লুঙ্গির খুঁটে চার আনা পয়সা বেঁধে মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

গাঁয়ের ছেলেদের গোষ্ঠীভোজনের 'ওরোস' উৎসবে আজন্ম খেতে ভালোবাসা বাশেদ সঙ্গী হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে তারা নেয়নি। ছাগলের কাঁচা মাংস তালপাতার উজ্জ্বল আগুনে যখন রং নিতে শুরু করেছে, বাশেদ আর স্থির থাকতে পারেনি। পঙ্‌ক্তিভোজনে বসে 'দাও দিকিনি এট্টুন' বলে খেয়েই চলে। গলায় ভাত আটকে মনে হয় চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবে। বাশেদ তবুও খেয়েই চলে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ফিরে গেলে চেষ্টা করেও সে উঠতে পারে না। হাত-পা ছড়িয়ে স্থির হয়ে শুয়ে ভাবে— 'আজ রেতেই কি মরব এই আঁদারের মদ্যি?'[৮] জীবনপ্রেমিক বাশেদকে যখন ক্রমশ মৃত্যুভয় ঘিরে ধরেছে, তখন সে শোনে ঝোপের আড়ালে মোড়লের বখাটে ছেলে তিন আনার বিনিময়ে সখির যৌবন ভোগ করার পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। বাশেদের লুঙ্গির খুঁটেও বাঁধা আছে সখির যৌবন কেনার মতো পর্যাপ্ত পয়সা— প্রবৃত্তির দুর্মর তাড়নায় তার মধ্যে তাই জেগে উঠেছে দুর্দান্ত জৈবিক তৃষ্ণা—

> *ই আল্লা পায়ে পড়ি তোমার, আমি কবরে যাব না, মরব না। আমি ওই ঝোপটার কাছে যাব, সিকিটো ছুঁড়ে দোব সখির আঁচলে, এই লে, আমি বাচেদ— আমি—*[৯]

এতক্ষণ যে শরীরটাকে টেনে তোলার ক্ষমতা ছিল না, একটা অন্ধ শক্তির আবেগে একবুক তৃষ্ণা নিয়ে বাশেদ এবার পৌঁছে যেতে চায় সখির কাছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিয়তির কাছে হেরে যায়— 'ওরা বাশেদকে সকালে পেল।' ঠিক ঢালুটার নীচে জমির কিনারায় 'উলঙ্গ, বিবর্ণ, নোংরা মৃতদেহটি' পড়ে রয়েছে। পেটের খিদে মিটলেও মনের খিদে তার মেটেনি। সমস্ত শরীরে সেই তৃষ্ণার লক্ষণ নিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে বাশেদের মৃতদেহটি 'দুর্গন্ধে ভরপুর' হয়ে উঠেছে।

বাশেদের বুকজোড়া তৃষ্ণার সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় সিরাজের 'বৃষ্টিতে দাবানল' গল্পের নারাং বাউরির মধ্যেও। বাউরি পাড়ার ক্ষেতমজুর নারাং রাঢ়ের দু-একদিনের টিপটিপে বৃষ্টির 'গাজোলে'[১০]র আবহাওয়াতে প্রথম দিনে কাজ হারিয়ে বেকার এবং দ্বিতীয় দিন হল ক্ষুধার্ত। 'গাজোল' বেড়ে 'ডাওর' আর ডাওর বেড়ে 'ফাঁপি' অর্থাৎ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নারাং-এর চিন্তা ছিল না। পুকুর ভাসাভাসিতে মাছ ধরে, লোকের গোরু-ছাগলের জন্যে ডালপালা কেটে পেটের ভাতটুকু অন্তত জোগাড় করে নিতে পারত। কিন্তু গাজোলের টিপটিপানি বৃষ্টির তৃতীয় দিনে তার সমস্ত হিসেব-নিকেশ ওলটপালট হয়ে যায়। পেটের খিদে আর মনের খিদে একসঙ্গে মিশে দিশেহারা, নিঃসঙ্গ নারাং 'বাঁজাডাঙার বজ্রাহত ঢ্যাঙা তালগাছের মতো' কামনার দাউদাউ আগুনে জ্বলতে থাকে। যাদের বাড়িতে বউ আছে তারা বউয়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে গাজোলের ঝিমধরা আলস্যে খুঁজে চলেছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত মাদকতা, নারাং-এর সে সুযোগটুকুও নেই। দু-দুখানা বউ ছিল তার। 'প্রথমবার বউটার খাওয়া দেখে দুঃখিত হয়ে' নানান অছিলায়

নারাং তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর দ্বিতীয় বউটা খেত কম, 'কিন্তু চাউনিটা ও শরীলটা ছিল ভীষণ পিচ্ছিল।' পিছলে যাব যাব করতে করতেই পালিয়ে গিয়েছিল বনকাপাসির সিগন্যালম্যান গোবরার সঙ্গে। নিঃসঙ্গ নারাং পেটের খিদের টানে গাজোলের আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে পা বাড়িয়েছিল গ্রামের পথে। সেখানেই তার সামনাসামনি পড়ে যায় শংকরার যুবতী বউ—

> *বউটার দলদলে গতর। পাছা টলছে, ঠোঁটে কী হাসি এবং সামনাসামনি ঘাটে নেমেই সাঁতার দিতে থাকল।... কতক্ষণ পরে সেই বউটি ভিজে কাপড়ের মারাত্মক শব্দ করতে করতে নারাংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ঘুরে কেন ফিক করে হেসে যায়।* [১১]

আর ওমনি নারাং-এর মাথায় কামনার বজ্রপাত ঘটল। প্রকৃতির মধ্যে মিশে থাকা আদিম প্রবৃত্তির জৈব টানে জ্বলতে জ্বলতে বুনো মহিষের মতো খ্যাপা-খ্যাপ্তো নারাং, মাদার গাছ ঘেরা আঁতুড়ের নোংরা ফেলার নির্জন 'ধুলোগড়ি'তে সল্লা দাইয়ের হাত ধরে। বিগত যৌবনা সল্লা শরীর সম্পর্কে কোনোকালেই কৃপণ নয়। যতীন মাস্টার থেকে মধু দারোগা এমনকি খোঁড়া ভিখারি ফৈজুও তার পড়ন্ত যৌবনের স্বাদ পেয়েছে। সেই সল্লা তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলে—

> *ওরে ডাকা! আমার কী হবে রে! তোরও পেটে পেটে এই ছিল রে!... ছাড় নারাং খেপিস না। আপোসের সুরে বলে— আরেকদিন হবে, আরেকদিন।* [১২]

পেটের খিদের সঙ্গে মনের খিদে মেশা নারাং-এর কামার্ত শরীরে তখন হিজলের খ্যাপাখ্যাপ্তো কালো মহিষ শিং নেড়ে গর্জন করছে। নিরুপায় নারাং এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ায় সল্লার বাড়িতে। সল্লার হাবা-গোবা সন্তানতুল্য মেয়েকে জোর করে ভোগ করে, শরীরের খিদে মেটায়। শরীরের খিদে মেটার পর নারাং 'ধূর্ত শেয়ালের মতো' জঙ্গলের মধ্যে বেলতলার বেদীতে রেখে যাওয়া রায়বাড়ির সিংহবাহিনী মায়ের প্রসাদ গোগ্রাসে গিলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। দু-দুটো ক্ষিদে মেটার পর নারাং কৃতকর্মের অপরাধে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তাই সল্লা যখন তার মেয়ের সর্বনাশকারীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়ার অভিশাপ দেয়, তখন—

> *নারাং মাথা দোলায়। পড়েছিল সল্লা, বজ্জঘাত হয়েছিল। আর শরীল...। শরীল বড় গণ্ডার। ই শরীল কিছু বাছে না সল্লা, বিষম উপদ্রু! বড় জ্বালা রে!...* [১৩]

দুটো খিদে, বলা যেতে পারে দুটো ভয়ঙ্কর 'তৃষ্ণা' মেটার পর প্রকৃতিস্থ নারাং-এর শরীরে ফিরে আসতে থাকে তার আজন্ম চেনা সহজ-সরল লাজুক অন্তর্মুখী সত্তা। তাই থানার দারোগার কাছে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে হাজতের ফাঁকা ঘরে উপুড় হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নারাং বিড়বিড় করে— 'শরীল বিষম গণ্ডার! হায় শরীল!' গাজোলের টুপটাপ বৃষ্টিফোঁটার সঙ্গে তার হৃদয়েও অবিরাম ঝরে চলে অনুশোচনার

শব্দহীন বৃষ্টিধারা— এ এক আশ্চর্য confession। সিরাজ আসলে দেখাতে চান প্রকৃতির হাতের ক্রীড়ানক মানুষ। তাই প্রকৃতির ভিতর তারা খুঁজে ফেরে পাপ-পুণ্য, শ্লীলতা-অশ্লীলতা। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির কাছে অসহায় মানুষদের বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন—

> *ওটা ('বৃষ্টিতে দাবানল') নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় সমালোচনা লেখা হয়েছিল, 'পড়তে পড়তে গা ঘিনঘিন করে।' বুঝলাম আমার উদ্দেশ্য সফল। বৃষ্টির দিনে গ্রামের প্রকৃতি এমন আচ্ছন্ন হয়— কিছু করবার থাকে না মানুষের। ধীরে ধীরে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া। সেই অবস্থায় জনমজুর খেটে খাওয়া একটা মানুষ, তার স্ত্রী নেই, গৃহ নেই, কিছুই নেই। যেখানে যাচ্ছে দেখছে লোকেরা বউ নিয়ে আনন্দ করছে। আর এসব দেখে তার মধ্যে জেগে উঠেছে আদি রিপু। এ অভিজ্ঞতা আমার এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে,... দেখেছি গোটা গ্রাম যেন একটা আদিম অন্ধ-কামনার মধ্যে বুঁদ হয়ে যায়, এই অনুভূতি পর্যবেক্ষণ না করলে বোঝা যায় না।...*[১৪]

—প্রায় একই রকমের অনুভূতি এবং পর্যবেক্ষণ দিয়ে হাসান আজিজুল হক 'তৃষ্ণা' গল্পের বাশেদকে গড়ে তুলেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তাই তাঁকে বলতে শুনি—

> *মানবেতর জীবনের ছবিটা 'তৃষ্ণা' গল্পে এসেছে। ওর খিদেটা একটা প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এখানে। এদেশের নিরন্ন শ্রমজীবী মানুষের প্রকাণ্ড খিদেটা যেন আমি ঐ গল্পে ব্যবহার করেছি ঐ ছেলেটার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে যে কিছুটা যৌন ব্যাপার এসেছে সেটা আমি মনে করি জীবনের একটা শর্ত হিসেবেই এসেছে। কারণ ওগুলো তো জীবনের মৌল চাহিদা। বাদ দিলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমি সবসময় চেষ্টা করি জীবনকে যতদূর পারা যায় তার totality-তে ধরবার।* [১৫]

কল্লোলীয় লেখকরা রক্ত-মাংসের মানুষের মনোজগত উন্মোচনের যে খোঁজ শুরু করেছিলেন, তারাশঙ্কর, মানিক পেরিয়ে তাদের উত্তরসূরীদের হাতে তা যেন আরও চরম বাস্তবতার মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। আসলে প্রতিটি মানুষের প্রবৃত্তির গভীরে লুকিয়ে থাকে এক অচেনা সত্তা। সময়, পরিবেশ, পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হয়। বাশেদ এবং নারাং সেই লড়াইয়ে ব্যর্থ, হেরো দু-জন মানুষ। দুটি গল্পকেই একটিমাত্র শব্দবন্ধে বাঁধা যায়— 'খিদে'। এই খিদে যেমন পেটের, তেমনি মনের। একদিকে দুর্মর প্রবৃত্তির তাড়না, অন্যদিকে সহায়সম্বলহীন প্রান্তিক মানুষদের দু-বেলা, দু-মুঠো খেয়ে পরে বাঁচার বাসনা— এই দুই পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে গল্প দুটিতে। আদিম যৌন ক্ষুধার দাবানল বাশেদ এবং নারাংকে যেন সারা গল্প জুড়ে তাড়িয়ে নিয়ে

বেড়িয়েছে। সরলার মেয়েকে ধর্ষণ করে নারাং যেখানে বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়েছে, বাশেদের আকস্মিক মৃত্যু তার কামনার তৃষ্ণা নিরসনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি গল্পই আমাদের বোধের জগতকে একেবারে ভেঙেচুরে দেয়। রাঢ়ের ঢ্যাঙা তালগাছের মতো বাশেদ যত লম্বা হতে থাকে তত তার মধ্যে একাকীত্বের যন্ত্রণাও বাড়তে থাকে আর সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে ভোগলিপ্সা। তাই লুঙ্গির খুঁটে সযত্নে জমানো পয়সা নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। নিয়তির অমোঘ পরিণামে বাশেদ সে সুযোগ পায়নি কিন্তু বজ্রাহত তালগাছের মতো কামনাহত নারাং সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন। নিয়তির অমোঘ পরিণাম নেমে এসেছে দুটি চরিত্রের উপরেই। প্রবৃত্তিগত তাড়নার সঙ্গে নিঃসঙ্গতা বাশেদ ও নারাংকে যেন একই সমভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। নারাং-এর প্রবৃত্তিতাড়িত তৃষ্ণাকে সিরাজ প্রকৃতির নির্মমতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতির কাছে, প্রবৃত্তির কাছে অসহায় মানুষের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। সিরাজের সঙ্গে হাসানের পার্থক্য এই যে, নারাং-এর মতো বাশেদকে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হয় নি। বাশেদ তাই বুকজোড়া তৃষ্ণা নিয়ে গোরে ঘুমোতে গেছে, আর নারাং কৃতকর্মের যন্ত্রণা নিয়ে মরতে মরতে বাঁচার শপথ নিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. সুশীল সাহা, *গ্রন্থপ্রসঙ্গে,* দ্র. সুশীল সাহা (সংক. ও গ্রন্থনা), 'পঞ্চাশটি গল্প : হাসান আজিজুল হক', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৭, পৃ. [২]

২. উদ্ধৃত : বরেন্দু মণ্ডল, *রাঢ়ের গল্প, গল্পের রাঢ় : সিরাজ ও হাসান,* দ্র. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা), 'সমকালের জিয়নকাঠি', দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জুলাই-ডিসেম্বর যুগ্ম সংখ্যা ২০১৩, পৃ. ৪২০-৪২১

৩. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি,* দ্র. গৌরীশংকর সরকার (সম্পা), 'ঐক্য', মেদিনীপুর, ১৯ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৩২

৪. হাসান আজিজুল হক, *তৃষ্ণা,* দ্র. 'পঞ্চাশটি গল্প : হাসান আজিজুল হক', পৃ. ৯

৫. তদেব, পৃ. ১০

৬. তদেব, পৃ. ১১

৭. তদেব, পৃ. ১৩

৮. তদেব, পৃ. ১৬

৯. তদেব, পৃ. ১৭

১০. মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে দু-তিন দিনের টিপটিপানি বৃষ্টির আবহাওয়াকে বলে 'গাজোল'। গাজোলের বৃষ্টি ভারী বর্ষণের রূপ নিলে বলে 'ডাওর'। ডাওর থেকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে তাকে বলে 'ফাঁপি'।

১১. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *বৃষ্টিতে দাবানল*, দ্র. 'গল্পসমগ্র' (২য় খণ্ড), কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৫৮
১২. তদেব, পৃ. ৬২
১৩. তদেব, পৃ. ৭০
১৪. অনিন্দ্য সৌরভ কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, *সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মুখোমুখি*, দ্র. 'ঐক্য', পৃ. ৪৩১-৪৩২
১৫. শাহদুজ্জামান কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, হাসান আজিজুল হক, দ্র. রবীন ঘোষ (সম্পা.), 'বিজ্ঞাপন পর্ব', কলকাতা, পঞ্চদশ বর্ষ, ১৯৮৮, পৃ. ৬১-৬২।

Contribution of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar as Educational and Social Reformer in the 19th Century

Bidyut Sarkar
Assistant Professor, Department of History
Maharaja Srischandra College

ABSTRACT : In 19th century, Ishwar Chandra Vidyasagar is one of the pioneers of the Bengali Renaissance. On the other hand, he was a philanthropist and social worker as well as a scholar and educator. Despite the British Indian government's unwillingness to retaliate against the spread of education, he has worked tirelessly to make education available to the people. He was the first devoted social worker and educated man in subjugated India. He was the first devoted social worker and educated man in subservient India. He realized that education was the only tool to free the country and the nation from the shackles of superstition. Spread the same education for all without any discriminating the children of the society. However, he devoted himself more to educating women because he understood that all the members of the place where women would be educated are more likely to be educated. He thinks that women's education is very important to get rid of the superstitions and superstitions of the society of that time. He opened the door of education to the people of the country from primary education to higher education. He did not neglect Oriental education. In the field of education, he wanted to coordinate Eastern and Western education. He called for adopting western education to get rid of all kinds of problems in the country. As a result, the West has taught that a new era will begin. He is an ideal man to every one of us Indians. Whose personality inspired the next generation.

Key Words: Enlight, Contribution, Educational Reform, Social Reform.

INTRODUCTION

All the thinkers who played a leading role in the renaissance that took place in Bengal and in the whole of India in the middle of the 19th

century; one of them was Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. The renaissance that Raja Rammohun Roy started in the then Indian society was later completed by the hand of Ishwar Chandra Vidyasagar. He has been hailed as a shining star in the history of Indian education for his significant contributions in various fields from social reform to education reform. Besides, his knowledge, human service, social reform, the spread of primary and women's education, the development of Bengali language and literature etc have contributed to all people at national and international level. Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar was inspired by Raja Rammohun Roy and Derozio.

The nineteenth century was an era of renaissance. In this era, Vidyasagar became a novice in education reform through social reform and was able to bring education consciousness in India. The name of Vidyasagar has always been remembered as the pioneer of any women's liberation movement, language developer and Educator. It is a difficult task to evaluate his overall personality and generous mind. He has left his signature of concentration and selflessness in every action in every field of life. His liberal outlook combined Eastern and Western cultures. Ishwar Chandra Vidyasagar has become a legend for the liberation of the mother. For a long time he has fought uncompromisingly against superstition, orthodoxy and bigotry. He was the first to find the Bengali nation to grow, to be worthy, to be humane, to be modern, to be progressive and universal. The world poet Rabindranath Tagore said of him that he was not a Hindu, he was not a Bengali or a Brahman, and he was a real man. About Ishwar Chandra Vidyasagar Mahatma Gandhiji said that the poor Bengali Brahman I respect is Ishwar Chandra Vidyasagar.

PERSONAL PROFILE

Ishwar Chandra Vidyasagar was born on 26th September 1820, in the village of Birsingha in the formerly undivided Midnapore district to an aristocratic Brahman family. Thakurdas Bandyopadhyay was his father and Bhagavati Devi was his mother. His grandfather's name was Ramjoy Tarkabhushan Bandyopadhyay. Ramjoy Tarkabhushan Bandyopadhyay was a man of great foresight. He named it Ishwar Chandra Vidyasagar. Vidyasagar's father worked in Calcutta but the family could not afford to

live in Calcutta. So he had to stay with his rural mother and grandmother. Mother Bhagavati Devi's education was the keynote of the entire Vidyasagar's life. Ishwar Chandra Vidyasagar used to study in the village Pathshala. At the age of five, he was admitted to the Pathshala of a Rural Gurumshai. Ishwar Chandra Vidyasagar used to beat him in that Pathshala as he was very naughty in his childhood. Then he was admitted to the Pathshala of another guru named Lakshikanta. Vidyasagar studied in this village Pathshala for only three years. Ishwar Chandra Vidyasagar showed extraordinary talent. Thakurdas Bandyopadhyay brought him to Calcutta in 1828 at the age of eight on the advice of that village Guru. They took refuge in the famous lion family in the Barabazar area of Kolkata. Ishwar Chandra Vidyasagar was admitted in the Class three of Government Sanskrit College, Calcutta on Monday 1st June, 1829. In 1830, while studying grammar, he was admitted to the English department of Sanskrit College. In 1836, he completed the Alangkar lesson and won the first place in the annual examination and received the Sahitya Darpan, Ratnabali Kavyaprakash Uttaramcharita, Mudrarakshas cognomens etc. Ishwar Chandra Vidyasagar passed the examination of the Hindu Law Committee on 22 April 1839. On 16th May, Committee gave him the award of Vidyasagar for successfully passing this test. In 1841, at the age of just 21, he joined Fort William College as a lecturer of Bengali language and literature. In 1846 he left Fort William College and took up the post of assistant editor at the Sanskrit College. Then in 1851 he was appointed principal and school inspector of Sanskrit College. After gaining the position of school inspector, he focused on spreading education betweens 1855 to 1858. He established about 60 girls' schools. In 1859 he established the Calcutta Training School. During his lifetime, Ishwar Chandra Vidyasagar wrote a total of 53 books, including 17 Sanskrit books, 4 English books and 32 Bengali books such as Shakuntala, Biography, Banbas Sita, Bhrantibilas, Betal Panchabingsati etc. Besides, he wrote books like Varnaparichay, Kathamala, Bodhodaya etc. suitable for primary education. Finally, in 1891, his career came to an end.

OBJECTIVES OF THE STUDY

To study the educational works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar.

To study the Social Works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar.

Research Questions:

Is there any contribution of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar in the education field?

Is there any contribution of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar in the Social field?

Methodology:

This study is Historical. Primary and Second sources are used as sources of collecting data in this historical study. Secondary sources are more used. in this study. The information for this study has been collecting from books, articles, and Ph.D. thesis. Mainly qualitative information has been used in this study. So, the study is also qualitative.

Social Reform:

Rammohan Roy's movement against paganism, "Sati daho", religious superstition and the violent movement of the Young Bengal Party made the signs of the new age clear in Bengal. The result of this movement was the Prevention of "Sati daho" Act and the Prevention of Slavery Act Vidyasagar's work career started at this time. So his reform religion was associated with the era. He was guided by the trend of Rammohan and New Young Bengal in a certain way. He was more influenced by humanism than by the logically and with the determination to shed women's tears, he has gone from steadfast to heroic like the medieval period. Because love and compassion took over his entire consciousness, he easily abandoned conventional reform and embraced the eternal truth. Ishwar Chandra Vidyasagar's contribution as a social reformer is immense. It is true that the practice of "Sati daho" was stopped on the initiative of Raja Rammohan Roy, but social evils like polygamy, child marriage, nobility etc. are still prevalent in society. He formed a movement against all social evils. However, he is notable among all the aspects of his life in the form of social reform such as Widow Marriage, Journalism, Women's education and Mass education etc.

Introducing Widow Marriage:

The cries of the widows in the homes of the Bengal moved to Vidyasagar's heart. He awoke vocal against polygamy and to prevent child marriage in order to bring girls back into the mainstream of society.

Vidyasagar not only strived for the education of girls but also for the establishment of girls in a position of dignity in society. In his efforts, the Widow Marriage Act was enacted in 1856. Vidyasagar also wrote several satirical pamphlets on the abolition of polygamy and the introduction of widowhood such as "Koshyachit Upjokto Vaiposyo", "Bidhoba Bibaho Bisoyok Prastab", "Ratna Parikha" etc.

Vidyasagar and journalism: Vidyasagar's literary life was inseparable from his journalistic life. Vidyasagar was fully involved in newspaper publishing. Vidyasagar drew everyone's attention to the possibilities of the Bengali language and Bengali literature through various papers and magazines. Through these writings, he tried to make the human mind aware of society. He was associated with the publication of two magazines called "Tattwabodhini" and "Sarvashubhakari" at that time. Besides, Vidyasagar had planned 'Somprakash patrika'. After the death of Harishchandra Mukherjee, when the 'Hindu Patriot' magazine was abort, he took the initiative to publish it regularly. He was realizing the importance of newspapers in spreading public education and shaping public opinion. Vidyasagar associated himself with many newspapers of that time. So his attitude toward the evaluation of education is also a valuable addition to the aspect of journalism.

Vidyasagar and Women Education:

Vidyasagar was very enthusiastic about Women's education from the very beginning. Vidyasagar was the bearer and carrier of women's progress in the 19th century. Spread and promote women's education and with the partial support of the then government through his efforts. Along with the reform of primary education, Vidyasagar devoted himself to women's emancipation and women's education. In his time, the girls of ordinary families and the girls of rural areas lived in the dark days of ignorance. Their lives were plagued by the curse of polygamy and child marriage. Vidyasagar took a vow to get rid of that curse. That is why; he was struggled in his life to be remembered in the history of Indian women's liberation. Vidyasagar took some important initiatives to spread women's education. Vidyasagar was deeply hurt by the immense humiliation of women. He realized that the only way to remove the

humiliation and deprivation of women wants to spread women's education.

Establishment of Bethune College:

In 1849, Vidyasagar established the first unpaid school for women's education in India under the government of Drinkwater Bethune. Mr. Bethune accepted Vidyasagar as the main force of the women's liberation movement as a friend and comrade- in-arms. He was always trying to get the girls of the relative's house admitted to this school at first. He said if the women are educated and knowledgeable, they will be able to give good education to their child.

The spread of women's education in rural areas:

Vidyasagar prepared the wives of the rural villages of Bengal for public education and he was always trying to spread it. As a result of this effort, he set up a girls' school at Jaugram in Bardhhaman district in 1857.

Formation of women's education Deport:

Vidyasagar requested the government to introduce a government grant system for the expansion of women's education. But he was not entirely successful in that move. That is why he opened a women's education deport. He is enthusiastic about women's education and appeals to individuals in existing countries for financial assistance. This invincible attitude of Vidyasagar has inspired conservative Hindus and Girls to set up schools.

Receiving government assistance:

In 1857, with the help of Mr. Hallyday, Vidyasagar established schools for girls in different villages of Bengal. He established a total of 35 girls' schools in Hooghly, Nadia Midnapore, Bardhaman district. In this school enrollment total of 3500 students. He was the first to take women's education to the stage of the movement. The mantra of his 'Sadhana' was that the god exists only where the woman is revered.

Women in the spread of higher education:

Vidyasagar wanted to build a new character, a new society in our country. It is not possible to build a new character and a new society without education. Vidyasagar extended a helping hand to the then Governor Bethune when he was contemplating higher education for women.

Abolition of polygamy:

He has long struggled against the practice of polygamy. In 1870 he gave scriptural evidence against these customs. Opposing scholars at the time attacked him harshly for all his books and proverbs. He authored two aggressive books, "Too Little" and "Too Little Again" under the pseudonym "Kasyachit Appropriate Nephew". Although polygamy was not enacted, he was able to create social awareness against these customs.

Behavior against child marriage:

One of the curses of Hindu society is child marriage. To get rid of this curse and in order to make the people aware, 'Sarvashubhakari' magazine published a book called 'Ballobibaho' against child marriage. Later, a law was enacted to prevent child marriage and the age of marriage for girls was fixed at 10 years. He was also conscious enough to dispel some of the superstitions of the society such as the caste system, untouchability, killing of lepers and nobility, etc.

Mass education:

Vidyasagar's biography shows that he wanted to light the lamp of knowledge for all, irrespective of race, religion, and caste. In 1853, the Governor, in collaboration with Hallyday, directed the East India Company to outline the public education of the province. The effect of Vidyasagar's educational thinking can be noticed in the instructions given to the Education Council.

Medium for mass education:

He recommended that the people of Bengal should be educated in their mother tongue. He thinks that the overall improvement of the people is possible through their mother tongue Bengali.

School Establish:

Necessary schools should be set up in all the districts and suitably skilled teachers should be appointed as per the need. For that purpose, he established schools in different districts such as Medinipur-3, bordhhaman-4, Hooghly-20, Nadia-11.

Curriculum:

The curriculum will include history, geography, arithmetic, geometry, physics, physical education, etc keeping in view the development of Mass education.

Supervisor:

The principal of Sanskrit College should be given the responsibility of supervision to ensure that the teaching and learning of the various schools in the province.

Adult Education:

Vidyasagar's contribution to adult education was not insignificant. He arranged for the establishment of night schools with the working and agricultural people. Later, he set up his evening school for the Scheduled Tribe Community at Karmatar. The non-formal education system is just a re-introduction of these institutions which establish by Vidyasagar.

Educational Reform:

Vidyasagar and Metropolitan Institution:

Vidyasagar's contribution to the spread of college education is valuable. The Metropolitan Institution continues to bear the signature of his contributions. This was the first step taken by Vidyasagar to make English education in our country. From 1854, law education, BA honors, M.A, etc. were started from the Metropolitan Institute. Simultaneously, branches of Metropolitan Institute were opened at Shyampukur, Boubazar and Barabazar. Vidyasagar used to bear all the expenses like housing, maintains, etc. of this college. So we can be said that even though he was poor, he became the main donor of the country. In the context of the Metropolitan School, Rabindranath said that he alone saved the Metropolitan School from all sorts of dangers. Now it is a glorious Vidyasagar College.

Vidyasagar and Fort William College:

At the end of his student life, Vidyasagar started his career as an accountant at Fort William College. Later he became a professor of Bengali language and literature at Fort William College. During this time, the Secretary of Fort William College and many others were impressed by his extraordinary erudition and generosity. Vidyasagar came in contact with the youngest civilians and realized that in order to liberate superstitious Indians from illiteracy. We need to know about the science of Western language, literature, philosophy, and apply it to human society. That's why he started learning English and Hindi at Fort William College. Rammohon's ideals of integration between Eastern and Western

thought inspired Vidyasagar. But he was never against the country's tradition. At that time Vidyasagar's various articles on social reform were published in 'Tattwabodhini'. He was an active member of the Theoretical Committee. In a word, Fort William College was an area of inspiration for Vidyasagar.

Sanskrit College and Vidyasagar:

In 1846, at the age of 25, Vidyasagar was appointed assistant secretary of the Sanskrit College. From his teaching experience at Fort William College, he began to think of reform in education. Because of this, he developed a program for the overall development of the teaching and learning system and administration of the Sanskrit College. But unfortunately, this program was not approved by the college authorities. As a result, he resigns from Sanskrit College. At the request of all, he rejoined the Sanskrit College in 1850. In 1851, Vidyasagar was promoted to the post of Principal of Sanskrit College. By joining Sanskrit College for the second time, Vidyasagar concentrated on various reformist works of the college. Notable among his programs-

1. To open the doors of Sanskrit College for all irrespective of race.
2. To arrange teaching through the mother tongue.
3. Introducing the English language and western science.
4. Emphasis on Bengali grammar by reducing the extra importance of Sanskrit grammar.
5. Remove 'Mugdhabodh' from the curriculum and add 'Upokramnika' and "Byakaron koumudi" instead.
6. Including European literature instead of Indian philosophy, Vedanta as well as Sanskrit, algebra and English instead of 'Lilavati'.
7. He introduced a salary system and summer vacation in Sanskrit college.

Also, the change in the teaching method, the introduction of a teacher teaching, the teacher's discipline and punctuality are equally important by his decision. He was reforming the entire education system.

Primary Education:

Vidyasagar has contributed the most in the field of primary education. He noticed that the country's primary education was deprived and neglected by the government. That is why he felt the stagnation of this primary

education and the need for reform and improvement. As a result, in 1853, he submitted a report on education to Mr. Moyater. Hallyday sends a report to Governor Dalhousie on November 15, 1854, directed and assisted by Vidyasagar. Notable among the recommendations made by Vidyasagar regarding primary education are:

1. Primary schools need to be improved in model school planning.
2. Each Primary school will have one head teacher and two assistant teachers.
3. Model schools will be located away from primary schools.
4. Primary schools need to be improved through regular visits.
5. The Principal of Sanskrit College will perform additional duties as the Chief Inspector.

Primary Textbook:

He spoke of composing suitable textbooks for primary education. His written 'Bornoporichoy' was very common in Bangla at that time. 'Bornoporichoy' was divided into 3 sections. Students were taught pronunciation in the first section. In the second section emphasizes reading simple prose in Bengali. In third section was the story of 'Gopal' and 'Rakhal', names two students.

Medium:

Vidyasagar has given utmost importance to the mother tongue for teaching in local schools.

Curriculum:

He has given special importance to Bengali grammar in the curriculum. As a result, includes 'Upakramanika' and 'Vyakaran kaumudi' in the curriculum. Bengali prose uses a lot of punctuation to make it easier. His books 'Kothamala' and 'Bodhoday' play a unique role in the language development of children. He said that also included geography, history, arithmetic, geometry, natural sciences, literature, Bengali, fine arts, etc should be kept as a curriculum in primary education.

Teacher Education for Primary level:

Primary children need well-trained teachers to teach them psychologically. That is why he spoke of setting up a normal school which would help in overcoming the shortage of teachers in primary education. He established a normal school in 1855 in collaboration with

the government where 60 teachers will be trained twice a year. The principal of this normal school was Akshay Kumar Dutta and the class was progressing in Sanskrit College. The students were given a monthly stipend of Rs 5.

Western Education:

Vidyasagar was more important in Western education as well as Eastern education. He realized that it was possible to develop and enrich Sanskrit and Bengali literature by a combination of Eastern and Western education. That's why he arranged for Sanskrit college students to learn English.

CONCLUSION

Vidyasagar was one of the pioneers of Bengali language and literature and the father of Bengali prose. It is a very difficult task to evaluate the contribution of his education in his entire life. Until the last day of his life, Vidyasagar struggled against the conservative and reactionary forces through education and social movements. Superstitious race and communal attitude did not find a place in any of Vidyasagar's works. No evil force has been able to shorten his lifelong for human services. He extended the Bengali language, literature, and socio-culture from the darkness of the Middle Ages to the paradigm of the new age. The humanitarian Vidyasagar was incomparable not only in the field of higher education but also in the period of writing children's books. Vidyasagar writes many books for children in a simple and orderly way and also develops simple mental thinking in word-formation. The style of prose introduced by Vidyasagar, the father of Bengali prose literature, also contained a deep refinement of his human senses and a deep knowledge of linguistics. The faith that Vidyasagar has worked with throughout his life is to serve society. So, in many cases, this servant for the people has worked alone and in his strength.

REFERENCE

[1]. Bala, B. (2019). Contribution of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar (1820-1891) as a Messiah of Women Emancipation in 19th Century Bengal. Ensemble, 1(2), 79-86.

[2]. 8. Banerjee, A. (2019). Was Vidyasagar a Failure as a Social Reformer? in Dr.Banibrata Goswami edited Reawakening & Vidyasagar :Proceedings of Selected Research papers presented in the National Seminar in collaboration with Bharata Vidya Charcha Kendra, Bardhaman,Tehatta, Tehatta Sadananda Mahavidyalaya, 1-35.

[3]. Banu, A. and Alam, S. (2016). Influence of Western Knowledge and Culture upon Ishwar Chandra Vidyasagar and his Philosophy of Education. International Journal of Education and Psychological Research, 5(2), 12-18.

[4]. Chaudhury, A. (2017). Remembrance: A Tribute to Iswar Chandra Vidyasagar for his Achievements and Innovations in the Field of Education during the 19th Century in Bengal. Internal Education and Research Journal, 3(4), 124-126.

[5]. De, A. (2020). Ishwar Chandra Vidyasagar on gender justice and women empowerment. International Journal of Multidisciplinary Research and Developmen, 7(5), 26-31.

[6]. Ghosh, R. (2018). Ishwar Chandra Vidyasagar's Contribution in the Development of Bengali Language and Literature and Its Relevance in Present Context. Asian Review of Social Sciences, 7(2), 44-49.

[7]. Gupta, A. K. (2019). Vidyasagar in popular perception: Recovered through anecdotes. Studies in People's History, 6(1), 23-32. http://dx.doi.org/10.1177/2348448919834789

[8]. Monda, P. K. (2018). Child Psychology and Vidyasagar's Bornoporichoi - An Analytical Review. Review of ReseaRch, 8(2), 1-5.

[9]. Sikder, P. and Halder, T. (2020). Vidyasagar as a Reformer of Education. Journal of Information and Computational Science, 10(1), 840-853.

[10]. Zafar, M. (2014). Social Reform in Colonial Bengal: Revisiting Vidyasagar. Philosophy and Progress, Vols. LV- LVI, 1-2. http://dx.doi.org/10.3329/pp.v55i1-2.26395

The Development of Political Alternatives in Bengal During 1920's: Emergence of Leftism and The Role of Newspaper in Its Growth

Debdatta Banerjee
Assistant Professor, Department of History
Fakir Chand College

Abstract : In the second decade of the 20th century, India's anti-colonial struggle underwent significant changes following Gandhiji's withdrawal from the non-cooperation movement in 1922. Chittaranjan Das's Swaraj Party, revolutionary nationalist movements, and the rise of Leftism drove the development of potential political alternatives in Bengal. Furthermore, the emergence of Leftism as an ideology, as well as the establishment of the Communist Party of India, gave the country's politics a new perspective. Bengal followed suit. The development of communist journalism in Bengal during the 1920s helped to consolidate the leftist movement and prepared the ground for future expansion.
Key Words: Twentieth Century, 1920s, Political Alternatives, Swaraj Party, Revolutionary Nationalism, Leftism, Communist Party, Journalism, Newspaper.

Introduction

With the announcement of the partition of Bengal in 1905 and in response to the introduction of the mass-participated Swadeshi movement in Bengal, twentieth century India witnessed a momentous shift in the trajectory of anti-colonial struggle against the oppressive colonial British rule, by inculcating the consciousness around the idea of nation and national identity which further advanced and intensified by the adverse impact of the First World War and the imposition of seditious Rowlatt Act, and finally, the first major manifestation of this consciousness across the country was culminated through the progress of Gandhi-led khilafat-non-cooperation movement.

However, the second decade of the twentieth century saw significant shifts and turns in the country's ongoing anti-colonial struggle.

Gandhiji's unexpected decision to withdraw the non-cooperation movement in 1922 left the common masses of the country in a state of absolute disarray. While the decision to annul the non-cooperation movement completely shattered the country's people, it also presented them with some promising political alternatives. Bengal followed suit. Alternative political philosophies to Gandhism arose in Bengal, resulting in the widespread proliferation of diverse political ideologies. Moreover, the emergence of a recently nurtured sense of 'Bengali Patriotism' prompted Bengal to actively redefine its identity. This process encompassed the adaptation of the vernacularisation of language politics, the rise of a fresh wave of literature, Mofussil towns expanded, and new political leaders from a variety of backgrounds rose to prominence during this period. All of these factors have a significant impact and provide strong support for the emergence of new political viewpoints. The people of Bengal during this time were principally driven by potential political options such as Chittaranjan Das's Swaraj Party, the resurgence of revolutionary nationalist movements, and the advent of the new ideology of Communism (Sarkar 1983; Bandyopadhyay 2004; Bhattacharya 2014).

Development of Political Alternatives during the 1920s in Bengal

Bengal's early politicalization led to the creation of these alternative positions. It saw Gandhian politics as one of several potential options during the transition from the 1920s to the 1930s. The deviation from the Gandhian approach to politics was significant enough to result in the establishment of a distinct political entity, known as the Swaraj Party. Chittaranjan Das, the leader of the non-cooperation movement in Bengal, initiated this program in response to the circumstances in Bengal followed by Gandhi's decision to withdraw the movement. The Swaraj Party, led by Chitta Ranjan Das, gained more popular sympathy and political engagement than Gandhi's Congress between 1923 and 1925. On the other hand, the revolutionary nationalists, whom Das had convinced to join non-violent non-cooperation, were now actively opposing inaction and laziness since the movement's withdrawal in February 1922 and pursuing their own independent path. Out of the three alternatives for the Gandhian Congress, the Left proposed one of the most promising political paths. In India, communism emerged as a powerful ideology and

later joined the nationalist struggle against colonial oppression as a political party. Its significance in the history of Bengal becomes evident when we consider how the Left developed in the years following 1947 (Bhattacharya 2014: 146-147, 161-168, 198-201).

Emergence of Leftism: A Political Alternative

However, twentieth-century India witnessed the inception of Leftism in India followed by the establishment of the Communist Party of India in the 1920s. This movement, in its ideology and orientation, sought to reconcile its particular anti-colonial nationalist aspiration with its more general goal of a global revolution for the liberation of the working masses from imperialist and capitalist exploitation within the framework of nationalist, anti-colonialist struggles. With its extensive support, radical enthusiasm, and aspiration for a different world order, it had a significant impact on Indian politics.

After the party was established, socialist ideals became institutionalised and gave Indian politics a new angle. The national freedom movement had a strong affiliation with it, and several nationalist militants found great inspiration in the socialist doctrine. According to the communists, the only way to regain national independence is through a dramatic socio-economic reform. However, their primary objective was to attain proletarian internationalism and incorporate national freedom within that framework. The communists advocated for the attainment of both democracy and socialism. They asserted that they had infused a revolutionary meaning into the term of 'Swaraj'. Their objective was to eliminate the system of landlordism, feudal dominance, and caste injustice. The First World War provided the necessary circumstances for the elimination of imperialism through a profound socio-economic change. In response to this scenario, the leadership of the Congress declared a mass movement, taking into consideration the aspirations of the working class and peasantry. The Congress, however, had little inclination towards fostering any form of class organization. Furthermore, it did not endorse the ideology of class struggle. The disillusioned factions of the working masses and nationalist activists, who were dissatisfied with the political strategies of the Congress, especially following the sudden termination of the Non-Co-operation Movement in

1922, sought other paths to achieve political and social liberation. At this crucial moment, amidst a prevailing colonial atmosphere and the emergence of the communist movement in India, the working-class people of India along with others found their means of expressing their opposition to colonial domination (Sarkar 1983; Overstreet and Windmiller 1959).

During the early years, the primary focus of the communist movement was to establish a revolutionary party, led by the working class, and to bring about a revolution. The most crucial question they faced was how to reconcile the concept of proletarian internationalism with Indian nationalism. While leftist movements in India emerged whether inside the National Congress or as a response to imperialism and as a reaction against the ideologies of the traditional Congress leadership, different left-wing groups had varying tactics and ideological perspectives on India's struggle for independence (Rai Chowdhuri 1976: 28).

The Establishment of the Communist Party in India

Manabendra Nath Roy (also known as Narendra Nath Bhattacharya) played a significant role in establishing the Communist Party in India. He actively took part in the Second Congress of the Communist International in 1920. In October of the same year, M.N. Roy, Abani Mukherjee, Mohammad Ali, and Mohammad Shafiq established the Communist Party of India in Tashkent. From 1921 to 1925, several formal communist organisations were founded across the nation, correlating with the expansion of peasant, workers and other leftist organizations. In December 1925, Kanpur hosted a pivotal conference involving various communist groups. The meeting convened under the leadership of Singaravelu Chettiar, a prominent communist figure from Madras. The individuals who played a significant role in the meeting were Singaravelu Chettiar, Dange, Muzaffar Ahmad, Nalini Gupta, Shaukat Usmani, and several others. The initiation of this conference is seen as the official commencement of the Communist Party of India (Sarkar 1983: 248-249; Sharma 1984).

The Role of the Communist Press

Communist journalism is consistently associated with the development of the communist movement worldwide. The party disseminates its beliefs and orchestrates public opinion in support of class politics through the publication of daily newspapers and magazines. In India, the advent of communist politics and the foundation of the communist party led to the development of press activity aimed at shaping public opinion towards a radical solution of economic equality and political empowerment of the masses through revolution. The party press emerged as a significant channel for political mobilization on behalf of the party. The publication tool of the CPI served as a constant and intensive way of disseminating propaganda. Bengal imitated the action. The initial communist journals in India mostly served as the official publications of regional communist organisations. M. N. Roy first fulfilled the role of a central press organ through the publications he published abroad. The publication titled *The Vanguard of Indian Independence* was released from Berlin in May 1922 with the aim of establishing a strong and robust basis for the communist party organization in India. Roy's newspapers were consistently published and widely distributed in India. However, the CPI did not have a central publication until the later half of the 1930s. *The National Front*, first established as a national newspaper, was founded by P.C. Joshi. The newspapers and journals released by the provincial branches of the party in different regional languages were published prior to the central newspaper. The early communist magazines in India, particularly those from the 1920s, served as the official channels for the local communist organisations (Overstreet and Windmiller 1959: 447-451).

The Development of the Communist Press and its Role in Emancipation of the Ideology during the 1920s in Bengal

The origins of communist journalism in Bengal can be traced back to the year 1919. *Nabajug*, an evening daily founded by Muzaffar Ahmad in Bengal in 1919, was a significant contribution to the development of communist journalism in the region. With the support of Kazi Nazrul Islam, Ahmed established a printing sector within the party organization to inspire revolution and the ideas of Marxism-Communism. The first

issue, released on July 12, 1919, featured in a single sheet of paper. Despite its initial success, *Nabajug* ceased publication in 1922. Later it resumed once again but struggled to regain its popularity (Ahmad 1969: 81; Bhattacharya 2014: 303).

Dhumketu, a newspaper that was published on 12 August 1922, was given its name by Kazi Nazrul Islam and was edited by Muzaffar Ahmad. It was the first journal to advocate for India's complete independence from colonial governance. The word *'Dhumketu'* symbolised the rise of communism as a different form of political opposition in India, indicating a shift in the global power structure. Nazrul requested Rabindranath Tagore to compose a poem for the newspaper's opening as a gesture of his well wishes. Tagore graciously fulfilled his request by creating a suitable poem for the newly established journal (Dasgupta 1996: 8).

After the publication of *Nabajug* and *Dhumketu* in Bengal during the 1920s, several publications with a particular focus on problems affecting the working class and labour people started to appear. These campaigns gave rise to *Sanhati*, *Langal*, and *Ganabani*, whose objectives aligned with those of the *Labour Kissan Gazette* of Madras and the *Socialist* of Bombay. Nevertheless, the newspaper *Sanhati* rose to popularity in Bengal in 1923. It was solely the initiative of the workers and the employees. Jitendra Nath Gupta served as the editor of the publication. Gyananjan Pal, the eldest son of Bipin Chandra Pal, assisted him in this undertaking (Chattyopadhyay 1992: introduction i). The eminent nationalist leader Bipin Chandra Pal gave the paper its name. '*Sanhati*' means 'unity. Further, the paper aimed to unite oppressed and proletariat voices against exploitation. The name itself upheld the ideas of class collaboration and international proletarian communism. The first female labour leader in Bengal, Santosh Kumari Devi wrote regularly for the paper and addressed issues related to the working-class people, class exploitation, and labour rights by specifically focusing on the miserable conditions of jute mill labourers in Bengal (Chattyopadhyay 1992: introduction ix-x). These articles portrayed the fact that during the second decade of the 20th century, communist ideology received a positive response in various parts of the country, with

women actively participating in this alternative political spectrum. Santosh Kumari Devi, a prominent example of women's participation in the communist movement, contributed to the publication *Sanhati* consistently and later published her own publication, *Sramik*, which regularly addressed the problems and miserable conditions of labourers. However, *Sanhati* allowed workers to share their personal experiences related to their struggles in the workplace. The paper also focused on the country's current political situation, aiming to make people aware of the national political scenario.

Meanwhile, a section of the Indian National Congress known as the 'Labour Swaraj Party' initiated a publication aimed at advocating for the well-being of the labour and peasant communities in Bengal. Similar to *Sanhati*, *Langal* sought to unite the working class in opposition to all types of injustice. The inaugural edition was released on 2 January 1926. Manibhushan Mukhopadhyay and Kazi Nazrul Islam were the principal forces behind it. Initially, Manibhusan Mukhopadhyay assumed exclusive accountability for the publishing. Subsequently, Muzaffar Ahmad assumed that responsibility in a gradual manner (Dasgupta 1996: 8-9).

The paper's objective was to once again unite working-class people. However, because the name '*Langal*' or 'Plough' was solely associated with the peasant section of society, Muzaffar Ahmad and others changed the name of a Bengali weekly from *Langal* to *Ganabani* in 1926 to address other working-class people in Bengal and to unite the working-class people as a whole. Muzaffar Ahmad became *Ganabani's* editor, and *Ganabani* became a weekly of the Peasants' and Workers' Party of Bengal. Both of these papers opened up new horizons for Bengal's peasant and labour sections.

After *Ganabani*, Hemanta Kumar Sarkar began editing *Jagaran*, a new party mouthpiece for peasants and labourers. The arrest of Ahmad and others in the Meerut Conspiracy Case, however, bundled *Jagaran's* publication (Dasgupta 1996; Chattyopadhyay 1992).

Conclusion

Thus, throughout the 1920s, Bengal saw a robust growth of the communist press, which paved the way for the ideology and movement's eventual spread and served to solidify the communist movement in the

region as one of the most promising political options available at the time.

References

Sarkar, Sumit,1983, *Modern India: 1885-1947*, India, Macmillan.

Bandyopadhyay, Sekhar, 2004, *From Plassey to Partition: A History of Modern India*, New Delhi, Orient Longman.

Bhattacharya, Sabyasachi, 2014, *The Defining Moments in Bengal: 1920-1947*, New Delhi, Oxford University Press.

Overstreet, Gene D. and Marshall Windmiller, 1959, *Communism in India*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press

Rai Chowdhuri, Satyabrata,1976, *Leftist Movements in India: 1917-1947*, Kolkata, Minerva Associates Publications.

Sharma, T.R., 1984, *Communism in India: The Politics of Fragmentation*, New Delhi, Sterling Publishers.

Ahmad, Muzaffar, 1969, *Amar Jibon O Bharater Communist Party*, Kolkata, National Book Agency.

Dasgupta, Samir, 1996, *Ganaandolone Chhapakhana Communist Party O Samadarshi Sangbadpatrer Kramaparjay*, Vol.1, Kolkata, National Book Agency.

Chattyopadhyay, Gautam (ed.), 1992, *Sanhati, Langal, Ganabani*, Kolkata, K.P Bagchi.

Interpretation of *Dracula* through the Lens of Science Fiction

Kisor Baulia
Assistant Professor, Department of English,
Karimpur Pannadevi College

Abstract : Bram Stoker’s epistolary novel *Dracula* (1897) is mostly regarded as a landmark work of the horror genre which introduced the legendary figure of Count Dracula and formed much of the vampire lore we know today. This novel does not have a single protagonist; however, it begins with lawyer Jonathan Harker travelling for work and lodging at the castle of the Transylvanian elite, Count Dracula. Notwithstanding, examining a bit more uncovers that *Dracula* touches on the basic ideas and themes of science fiction much more often. So, this paper will seek to analyse *Dracula* through the lens of Science Fiction. In order to fully understand *Dracula* via the prism of early science fiction, this paper will examine closely to decode how the novel's multilayered theme of alternative reality or the intersection of science and supernatural, Alien life, use of latest technological components, physiological psychology, exploration of human and scientific limitations reflected in this novel, that eventually shaped the Victorian era. Moreover, as product of the fin-de-siècle scientific revolution of the late 19th century, this paper will also try to understand Stoker’s juxtaposition of science/ technology and to determine exactly what part science plays in *Dracula,* to identify the novel's place in the field of science-fiction and its relevance to current and potential arguments concerning science and its place in society by gazing attentively at how the book addresses science and technology.
Keywords: Dracula, Science Fiction, Alternative Reality,Alien, Physiological Psychology, Science, Technology.

Introduction

Dracula continues to be regarded as one of the most significant works of literature and art even after being published for the first time more than a century ago, Bram Stoker's epistolary novel, which first appeared in June

1897, catapulted the vampire subgenre to its pinnacle of popularity, surpassing the works of Polidori's *The Vampyre* (1819), James Malcolm Rymer's *Varney the Vampyre*: or, *The Feast of Blood* (1847), and Sheridan Le Fanu's *Carmilla* (1872). Yet the main focus of this paper is to discuss something else. The paper will seek to analyse *Dracula* through the lens of Science Fiction, which mainly emphasises on the theme of alien invasion, various development of science and the interplay between nature and the alien world. This study seeks to uncover the various components of science fiction embedded within the narrative and how Stoker intellectually uses several scientific devices in favour of the modern people to defend the human world from a nonhuman creature.

This novel was first published in the twilight of the nineteenth century when a major transition from agricultural practice to industrial practice occurred in Victorian Britain. Industrialization brought new devices, technologies and significant discoveries in science were made in many different sectors during the 19th century, including electricity, medicine, biology, social sciences, psychology and so on that improved the Victorian lifestyle. Carol A. Senf highlights the fact that,

> "Compared to all earlier historical eras, the nineteenth century witnessed unprecedented scientific discoveries and technological developments that have helped to determine the shape and nature of our own age. Because their impact on daily life—including transportation, communication, medicine, and industry—was so dramatic and so immediate, no one living during Stoker's lifetime could have failed to be aware of the power of science and technology." (5)

These innovations not only improved the everyday Victorian lifestyle but also sparked the creativity of the artists like Mary Shelley, Robert Louis Stevenson and Bram Stoker who Born within this vibrant and thought-provoking 19th century.

The American publisher Hugo Gernshack, one of the upholders of this genre is taken into account for popularising the term 'Science Fiction' (if not invented) in the 1920s. Although it is thought that Science fiction makes its appearance in the second century for the first time by Greek author, Lucian who used the thematic device of a hypothetical

moon trip to satirise his cultural background, science fiction does not get its popularity until the 19th century. There are wide varieties of definitions for science fiction. And it is challenging to define science fiction because this discipline has already illustrated various subgenres and covers a wide range of topics. Alternative reality, Alien invasion, futuristic scientific inventions, time travel, futuristic voyage, robot and artificial intelligence are considered as some of the major themes of science fiction. According to Marshall B. Tymn, "Science fiction is a literature with a heritage reaching back into ancient times, to a pre-scientific world inhabited by peoples whose myths, legends and superstitions became a way of thinking about and explaining the wonders of the universe" (41). On the other hand, Science fiction is literature which facilitates us to recognize change as both inevitable and natural, and it sometimes encourages us to accept changes.

The purpose of this paper is to examine the text closely to decode how the ideas of alien invasion, practising advanced technology and alternative reality; the intersection of science and supernatural reflected in this novel and eventually help Stoker to compose his narrative. First chapter narrates the theme of alien invasion and how Dracula, a nonhuman being, tries to invade modern society to be a part of it and to contaminate it with his poison.

Second chapter talks about the exercise of various scientific tools like phonograph diary, telegram, blood transfusion, shorthand writing and psychological tools like somnambulism, hypnotism, telepathic communication and how those things were used by the modern people to demolish the ancient devil. And the third chapter deals with how Stoker represents the idea of alternative reality by demonstrating the two different orbs in his novel. One is the Eastern European realm of Transylvania and the other is Western European realm of England. And how Transylvania turns up as an ancient orb full of superstitions and supernatural elements opposed to technologically advanced England.

Alien Invasion

Science fiction literature and movies frequently depict alien invasions, in which alien species descend on Earth with an objective to either eliminate

and destroy human life, enslave it, or demolish it completely. Keith N. Hull acknowledged that:

> "Science fiction has undertaken the theme of defining humanity with vigor, ingenuity, and depth, yet the basic device for introducing it is common in popular literature—the alien, the other. Here is the science fiction buff's familiar ground; we all know the forms that aliens can take: extraterrestrials, monsters, machines with human personalities, animals evolved into telepathically speaking companions, human beings who acquire sub- or superhuman capabilities." (66-67)

Elements of science fiction narratives concerning alien invasions are hinted at in Stoker's *Dracula.* Several concepts that would resurface in subsequent science fiction are shown in the manner in which Dracula is portrayed as a threat, how he intends to expand his dominance, and the cultural concerns that encircle his presence. There are various ways in which Count Dracula exemplifies the notion of alienness. His appearance, habits, origin, immortality, supernatural strength of controlling nature, human and animal, and predatory nature make him alienated from the Victorian modern society.

One could consider Dracula's departure from Transylvania to England to be an invasion. His otherness not only goes across his geographical location of birth but also includes a deeper sense of cultural and existential alienation in the context of Victorian England. His arrival is highlighted by his systematic and premeditated tactics, with his objective of strengthening his dominance and breeding new vampires. His planned technique to broaden his influence and produce young vampires is made apparent in his choice of targets, Mina Harker and Lucy Westenra. It is evident when simultaneously the 'crew of light' is busy destroying Dracula's home in England and Dracula is engaged to attack Mina. He exclaims to the 'crew of light':

> "You think you have left me without a place to rest; but I have more. My revenge is just begun! I spread it over centuries, and time is on my side. Your girls that you all love are mine already. And through them you and others shall yet

> be mine - my creatures, to do my bidding and to be my jackals when I want to feed." (Stoker 326)

This systematic approach may look similar to the conception of an invasion prevalent in science fiction, in which a foreign species tries to subjugate or colonise a new planet.

In addition to physical devastation, psychological and cultural instability can be seen as other aspects of Dracula's invasion. Through terror and uncertainty, he capitalises on the vulnerabilities and anxieties of his victims. The science fiction concept of alien influence undermining personal independence and identity is reflected in the process of becoming a vampire, which involves a loss of personal autonomy. Lucy Westenra's social conventions and personal integrity is severely violated when she turns into a vampire. And it is unacceptable to the people of reason, probably that is why when Van Helsing presents the fact that he "did not say she was alive, my child; I did not think it. I go further than to say that she might be Un-Dead" (Stoker 219). Arther exclaims "Un-Dead! Not alive! What do you mean? Is this all a nightmare, or what is it?" (219). Humans cannot fathom Dracula's powers, which include his immortality, ability to change into a bat or wolf, and control over the weather. Because of their superhuman abilities, the human characters feel even more fearful and powerless. Van Helsing expresses his concern after noticing:

> " he can, within limitations, appear at will when, and where, and in any of the forms that are to him; he can, within his range, direct the elements: the storm, the fog, the thunder; he can command all the meaner things: the rat, and the owl, and the bat – the moth, and the fox, and the wolf; he can grow and become small; and he can at times vanish and come unknown. How then are we to begin our strife to destroy him? How shall we find his where; and having found it, how can we destroy?" (Stoker 252)

Moreover, the application of science and technology to tackle unusual threats is thought to be a hallmark of science fiction. In Dracula, conventional and scientific techniques are used to combat the alien danger. An essential participant in the struggle against Dracula, Professor

Abraham Van Helsing confronts the vampire by utilising both contemporary medical knowledge and ancient folklore. This fusion of science and superstition may serve as an example of how science fiction frequently uses various fields of human knowledge to address difficulties that are found far beyond Earth. In this case, Helsing uses blood transfusion and hypnotism as a scientific element along with garlic and holy water (folkloric ingredients) to illustrate how both old and new knowledge can come together to defeat an unworldly creature.

Practising Advanced Technology

One can consider Stoker's portrayal of technology in Dracula as a precursor to the way of science fiction which frequently uses modern scientific developments to explore possibilities for the future. The novel's use of phonograph diary, telegraphs, blood transfusion, shorthand writing and psychological tools like somnambulism, hypnotism, and other technologies captures the fascination of the nineteenth century's technological progression and its potential global impacts. Both of Stoker's fictional and non-fiction writings demonstrate his fascination in the resources of science. He addresses a wide range of social and scientific disciplines from his day including criminal anthropology, physics, chemistry, geology, anthropology, mental physiology, or early psychiatry in his writings. Glennis Byron points out:

> "His characters are themselves frequently scientists of one kind or another, and usually have all the latest gadgets and inventions placed at their disposal, from bicycles to automobiles to aeroplanes, and from Krupp cannons to Winchester rifles. The more alien and mysterious the world Stoker presents, the more enthusiastically and ingeniously he exploits the technological innovations of his times." (1-2)

Different theories imply that science is the reason the vampire hunters managed to triumph over the Count. The portrayal of science in the present case is one of providing shelter against the centuries-old, non-human menace. Stoker beliefs "science (or more accurately, technology) can help people to solve the problems that he witnessed in his own day" (Senf 135). In this way, science is shown as a source of hope, and Stoker's scientists fight a worthy battle against Dracula. Van Helsing and

Dr. Seward can be considered as reflecting the changes Roy MacLeod describes as occurring in the late 19th century, when "science was invested with new values – of instrumentality, commodity, and utility – and its moral value seen as an 'object lesson' in citizenship and efficiency" (3).

In the battle against the vampire, various devices such as phonographs, typewriters, telephones, telegraphs, Harker's shorthand journal are implemented and all those things are "nineteenth century up-to-date" (Stoker 43). And that scientific technology is not only the latest of that century but also paves the way for the futuristic development in the field of science. Instead of telephone and phonograph now modern people have mobile and audio and video recorders to communicate and record data respectively. Blood transfusions had been attempted as an ultimatum to save patients' lives for over a century, but until the Austrian-American immunologist Karl Landsteiner discovered multiple blood groups and made the practice safer in 1909, this process was rarely executed. But Stoker's use of the technology of blood transfusion in his 1897 novel, *Dracula* may demonstrate the idea how this process can act as a boon to the people of the near future for saving lives. It is thought that he had done his medical homework from his brothers Thornley and George. So, this text may give the intuition why one should have to use those technologies and think about the possible improvement of these technologies for the betterment of human life and to fight against the unknown in future.

Moreover, Stoker's interest in psychology cannot be denied. Dr. Seward is believed to be the most rational character in this novel. It can be said through the characteristics of him Stoker presents the psychological advancement of science. While examining Renfield his quest for understanding human behaviour made him think "Why not advance science in its most difficult and vital aspect, the knowledge of the brain? Had I even the secret of one such mind, did I hold the key to the fancy of even one lunatic, I might advance my own branch of science…" (Stoker 80). Stoker tries to portray him in a manner to inquire more about the futuristic development of the science of the human brain and its functions. In addition to that prof. Abraham Van Helsing

introduced the idea of mesmerism to connect with Dracula's brain and his thoughts through Mina Harker (a victim of Dracula). Van Helsing seems confident enough to defect Dracula, as he believes "We have on our side power of combination – a power denied to the vampire kind; we have resources of science; we are free to act and think; and the hours of the day and the night are ours equally" (Stoker 254). These psychological components help 'the crew of light' to defeat the devil. Although these scientific elements were already introduced to the world before Stoker's writing of *Dracula*, they were in the beginning phrase. So, Stoker's exercise of these tools to defeat an unknown creature may be seen as a catalyst for the further development in the realm of science for the better understanding of the universe and human mind.

Alternative Reality: The Intersection of Science and Supernatural

Alternative reality often deals with a parallel universe or reality coexisting with the real world. The notion of alternative reality is effectively entwined throughout the narrative. Stoker uses the contrast between the strange realm of Transylvania and the well-known Victorian England to investigate alternate realities. Victorian England is portrayed as a location of modernity and rationality, distinguished by its social order, advancement in science, and empirical understanding. Characters such as Mina, Jonathan Harker and Dr. Seward exhibit these ideas and they are governed by a logical and rational knowledge of the universe. In stark contrast, Transylvania is depicted as a region filled with esoteric mythology and mediaeval superstitions. The scenery itself suggests a break from civilization because of its untamed and savage characteristics. With its gloomy interiors and meandering pathways Dracula's castle is a manifestation of unearthly energies that extend beyond logic.

In the first chapter of this novel Jonathan Harker states in his journal: "I read that every known superstition in the world is gathered into the horseshoe of the Carpathians, as if it were the centre of some sort of imaginative whirlpool; …" (Stoker 8). Furthermore, while conducting thorough research on Transylvania from British Museum's books and maps, he finds: "… in the midst of the Carpathian Mountains; one of the wildest and least known portions of Europe. I was not able to light on any map or work giving the exact locality of the Castle Dracula, as there are

no maps of this country as yet to compare with our own Ordnance Survey maps; …" (8). On the other hand, in chapter II, Harker discovers:

> "A table in the centre was littered with English magazines and newspapers, though none of them were of very recent date. The books were of the most varied kind- history, geography, politics, political economy, botany, geology, law – all relating to England and English life and custom and manners." (Stoker 26)

in Dracula's collection. It seems that both Dracula and Harker know about this coexisting reality but have a very little idea about each other's realms. So, they both want to increase their knowledge by reading books and seeing maps before going into each other's world. Although these two realms are nothing but the opposite sides of Europe (Eastern Europe and Western Europe), Stoker's brilliant description of these states and their distinct differences may convince readers to believe that these two Territories are of different universes. Nevertheless, Jonathan Harker's visit to Dracula's castle in Transylvania at the start of the book signifies a change from the logical and structured world of Victorian England to the uncanny and obscure continent of the Count's homeland. On his way to the castle the old lady asks him not to go there as, "It is the eve of St George's Day. Do you not know that tonight, when the clock strikes midnight, all the evil things in the world will have full sway?" (Stoker 11). But as Harker does not belong to this territory, he was unaware of these facts and he instantly felt "It was all very ridiculous" (11). His logical thinking does not allow him to believe in things which reason cannot explain. Furthermore, after being imprisoned by Count Dracula, he warns Harker not to roam where he is not expected by saying, "We are in Transylvania; and Transylvania is not England. Our ways are not your ways, and there shall be to you many strange things. Nah, from what you have told me of your experiences already, you know something of what strange things here may be" (Stoker 28). It gives the ideas of alienation and may tempt readers to interpret the notion of alternative reality. Stoker uses the contrast between the alien environment of Transylvania and the well-known Victorian England to explore alternate realities. It can be said that disorientation and alienation are produced due

to the collision of these two realities. Jonathan Harker has a reality check when he steps into Dracula's domain. And the circumstances make him question everything that he knows. "*Dracula* is thus especially interesting because it emphasises the conflict between people who believe that the world is systematic and subject to both reason and human control and individuals whose very existence embodies mystery and the total lack of human control over a powerful and overwhelming universe" (Senf 19). So, the frontiers of scientific understanding are challenged by Dracula's capabilities, which include shapeshifting, mind control, and immortality. And it can be said that the Count's superhuman abilities disrupts reason and may bring forth the ideas of a parallel universe where science's principles do not apply.

Conclusion

It is always hard for any writer or critic to demonstrate a clear line between two genres. Sometimes a writer's creative thinking, his narrative technique, portrayal of various themes often makes this boundary blurred and creates a doubt in the mind of the reader whether a text should be considered to be a part of only one genre or it can be associated with both. Somehow this distinction relies on the perspective of the readers. Though it goes without arguing that Dracula is a masterpiece of Gothic literature. However, the primary argument represented here is whether or not Stoker's combination of scientific components with Gothic mystery and awe, as well as his application of contemporary science, the idea of an alternate universe, and the invasion of aliens, make Dracula a work of science fiction. Critics have different opinions on this matter. Historian and science fiction author Brian Aldiss supports that Dracula is not science fiction. In contrast to that a larger portion of Stoker's writing including *Dracula* would fall within Paul Fayter's concept of science fiction. According to him, science fiction is not merely restricted to future fiction, rather it is literature that deals with how science and technology paves the way for social change. Carol A. Senf argues that "For a work to be classified as science fiction, science and technology must be brought to the forefront as part of the issues in question. Furthermore, the science in science fiction must be somewhat speculative rather than an articulation of current science" (130).

Despite the fact that Dracula was published before science fiction was formally recognized as a genre, many of the main concepts and narrative elements it raises are revealed by the book. The work addresses existential threats, integrates science and superstition, and explores the alien invasion trope—all of which speak to the genre's fascination with the strange and unusual. The way science fiction and Gothic horror come together in *Dracula* emphasises how the lines between genres are not always fixed. The novel's themes of horror, otherness, and technological response delivers a notion in which several genres can interact and influence one another.

In spite of having so many debates, it is seen that *Dracula* meets some of these conditions. And the fact cannot be denied that *Dracula* delivers some of the major themes and ideas of science fiction too. Thus, the present study tries to interpret *Dracula* in a fresh perspective of the science fiction genre. Taking a closer look at *Dracula* from this angle may help us understand the story's significance for science fiction as well as its role in shaping the landscape of science fiction.

References:

Byron, Glennis. “Bram Stoker’s Gothic and the Resources of Science.” *Critical Survey*, vol. 19, no. 2, 2007, pp. 48–62. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/41556580. Accessed 1 Sept. 2024.

Hull, Keith N. “WHAT IS HUMAN? URSULA LEGUIN AND SCIENCE FICTION’S GREAT THEME.” *Modern Fiction Studies*, vol. 32, no. 1, 1986, pp. 65–74. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/26281850. Accessed 1 Sept. 2024.

Jacobsson, Lisa. *The Changing Role of Science in Frankenstein, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, and Dracula.* 2010. Linköping University, MA thesis. *Diva,*https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A422482&dswid=9936.

Jódar, Andrés Romero. “Bram Stoker’s ‘Dracula’. A Study on the Human Mind and Paranoid Behaviour / Drácula de Bram Stoker Un Estudio Sobre La Mente Humana y El Comportamiento Paranoide.” *Atlantis*, vol. 31, no. 2, 2009, pp. 23–39. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/41055362. Accessed 1 Sept. 2024.

MacLeod, Roy. “The ‘Bankruptcy of Science’ Debate: The Creed of Science and Its Critics, 1885-1900.” *Science, Technology, & Human Values*, vol. 7, no. 41, 1982, pp. 2–15. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/688927. Accessed 1 Sept. 2024.

Senf, Carol A. *Science and Social Science in Bram Stoker’s Fiction.* Greenwood Press, 2002.

Stoker, Bram. *Dracula.* Penguin Classic, 2003.

Tymn, Marshall B. “Science Fiction: A Brief History and Review of Criticism.” *American Studies International*, vol. 23, no. 1, 1985, pp. 41–66. *JSTOR*, http://www.jstor.org/stable/41278745. Accessed 1 Sept. 2024.

The Citizenship Amendment Act : Constitutional Challenges and Human Rights Concerns

Surya Kanta Datta
Research Scholar, Department of Political Science,
The University of Burdwan

Abstract : The Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019, a contentious piece of legislation in India, seeks to amend the Citizenship Act of 1955 by providing a pathway to Indian citizenship for non-Muslim refugees from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan who have faced religious persecution. While the government presents the act as a humanitarian measure, it has sparked significant debate due to its exclusion of Muslim refugees. Critics argue that this exclusion violates the principle of equality before the law, enshrined in Article 14 of the Indian Constitution, which guarantees equal protection of the laws to all individuals within India's territory.The act has also been criticized for potentially undermining India's secular fabric, a core value of the Indian Constitution. By basing citizenship eligibility on religious identity, the CAA is perceived as diverging from India's traditionally inclusive and secular approach to citizenship. The potential combination of the CAA with the proposed National Register of Citizens (NRC) has further raised concerns. Opponents fear that the NRC could be used to disenfranchise significant numbers of people, particularly Muslims, who may struggle to provide the necessary documentation to prove their citizenship, thus exacerbating their marginalization and risking statelessness.From a constitutional perspective, the CAA has been challenged for its alleged violation of Article 14 and the secular ethos of the Indian Constitution. Critics argue that the act discriminates based on religion, undermining the secular character of the Constitution, which requires equal respect for all religions. The act's selective application of citizenship is also seen as conflicting with international human rights standards, which emphasize equality and non-discrimination.The human rights implications of the CAA are significant, particularly concerning the marginalization of Muslim communities. The act's exclusion of Muslims, combined with the

potential implementation of the NRC, raises fears of large-scale disenfranchisement and the erosion of India's commitment to human rights. Critics warn that this legislative framework could lead to increased social unrest and division within Indian society, further straining the country's secular and inclusive fabric.

Key Word: Citizenship Act,Impact of the Citizenship Amendment Act on Minority Communities, NRC, Religions, Indian Constitution, National Register.

Introduction

A contentious piece of legislation in India, the Citizenship Amendment Act of 2019, aims to amend the Citizenship Act of 1955 by giving non-Muslim refugees from Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan who have experienced religious persecution a route to Indian citizenship. Opponents claim that the act discriminates against Muslims and transgresses the secular ideals of the Indian Constitution. Concerns about possible effects on India's secular fabric and the possibility of marginalizing vulnerable people serve to intensify the dispute.The principle of equality before the law has been questioned for being violated by the CAA's exclusion of Muslim refugees. Concerns have also been raised regarding the possibility that the CAA and the National Register of Citizens will be used to deny citizenship to a significant number of individuals, especially Muslims who might find it difficult to produce the required paperwork to verify their citizenship. The act's selective application of citizenship calls into doubt India's commitment to the equality and non-discrimination ideals inherent in international human rights standards. The emphasis placed by the CAA on religious identification as a requirement for citizenship is perceived as a divergence from the inclusive and secular culture that has historically defined Indian citizenship.

Statement of Objects and Reasons

The purpose of the Citizenship Act of 1955 was to establish Indian citizenship.

- There has historically been a problem with trans-border migration between Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan.

- These nations have seen persecution of several Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Hindu groups.
- People from these groups who entered India without proper travel authorization or with expired documentation are regarded as illegal immigrants.
- The Passport (Entry into India) Act of 1920 and the Foreigners Act of 1946 have been waived by the Central Government, protecting these migrants from unfavourable consequences.
- The purpose of the proposed reforms is to offer Indian citizenship to these migrants.
- For illegal immigrants who arrived in India before December 31, 2014, there is a unique system in place to handle citizenship issues.
- The goal of the measure is to give these migrants immunity so that, should they satisfy all requirements, they can apply for Indian citizenship.
- The ability of the Central Government to cancel an overseas citizen of India card registration due to legal infractions.
- The law suggests giving Indian citizens residing abroad a hearing prior to card cancellation. The Constitution provides safeguards to indigenous people living in the Northeastern States. The bill seeks to maintain legal protections for areas under the "Inner Line" system of the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873.[1] (The Citizenship Amendment Bill, 2019).

Constitutional Challenges

The Citizenship Amendment Act (CAA), 2019, amends the Citizenship Act of 1955 to grant Indian citizenship to religious minorities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians) from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan who entered India before December 31, 2014. One of the primary constitutional challenges to the CAA is its alleged violation of Article 14 of the Indian Constitution, which guarantees equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. Critics argue the Act discriminates based on religion, undermining the secular fabric of the Constitution. The CAA also contravenes the secular ethos of the Constitution, which requires a balanced relationship with all religions. Further challenges are based on

the potential impact of the CAA when read in conjunction with the proposed National Register of Citizens (NRC). The combination of these two policies could, according to opponents, lead to the marginalization and disenfranchisement of certain communities, particularly Muslims, thereby exacerbating religious polarization in the country. The government defends the CAA as a humanitarian measure to protect persecuted minorities, arguing it does not violate the Constitution. The Supreme Court of India is currently scrutinizing the CAA's constitutionality, determining its alignment with the principles of equality, secularism, and justice[2] (Choudhary, 2020).

1.Violation of Secularism

The Indian Constitution's secular aspect is purportedly violated by the CAA, which is one of the main constitutional objections to it. The Indian Constitution forbids discrimination on the basis of caste, religion, sex, or place of birth (Article 15). Critics contend that the Act violates the secular values contained in the Constitution by specifically barring Muslims from receiving the benefits of the CAA[3] (Khan, 2020).

The probable compliance of the 2019 Citizenship Amendment Act (CAA) with the secularism concept of the Indian Constitution has been a subject of controversy. While the CAA selectively provides citizenship to non-Muslim immigrants from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan while excluding Muslims, secularism demands equal respect for all religions. Critics contend that this discrimination weakens the secular fabric of the country and breaches the secular spirit of the Constitution. The Preamble's secular nature and the constitution's guarantee of equality before the law are incompatible with the exclusion of Muslims. The Basic Structure Doctrine, a legal precept that safeguards the core elements of the Constitution, including secularism, is another topic of discussion in this debate[4] (Sharma, 2020).

2.Conflict with the Fundamental Right to Equality

The Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019 has drawn a lot of criticism because it is thought to violate Article 14 of the Indian Constitution's Fundamental Right to Equality. No one shall be denied "equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India," according to Article 14's promise. It has been claimed

that the CAA introduces a discriminatory criterion based on religion by specifically omitting Muslims from the list of religious groups eligible for citizenship through its provisions, breaking the principles of equality and secularism.[5] (Bhatia, 2020).

3.Impact on the National Register of Citizens (NRC)

India's 2019 Citizenship Amendment Act (CAA) has been the subject of intense constitutional discussions. Given that the CAA grants citizenship based on religion, one of the main constitutional objections against it is that this may violate the fundamental right to equality guaranteed by Article 14 of the Indian Constitution. Critics claim that the Act discriminates against Muslim immigrants and refugees by accelerating citizenship for non-Muslim minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan.[6] (Sinha, 2020).

The impact of the CAA and the National Register of Citizens (NRC) on India's secular fabric has been questioned. The NRC, which attempts to identify illegal immigrants, may disproportionately affect Muslim citizens who might not have the necessary documentation to prove their citizenship. The NRC and the CAA may result in the exclusion of a significant number of Muslims from the citizenship list, making them stateless.[7] (Bhargava, 2021).

More constitutional questions have been brought up by the CAA's possible connection to the National Register of Citizens (NRC). The NRC seeks to locate and remove undocumented immigrants from Assam. Critics worry that if the CAA and NRC are combined, many lawful citizens—Muslims in particular—may be excluded, which would result in a large-scale loss of citizenship and statelessness.[8] (Verma, 2021).

Human Rights Concerns

The Indian Parliament enacted the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019, which has generated discussion and raised concerns about its effects on human rights. The Act seeks to grant non-Muslim refugees who have experienced religious persecution in Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan Indian citizenship. Millions of Muslims in India may become stateless and marginalized as a result of the CAA and the planned National Register of Citizens, according to critics. Concerns regarding the CAA's potential to deepen societal divides and erode India's

commitment to human rights are also voiced by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights.

1.Marginalization of Muslim Communities

Serious human rights concerns have been raised by the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019, especially in light of the marginalization of Muslim populations. With a clear exclusion of Muslims, the Act gives religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan a route to Indian citizenship. Many have claimed that this discriminatory clause contradicts both international human rights norms and the secular values established in the Indian Constitution, which has led to significant condemnation of it. Opponents argue that the CAA, in conjunction with the National Register of Citizens (NRC), unfairly singles out Muslims, worsening their marginalization and increasing their risk of becoming stateless.[9] (Human Rights Watch, 2020). Muslim communities in India are experiencing increased worries of religious persecution as a result of this legislative framework, which is seen as discriminatory.[10] (Amnesty International, 2020).

2.**Impact on Refugee Rights**

There are serious concerns about how the Citizenship Amendment Act (CAA) of 2019 would affect the rights of refugees in India. Though it excludes Muslim migrants, the Act gives non-Muslim refugees from nearby countries a route to citizenship, raising concerns about religious discrimination and its compliance with international human rights norms. The Act's selective nature erodes the fundamental tenet of refugee protection—that of non-refoulement. Critics contend that the CAA may worsen minority populations' marginalization and result in the disenfranchisement of vulnerable groups, mainly Muslims[11] (Bhattacharya, 2020). The aforementioned legislation poses a threat to India's enduring secularism legacy and its adherence to international human rights accords[12] (Jain, 2021).

3.**Potential for Social Unrest**

The Indian Citizenship Amendment Act (CAA) has generated controversy because of its possible effects on human rights, especially with regard to its discriminatory character based on religion. Opponents contend that the CAA may isolate Muslims, causing discord and division

in society. Fears of mass disenfranchisement are also heightened by the projected National Register of Citizens (NRC), especially for Muslims. Protests and civic unrest have been triggered by the possibility of statelessness for those who are unable to establish their citizenship.[13] (Sen, 2021).

Conclusion

The Citizenship Amendment Act (CAA), 2019, amends the Citizenship Act of 1955 to grant Indian citizenship to religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan who entered India before December 31, 2014. Critics argue that the CAA violates Article 14 of the Indian Constitution, which guarantees equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India. They argue that the Act discriminates based on religion, undermining the secular fabric of the Constitution.The probable compliance of the CAA with the secular concept of the Indian Constitution has been a subject of controversy. Critics contend that this discrimination weakens the secular fabric of the country and breaches the secular spirit of the Constitution. The Basic Structure Doctrine, a legal precept that safeguards the core elements of the Constitution, including secularism, is another topic of discussion in this debate.TheCAA has drawn criticism because it is thought to violate Article 14 of the Indian Constitution's Fundamental Right to Equality. Critics claim that the Act discriminates against Muslim immigrants and refugees by accelerating citizenship for non-Muslim minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan while excluding Muslims. The impact of the CAA and the National Register of Citizens (NRC) on India's secular fabric has been questioned.

Human rights concerns have been raised by the CAA, particularly in light of the marginalization of Muslim populations. The Act gives religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan a route to Indian citizenship, which many have claimed contradicts both international human rights norms and the secular values established in the Indian Constitution. Critics argue that the CAA may worsen minority populations' marginalization and result in the disenfranchisement of vulnerable groups, mainly Muslims.

Lastly, the CAA has generated controversy due to its potential effects on human rights, especially with regard to its discriminatory character based on religion.

References

1. The Citizenship Amendment Bill, 2019, No.33/ln/ref./December/2019, Govt. of India. New Delhi; the 4th December, 2019.
2. Choudhary, S. (2020). *The Citizenship Amendment Act: Constitutional Challenges and the Question of Secularism.* Indian Law Review, 4(2). PP. 123-145.
3. Khan, M. (2020). *Secularism and the Citizenship Amendment Act: A Legal Analysis*. Indian Law Journal, 29(1). PP. 40-50.
4. Sharma, M. (2020). *The Citizenship Amendment Act: A Constitutional Analysis*. Oxford University Press. PP. 67.
5. Bhatia, G. (2020). *Equality before the law and the Citizenship Amendment Act*. Indian Journal of Constitutional Law, 8(2). PP. 215-234.
6. Sinha, M. (2020). *Constitutional dilemmas in India: The Citizenship Amendment Act and its aftermath.* Oxford University Press. PP. 45.
7. Bhargava, R. (2021). *The Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizens: A threat to secularism in India?* Cambridge University Press. PP. 123.
8. Verma, V. (2021). *The NRC and the CAA: Constitutional Implications and Human Rights*. Legal Studies Review, 22(2). PP. 60-70.
9. Human Rights Watch. (2020). *"Shoot the Traitors": Discrimination Against Muslims Under India's New Citizenship Policy*. Human Rights Watch. PP. 18.
10. Amnesty International. (2020). *The Human Cost of the Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens: Muslim Communities at Risk*. Amnesty International. PP. 12.
11. Bhattacharya, S. (2020). *The Citizenship Amendment Act: Implications for Refugee Rights in India*. Journal of South Asian Studies, 12(2). PP. 54-60.
12. Jain, A. (2020). *The Impact of the Citizenship Amendment Act on Minority Communities*. South Asian Studies, 18(4). PP. 98-105.
13. Sen, A. (2021). *Social unrest and the Citizenship Amendment Act*. Human Rights Quarterly, 43(1). PP. 89-110.

Jagat Seths : A Historical Review on Monopolistic Dominance Over Mercantile Economy of Eighteenth Century Murshidabad

Atriya Sarkar
Research Scholar, Department of History
University of Kalyani.

Abstract : The tenure of Murshid Quli Khan as *diwan* of Bengal and later as the Nawab of Bengal represents a pivotal epoch for experimentation on Bengal economy. Murshid Quli Khan, the *diwan* of Bengal, shifted the capital of *Suba* Bengal along with the headquarter of *diwani* from Dacca to Murshidabad. He was accompanied by Manikchand Shah, a great banker, and other key officials. During his *Nawabi* rule, Murshidabad developed into a major centre of *suba* Bengal's mercantile activities for both Indian and foreign merchants. The period also witnessed a substantial expansion of banking and credit systems. During this period some merchant princes, especially the house of Jagat Seths, with its extensive network of branches across the province's key trade centres, played a significant role in the institutionalization of banking in Murshidabad. Modern Indian history lamented Jagat Seths as a protagonist of the conspiracy of Plassey. Still Jagat Seths played a very influential role in the growth of trading activities of *suba* Bengal. This paper intends to explore the influential role of Jagat Seths on the economic activity of eighteenth century Bengal.

This issue of eighteenth century Bengal's economy is particularly fascinating, focusing on the rise of a business house that managed to establish a monopoly over one of the wealthiest and largest provinces of the era. Historians often portray Jagat Seths as a key player in the conspiracy of Plassey, yet his influence on the expansion of trading activities in *suba* Bengal remains significant. This paper seeks to examine Jagat Seth's profound impact on the economic landscape of the eighteenth century.

Keyword: *Diwani*,Mint, Merchant Princes, *Suba*, *Kuthi*, *Hundi*, shroff, Banking Houses, *Nagar Seth.*

Murshidabad was intricately linked to the political and economical events that transpired in eighteenth century Bengal.[1] Murshidabad served as the ultimate capital of Bengal-Bihar-Orissa,also known as *suba* Bengal, during the pre-British era. Throughout the seventeenth and eighteenth century Murshidabad epitomized a profoundly urbanized locale within the contemporary landscape.[2] Murshidabad was situated on the main line of communication between the upper Ganges valley and the Bay of Bengal along which the activities of the European traders were vigorous. It also commanded the European settlements along the banks of the Bhagirathi and Hooghly rivers.[3] During Jahangir's reign this place became well known for silk and silk fabrics. Along with Kashimbazar, the most important silk manufacturing station in the area, it continued to grow in importance during the second half of the seventeenth century and eventually became an administrative station. It was also a mint town from 1679.[4]

In 1704, Murshid Quli Khan, the *diwan* of Bengal, transferred the *diwani* headquarters from Dacca to Murshidabad.[5] After his arrival at Murshidabad he improved the town. He took with him from Dacca all the revenue officials and some of the richest merchants and bankers who settled in different parts of the district. The bankers and other trade financiers opened their head offices in the city. In the first half of the eighteenth century, the commercial life of Bengal and,to a great extent, its economy were dominated by the three merchant princes namely, banking house of Jagat Seths, the well known Umichand and the Armenian merchant Khwaja Wazid.[6] Among them the house of the Jagat Seths 'the banker of the world' [7] played a pivotal role in Bengal's trade and politics during the eighteenth century.[8]

We have seen that Murshidabad rose from the position of a small market town to be the headquarters of Bengal. But in becoming the capital of the province, it did not cease to be a commercial centre. By the beginning of the eighteenth century its importance as the centre of the silk trade was already established. Several important centres, for the

manufacture and distribution of silks, flourished in the district, of which the principal were Murshidabad city itself, Kashimbazar, Saidabad and Jangipur. These places attracted many foreign traders.[9]

The trade of the district of Murshidabad was facilitated by its command over the trade routes up and down the Ganges and these Inking the chief cities of Bengal. The great river highways of the district, their tributaries and canals, Murshidabad was unusually well placed for both internal and external trade. Notably, the organizational structure of banking in Murshidabad featured a noteworthy role played by indigenous establishments, with the prominent Jagat Seths house standing out, having established branches in key trade centres across the province. These entities came to be colloquially referred to as the 'Rothschild's of the East'.[10]

A primary revenue stream for the banking establishment emanated from the minting of bullion and species imported by European companies into Bengal to facilitate payments for their exported commodities. Another lucrative avenue for the seths involved extending loans to companies perennially grappling with cash shortages. The European enterprises readily sought financial assistance from the Jagat Seths' *kuthees* (agencies or branches) located in key cities such as Calcutta, Kashimbazar, Dacca, Hooghli, and Patna. In the early 1750, Robert Orme, who was present in Bengal, lauded the Jagat Seths as 'the greatest shroff and banker in the world'.[11]

European enterprises freely borrowed funds from the *kuthi* of the Jagat Seths.[12] The progenitor of the esteemed Jagat Seths house, renowned as the "banker of the world"[13] was the eminent merchant Manikchand Shah. He migrated from Patna to Dacca, presumably in the early eighteenth century, establishing a firm there. Upon Murshid Quli Khan relocating his capital to Murshidabad, Manikchand accompanied the court to the new seat of power. The significance of Manikchand is underscored by the fact that, during the succession strife in 1712 when Azim-us-Shan declared himself emperor, Manikchand and his nephew were bestowed with an elephant each, along with a siropa from the State, in recognition of their support. In Murshidabad, Manikchand earned favor as the Nawab's preferred banker and advisor, a testament to his standing.

Emperor Farrukhsiyar sought financial assistance from Manikchand to fuel his undertakings, leading to the latter's recognition in 1712 with the title of *Nagar Seth*, denoting a city banker. By the time of his demise in 1714, the banking house had firmly entrenched itself, and under his successor Fatehchand, it attained genuine greatness. The title of Jagat Seth, conferred by Emperor Mahmud Shah in 1723,[14] elevated the house to a unique and paramount position in the country. Jagat Seth emerged as the most influential private individual in Murshidabad.[15]

The residence of Jagat Seths emerged as the focal point of commercial credit. Existing documents make mention of the East India Company's loans, the reimbursement of loans, as well as the trade and acquisition of bullion and other transactions conducted in association with the house of Jagat Seths.[16] The Jagat Seth's residence boasted establishments strategically positioned in key cities across northern India, spanning from Dacca to Delhi. Consequently, the credit instruments which they issued were commonly known as *hundis, enjoyed* considerable popularity and also in high demand.[17] It issued bills for varying amounts, enabling transactions to be conducted through its numerous branches. Consequently, merchant capital commenced accumulating, transforming Murshidabad into the epicenter of the nation's wealth.[18] The domicile of Jagat Seths functioned as the recipient and custodian of government revenues in Bengal. Commencing with the era of Murshid Quli Khan, the Jagat Seths progressively assumed the role of collateral for a substantial portion of the rents. Defaulting *zamindars* were mandated by the Nawab to direct their revenues to the Jagat Seths. The financial institutions and other trade financiers established their principal offices in the city. These banking establishments, notably the Jagat Seths house, executed the paramount financial transactions of the Government of Bengal. The land revenue payments from *zamindars* and farmers were channeled through these bankers, serving as conduits through which the Nawabs of Bengal remitted the annual revenue to the Mughal Court. Additionally, they held positions as officials of the mint in Murshidabad.[19] Their command over the mint also translated into authority over the acquisition of foreign bullion imported into Bengal.[20]

The English East India Company had persistently pursued the acquisition of minting privileges for an extended period. The Kashimbazar Council was entrusted with the task of securing these privileges from the Nawab . Despite negotiating with prominent officials of the *durbar*, the Council received discouraging information. It was conveyed that due to Futtichund's significant influence with the Nawab, there was little hope of obtaining the grant. Futtichund held exclusive control over the mint, and no other shroff or merchant dared to purchase or coin even a rupee's worth of silver. [21]

The household of the Jagat Seths evolved into a quasi-institution, particularly from the forties of the eighteenth century, serving as a guiding force for the conduct of merchants, shroffs, and bankers. On June 7, 1742, the Kashimbazar Council reported that, following Jagat Seths withdrawal from Murshidabad due to the Maratha invasion, a prevailing sentiment existed among merchants and shroffs. They believed that the city would not be secure until Jagat Seths resumed residence there.[22] The Nawab sought Jagat Seth's return to the city, emphasizing that his presence was indispensable not only to the Nawab but also to the merchants. Furthermore, Jagat Seth's conduct served as the overarching guide for all involved parties.[23] On the 14th of June 1742, it was observed that the merchants returned from their places of refuge following the arrival of Jagat Seths[24] in the city. Luke Scrafton made an estimate of annual income of the Jagat Seths in 1757.[25]

Table:

The Jagat Seths' Estimated Annual Income, 1757 (Rupees)

On 2/3 of revenue at 10%	10,60,000
Interest from zamindars at 12%	13,50,000
On recoining 50 lakhs at 7%	3,50,000
Interest on 40 lakhs at 37 1/2%	15,00,000

Interest from Batta or Exchange rates 7 to 8 lakhs	7,00,000
Total	49,60,000

Source:Chaudhury,Sushil,1995,*From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal*, Delhi, Manohar Publisher, p.115.

The influence over the currency and government finance which the indigenous bankers gained under the Nawabs of Murshidabad continued throughout the period of currency reform during the early British. But they could not retain the full power and influence they had exercised during the pre-*diwani* period.[26] But as the century advanced most of these banking houses declined as their sources of income dried up. The reduction of the house of Jagat Seth which had held a unique position in the country and played such an important part in the economic life of Murshidabad and the whole province, to minor importance following the grant of *diwani* in 1765 may be taken as illustration of the general trend.[27] Jagat Seth's connection with the mint at Murshidabad was so profitable to them that they were naturally hostile to the establishment of a mint at Calcutta which would have diminished their wealth.[28] Despite that, the greatness of the house began to decline rapidly after 1765. The Jagat Seths withdrew their branches from different places owing to the wars and disorders that followed the decay and disintegration of the Mughal empire. The trend of the Seth's downfall began when Mir Kashim put two of the most influential members of their family to death.[29]

References:

1. O'Malley, L.S.S., 1997, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad,* Calcutta, Govt. of West Bengal, p.1.
2. Bhattacharya,Birendra Kumar (ed.),1979,*West Bengal District Gazetteers:Murshidabad*, Kolkata, Government of West Bengal, p.97.
3. Mohsin, Khan Mohammad, 1973, *A Bengal District in Transition:Murshidabad 1765-1793,* Dacca, The Asiatic Society of Bangladesh, p.5.

4. *ibid*, p.4.
5. Bandapadhaya,BijoyKumar,& Others(ed.),2003,*Murshidabad Zilla Gazetteer, West Bengal District Gazetteers, Murshidabad*, West Bengal Government, p. 107; Karim, Abdul,1963, *Murshid Quli Khan and His Times,* Pakistan, The Asiatic Society, .pp.20-21.
6. Chaudhuri,Sushil,1995,*From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal,* Delhi, Manohar Publisher, p.109.
7. Mitra,Asok(ed.),1953, *Census of India 1951, West Bengal District Handbook: Murshidabad,* Calcutta, Govt. of West Bengal, p. lxviii.
8. Mohsin, Khan Mohammad, *op.cit.*, p.6.
9. *ibid.*
10. C haudhuri,Sushil,2008, *Nababi Amole Murshidabad* (In Bengali), Kolkata, Ananda Publication, p.37.
11. Chaudhuri,Sushil,1995, *op.cit.*,p.109.
12. Raychaudhuri Tapan & Habib, Irfan (ed.),1987,*The Cambridge Economic History of India;* Vol-I. c. 1200-c.1750., Cambridge,Cambridge University Press, p.341.
13. Roy, Nilkilnath, 1982, *Jagat Seth*, (In Bengali) Calcutta, Pragyabharati, p.15.
14. Bandapadhaya,BijoyKumar,&Others(ed.),2003, *op.cit.,* p. 107.
15. Karim,Abdul, 1963, *op.cit.*, pp.98-100.
16. Sinha.N.K.(ed.),1981,*The Economic History of Bengal from Plassey to Permanent Settlement;* Vol-1, Calcutta, Firma KLM Pvt. Ltd, p.149.
17. *ibid.*, p.151.
18. *Krishnath College 150 years Commemoration Volume 1853-2003*,Part-I,2003,Berhampore: Krishnath College Commemoration Volume Committee, p.3.
19. Roy, Nilkilnath, *op.cit.*, p.15.
20. Mohsin,Khan Mohammad, *op.cit.*, p.10.
21. Chaudhuri, Sushil, 1995, op.cit.,p.111.
22. *ibid.*, p.112.
23. Chaudhuri,Sushil,2008, *op.cit.*, p.36.
24. Chaudhuri,Sushil,1995, *op.cit.,* p.113.

25. Chaudhuri, Sushil, 1995, op.cit.,p.114.
26. Mohsin,Khan Mohammad, *op.cit.*, p.140.
27. *ibid.*, p.141.
28. *ibid.*, p.142.
29. *ibid.*, p.143.

Uprooted, not tamed : Revisiting the experiences of refugees of East Pakistan through the prism of literature

Arnab Bhattacharyya
Assistant Professor, Department of English,
Saheed Nurul Islam Mahavidyalaya,
North 24 Parganas, West Bengal

Abstract: Apart from the sense of loss and estrangement, the tremendous effort that the Bengali Hindu refugees put in to recast their lives in new modes of existence forms the core of several literary texts in Bengali. The trauma of being uprooted from one's birthplace and forcefully thrown into a vast abyss of uncertainty and insecurity has been negotiated by these masses with tremendous zeal and determination. Literature on Partition of India, in the process of recording the trauma and the triumph of the homeless people, interrogates the official positions on this momentous event. Many among these works expose the insensitive attitude of the government that was brought to power by the sacrifices of countless people. However, the way the refugees showed resilience and asserted their rights has influenced the socio-political milieu of West Bengal in a significant way. Literary texts in Bengali address this phenomenon and show how refugees tried to rebuild their lives in midst of adversities.
Keywords: Partition, refugees, uncertainty, zeal, resilience.

Introduction

Partition of India brought about human misery on a colossal scale with millions bereaved, destitute, homeless and hungry.[1] Despite promises given by the political leaders in India, the uprooted people, in general, faced tremendous financial hardship and suffered from a profound identity crisis. The refugees were regarded as a burden on the newly independent state by an unsympathetic bureaucracy. Especially the migrants from East Pakistan faced brutal indifference as well as hostility from the government. Yet, despite seemingly insurmountable odds, they

tried to resettle themselves and recreated their lost home wherever possible. Official narrative of Partition neither captures the sense of loss, trauma and bewilderment associated with the mass-exodus nor the refugees’ struggle for re-structuring lives despite an overwhelming sense of identity-crisis and insecurity in an unknown land. It also glosses over the antagonism between the state and the refugees, especially in West Bengal. These gaps in official historiography are filled by literary representations of the struggle of the refugees in the wake of Partition. Literary works throw light on different aspects of the refugee experience ranging from sense of dislocation to struggle for securing rights. This paper seeks to explore some literary narratives in Bengali that dwell on the rehabilitation and settlement of refugees and present a multi-layered saga of resistance and survival in post-Partition India.

Literary Portrayals of the Resilience of Refugees

Refugees are ordinary people in extraordinary circumstances requiring and deserving other's support in their struggle for rebuilding lives. However, in reality refugees from East Pakistan did not get adequate assistance from the government. A critic has rightly observed, ‘…The Bengali refugees too showed tremendous dynamism and zeal, but there was no matching effort on the part of the state to rehabilitate them… whatever rehabilitation took place in the province was largely self-rehabilitation by the refugees' [2]. Refugees from East Pakistan took upon themselves the task of settling themselves on vacant lands, abandoned buildings or military barracks as an apathetic government turned a blind eye to their misery and suffering. Several Bengali novels and plays on refugee lives have aesthetically treated the struggle of millions of uprooted people for finding a roof over their heads. Refugees occupied wastelands in the suburban areas of Calcutta and made the marsy lands habitable by their tireless efforts. They resisted the attempts of police as well as thugs hired by land speculators to evict them from the colonies. The struggle for finding a home was fraught with numerous difficulties and the refugees faced batons and bullets by the police.

Ritwik Ghatak, the renowned filmmaker who depicted the plight and resilience of refugees on the silver screen, has narrated the struggle of refugees in *Dalil*, a five-act play. Here he delineates how refugees set up

a colony in a dilapidated military barrack. These colonies were termed as squatters' colonies (or "Jabardakhal" colonies in Bangla) as the refugees' occupation of the land was unauthorized. The need of finding a shelter was compulsive though the government was not sincere about it. The refugees, compelled by the irresistible pressure of circumstances moved along a course, which was not legal but necessary. Most of these lands were marshy and barren, lying unused. The refugees made those lands habitable by their hard labour. The Government of West Bengal stepped in, not to provide shelters to hapless refugees, but to protect the interests of the landowners who hoped to reap huge profit out of land speculation, the Government of West Bengal brought out Gazette notification directing the squatters to vacate the land in their unauthorized occupation within 15 days or face forcible eviction.[3] Later Government introduced Eviction Bill in the State Assembly. It was followed by extensive debates on the floor of the assembly as well as angry protests on the streets.

Dalil reflects the anger of the refugee masses who took part in protest marches against the insensitive attitude of the government. They called the national leaders traitors as they turned their faces from the plight of the dislocated masses. The struggle of the refugees in the squatters' colonies was a story of terrible suffering, great courage, initiative and creativity of a huge number of people who emerged from the shadow of a nightmarish existence into a meaningful collective life. The play recreates the inhuman conditions in which the refugees had to live on the platform of Sealdah station. They believed that those who agreed to such terms of freedom had a moral responsibility to ensure the well-being of the uprooted masses. Therefore, they hoped that the government of independent India would listen to their tales of suffering. They never imagined that bullets and tear-gas shells would be fired to disperse the refugees who had gathered for marching towards' the Governor's House. Haren Pandit and Mahinder, characters in *Dalil* were shocked to witness brutal police action on hungry and dispossessed refugee masses. Arun Malakar, one of the hapless refugees from East Bengal, had been carrying a deed of his lost property since his arrival on Sealdah station. He was extremely hopeful about getting compensation if his material losses. Having watched the cruelty with which refugees were

tortured, he realized that the Government would never compensate him. Overcome with rage, he screamed, 'Who is the enemy? One day I will find him and will tear him apart'[4]. Arjun Malakar was shot to death by the police as he rushed outside the platform to join the procession of refugees.

Sunil Gangopadhyay's novel *Arjun*, published in 1971, is a major literary text on Partition that focuses on the life in a squatters' colony set up by occupying a large tract of land walled off from its surroundings near Dumdum. The refugees named it 'Deshpran colony'. The inhabitants of Deshpran Colony did not face any resistance from either the establishment or the actual owner of the plot at the initial stage. The colony committee distributed plots among the displaced families coming from different parts of erstwhile East Pakistan. It became an urban refugee settlement with a rural ambience as the dwellers of the colony tried to recreate their lost homeland in this urban space. The refugees tried hard to rise above the crippling economic crisis and took up any job they found. Even a meritorious student like Arjun had to forsake the idea of studying, at least, for the time being. He worked as a waiter in a teashop. His mother finally took the entire responsibility of running the family with her small income as a seamstress. Arjun resumed his studies and earned laurels as a brilliant student. However, he did not shy away from the problems of his neighbours in the colony. When Kewal Singh, the owner of a plywood company conspired to uproot five families in the colony and to take over their land he protested.[5] Kewal Singh's henchmen who happened to be some misguided refugee youth from the same colony, stealthily set fire to five houses , reducing them to ashes, and made the dwellers homeless for the second time. This atrocity terribly enraged Arjun who shook off his initial doubts and like his mythical namesake fought valiantly to emerge victorious.

The struggle of the homeless people from East Pakistan to set up their own colonies occupies a significant space in Sabitri Roy's novel *Swaralaipi(Musical Notes)* which was published in 1952. One of its themes is the struggle of refugees to bring back dignity to their lives. The refugees who settled in abandoned military barracks, deserted houses and wasteland had to defend their newly built homes from the assault of

police and hired goons of landed magnates. There is a detailed description of a violent assault on a refugee colony in this novel. Assisted by the police, the hoodlums attacked the residents of the colony. They set fire to thatched houses and razed many of them to ground. Even old and infirm men and women were not spared. The police shot Tulsi, a refugee youth to death. Instead of chasing away the criminals, the men in uniform acted as killers and arrested refugee settlers . The novelist shows how nexus between land speculators, political leaders, criminals and police resulted in worsening of the plight of refugees. Savitri Roy's novel situates the predicament and struggle of the refugees in the context of growing discontent of people against the misrule of the then provincial government which protected the rights of the rich landowners and remained indifferent to the grinding poverty of millions of tillers.It was an era when people were denied of their basic rights. Quotas in ration-shops decreased without paying slightest attention to the misery of the masses. On the other hand, black marketeering thrived with the connivance of the administration. Government was not ready to tolerate any manifestation of dissent. Sabitri Roy depicts in her novel how police attacked a small procession of young women including school going girls in Kolkata. The response of the government towards the legitimate demands of the refugees was harsh as well.

Salil Sen's play *Notun Ihudi*, published in 1951, exposes the cruelty and apathy with which government treated the hapless refugees from East Pakistan . The play depicts the plight of refugees taking shelter in railway stations. The following conversation between a government volunteer and members of a refugee family amply demonstrates the apathy of the bureaucracy towards these disposed people:

Volunteer: You can't stay here. Either you have to go to the camp, or empty the station. Beside , you won't get rice.

Duikha: What fine rice! Half of it is nothing but stones. And you are threatening to stop it.

Volunteer: You have become arrogant feeding on free rice. A strong young man like you, sitting idle. Can't you get some job? Do you suppose you will be able to live on relief all your life? God knows what will happen to you.

Mother: Don't mind him my son. He's just a fool. We will go away as soon as we get a house. Just have pity on us for a few days.[6]

Pressurized by a pitiless government, refugees started a frantic search for a shelter and crooks often trapped them. Keshto, the sharecropper who left East Pakistan along with the Bhattacharyya family got robbed of three hundred rupees, a large sum of money in those days, by some frauds who promised to help him buy two bighas of land with that amount of money. Manmohan Bhattacharyya, the patriarch of a refugee family, finally managed to find a rented room for his family at a price much higher than what the other tenants in the house used to pay. Steep rise in the cost of living and the unhygienic environment of the slum where they stayed made life miserable for the Bhattacharyya household. Besides, the male members were yet to find suitable jobs. Manmohan and his youngest son Mohan went from pillar to post in search of employment. Mohan came to know that his family members were entitled to a monetary grant from the government as his eldest brother died in British prison as a freedom fighter. He collected the application form and asked his father to fill in the form, so that they could seek financial help from the government. In spite of the deepening economic crisis, Manmohan Bhattacharyya was reluctant to ask the government for financial assistance on the ground of his son's martyrdom. It seemed to him like putting a price on his son's selfless sacrifice for the long-cherished freedom of his motherland. The play shows how idealism survived even in midst of poverty, hunger and unemployment. Monmohan Bhattacharya, despite his old age, tried to earn money by helping a Brahmin cook and his son Mohan sold handkerchiefs to earn a living. They shed their middle-class prejudices in and joined the ranks of the working people.

Notun Ihudi brings into focus the transformation of the refugees into members and sympathizers of the working class. Mohan got a job at a factory where retrenched workers were on strike. The trade-union leader Mahendra appealed to him to renounce the job. The conversation between Mahendra and Mohan refers to important socio-political issues of that time. Mahendra accused Mohan of being a traitor as his acceptance of the job would weaken the solidarity of the workers, which

was the precise goal of the profit-mongering mill-owners. Mohan understood the implications of accepting the job but confessed his helplessness. He vented his ire at the national leaders who betrayed the refugees. Mahendra sympathized with the plight of the refugees. However, he reiterated that Mohan's decision was immoral. This charge of immorality resonated with deeper significance in the context of several compromises that the refugees had to make in order to eke out a living. Mohan angrily reacted to this accusation as he had personally resisted all temptations of earning money by dubious means. He asserted that refugees were victims of circumstances. Mahendra shared Mohan's agony and gradually the two men's opinions on society and the unhindered exploitation of the masses converged. However, despite the passionate appeal of Mahendra Mohan refused to renounce the job. Then Mahendra made a final attempt by reminding him of his brother's martyrdom in British prison. He asked: "Then why are you, as his brother, accepting servility? Why don't you try to make an organized movement successful? Why? Why should one take advantage of your poverty to deprive others?" [7] Mohan's inner idealism surged up and he agreed to reject the offer of a job. Ritwik Ghatak's play *Dalil* has a similar incident where Mahinder, a refugee from East Pakistan, expressed solidarity with the workers on strike and did not accept the job since he felt that this would be a betrayal of the workers' cause. These literary portrayals indicate that a section of the refugees started viewing themselves as sections of the toiling masses and started getting conscious about their class-identity. The redrawing of the contours of their class identity made the Government more hostile towards the refugees.

Prafulla Roy's novel *Nona Jal, Mithe Mati (Salty water, Sweet Soil)*, published in 1983, captures the struggle of the uprooted men and women of East Pakistan to rebuild their lives on the desolate island of Barodiglipur in North Andaman. The dense forests, misty nights and all--pervading stillness of the Andaman Islands were a mystery to them. Gradually they were able to shed fear and started facing the challenges of life there. It is interesting to note that the novelist does not criticize the decision of the Government to send the Bengalee refugees to the distant Andaman Islands. Rather he considers it as an opportunity to the refugees

to start a new phase of life. Basini, an old refugee woman encouraged the refugees to think of life in positive terms. She became a source of inspiration for the other refugees. They initially thought that they were doomed forever in the wilderness of the Andaman forests. When they found the soil there fertile and rivulets filled with different kinds of fish, they slowly gathered inner strength. Pal Sahab, the colonizing Assistant, distributed land among the refugee households and acted not as their master but as their friend and guardian. Undergrowth of weeds made farming extremely difficult for the refugee settlers. When they did not get any help from government, they bought cows and ploughs from the settlers at Rangat with their own hard-earned money. Old Basini donated her gold chain, kept as a souvenir of her married life. Other refugees contributed a portion of the cash dole they got from the government. The refugees transformed the island's landscape with their hard labour. They emerged as the makers of their own destiny.

Conclusion

There has always been a tendency on part of the government to judge the refugees as 'objects' of charity. This refusal to acknowledge their subject positions has been challenged by the literary texts on Partition. These creative texts bear testimony to the subjective agency through which the refugees altered the pattern of their existence. The way they asserted their rights has influenced the socio-political milieu of West Bengal in a significant way. Literary texts in Bengali address this phenomenon and show how refugees tried to undo the effects of Partition in their quest for home and identity.

References:

1. After Partition. Modern India Series – 7, Issued by The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1948, Delhi, p.50.
2. Tai,Yong, Tan, and Kudaisya, Gyanesh,(eds.), 2000, The Aftermath of Partition in South Asia, London& New York, Routledge, p.161

3. Chakraborty,P,K., 1990. *Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal,* Kalyani,West Bengal, Lumiere Books p.154
4. Ghatak, Ritwik, 2008. *Dalil,Ritwik Ghataker Nataksangraha*, Paschimbanga Natya Akademy, Kolkata, Dept. of information and Culture, Govt. of West Bengal, p.100.
5. Gangopadhyay, Sunil, 2003. *Arjun,Sunil Gangopadhyay Uponayas Samagra*, Vol 3, Kolkata, Ananda Publishers, p.245
6. Sen, Salil. 2002, *Notun Ihudi,* Kolkata. Dey's Publisher, pp.32-33.Translated version taken from Bagchi, Jasodhara, Dasgupta,Shubhoranjan(eds), 2007, *The Trauma and the Triumph*, Kolkata,Stree, p.210.translation by Sudeshna Chakraborty.
7. ibid,p.66.

The Sea port of Gwadar : Security Implication for India

Sanjay Biswas
Assistant Professor, Department of Political Science,
Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip

Abstract: Gwadar port is an important sea port located in Pakistan. This port is the third port of Pakistan located on its coast, the other two established sea ports are Karachi and port Qasim. The port is positioned in the strategic location influencing the security of the Indian ocean and can play a great impact on India. This port is slated to be one of the pearls of China's string of pearls located in the Arabian sea. Gwadar is expected to provide a strong economic boon for Pakistan and a game changer project in South Asia. The port enables China to have direct access to the Indian ocean through the Arabian sea. There are stiff geopolitical contests seen in the 21st century. Echoing Robert D. Kaplan, the maritime competition is shifting from the Atlantic to the Indian ocean. In the 21st Asia's two giants are busy with geopolitical clout not seen before. The China Pakistan Economic Corridor (CPEC), the flagship dream project of Xi Jinping connected the port city of Gwadar of Pakistan's province of Balochistan to the Kashgar of Xinjiang province of Chinese northwestern region. Though the port would have great economic relevance, the article intends to go beyond economics and aims to see through the geopolitical lens. The port project would bring China's geopolitical ambitions in the Indian Ocean region and have the potential to change the security environment of the region. The port would challenge India's security and geopolitical interests in the region.
Key Words: SLOCs, Gwadar, String of Pearls, Strait of Hormuz.

Introduction:

The Indian Ocean has remained a strategic and vital maritime arena from the ages and acting as a vital link among different regions of the world whether in trade and commerce, cultural, social, political exchanges. The Indian ocean is a vital ocean for transportation of energy and other sea

bound materials. The booming economy of India and China needs plenty of crude oil from the Persian gulf, Africa and West Asia. During the cold war era the symmetry of power dynamics of the world kept the Indian ocean almost peaceful and calm but, at the end of cold war after the collapse of USSR in 1991 the power dynamics shifted from bipolar to unipolar-the USA emerged as the sole power of the world. In the 21st century two Asian powers, India and China started their footprint in the oceanic realm. Due to the huge economic development of the two Asian powers in the last decade of the 20th century, the geopolitics of the region is changing rapidly (Bouchard and Crumplin, 2010). In the 21st century, the Indian ocean is more turbulent as power dynamics of India and China and among other powers are playing havoc. The energy thrust industries and ever growing economy of China need a plenty and constant flow of energy from the Middle East, Africa and other oil producing countries to sustain the growth rate and to feed the large population of these countries.This energy flow is carried away through the Sea Lanes of Communications (SLOCs) spanning the Indian Ocean from west to east, the security and safe arrival of these imports through the Indian Ocean has been treated as a chief necessity if the economy is to survive, sustain and grow. The article analyzes the strategic salience of Gwadar port and its impact in the security of the Indian ocean and further impacts to India posed by China In the first section geopolitics of Gwadar is analyzed, in the second section the security implications of Gwadar for India is explained and in the last section of the article the strategies of India to hedge against the Chinese hegemonic move is discussed.

Geopolitics of Gwadar:

The bonhomie of China and Pakistan in Asia and elsewhere is seen in the 21st century. The two all weather friends are collaborating in different fields. But the most important one is in the Indian ocean realm. The defense collaboration, the partner of China's One Belt One Road project, CPEC all are seen as Pakistan is the closest ally of China. As per Booz Hamilton which identified the construction of different sea ports along the coast on littoral countries as "String of Pearls" commencing from South China sea to Middle East. Sittwe port, Gwadar port, Hambantota port, Chittagong port. China exports a large portion of its

arms to the Indian Ocean Region. It exports to Pakistan, Burma, Bangladesh, Sri Lanka, the Middle East, East Africa and Indian Ocean island states(Malik,2014). According to Rahman and others, Gwadar port is an important dot that connects the string of pearls of China. As Gwadar is a part of China's CPEC, the port will provide China direct access to the Indian ocean through Arabian sea. The all weather friend Pakistan will be in a position to influence in the Indian ocean.(Rahman, et al. 2021). Indian security in the Indian ocean can face a challenge. The naval build up by People's Liberation Army Navy (PLAN) can pose a security threat to the Indian Navy. Harsh V. Pant opined that Gwadar is a very important sea port gathering a huge global impression. China's presence in Bay of Bengal and Gwadar via overland roads is worrisome for India (Pant,2012a). Though CPEC and Gwadar is an economic corridor, military use of the corridor by China cannot be ruled out. It can be armed by China and can cut off the oil supply of India from the gulf. The Strait of Hormuz choke point can be blocked if tensions between India and China break out. After commissioning of the CPEC the naval build up by two friends; China and Pakistan in the Indian Ocean would pose a security challenge for India. Harsh V. Pant in his book " The Rise of China: Implications for India" says that "China's involvement in the construction of Gwadar has worried India due to its strategic location, about 70 km from the Iranian border and 400 km east of the Strait of Hormuz, a major oil supply route. It has been suggested that it will provide China with a "listening post" from which it can "monitor US naval activity in the Persian Gulf, Indian activity in the Arabian Sea, and future US-Indian maritime co-operation in the Indian Ocean (Pant,2012b)". So, Gwadar sea port can pose a security problem for India. Moreover securing the growing investment, energy resources and infrastructure development projects in the Indian Ocean are motivational imperative that can not be forgotten. So, China is increasing its naval infrastructure and expanding its maritime strategy in the region. The imperative to protect people and investment in the littorals is the main strategic driver for China's strategic thinking and presence of military activities in the Indian Ocean(Brewster,2018).

The Port of Gwadar will enable China to project power and impart strategic edge to China in the western flank of the Indian ocean to even out the power of India and US. Due to naval build up at Gwadar, it can control the Strait of Hormuz and energy supply of India can be hampered in case of blockade during war or conflict. The Indian security in the western flank of the Indian ocean will be shattered and its impact on defense establishment will be felt enormously. The use of Gwadar as a naval base for China's PLAN with a permanent naval base can challenge India's regional influence and hegemony as India regards, Indian ocean its own backyard and Indian ocean is India,s ocean The strategic leverage of China and Pakistan can be achieved if Gwadar is fully militarized. China could control the Strait of Hormuz from Gwadar port.

Gwadar: Security Implications for India:

Gwadar, the port city located in the strategic position of Pakistan's Balochistan province, has significance due to its proximity to Strait of Hormuz, the critical choke point for global oil supplies. It is developed under CPEC and has great security implications. The port can impact the global oil supply because its proximity to Strait of Hormuz and China and Pakistan can interdict Indian supply of oil from gulf countries. It can also alter the power dynamics of the Indian ocean region. Gwadar can be militarized by China. The naval build up can impact Indian security in the Indian ocean. According to Rahman and others, the ever growing economy of China requires a plenty of energy supply and other raw materials. China's about 80% oil is transported through the strait of Malacca which can face blockade in case of conflicts. So, China is building alternative sea routes for transportation of energy from the Persian gulf, Africa and West Asia. Gwadar, Kyaukphyu, will give China strategic importance in the Indian Ocean. The naval activities of India can be monitored in the Indian Ocean. Due to being located at a far distance from Karachi port, Gwadar port will provide China immunity from India's security monitoring. China's naval build up may be carried out in the Indian Ocean and pose a security dilemma for India. The strategic vulnerability of China, because of interdependence on the Indian Ocean and Malacca strait for energy transportation can be reduced. Gwadar port will project power Gwadar port will provide strategic importance to

China in the Indian Ocean. The port will give easy access to the Indian Ocean through the Arabian sea. It is an important dot. of China's Border Road Initiative and one of the pearls of the string of pearls of China. The port can be used for monitoring and overseeing the naval activities of India and its allies in the Indian Ocean. The naval build up of China is slated to be increased in the Indian Ocean in the coming years. (Rahman, Z.U. et al., 2021a) Don McLain Gill in his article 'The Geopolitics of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and Security Implications for India' highlighted the impact and influence of CPEC and Gwadar on India. The port would provide China a dominant and permanent naval presence and easy base and intensify its naval activities in Indian proximity. The control of the strait of Hormuz and building of a naval base in the Gwadar port can not be ruled out and make the Indian security situations worse (McLain: 2019). According to Commodore Uday Bhaskar, wrote an article in 2010 and opined that the probability of Pakistan may tilt towards China, has become true in the 21st century. The PLAN can access the strategically located Gwadar port as Pakistan and India's vulnerability in the Indian ocean will increase. India's Hormuz dilemma will increase (Bhaskar, 2010). According to Mingjiang Li, Pakistan is a pivot state to protect China's economic and security interests in the Indian ocean region. It is to be used to constraints for India and Gwadar is to be used for security of its maritime transports (Li,2020). According to David Brewster, Gwadar port of Pakistan is aimed to connect the Indian ocean via overland transport corridor as mentioned earlier by CPEC which is a well planned mega project. The Gwadar port and establishment of a naval base in the Indian ocean will give strategic imperatives to China (Brewster, 2020). The People's Liberation Army Navy(PLAN) is more ambitious and assertive in the 21st century. The overcapacity in the domestic market compelled China to go abroad for projects built up in areas having strategic importance. The One Belt One Road Initiative and its subsidiaries such as CPEC, Maritime Silk Road intended to establish naval bases in the Indian Ocean. The Gwadar port in Pakistan, Hambantota port in Sri Lanka, Kyaukphyu in Myanmar aimed to connect the Indian Ocean with China via overland. So, by this strategic planning China is certainly impacting the security

calculus of the Indian Ocean and in turn can destabilize the Indian security fabric ((Brewster,2016).

India’s Strategic Move:

To hedge against the implications of CPEC and Gwadar, India can expand and strengthen the regional partnership to counterbalance China and Pakistan. QUAD countries; US, Japan and Australia can be very fruitful for strategic alliance, Look Act policies will be applied more aggressively. India should strengthen border infrastructure and connectivity, the maritime presence, and modernization of navy and more surveillance in the Arabian sea. India has played an active role to hedge against the geopolitical assertion of China and Pakistan in the context of CPEC and Gwadar development. India’s involvement with Chabahar port, then, serves as a key strategy to buttress its superpower status by widening its regional market presence and using an Indo-Iranian alliance to buffer China and particularly Sino-Pakistani cooperation (Soroush Aliasgary and Marin Ekstrom, The Diplomat) In 2018, India got access to the Sabang port in Indonesia (Pramit Pal Chaudhari, HT) and it makes India’s hold on naval matters stronger as this port lies on the entrance of the Malacca Strait through which a major share of trade and crude oil is transported to China. India also received strategic access to Duqm Port of Oman (Panda, The Diplomat). According to Dipankar Peri of Hindu correspondence, Japan hosted the Malabar which was held in November 2022 which also marked 30 years of the exercise which began as a bilateral exercise between India and the U.S. in 1992. Four QUAD members joined the exercise for the first time in 2020 amid the Galwan conflict with China in the Ladakh area. The exercise is aimed against the Chinese expansion and increased assertive move in the Indian Ocean region and beyond (Peri, Dipankar, The Hindu, 21 February, 2023). India has taken multilateral, bilateral ,minilateral initiative to tackle growing security threats in the Indian Ocean. The Modi government's proactive engagement with Iran is a strategic victory for New Delhi over China. India is interested to have a major stake in the infrastructure sector of Iran, to further its economic as well as strategic interests. India has played an active role to contain the hegemonic China. India’s maritime strategy is aimed at hedging against China in the Indian ocean and beyond.

Conclusion:

The Gwadar port of Pakistan that can be used by China is an important strategic project. This port enables China to access the Indian ocean through Arabian sea and can cause a great impact and challenge for India as it can be used as a military base. The port not only has potential for disruption of India's energy supply coming from the Strait of Hormuz. It can also strengthen the Indian arch rival Pakistan militarily. To check the rival China, India should play a more dynamic role in the Iran and Persian gulf countries. India is collaborating with Iran through investment and development of Chabahar port. This island is located in a very strategic position and can be used for multiple purposes, only sound and robust planning and allotment of funds required with political will necessary for this end. Indian maritime strategy was so far Pakistan centric. Now India should have a broader maritime strategy in the Indian Ocean and beyond it. India can take a cooperative security Initiative for tackling ever growing natural disasters, terrorism, piracy, sea lines of communication (SLOC) and blockade of choke points spreading in the Indian Ocean like strait of Hormuz in the mouth of Persian gulf and strait of Malacca, the vital gateway to Pacific Ocean from Indian Ocean south of Andaman & Nicobar Islands.

Reference:

1. Christian Bouchard & William Crumplin (2010). *Neglected no longer: the Indian Ocean at the forefront of world geopolitics and global geostrategy, Journal of the Indian Ocean Region*, 6:1, 26-51, DOI: 10.1080/19480881.2010.489668
2. Malik, M. (2014).*The Indo-Pacific Maritime Domain: Challenges and Opportunities. In Mohan Malik,* (Ed.). Maritime Security in the Indo-Pacific: Perspectives from China, India and the United States. Rowman &Littlefield.pp.(pp.15-19
3. Rahman, Z. U. et. al (2021). The geopolitics of the CPECand Indian Ocean: security implication for India, Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, 13:2, 122-145, DOI: 10.1080/18366503.2021.1875807)

4. Pant. Harsh V.(2012a), Pant, H. V. (2012). *China in South Asia: A Tightening Embrace.* In Harsh V. Pant. (Eds.). Rise of China: Implications for India. Cambridge University Press of India Pvt. Ltd. .New Delhi p-237) https://libgen.is/book/index.php?md5=E8169F241CE3EA9ECF318BA1F58442B8
5. Pant. Harsh V.(2012b), Pant, H. V. (2012). *China in South Asia: A Tightening Embrace*. In Harsh V. Pant. (Eds.). Rise of China : Implications for India. Cambridge University Press of India Pvt. Ltd. .New Delhi. P.242). https://libgen.is/book/index.php?md5=E8169F241CE3EA9ECF318BA1F58442B8
6. Brewster, D. (2018). *A Contest of Status and Legitimacy in the Indian Ocean.* In David Brewster,(Eds.) India and China at Sea: Competition for Naval Dominance in the Indian Ocean.OUP.NewDelhi,p.21. https://libgen.is/book/index.php?md5=7217465EDAA2865E114E7AA1F806C49D
7. Rahman, Z. U. et. al (2021a). The geopolitics of the CPECand Indian Ocean: security implication for India, Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, 13:2, 122-145, DOI: 10.1080/18366503.2021.1875807)
8. McLain, D.G. (2019), *The Korean Journal of International Studies*,Vol.17, No3(December 2019), 337-354, http://dx.doi.org/10.14731/kjis.2019.12.17.3.337)
9. Bhaskar, C. U. (2010). "China and India in the Indian Ocean Region: Neither Conflict nor Cooperation Preordained"CHINA REPORT 46 : 3 (2010): 311–318, DOI: 10.1177/000944551104600311
10. Li, M. (2020). The Belt and Road Initiative: geo-economics and Indo-Pacific security competition, *International Affairs,* 96: 1 (2020) 169–187; doi: 10.1093/ia/iiz240
11. Brewster, D. (2016), Silk Roads and Strings of Pearls: The Strategic Geography of China’s New Pathways in the Indian Ocean, *Geopolitics*, DOI: 10.1080/14650045.2016.1223631

12. Soroush Aliasgary and Marin Ekstrom, 21 October, 2021, The Diplomat, https://thediplomat.com/2021/10/chabahar-port-and-irans-strategic-balancing-with-china-and-india/ (Accessed on 24 May, 2023)
13. Pramit Pal Chaudhari, (2018, May 17). *“Indonesia gives India access to the strategic port of Sabang”,* Hindustan Times.
14. Panda, A. (2018, February 14). “*India gains access to Oman’s Duqm port, putting Indian ocean geopolitical contest into the spotlight”,* February 14, 2018, The Diplomat
15. Peri, Dipankar, The Hindu, 21 February,2023, *Australia to host Malabar naval exercise for first time this August*, https://www.thehindu.com/news/national/australia-to-host-malabar-naval-exercise-for-first-time-this-august/article66537072.ece (Accesed on 24 May, 2023).

Locating the Indian Migrant Labourers in Bhutan through the Diasporic lens

Tsheten.Tshomo.Bhutia
Assistant Professor, Dept. of Political Science
Bolpur College, West Bengal

Abstract: The India Bhutan border is 699km long. Indian states like Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal and Sikkim share borders with the small kingdom. Apart from a few border skirmishes in the past, mostly with regard to the China threat looming large, Indo-Bhutan relations have mostly been friendly. Hydro power projects are one of the major sources of revenue for both the nations in South Asia with the economy of Bhutan heavily dependent on mega hydro power projects funded by the Indian government and the Indian nation in turn are dependent on the Bhutan government for cheap hydro electric power. This scenario has resulted in a huge number of Indian labourers working in Bhutan, which has only increased with time resulting in a growing settlement of labourers of Indian origin. At the geopolitical level, the Government of India not only funds hydropower projects but these projects are also being manually produced by India's work force. The Indian labourers who make up a huge chunk of work force in Bhutan's economy, represent a community who are at the receiving end of the socio-economic spectrum with an uncertain future, low incomes, harsh living conditions far away from home. This paper seeks to look at how this community of Indian labourers despite of playing an important role in the India-Bhutan relations remain under represented both in India and Bhutan. Furthermore the paper seeks to understand the complex relationship of the migrant workers towards the larger Bhutanese community and their sense of belongingness in the host nation.

Key words: Migrant labourers, Indo-Bhutan relations, under-representation, geo-political.

Introduction

Scholars, political theorists, writers trying to understand the term 'diaspora' often struggle with finding an exact definition of the term, because of the array of processes that produce a variety of groups and communities settled in different corners of the world, far way from their place of origin and have different reasons for doing so. To include and exclude these different groups within a fixed definition of the term would be challenging and misleading. For instance, one could say diaspora indicates a "distance and separation from a society of origin with which there is a continuous affinity." (Pradhan, 2021: 2) According to the said line then, diaspora would include all all migrant and minority populations that retain their ethnic consciousness and share collective memories, experiences, histories, similar identity and values. The phenomenon of globalisation has increased the process of migration, most specifically international and cross border migration where huge number of people move to foreign countries for better economic opportunities which usually presents itself in the form of employment. Foreign relations between nations have only deepened over the decades and this has resulted in opening up job opportunities in foreign lands with attractive salary packages. In many developing countries like India, job opportunities in foreign countries are seen as an opportunity to improve their socio-economic condition back home which results at least one member of the family going abroad. Sanjay Chaturvedi in his article points out how there has been a "globalisation of migration" which has resulted in diasporas of various kinds. He points out that the landscape of the diaspora in todays world is dynamic navigating between the local, national and global of who moves where, when how and why and this produces a complex, multifaceted phenomena called the diaspora which could work both as a bridge and a barrier between and also with polities, localities and communities. (Chaturvedi, 2005:142). The sudden interest in Diaspora and diasporic subjects in the recent decades in not without reason. As Sanjay Chaturvedi in his work points, much of this has got to do with the geo-political vision of the actors involved, be it the state or the diaspora themselves. Diasporic communities living abroad in today's deeply interconnected world are considered to play an important role in

transforming and uplifting the economy of a nation, both the host nation and their homeland. Most countries in the world thus now have specific policies which encourage the diaspora to maintain a connection with their homeland be it in terms of voting rights or investment in the country. (Chaturvedi, 2005).

In the beginning the understanding of the term 'Diaspora' was limited to physical dispersion of a certain community from their place of origin, their homeland. It is a known fact that the term was derived from the greek word '*Dia*' which means 'through' and '*speiro*' which means to scatter or to disperse and was used to explain the scattering of Jewish communities in exile outside of Palestine. Along with the physical dispersion this term also carried with it 'religious, philosophical, political and eschatological connotations' as it also described a special connection between the land of Israel and the Jewish people. (Pradhan, 2021, 1). Earliest studies of Diaspora described the term as 'bounded entities' containing certain specific features. For instance William Safran's work mentions different features to conceptualise 'diaspora' as having "a history of dispersal, myths, memories of the homeland, alienation in the host country, desire for eventual return, ongoing support of the homeland and a collective identity importantly defined by this relationship." (Pradhan, 2021,6). The problem with such a conceptualisation is that, in recent times, most migrant groups in the world espouse such features, which begs the question, if all kinds of migrant communities should also be included within the category of the 'diaspora' or at least should be understood as having diasporic tendencies? Migrant communities settled in different parts of the world away from their places of origin working in different jobs in different capacities, sending their income home, earning a living also have an ethnic consciousness, a collective identity, a longing for their home and family. The issue gets further complicated because international and cross border migration is complex in itself. This is the point where this paper attempts to understand and place the large community of Indian migrant labourers in Bhutan. According to recent government data, there are about forty five thousand legal Indian labourers in Bhutan which is about 6 percent of the overall population of Bhutan. (Poussot, 2018). Who are they? Where do they come from ? And

most importantly how are they significant to the economy of both India and Bhutan? These are some of the questions that this paper attempts to deal with.

Indo-Bhutan relations - a brief overview

India-Bhutan relations have been one of the most cordial relations any country shares with the other in the South Asian region and the world. Historically from the time of Jawaharlal Nehru as the Prime minister of India, both the countries have shared warm relations beginning with the signing of the Treaty of Friendship and Cooperation between the two nations in 1949. Serving as a buffer state between India and China due to its strategic geographical proximity to the latter, Bhutan demands a significant position in the foreign policy relations of India. The government of India reiterates this fact by being a guiding force in almost all policy decisions of the country and has proven their friendship to the Kingdom in security matters by coming to the aid of Bhutan. India provides support to Bhutan in various fields but especially in relation to its economic development by investing a substantial amount of capital in the fields of trade, energy, agriculture, digital connectivity and transport system. Bhutan is also the only South Asian country that has resisted joining China's grand project of the Belt Road Initiative (BRI) and any other grants and loans that China has to offer thus respecting India's security concerns.(Shivamurthy, 2022,3). India is Bhutan's largest trading partner. Trade between the two countries is governed by the Indo-Bhutan Trade and Transit Agreement of 1972 which was last renewed in 2016 and which resulted in a free trade regime between the two countries. In the recent times talks of building a rail connectivity network between the two nations has been going on and this was one of main agendas in the recent visit of the Indian Prime minister to the region in March this year. Several news agencies reported of a rail connectivity network being finalised between the two nations furthering the already strong relationship that the two nations share. [1] With India, Bhutan shares

[1]please see Dipanjan Roy Chaudhury. (2024). *India Bhutan explore setting up of new Hydropower Projects.* https://m.economictimes.com/industry/energy/power/india-bhutan-

borders with Sikkim to the west, West Bengal and Assam to the South, Arunachal Pradesh to the east. It is also adjacent to the Siliguri corridor which connects India to the north eastern region and this close proximity has also resulted in the emergence of border towns between the two nations. For instance, the border market of Dadgiri- Hatisar located in the Chirang district in Bodoland Territorial Region (BTR-Assam) is part of the daily transit lives of local people in Bhutan and India. With the recent finalisation of a rail road connecting the Kokrajhar area in West Bengal and Gelephu in Bhutan, the connectivity between the two nations is only set to increase and with it bilateral trade will also increase which in turn will increase the importance of such border towns. [2]

The Himalayan kingdom and India share a special bilateral relationship in almost all sectors of cooperation and one such area is the hydroelectric power projects. The first mega hydropower project - Chukha Hydropower Project of 1987 was fully funded by the Government of India after which an agreement on the cooperation in the field of Hydroelectric Power was signed by both the nations in 2006. Another Hydroelectric Power project which was completed on time was the Mangdecchu Hydropower Project which is located in the Trongsa district of Bhutan. So far, there are four Hydroelectric power (HEP) projects in Bhutan and three more that are under construction. All the HEPs besides generating export revenue are also cementing the economic integration between the two countries. These projects are mutually beneficial on one hand generating revenue for the Bhutanese economy and on the other hand, providing a reliable source of inexpensive and clean electricity to India. According to the Ministry of External Affairs, Government of India, there are about 60,000 Indian nationals living in Bhutan and a bulk of them are employed in the hydroelectric power and construction industry. The 1020 MW Punatsangchhu -II HEP is also expected to be commissioned this year. It can be seen that hydro power

---

explore-setting-up-of-new-hydropower-projects/articleshow/108737630.cms

[2]How Indo-Bhutan Border Market has moved beyond narratives of Conflict & Security. https://thewire.in/society/how-an-indo-bhutan-border-market-has-moved-beyond-narratives-of-conflict-and-security

projects are one of the major sources of revenue for both the nations in South Asia. This scenario has resulted in a huge number of Indian labourers working in Bhutan, which has only increased with time resulting in a growing settlement of Indian migrant labourers. At the geopolitical level, the Government of India not only funds hydropower projects but these projects are also being manually produced by India's work force.

Understanding the Indian migrant labourers in Bhutan (who are they?)

"Indian labourers are everywhere in Bhutan. On roadsides, in tents, cutting boulders down to gravel sized pebbles, or moving large objects using make-shift devices," Jacquelyn Poussat remarks in a study conducted in 2016 while she lived in Bhutan. In her article, she analyses the Indian migrant labourers from a psychological point of view but also provides glimpses of the socio-economic state of the workers. (Poussat, 2018). Migrant workers constitute a significant proportion of workforce in the economy of Bhutan. This proportion is hugely concentrated in the construction industry which is labour intensive and requires skilled and semi-skilled workers. Migration of labourers to Bhutan in substantial numbers started in the 1980s when the landlocked Himalayan kingdom felt the need to recruit workforce to build the infrastructure and other related construction works in the country. Bhutan has had a history of isolation with a small population not very skilled in infrastructure developmental activities. Fuelled by the forces of globalisation, privatisation and liberalisation and coupled with a need to modernise its economy, Bhutan started hiring foreign workers to work especially in the construction sector and hydropower project related activities. This became one of the main reasons for migration of Indian workers to the kingdom. Given its geographical proximity to India and the cordial relation it shares with India, a sizeable portion of workers especially from the Indian state of West Bengal and Assam through the cross border towns started working in Bhutan.

Construction sector in Bhutan is one of the key areas of the Bhutanese economy. Along with government construction projects, the country is also witnessing a housing construction boom fuelled by the

strong demand for rental apartments, shops, hotels and office spaces. As of June 2019, migrant workers in the construction sector account for about 10 percent of the entire employment in Bhutan. A huge percentage of workers come from the India most specifically from the region of West Bengal, Assam and nearby border towns like Jaigaon. (Wijunamai, 49). There are many reasons for the presence of a huge number of Indian workers in this sector. Firstly, it is the geographical proximity of the two nations which make commuting and accessibility via road easier for the migrants. Bhutan also has a much easier recruitment process, easier paper work for work permits, better facilities, decent wages and closeness to their homes which all add to the migrants being able to save money to send back to their homes especially in times of emergency. In many of the ethnographic studies, when interviewed workers express a much better experience working in Bhutan as it is safer, cheaper as compared to working in European or Gulf countries. Another reason for the dominant presence of Indian migrant workers most specifically in the construction sector has got to do with the socio-economic context of Bhutan itself. Construction work is not the most sought after employment choice for the people in Bhutan. This type of work which demands strenuous labour, technical skills has some sort of a social stigma attached to it and usually looked down upon by locals. It is usually considered work for the outsiders (in this case Indian foreign workers). Thus, even while unemployment among the youth is increasing in Bhutan, employment in the construction sector is not preferred by most locals. As one report stated, the youth would rather stay unemployed than to work in this sector. This has resulted in more job opportunities for the Indian migrant workers who are more than happy to fill up the job poisons due to their own socio-economic conditions back home. These foreign workers are more skilled, have technical know-how and incur a much cheaper rate than their Bhutanese counterparts and are often preferred by employers in Bhutan.

Indian migrant workers can roughly be divided into two categories of highly skilled workers who are predominantly men on one hand and daily casual workers mostly semi-skilled on the other. The former are usually hired for longer periods of time with a good salary and are

engaged in operational tasks. For instance, the steel factory in Pasakha located on the Bhutan-India border which forms the part of Bhutan's southern industrial belt employ about 500 Indian men who work in the steel factory and are engaged in operations to management and fitting, with a good salary and decent housing facilities. They are usually employed for a period of three years with their work permits being renewed each year. The daily casual workers include both men and women who commute daily to Bhutan through special checkpoints with daily entry passes. For instance, many workers from nearby Jaigaon commute daily to Bhutan and perform manual unskilled jobs from cleaning public places and breaking stones to petty work in shops and restaurants.[3] In addition to this, Indian migrant workers are seen employed in Hydropower electric projects in Bhutan which form an integral part of the Bhutanese economy. These Hydropower electric projects are funded to a huge extent by the Government of India and form an integral part of the bilateral relations between the two nations. A majority of the workers engaged in the Hydropower projects are foreign workers from India who are employed through government agencies for a period which might change depending on the successful completion of the project. A section of them are also contractual workers hired for a specific time period. According to ethnographic studies and news reports, these workers usually live in make shift houses with little or no ventilation system; they cook for themselves and most of them send their income home to their families back in India. In an ethnographic study, most of the Indian migrant workers expressed how sending money electronically was better and cheaper then actually visiting their homes in person as that incurred loss of time, work opportunities and incurred heavy expenditure which they wanted to avoid. (Poussat, 2018). When

---

[3]Harwood, Becky. (2024). Migrant Workers Driving Development : A view from Pasakha, Bhutan. https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://clareprogramme.org/update/migrant-workers-driving-development-a-view-from-pasakha-bhutan/&ved=2ahUKEwjkmJ3IpviFAxUva2wGHQIMBIoQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2LuFBoX6ekKRaVwG6cVzb4

asked why they chose to work in Bhutan instead of their own countries, they stated lack of work opportunities back home and the same jobs in their countries paid less than what they earned in Bhutan. In one of the studies, a worker is seen pointing out how Bhutan offered better health facilities and a cleaner environment because of which he felt healthier and fell sick rarely. (Wijunimai, 2020)

Migration, South Asia, Diaspora

Over the past few decades international migration has doubled and for developing countries like India migrant remittances continue to be a major source of income. In the whole world - India, Mexico and Egypt receive the largest amount of money from their diaspora. (Chaturvedi, 2005, 146). The Indian diaspora is one of the most varied and heterogeneous category not just in the South Asian region but in the world. One of the reasons for its complexity is the structure and territory of South Asia itself. The South Asian region is in itself filled with complexity given the intertwined territoriality, histories, cultures, ethnicities of the nation-states that comprise it. Movement of people from one country to another in the region has been taking place since times immemorial; migration has thus been a part of the history of each country in the region especially given the shared borders between nations and their geographical proximity. Every country in South Asia shares borders with one another and because of this, every nation state has had a history of cross border migration. Bhutan becomes a good example in this regard given its close ties with India, not just because of its geographical proximity but also because of the relation that the two countries share. India is Bhutan’s leading trade partner and works very closely with Bhutan in its developmental activities, hydropower generation, education, infrastructure and provides the Himalayan kingdom with help, not just financially but also in term of manpower and labour. The presence of a sizeable number of Indian workers in different capacities that we have seen previously shows us how the Bhutanese economy is dependent on this community of workers for economic and infrastructural development. The question to be asked then is where does one fit this (roughly 40,000 to 50,000) Indian workers in the category of Indian diaspora? To put it

another way, does this category of Indian migrant workers and labourers fall outside the purview of the diaspora?

Amba Pande in her paper points out the challenge in finding a paradigm or template for understanding the Indian diaspora taking into account the fact that it subsumes such a diverse set of people and migration patterns. She cautions therefore that in the context of Indians living and working outside of their country, it is impossible to "approach the diaspora as a single entity." (Pande, 2013, p.59) In the recent decades there has been a tremendous quantitative and qualitative change in the phenomenon of the diaspora, given the advancement in technology, infrastructure, transport system all encapsulated by the forces of globalisation which is gradually seen to be eroding the boundaries of the nation-state. Satchidanandan points out how different migration has become in the recent decades where people are migrating not forcibly away from religious and other political or social persecution but rather in search of better opportunities. He compares the new immigrant as a new kind of coloniser who is taking full advantage of the labour market and at the same time having no intention of ruling over the land. (Satchidanandan, 2002, p.51). It seems that the migrant labourers working in Bhutan be it in the construction sector, hydropower projects, steel industry or daily casual labourers commuting daily doing odd jobs are living two lives in two different cultural settings. One is the place where they spend a considerable amount of time working, eating, sleeping, building, earning income. The other is the place where they actually belong , their home - where they get to spend less time apart from their family. There is a sense of discomfort and displacement they go through adjusting and living in a foreign land that is not theirs fully and truly but that which provides them the capital to live and to look after their family back home. This sense of discomfort on one hand and necessity on the other could starkly be seen during the time of Covid 19 when many of the Indian workers were stuck in Bhutan unable to go back home due to border restrictions imposed by the Bhutanese Government. On the other hand there were many newspaper reports that reported of workers desperately wanting to go back to Bhutan in order to work and earn a living. This was because many of them were so dependent on the

economy of Bhutan for their livelihood that they had no other choice than to wait desperately for the restrictions to be lifted as they were unable to find work in India. The Indian labourers who make up a huge chunk of work force in Bhutan's economy, represent a community of the Indian diaspora who are at the receiving end of the socio-economic spectrum with an uncertain future, low incomes, harsh living conditions far away from home. So even while playing a significant role in the relations between two nations, they fail to carve a space in the larger understanding of the Indian diaspora.

Locating the Indian migrant labourers in Bhutan

According to the Ministry of External Affairs, Government of India there are about 60,000 Indian nationals living in Bhutan and are employed mostly in the hydroelectric power and construction industry. This is a community of Indian workers participating in the building of the Bhutanese economy and also earning their livelihoods working and living far away from home. While the Indian migrant workers are seen everywhere in Bhutan, it is not surprising to notice how different their socio-economic condition is from the rest of the Bhutanese population. Jacquelyn Poussot in her study describes the different labour camps of the workers as a cluster of makeshift accommodations of "uninsulated cabins with no windows." She further discusses the stigma that is attached to the profession of the Indian workers and to some extent even their nationality as foreign Indian labourers which reduces them as to being outsiders in a foreign land performing menial tasks that are looked down upon in the Bhutanese society. (Poussot, 2018). In this regard, the Indian migrant labourers while working in a foreign land fails to escape the stigma that is attached to the profession of cheap labourers (majdoor) even back at home in India. Even while working in a foreign land, they are still considered to occupy the lower rungs of the society and this is reproduced as they fail to carve a space for themselves even in the larger understanding of the Indian diaspora. In the evolving discourse of diaspora, diasporic communities and most particularly the Indian diaspora, this section of workers in Bhutan, as the case in point in this paper (but also Indian migrant labourers in others countries of South Asia) seem to be under-represented or not represented at all, thus leaving

a vacuum and failing to provide a wholesome understanding. Innumerable studies of Indian foreign policy, diasporic literature, research papers seem to be either silent or have not given importance to this category of the Indian foreign workers. The inability to locate this category of Indian workers in the larger understanding of what has been an attempt to define the borders of the Indian diaspora begs the question of critically analysing and understanding as to why this exclusion of a whole community of Indian nationals takes place. Doesn't this sort of exclusion and under-representation also mean denying their diasporic experiences which form an integral part of their identity?

With the change in the concept of diaspora and diasporic identity, many studies in the world that are emerging in the recent decades point to the fluidity in the nature of diasporic identities. In this regard writers such as Stuart Hall and Homi Bhabha come to mind as they draw attention to the fluid nature of diasporic identity which are 'continuously reframed in ongoing negotiations with the challenging political environment. (Hall,1993, Bhabha, 1999, as seen in Pradhan, 7). Bhabha further talks about how this "fluid diasporic identities and their hybridity offer an alternative organising category for a 'new politics of representation' which is informed by an awareness of diaspora and its contradictory, ambivalent and generative potential." (Bhabha, 1994, 7 as seen in Pradhan, 8). Given the complexity in defining the contours of the Indian diaspora, the community of Indian migrant labourers in Bhutan in this case, makes a compelling case of the need to redefine the understanding of the Indian diaspora in South Asia. This indeterminateness is precisely the point where their unique experiences needs to be placed, taken account for and recognised. As Stuart Hall has rightly pointed out, "diaspora experiences can only be understood by recognising the heterogeneity and diversity that is at the heart of the diaspora and it is through this that diasporic subjects are constantly producing and reproducing themselves anew, through transformation and difference." (Hall, 1993, p.402).

Conclusion

While this paper has attempted to locate the Indian migrant labourers in Bhutan in the larger understanding of the category of Indian

diaspora, this paper also acknowledges the fact that, a deeper and perhaps an in depth study of this community of Indian workforce using ethnographic methodology is required which remains outside the purview of this paper given time constraints and lack of resources to carry out such a study. There is also a realisation that such a study will enhance the understanding of the Indian diaspora and add to the existing discourse enriching its content by accepting differences and diversity as a part of the diasporic experiences and diasporic identity. Not only this, widening the scope of diaspora will also give a voice to the diasporic subjects whose experiences are contingent on the context and spaces they occupy. For instance, in this paper I have tried to problematise and rethink the Indian diaspora as it appears and is understood in the mainstream literature. I have also tried to argue through the category of Indian migrant labourers in Bhutan that despite of being an important part of the economy of both India and Bhutan, they seem to be ignored or taken as the less fortunate members of the Indian diaspora with no guaranteed security or rights for their lives. This paper also points out that this category of the Indian workforce while living and working in Bhutan maintain their cultural and national identities and how despite of hardships and an unknown future are completely dependent on the Bhutanese economy for their livelihood. In this regard, Avtar Brah rightly argued that the diasporic space is the "intersectionality of diaspora border and dislocation as a confluence if economic, political, cultural and psychic process. It is where multiple subject positions are juxtaposed, contested, proclaimed or disavowed." (Brah, 2002, p.208).

In a recent visit to Bhutan on March 22, 2024, Prime minister Narendra Modi signed several strategic MoUs and agreements in the fields of energy, trade, digital connectivity, space and agriculture with Bhutan. Along with this, two proposals on establishing rail links between India and Bhutan - Kokrajhar -Gelephu rail link and Banarhat -Samste rail link were also finalised thus commemorating the already strong relationship that the two South Asian nations share with each other. This development would mean better transport routes and connectivity between the two nations which would also mean easier movement of people across borders. In an era of increasing interdependency among

nations, foreign relations have become crucial for the development and preservation of national interest, the role of the diaspora is only bound to increase. Taking this into consideration, it is pertinent to enrich and broaden our understanding of diaspora to include into its fold all the myriad diasporic experiences.

References

Bhabha, Homi K. (1994). The Location of Culture. London : Routledge.

Brah, Avtar. (1996). Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. rpt. 2002. London: Routledge.

Clifford, James. (1994). “Diasporas.” Cultural Anthropology. Vol.9.3. Wiley on behalf of American Anthropological Association. Pp. 302-338.

Chaturvedi, Sanjay. (2005). “Diaspora in India’s Geopolitical Visions: Linkages, Categories and Contestations.” Asian Affairs : An American Review. Vol. 32. No.3. Taylor & Francis, Ltd. pp. 141-168.

Hall, Stuart. (1993). “Cultural Identity and Diaspora.” In Colonial Discourse and Post Colonial Theory. Edited by Patrick Williams & Laura Christman. London : Longman.

Mukhopadhyay, Jayita. (2010). “Indian Diaspora in Southeast Asia : Predicaments & Prospects. The Indian Journal of Political Science. Vol.71.No.3. pp. 995-102.

Prakash, Chandra Pradhan. (2021). “Rethinking Indian Diaspora: Conceptualising Diasporic Consciousness.” Litfinite. Vol. 3.num 2. India: Pen Prints publication.

Poussot, J. (2018). Indian Labourers, the Invisible class of Bhutan. South Asia @LSE.

Pande, Amba. (2013). “Conceptualising Indian Diaspora: Diversities within a Common Identity.” Economic & Political Weekly. Vol.48. No.49. pp. 59-65.

Ranjan, Amit. (2018). “India- Bhutan Hydropower Projects: Cooperation and Concerns.” ISAS working paper - No.309.

Satchidanandan, K. (2002). “That Third Space: Interrogating the Diasporic Paradigm.” India International Centre Quarterly. Vol.29.No.2. India International Centre, Pp. 50-57.

Shivamurthy, Aditya Gowdara. (2022). “The Changing Contours of Bhutan’s Foreign Policy and the Implications for China and India.” ORF Occassional Papers. No.356. Observer Research Foundation.

Wijunamai,Roderick. (2020). “Migrant Construction Workers in Bhutan : Understanding Immigrant Flows and their Perceptions.” RigTshoel

Research Journalof the Royal Thimpu College, Bhutan. Weiss, Gail. (2016). "Diasporic Looking : Portraiture, Diaspora and Subjectivity." In Imaging Identity. Edited by Melinda Hinkson. Australia: ANU Press. Pp. 59-81.

Online sources

Harwood, Becky. (2024). Migrant Workers Driving Development : A view from Pasakha, Bhutan. https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://clareprogramme.org/update/migrant-workers-driving-development-a-view-from-pasakha-bhutan/&ved=2ahUKEwjkmJ3IpviFAxUva2wGHQIMBIoQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw2LuFBoX6ekKRaVwG6cVzb4

India -Bhutan Hydropower Cooperation: Assessing the Present Scenario. 2022. https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.orfonline.org/expert-speak/india-bhutan-hydropower-cooperation&ved=2ahUKEwi586ispviFAxXIR2wGHe7lASkQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw1aiSg2_JAgxrAVYapod9jI

Siddiqui, Huma. (2020). Celebrating India-Bhutan Ties : the Mangdechhu Hydroelectric Power Project receives prestigious award. https://www.financialexpress.com/business/infrastructure-celebrating-india-bhutan-ties-the-mangdechhu-hydroelectric-power-project-receives-prestigious-award-2110873/

Chaudhuri, Dipanjan Roy. (2024). India Bhutan explore setting up of new Hydropower Projects. https://m.economictimes.com/industry/energy/power/india-bhutan-explore-setting-up-of-new-hydropower-projects/articleshow/108737630.cms

How Indo-Bhutan Border Market has moved beyond narratives of Conflict & Security. https://thewire.in/society/how-an-indo-bhutan-border-market-has-moved-beyond-narratives-of-conflict-and-security

Tourism Impact Assessment : A Study on West Bengal Coastal Stretch

Jayeeta Bagchi
Assistant Professor, Department of Geography
Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip

Abstract : The term 'environment' is considered as a key element in tourism as it has both positive and negative environmental impacts. Therefore the present study aims to discuss about the impact of tourism on physical environment along the coastal stretch of West Bengal, as it consists valuable and fragile environment. The negative impacts which are frequently highlighted include littering, overcrowding, traffic congestion as well as pollution of, water and soil along with the deterioration of natural resources as a result of the constructions of tourism services, especially erection of hotels pose an adverse impact on the health of the coastal zones. The present study emphasizes on few environmental factors such as forest clearance and loss of sand dunes, air and noise pollution, impact of tourism on red crabs and small fishes, beach litter, water quality and beach accommodation to assess the impact. Perceptions of both tourists and local communities have been considered. The impact is very significant and reflects a spatial and temporal variation among the tourist destinations.

Keywords: Tourism, Coastal Area, Physical Environment, impact assessment.

Introduction

The scale of tourism growth in the relation to the carrying capacity of the environment greatly influences the extent of environmental impact. Ray (2007) said tourism is a pervasive rather than an intensive stress event. That is, its impact is cumulative over a long period which may be measured in years rather than, as in flood or hurricane, in hours or minutes. This slow onset is further intensified by the development of tourism related activities in the form of newer hotels, development of the transport and communication system, all because of the economic benefits associated with tourism. Thus the activities related to the tourism

industry spread to vulnerable areas. Deterioration of surface waters quality: The direct and indirect exposure of population to sewage is of primary concern (Koivunen *et. al.*, 2003; Canteiro *et al.*, 2018). The increasing demography and the growing water demand has lead to a global deterioration of surface waters quality. So, Human pathogens, bacteria, protozoa, and viruses are related with coastal pollution and intense, unplanned tourism activities (Bagchi, 2019).

The main objective of the study was, to examine the impact of tourism on the economic condition of the study area, more specifically on the local community. The main issues that need to be addressed are- the impact of tourism on employment, labour supply, level of income (WTO, 2016).

Study area

The study area comprises of Digha, Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj**.** Digha and Mandarmoni are located in Purba Medinipur district and Bakkhali-Frazerganj is located in South24 Parganas district of coastal West Bengal, which are noted for their tourism and fish landing activities. Digha is the largest and most popular tourist destination of West Bengal at the same time, it is the largest and oldest tourist spot among Digha,Bakkhali-Frazerganj and Mandarmoni. Geographically the area extends between 21°37´ N to 21°40´ N and 87°30´ E to 87°37´ E. Since the work is extended to the effect of tourism on water quality (as another important part of physical aspect) which is a major concern of the present era, in terms of tourism, therefore, Satjelia Island (located in the fringes of Sundarban Biosphere Reserve), a zone devoid of any commercial tourism has been selected as the control zone to give a comparative outlook of the pollution level between the study areas.

Materials and methods

The whole methodology followed by two basic steps, survey procedure and statistical analyses.

Survey procedure:

A perception survey of the local community was done based on the structured questionnaires. 15% of households were surveyed from each study area to find out the impact of tourism on(i)Forest clearance and loss of sand dunes, (ii)Air and noise pollution, (iii) impact on red crabs and

small fishes, (iv) Beach litter, (v) Water quality (vi) Beach accommodation.

Statistical analyses:

The data collected for nutrient analysis, heavy metal and physico-chemical variable from WBPCB and other relevant journals were finally subjected to statistical analyses.

- Analyses of variance (ANOVA) were performed using SPSS9.0 package to determine the spatial variation between the stations. ANOVA is used in the analysis of comparative experiments, those in which only the difference in outcomes is of interest. The ANOVA has used in the study to get the spatial variation of different parameters (temperature, salinity pH, DO, BOD, COD, NO_3, PO_4, SiO_3, Zn, Cu and Pb) of water quality between the stations (Digha-Mandarmoniand Bakkhali-Frazerganj). For convenience of study and considering the distance between Digha and Mandarmoni it has considered as one zone for water quality analyses only, and Bakkhali-Frazerganj has considered another zone.
- Correlations were also analyzed to get the relationship among different parameters of water quality as Correlation values are important to understand the strength of relationship between various parameters. If the value is significant ($p < 0.01$) then the two variables are strongly related. This relationship is direct if the 'r' value is positive and inverse if the 'r' value is negative.
- Other parameters were represented through bar diagrams, pie charts etc. The identified items of beach litter have listed on a table format.

Results and Discussion

- ***Impact on forest clearance and loss of sand dunes:***

Digha, Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj have lost their dunes due to tourism related activities as revealed from the primary survey which is a perception survey of the tourists and the local people. The perception of visual change realized by them is indicating that tourism related activities are responsible for this. 10-12 meters high dunes have been flattened into plains at half the heights to make way for construction of the hotels and roads. This may severely affect the coastal ecosystem in adverse ways. Majority of the surveyed population of the local community at Digha

(85.37%) and Mandarmoni (80.82%) agreed with the fact that, forest clearance and loss of dunes have occurred but at Bakkhali-Frazerganj majority of the surveyed population didn't agree with the fact. There as on behind forest clearance is an important factor to be considered to identify whether growth of tourism is responsible for this or not. Perception survey reveals that, construction of hotels is the main cause behind the forest clearance and loss of sand dunes at Digha and Mandarmoni, but people's perception at Bakkhali-Frazerganj reveal other reasons (such as collection of fuel wood, smuggling of wood from the forest etc) are responsible for the forest clearance, rather than tourism.

- ***Impact on air and noise pollution:***

Primary survey reveals the host community suffers from both air and noise pollution due to different types of tourism related activities, but it varied from one zone to another. Majority of the surveyed population (50% and 48.31% respectively) at Mandarmoni said that they do not suffer from air pollution as well as noise pollution. At Digha majority of the surveyed population (50% and 44.44% respectively), said they do suffer from both air and noise pollution. Again, Bakkhali-Frazerganj shows another picture, where majority of the surveyed population (50%) do not have any idea about their suffering from air pollution, but they agreed about the fact, that they do suffer from noise pollution. Hence, the primary survey reveals that host community of the study area suffers from both air and noise pollution, but they suffer from noise pollution more than air pollution. Primary survey reveals there are so many sources of air pollution in this region, but the major source of pollution is auto emission. Motor vans which are used for site seeing, bikes which are hired by tourists from some local people for bike ride on the beach as a recreational activity and increased number of vehicles to serve the tourism contribute considerably to level of air pollution. Another important source of air pollution is the use of generators. Mandarmoni is not electrified. So, generator is basically one and only source of electricity. All hotels and lodges at Mandarmoni are fully dependent on generators. Primary survey shows, in peak tourist seasons, at the time of heavy tourist influx these diesel generators runfor17to18hrs per day, and in some hotels it runs for 22hrsperday at Mandarmoni. Primary survey

reveals the main source of noise pollution at Mandarmoni is generator, at Digha andBakkhali-Frazerganj it is loud speakers which is used at the time of cultural programmes in the hotels on special occasions, but horns are another source of noise pollution at Digha. The time of occurrence of both kind of pollution as identified by the local community is the peak tourist season at Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj and it is remain same throughout the year at Digha. The noise pollution results headache and irritation among the local community of the study area. Like noise pollution, the local community also suffers from air pollution which causes health problems, such as, burning sensation in eye, nose, throat; lung problem etc.

- ***Impact on red crabs and small fishes:***

The sandy beaches of Mandarmoni, Digha and Bakkhali-Fraserganj are under pressure of expanding coastal population, ribbon development in the coastal strip and increasing recreational activities on the beach. Thus, human uses of beaches are increasing sharply. Such development and anthropogenic activities trigger significant changes in existing fauna. Red crabs and small fishes were selected to study the impact of tourism on them. Majority of the surveyed population (58.23% and 56% respectively) at Mandarmoni and Digha and a smaller part of population (32.5%)at Bakkhali-Frazerganj agreed with the fact that, emigration of species have occurred. Perception survey of the local community reveals that,

not only red crabs, the small fish catch have also been reduced remarkably. Study reveals, a huge number of red crabs have been reduced at Mandarmoni, because of shifting from their earlier location. At Digha the amount of small fish catch has also been reduced along with the decline in the number of red crabs. Same trend of Digha has observed at Bakkhali-Frazerganj zone, but here small fish catch have reduced more than red crabs.

The reasons behind the above fact in the study area, are the development of tourism and tourism related activities, vehicular movement on beach, and overcrowding of beach visitors. Majority of the surveyed population at Digha and Mandarmoni zone supported the said reason, with exception at Bakkhali-Frazerganj where people do not have

any clear idea about the reasons responsible for the decline in fish catch. Primary survey reveals there is no road way to reach the hotels and lodges at Mandarmoni, because after Dadanpatra, the road ends and rest of the road is beach. The car rolls along the beach, which is another attraction as well as recreational activity for the tourists. Sometimes tourists hire two wheelers to enjoy the beach ride. Same as Mandarmoni, beach drive is followed as a recreational activity at Digha and Bakkhali-Frazerganj beaches too, which also cause a negative impact upon the red crabs on the beach. According to the perception survey of the local community at Mandarmoni, the small fish catch have reduced as they have retreated into the deep sea, as the water near the shore is getting polluted.

- ***Tourism and beach litter generation:***

The beach litter and related pollution is responsible for this which is generating from the tourism related activities on the beach. Beach litter accumulation is very important aspects of beach degradation which have adverse effects on the users of the beach and marine life. 32 items of beach litter have been identified during the study. The litter found on the beaches of study area (Digha, Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj) is mainly plastic dominated. Most of the plastics are non-degradable. Majority of the surveyed tourists at Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj said that the condition of beach is clean but, this perception is completely opposite at Digha, where majority of the surveyed tourists think the beach is dirty. As per tourists' perception, lack of consciousness of the tourists is responsible for the condition of the beach in the study area.

- ***Impact on water quality:***

The key findings from the water quality data areas follows:

- At Digha-Mandarmoni belt dissolved Zn, Cu and Pb are negatively correlated with salinity and pH (Salinity × Dissolved Zn = -0.8017, $p < 0.01$; Salinity × Dissolved Cu = -0.8351, $p < 0.01$; Salinity × Dissolved Pb = -0.7592, $p < 0.01$ and pH × Dissolved Zn=-0.6016, $p < 0.01$; pH ×Dissolved Cu =0.5932, $p <0.01$; pH×Dissolved Pb =-0.6569, $p <0.01$).

- BOD and COD are indicators of aquatic health and their values increase, if the water deteriorates. Under this situation the Biological and Chemical Oxygen Demand (BOD and COD) greatly increase and the DO values decrease. This phenomenon is also confirmed by the significant negative correlation values between DO and BOD (DO×BOD=-0.7105,p <0.01) and DO and COD (DO×COD = -0.7087,p<0.01).
- The inter-relationships between NO_3, PO_4 and Dissolved heavy metals (NO_3 × Dissolved Zn = 0.6891, p < 0.01; NO_3 × Dissolved Cu = 0.6310, p < 0.01; NO_3 × Dissolved Pb = 0.6674, p<0.01; PO_4×Dissolved Zn=0.4073,p<0.01;PO_4×DissolvedCu=0.4043,p<0.01;PO_4× Dissolved Pb = 0.4733, p<0.01) reflect that the pollution in the present aquatic system are both from anthropogenic and industrial sources. Even the pollutants are of complex nature, where nutrients and heavy metals are related positively. The significant positive relationship of NO_3 and PO_4 reflects that human activities like bathing, defecation, washing clothes and utensils go hand in hand in the aquatic system. Such activities are common in and around tourism sites. The positive correlation of NO_3 and PO_4 with SiO_3 is purely physical, where SiO_3 increases in the water column due to churning action by the run-off that enters the aquatic phase and disturbs the river bed.
- At Bakkhali-Frazerganjsalinity and pH has significant negative influence on most of the dissolved metals (Salinity×DissolvedZn=-0.6959, p<0.01; Salinity × Dissolved Cu=-0.4807, p <0.05; Salinity × Dissolved Pb = -0.7410, p<0.01 and pH × Dissolved Zn = -0.1261, IS; pH × Dissolved Cu = 0.1033, IS; pH × Dissolved Pb = -0.1672, IS).
- Significant negative correlation values between DO and BOD were observed (DO×BOD = -0.8432, p <0.01) and DO and COD (DO×COD = -0.8925, p < 0.01), which signifies deteriorated water quality. This zone also sustains cluster of tourism units.
- The inter-relationships between NO_3, PO_4 and Dissolved heavy metals (NO_3 ×Dissolved Zn = 0.8069, p<0.01; NO_3 × Dissolved Cu = 0.9154, p<0.01; NO_3× Dissolved Pb = 0.8526, p<0.01;PO_4×DissolvedZn=0.7486,p<0.01;PO_4×DissolvedCu=0.8966,p<0 .01;PO_4× Dissolved Pb = 0.8132, p<0.01) reflect that the pollution in the present aquatic system are both from anthropogenic and industrial

sources. Even the pollutants are of complex nature, where nutrients and heavy metals are related positively.

- At Satjelia Island (*control zone*) dissolved Zn, Cu and Pb are mostly negatively correlated with salinity and pH (Salinity×Dissolved Zn = -0.6120, $p<0.01$; Salinity×Dissolved Cu = -0.7456, $p<0.01$; Salinity×Dissolved Pb = -0.6172, $p<0.01$ and pH × Dissolved Zn = -0.5731, $p<0.01$; pH × Dissolved Cu = 0.7042, $p<0.01$; pH × Dissolved Pb = -0.5850, $p<0.01$).
- BOD and COD are indicators of aquatic health and their values increase, if the water deteriorates. Under this situation the Biological and Chemical Oxygen Demand (BOD and COD) greatly increase and the DO values decrease. This phenomenon is also confirmed by the significant negative correlation values between DO and BOD (DO×BOD=-0.8606,$p<0.01$) and DO and COD (DO×COD = -0.8509,$p<0.01$).
- The inter-relationships between NO_3, PO_4 and Dissolved heavy metals (NO_3 ×Dissolved Zn = 0.9465, $p<0.01$; NO_3× Dissolved Cu = 0.9316, $p<0.01$; NO_3 × Dissolved Pb = 0.9152, $p<0.01$;PO_4×DissolvedZn=0.9202,$p<0.01$;PO_4×DissolvedCu=0.8644,$p<0.01$;PO_4×Dissolved Pb = 0.8088, $p<0.01$) reflect that the pollution in the present aquatic system are both from anthropogenic and industrial sources. Although no industries exist in Satjelia, but the antifouling paints used for conditioning fishing vessels and trawlers are the sources of heavy metals.

The tourism units are the sources of sewage and several anthropogenic wastes of complex character. Even heavy metals are also released from speed boats and small floating vessels that are used for recreation purposes. Conditioning these accessories with antifouling paints lead to leaching of Zn, Cu and Pb in the aquatic phase. It is observed that nutrients like NO3, PO4 and heavy metals are more in areas where the resources are aggregated like Digha- Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj zone.This may be attributed to intense human activities, and fish landing related activities in these zones. The Satjelia zone is adjacent to the forest area of Sundarban Biosphere Reserve (SBR). In this zone there is an almost negligible tourism activity which is reflected by the lower values of nutrients and heavy metals. ANOVA

results also confirmed the spatial difference between sites ($p < 0.01$) in the study area which is a reflection of intense human activities in Digha-Mandarmoni and Bakkhali-Frazerganj.

- ***Tourism and beach accommodation:***

In the initial states of tourism in the study zones, beach shacks became popular due to their small numbers, economical rates and simple decor. Primary survey in all three study area reveals that number of shops and shacks have increased day by day after development of tourism. So, these structures crowd the shorelines without any comfortable space among them, and they lack eco-friendly toilet facilities and proper refuse collection, all of which often result in waste invariably find its place in the coastal waters. Beach shacks along the beaches of Mandarmoni, Digha and Bakkhali-Frazergunj are responsible for the crowding on the beach.

Conclusion

Although tourism is concentrated along the coastal zone in West Bengal (Digha, Mandarmoni, and Bakkhali-Frazerganj), it has had a number of positive benefits in terms of increased incomes, increased employment, added avenues for upward mobility for locals, increased revenue. However, there are also some socio-economic and environmental impacts associated with these benefits that need to be taken care of. Ecotourism should be encouraged to combine environmental education to protect local flora and fauna and provide local people with economic incentives to safe guard their environment. Uncontrolled growth of beach accommodations should be checked in all three tourist centers, especially at Digha and Mandarmoni. Policies which recognize the type of interconnections among tourism, local communities and the environment of the study area, should ensure that tourism contributes to a sustainable development of the region

.

References

Akis, S., Peristianis, N., &Warner, J. (1996). Residents' attitudes to tourism development: the case of Cyprus. Tourism Management, 17(7), 481-494.

Ap, J. (1992). Residents' perceptions on tourism impacts. Annals of Tourism Research,19(4), 665-690.

Ashe, J.W. (2005). Tourism investment as a tool for development and poverty reduction.The experience in Small Island Developing States (SIDS).

Aref F, Ma'rofR, SarjitG (2009).Community Perceptions toward Economic and Environmental Impacts of Tourism on Local Communities. Asian Social Science, 5(7): 130-137.

Bagchi. J (2019) Tourism and Physical Environment: A Perception Study on West Bengal Coastal Area. Scholarly Research Journal for Humanity Science and English Language, 2019 (7/32).

Basu,J.(2009) On The Waterfront, The Telegraph-Metro on Sunday.

Beeton,S. (2006).Community development through tourism. In: Landlink Press, Australia.Chawla,R.(2003)Sustainable Development and Tourism, Sonali Publications, NewDelhi-110002, India.

Canterio, M., Cordova – Tapia, F., Brazeiro, A (2018) Tourism impact assessment: A tool to evaluate the environmental impacts of touristic activities in Natural Protected Areas. Tourism Management Perspectives, 28(2018)2020-227

Cohen, E. (1978). Impact of tourism on the physical Environment. Annals of Tourism Research, 5(2), 215-237.

Das,Gautam Kr.(2006) Sundarbans Environment and Ecosystem, Sarat book distributors, Kolkata-73.

Diedrich, A., & Garcı´a-Buades, E.(2008).Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. Tourism Management, 1-10.

Dhara,S.(2007)Cyclone Hazard: A Perception Survey on Sea-fishing and Beach-tourism in West Bengal Coast, Hazard Perception and Disaster Management : Publication of the UGC sponsored Seminar, Department of Geography, Sivanath Sastri College, Kolkata.

Fen L, Hongfeng C, Wenhua L (2007). Socioeconomic Impact of Forest Eco-compensation Mechanism in Hainan Province of China. China Population, Resources and Environment, 17(6): 113-118.

Ko, D.-W., & Stewart, W. P. (2002). A structural equation model of resident's attitudes for tourism development. Tourism Management, 23(5), 521-530.

Koivunen, J., Siitonen, A. and Tanski, H. H. (2003). Elimination of enteric bacteria in biological chemical wastewater treatment and tertiary filtration units. Water Res., **37**: 690- 698.

Lankford, S. V., & Howard, D. R. (1994). Developing a tourism impact attitude scale. Annals of Tourism Research, 21(1),121-139.

Liu,J.C.,Sheldon,P.,&Var,T.(1987).ResidentPerceptionsoftheenvironmentalimpactoftourism. Annals of Tourism Research,21(121-139).

Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of Sustainable Tourism, 11(6): 459-475.

Mason, P. (2003). Tourism impacts, planning and management. Jordan Hill, Oxford: Butterworth– Heinemann.

Mitra, A., Chakraborty, R. and Banerjee, K. (2008)Monthly variation of Zn, Cu and Pb in and around Indian Sundarbans, Proc. Nat. Acad. Sci. India, Sect.B,Vol. 78Pt. III.

Mitra, Abhijit; Mukhopadhyay,B; Ghosh, A.K and Amalesh Choudhury. (1990) Preliminary studies on metallic pollution along the lower stretch of the Hooghly estuary. West Bengal, India. Proceedings of International Symposium on Marine Pollution, 241-249.

Mitra, Abhijit; Trivedi, Subrata and Amalesh Choudhury. (1994) Inter-relationship between trace metal pollution and physico-chemical variables in the frame work of Hooghly estuary. Indian Ports, 27-35.

Mitra, Abhijit; and Amalesh Choudhury. (1994) Dissolved trace metals in surface waters around Sagar Island, India. Journal of Eco-biology, Vol.6, No.2, 135-139.

Nash A.D. (1992). Impact of marine debris on subsistence fishermen. Mar. Pollut. Bull. 24: 150-155

Niyogi,C.,Chattopadhyay,K.(2007) Perception of Hazard: Methodology and its Applicationin

An Environmental economic Study, Hazard Perception and Disaster Management: Publication of the UGC sponsored Seminar, Department of Geography, Sivanath Sastri College, Kolkata.

Nunoo F.K.E.and Quayson E.(2003). Towards management of litter accumulation- case study of two beaches in Accra, Ghana. J. Ghana Sci. Assoc. 5: 145-155.

O'malley, L.S.S (1911)Bengal District Gazatteers. Midnapur District. The Bengal Secretariat Book Depot. Calcutta.

O'malley, L.S.S (1914)Bengal District Gazatteers. 24 Parganas District. The Bengal Secretariat Book Depot. Calcutta.

Paul,AshisKr. (1985):The development of accumulation forms and erosion in the coastal tracts of Balasore, Medinipurand24-Parganas district of Orissa and W.B. India. Jour. Land. Syst. Ecol. Studies. Calcutta.

Paul, Ashis Kr.(1991): Effective management strategies for the coast of West Bengal. Geog. Rev.India.Calcutta.Vol.53, No.1

Paul,A.(2002)Coastal Geomorphology and Environment, acb publications, Kolkata.

Ray,B. (2007)Tourism Hazard in a Hill Town: A Perception Study, Hazard Perception and Disaster Management : Publication of the UGC sponsored Seminar, Department of Geography, Sivanath Sastri College, Kolkata.

Richards, G., & Hall, D. (Eds.) (2000). Tourism and sustainable community development. USA: Routledge.

Sharpley,R.(2002).Tourism and Development:Concepts and Issues. Multilingual Matters Limited.

Tatoglu,E., Erdal,F., Ozgur,H., &Azakli,S.(2000).Resident perception of the impacts of tourism in a Turkish resort town.

WTO (2016). UNWTO – Tourism Highlights (2016 ed.).

Orating the Dignity of Man : Reading Krishna Mohan Banerji's *The Persecuted* in the Light of Renaissance Humanism

Ratan Dey
Assistant Professor, Department of English
Sundarban Mahavidyalaya

Abstract: The World of Renaissance was a world that put into radical question the validity of the theocentric universe. The Renaissance tends to re-examine, and in the process re-define, the relationship between Man, his God, and the Universe. Age-old religious practices and beliefs were questioned; reason rather than superstition came to dominate human behavior. The European Renaissance of the 15^{th} and 16^{th} centuries made its presence felt with the introduction of Western education in India some three centuries later. A certain section of Kolkata youth who studied Western literature and philosophy began to wage war against the mindless orthodoxy of the Hindoo religion during the first half of the nineteenth century. Krishna Mohan Banerji was the flagbearer of their effort to purge their religion of superstition and dehumanization. This present paper makes a humble effort to relocate and redefine the elements of Renaissance humanism in Rev. Krishna Mohan Banerji's play ***The Persecuted*** (1831), the first play to be written by an Indian in English.
Key words: Renaissance, Theocentric, Renaissance Humanism, Orthodoxy, The Persecuted.

Introduction

Renaissance humanism is often interpreted as a worldview that tries to understand the nature and perspective of humanity, a worldview that is developed out of an extensive reading of classical antiquity. Italy was the first European country where the Renaissance first took place in the 14^{th} century. A basically intellectual movement, Renaissance humanism accelerates the revival of human interest in the classical world and studies. It attempts at reversing and questioning the medieval way of thinking and, in the process, instrumenting something new. Pico della Mirandola's *Oration on the Dignity of Man* is often considered to be the

manifesto of the Italian Renaissance, which paved the path for the mainland European Renaissance a century later. The work reignited the passion in human beings for a further journey: a journey into the world of estimating and assessing human capacity and human achievement from various perspectives. Slowly but steadily, this quest for redefining the position of an individual in the universe transcends the geographical border of Europe and reaches the shores of even the remotest part of the globe. Scholars and thinkers who were ceaselessly haunted by this sense of restlessness to 'strive, to seek, to find' something new are generally called the Renaissance humanists.

In *Oration on the Dignity of Man* (composed in 1486) Pico's philosophical and rhetorical reasoning rests on the fact that Man, among other created beings, was least beneficial as Man was the last thing to be created by God. To recompensate this, God the supreme architect posits Man at the centre of the universe. Pico's attempt in *Oration on the Dignity of Man* to examine human achievement revolves around the fact that the final frontier in mankind's quest has always been the finding of pure reason. One significant way to attain this pure reason is the study of philosophy and theology. Pico's argument that Man is what he makes of himself and is what he chooses to believe is seminal to any understanding of the humanistic approach during the Renaissance. Thus, Man's relentless quest for knowing the unknown places the whole thing in the framework of neo-Platonic discourse. By translating Man's intellectual potential into performance, he can ascend the 'chain of being', and this idea is in itself an unprecedented backing of the dignity of human existence on earth. This dignity is something by which Man can transform himself through his free will. As Pico puts it in his famous work *Oration on the Dignity of Man* –

> At last, the Supreme Maker decreed that this creature … He set him in the middle of the world and thus spoke to him:
> "We have given you, Oh Adam; no visage proper to yourself... I have placed you at the very center of the world, so that from that vantage point you may with greater ease glance round about you on all that the world contains. We have made you a creature neither of heaven nor of earth, neither mortal nor immortal, in order that you may, as the free and proud shaper of your own being, fashion yourself in

> the form you may prefer. It will be in your power to descend to the lower, brutish forms of life; you will be able, through your own decision, to rise again to the superior orders whose life is divine." (Pico della Mirandola 6-7)

The introduction of western education in India prompts a group of youth to raise pertinent questions that sounded similar to Pico's idea of choice and free will.

In colonial India, the province of Bengal was the epicentre of such intellectual awakening that instigated unprecedented social and cultural upheavals during the beginning of the nineteenth century. A group of budding intellectuals like Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and the Young Bengal (also known as the Derozians) who were educated in western education began to rebel against the socio-cultural aridity such as the rigors of age-old customs and mindless orthodoxy inside Hindoo religion and acted as a harbinger of a new dawn.

The tag 'Young Bengal' generally applies to this group of radical thinkers who were 'Hindoo by birth, yet European by education'. They put into intellectual investigation everything that does not conform to their rational bent. The consequences of their humanistic approach, as Susobhan Sarkar aptly puts it in his *On Bengal Renaissance*, were alarming and far-reaching:

> Orthodox society was deeply alarmed. It was rumoured that some Hindu College Boys, when required to utter mantras at prayers, would repeat lines from the Iliad instead; that one student, asked to bow down before the goddess Kali, greeted the image with a "good morning, madam". A poor Brahmin, Brindaban Ghoshal, carried to society leaders the daily gossip, spiced richly with scandal-mongering about Derozio and his pupils. (Sarkar 104)

Krishna Mohan Banerji's (1813-1885)book *Dialogues on the Hindu Philosophy* deals with his ideas and observations on the ancient Indian school of philosophy. The book was an influential text in interpreting Indian 'theosophy' alongside western theology.

Rev. Krishna Mohan Banerji's play *The Persecuted: The Dramatic Scenes Illustrative of the Present State of Hindoo Society in Calcutta* (1831) is the first Indian play to be written in English, a play that is written in mold of 'Agitprop' tradition and aims at exposing the

hypocritical and stagnant rituals of contemporary Hindoo society. The 20th century theatrical transaction of agitprop hovered around the building of public opinion through propagandist ideas and theories. Now, the agony and anger of a castaway found its fullest utterance through the columns of *The Enquirer*:

> As we have left the sacred sanctuary of Hindu religion, cruel tortures are bestowed on us. Ultra -religious people are dagger drawn as we have shaded all superstitions. What we have done is rational that is why it is true to our conscience. We have pledged to take this path patiently. If our enemies want to kill us in anger, we are ready to give our life. … we are ready to face all the tortures. We know to reform the nation and develop it, there will be some misunderstanding and uproar in the surface. (Midday 67)

This hitting back at the enemy through the mouthpiece of the Young Bengal worked as a prelude to a new form of countering; countering by creating a literature that mirrors the spirit of the age.

In *The Persecuted,* Banerji targeted the 'Baboo culture' of Calcutta Society in the first half of the 19th century and uncompromisingly exposed its dubiousness and double standard. A general overview of the plot places the characters of the play in three distinct categories: those who tried by hook or by crook to keep intact the foundation of Brahminism (Kamdeb, Debnauth, Ram Lochun, Lall Chand, Turkolunkar, and Bydhabagis); those who were determined to turn these dehumanizing practices of theology upside down (Banylal, Shamnauth, Indranauth, and Bhyrub); and those who remained some sort of detached perspective in the face of this trouble-tossed time (Sumbal Chand, Ram Mohun, Hurry Chand, and Kader). The clash between the worn-out conservative values on one hand and the inevitable changes with the coming of a new era can be seen as a clash between the instinctive attachment to the past and the newly introduced western education. As Sib Sankar Majumder aptly sums up this unavoidable cultural clash:

> Moreover, he [Lall Chand] has decided to summon a meeting of "all rich men " (presumably of the city) for ostracizing Banylal, Mohadeb's son. What is very interesting, however, is to note that it [he] is not upper-caste Brahmins but a wealthy 'baniya' (Lalchand is a very

> characteristic name for a Hindi speaking northerner from the city's thriving business community) who calls the shots in this controversy and upper-caste (represented by the Brahmins) are only playing the second fiddle. (Majumder 46)

Interestingly, Banerji, a student from the Hindu College, came in close proximity with such scholarly figures as Direzio, David Hare, and Alexander Duff, who helped him build an understanding of cross-cultural intercourse. He attempted to draw a parallel between the Vedas and the Holy Bible. He wrote *The Persecuted* in 1831 and a year later he was converted to Christianity.

Considering the blatant autobiographical element of the play, we can safely say that the figure of Banylal is modelled on Banerji himself, whereas the character of Mohadeb is designed after Banerji's own father, Jeeban Krishna Banerji. The fellow comrades of Banylal are none other than the youths from the Young Bengal. The play opens in the form of an argument between two servants – an old one against a new one – arguing about certain 'unrighteous, vile, and unantural' crime committed by the protagonist Banylal.

The confrontation between the father and the son in the second scene of the second act brings forth the central conflict of the drama: a conflict that shows the unbridgeable gap between the old social order governed by ritualistic stagnation and the newly emerging protestant youth. Mohadeb, the father of Banylal, desperately tries to get his son back on the track of tradition by urging him to undergo the ritual of penance. He even appeals to his son on the ground of the filial tie that binds a father to his son. Banylal's reply to his father is emblematic of moral and ethical uprightness: "Dear sir! be comforted; how can I with a safe conscience disgrace philosophy, disgrace humanity, and disgrace the character of man by uttering what is not a fact" (Midday 21). When left alone on the stage, Banylal's inner conflict is what sums up the pangs of a Renaissance humanist:

> Are these the effects of knowledge? – Disagreement between father and son? The Almighty was wise when he forbad man to taste this baneful fruit. What! Is knowledge to produce all these? Is a man by renouncing superstition to fail into such difficulties? Are we to set ourselves at defiance to

> all the calls of nature? Is education to blunt our feelings and render us indifferent to our brothers and sisters? … a father's cries are not stronger than those of truth. … I break down the chains of filial duty for truth (Midday 21-22).

All these questions are rhetorical sets of questions. The protagonist knows well in his mind what course of life to choose. These questions are pertinent to a humanist who is about to embark upon the search for truth.

The dramatic conflict seems to get a whole new dimension in the exchange between the old servant and Banylal towards the end of the play. Banylal backs his idea of going unrepentant, as he is seen to accuse Hindoo religion of 'absurdities'. In reply to the charge of heresy brought against him by the old fellow, his response seems to sum up the degeneration that this religion has undergone. The supreme form of irony lies in the fact that the Brahmin who appeared in the penultimate scene (V, ii) to win Banylal back to their school of thought is named Bydhalunkar. His name seems to suggest that he is Knowledge (Vidya) personified. But his speech establishes him as one who has anything but knowledge and understanding in him. In sharp contrast to this stands Banylal's undaunted resistance to any such attempt to lure him. He has committed to the path of truth, and there is no going back for him:

> Let us enter the field with fortitude and perseverance. – Let us handle this sacred cause, and desert it only by our death. Our lives may be lost; but let us not shrink with fear. – Let *"Bear on; bear nobly on"* be our watchword. Let us prove ourselves dutiful sons of our country by our actions and exertions. Now let us see what strength can ignorance and bigotry bring into the field. Let us mark how feeble is prejudice when rational beings attack it with prudence (Midday 46).

The protagonist, like Krishna Mohun in his own life, is quite resolute in his decision not to do even the right thing (sticking to the filial tie) for a wrong reason (surrendering to the pressure of the Brahminical order). It is in his last speech where he is seen to cheer his fellow comrades up that Banylal emerges as a Renaissance humanist in the truest sense of the term.

Conclusion

The Renaissance humanists, at no point in their lives, abandoned their religion. We can say the same thing in the case of Rev. Krishna Mohun Banerji, for whom it was something like 'once a Hindoo, always a Hindoo'. Though he was converted to Christianity at one point in his life, it was more of a physical, outward change. When Rabindranath Tagore wrote about the role of religion in shaping the identity of a race in his *Atmaparichay*, he explained that the racial identity of an individual is inseparable from his religious identity. These cannot change under any circumstances. Tagore described Bnerji as a 'Hindu-Christian'. Thus, Krishna Mohun Banerji can be taken to represent those rare breeds of journalists whose *The Persecuted* remains a classic in the field of Renaissance quest for truth. Like most of the humanists of the Renaissance, his journey was a solitary one. He didn't get much support from his family and friends. Yet he didn't hold himself back from chasing 'knowledge like a sinking star' in order to redefine the fullest potential of his 'self'.

References

Pico della Mirandola, Giovanni.1965. *Oration on the Dignity of Man*. Translated by Robert Caponigri. Chicago:A Gateway Edition, pp. 6-7

Sarkar, Susobhan. 1979.*On the Bengal Renaissance*. Calcutta: Papyrus, p.104.

Midday, Suranjan. 2018. *Reverend Krishnamohan Banerjee's The Persecuted.* Kolkata: Rupali, Kolkata, pp. 21-22, 46, 67.

Majumder, Sib Sankar. 2014. "Theatre of Class Contradiction: A Comparative Study of Krishnamohan Bandyopadhyay's The Persecuted and Michael Madhusudan Dutt's Ekei Ki Bole Sabbhyata". *IIS University Journal of Arts*, vol. 3, no. 1, pp-42-50.

A Secular Integration of Human Value : The Kernel of Religious Harmony

Apabrita Bhattacharya
Research Scholar, Department of Philosophy
University of North Bengal

Abstract : I intend to show in my paper that respect towards humanity is the primary criterion for building a harmonious society. An ideal society always tries to value an individual's autonomy. This can be maintained only by giving equal rights and liberty. However, the problem arises when an autonomous action hurts the sentiments of others. This type of action cannot be regarded as morally justifiable. In a multi-religious society, when a particular religious faith dominates another faith, it becomes an imbalanced society. Giving preference to humanism in the place of social discriminationcan maintain harmony within the society. A secular society aims to promote a conflict-free, balanced society. People must adopt a welcoming attitude towards humanity in order to practice it in the present situation.
Keywords : value, humanity, secular, religion, discrimination, harmony.

Introduction :
'Value' is a heavyweight word in our human dictionary. The word itself is always related to something. Human beings are considered rational. So, their values enliven society in terms of interaction. It means that, in our galaxy, the surrounding objects of a being should always be valued by them. Human beings should codify all aspects of a society, i.e., culture, economy, education, growth, politics, etc. However,everyoneis known by their different professions - teachers, doctors, householders, politicians, etc. However,giving importance to the entire humanity is necessary for everyone to provide justice to their work. So, giving preferenceto humanity should be considered our primary duty. That is whythese values should have some ethical or moral justification. Beforeproviding some value to someone or some aspects, it is vital to know in what respect we are giving this. Is it good for society? The society represents the entire human harmony. We know that ethics is concerned about right and

wrong, good and bad conduct. So, the term 'value' should have an ethical justification before its implication.

The implication of human values in Indian society:

In my paper, I discuss the importance of human values that should be present in a secular society. Before examining the values, we must know which society can be considered secular.To answer this question, I want to convey that no particular definition of a secular state or society exists. As a matter of discourse, people can call a society secular, only which fulfils their needs or requirements. However, apart from this, to understand the term 'secular’,one can say that the word itself has a universal application, not any individual approach. As a universal or social ideology, some values are inherent in the norm of secularism. The implication of equal rights and opportunities, human dignity, justice, religious liberty, etc., are important human values that a secular state aims to achieve. However, we live in an ever-changing society because of the development process. So, the needs or requirements have also been changed. Therefore, secularism is a dynamic notion that aims to give values ethically in every ongoing situation.

We can consider human beings as rational as well as religious. However, it has been claimed that, while being religious, men prioritize faith more than reason. In this domain, the notion of secularism intends to analyse our religious faith through reasoning. The main aim of secularism is to promote humanism. So, it is only possiblethroughgiving value to the entire humanity. We all know that, from the ancient past, human beings were considered superior and valued much more than other living creatures. We observe the importance of human beings from our ancient literature. This type of human-centric approach also includes or indicates the practice of secular ideas. In our ancient past, in India, there were some secular practices, like worship of nature, etc. This practice was for the benefit of human beings irrespective of their different religions, caste, sex, etc. All ethical practices, such as truthfulness, respect for others, etc., can be considered secular. Because of some societal superstitions, we sometimes forget to treat others as human beings. Humanity is our primary identity; we all share in the same galaxy. Most people think about some supernatural entity. We consider that being the builder of the globe and also the generator of the human soul and body. In the domain of secularism, it can be said that the supernatural entity only creates

human beings without making any religious discrimination. For the supreme entity, we all are the same. Religion, caste, sex,etc., are human creation that separates one from the other. It would be clear by saying that there is no religious tag on the child's body at the time of birth. Instead, they are only identified as a 'human child'. So,'humanity' is the actual identity.

While talking about ancient times, the ground of Philosophy is that which is very much conscious about the values of the world and human beings living there. By giving such values to human beings, which is morally justifiable, Philosophy tries to find the meaning of our life. As a value theory, many philosophical schools approach ' humanism ' by giving their views in different ways. On the grounds of Philosophy, ' human values ' can be shared by any school. Although whether it is theistic or atheist, orthodox or non-orthodox. Both humanism and secularism are philosophical movements thatarehuman-centric. Both ideas share values of welfare by humans, for humans. In the domain of humanism, we can cite the Carvaka school, which has ahuman-centric approach. The Carvakas held a strong affinity for the material realm and rejected the notion of heavenly origin. These schools are regarded as hedonistic, as they prioritize the pursuit of human enjoyment in the current life. Similarly, secularism aims to promote well-being in our present existence by providing social welfare. In addition to receiving some criticism, the Carvaka school is commonly referred to as '*lokayata*', which signifies the 'philosophy of the people'.

After discussing Carvaka's theory, Jaina's interpretation of humanism is commendable. The Jaina Philosophical theory shows their concern about humanism by application of the idea of non-violence. Being an atheist school, Jaina philosophical school gives more preference to '*karma'(deeds)*. They are very much concerned about human activities. In this regard, they advocate the concept of '*Triratna*' (three jewels). While talking about '*Triratna'*, Jaina school discusses the path of right conduct based on a fivefold moral way; non-violence is one of them. As we know, violent acts create conflict within society. They adopted the theory of patience in the place of revenge. In the same way, the idea of secularism promotes social harmony by adopting non-violent policies to maintain brotherhood. Another vital aspect that JainaPhilosophy shares is the motive of tolerance. They promote the theory of '*Anekantavada'*. In

this regard, they didn't demand their approach as only the true one. Instead, they believe in the partial truthfulness of others. They do not believe in individuals but rather in universal or humanity in general. On the other hand, the notion of secularism also believes in the ideology of acceptance. The idea of secularism advocates cooperation in a non-violent way by not discarding or rejecting anyone's views. Humanhoodestablishes the worldfamily–the primary propaganda of secular ideas.

After discussing humanism on the grounds of Jaina Philosophy, let us discuss the vision of Buddhism. Buddhist philosophy was setas a remark for their virtuous thinking. Buddha speaks about four immeasurable states of dwelling. It is known as *'Brahma-vihara'*. As states of mind, *'Brahma-vihara'* are known as the perfect virtues of human life. Practising these virtues can make people aware of themselves andcreate awareness about other people related to that being. Among these four virtues, the first is *'Mettta'*,which teaches universal love and kindness. It is one kind of universal amiability. Just like the first virtue, the secular ideology aims to spread the energy of love toward all religious beliefsto build a universal brotherhood. The second virtue is *'Karuna'*. This makes the soul wise. Only a compassionate soul can forgive all the narrow things. In the same way, in the secular state, the souls guided by reason can also understand and not dominate the thinking of others. The third virtue is *'Mudita'*, which means altruistic happiness. A selfish being cannot build social harmony. But if a person desires the happiness of others, it will cause self-happiness. The fourth virtue, *'Upeksha'*, indicates the balance of mind. Upeksha or equanimity creates leniency in mind. Anunbiased mind is needed to make a good society. The secular ideas also aim to achieve mental endurance for social co-existence.

Certain social practices in India, such as hierarchy and discrimination based on gender, religion, etc., might be viewed as anti-humanistic behaviours that undoubtedly undermine social cohesion. Human values can only be given by maintaining equality. In the medieval Indian period, two significant social and religious movements fought against social discrimination on their path to love and equality. These are - the Bhakti and Sufi movements. The main aim of human beings is to achieve liberation. The Bhakti and Sufi saints emphasise the devotion of self to God. By way of devotion, all humanity can eliminate social evils.

These two significant movements highlight the path of secularism by advocating social equality. Kabir, Thiruppana Alwar, and other well-known Bhakti saints were among the lower classes who experienced social persecution firsthand. They experienced discrimination and came to understand the value of humanity. They followed the equal path because they believed it might end discrimination in all communities.The principle of equality is one type of agitation against various kinds of social oppression. Providing all equal rights and a dignified life can eliminate the curse of social oppression. Human rights should be given irrespective of class, caste, or gender. It has been claimed that women are often considered objects who have no choice or freedom. Two important Bhakti saints - Meerabai and Surdas, by their peaceful rebellion, advise to give women equal footing. Humanity exists in bothmen and women. So, no one should be disrespected and discriminated against. On the other hand, Guru Nanak, the reformer of the Sikh movement, also advocates for following the path of equality to pursue a social life.

On the other hand, the Sufi movement can be considered the Islamic spiritual enlightenment movement. Like the Bhakti movement, the Sufi movement emphasized the devotional path of love and was against religious formalism. Many Sufi saints, such as Amir Khusrau, Nizamuddin Auliya, etc., propagate universal love and brotherhood. Both the Bhakti and Sufi movements advocate giving value to humanity through love.

Despite these movements, many Indian thinkers were worried about some superstitious Indian culture and paid full attention to humanity. One of the great thinkers was Swami Vivekananda. Poverty, inequality, and ignorance in our society greatly disturbed his mind. As a spiritual spokesperson, he advocated for religious oneness. Vivekananda found the existence of God in every human being. He was a believer in selfless service. As a non-superstitious thinker, Swami Vivekananda accepted religion as a manifestation of divinity present in humanity. For him, without creating any barrier between religious groups, everyone could learn the level of spirituality only by acknowledging the goodness of humankind within everyone. As an advocator of ‘Universal Religion’, he advised people to be open-minded and to acquire positive thoughts from all religious scriptures.[i]

Another vital thinker, Rabindranath Tagore, elaborates on 'humanism' by advocating the revelation of divinity within human beings. His notion of ' humanism ' is also very much connected with 'spirituality'. He rejected all forms of ritualistic social injustice and superstitions by practising love in his thoughts and words. Tagore finds the existence of God in human life, which he called *'Jivan Devata'*. He always talks about human unity and social harmony. While advocating 'humanism', Tagore advocates the service for humanity as the duty of every person. Tagore elucidated the function of the infinite spirit as a constructive archetype of virtue and affection that resides within the human race. He explained the idea of salvation by describing the human state of life. Tagore considered this state of life the highest state of salvation through unity, where all contradictions, limitations, or finiteness are merged into an infinite process, which is ' *Brahmavihara*' living in infinity.[ii]

Let us talk about anotherinfluential social and spiritual thinker, Sri Aurobindo. He advocated equality and always paid attention to human dignity and honour. That is why he advocated attaining a divine state where all forms of inequality would vanish. While focusing on humanity, Sri Aurobindo advocated service for humankind and asserted respect for all beings. SriAurobindo posits that the religion of humanity opposes the subjugation, brutality, and exploitation of humankind. Sri Aurobindo was very concerned about human salvation and equal footing. He also cited spiritual consciousness, which makes human beings aware of humanity's oneness.

Another social reformer, M.K. Gandhi, gave importance to humanity through his ethical views that were applied to his social services.Gandhi was very much concerned about human integrity and social solidarity. As a freedom fighter, Gandhi was conscious not only of social freedom but also of individual freedom. He adopted the policy of *'Ahimsa'*(non-violence) as the law of love as a medium of interaction, even with enemies. Gandhi advocates the notion of equality and tolerance. Tolerant behaviour comprises a non-violent attitude towards others. Gandhi advocates paying equal respect to all religions, known as‘*Sarva Dharma Sambhava*’. By adopting the notion of religious tolerance, Gandhi wanted to achieve peace within religious society. He was against all forms of social discrimination. As a humanist, M.K. Gandhiwas concerned about universal upliftment. His notion of

'*Sarvodaya'* can be considered a movement for the betterment of humanity.

Conclusion: In conclusion, it can be said that peace and prosperity within a society depend upon its attitude towards human beings. Using rational thought, humans make many societal changes to benefit living creatures. Whendiscussing values like – equality, liberty, justice, dignity, etc., it can be achieved only by giving importance to humanity.In the mirror of humanity, no one is superior or inferior. The idea of secularism also aims to provide a dignified, respectful living where there is noplace for any discrimination.As a dynamic ideology, secularism welcomes multiple religious faiths to coexist harmoniously. Only cooperation and acceptance makeliving a dignified, peaceful life possible.To make this happen, one needs to judge and guide others on the ground of humanism so that the social balance can be maintained.

---

[i]Lal, B.K. (2017). *CONTEMPORARY Indian Philosophy*. 8 Camac Street, Kolkata: MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS, PP. 44-45.

[ii] Tagore, Rabindranath. (2019). *Sadhana*. Chennai: Notion Press, P. 306.

References

1. Holyoake, George Jacob. (1871). *THE PRINCIPLES OF SECULARISM*. London, England: Legare Street Press.
2. Vivekananda, Swami. (2018). *THE COMPLETE WORK OF SWAMI VIVEKANANDA*. New Delhi: Discovery Publisher.
3 Pillai, P. Govinda. (2022). *The Bhakti Movement: Renaissance or Revivalism?* London, Routledge.
4. Debnath, Sailen. (2010). *Secularism Western and Indian.* Ansari Road, New Delhi: ATLANTIC PUBLISHERS.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Ph : 9804923182, 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-